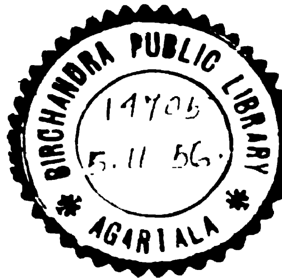
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

নব্য দর্শন

শ্রীতারক চন্দ্র রায় বি. এ.
প্রণীত



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৯৫২

মূল্য দশ টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে শ্রীগোবিন্দ পদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রাকাশিত এবং ৩৮, শিবনারায়ণ
দাস লেনস্থ রাণীশ্রী প্রেস হইতে শ্রীবামাচরণ মণ্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

তৃতীয় পর্ব্ব

নব্য দর্শন

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

উৎসর্গ

ওঁ তৎ সৎ

চরিত্র-মাধুর্য্যে যিনি আত্মীয়-বন্ধুগণকে মুগ্ধ এবং আমার
জীবন-ভার লঘুতর করিয়াছিলেন, পরদুঃখকাতরা
ও সেবাপরায়ণা আমার সেই পুণ্যবতী
স্বর্গতা পত্নী প্রমদা দেবীর পুণ্যস্মৃতির
উদ্দেশে এই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের
ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড
উৎসর্গ করিলাম।

প্রস্তাবনা

এই গ্রন্থের পরিকল্পনায় আমি পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস তিন পর্ব্বে বিভক্ত করিয়াছিলাম—গ্রীক দর্শন, মধ্যযুগের দর্শন ও নব্য দর্শন, এবং বেকন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যুগকে শেষ পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু হেগেল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দার্শনিক চিন্তা এত বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত এবং বৈচিত্র্য-প্রাপ্ত হইয়াছে, যে এই যুগের ইতিহাসকে এক স্বতন্ত্র পর্ব্বে সন্নিবিষ্ট করাই সঙ্গত মনে করিয়া নব্য দর্শন-পর্ব্ব হেগেলের দর্শনের সঙ্গেই শেষ করিলাম। "আধুনিক দর্শন" নামে এক স্বতন্ত্র পর্ব্বে হেগেলের পরবর্ত্তী দর্শনের ইতিহাস সন্নিবেশিত হইবে।

এই ইতিহাস রচনা করিতে বহু ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের বাংলায় অনুবাদ করিতে হইয়াছে। আমি যে যে শব্দের ব্যবহার করিয়াছি, পাদটীকায় তাহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দ উদ্ধৃত করিয়াছি। সমস্ত শব্দই যে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। Becoming শব্দের অনুবাদে আমি "ভবন" শব্দের ব্যবহার করিয়াছি। "ভবন" শব্দের অন্য অর্থ আছে বলিয়া একজন সমালোচক আপত্তি করিয়াছেন, কিন্তু Becoming অর্থেও "ভবন" শব্দের ব্যবহার আছে। গীতার অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী "স্বভাব" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মণঃ জীবরূপেণ ভবনম্"। অবশ্যম্ভাবী (e.g. necessary truth) অর্থে Necessary শব্দের অনুবাদে অ-বশ্য, অবশ্যক, অবশ্যম্ভাবী ও নিয়ত, এই চারি শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছি। "অবশ্যক" শব্দ হিন্দি ভাষায় এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়, ইহা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি। সংস্কৃত ভাষায় অব্যভিচারী, নিত্য সিদ্ধ, পরিনিষ্ঠিত সাংসিদ্ধিক, সহজ, অকৃত প্রভৃতি শব্দ প্রায় এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু এই সমস্ত শব্দের মধ্যে বাধ্যতার ভাব নাই। "Justice" শব্দের স্থলে আমি সুবিচার শব্দের ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু Justice ও সুবিচার শব্দের দ্বারা মূল গ্রীক শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না। 'সুবিচার' অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী অন্য কোনও শব্দ না পাইয়াই উহাই ব্যবহার করিতে হইয়াছে। মূল গ্রীক শব্দের অর্থ, আমি প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। Dialectic শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফিকটে ও হেগেল যে অর্থে ঐ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, প্রথমে আমি সেই অর্থে 'দ্বিমুখী-নয়" ব্যবহার করিয়াছিলাম। পরে জানিতে পারিলাম জৈন দর্শনে "স্যাৎ বাদে" "সপ্তভঙ্গী নয়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অনুকরণে আমি "ত্রিভঙ্গী নয়" শব্দের ব্যবহার করিয়াছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ বি.এ. অনার্স পরীক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত পাঠ্য পুস্তকের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ইহা আমার পক্ষে আনন্দের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরেও যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের অনুরাগী, এই গ্রন্থ তাঁহাদেরও কাজে লাগিলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

আমার দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা-বশতঃ প্রুফ সংশোধনে কিছু কিছু ভুল রহিয়া গিয়াছে। ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

শ্রীতারক চন্দ্র রায়

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস

তৃতীয় পর্ব্ব

নব্য দর্শন

প্রথম অধ্যায়

বস্তুবাদ-প্রবণতা

(১)

ফ্রান্সিস্ বেকন

প্রাচীন কাল হইতে দার্শনিক চিন্তা দুইটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এক ধারার গতি অধ্যাত্মবাদের[১] অভিমুখে, দ্বিতীয়টির গতি বস্তুবাদের[২] দিকে। যে যে বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় আছে, তাহাদিগকে সাধারণতঃ আমরা দুইভাগে বিভক্ত করি—জড় ও চিৎ। কিন্তু মানবের জ্ঞানের ইতিহাসে বহুদিন পর্য্যন্ত এই পার্থক্যের উপলব্ধি হয় নাই। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব সকলের নিকট স্পষ্ট ছিল, কিন্তু 'জ্ঞান'ও যে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং সেই জ্ঞান উদিত হয় যে 'মনে', তাহা যে দেহ হইতে স্বতন্ত্র, এই জ্ঞান আবির্ভূত হইতে বহু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে আনক্সগোরাস প্রথমে জড় হইতে স্বতন্ত্র এক পদার্থের কথা বলিয়াছিলেন, যাহার নাম দিয়াছিলেন তিনি "নউস্"[৩]। কিন্তু এই নউস্ জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যরূপে পরিগণিত হইতে আরও কিছুকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য দর্শন ইহার পরে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে—ডেমোক্রাইটাস প্রবর্ত্তিত পরমাণবিক জড়বাদ এবং প্লেটোর আধ্যাত্মবাদ। নব্য পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও এই দুই ধারা অব্যাহত আছে। ইহাদের রূপের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই মাত্র। অভিজ্ঞতাই[৪] যে যাবতীয় জ্ঞানের ভিত্তি, তাহা উভয় পক্ষ-কর্ত্তৃকই স্বীকৃত। এই অভিজ্ঞতায় যে চিৎ ও জড় উভয়বিধ পদার্থের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেও কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু এক পক্ষ বলেন, যাহা চিৎ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাও জড়—জড়ের সূক্ষ্মরূপ; অন্য পক্ষ বলেন, যাহাকে জড় বলিয়া মনে হয়, তাহা চিতেরই প্রকাশভেদ মাত্র। প্রথম পক্ষ বলেন, আমাদের যাবতীয় জ্ঞান জড়েরই জ্ঞান, ইন্দ্রিয়দ্বারা সেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়; ইন্দ্রিয় ভিন্ন জ্ঞানলাভের অন্য কোনও পথ নাই; দ্বিতীয় পক্ষ জ্ঞানের উৎপাদনে মনেরও যে যথেষ্ট দান আছে, তাহার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন। নব্য দর্শন মুখ্যতঃ এই দুই মতের বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ।

[1] Idealism [2] Realism [3] Nous [4] Experience

জার্মাণ দার্শনিকগণ দে-কার্ত্তকে নব্য দর্শনের জনক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দর্শনের ইতিহাসের ইংরেজ লেখকগণ দে-কার্ত্ত এবং বেকন—দুইজন হইতেই নব্য দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে, বলেন। বেকন ও দে-কার্ত্ত দার্শনিক গবেষণার দুইটি বিভিন্ন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন—নব অভিজ্ঞতামূলক প্রণালী[1] এবং নব বিতর্কমূলক প্রণালী[2]। দুই প্রণালীরই প্রধান কথা পূর্ব্বকালীন সমস্ত মত এবং যাবতীয় পূর্ব্ব-সংস্কার বর্জ্জন করিয়া অভিজ্ঞতার পরীক্ষা করা—অভিজ্ঞতায় যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার উপর দর্শনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। সত্য-আবিষ্কারের নির্ভুল ও নিশ্চিত প্রণালীর উদ্ভাবন উভয়েরই লক্ষ্য ছিল। অভিজ্ঞতার মধ্যে যাহা পাওয়া যায় না তাহা কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু বেকন বাহ্য ইন্দ্রিয় হইতে যে জ্ঞান উদ্ভূত হয়, কেবল তাহাকেই অভিজ্ঞতা বলিয়া স্বীকার করিতেন। দে-কার্ত্ত মানসিক ব্যাপার সকলকেও অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতেন।

১৫৬১ খৃষ্টাব্দে Francis Bacon of Verulum লণ্ডননগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা Sir Nicholas Bacon তৎকালের একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। কুড়ি বৎসর যাবত তিনি রাণী এলিজাবেথের রাজত্বে "Keeper of the Great Seal"-এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পিতার যশঃ পুত্রের যশঃকর্ত্তৃক অভিভূত হইলেও, Sir Nicholasও একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। বেকনের মাতা ছিলেন Lady Anne Cooke, এলিজাবেথের কোষাধ্যক্ষ লর্ড বার্গের শ্যালিকা। Lady Anne বিদুষী এবং পুত্রের শিক্ষা-বিধানে বিশেষ যত্নবতী ছিলেন।

১২ বৎসর বয়সে বেকন কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন। তিন বৎসর তথায় শিক্ষালাভ করিয়া কেম্‌ব্রিজের শিক্ষাপ্রণালী ও আরিষ্টটলের দর্শনের প্রতি গভীর বিরাগ লইয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন, এবং দর্শনকে তাহার বন্ধ্যা বিতণ্ডা হইতে মুক্ত করিয়া মানুষের প্রয়োজন-সাধনে নিযুক্ত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি প্যারিসের ইংরেজ রাজদূতের অফিসে সহকারী নিযুক্ত হন। এই সময়ে ১৫৭৯ সালে তাঁহার পিতা হঠাৎ পরলোক গমন করেন, এবং তাঁহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। তখন তিনি আইনব্যবসায় অবলম্বন করেন। পদস্থ আত্মীয়বর্গের কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন নাই। ১৫৮৩ সালে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন, এবং তাঁহার কার্য্যে তাঁহার নির্ব্বাচকগণ এতই সন্তুষ্ট হন, যে পরবর্ত্তী প্রত্যেক নির্ব্বাচনে তাঁহারা তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি-সম্বন্ধে বেন্ জন্‌সন্ লিখিয়াছেন, "তাঁহার মতো পরিপাটী, বাহুল্যবর্জ্জিত ও গুরুগম্ভীর বক্তৃতা কেহ কখনও করে নাই। তাঁহার বক্তৃতায় বৃথা বাগাড়ম্বর ছিল না, নিরর্থক শূন্যগর্ভ বক্তৃতা তিনি করিতেন না। তাঁহার বক্তৃতার প্রত্যেক অংশ স্বকীয় ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তি পাইত। শ্রোতৃগণ কাশিতে অথবা অন্যদিকে চাহিতে পারিত না, পাছে কোনও কথা কর্ণগত না হয়, এই ভয়ে। শ্রোতৃবর্গকে তিনি মুগ্ধ করিয়া

[1] Empirical method [2] Speculative method

রাখিতেন ; অন্য কেহই তাঁহার মতো তাহাদিগের প্রীতিলাভে সক্ষম হয় নাই। কখন বক্তৃতা শেষ হইয়া যায়, প্রত্যেক শ্রোতার মনে এই আশঙ্কার উদয় হইত।" এমন সৌভাগ্যলাভ কম বক্তারই ঘটে।

এলিজাবেথের প্রিয়পাত্র Earl of Essex বেকনের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বেকনকে কোনও রাজনীতিক পদে নিযুক্ত করাইতে না পারিয়া ১৫৯৫ সালে Essex তাঁহাকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। এই দানের জন্য বেকনের চিরকাল এসেক্সের অনুগত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। কয়েক বৎসর পরে এসেক্স এলিজাবেথকে বন্দী করিবার জন্য যখন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, তখন বেকন বারংবার পত্র লিখিয়া তাঁহাকে এই ষড়যন্ত্র হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন ; কিন্তু এসেক্স নিবৃত্ত না হওয়ায়, বেকন তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেন, যে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্য তিনি রাণীর প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। পরে এসেক্স যখন রাজ-বিদ্রোহের অপরাধে ধৃত হন, তখন বেকন তাঁহাকে ক্ষমা করিবার জন্য বারংবার রাণীকে অনুরোধ করেন। ইহার পরে এসেক্স কিছুদিনের জন্য কারামুক্ত হইয়া যখন সসৈন্যে লণ্ডনে প্রবেশ করেন এবং জনসাধারণকে রাণীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করেন, তখন বেকন রাগান্বিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যান। এসেক্স ধৃত হইয়া আবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তাহার বিচারের সময় বেকন সরকারী কাউনসেল নিযুক্ত হন, এবং বন্ধুর অপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। দোষী প্রমাণিত হইয়া এসেক্স প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। বন্ধুর প্রাণদণ্ডে সহায়তা করার জন্য বেকন সাধারণের বিরাগভাজন হন,, এবং একদল লোক তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। বেকন অমিতব্যয়ী ছিলেন ; যাহা আয় করিতেন, তাহাতে তাঁহার ব্যয়-নির্ব্বাহ হইত না। বিবাহের পরে তাঁহার অর্থের প্রয়োজন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ১৫৯৮ সালে দেনার জন্য তাঁহাকে বন্দী হইতে হয়। ইহা সত্ত্বেও ক্রমেই তাঁহার পদোন্নতি হইতে থাকে। ১৬০৬ সালে তিনি Attorney General নিযুক্ত হন, এবং ১৬১৮ সালে ৫৭ বৎসর বয়সে লর্ড চ্যানসেলর পদে নিযুক্ত হন। ৩ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পরে, বেকনের বিরুদ্ধে উৎকোচগ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত হয়।* তখন অনেক বিচারকই উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। বেকন যদি এসেক্সের বিরুদ্ধে গিয়া একদল লোকের বিদ্বেষভাজন না হইতেন, তাহা হইলে হয়তো এ অভিযোগ উপস্থিত হইত না। রাজা তাঁহাকে Baron Verulum of Verulum উপাধি দিয়াছিলেন ; এবং তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। বন্ধুগণ আসন্ন বিপদের কথা জানাইয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজানুগ্রহপুষ্ট বেকন কোন বিপদের আশঙ্কা করেন নাই। যখন প্রকাশ্যে অভিযোগ উপস্থিত হইল, তখন তিনি রাজার নিকট অপরাধ স্বীকার করিলেন। বিচারে তিনি দোষী প্রমাণিত হইলেন, এবং তাঁহার প্রতি কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড উভয়ই প্রদত্ত হইল। কারাগার হইতে বেকন দয়াভিক্ষা করিয়া রাজার নিকট আবেদন করেন, এবং দুই দিন কারাদণ্ড-ভোগের পরে তিনি কারামুক্ত হন। অর্থদণ্ড হইতেও তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইহার

পরে পাঁচ বৎসর বেকন বাঁচিয়া ছিলেন। অর্থ-কষ্টের মধ্যেও তিনি জ্ঞানালোচনায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ১৬২৬ সালে তাহার মৃত্যু হয়। তাঁহার উইলে তিনি লিখিয়া-গিয়াছিলেন, "আমার আত্মা আমি ঈশ্বরকে সমর্পণ করিলাম। আমার নাম ভবিষ্যৎ কাল ও বিদেশী জাতিদিগকে দান করিলাম।" ভবিষ্যৎ কাল এবং জগতের জাতিগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

বেকনের চরিত্র-সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ বর্ত্তমান। আলোক ও ছায়ার সমবায়ে গঠিত তাঁহার চরিত্র ছিল জটিল। Novum Organum-এর রচয়িতা দার্শনিক বেকন এবং প্রতিষ্ঠা-কামী রাজ-সভাসদ বেকনকে একব্যক্তি বলিয়া মনে করা কঠিন। সত্যের প্রতি অনুরাগ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং মনের অসাধারণ ধারণা-শক্তির জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠার প্রতি লোভ ও চাটুকারিতার বিষয় বিবেচনা করিলে, কবি পোপ "মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, উজ্জ্বলতম এবং নীচতম" বলিয়া তাঁহার যে বর্ণনা করিয়া-ছিলেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাঁহার দর্শনের মূল্য যাহাই হউক, ইংরেজি সাহিত্যে তাঁহার স্থান কাহারও নিম্নে নহে।

কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়াছেন যে দর্শনের ইতিহাসে বেকন তাঁহার প্রাপ্য স্থান প্রাপ্ত হন নাই। জার্ম্মাণ দার্শনিকগণ বেকনের রচনায় দার্শনিক মূল্য কিছু আছে বলিয়া মনে করেন নাই। ইংরেজি ও জার্ম্মাণ দর্শনের সংযোগ-সূত্র বেকনের মধ্যে পাওয়া যায় না, উহা পাওয়া যায় তাঁহার পরবর্তী দার্শনিকদিগের মধ্যে। Erdmann, Ueberweg এবং অন্যান্য জার্ম্মাণ দার্শনিকদিগের মতে ক্যাণ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন Hume কর্ত্তৃক, লাইবনিট্‌জ্ প্রভাবিত হইয়াছিলেন লক্-কর্ত্তৃক। স্পিনোজা অবজ্ঞার সঙ্গে বেকনের উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরেজ দার্শনিকদিগের মধ্যে কেবল Hobbs-এর নিকট হইতেই তিনি কিছু গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু Hobbs, Lock, এবং Hume, ইহারা সকলেই যে বেকনেরই উত্তরাধিকারী, তাহা ভুলিলে চলিবে না। পূর্ব্বে বেকন আবির্ভূত না হইলে, তাহাদের আবির্ভাব সম্ভবপর হইত না। বস্তুবাদের দর্শন যে বেকন হইতেই উদ্‌ভূত হইয়াছে, তাহা বলা যায়।

এই প্রতিষ্ঠাকামী, বিলাসপ্রিয়, অর্থগৃধ্নু ব্যক্তির মনে অদম্য জ্ঞানস্পৃহা বর্ত্তমান ছিল। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সর্ব্বদাই তিনি জ্ঞানের পরিধি-বিস্তারের চিন্তা করিতেন। বিজ্ঞানের তৎকালীন অবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রকৃতির রহস্য অবগত হইয়া, তাহার সর্ব্ববিভাগে মানবের প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা করিবার চিন্তায় তাঁহার মন ব্যাপৃত থাকিত। এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের পুনর্গঠনের তিনি যে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা এই:

প্রথমতঃ, প্রাচীন পদ্ধতি অপরিবর্ত্তিত থাকিবার ফলে দর্শনে যে নিস্ফলতার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়া, নূতন পদ্ধতিগ্রহণের আবশ্যকতা প্রমাণের জন্য কয়েকখানি গ্রন্থরচনা।

দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ। প্রত্যেক বিভাগে যে সমস্ত সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই, তাহার বর্ণনা।

তৃতীয়তঃ, প্রাকৃতিক গবেষণার জন্য তাঁহার উদ্‌ভাবিত নূতন পদ্ধতির ব্যাখ্যা।

চতুর্থতঃ, স্বয়ং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণার আরম্ভ।

পঞ্চমতঃ, মধ্যযুগের বাক্-ভূয়িষ্ঠতার মধ্যে যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে সোপানমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রাচীনগণ তাহাদের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা।

ষষ্ঠতঃ, তাঁহার প্রণালী-অবলম্বনের ফলে যে সকল বৈজ্ঞানিক ফল উদ্ভূত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন, তাহাদের দর্শনা।

সপ্তমতঃ, নানা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যে আদর্শ-অবস্থার[1] সৃষ্টি হইবে, তাহার চিত্র-অঙ্কন। এই সকলের সমবায়ে বেকন "দর্শনের মহৎ পুনর্গঠন"[2] রচনা করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন।

একমাত্র আরিষ্টটল ভিন্ন এরূপ বিরাট কল্পনা পৃথিবীতে আর কাহারও মনে উদিত হয় নাই। ইহার উদ্দেশ্য ছিল মানবমঙ্গল, কেবল সুষমামণ্ডিত দর্শনের উদ্ভাবন নহে। জ্ঞানই শক্তি। বেকন বলিয়াছিলেন, "এই জ্ঞান কেবল মত নহে, কার্য্যে পরিণত করিবার বিষয়। আমি কোনও মত অথবা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত নহি; উপযোগ ও শক্তির ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাই আমার লক্ষ্য।" আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষাই এই।

বেকনের প্রধান গ্রন্থগুলির নাম (I) The Advancement of Learning (2) Novum Organum (3) Essays (4) New Atlantis.

Advancement of Learning (বিদ্যার উন্নতিসাধন) গ্রন্থে বেকন বিদ্যার তৎকালিক অবস্থার বর্ণনা করিয়া তাহার কোথায় কোথায় ত্রুটী আছে, প্রদর্শন করিয়াছেন। বিদ্যার যে যে ক্ষেত্র অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। শরীর-বিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রকে বেকন বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তৎ-কালীন চিকিৎসা-পদ্ধতির নিন্দা করিয়াছেন। চিকিৎসকগণ চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন না করিয়া মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেন। বেকন শবব্যবচ্ছেদ ও প্রয়োজনমত জীবন্ত-প্রাণীর অঙ্গব্যবচ্ছেদেরও পরামর্শ দিয়াছেন। অসাধ্য পীড়ায় যেখানে রোগীর অধিকদিন বাঁচিবার আশা নাই, সেখানে তিনি যন্ত্রণা-শান্তির জন্য চিকিৎসকগণকে রোগীর মৃত্যু নিকটতর করিবার অধিকার[3] দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু মানুষের পরমায়ু-বৃদ্ধি করিবার উপায়-নির্দ্ধারণেও তিনি চিকিৎসকদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় তিনি 'আচরণবাদী'[4]দিগের মত মানবীয় প্রত্যেক কার্য্যের কারণ-অনুসন্ধানের পরামর্শ দিয়াছেন। বিজ্ঞান হইতে "যদৃচ্ছা" শব্দটিকে তিনি নির্ব্বাসিত করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যদৃচ্ছা" এমন এক পদার্থের নাম, যাহার অস্তিত্ব নাই।" "ইচ্ছা" নামে কিছুর অস্তিত্বও তিনি স্বীকার করেন নাই।" ইচ্ছা-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করিলেও, এক কথায় বেকন "স্বাধীন ইচ্ছা" অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র 'ইচ্ছা'র অস্তিত্ব নাই।

[1] Utopia [2] Magna Instauratio [3] Euthanasy [4] Behaviourist

"সামাজিক মনোবিজ্ঞান" নামে এক নূতন মনোবিজ্ঞান বেকন সৃষ্টি করিয়াছেন। "প্রথা, অভ্যাস, শিক্ষা, দৃষ্টান্ত, অনুকরণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বন্ধুত্ব, সঙ্গ, প্রশংসা, তিরস্কার, কার্য্যে প্রবর্ত্তনা,[১] আইন, গ্রন্থ, অধ্যয়ন প্রভৃতি-সম্বন্ধে দার্শনিকগণের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। মানুষের নৈতিক চরিত্র এই সকল দ্বারাই প্রভাবিত হয়। ইহাদের দ্বারা মন পবিত্র এবং নিয়ন্ত্রিত হয়।" বেকনের এই উক্তি হইতে উপরোক্ত বিজ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে।

বেকনের মতে কিছুই বিজ্ঞানের আলোচনার বহিভূর্ত নহে। ইন্দ্রজাল, স্বপ্ন, ভবিষ্যদ্বাণী, টেলিপ্যাথি, এবং যাবতীয় "Psychical ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার তিনি পক্ষপাতী। তিনি বলিতেন, ইহাদের গবেষণা হইতে কোন্ অজ্ঞাত সত্যের আবিষ্কার হইতে পারে, তাহা কেহই জানে না। Alchemy হইতে রসায়ণশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

"জীবনে সফলতা" নামে আর একটি নূতন বিজ্ঞানের কথা বেকন বলিয়াছেন। ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন জ্ঞানের—নিজের এবং অপরের। যাহাদিগের সহিত আমাদের কার্য্যের সম্বন্ধ, তাহাদের মেজাজ, কামনা, মত, অভ্যাস প্রভৃতি-সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান-দ্বারা জ্ঞানলাভ প্রয়োজন। তাহারা কাহার সাহায্যের উপর নির্ভর করেন এবং কাহার ভরসা রাখেন, তাহাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহাদের বন্ধু-বান্ধব, মুরুব্বি, শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী কাহারা, প্রভৃতি-সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ-সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বহুলোকের সহিত বন্ধুতা, কোনও বিষয়ের আলোচনার সময় অত্যধিক স্বাধীনতা-প্রদর্শন অথবা মৌন অবলম্বন না করিয়া মধ্যপন্থা অবলম্বন, এবং অতিরিক্ত পরিমাণ অমায়িকতা অথবা সারল্য-প্রদশন না করিয়া প্রয়োজন মত কিঞ্চিৎ রুক্ষতা প্রদর্শন সফলতার প্রকৃষ্ট উপায়।

বেকন বন্ধুদিগকে শক্তিলাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার বন্ধুগণও হয়তো তাঁহার প্রতি মহত্তর ভাবের পরিপোষণ করিতেন না। তাঁহার পতনের ইহা একটি কারণ। এই প্রসঙ্গে বেকন গ্রীসের "সপ্ত বিজ্ঞলোকদিগের" অন্যতম বিয়াসের নিম্নলিখিত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন: "তোমার বন্ধুগণ এক সময়ে শত্রুতে পরিণত হইতে পারে, তাহাদিগকে ভালবাসিবার সময় ইহা মনে রাখিবে, এবং তোমার শত্রু একসময়ে তোমার মিত্র হইতে পারে, ইহা মনে রাখিয়া তাহার সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিবে। তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং মনোভাবের কথা বন্ধুর নিকট অতিরিক্ত ভাবে প্রকাশ করিও না। কথোপকথনকালে স্বীয় মত-প্রকাশ যতটা করিবে, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও। আচরণে গর্ব্বের প্রকাশ উন্নতির সহায়ক। দম্ভ চরিত্রনৈতিক ত্রুটী হইলেও রাজনীতিতে ত্রুটী বলিয়া পরিগণিত হয় না।"

এইরূপে সমস্ত বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া বেকন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে কেবল বিজ্ঞানের উন্নতিই যথেষ্ট নহে। যাবতীয় বিজ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র বিজ্ঞানকে একাভিমুখী করা প্রয়োজন। এতদিন পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের যে যথেষ্ট উন্নতি

[১] Exhortation

হয় নাই, তাহার কারণ তাহাদের সম্মুখে কোনও সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। বিজ্ঞানের জন্য যাহার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা হইতেছে 'দর্শন'—অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বিশ্লেষণ এবং যাবতীয় বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও মীমাংসার মধ্যে সহযোগিতার সম্বন্ধ-স্থাপন। ইহা না হইলে কোনও বিজ্ঞানই গভীরতা লাভ করিতে পারে না। কোনও সমতল ক্ষেত্রের উপর দণ্ডায়মান হইয়া যেমন চতুষ্পার্শস্থ সমগ্র ভূভাগের পরিপূর্ণ দৃষ্টি-লাভ করা যায় না, তেমনি কোনও বিজ্ঞানের উপরিস্থ বিজ্ঞানে আরোহণ না করিয়া সেই বিজ্ঞানের উপর দণ্ডায়মান হইলে, তাহার দূরবর্ত্তী এবং গভীর অংশ দৃষ্টিগোচর হয় না।

বিজ্ঞান অপেক্ষা দর্শনের প্রতিই বেকনের অধিকতর অনুরাগ ছিল। দর্শন ব্যতীত ঝঞ্ঝা ও শোকবিক্ষুব্ধ জীবনে শান্তি-লাভ অসম্ভব। "বুদ্ধি হইতে মহতী শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়; বিদ্যাদ্বারা মৃত্যু এবং দুর্ভাগ্যের ভয় বিজিত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। দর্শন আমাদিগকে মনের সম্পদ অন্বেষণ করিতে শিক্ষা দেয়। এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু আছে, তাহা না আসিলেও, তাহার অভাব অনুভূত হয় না।"

মানুষ যে প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য-বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে বেকনের সন্দেহ ছিল না। "এপর্য্যন্ত মানুষে যাহা করিয়াছে, তাহা হইতে ভবিষ্যতে তাহারা কি করিতে সমর্থ, তাহা অনুমান করা যায়।" বেকনের বিশ্বাস ছিল, তাঁহার প্রস্তাবিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া, বর্ত্তমানে যাহা কল্পনারও অতীত, মানুষ তাহা সাধন করিতে সক্ষম হইবে।

তৎকালীন বিদ্যার অবস্থা বর্ণনা করিয়া বেকন তাহার নিশ্চল অবস্থার কারণ-স্বরূপ তিনটি "পীড়া"র উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম পীড়া—"রচনার বিলাসিতা"—বর্ণিতব্য বিষয় অপেক্ষা বর্ণনার ভঙ্গীকে অধিকতর মূল্যবান মনে করা। এই ভঙ্গীতে শব্দের লালিত্য ও বাক্যালঙ্কার বিষয়ের গুরুত্বের স্থান অধিকার করে। দ্বিতীয় পীড়া—তথ্যবর্জ্জিত কাল্পনিক বিষয়ের গবেষণা। মধ্যযুগের Schoolmanদিগের মধ্যে এই পীড়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। তাঁহারা সামান্য একটু তথ্যের সাহায্যে বিরাট বিরাট পাণ্ডিত্যের জাল বয়ন করিয়াছিলেন। তৃতীয় পীড়া—সত্যকে উপেক্ষা করা। এই পীড়া দ্বিবিধ। অন্যকে প্রতারণা ইহার একরূপ। নিজে প্রতারিত হইবার দিকে প্রবণতা ইহার অন্য রূপ। প্রতারণা ও অতিরিক্ত বিশ্বাস-প্রবণতা, দুই রূপে এই পীড়া প্রকাশিত হয়। কুসংস্কার ও ধর্ম্মান্ধতা ইহার ফল।

উপরোক্ত ত্রুটিগুলির বিপদ অনেক। বড় বড় নামের প্রতি অত্যধিক ভক্তি, মানবীয় বুদ্ধির উপর অপরিমিত বিশ্বাস, অতীতে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রতি উপেক্ষা এবং অপর্য্যাপ্ত প্রমাণের দ্বারা আলোচ্য সমস্যার ত্বরিত সমাধান, এই সমস্ত ত্রুটির ফল। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিপদ জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। মানবের প্রয়োজন-সিদ্ধি—মানবজীবনের সুখ ও সুবিধা-বৃদ্ধিই—যে এই উদ্দেশ্য, তাহা বিস্মৃত হইলে সমস্ত আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

এই সমস্ত ত্রুটি-বশতঃ বিদ্যার প্রগতি এতদিন ব্যাহত হইয়া আসিয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য জ্ঞানালোচনার এক নূতন পদ্ধতির প্রয়োজন। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় বিজ্ঞান পশ্চাতে পড়িয়া আছে। জড়জগৎ ও জ্ঞানের জগতের মধ্যে সাম্য-প্রতিষ্ঠা, এবং জ্ঞানজগতের বিস্তৃতিসাধন করিয়া সমগ্র জড়জগতের জ্ঞান তাহার অন্তর্ভুক্ত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া বেকন অগ্রসর হইয়াছিলেন।

বেকনের সময় লোকের মনে নূতন আবিষ্কারের জন্য একটা আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল; নূতন নূতন দেশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নাবিকের কম্পাস, বারুদ, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির আবিষ্কারে, মানুষের অনেক প্রাচীন ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কিন্তু নূতন আবিষ্কারের জন্য কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই। যে সকল আবিষ্কার ইতিপূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহা বহু পরিমাণে দৈব ও যদৃচ্ছার ফলে সংঘটিত হইয়াছিল, শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীর অনুসরণে হয় নাই। বেকন নূতন আবিষ্কারের জন্য যে প্রণালীর ব্যবস্থা করিলেন—তাহাই Novum Organum ("নব সাধন")। আরিষ্টটলের Organon গ্রন্থে জ্ঞানলাভের যে উপায় বর্ণিত হইয়াছিল, বেকনের Novum Organum তাহার বিপরীত। মানুষের মনে নূতন আবিষ্কারের জন্য যে আগ্রহ আছে তাহাতে বলসঞ্চার করিয়া ফলপ্রসূ পথে পরিচালিত করাই নব পদ্ধতির উদ্দেশ্য। বেকন লিখিয়াছেন "মানবের শক্তি ও মর্য্যাদার দৃঢ়তর ভিত্তি-নির্ম্মাণ এবং তাহাদের সীমা-বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করাই আমার অভিপ্রায়।"

মানবের প্রয়োজনসিদ্ধিই আবিষ্কারের উদ্দেশ্য। যে বিজ্ঞানদ্বারা মানুষের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তাহার কোনও মূল্য নাই। প্রকৃতির উপর মানুষের ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠাই বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। জীবনে যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা পূর্ণ করা, মানুষের সুখের পরিমাণবৃদ্ধি করা এবং তাহার শক্তিবৃদ্ধি করা—ইহাই যাবতীয় জ্ঞানের উদ্দেশ্য। "মানবীয় বিজ্ঞান এবং মানবের শক্তি একই।" "জ্ঞানই শক্তি।" জগৎকে বুঝিতে হইলে এবং তাহাদ্বারা আমাদের কাজ করাইয়া লইতে হইলে, প্রথম প্রয়োজন জগৎকে ভাল করিয়া জানা। মনোযোগের সহিত জগতের পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন তাহা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং জগতের উপর প্রভুত্বলাভের জন্য প্রকৃতির সত্যজ্ঞান লাভ অপরিহার্য্য। কিন্তু এই জ্ঞান-লাভের জন্য দুইটি পদার্থের প্রয়োজন। তাহাদের একটি নিষেধমূলক, অন্যটী বিধিমূলক। মনের যাবতীয় পূর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জনই নিষেধ; সযত্ন পর্য্যবেক্ষণদ্বারা 'বিশেষ' হইতে সামান্যের জ্ঞানলাভ—বিধি।

পূর্ব্বসংস্কার বেকনের মতে চতুর্ব্বিধ। এই সকল সংস্কারকে বেকন "Idols" (পূজার প্রতিমা) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই চতুর্ব্বিধ Idols-এর নাম (1) Idols of the Tribe—জাতি-সাধারণ Idols, (2) Idols of the Cave (গহ্বরের Idols), (3) Idols of the Market (হাটের Idols) (4) Idols of the Theatre (রঙ্গক্ষেত্রের Idols)।

যে সমস্ত ভ্রান্ত সংস্কার মানব জাতি-সাধারণ—প্রত্যেক মানুষেরই যে সকল সংস্কার আছে, তাহারা Idols of the Trebe। যে সকল সংস্কার ব্যক্তিগত, তাঁহারা Idols of the

Cave। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার ফলে মানুষে মানুষে ভাবের আদান প্রদান হইতে, ভাষার অশুদ্ধ ব্যবহার হইতে, Idols of the market place উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ এবং প্রমাণের ভ্রান্ত নিয়ম হইতে Idols of the Theatre-এর উদ্ভব।

Idol শব্দের অর্থ প্রতিমা। ঈশ্বর-বোধে যে প্রতিমা পূজিত হয়, তাহাকে Idol বলে। Idol যেমন ঈশ্বরের সত্যরূপ নয়, তেমনি বেকন যাহাদিগকে Idol বলিয়াছেন, তাহারাও সত্য নহে। ভ্রান্তি-মূলক বিশ্বাস অর্থেই বেকন এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। মানুষের মনে যত প্রকারে ভ্রান্তির উদ্ভব হয়, চতুর্বিধ Idol-দ্বারা বেকন তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। Idols of the Tribe সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "মানুষের ইন্দ্রিয়ই সমস্ত বস্তুর মানদণ্ড বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (Protagorus বলিয়াছিলেন, মানুষই সকল বস্তুর মানদণ্ড)। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও মনের প্রত্যক্ষ সমস্ত জ্ঞানই মানুষের নিজের নিজের জ্ঞান, বিশ্বের মধ্যে সে জ্ঞান নাই। অনেক দর্পণে বস্তু বিকৃত ভাবে প্রতিফলিত হয়। দর্পণের নিজের ধর্ম্ম প্রতিবিম্বে সংক্রামিত হয়—প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্বিত দ্রব্যের অনুরূপ হয় না। মানুষের মনঃও দর্পণ-সদৃশ। মনের নিজের ধর্ম্ম অনেক সময় তাহাতে প্রতিফলিত বিষয়ে সংক্রামিত হয়। আমাদের চিন্তায় তাহার বিষয় অপেক্ষা আমরা নিজেরাই বেশী প্রতিফলিত হই। মানুষের বুদ্ধির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা আছে। এইজন্য যতটা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা বাহ্য জগতে প্রকৃত পক্ষে আছে, তাহা অপেক্ষা তাহা বেশী পরিমাণে আছে বলিয়া আমরা মনে করি। সমস্ত জ্যোতিষ্কই যে সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে ভ্রমণ করে, এই ভ্রান্ত কল্পনা ইহা হইতেই উদ্ভূত। একবার কোনও বিষয়ে মানুষের বিশ্বাস হইলে, সর্ব্বত্রই তাহার সমর্থক প্রমাণ দেখিতে পায়। সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রমাণ যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা গ্রাহ্য করেনা। এই জন্যই ফলিত জ্যোতিষ, স্বপ্ন, নিমিত্ত, পাপের শাস্তি প্রভৃতির বিরুদ্ধ প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস নষ্ট হয় না। বিশ্বাসের পক্ষে প্রমাণ যাহা মিলে, তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হয়। এই সম্বন্ধে বেকন যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এই: প্রকৃতির প্রত্যেক ছাত্র এই উপদেশটি একটি সাধারণ নিয়ম বলিয়া গণ্য করিবেন—যখনি কোনও বিষয়ে মন অতিরিক্ত পরিমাণে আকৃষ্ট হইবে এবং তাহার চিন্তায় বিশেষ তৃপ্তি অনুভূত হইবে, তখনি বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে, বিশেষ সন্দেহের সঙ্গে সেই বিষয়ের পরীক্ষা করিতে হইবে। বুদ্ধি যাহাতে নির্ম্মল থাকে, এবং পক্ষপাত-দুষ্ট না হয়, সেজন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। বুদ্ধি যাহাতে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া দূরবর্ত্তী কোনও সাধারণ নিয়মে উড়িয়া গিয়া না বসিতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। বুদ্ধিকে পাখা সরবরাহ না করিয়া বরং তাহাতে ভার ঝুলাইয়া দিতে হইবে, যাহাতে লম্ফ দিতে অথবা উড়িতে না পারে। কল্পনা যদি পরীক্ষা-কার্য্যে বুদ্ধির সহায়কমাত্ররূপে না থাকে, তাহা হইলে ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

Idols of the Cave সম্বন্ধে, বেকন বলিয়াছেন "প্রত্যেক মানুষ এমন এক গহ্বরে বাস করে, যাহার মধ্যে প্রকৃতির আলোক বক্র ভাবে প্রবেশ করে, এবং প্রবেশকালে তাহার বর্ণ বিকৃত হইয়া যায়। তাহার শিক্ষা, তাহার ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব, তাহার মানসিক

ও শারীরিক অবস্থা প্রভৃতিদ্বারা এই গহ্বর গঠিত। কাহারও কাহারও মনঃ স্বভাবতই বিশ্লেষ-প্রবণ; তাহারা কেবল বিভেদই দেখিতে পায়। কাহারও মনঃ স্বভাবতঃ সংশ্লেষ-প্রবণ, সাদৃশ্যই সাধারণতঃ তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈজ্ঞানিক ও চিত্রকরদিগের মনঃ প্রথমশ্রেণীর; কবি ও দার্শনিকের মনঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর। কেহ কেহ স্বভাবতঃই প্রাচীনের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা পোষণ করেন; কেহ কেহ নূতনের পক্ষপাতী। কমসংখ্যক লোকই মধ্যপন্থী; তাহারা প্রাচীন লোকদিগের যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস অথবা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন না, নূতনকেও ঘৃণা করেন না।' সত্য কোনও দলভুক্ত নহে।

Idol of the Market Place সম্বন্ধে বেকন লিখিয়াছেন, 'ভাষার মাধ্যমেই মানুষে মানুষে ভাবের আদান প্রদান হয়। কিন্তু সাধারণ লোকের বুদ্ধির উপযোগী করিয়াই শব্দের সৃষ্টি হয়। অনুপযোগী শব্দদ্বারা বোধের বাধা উৎপন্ন হয়। "অনন্ত" শব্দ দার্শনিকগণ প্রায়ই ব্যবহার করেন। কিন্তু এই "অনন্ত" কি, তাহা কি কেহ জানে? ইহার অস্তিত্ব আছে কিনা, তাহাই কি কেহ অবগত আছে? দার্শনিকেরা কারণান্তরবিহীন প্রথম কারণের কথা বলেন; কিন্তু ইহা কি অজ্ঞান আবৃত করিবার জন্য ব্যবহৃত শব্দমাত্র নয়? যাহার বুদ্ধি নির্ম্মল, এরূপ সকলেই জানে, যে কারণবিহীন কোনও কারণই হইতে পারে না। দর্শনের পুনর্গঠনের প্রধান কার্য্য হইবে—মিথ্যা বলা বর্জ্জন।

Idols of the Theatre সম্বন্ধে বেকনের উক্তি এইরূপ: "প্রচলিত যাবতীয় দর্শনই নাটকমাত্র। তাহাতে দার্শনিকদিগের মনঃ-কল্পিত জগৎ নাটকের আকারে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাসে বর্ণিত সত্য ঘটনাবলী অপেক্ষা নাটকে বর্ণিত ঘটনাবলী যেমন অধিকতর চিত্তাকর্ষক, সংক্ষিপ্ত এবং আমাদের ইচ্ছার অনুরূপ, দার্শনিক রঙ্গমঞ্চের নাটকও তদ্রূপ। প্লেটো যে জগতের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্লেটোরই সৃষ্টি। তাহাতে জগৎ চিত্রিত না হইয়া প্লেটোই চিত্রিত হইয়াছেন।"

বেকন আরও লিখিয়াছেন, এই সকল Idolsএ যদি পদে পদে আমাদের পদস্খলন হয়, তাহা হইলে সত্যের পথে কখনও আমরা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিব না।

নূতন প্রকারের তর্ক-পদ্ধতি—বুদ্ধির জন্য নূতন যন্ত্র—আমাদের আবশ্যক। নাবিকের কম্পাস আবিষ্কৃত না হইলে পশ্চিম গোলার্দ্ধের বিস্তৃত ভূভাগ যেমন কখনই আবিষ্কৃত হইতে পারিত না, তেমনি আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত না হওয়ার জন্যই শিল্পের যতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। জড় পৃথিবীর সমস্ত অংশই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইবার পরেও বুদ্ধির জগতে প্রাচীন আবিষ্কারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকা বিষম কলঙ্কের কথা।

সত্য-আবিষ্কারের প্রধান বাধা উপস্থিত হয় প্রমাণবিহীন মত[1] ও তাহা হইতে অনুমান হইতে। আমরা যে নূতন সত্যের সন্ধান পাই না, তাহার কারণ আমরা অনুসন্ধান আরম্ভ করি বহুকাল প্রচলিত কিন্তু নিশ্চিতিবিহীন প্রতিজ্ঞা হইতে, এবং এই প্রতিজ্ঞা সত্য কিনা,

---

[1] Dogma

তাহা পর্য্যবেক্ষণ অথবা পরীক্ষাদ্বারা যাচাই করি না বলিয়া। কেহ যদি নিশ্চিতি হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহার অনুসন্ধান সন্দেহে পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য, কিন্তু যদি সন্দিগ্ধ মনে আরম্ভ করে, তাহা হইলে নিশ্চিতিতে তাহার পরিসমাপ্তি হয়।" শেষোক্ত মন্তব্য ঠিক সত্য না হইলেও, এইরূপেই দর্শনের নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। ফ্রান্সে দে-কার্ত্তও সন্দেহকেই দর্শনালোচনায় প্রথম স্থান দিয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রকার পূর্ব্বসংস্কার বর্জন করিয়া আবিষ্কারের বিধিমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। সে পদ্ধতি আরোহমূলক। এই পদ্ধতির সাহায্যে আমরা বিশেষ হইতে সামান্যে পৌছিতে সমর্থ হই। তাহার জন্য প্রথমে সতর্কতার সহিত তথ্যসংগ্রহ, তাহাদের বিন্যাস এবং তুলনা আবশ্যক। কোন বস্তুর জ্ঞান বলিতে তাহার কারণের জ্ঞান বুঝায়। তাহার কারণ কি, কিরূপে তাহার উৎপত্তি হয়, ইহা না জানিলে কোনও বস্তুর জ্ঞান-লাভ হইয়াছে বলা যায় না। আরিষ্টটল চারিপ্রকার কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। বেকন তাহার মধ্যে মাত্র স্বরূপ-কারণকেই[1] প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। বস্তুর স্বরূপ অথবা প্রকৃতি বুঝাইতে আরিষ্টটল form শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। জগতে যাহা কিছু ঘটে, বস্তুর স্বরূপেই তাহার কারণ নিহিত আছে। কোনও বিশেষ ব্যাপার যে কারণবশতঃ সংঘটিত হয়, তাহা জানিবার উপায় কি? অর্থাৎ সেই ঘটনার সংঘটনের জন্য কি কি অপরিহার্য্য? কি না থাকিলে সেই ঘটনা ঘটিতে পারে না? ইহার উত্তরে বেকন বলেন, যাহা যাহা অপরিহার্য্য নহে, তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিলে কারণ বাহির হইয়া পড়িবে। তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিবার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই সেই ব্যাপারের "form" অথবা স্বরূপ। সমস্ত প্রাকৃতিক জগৎ কতকগুলি মৌলিক দ্রব্য অথবা গুণের বিভিন্ন সমবায়ে গঠিত। সুতরাং কোন দ্রব্য-সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তাহার মৌলিক গুণসকলের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এই মৌলিক গুণাবলীর পরিচয়-লাভের জন্য প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে অন্য গুণের বহিষ্করণ[2]। তাপের কথা ধরা যাউক। যেখানেই তাপ আছে, সেখানেই তাহার form বর্ত্তমান; যেখানে তাপ নাই, সেখানে তাহার formও নাই। 'ভার' তাপের form হইতে পারে না, কেমনা যেখানে তাপ আছে, সেখানেও যেমন ভারের অস্তিত্ব আছে, তেমনি যেখানে তাপ নাই, সেখানেও আছে। সুতরাং ভার বাদ গেল। এইরূপে এক এক করিয়া বস্তুর অনেক গুণ বাদ দিয়া আমরা 'গতি' প্রাপ্ত হই। তখন দেখিতে পাই, যে যেখানেই গতি আছে, সেখানেই তাপ আছে, যেখানে গতি নাই, সেখানে তাপ নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারি, যে গতিই তাপের কারণ। যে প্রণালীদ্বারা দ্রব্যের মৌলিক রূপ আবিষ্কৃত হয়, তাহাই আরোহপ্রণালী[3]।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে বেকন অন্যান্য বিজ্ঞানের জনক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার প্রণালী[4] কেবল যে জ্যোতিষ, যন্ত্রবিদ্যা, আলোকবিজ্ঞান প্রভৃতি ভৌতিক বিজ্ঞানেই প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নহে;

[1] Formal cause [2] Exclusion [3] Induction [4] Empirical method

চরিত্রনীতি, রাষ্ট্রনীতি, তর্কবিজ্ঞান প্রভৃতি মানবীয় বিজ্ঞানেও[1] তাহাদের প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন সমগ্র মানব জীবনকে, মানবের বিবিধ চিন্তা, সেই সকল চিন্তার গতি, মানবের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, সকলকেই ভৌতিক বিজ্ঞানের প্রণালীর প্রয়োগদ্বারা তাহাদের "মৌলিক আকারে"[2] পরিণত করিতে; এবং তাহাদ্বারা মানবজীবনের ব্যাখ্যা করিতে। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে বেকন সক্ষম হন নাই। চরিত্রনীতি-সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি সামান্য ইঙ্গিত ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারেন নাই। রাজনীতি-সম্বন্ধে তিনি কার্য্যত: কিছুই বলেন নাই। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তিনি নীরব ছিলেন। রাজনীতি ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া তিনি সুবিবেচকের কাজই করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই বলিয়া তিনি ধর্ম্মের সমস্যা এড়াইয়া গিয়াছেন। আধ্যাত্মিক ব্যাপার প্রাকৃতিক ব্যাপারের মত ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হইত। মানুষের সামাজিক এবং ধর্ম্মীয় জীবনের প্রাকৃতিক ভিত্তির ইঙ্গিত বেকন দিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হইতে কিরূপে নৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়, প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে কিরূপে সামাজিক অবস্থার উৎপত্তি হয়, তাহার উত্তর তিনি দেন নাই। তাঁহার শিষ্য হব্‌স্ তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বেকন যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা করিতে সক্ষম হন নাই। এই জন্য তাঁহার জীবনের মত তাঁহার দর্শনও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাঁহার অবলম্বিত প্রণালী—শ্রেণীবিভাগ ও গুণ-নিষ্কর্ষণ[3]—নিতান্তই যান্ত্রিক ও প্রাণহীন। তাহাদ্বারা চিন্তার গভীর সমস্যাসকলের সমাধান হওয়া সম্ভবপর ছিল না। স্ব-গত বস্তুর[4] স্বরূপ ও উৎপত্তি-সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই। তাঁহার দর্শন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ। কলার অভিব্যক্তি, মানবমনের সৃজনশীল কল্পনা অথবা তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধেও কোনও ধারণা করা এই দর্শনের পক্ষে অসম্ভব।

New Atlantis

বেকন রাষ্ট্রনীতি-সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার আদর্শরাষ্ট্রের কল্পনা তাঁহার New Atlantis গ্রন্থে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই আদর্শ রাষ্ট্রকে তিনি স্থাপিত করিয়াছেন New Atlantis নামক এক কল্পিত দ্বীপে। প্লেটোর Timaeus গ্রন্থে Atlantis নামে এক লুপ্ত মহাদেশ-সম্বন্ধে প্রচলিত এক কিংবদন্তীর বর্ণনা আছে। এই মহাদেশ Hercules স্তম্ভ হইতে কিছু দূরে বর্ত্তমান আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত ছিল, এবং কালক্রমে সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায় বলিয়া প্রাচীনেরা বিশ্বাস করিতেন। বেকনের কল্পিত New Atlantis দ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগরে। এই কল্পিত দ্বীপের নামেই তিনি গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ গল্পের আকারে লিখিত। গল্পটি এই: কয়েকজন লোক পেরু হইতে সমুদ্র পথে চীন ও জাপান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বাতাস স্তব্ধ হইয়া পড়িল। ফলে কিছুদিন জাহাজ নিশ্চল

[1] Humanistic sciences [2] Simple form [3] Abstraction [4] Thing-in-itself

অবস্থায় সমুদ্রের বক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরে আসিল প্রবল ঝটিকা, এবং জাহাজ বায়ুবেগে ইতস্ততঃ তাড়িত হইয়া লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। খাদ্যসম্ভার ক্ষীণ হইয়া আসিল। কিছুদিন পোতারোহিগণ অর্দ্ধাহারে কাটাইলেন। কয়েকজন আরোহী পীড়িত হইয়া পড়িল। অবশেষে অনশন ও মৃত্যু যখন আসন্ন, তখন দূরে এক রমণীয় দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হইল। জাহাজ তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, সমুদ্রতটে সুন্দর পরিচ্ছদ-পরিহিত কয়েকজন সুসভ্য লোক দেখা গেল। পোতারোহিগণ তীরে অবতরণ করিলে, ইহারা তাহাদিগকে বলিলেন, যে কোনও বিদেশীকে ঐ দ্বীপে বাস করিতে দেওয়া হয় না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাঁহারা পীড়িত, সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাঁহারা তথায় অবস্থান করিতে পারেন।

কয়েক সপ্তাহ দ্বীপে অবস্থান করিয়া পোতারোহিগণ দ্বীপ-সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিলেন, তাহা এই : ১৯ শতাব্দী পূর্ব্বে সোলোমোনা নামে এক রাজা এই দ্বীপে রাজত্ব করিতেন। এখন পর্য্যন্ত সেই নরপতির স্মৃতি সকলে ভক্তির সহিত পূজা করে। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁহার প্রজাদের মঙ্গল। "Solomon's House" (সলোমানের গৃহ) নামে এক সংঘের প্রতিষ্ঠা এই নরপতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। এই সংঘ অপেক্ষা মহত্তর কোনও প্রতিষ্ঠান জগতে এপর্য্যন্ত স্থাপিত হয় নাই। এই প্রতিষ্ঠানদ্বারাই দ্বীপ শাসিত হয়। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের যে কাজ, এই দ্বীপে Solomon's House দ্বারা সেই কাজ হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে রাজনীতির কোনও স্থান নাই ; কোনও রাজনৈতিক অথবা "উদ্ধত নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি", তাহার মধ্যে নাই। প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন, নির্ব্বাচনী বক্তৃতা, সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, মিথ্যা প্রচার প্রভৃতির কিছুই এ দ্বীপে নাই। এই সকল উপায়ে শাসনকার্য্যে লোক-নিয়োগের কল্পনাও কাহারও মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের যশোলাভের পথ সকলের সম্মুখেই উন্মুক্ত : এবং যাহারা এই পথ উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, দেশের শাসক মণ্ডলীতে কেবল তাঁহাদের স্থান হয়। দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকদিগকে বাছিয়া লইয়া তাহাদের উপরই শাসন-কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। প্রজার মঙ্গলই শাসনের উদ্দেশ্য। যন্ত্রবিৎ, স্থপতি, জ্যোতির্ব্বিদ্, ভূতত্ত্ববিদ্, প্রাণিতত্ত্ববিদ্, রসায়নতত্ত্ববিদ্, অর্থনীতিবিদ্, সমাজতত্ত্ববিদ্, মনস্তত্ত্ববিদ্ এবং দর্শনশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণদ্বারা দেশ শাসিত হয়। প্রকৃত পক্ষে "শাসন" বলিতে দেশে বিশেষ কিছুই নাই। মানুষ-শাসন অপেক্ষা প্রকৃতির শাসন-ব্যাপারেই দ্বীপের শাসকদিগের সময় অধিক ব্যয়িত হয়। "কারণ সকলের[1] এবং বস্তুর গুপ্তগতির[2] জ্ঞান লাভ এবং মানব-সাম্রাজ্যের প্রসার বর্দ্ধিত করিয়া যাবতীয় সাধ্য বিষয় সাধন করাই আমাদের সংঘের উদ্দেশ্য।" ইহাই গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য বিষয়। মানবের জ্ঞানবৃদ্ধিদ্বারা তাহার ক্ষমতা-বৃদ্ধি করাই সকল শাসন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই গ্রন্থে যে সকল কার্য্যে শাসনকর্ত্তাদিগকে ব্যাপৃত দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে আছে নক্ষত্রদিগের পর্য্যবেক্ষণ, জল-প্রপাতের জলের

[1] Knowledge of causes [2] Secret motion of things

শক্তি শিল্পে প্রয়োগের ব্যবস্থা, রোগের চিকিৎসার জন্য গ্যাসের উৎপাদন, মানবদেহের আভ্যন্তরীণ সংস্থানের জ্ঞান-লাভের জন্য জন্তুর উপর অস্ত্রোপচার, সঙ্কর প্রথায় নূতন জাতীয় জন্তু ও বৃক্ষের উৎপাদন প্রভৃতি। "পক্ষীর উড্ডয়নের আমরা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি, কিছু কিছু উড়িতেও আমরা শিখিয়াছি। জলের মধ্যে চরিবার উপযোগী জাহাজ ও নৌকাও আমাদের আছে।" "যাহা আমাদের প্রয়োজন, তাহা আমরা উৎপন্ন করি। যাহা উৎপন্ন করি, তাহার ব্যবহার করি। বিদেশী বাণিজ্যের জন্য আমরা যুদ্ধ করিতে যাই না। বিদেশী বাণিজ্য যে আমাদের নাই, তাহা নহে। তবে সে বাণিজ্য স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমুক্তা, রেশম, মশলা, অথবা অন্য কোনও বাণিজ্যদ্রব্যের নহে; সে বাণিজ্যের দ্রব্য "আলোক"—"জ্ঞানের আলোক"। এই আলোকের বণিক সকলেই Solomo's House-এর সভ্য। তাঁহারা বিদেশে প্রেরিত হন দ্বাদশ বৎসরের জন্য—বিদেশের বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের জ্ঞান-অর্জ্জনের জন্য। দ্বাদশ বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা Solomon's House-এর অধ্যক্ষদিগের নিকট প্রতিবেদন করেন। তাহাদের স্থলে আবার নূতন একদল বিদেশে প্রেরিত হয়। এইরূপে বিভিন্ন দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু New Atlantis-এ আনীত হয়।

প্লেটোর সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অনেক "ইউটোপিয়ার" সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের বিজ্ঞতম, মহত্তম, স্বার্থলেশহীন ব্যক্তিদিগের দ্বারা শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইবে, প্রজার মঙ্গল তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে, শাসনযন্ত্রকে প্রজাগণ ভার বলিয়া উপলব্ধি করিবে না, বরং জীবনের ভার-লাঘবের জন্য তাহার দিকে দৃঢ় বিশ্বাসে চাহিয়া থাকিবে—এই কল্পনা যুগে যুগে লোকের চিত্ত মোহিত করিয়াছে, কিন্তু তাহার বাস্তবরূপ এখনও বহু দূরে।

চরিত্র-নীতি

বেকনের চরিত্রনীতি স্পষ্টতঃই সুখবাদ-মূলক[1]। "যদি ভোগাসক্ত হইতে না চাও, তবে ভোগ করিও না। যদি ভয়ার্ত্ত হইতে না চাও, তাহা হইলে আসক্ত হইও না"—এই মত তাঁহার নিকট আত্মপ্রত্যয়হীন, দুর্ব্বল ও ভীরু মনের পরিচায়ক। ষ্টোয়িকদিগের কামনা-বর্জনের মত স্বাস্থ্যহানিকর আর কিছুই নাই। যে জীবন বৈরাগ্যদ্বারা অকালমৃত্যুতে পরিণত হইয়াছে, তাহার আয়ুর্বৃদ্ধিতে লাভ কি? ইহা ব্যতীত সম্পূর্ণ বাসনা-বর্জন অসম্ভবও বটে, কেননা সংস্কার দমিত হইবার পাত্র নহে, উহা সময়ে সময়ে বাহির হইবেই। মানুষের স্বভাব অনেক সময় অপ্রকাশিত থাকে; কখনও কখনও তাহাকে জয় করাও সম্ভবপর হয়; কিন্তু তাহাকে বিনষ্ট করা এক প্রকার অসম্ভব। বলপ্রয়োগ করিয়া তাহা দমন করিয়া রাখিলে প্রবলতর হইয়া তাহা পুনরাবিভূ্ত হয়। ধর্ম্মমত অথবা উপদেশদ্বারা স্বভাবের প্ররোচনার হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু কেবল অভ্যাসদ্বারাই ইহার পরিবর্ত্তন অথবা দমন সম্ভবপর হয়। কিন্তু স্বভাবের উপর জয়লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিও না। বহুদিন স্বভাব সমাধিস্থ থাকিয়া প্রলোভনের ফলে বাহির হইয়া আসিতে পারে। ইসফের গল্পের বিড়াল যুবতীতে

[1] Epicurean

রূপান্তরিত হইয়া গম্ভীরভাবে টেবিলে বসিয়া থাকিত, কিন্তু যখনি একটা ইঁদুরকে পার্শ্ব দিয়া দৌড়াইতে দেখিত, তখন আর স্থির থাকিতে পারিত না। সুতরাং হয় প্রলোভন হইতে একেবারে দূরে থাকিতে হইবে, নতুবা বারংবার প্রলোভনের সম্মুখীন হইয়া তাহাতে অভ্যস্ত হইতে হইবে, যাহাতে তাহাদ্বারা মনঃ বিচলিত না হয়।" বেকনের মতে দেহের পক্ষে সংযমে অভ্যস্ত হওয়ারও যেমন প্রয়োজন, অমিতাচারে অভ্যস্ত হওয়ার প্রয়োজনও তেমনি। তাহা না হইলে একমুহূর্ত্তের অসংযমে তাহার ধ্বংস হইতে পারে।

বেকনের প্রবন্ধবলী

বহু বিষয়ে বেকন প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। "সত্য" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "সত্যের অনুসন্ধান হইতেছে সত্যের নিকট প্রেম-নিবেদন, সত্যের-জ্ঞান, সত্যের গুণ-কীর্ত্তন ; আর সত্যে বিশ্বাস হইতেছে সত্যের সম্ভোগ ; ইহাই মানবের পরম মঙ্গল। "কর্ম্মে আমাদের আলাপ হয় মূর্খের সহিত। পুস্তকে আমাদের পরিচয় হয় পণ্ডিতদিগের সহিত।" "কতকগুলি পুস্তক কেবল আস্বাদের জন্য, কতকগুলি গ্রাস করিতে হয়, অল্প-সংখ্যক পুস্তক আছে, যাহাদিগকে চর্ব্বণ করিয়া পরিপাক করিতে হয়।" বেকনের প্রবন্ধাবলী এই শেষোক্ত শ্রেণীর।

Advancement of Learning-গ্রন্থে বেকন লিখিয়াছেন : "ম্যাকিয়াভেল এবং তাহার মতাবলম্বী অন্যান্য লেখকগণ মানুষের যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা না বলিয়া, তাহারা প্রকৃতপক্ষে কি করে, তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট আমরা ঋণী ; কেননা পাপের স্বরূপ জানা না থাকিলে, পারাবতের সরলতাব সহিত সর্পের ভূয়োজ্ঞানের সংযোগসাধন সম্ভবপর হয় না। এই জ্ঞান না থাকিলে ধর্ম্ম অরক্ষিত ও বিপদসঙ্কুল অবস্থায় পতিত হয়।" "Of Goodness" প্রবন্ধে বেকন সাধুতার সহিত কিয়ৎ পরিমাণ কপটতার সংমিশ্রণ সমর্থন করিয়াছেন, এবং বিশুদ্ধ কোমল ধাতুর সহিত খাদ মিশ্রিত হইলে তাহার স্থিতিকাল দীর্ঘতর হয় বলিয়াছেন। মনের বিস্তৃতি-গভীরতা-ও-তীক্ষ্নতা-সাধক প্রত্যেক বস্তুর সহিত পরিচয়-মূলক বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের তিনি প্রশংসা করিয়াছেন। কর্ম্মবিহীন জ্ঞান ও চিন্তাপরায়ণতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। "মানবজীবনরূপ নাট্যশালায় কেবলমাত্র দেবতা ও দেবদূতদিগেরই দর্শক হওয়া সাজে, ইহা সকলের জানা উচিত।" "Of Atheism" প্রবন্ধে নাস্তিকতা-অপবাদ-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বেকন লিখিয়াছেন, "বিশ্বের মধ্যে মনের অস্তিত্ব নাই, ইহা বিশ্বাস করা অপেক্ষা যাবতীয় পৌরাণিক উপাখ্যান, তালমদ এবং কোরাণের কাহিনীতেও বিশ্বাস করা ভাল। অল্প পরিমাণ দার্শনিক জ্ঞানে লোককে নাস্তিকতার দিকে আকৃষ্ট করে ; কিন্তু দার্শনিক জ্ঞানের গভীরতা লোকের মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিয়া আনে। কেননা মনঃ যখন বিক্ষিপ্ত মাধ্যমিক কারণের (second causes) দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন সময়ে সময়ে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আরও অনুসন্ধান হইতে বিরত হইতে পারে, কিন্তু যখন পরস্পর সংবদ্ধ কারণাবলীর শৃঙ্খলা তাহার দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তাহাকে ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেই হইবে।" বেকনের মতে বহুসংখ্যক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্বই ধর্ম্মসম্বন্ধে ঔদাসীন্যের কারণ।

"ধর্ম্মে যদি বহুভেদ থাকে, তাহা হইলে নাস্তিকতার উদ্ভব হয়। যদি একটি ভেদের অধিক না থাকে, তাহা হইলে উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরই ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু নানা ভেদ হইতে নাস্তিকতার আবির্ভাব হয়। বিপদ ও দুর্ভাগ্যের সময় লোকের মনঃ ধর্ম্মের নিকট নত হয়, কিন্তু শান্তি ও সমৃদ্ধিমণ্ডিত পাণ্ডিত্যের যুগে নাস্তিকতার আবির্ভাব হয়।"

মানবচরিত্রের বিশ্লেষণে বেকন অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। "বিবাহের প্রথম দিনই বিবাহিতের মনের বয়স সাত বৎসর বাড়িয়া যায়।" "খারাপ স্বামীর ভালো স্ত্রী প্রায়ই দেখা যায়।" "যাহার স্ত্রী-পুত্র আছে, সে ভাগ্যের নিকট জামিন দিয়াছে।" প্রেম-সম্বন্ধে বেকন লিখিয়াছেন, "প্রেমের আতিশয্য একটি অদ্ভুত ব্যাপার। প্রেমিক তাহার প্রেমের পাত্র-সম্বন্ধে যে অতিরিক্ত ধারণা পোষণ করে, কোনও অহংকারী লোকই কখনও আপনার সম্বন্ধে সেরূপ ধারণা পোষণ করে না। পৃথিবীতে যত গুণবান্ এবং মহৎ লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের কেহই প্রেমের উন্মাদনার বশীভূত হন নাই। ইহা হইতে প্রতীতি হয়, মহৎ স্বভাব এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য এই রিপুর প্রতিবন্ধক।"

বেকন যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। শিল্পের উন্নতির ফলে লোকে যুদ্ধে অপটু হইয়া পড়ে বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল স্থায়ী শান্তিতেও মানুষের যুদ্ধপ্রবৃত্তি শান্ত হয়, এই জন্য তিনি তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না। 'ক্রিসাস্ যখন সোলনকে তাঁহার স্বর্ণভাণ্ডার দেখাইয়াছিলেন, তখন সোলন বলিয়াছিলেন, "যাহার অধিকতর লৌহ আছে, সে যদি এখানে আসে, তবে সে এই সকল স্বর্ণ অধিকার করিবে।" বিপ্লব-পরিহার করিবার উপায়-সম্বন্ধে বেকন বলিয়াছেন, "রাজদ্রোহের কারণ বিদূরিত করাই রাজদ্রোহ বন্ধ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। ইন্ধন যদি প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে কোথা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া তাহা প্রজ্জ্বলিত করিবে বলা কঠিন। আবার অতিরিক্ত কঠোরতার সহিত সমালোচনা বন্ধ করিলেও যে উপদ্রবের শান্তি হয়, তাহাও নয়। উপদ্রবের প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন করাই তাহা বন্ধ করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টার ফলে তাহার স্থায়িত্ব বর্দ্ধিত হয়। দারিদ্র্যের এবং অসন্তোষের আধিক্যবশতঃই রাজদ্রোহের উদ্ভব হয়।" "ধর্ম্মে নূতনত্বের প্রবর্ত্তন, টেক্স, আইন ও দেশাচারের পরিবর্ত্তন, প্রজার অধিকারে হস্তক্ষেপ, প্রজাপীড়ন, অনুপযুক্ত লোক ও বিদেশীর পদোন্নতি, অন্নাভাব, সৈন্যদিগের কর্ম্ম-চ্যুতি, বে-পরোয়া দলাদলি এবং যাহাতে প্রজাসাধারণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া তাহা-দিগকে একদলভুক্ত করে—এই সকলই রাজদ্রোহের কারণ।" "শত্রুদিগের মধ্যে ভেদ-উৎপাদন এবং বন্ধুদিগের মধ্যে একতা-সংসাধন, বেকন রাজদ্রোহদমনের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সম্পত্তির ন্যায়ানুগত বণ্টনকে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় বলিয়াছেন। গণতন্ত্র এবং সাম্যবাদ বেকনের মনঃপূত ছিল না। অশিক্ষিত জনসাধারণকে বেকন বিশ্বাস করিতেন না। সাধারণ লোকের তোষামোদ যাহারা করে, তাহাদিগকে তিনি নিকৃষ্টতম চাটুকার বলিয়াছেন। যখন জনসাধারণ ফোকিয়নের প্রশংসা করিয়াছিল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছি?" কৃষক-সম্প্রদায় জমির মালিক হইবে। অভিজাত সম্প্রদায়কর্ত্তৃক শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। রাজা হইবেন

দানশীল, ইহাই বেকন বলিয়াছিলেন। বিদ্বান শাসকের অধীনে সমৃদ্ধিহীন কোনও জাতির উদাহরণ পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে তিনি সেনেকা, এণ্টোনাইনাস পায়াস ও মার্কাস অরেলিয়াসের উল্লেখ করিয়াছেন।

অনেকের মতে বেকনের দর্শনে নূতন কিছুই নাই। মেকলে লিখিয়াছেন, "সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে প্রত্যেক মানুষই আরোহপ্রণালীক্রমে চিন্তা করিয়া আসিতেছে। সুতরাং তাহা লইয়া হৈ চৈ করিবার, অথবা তাহার জন্য বেকনের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। যখন কেহ অনুমান করে যে 'পাই' (মাংস ও ফলের পিষ্টক) তাহার সহ্য হয় না, কেননা যখনই সে 'পাই' খাইয়াছে, তখনই তাহার অসুখ হইয়াছে, যখন খায় নাই, তখন অসুখ হয় নাই, যখন খুব বেশী খাইয়াছে তখন গুরুতর অসুখ হইয়াছে, যখন কম খাইয়াছে, তখন সামান্য অসুখ হইয়াছে, তখন অজ্ঞাতসারে হউক অথবা জ্ঞাতসারেই হউক Novnm Organumএর সকল সূত্রেরই সে তাহার অনুমানে প্রয়োগ করিয়াছে। এই সমালোচনা খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। কেননা বিজ্ঞলোকের অভিজ্ঞতা-প্রসূত চিন্তাপ্রণালী সূত্রাকারে বিবৃত করাই তর্কশাস্ত্রের কার্য্য। কিন্তু বেকন এই প্রণালীর আবিষ্কার করেন নাই। সক্রেটিসের তর্কপ্রণালী এই প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আরিস্টটল এই প্রণালীতেই প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণা করিয়াছিলেন। Roger Bacon কেবল এই প্রণালীর ব্যবহার করেন নাই, ইহার ব্যবহারের জন্য উপদেশও দিয়াছিলেন। বেকন পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের নিকট আপনার ঋণ অস্বীকার করেন নাই। তিনি Hippocrates এবং Platoর নামের উল্লেখ করিয়াছেন।

বেকন বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমসাময়িক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তিনি Copernicus এর মত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, Kepler এবং Tycho Braheকেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। Harveyর আবিষ্কারসম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। নিজে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার সময় তাহার ছিলনা। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার কল্পনাই তাঁহার প্রধান গৌরব।

(২)

গ্যাসেণ্ডি

গ্যাসেণ্ডি ও হবস্‌কর্ত্তৃক প্রাচীন জড়বাদ পুনরুজ্জীবিত হয়। তৎকালীন বৈজ্ঞানিক মতবাদদ্বারা উভয়েই বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে গ্যাসেণ্ডির জন্ম হয়। আধুনিক পরমাণু-বাদের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। নিউটনের মতো তিনিও পৃথিবীর আকর্ষণের কথা বলিয়াছিলেন। প্রত্যেক বস্তু যে নিম্নে পতিত হয়, নিউটনের মতো তিনি ইহাকে পৃথিবীর আকর্ষণের ফল বলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থদ্বয়ের নাম De

Vita Epicuri এবং Syntagma Philosophiae Epicuriae। এই গ্রন্থদ্বয়ে তিনি এপিকিউরাসের দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেকন এবং দে-কার্তের মতো গ্যাসেণ্ডিও স্কলাষ্টিক দর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। জগতের ব্যাখ্যার জন্য যাহারা বেকনের প্রত্যক্ষবাদমূলক প্রণালীর ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। বেকন এবং হব্‌স্‌ ও দেকার্তের মধ্যে তাঁহাকে সংযোগসূত্র মনে করা যাইতে পারে।

গ্যাসেণ্ডি ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী পুরোহিত হইলেও এপিকিউরাস এবং লুক্রেসিয়াসের জড়বাদ অবলম্বন করিয়া তাহার সঙ্গে ক্যাথলিক ধর্ম্মের মিশ্রণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন জড়বাদে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই; পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা জড়বাদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অনুমানের উপরই তাহা স্থাপিত হইয়াছিল। গ্যাসেণ্ডি দেকার্তের গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া এপিকিউরাসের মতে প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল; যে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক জ্ঞানের যাবতীয় ব্যাখ্যা পরমাণুবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার মতে পরমাণুগণই জাগতিক সমস্ত বস্তুর উপাদান। ঈশ্বর পরমাণুদিগকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের মধ্যে গতিসঞ্চার করিয়াছিলেন। পরমাণু হইতেই যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে এবং বর্ত্তমানেও হইতেছে। পরমাণুপুঞ্জের সংযোগ হইতে বস্তুর সৃষ্টি এবং বিশ্লেষণ হইতে ধ্বংস হয়। তাঁহার মতে পরমাণুর গতি ও ভারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান; পরমাণুর গতির উপর তাহার ভার নির্ভরশীল। দেশ ও কাল জড় হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। তাহারা দ্রব্যও[১] নহে, দ্রব্যের আগন্তুক অবস্থাও[২] নহে। যাবতীয় বস্তুর ধ্বংস হইলে দেশ অনন্তে বিস্তৃত হইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে কালের অস্তিত্ব ছিল এবং পরেও থাকিবে। তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক মতই গ্যাসেণ্ডি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

---

(৩)

হব্‌স্‌

বেকনের মতে জ্ঞানই শক্তির উৎস, এবং শক্তিলাভের জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন। গ্রীক দর্শন-অনুসারে জ্ঞান হইতে সংযমের উৎপত্তি হয়, এবং শক্তি অপেক্ষা সংযমই অধিকতর কাম্য। বেকনের পরে টমাস হব্‌স্‌ও শক্তিলাভকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ক্ষমতা-প্রিয়তা মানব-প্রকৃতির সার-স্বরূপ, এবং প্রাকৃতিক জগতের সারভূত গতি মানবের সংবিদে শক্তির প্রতি আকর্ষণরূপে প্রকাশিত।

---

[১] Substance [২] Accidents

১৫৮৮ সালে ইংলণ্ডে হব্‌স্ জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বুদ্ধির অসাধারণ বিকাশ হইয়াছিল। পাঁচ বৎসর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি ফ্রান্সে গমন করেন। তথায় গ্যাসেণ্ডি ও দেকার্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় পাঠে নিবিষ্ট হন, এবং গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হন। থুসিডাইডের গ্রন্থ পাঠ করিয়া গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহার গভীর বিরাগের উৎপত্তি হয়, এবং ধর্ম্মীয় ও রাষ্ট্রীয় যাবতীয় বিষয়ে রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব থাকা উচিত, তাঁহার এই ধারণা হয়। এই সময় বেকন তাঁহার কর্ম্মজীবন হইতে অপসৃত হইয়া নির্জনে বাস করিতেছিলেন। হব্‌স্ কিছুকাল তাঁহার সেক্রেটারীর কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দর্শনদ্বারা প্রভাবিত হন নাই। চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি আবার দেশভ্রমণে বহির্গত হন। সেই সময় একদিন এক ভদ্রলোকের পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিয়া তিনি একখানা ইউক্লিডের জ্যামিতি দেখিতে পান। পুস্তকখানা ৪৭ প্রতিজ্ঞায় খোলা ছিল। প্রতিজ্ঞার উপপাদ্য পাঠ করিয়া প্রথমে তিনি অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রমাণ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া তাহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং জ্যামিতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছিল। তখন জ্যামিতির প্রমাণ-পদ্ধতি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে প্রয়োগের সংকল্প তাঁহার মনে উদিত হয়।

ইংলণ্ডে অন্তর্বিদ্রোহের সময় হব্‌সের মনোযোগ রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের দিকে আকৃষ্ট হয়। ফলে তাঁহার সমগ্র দর্শনের উপর রাজনীতির প্রভাব লক্ষিত হয়।

হব্‌সের প্রধান গ্রন্থগুলির নাম—(1) The Leviathan (১৬৫০) (2) De Corpore (১৬৫৫) (3) De Homine (1658) (4) Behemoth (5) The Common Laws (6) Historia Ecclesiastica (১৬৭০).

১৬৭৯ সালে Hobbs পরলোক গমন করেন।

Leviathan বিশালকায় একপ্রকার সামুদ্রিক জন্তুর নাম। ইহা হইতে অতিরিক্ত বৃহৎ বস্তু অর্থে এই শব্দ প্রযুক্ত হয়। Leviathan গ্রন্থে হব্‌স্ রাষ্ট্রকে এই নামে অভিহিত করিয়াছেন।

হব্‌সের মতে জ্ঞানের যাবতীয় বিভাগের মধ্যে একমাত্র জ্যামিতিতেই নিশ্চিতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের মূল গণিতের মধ্যে নিহিত, এবং গতিই সমস্ত বস্তুর মূল তত্ত্ব। কারণের খাঁটি জ্ঞান হইতে তাহার কার্য্যের অনুমান এবং কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ হইতে তাহার কারণের অনুমানই "দর্শন"। আমাদের প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে কারণ হইতে তাহার ভাবী কার্য্য নিরূপণ করাই দর্শনের উদ্দেশ্য।

ইন্দ্রিয়ের উপর বাহ্য বস্তুর কার্য্য হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয়। বাহ্য বস্তুর মধ্যস্থ কতকগুলি "গতি" দ্বারাই ইন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেশের মধ্যস্থিত জড়পিণ্ডের গতি হইতেই যাবতীয় জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। দর্শনের কারবার এই সকল জড়পিণ্ডের সহিত। আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞান হয় প্রত্যাদেশ হইতে।

এক প্রথম কারণ হইতে সমস্ত গতির উৎপত্তি। প্রত্যেক কার্য্যই তাহার কারণ

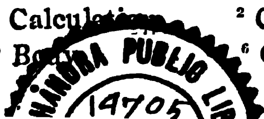
হইতে উদ্ভূত, এই কারণ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের কার্য্য, এই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের কার্য্য। এইরূপে পশ্চাৎ দিকে যাইতে যাইতে এক প্রথম কারণের কল্পনা করিতে হয়, যাহার কোনও কারণ নাই; না করিলে 'অনবস্থা'র উদ্‌ভব হয়, অর্থাৎ এই কারণশ্রেণীর শেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু মানবের চিন্তা এই রূপ কল্পনার বিরোধী বলিয়া, "প্রথম কারণ" আমাদের নিকট দুর্বোধ্য। দুর্বোধ্য হইলেও তাহাতে বিশ্বাস করিতে হয়। বিশ্বাস এবং যুক্তি এক নহে। বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, বিশ্বাসের সেখানে আরম্ভ। যুক্তিসহযোগে তর্ক গণনা[1] মাত্র, এবং গণনাও যোগ ও বিয়োগের অতিরিক্ত কিছু নহে। শব্দ সকল মানসিক ভাবপ্রকাশক সঙ্কেতমাত্র। মনে বাহ্যবস্তুদ্বারা যে সকল ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে মনে রাখিবার জন্যই এই সকল সঙ্কেতের সৃষ্টি। শাব্দিক সঙ্কেতসমূহের পরস্পর সংযোগই চিন্তা। চিন্তা নির্ভর করে শব্দের উপর। শব্দের সাহায্য ব্যতীত চিন্তা করা সম্ভবপর হয় না। ভাষার নির্ভুল অর্থ-নির্দ্দেশ দর্শনের পক্ষে প্রথমেই আবশ্যক। গণনার জন্য যে সকল ধাতু খণ্ড[2] ব্যবহৃত হয় তাহাদের যে কাজ, শব্দের কাজও তাহাই। "বিজ্ঞ লোক শব্দদ্বারা গণনামাত্র করেন, কিন্তু মূর্খগণ শব্দদিগকে অর্থের মত মূল্যবান মনে করে, এবং আরিস্টটল, সিসিরো অথবা টমাসের মতানুসারে তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করে।" শব্দদ্বারা আমরা সর্ব্বদাই প্রতারিত হইতেছি।

হব্‌সের মতে জড়[3] একমাত্র দ্রব্য[4] কিন্তু আমরা জড়কে পিণ্ড[5] রূপেই জানি। জড়পিণ্ডের ব্যাপ্তি, আকার, বর্ণ প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে, তাহাদের সত্তা[6] পিণ্ডের মধ্যে নাই। আমাদের ইন্দ্রিয়গণের উপর জড়পিণ্ড সকল যে সকল কার্য্য উৎপাদন করে, এই সকল গুণ সেই সকল কার্য্য। জড় পদার্থেরও কোন বাস্তব সত্তা নাই, পিণ্ডসকলের মুখ্য গুণাবলীর সম্প্রত্যয়ই[7] জড় পদার্থ।" হব্‌সের এই ব্যাখ্যা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে তিনি জড়বাদদ্বারাই জগতের ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইলেও তাহার ব্যাখ্যা অধ্যাত্মবাদেরই অনুকূল। জড়ের মুখ্য গুণাবলীর অস্তিত্ব যদি বাহ্য বস্তুর মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যয় সম্পূর্ণ মানসিক পদার্থ, এবং এই সকল প্রত্যয় উৎপাদন করে বলিয়া মনকে সক্রিয় পদার্থ বলিতে হয়।

আরিস্টটলের মতে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবার দিকে মানুষের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। পরস্পরের সহিত একত্র বাস করা তাহার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব। কিন্তু হব্‌স্ তাহা স্বীকার করেন নাই; তাঁহার মতে সর্ব্বপ্রাণী-সাধারণ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি হইতে মানুষের অদম্য ক্ষমতা-লিপ্সার উৎপত্তি হইয়াছে। সেই জন্য অন্য কাহারও দুঃখ ক্ষতি গ্রাহ্য না করিয়া মানুষ সর্ব্বদাই আপনার সুখের অনুসন্ধান করে। ইহার প্রমাণস্বরূপ হব্‌স্ গৃহস্থ ও পথিকেরা দস্যুতার ভয়ে যে সতর্কতা অবলম্বন করে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরদ্রব্যাপহরণের দিকে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যদি না থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বনের

---

[1] Calculation [2] Counters [3] Matter [4] Substance
[5] Bodies [6] Objective Existence [7] General notion



কোনও প্রয়োজন হইত না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমাজে দস্যুর সংখ্যা তো খুব বেশী নহে। সহস্রের মধ্যে একজনও হইবে কিনা সন্দেহ। অবশিষ্ট ৯৯৯ জনের পরস্বাপহরণের প্রবৃত্তি নাই। এই মুষ্টিমেয়-সংখ্যক দুর্বৃত্তের অস্তিত্ব হইতে সকল মানুষকে অসামাজিক-প্রবৃত্তি-পরায়ণ বলা যায় না। মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক মৈত্রী আছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ আরিস্টটল পথিকদিগের প্রতি সাধারণতঃ সদয় ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। অসভ্য আদিম জাতিদিগের মধ্যে এরূপ জাতিও আছে, যাহাদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোনও বিবাদ-বিসংবাদই নাই। পরস্ব-লুণ্ঠন-মূলক দ্বন্দ্ব কথঞ্চিৎ উন্নততর সভ্যতার লক্ষণ। তাহা কোনও সমাজবিরোধী সহজাত সংস্কারের ফল নহে। বরং তাহা হইতেই সমাজ-বিরোধী প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়।

হব্‌স্ কিন্তু যে আদিম অবস্থার কথা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের শত্রু ছিল। প্রত্যেকেই স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিত। ফলে সমাজ বলিতে কিছু ছিল না। ছিল বহুসংখ্যক পরস্পর বিরোধী মানুষের সমষ্টি। পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি লাগিয়াই ছিল। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-প্রভু ছিল। ন্যায়ান্যায়ের কোনও ধারণা ছিল না। "জোর যার মুল্লক তার", এই ছিল সকলের অবলম্বিত নীতি। অধিকার বলিয়া কিছু ছিল না। কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী হয় নাই। কারণ এই অবস্থার অসুবিধা উপলব্ধ হইয়াছিল, এবং মানুষ ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায় খুঁজিয়াছিল। এই অবস্থা হইতে বাহির হইয়া আসিবার একমাত্রই উপায় ছিল। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রভুত্ব বিসর্জন দিয়া একজনের হস্তে তাহা ন্যস্ত করাই সেই উপায়। এই উপায়ই অবলম্বিত হইয়াছিল। এক এক দেশের যাবতীয় মানুষ মিলিত হইয়া তাহাদের ব্যক্তিগত প্রভুত্ব একজনের হস্তে সমর্পণ করিয়া, তাহাকে সকলের উপর সর্ববিধ কর্তৃত্ব দান করিয়াছিল। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছিল।

রাষ্ট্রভুক্ত জনগণকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে এবং পরস্পরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রের অধিপতিকে প্রয়োজনীয় সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। এই ক্ষমতা অর্পণরূপ সামাজিক চুক্তি হইতেই[1] সামাজিক জীবনের উদ্ভব হইয়াছে; সমাজবদ্ধ হইয়া শান্তিতে বাস করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু এই চুক্তি প্রজাদিগের পারস্পরিক চুক্তি; যাহাকে সমস্ত ক্ষমতা দিয়া রাষ্ট্রের অধিপতি করা হইয়াছিল, তাহার সহিত এই চুক্তি হয় নাই। তাঁহার কর্তব্য-সম্বন্ধে কোনও চুক্তি তাহার সহিত হয় নাই। কেহ যদি রাষ্ট্রপতির আজ্ঞা পালন করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে, কেননা সেই অস্বীকৃতিদ্বারা সে সমাজ গঠিত হইবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া যায়, এবং সে অবস্থায় যে কেহ তাহার প্রাণনাশ করিতে পারিত। রাষ্ট্রপতি এই চুক্তিতে আপনাকে কোনও রূপে বদ্ধ করেন নাই, কেননা তিনি চুক্তি ভঙ্গ করিলে, তাহাকে চুক্তি-পালনে বাধ্য করিবার কেহই ছিল না। সমাজের উৎপত্তি-সম্বন্ধে ইহাই হব্‌সের মত।

---

[1] Social contract

এই তথাকথিত চুক্তির কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই। কখনও যে কোনও দেশে জনসাধারণ মিলিত হইয়া কোনও এক ব্যক্তিকে তাহাদের ব্যক্তিগত সমস্ত ক্ষমতা দান করিয়াছিল, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু সুদূর অতীতে কোনও দেশের জনসাধারণ এই প্রকার কোনও চুক্তি করিয়া তাহাদের প্রায় সমস্ত ক্ষমতা কোনও ব্যক্তিকে অর্পণ করিয়া থাকিলেও, শত শত বৎসর পরে সেই চুক্তিকারীদিগের বংশধরগণের পক্ষেও সে চুক্তি যে পালনীয়, কোনও যুক্তিদ্বারাই তাহা সমর্থিত হয় না। কিন্তু হব্‌স্ এই চুক্তিদ্বারা ইংলণ্ডের নূতন রাজতন্ত্রের সমর্থন করিযাছিলেন। তাঁহার মতে শাসনক্ষমতা কেবল একজনের হস্তে না থাকিলে সমাজকে বিশৃঙ্খলা হইতে কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রও যে দেশকে বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

কিন্তু হব্‌স্ কেবল প্রজাতন্ত্রেরই বিরোধী ছিলেন না। তিনি রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মীয় সমস্ত ক্ষমতা একই হস্তে কেন্দ্রীভূত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। Leviathan গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে একহস্তে তরবারী ও অন্য হস্তে ধর্ম্মাধ্যক্ষের ক্রসদণ্ডধারী নরপতির চিত্র অঙ্কিত ছিল। এই সময়ে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোকে নানা দেশে রাজনৈতিক বিপ্লব-সংঘটনের চেষ্টা করিতেছিল। প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় ও নানা দলে বিভক্ত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। প্রত্যেক দল ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়া আপনাদের ইচ্ছামত বাইবেলের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং তৎকালে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ষ্টুয়ার্ট বংশকে আক্রমণ করিতেছিল। রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্য লোকের দেহ ও মনঃ উভয়ই শৃঙ্খলিত করিবার প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছিল।

হব্‌সের রাজনৈতিক মতে তাঁহার জড়বাদই প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। জড়জগৎ যেমন পরমাণুপুঞ্জের সমবায়, রাষ্ট্রও তেমনি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তির সমবায়; পরস্পরের বিরোধিতাই ইহাদের স্বভাব। অসভ্য অবস্থায় প্রত্যেক মানুষের সহিত প্রত্যেকের বিরোধ, আত্মরক্ষাই তখন পরম মঙ্গল, মৃত্যুই পরম অমঙ্গল বলিয়া পরিগণিত হইত। মৃত্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষাই তখন প্রাকৃতিক নিয়ম ছিল। প্রত্যেক লোকই তাহার প্রতিবেশীকে সন্দেহ ও ভীতির দৃষ্টিতে দেখিত। ইহা হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্য উপরোক্ত সামাজিক চুক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। এই চুক্তি করিয়া প্রত্যেকে তাহার স্বাধীনতা-বর্জন এবং কামনার সঙ্কোচ সাধন করিয়াছিল। এই সামাজিক চুক্তি হইতেই রাষ্ট্রীয় শাসন-বিধির সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের প্রত্যেক লোক এক শক্তির অধীনতা স্বীকার করিলেই তবে এই চুক্তি কার্য্যকরী হয়। এইরূপ শক্তির অভাবে চুক্তিভঙ্গ রোধ করা সম্ভবপর হয় না। এই প্রভু-শক্তিই রাষ্ট্রীয় শক্তি, তাহার ইচ্ছাই আইনে পরিণত হয়। ন্যায় ও অন্যায়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ভালো ও মন্দ ইহাদের কোনও অর্থ নাই। রাষ্ট্রের প্রভুশক্তি যাহা আদেশ করেন, তাহাই ন্যায়, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই ভাল। যাহা নিষেধ করেন, তাহা অন্যায়, অধর্ম্ম ও মন্দ। এতাদৃশ অবস্থা হইতে সুনীতির উদ্ভব হয়। যখন সকলেই বুঝিতে পারে, যে এইরূপে পরস্পরের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্ব-কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিলে এবং

এক শক্তির অধীনতা স্বীকার করিলে সকলেরই মঙ্গল হয়, তখনই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে কাহার কোনও "অধিকার" নাই, কেননা এই শক্তি সামাজিক চুক্তিতে কোনও অংশ গ্রহণ করিয়া আপনাকে কোনও প্রকার দায়িত্বে আবদ্ধ করে নাই। নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে কাহারও অধিকার নাই। প্রভুশক্তির নির্দ্দেশই এই পক্ষে যথেষ্ট এবং সর্ব্বথা পালনীয়। ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়েও তিনি প্রভু; প্রজাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান তাহাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও বিবেককে এই প্রভুশক্তির সম্মুখে মাথা নত করিতে হইবে। সর্ব্বশক্তিমান রাষ্ট্রকে এই জন্য হব্‌স্ Leviathan বলিয়াছেন॥ তাহাকে "মর্ত্ত্যদেবতা"[১] অথবা ভূদেব নামেও অভিহিত করিয়াছেন। এই বিরাট-কায় জন্তু সকল ব্যক্তিকে গ্রাস করিয়াছে—তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন করিয়াছে। যাজক-সম্প্রাদায়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে মীমাংসা করিবার অধিকার হব্‌স্ অস্বীকার করিয়াছেন, এবং যে ধর্ম্ম রাষ্ট্রপতির অধীনতা স্বীকার করে না, তিনি তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন। পিউরিটান ও ক্যাথলিক উভয়েরই তিনি বিরোধী ছিলেন।

কিন্তু লোকের বিচারশক্তি শৃঙ্খলিত করিবার এই প্রচেষ্টায় বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাদ্বারাই পরিশেষে মুক্তি সাধিত হইয়াছিল। ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিদিগের যুক্তি-খণ্ডনের জন্য হব্‌স্ তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ফলে Leviathan নাস্তিকদিগের বাইবেলে পরিণত হইয়াছিল। আইনদ্বারা লোকের ধর্ম্ম বিশ্বাস বাঁধিয়া দিবার প্রস্তাব যিনি করিয়াছিলেন, তিনি যে খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন, ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু হব্‌স্ বলিয়াছেন মূর্খেরা ভিন্ন কেহই ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করিতে পারে না। কিন্তু আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন সুসম্বদ্ধ জড়বাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং নাস্তিকতার সহিত ইহার কোনও বিরোধ নাই।

A. W. Benn বলিয়াছেন, বেকন ও হব্‌সের কৃতিত্ব-সম্বন্ধে একটা অতিরঞ্জিত ধারণা অনেকের আছে। কিন্তু তাহারা যে ভৌতিক এবং চরিত্রনৈতিক বিজ্ঞানে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই ধারণার মূলে কোনও সত্য নাই। মানবচিন্তার অভিব্যক্তি যে পথে বাস্তবিক অগ্রসর হইয়াছে, তাঁহারা উভয়েই সে পথ হইতে দূরে ছিলেন। সুদূর অতীতের সৌরীয়[২] শ্রেণীভুক্ত যে সকল বিশালকায় জন্তুর কঙ্কাল দেখিয়া বিস্ময়ের উদ্রেক হত, তাহারা যেমন প্রাণের অভিব্যক্তির ইতিহাসে কোনও মুখ্যস্থান প্রাপ্ত হয় নাই, প্রাণের অভিব্যক্তির ধারা তাহাদের অনুসরণ না করিয়া অন্য পথে প্রবাহিত হইয়াছিল, বেকন ও হব্‌সের দর্শনের অনুসরণ না করিয়া মানবচিন্তাও তেমনি অন্যপথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে Raleigh-এর El Dorado-র সহিত বৃটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের যে সম্বন্ধ, বেকনের স্বপ্নের সহিত বিজ্ঞানের ভাবী জয়যাত্রার সম্বন্ধ তাহা হইতে অধিকতর ছিল না। যে যুক্তির সাহায্যে হব্‌স নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে স্বাধীনতা-সূর্য্যের

[১] Mortal God [২] Saurian

তাপে তাহা শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছিল। সামাজিক চুক্তিবাদের ব্যবহারিক গুরুত্ব যে অত্যধিক ছিল, তাহা সত্য। কিন্তু চরিত্রনীতির ভিত্তিরূপে চুক্তির ধারণা অতি প্রাচীন। এপিকিউরাসের এই ধারণা ছিল, এবং Hookerএর Ecclesiastical Polity গ্রন্থে এই মত অধিকতর বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। লক এবং রুসোর হস্তে রূপান্তরিত হইয়া এই মত বিপ্লবসাধক অস্ত্রে পরিণত হয়। বেকনের মত হব্‌স্‌ও বিশ্বাস করিতেন, যে অভিজ্ঞতা হইতেই সকল জ্ঞানের উদ্ভব হয়। জগতের অভিজ্ঞতা কেবল বাহ্য ইন্দ্রিয় হইতেই উৎপন্ন হয়, একথা হব্‌স্‌ বেকন অপেক্ষা স্পষ্টতর করিয়া বলিয়াছেন। এখানেও তাহাদের মৌলিকতার কোনও দাবী নাই, কেননা একাধিক গ্রীক দার্শনিক ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন।

হব্‌স্‌ ও রুসোর "সামাজিক চুক্তির" ধারণা এক নহে। একপ্রকার সামাজিক চুক্তিই যে রাষ্ট্রের ভিত্তি, এবিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ নাই ; মানুষের সামাজিক অবস্থা যে তাহার প্রাকৃতিক অবস্থারই পরিণতি, এবিষয়েও উভয়ে একমত। কিন্তু হব্‌সের মতে মানুষে মানুষে শত্রুতা ছিল, এবং সকলের নিরাপত্তার জন্য তাহারা চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। রুসোর মতে মানুষে মানুষে এরূপ শত্রুতা নাই ; বরং মানুষের সুবিধা এবং উন্নতির জন্য তাহারা স্বভাবতঃই পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়। হব্‌সের মতে "জোর যার মুল্লুক তার", এই মতই চুক্তির ভিত্তি, সুতরাং যে জোর (শক্তি) ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে থাকিলে পরস্পরের ধ্বংস-সাধনে নিযুক্ত হয়, তাহা ব্যক্তির নিকট হইতে লইয়া যাহার হস্তে ন্যস্ত হয়, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান ও প্রভু। রুসোর মতে এই চুক্তির উদ্দেশ্য সকলকে একত্রিত করিয়া সমান অধিকার-ভোগে সমর্থ করা, এবং সকলের কর্ত্তব্যেরও সমতাসাধন করা। হব্‌সের মতে এই চুক্তি একপক্ষের, রুসোর মতে এই চুক্তি পারস্পরিক, শাসকও শাসিত উভয় পক্ষেরই ; এবং যে শক্তি ব্যক্তির নিকট হইতে অপহৃত হয়, তাহা সমগ্র সমাজকে প্রদত্ত হয়। সুতরাং রুসোর রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্রী, হব্‌সের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রী। হব্‌স্‌ মানুষের প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে স্বার্থপরতা ও ভয় ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই। রুসো প্রকৃতির মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মের উৎস দেখিতে পাইয়াছেন ; যেখানে হব্‌স্‌ ঘৃণা ও বিকর্ষণ দেখিয়াছেন, সেখানে রুসো দেখিয়াছেন মৈত্রী ও প্রেম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অধ্যাত্মপ্রবণতা

দে-কার্ত্ত

নব্য দর্শনের জনক বলিয়া দে-কার্ত্তের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইহা অসঙ্গত নহে। বেকন বৈজ্ঞানিক গবেষণার নূতন প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দে-কার্ত্ত কেবল দার্শনিক গবেষণার নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন নাই, একটি নূতন দার্শনিক মতেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার দর্শন হইতে নব্য চিন্তা নানা দিকে প্রধাবিত হইয়া গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে।



দে কার্ত্ত

দে-কার্ত্ত ফরাসী দেশে তুরাইন প্রদেশে ১৫৯৬ সালে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এক জেস্যুইট কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পঠদ্দশাতেই মধ্য যুগের দর্শনের প্রতি তাঁহার গভীর বিরাগ জন্মিয়াছিল। কলেজ ত্যাগ করিয়া তিনি গণিতের আলোচনায় নিবিষ্ট হন। ২০ বৎসর বয়সে সৈন্য-বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি কিছু দিন নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। পরে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া আবার অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। পারিসে বন্ধুবান্ধবদিগের সাহচর্য্য বিদ্যাচর্চ্চার বিঘ্ন উৎপাদন করায় তিনি দেশত্যাগ করিয়া হলাণ্ডে গিয়া বাসস্থাপন করেন। তথায় কুড়ি বৎসর যাবত তিনি জ্ঞানালোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। দে-কার্ত্ত স্বল্পভাষী অসামাজিক প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের

একটা আকর্ষণ-শক্তি ছিল, যাহার জন্য বিদেশেও বহুসংখ্যক লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। তাহাদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্য অনেক বার তাঁহাকে বাসপরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ১৬৪৯ সালে সুইডেনের রাণী ক্রিশ্চিনার নিমন্ত্রণে তিনি স্টকহলমে গমন করেন। এই রাণীর স্বার্থপরতাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। রাণী প্রত্যুষে শয্যাত্যগ করিতেন। দে কার্ত্ত অত সকালে শয্যাত্যাগে অনভ্যস্ত হইলেও, রাণীর অনুরোধে তাঁহাকে সকাল পাঁচটায় সময় রাজপ্রাসাদে গিয়া তাঁহাকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতে হইত। জানুয়ারী মাসে তিনি হলাণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলন, কিন্তু রাণীর বিশেষ অনুরোধে তাহাকে আরও কিছুদিনের জন্য তথায় থাকিয়া যাইতে হইল। ১৬৫০ সালে স্টকহলমে প্রবল শীত পড়িয়াছিল, কিন্তু স্বার্থপর রাণী তাহার পাঠের সময় পরিবর্ত্তন করিলেন না। রাজপ্রাসাদেও দে-কার্ত্তের বাসের ব্যবস্থা করিলেন না। সেই প্রবল শীতে প্রত্যুষে রাজপ্রাসাদে যাইবার সময় একদিন দে-কার্ত্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সেই পীড়াতেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হইল।

দেকার্ত্তের দৈহিক সাহসের অভাব না থাকিলেও, নৈতিক সাহসের অভাব ছিল। কোপার্ণিকাসের জ্যোতিষিক মত শিক্ষাদানের জন্য গ্যালিলিওর বিপদের কথা শুনিয়া, তিনি ঐ বিষয়ে লিখিত নিজের একখানা গ্রন্থপ্রকাশ করিতে বিরত হন। কিন্তু তিনি যে দেশে তখন বাস করিতেছিলেন (হল্যাণ্ড), সেখানে Inquisition ছিল না, এবং দৈহিক বিপদের আশঙ্কাও ছিল না। এই দুর্বলতার জন্যই বন্ধুদিগের সাহচর্য্য-পরিহারের জন্য তাঁহাকে দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহার জন্যই রাণী ক্রিশ্চিনার অসন্তোষের ভয়ে তিনি স্টকহলমে প্রবল শীতে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া আপনার জীবন বিপন্ন ও অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

দে-কার্ত্ত গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যে বিশ্লেষমূলক জ্যামিতি হইতে[1] আধুনিক গণিতের আরম্ভ, তাহা দে-কার্ত্তেরই সৃষ্টি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁহার দানসম্বন্ধে মতভেদ আছে। তাঁহার দার্শনিক মতবাদে বহু ক্রটী থাকিলেও, নব্য দর্শনের বিকাশে তাহা যে প্রকৃত সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রধান গ্রন্থগুলির নাম (১) Discourse on the method of Rightly Conducting the Reason (১৬৩৭)—যুক্তিকে যথার্থ পথে চালিত করিবার উপায়-সম্বন্ধে আলোচনা। (২) Meditations on First Philosophy (১৬৪১)—প্রাথমিক দর্শন-সম্বন্ধে চিন্তা (৩) The Principles of Philosophy (১৬৪৪) দর্শনের তত্ত্বাবলী।

প্রথমোক্ত গ্রন্থে দে-কার্ত্ত তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাস বর্ননা করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে সত্যের জ্ঞানলাভই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বেকন এবং হব্‌স্ জ্ঞান চাহিয়াছিলেন তাহার উপযোগের জন্য, মানুষের প্রয়োজন-সাধনের জন্য। কিন্তু দে-কার্ত্তের সেরূপ কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। জ্ঞান নিজেই তাহার প্রয়োজন; জ্ঞানের জন্যই তিনি

[1] Analytical Geometry.

জ্ঞান চাহিয়াছিলেন, এই উদ্দেশ্যেই তিনি বহু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা তাঁহার কাম্য ছিল, তাহা প্রাপ্ত হন নাই। সাহিত্যের গ্রন্থে আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান পাওয়া যায় না। দার্শনিকগণ সত্য শিক্ষা দেন বলিয়া দাবী করেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের অন্ত নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, যে সত্য তাঁহারা পান নাই। গণিতে নিশ্চিতি আছে সত্য, কিন্তু যান্ত্রিক শিল্পের ভিত্তিস্বরূপ ব্যবহারের জন্যই কেবল গণিতের সত্যের আদর। ক্লান্ত হইয়া দেকার্ত্ত লিখিত গ্রন্থ ছাড়িয়া "জীবন-গ্রন্থে"র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া তাহারা জীবনের প্রধান "স্বার্থ" সম্বন্ধে কি বলে, তাহা শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহা তিনি চাহিয়াছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হইলেন না। দার্শনিকদিগের মধ্যে যেমন, সাধারণ লোকের মধ্যেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত। ধর্ম্মের মধ্যে একটা নিশ্চিত আশ্রয় মিলিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের সত্যতা অপ্রাকৃত প্রত্যাদেশ হইতে প্রাপ্ত; দে-কার্ত্ত খুঁজিতেছিলেন প্রাকৃত জ্ঞান। কোথাও নিশ্চিত সত্যের সন্ধান না পাইয়া, তিনি সকল মতকেই সন্দেহ করিতে শিক্ষা করিলেন, এবং একমাত্র স্বীয় প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন। একমাত্র গণিত হইতেই নিঃসন্দিগ্ধ সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় দেখিয়া, তিনি বীজগণিত ও জ্যামিতির উপপত্তি-প্রণালী অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিতে মনঃস্থ করিলেন। গণিতের পদ্ধতি হইতে তিনি চারিটি মৌলিক নিয়মের আবিষ্কার করিলেন। প্রথমতঃ—যাহা স্পষ্টই সত্য বলিয়া প্রতীত হয় না, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে না; (২) প্রত্যেক বিচার্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য যতগুলি বিভিন্ন প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন, তাহাকে ততগুলি অংশে বিভক্ত করিবে; (৩) প্রথমে সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সহজ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া ক্রমে ক্রমে জটিলতর হইতে জটিলতম বিষয়ের আলোচনা করিবে; (৪) প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিচার্য্য বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ ও বিভাগ এমন সম্পূর্ণ ভাবে করিতে হইবে, যেন তাহার কোনও অংশ বর্জিত অথবা উপেক্ষিত না হয়।

উপরোক্ত নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া কোনও একটি নিশ্চিত সত্য পাওয়া যায় কি না, দে-কার্ত্ত তাহার অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলেন। এ পর্য্যন্ত দর্শন ও বিজ্ঞানে যে সমস্ত মত সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন না। দর্শনবিজ্ঞানের বাহিরে দৈনন্দিন জীবনেও যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তাহাও স্বীকার করিলেন না। প্রমাণ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্যতা স্বীকার করিতে তিনি অস্বীকার করিলেন।

দে-কার্ত্ত লিখিয়াছেন "এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু সর্ব্বাপেক্ষা সত্য এবং নিশ্চিত বলিয়া আমি গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হয় ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে অথবা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি, যে ইন্দ্রিয়গণ সময় সময় আমাদিগকে প্রতারিত করে। সুতরাং যাহাদ্বারা একবারও প্রতারিত হইয়াছি, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা নিরাপদ মনে করি নাই। এই জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এবং স্মৃতির মধ্যে বর্ত্তমান বিষয়, এমন কি গণিতের প্রমাণও অবিশ্বাস করিয়াছি। আমি ধরিয়া লইব, কোনও অসাধারণ শক্তিমান এবং প্রতারণাপরায়ণ দুষ্ট দৈত্য আমাকে প্রতারণা করিবার জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছে। আমি ধরিয়া লইব, যে আকাশ, বাতাস, পৃথিবী, বর্ণ, রূপ, শব্দ এবং যাবতীয় বাহ্য বস্তু স্বপ্নের মিথ্যা সৃষ্টি,

এবং উপরোক্ত দৈত্যই মায়াদ্বারা তাহাদের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছে। যাহা আমি দেখিতে পাইতেছি, সকলই মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া লইব। আমার স্মৃতিতে যে সকল বস্তু আছে, তাহাদের কখনও অস্তিত্ব ছিল না, ইহা আমি ধরিয়া লইব। আমি ধরিয়া লইব, আমার কোনও ইন্দ্রিয় নাই, এবং দেহ আকার, ব্যাপ্তি প্রভৃতি আমার মনের মিথ্যা কল্পনামাত্র। ইহার পরে কি অবশিষ্ট থাকে? যে "আমি" সকলের দ্বারা প্রতারিত হইতেছি, সেই "আমি" কি কিছুই নহি? আমার ভ্রান্ত উপলব্ধির মধ্যে কি আমার অস্তিত্ব নাই? আমি কি বলিতে পারি না, "আমি আছি, কেন না আমি প্রতারিত হইতেছি?" দুষ্ট দৈত্য যত পারে আমাকে প্রতারিত করুক; কিন্তু তাহার এমন সাধ্য নাই যে "আমি যে আছি", ইহার অন্যথাসাধন করে। উপরন্তু স্বীকার করিতে হইবে, যে "আমি আছি" এই বাক্যটি যতবারই আমাদ্বারা উচ্চারিত হয়, অথবা যতবারই ইহার ধারণা আমার মনে উদিত হয়, প্রত্যেকবারই তাহা সত্য। আমি কি, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি যে আছি—আমার অস্তিত্ব যে আছে—সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।" নানাবিধ সংবেদন ও চিন্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া দে-কার্ত্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন, দেহ ও মনের সমস্ত ধর্ম্মই দেহ ও মনঃ হইতে বিযুক্ত করিয়া চিন্তা করা সম্ভবপর, কিন্তু চিন্তাকে মন হইতে বিযুক্ত করা সম্ভবপর হয় না। সমস্ত বিষয়ই তিনি সন্দেহ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার নিজের অস্তিত্ব, যিনি চিন্তা করেন, তাহার অস্তিত্বে-সন্দেহ করা চলে না। সন্দেহ করা একপ্রকার চিন্তা। "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি[১]", ইহাই দর্শনের প্রথম সূত্র। সংবিদ এবং সত্য—বস্তু ও তাহার প্রত্যয়[২]—উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান, দে-কার্ত্তের মতে, তাহাই দর্শনের গোড়ার কথা, তাহা হইতেই দর্শনের যাত্রা সুরু। 'আমার' অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। এই নিশ্চিত জ্ঞান হইতে অন্য কোনও সত্যের আবিষ্কার করা যায় কিনা, এখন দেখিতে হইবে।

আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি (অহম্ অস্মি)। ইহা হইতে মানুষের স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যে আমি যাবতীয় বস্তু-সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করি, সেই "আমি" কে, ইহার অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে আমি আমার ব্যক্তিত্বের ধ্বংস না করিয়া, আমার যাহাকিছু আছে, সে সকল হইতেই বিচ্ছিন্ন করিয়া "আমি"র চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু 'চিন্তা'[৩] হইতে বিচ্ছিন্ন 'আমি' চিন্তা অসম্ভব। আমি মনে মনে ভাবিতে পারি, আমার হস্ত নাই, পদ নাই, কোনও ইন্দ্রিয়ই নাই, আমি দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত; কিন্তু আমার "চিন্তা" নাই—সংবিদ নাই—ইহা কল্পনা করা অসম্ভব! সুতরাং দেহের কোনও ধর্ম্মই "আমি"র মধ্যে নাই, ব্যাপ্তি নাই, রূপ নাই, দেহের কিছুই নাই, আছে কেবল চিন্তা। 'আমি' চৈতন্যস্বরূপ আত্মা—চিন্তাই আমার স্বরূপ। এই "আমি"র, অহং এর অথবা আত্মার কোনও চিত্র অঙ্কন করা সম্ভবপর নহে। ইহাকে জানা যায় কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা।

[১] Cogito ergo Sum [২] Idea [৩] Thought

"আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি", এ সম্বন্ধে আমার যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, ইহার কারণ কি? কোথা হইতে এই নিশ্চিতির উদ্ভব? কাহারও পক্ষে চিন্তা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে না থাকা[1] যে অসম্ভব, ইহার সুস্পষ্ট জ্ঞান হইতেই এই নিশ্চিতির উদ্ভব হয়। ইহা হইতে নিশ্চিত জ্ঞানের কষ্টি পাথর[2] কি, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যাহাই আমি সুস্পষ্ট সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি, "আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি", ইহারই মত অনিবার্য্যভাবে আমার প্রজ্ঞা[3] যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাই নিশ্চিত ভাবে সত্য।

এপর্য্যন্ত একটি নিশ্চিত সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে। নিশ্চিত সত্য চিনিবার কষ্টি পাথরও পাওয়া গিয়াছে। এই উভয়ের সাহায্যে অন্য কোনও নিশ্চিত সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, তাহার অনুসন্ধানে আমাদের সমস্ত চিন্তা ও প্রত্যয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। তাহাদের মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা, যাহার বিষয়গত সত্যতা আছে, অর্থাৎ বস্তুজগতেও যাহার অস্তিত্ব আছে,[4] ইহার অনুসন্ধান প্রয়োজন। আমাদের মনে যে সকল প্রত্যয় আছে তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি সহজাত[5], কতকগুলি বাহ্য পদার্থ হইতে প্রাপ্ত, এবং কতকগুলি আমাদের নিজেদের সৃষ্টি। যত প্রত্যয় আমাদের মনের মধ্যে আছে, তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রত্যয় বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখন প্রশ্ন এই, কোথা হইতে এই প্রত্যয় আমাদের মনের মধ্যে আসে? নিশ্চয়ই এই প্রত্যয়ের সৃষ্টি করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ঈশ্বরের প্রত্যয় এক পূর্ণও অনবদ্য পুরুষের প্রত্যয়। যিনি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, যাঁহার কোনও ত্রুটী নাই বলিয়া যিনি অনবদ্য, যিনি অসীম, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান, প্রত্যেক বিষয়েই যিনি পূর্ণ, ইহা তাঁহার প্রত্যয়। এই পূর্ণতার সহিত আমরা অপরিচিত, সুতরাং আমাদের পক্ষে এই প্রত্যয়গঠন করা অসম্ভব। একমাত্র পূর্ণ পুরুষই এই প্রত্যয় আমাদের মনের মধ্যে সংস্থাপিত করিতে পারেন, তাহা ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে আমাদের মনের মধ্যে এই প্রত্যয়ের প্রবেশ অসম্ভব। এই প্রত্যয়ের অস্তিত্ব হইতে সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি। পূর্ণতা যাঁহার স্বরূপ, এইরূপ পদার্থের যদি বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে আমার মনের মধ্যে তাঁহার প্রত্যয়েরও অস্তিত্ব সম্ভবপর না। পূর্ণতার প্রত্যয় আমার পক্ষে সৃষ্টি করা যখন অসম্ভব, অপূর্ণ কোনও বস্তুদ্বারাই তাহার সৃষ্টি যখন অসম্ভব, তখন ইহা যাহার প্রত্যয়, সেই পূর্ণ সত্তাকর্তৃকই কেবল ইহার সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং সেই পূর্ণ সত্তার অস্তিত্ব আছে। ঈশ্বরের গুণাবলী সম্বন্ধে যতই চিন্তা করা যায়, ততই বুঝিতে পারা যায়, তাহাদের প্রত্যয় আমাদের মনের সৃষ্টি হইতে পারে না। আমি নিজে একটি দ্রব্য বলিয়া দ্রব্যের প্রত্যয় আমার মনে আছে। কিন্তু আমি সসীম Substance, আমার মনে Substance-এর যে প্রত্যয় আছে, তাহা সসীম Substance-এর প্রত্যয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যয় অসীম Substance-এর প্রত্যয়। অসীম Substance

---

[1] Not to be [2] Criterion [3] Reason
[4] Objective truth [5] Innate

ভিন্ন সে প্রত্যয়ের সৃষ্টি কেহই করিতে পারে না। এই অসীমের ধারণা নিষেধবাচক[1] নহে। অন্ধকার যেমন আলোকের অভাবমাত্র, অসীম তদ্রূপ কোনও দ্রব্যের অভাবমাত্র নহে। বরং সসীম অপেক্ষা অসীমের বাস্তবতা বেশী। সুতরাং সসীমের প্রত্যয়ের পূর্ব্বেই অসীমের প্রত্যয়ের উদ্ভব হয় বলিতে হইবে।

কিন্তু ঈশ্বর হইতে তাঁহার প্রত্যয় আমাদের মনে আসিয়াছে কি প্রকারে? ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে আসে নাই, তাহা নিশ্চিত। কেননা ইন্দ্রিয় হইতে জাত প্রত্যয়, ইন্দ্রিয়ের উপর বাহ্য দ্রব্যের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয়। তাদৃশ কোন ক্রিয়া হইতে ঈশ্বরের প্রত্যয়ের যে উৎপত্তি হয় নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আমরা যে এ প্রত্যয় সৃষ্টি করি নাই, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কেননা এই প্রত্যয়ের সহিত কিছু সংযোগও যেমন আমরা করিতে পারি না, তেমনি ইহা হইতে কিছু বিয়োগও করিতে পারি না। তাহা হইলে, মনের বাহির হইতে এই প্রত্যয় যদি আমাদের মনে না আসিয়া থাকে, যদি আমরা নিজেরা ইহা সৃষ্টি না করিয়া থাকি, তাহা হইলে ইহাকে সহজাত বলিতে হইবে, আমার নিজের আত্মার প্রত্যয় যেমন সহজাত, তেমনি সহজাত।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে সকল প্রমাণ আছে, তাহার প্রথমটি এই :—ঈশ্বরের প্রত্যয় আমাদের মনের মধ্যে আমরা প্রাপ্ত হই। আমাদের মনের মধ্যে এই প্রত্যয়ের অস্তিত্বের নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। সেই কারণই ঈশ্বর। দ্বিতীয়তঃ আমাদের নিজেদের অপূর্ণতা, বিশেষতঃ সেই অপূর্ণতার জ্ঞান হইতেও, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। আমাদের কোনও বিষয়ে পূর্ণতা না থাকিলেও, নানাবিধ পূর্ণতার জ্ঞান আমাদের আছে। এই পূর্ণতা কোথায় অবস্থিত? আমাদের মধ্যে যখন নহে, তখন আমাদের অপেক্ষা পূর্ণতর এমন কোনও সত্তা নিশ্চয়ই আছে, যাহার উপর আমরা নির্ভরশীল, যাহার নিকট হইতে আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। তৃতীয়তঃ—"ঈশ্বরের প্রত্যয় হইতেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের মনের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন প্রত্যয়ের মধ্যে যে প্রত্যয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার পর্য্যবেক্ষণের সময়, অর্থাৎ পূর্ণতম পুরুষের প্রত্যয়ের পর্য্যবেক্ষণের সময়, দেখিতে পাই, যে অন্যান্য প্রত্যয়ের মত ইহার যে কেবল বাস্তব অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে, তাহা নহে (ঘটনাবিশেষের সমবায় ঘটিলে, অন্যান্য প্রত্যয়ের বাস্তব অস্তিত্ব সংঘটিত হয়, সমবায় না ঘটিলে হয় না)। কিন্তু ইহার অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব আছে। যত প্রকারের ত্রিভুজ হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকের কোণসমষ্টি যে দুই সমকোণের সমান, ত্রিভুজের প্রত্যয়ের মধ্যেই এই সত্যের মূল নিহিত আছে। তেমনি অবশ্যম্ভাবী[2] অস্তিত্বও পূর্ণতম সত্তার প্রত্যয়ের অন্তর্ভূত, এবং ইহা হইতে পূর্ণতম সত্তার বাস্তবিক অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারা যায়। অন্য কোনও প্রত্যয়েরই অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব নাই, কিন্তু এই পরমসত্তার প্রত্যয় হইতে অবশ্যম্ভাবী ও নিয়ত অস্তিত্ব অবিচ্ছেদ্য। আমাদের ভ্রান্ত সংস্কারের জন্য আমরা ইহা দেখিতে পাই না। অন্য যত পদার্থ আছে, তাহাদের বাস্তব অস্তিত্ব ও তাহাদের

[1] Negative [2] Necessary Existence

প্রত্যয়ের মধ্যে আমরা পার্থক্য করিতে অভ্যস্ত। আবার অনেক সময় কল্পনার সাহায্যে যে সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব নাই, তাহাদের কল্পনাও করি। এই জন্যই পরম পুরুষের প্রত্যয় কল্পিত প্রত্যয়সকলের একটি কি না, অথবা যে সকল প্রত্যয়ের অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব নাই, তাহাদের একটি কিনা, সে সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহের উদ্রেক হয়। দে-কার্ত্ত বলিয়াছেন, "ক্যাণ্টারবেরীর Anselmএর প্রমাণ হইতে আমার এই প্রমাণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। Anselmএর প্রমাণ এইরূপ: ঈশ্বর-শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে যাহাকে পূর্ণতম ভিন্ন অন্য কোনও রূপে চিন্তা করা যায় না, তাহাই ঈশ্বর। কিন্তু চিন্তায় অস্তিত্বের সহিত বাস্তব অস্তিত্ব থাকিলে, তাহা কেবল চিন্তায় নিবদ্ধ অস্তিত্ব অপেক্ষা পূর্ণতর হয়। সুতরাং ঈশ্বর যে কেবল চিন্তাতেই আছেন, তাহা নয়, তাঁহার বাস্তব অস্তিত্বও আছে। এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টতঃ দোষযুক্ত। ইহা হইতে যাহা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত, তাহা এই:—"ঈশ্বর বস্তুতঃ আছেন, এই ভাবে ভিন্ন তাঁহাকে চিন্তা করা যায় না।" কিন্তু ইহা হইতে তাঁহার অস্তিত্বের বাস্তবতা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া প্রমাণিত হয় না। আমার প্রমাণ এইরূপ:—কোনও বস্তুর সত্য এবং অপরিবর্ত্তনীয় প্রকৃতির অন্তর্ভূত বলিয়া যাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, যাহা কোনও বস্তুর সার ভাগ অথবা তাহার স্বরূপের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহা সেই বস্তুর আছে বলা যায়। ঈশ্বরের সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি, যে অস্তিত্ব তাঁহার সত্য এবং অপরিবর্ত্তনীয় প্রকৃতির ধর্ম্ম। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, ইহা বলা যুক্তিযুক্ত। পূর্ণতম সত্তার প্রত্যয়ের মধ্যে "অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব" আছে। এই অস্তিত্ব আমাদের বুদ্ধির অলীক কল্পনা নহে। অস্তিত্ব ঈশ্বরের সনাতন এবং অপরিবর্ত্তনীয় প্রকৃতির অন্তর্গত।"

ইহা ব্যতীত দে-কার্ত্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বের আরও একটি প্রমাণ দিয়াছেন। আমি আসিলাম কোথা হইতে? আমি আমাকে সৃষ্টি করি নাই। সে ক্ষমতা স্পষ্টতঃই আমার নাই। অন্য কোনও সসীম কারণ হইতেও আমার উদ্‌ভব হয় নাই। প্রত্যেক মুহূর্ত্ত হইতে পর মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার স্থায়িত্বেরই বা কারণ কি? কাল অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি; ইহার কোনও অংশের অস্তিত্ব অন্য কোনও অংশের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং গত মুহূর্ত্তে আমি ছিলাম, ইহা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে থাকিবার কোনও কারণ নহে। তবে এমন কোনও শক্তি যদি থাকে, যে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার ধ্বংস হইবামাত্র আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করিতেছে, তাহা হইলে আমার স্থায়িত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারে—অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বারাই কেবল স্থায়িত্ববিধান হইতে পারে। কিন্তু এ তর্ক তো ঈশ্বরের বেলাতেও উঠিতে পারে। চিন্তাই ঈশ্বরের স্বরূপ। কিন্তু চিন্তা করিতে সময়ের প্রয়োজন। সুতরাং ঈশ্বরও প্রত্যেক মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান। প্রত্যেক মুহূর্ত্তের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও তো বিনাশ হইবার কথা। তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করে কে? তিনি পূর্ণ, এবং পূর্ণতার অঙ্গ অস্তিত্ব, ইহাই যদি এই প্রশ্নের উত্তর হয়, তাহা হইলে আবার আনসেলমের যুক্তিতে ফিরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের নাশ হইবে কেন। যাহা সৎ তাহার বিনাশ হইতে পারে না। কাল যাহাই হউক, আত্মা সৎ পদার্থ; তাহার বিনাশ অসম্ভব।

ঈশ্বরের প্রত্যয়ের অস্তিত্ব হইতে দে-কার্ত্ত ঈশ্বরের নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব হইতে তিনি বাহ্য জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসও ফিরিয়া পাইয়াছেন। ঈশ্বরের যে প্রত্যয় আমাদের আছে, তাহাতে দেখিতে পাই, সত্যনিষ্ঠা ঈশ্বরের প্রকৃতির অন্তর্গত। এই জন্য তিনি আমাদিগকে প্রতারিত করিতে পারেন না, অথবা আমাদিগের ভ্রান্তির কারণও হইতে পারেন না। যদি মনে করা যায়, যে প্রতারণার সামর্থ্য না থাকিলে ঈশ্বরের পূর্ণতার হানি হয়; তাহা হইলেও প্রতারণা করিবার ইচ্ছা যে দুষ্প্রবৃত্তির লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের প্রজ্ঞা কোনও বস্তুকেই মিথ্যারূপে গ্রহণ করিতে পারে না। ঈশ্বর যদি আমাদিগকে এমন বিকৃত বিচারশক্তি দিতেন, যে মিথ্যাকে আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রতারক বলা যাইত। এইরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব হইতে সন্দেহের স্থলে নিশ্চিতির উদ্ভব হইল। যখন আমরা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাবে কোনও জ্ঞানের বিষয় অবগত হই, তখন সেই জ্ঞানকে নিশ্চিত জ্ঞান বলিতে কোনও বাধা নাই।

ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠা দ্বারা দে-কার্ত্ত বাহ্যজগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের দেহের ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত বস্তুর সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় তাঁহার মনের মধ্যে আছে বলিয়া তিনি তাহার বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় সকল সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি প্রত্যেকের মনের মধ্যে আছে। ইহা সম্ভবপর নয়, যে ঈশ্বর আমাদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য ঐ প্রবৃত্তি আমাদিগকে দিয়াছেন।

ঈশ্বরের সত্য প্রত্যয় হইতে দ্বিবিধ দ্রব্যের[1] অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। যাহার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না, তাহা Substance (সৎ বস্তু)। এই অর্থে ঈশ্বরই একমাত্র Substance। অসীম Substance রূপে ঈশ্বর নিজেই তাঁহার অস্তিত্বের কারণ। কিন্তু মননশীল Substanee এবং দেহধারী Substance (চিৎ ও জড় রূপ) অপরও দুইটী Substance-এর কথা দে-কার্ত্ত বলিয়াছেন। ইহারা ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট। ইহাদের অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের সহযোগিতা ভিন্ন অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই। এই দুই Substance-এর প্রত্যেকেরই নিজের এক একটি গুণ আছে, যাহা তাহার স্বরূপ। ইহাদের অন্যান্য ধর্ম্ম এই স্বরূপ হইতে উদ্ভূত। ব্যাপ্তি জড়ের গুণ ও স্বরূপ; চিন্তা আত্মার স্বরূপ। অন্য যাহা কিছু দেহসম্বন্ধে বলা যায়, তাহা ব্যাপ্তিরই প্রকারভেদ, এবং আত্মার মধ্যে চিন্তার অতিরিক্ত যাহা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চিন্তারই বিকার। চিন্তা যাহার অব্যবহিত ধর্ম্ম, তাহাকে বলে আত্মা (spirit)। ব্যাপ্তির অব্যবহিত আধারকে বলে জড়। চিন্তা এবং ব্যাপ্তি যে কেবল পরস্পর হইতে ভিন্ন, তাহা নহে, ইহারা পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত; ইহাদের মধ্যে সাধারণ কিছুই নাই।

চিৎ ও জড়ের মধ্যে এই বিরুদ্ধ সম্বন্ধ, জীবাত্মা ও দেহের মধ্যে বর্ত্তমান। জড়ের স্বরূপ ব্যাপ্তি, চিতের স্বরূপ চিন্তা। উভয়ের কোনও সাধারণ ধর্ম্ম না থাকায়, দেহ ও

---

[1] Substance

জীবাত্মার মধ্যে কোনও জীবন্ত সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব। উভয়ে একত্র অবস্থিতি করিলেও উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-সম্বন্ধ নাই। দেহ ঈশ্বরের সৃষ্ট স্বতশ্চালিত যন্ত্র। দেহের মধ্যে আত্মার বাস, নিবিড় ভাবে বাস হইলেও, তাহাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কোনও সম্বন্ধই নাই। উভয়ের সংযোগ স্বাভাবিক নহে। বলপ্রয়োগে উভয়ের সংযোগ সাধিত হইয়াছে। উভয়েই স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ[1]। উভয়ে পরস্পর হইতে কেবল যে ভিন্ন, তাহা নহে, তাহারা স্বরূপতঃ বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত। দেহের মধ্যে আত্মার প্রবেশে তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না। আত্মার প্রবেশের ফলে দেহের স্বাভাবিক সঞ্চালনের অতিরিক্ত সঞ্চালনের উদ্ভব হইতে পারে, কিন্তু দেহযন্ত্রের গঠনের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। দেহযন্ত্রের সহিত অন্যান্য যন্ত্রের পার্থক্য এই, যে ইহার মধ্যে জীবাত্মার অধিষ্ঠান আছে। ইতর জন্তুর মধ্যে স্ব-সংবিদ এবং চিন্তা নাই, এই জন্য অন্য যন্ত্রের সহিত তাহাদের পার্থক্য নাই। কিন্তু দেহ ও জীবাত্মা যদি পরস্পর-নিরপেক্ষ এবং বিরুদ্ধ-ধর্ম্মযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ সম্ভবপর হয় কিরূপে? বিনা বলপ্রয়োগে তাহাদের কোনও রূপ সংস্পর্শ সম্ভবপর নহে। বলপ্রয়োগেও একটিমাত্র বিন্দুতেই এই সংস্পর্শ সম্ভবপর হইতে পারে। দে-কার্ত্ত বলেন, মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত Pineal Gland-নামক গ্রন্থিই দেহ ও জীবাত্মার সংযোগস্থল। মস্তিষ্কের অন্যান্য সকল অংশই জোড়া জোড়া আছে, মস্তকের এক এক দিকে একটি। সমস্ত মস্তিষ্ক যদি জীবাত্মার অধিষ্ঠান-ভূমি হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক বস্তুর দ্বিবিধ জ্ঞান উৎপন্ন হইত। (এক এক অংশ হইতে এক একটি)।

ইতর জন্তুর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাদের স্নায়ু-যন্ত্র দ্বারা। স্নায়ু-যন্ত্রের উপর বাহ্য বস্তুর কার্য্যের ফলে যান্ত্রিক নিয়মানুসারেই এই গতি উৎপন্ন হয়। মানুষের দেহের উপর বাহ্য বস্তুর ক্রিয়ার ফলেও তাহার স্নায়ুযন্ত্রে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মানুষের সর্ব্ব শরীরে animal spirits নামে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা তাহাদের দ্বারা স্নায়ুপথে উপরোক্ত pineal glandএ নীত হয়, এবং pineal glandএ ইচ্ছাশক্তির প্রভাব এই সকল animal spiritsএ সংক্রামিত হইয়া দেহের পেশীতে বাহিত হয়। Pineal gland দ্বারাই দেহ ও মনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভবপর হয়।

কেহ কেহ "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি," ইহাকে চক্রক হেত্বাভাসমূলক উপপত্তি বলিয়াছেন।[2] আমি চিন্তা করি এই বাক্যে "আমি"র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া দে-কার্ত্ত তাহা আবার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি," ইহা যদি একটি Syllogism হয়, তাহা হইলে ইহার তিনটি বাক্য চাই:— (১) যাহারা চিন্তা করে, তাহাদের সকলেরই অস্তিত্ব আছে। (২) আমি চিন্তা করি; (৩) সুতরাং আমার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রথম বাক্যটি দে-কার্ত্ত কোথায় পাইলেন? ইহা তিনি প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। দ্বিতীয় বাক্যটিতেও তিনি

[1] Self-subsistent [2] Petitio Principi

"আমি"র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অথচ কিছুই তিনি স্বীকার করিয়া লইবেন না, বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে "আমি"র অস্তিত্বের জ্ঞান, স্ব-সংবিদের মধ্যেই নিহিত। প্রমাণান্তরের অপেক্ষা তাহার নাই। সেই স্বতঃস্ফুরিত জ্ঞান হইতেই দে-কার্ত্ত দর্শনের আরম্ভ করিয়াছেন। কোনও যুক্তি-বলে তিনি "আমি"র অস্তিত্ব-সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হন নাই। এই আত্মজ্ঞানই সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি। ইহাকে বর্জ্জন করিয়া কোনও জ্ঞানই সম্ভবপর নহে। Meditations গ্রন্থে দে-কার্ত্ত স্বীকার করিয়াছেন, যে চিন্তা ভিন্নও আত্ম-সংবিদের প্রতীতি[১], অনুভূতি, কামনা[২] ও ইচ্ছা ধর্ম্মও আছে। ইহারা যে চিন্তার বিভিন্ন রূপ, তাহাও নহে। চিন্তাদ্বারাই আমরা ইহাদের অস্তিত্ব অবগত হই, কিন্তু শুধু চিন্তার ধারণার জন্য ইহাদের কোনও প্রয়োজন হয় না। এই জন্য "চিন্তাকেই "আমি"র স্বরূপ বলিতে হয়।

"Cogito ergo Sum" এই উক্তিকে কেহ কেহ দর্শনের ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেগেল বলিয়াছেন, "এই উক্তিতে দর্শন তাহার প্রকৃত ভিত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে। কেননা স্বতঃ-নিশ্চিত চিন্তা হইতে চিন্তার যাত্রা আরব্ধ হয়, কোনও বাহ্য অথবা দত্ত বস্তু[৩] হইতে নহে, কোনও আপ্ত বাক্য[৪] হইতেও নহে। "আমি চিন্তা করি" এই বাক্যের মধ্যে যে স্বাধীনতা আছে, কেবল তাহা হইতেই তাহার যাত্রারম্ভ হয়। হেগেলের বাক্যের অর্থ এই, যে চিন্তাই[৫] সত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি, বস্তুজগৎ নহে। সুতরাং চিন্তা হইতে দর্শনের সূত্রপাত হওয়া উচিত; দে-কার্ত্তের দর্শনও চিন্তা হইতে শুরু হইয়াছে।

আত্ম-সংবিদ্‌কে দে-কার্ত্ত যাবতীয় জ্ঞানের উৎস এবং কষ্টিপাথর বলিয়াছেন। কিন্তু দে-কার্ত্তের মতে "আত্মসংবিদ" ব্যক্তিগত এবং কেবল বিষয়ীগত। এ অবস্থায় ইহাদ্বারা ব্যক্তিত্বের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া কিরূপে বাহ্য জগতে পৌছিতে পারা যায়, তাঁহা বোঝা যায় না। দে-কার্ত্ত আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে বিরাট ব্যবধান স্বীকার করিয়াছেন। এই ব্যবধান বিষয়ী মনের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভবপর নহে। চিন্তার প্রত্যেক কার্য্যে বিষয়ী ও বিষয়ের নিবিড় মিলনের দ্বারাই এই ব্যবধান অতিক্রম করা যায়। কিন্তু দে-কার্ত্ত যে আত্মসংবিদের সাহায্যে জ্ঞানের নিশ্চিতি আনিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে বাহ্য বিষয়ের স্থান নাই। তার পরে Cogito ergo sumএর মতো "সুস্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট ভাবে" যাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এখানে "সুস্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্টের" অর্থ কি, তাহাও স্পষ্ট নহে। ইহারা আপেক্ষিক শব্দ, সুস্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্টতার তারতম্য থাকিতে পারে।

দে-কার্ত্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা Anselmএর প্রমাণ হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন। কিন্তু উভয় প্রমাণই হেত্বাভাসযুক্ত[৬]। উভয় প্রমাণেই ঈশ্বরের প্রত্যয়ের অস্তিত্ব হইতে তাঁহার বাস্তব অস্তিত্ব অনুমিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বিনা প্রমাণে দেকার্ত্ত ধরিয়া লইয়াছেন, যে জীবাত্মা আপনাকে সসীম এবং অপূর্ণ বলিয়া জানে, এবং পূর্ণতা কি তাহাও অবগত আছে।

[1] Perception [2] Desire [3] Given
[4] Authority [5] Thought [6] Fallacious

ঈশ্বরের অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণে দেকার্ত্ত বলিয়াছেন পূর্ণতার প্রত্যয়ের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব আছে। ইহার উত্তরে ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, অস্তিত্ব কোনও দ্রব্যের গুণ নহে, যে ইহা কোনও দ্রব্যে আরোপ করিবে। অস্তিত্বদ্বারা কোনও উদ্দেশ্যের[১] গুণের বৃদ্ধি সাধিত হয় না। প্রাপ্ত একশত মুদ্রার সহিত প্রাপ্য একশত মুদ্রার গুণগত কোনও ভেদ নাই, যদিও দ্বিতীয়টি অস্তিত্ব হীন, প্রথমটির অস্তিত্ব আছে। দেকার্ত্তের প্রমাণদ্বারা পূর্ণতম পুরুষের প্রত্যয়ের অস্তিত্বের অতিরিক্ত কিছুই প্রমাণিত হয় নাই।

জড় ও চিতের দ্বৈতসমাধানে দেকার্ত্ত সমর্থ হন নাই। দেহ ও মনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অসন্তোষজনক। তাঁহার শিষ্যগণ যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা আলোচিত হইবে।

দেকার্ত্ত ব্যাপ্তিকে জড়ের স্বরূপ বলিয়াছেন। প্লেটো তাঁহার Timaeus গ্রন্থেও তাহাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু দেকার্ত্ত প্লেটোর নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করেন নাই।



১ Subject

তৃতীয় অধ্যায়

অদ্বৈত-প্রবণতা

জিউলিঁক্স্ এবং মালেব্রাঁ

জিউলিঁক্স্ লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। ১৬২৫ সালে তাঁহার জন্ম এবং ১৬৬৯ সালে মৃত্যু হয়। দেকার্তের দর্শনের আলোচনা করিয়া তিনি তাহাতে ত্রুটি দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেকার্ত দেহ ও মনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন নাই। জড় ও চিৎ সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী হইলেও, এবং উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অস্তিত্ব অসম্ভব হইলেও, আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা বাহ্য জগতের জ্ঞান প্রাপ্ত হই, এবং আমাদের ইচ্ছার বশে আমাদের দেহ, এবং দেহের মাধ্যমে বাহ্য দ্রব্যও চালিত হয়। ইহার ব্যাখ্যায় জিউলিক্স্ বলিয়াছেন, জীবাত্মা দেহের উপর কোনও কার্য্য করে না, দেহও মনের উপর কোনও কার্য্য করে না। যদি জীবাত্মা "সোজাসুজি" দেহের উপর কোনও কার্য্য করিত, তাহা হইলে আমরা তাহা জানিতে পারিতাম; ইচ্ছাশক্তি দেহে সংক্রামিত হইয়া দেহকে চালিত করে, তাহা জানিতে পারিতাম। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই আমাদের হয় না। আবার দেহ ও অব্যবহিত ভাবে জীবাত্মার উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তাহার উপর কোনও কার্য্য করিতে পারে না। কেননা জীবাত্মার স্বরূপ সম্পূর্ণ বিভিন্নজাতীয়, তাহার উপর জড়বস্তুর কোনও ক্রিয়া অসম্ভব। Pineal glandএর ভিতরকার animal spiritএর সাহায্যে অথবা অন্য কোনও প্রকারে জড় ও চিতের মধ্যে কোনও ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব। তাহা হইলে বাহ্য জগতের জ্ঞান আমরা লাভ করি কিরূপে? ইহার উত্তরে জিউলিক্স্ বলিয়াছেন, ঈশ্বরই আমাদিগকে বাহ্য জগতের জ্ঞান দান করেন। আবার আমাদের যখন কোনও ইচ্ছা হয়, তখন ঈশ্বরই আমাদের দেহকে "ইচ্ছা"-অনুযায়ী ভাবে চালিত করেন। আমাদের আত্মার সমস্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং আমাদের দেহের সমস্ত গতিবিধি ঈশ্বরই উৎপন্ন করেন। আমার ইচ্ছার "উপলক্ষে"[১] ঈশ্বর আমার দেহকে চালিত করেন, এবং আমার দেহের গতি উৎপন্ন হইলে তিনি আমার মনে তাহার প্রত্যয়ের সৃষ্টি করেন। একটি আর একটির উপলক্ষ মাত্র, কারণ নহে। এই মতকে এই জন্য উপলক্ষ-বাদ[২] বলে। মনঃ ও দেহের কার্য্য সমসাময়িক, কিন্তু পরস্পর নিরপেক্ষ। কিন্তু ঈশ্বর যে প্রতিক্ষণে প্রত্যেক জীবের মনে প্রত্যয় সৃষ্টি করিতেছেন, এবং প্রত্যেক দেহকে চালিত করিতেছেন, তাহা নহে। ঈশ্বর আমার দেহ এবং আমার আত্মা উভয়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনিই জড়ে গতিশক্তি দান করিয়াছেন, এবং এই গতির নিয়মও তিনিই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ফলে তাঁহারই

---

[1] Occasion [2] Occasionalism

নিয়মানুসারে জড়ের গতি পরিচালিত হয়। আমার মনঃ ও তাহার ইচ্ছাও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আমার আত্মা ও দেহকে সংযুক্ত করিয়াছেন। তিনি এমনভাবে ইহাদের সংযোগ-সাধন করিয়াছেন, যে উভয়ের কার্য্যের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল সম্ভবপর হয়। জড়ের গতি এবং মনের ইচ্ছা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ হইলেও, এমন ভাবেই দেহ ও আত্মাকে ঈশ্বর একত্র জুড়িয়া দিয়াছেন, যে যখনই "ইচ্ছা" দেহকে কোনও প্রকারে চালিত করিবার ইচ্ছা করে, দেহ তেমনি ভাবেই আপনা হইতেই চলে। আবার দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গণ যখন বাহ্য জগৎ হইতে আগত স্পন্দনের ফলে উত্তেজিত হয়, তখন মনেও তাহার অনুরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইহাতে দেহের উপরে মনের কোনও কার্য্য নাই, এবং মনের উপরও দেহের কোনও কার্য্য নাই। দুইটি ঘড়িতে ঠিক একই সময়ে ১২টা বাজে, কিন্তু তাহাদের এই মিল তাহাদের মধ্যে কোনও সংযোগের ফলে, একটির উপর অন্যটির কোনও প্রভাবের ফলে, উৎপন্ন হয় না। তাহাদের নির্ম্মাণকৌশলের ফলেই ঐ মিল সংসাধিত হয়। মানব-মনঃ ও মানব-দেহের নির্ম্মাণকৌশলের ফলেই উভয়ের মধ্যে এই ঐক্যের উদ্ভব হয়। দেকার্ত্ত বলিয়াছিলেন, বলপ্রয়োগে দেহ ও মনের একত্রাবস্থিতি সংঘটিত হইয়াছে। জিউলিঁক্স্এর মতে উভয়ের সংযোগ ঈশ্বরকৃত একটি অপ্রাকৃত ব্যাপার। দেহ ও আত্মার মধ্যে ঐক্যবিধায়ক কোনও অনুস্যূত[1] তত্ত্ব তাহাদের মধ্যে নাই যে তত্ত্বদ্বারা তাহাদের ঐক্য সাধিত হয়, তাহা দেহ ও আত্মার অতীত, এক অতিগ তত্ত্ব।[2]

জিউলিঁক্সের মতে মানুষের কোনও কর্তৃত্বই নাই। আমরা দ্রষ্টামাত্র। জীবাত্মার সমস্ত জ্ঞানের কর্ত্তাও যেমন ঈশ্বর, বাহ্য জগতের সমস্ত ক্রিয়ার কর্ত্তাও তেমনি তিনি। বিশ্বে তিনিই একমাত্র সক্রিয়শক্তি। মানবাত্মা ঈশ্বরের একপ্রকার রূপ[3] মাত্র। আমরা ঈশ্বরের কার্য্যের সাক্ষীমাত্র। তাঁহার ইচ্ছার নিকট আত্ম-সমর্পণই মানবের কর্ত্তব্য।

সংবিদ[4] কোনও শক্তি উৎপাদন করিতে পারে না, শক্তির সংক্রামণও করিতে পারে না। অনেক বড় বড় পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন। মানবসংবিদ যদি শক্তির উৎপাদনে অথবা সংক্রামণে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহাদ্বারা দেহ চালিত হইতে পারে না। এই মতের সহিত সক্রিয় ঈশ্বরে বিশ্বাসের সংযোগ হইতে জিউলিঁক্সের মতের উৎপত্তি।

জিউলিঁক্সের মতের সহিত মালেব্রাঁর মতের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। Nikolas Malebranche (১৬৩৮—১৭১৫) একজন ফরাসীদেশীয় ক্যাথলিক পুরোহিত ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি Oratory নামক যাজক-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন, এবং মৃত্যুপর্য্যন্ত ইহার সভ্য ছিলেন। ২৬ বৎসর বয়সে দে-কার্ত্তের Treatise on Man পাঠ করিয়া তিনি তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়েন, এবং দশ বৎসর ধরিয়া তিনি দে-কার্ত্তের দর্শন গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করেন। ১৬৭৪ সালে তিনি "On the investigation of Truth (সত্যের

[1] Immanent Principle [2] Transcendent Principle
[3] Form, [4] Consciousness.

অনুসন্ধান-সম্বন্ধে) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ইহার ফলে মালেব্রাঁর যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকখানি গ্রন্থও তিনি লিখিয়াছিলেন।

মালেব্রাঁ দে-কার্ত্তের মতকে সর্ব্বেশ্বরবাদের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছিলেন; আর একটু অগ্রসর হইলেই তিনি পূর্ণ সর্ব্বেশ্বরবাদে উপনীত হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ক্যাথলিক সংস্কার তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। দে-কার্ত্তের দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ-বর্ণনা হইতে মালেব্রাঁর দর্শনের আরম্ভ। দেহ ও আত্মা যখন সম্পূর্ণ বিভিন্নজাতীয় পদার্থ,তখন আত্মা কিরূপে বাহ্য জগতের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়? মালেব্রাঁ বলিলেন, বাহ্য জগতের যে জ্ঞান আমাদের আছে, তাহা প্রত্যয়ের আকারে বর্ত্তমান। এই প্রত্যয়ের আকারেই বাহ্য জগৎ আত্মার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সমর্থ। কোনও বস্তুই আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাকে চিরকালই আত্মার বাহিরে থাকিতে হইবে। তাহার প্রত্যয়ই আত্মায় প্রবেশ করিতে সমর্থ। বাহ্য বস্তুর প্রত্যয় সসীম জীবাত্মা নিজে সৃষ্টি করিতে অক্ষম। জীবাত্মা যে প্রত্যয় সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই। যাহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তাহার অস্তিত্ব ও জ্ঞান জীবাত্মার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। বস্তুর প্রত্যয় আমরা প্রাপ্ত হই, সৃষ্টি করি না। কিন্তু বাহ্যবস্তু হইতে তাহার প্রত্যয় প্রাপ্ত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বাহ্য দ্রব্যের "ছাপ" সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মী জীবাত্মার উপর পড়িবে, ইহা কল্পনা করা অসম্ভব। যদি তাহা সম্ভবপরও হইত, অসংখ্য বস্তুর ছাপ আত্মার উপর পড়িয়া পরস্পরকে বিকৃত এবং ধ্বংস করিত। সুতরাং আত্মা ও বাহ্যজগৎ উভয়ের অতীত কোনও বস্তু হইতে জীবাত্মা তাহার প্রত্যয় প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরই সেই বস্তু। অদ্বৈত ঈশ্বর যাবতীয় বস্তু ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার নিজের মধ্যে তিনি সমস্ত বস্তু দর্শন করিতেছেন; যাবতীয় বস্তুর প্রত্যয়ও তাঁহার মধ্যে অবস্থিত। তিনি সমগ্র জগতের সমস্ত বস্তুর প্রত্যয়ের আধার, তিনিই জগতের আত্মিক রূপ। তিনিই জীবাত্মা এবং জগতের মধ্যে মধ্যস্থরূপে বর্ত্তমান আছেন। আমরাও তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান, এবং তাঁহার মধ্যেই আমরা প্রত্যয়ের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হই। তিনিই জীবাত্মার নিবাসভূমি। আমাদের ইচ্ছা এবং আমাদের বস্তু-সম্বন্ধীয় অনুভূতি, তাঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হই। অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ পরস্পর বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র হইলেও তিনি উভয়কেই ধারণ করিয়া আছেন।

মালেব্রাঁ কেবল যে দেহ ও আত্মার মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অসম্ভব বলিয়াছিলেন, তাহা নহে। জড়ের কোনও অংশের সহিত অন্যান্য অংশেরও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁহার মতে অসম্ভব। আমাদের মনের মধ্যে যেমন আমরা ঈশ্বরের প্রত্যয় দেখিতে পাই, তেমনি "ব্যাপ্তির" প্রত্যয়ও পাই। এই ব্যাপ্তির প্রত্যয়কে মালেব্রাঁ "বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপ্তি" বলিয়াছেন। এই নাম তিনি Plotinusএর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বাহ্য জগতের আদিম রূপ এই ব্যাপ্তি। "ব্যাপ্তির" মতো অন্যান্য পদার্থের প্রত্যয়ও ঈশ্বরের মধ্যে বর্ত্তমান। ঈশ্বরের মধ্যেই আমরা তাহাদিগকে দর্শন করি।

চতুর্থ অধ্যায়

সর্ব্বেশ্বরবাদ

স্পিনোজা

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে স্পিনোজার আসন অতি উচ্চ। তাঁহার চিন্তার গভীরতা ও চরিত্রের মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠতম গ্রীক দার্শনিকদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যে সকল গুণ লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করে, সে সকল গুণেই তিনি অলংকৃত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অত্যুন্নত নৈতিক চরিত্রের মর্য্যাদা তিনি জীবিত-কালে প্রাপ্ত হন নাই। ঈশ্বরচিন্তা তাঁহার সমগ্র দর্শনে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও, খৃষ্টীয় জগৎ তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া ঘৃণ্য করিত। স্ব-সমাজেও তিনি অপাংক্তেয় ছিলেন।



স্পিনোজা

স্পিনোজার জন্ম হইয়াছিল ইহুদী বংশে। আশ্চর্য্য জাতি এই ইহুদীরা। তিন সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ যে ভীষণ অত্যাচার এই জাতির উপর অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না। কিন্তু কিছুতেই ইহার প্রাণশক্তির নাশ করিতে পারে নাই। আড়াই শত বৎসর মিশর দেশে অমানুষিক উৎপীড়নের মধ্যে বাস কবিয়াও ইহুদীরা জাতীয় বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দেয় নাই। বেবিলনে বন্দিত্ব তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিতে পারে নাই, জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। এন্টিয়োকাসের নিষ্ঠুর পীড়নেও তাহারা জাতীয় ধর্ম্ম ও আচার বর্জ্জন করে নাই। ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমকর্ত্তৃক জেরুজালেম বিজিত হইবার পরে, স্বদেশ হইতে

নির্ব্বাসিত হইয়া তাহারা নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিদেশে বিজাতীয় লোকের মধ্যে বাসের ফলে তাহারা জাতীয় ভাষা ভুলিয়া গিয়াছিল। খৃষ্টানধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম তাহাদের ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইলেও খৃষ্টান ও মুসলমান দেশে তাহাদের উপর উৎপীড়নের সীমা ছিল না। সর্ব্বত্রই তাহাদের জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। ইয়োরোপের কোনও দেশেই তাহাদের সম্পত্তিক্রয়ের অধিকার ছিল না। কোনও শিল্প অবলম্বন করিয়া জীবিকা-উপার্জ্জন করিতেও তাহারা পারিত না। প্রত্যেক নগরে নির্দিষ্ট পল্লীতে ভিন্ন তাহাদিগকে অন্যত্র বাস করিতে দেওয়া হইত না। রাজারা তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিত; সাধারণ লোকে তাহাদিগকে দলে দলে হত্যা করিত। আপনাদের অর্থ ও বাণিজ্যদ্বারা বড় বড় নগরের প্রতিষ্ঠা করিলেও সর্ব্বদাই তাহারা অপমানিত ও রাষ্ট্রীয় সর্ব্ববিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অথবা জাতীয় সংহতি-সাধক কিছুই তাহাদের ছিল না। তবুও ছিন্ন ভিন্ন, অত্যাচার-পীড়িত ও লাঞ্ছিত এই জাতি তাহার একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, আপনাদের ধর্ম্ম ও আচার রক্ষা করিয়াছে, বিজ্ঞান ও দর্শনে প্রভূত দান করিয়াছে; এবং প্রায় দুই সহস্র বৎসর পরে স্বদেশে স্বকীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

জেরুজালেমের পতনের বহু পূর্ব্বেই ইহুদীরা নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। টায়ার ও সিডনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ বহুদিন হইতেই তাহাদের ছিল। এথেন্স, এন্টিয়ক্, কার্থেজ, আলেকজান্দ্রিয়া, রোম, মার্সাই ও স্পেনেও তাহাদের উপনিবেশ ছিল। জেরুজালেমের মন্দিরধ্বংসের পরে দলে দলে দেশ ত্যাগ করিয়া তাহারা নানা দেশে গিয়াছিল। পূর্ব্বদিকে দানিয়ুব ও রাইন নদের প্রবাহের অনুসরণ করিয়া পোল্যাণ্ডে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং পশ্চিমদিকে স্পেন ও পর্ত্তুগালে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। মধ্য ইয়োরোপে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে তাহারা প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া খৃষ্টান-দিগের ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইত। কোনও কোনও লেখক স্পেন দেশকে "ইহুদীদিগের স্বর্গ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা অত্যুক্তি-রঞ্জিত হইলেও স্পেনের অন্তর্গত গ্রানাডা রাজ্য সম্বন্ধে অনেকটা সত্য। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেন মুসলমানদিগের অধিকার-ভুক্ত ছিল। মুসলমান রাজ্য গ্রানাডায় ইহুদীদিগের জীবন ও সম্পত্তি বহুল পরিমাণে নিরাপদ ছিল। গ্রানাডার দৃষ্টান্ত স্পেন ও পর্তুগালের সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে অনুসৃত হওয়ার ফলে, তথায় ইহুদীগণ অপেক্ষাকৃত শান্তিতে বাস করিত পারিয়াছিল। মোল্লাদিগের বিদ্বেষ, উৎপীড়ন ও অবহেলার যে অভাব ছিল, তাহা নহে। অভাবগ্রস্ত রাজা ওমরাহদিগের স্বকীয় স্বার্থেই ইহুদীদিগকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল। সেই জন্যই তাহারা তাহাদিগের জীবন ও সম্পত্তি-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অর্থের প্রয়োজন হইলে, ইহুদী বণিকেরা তাহাদিগের অভাব মোচন করিত। সেইজন্যই ইহুদীদিগের অর্থ তাহারা লুণ্ঠিত হইতে দেন নাই। লায়ন ও ক্যাষ্টিলের শাসনকর্ত্তা ও ধনিকদিগের ধনভাণ্ডার ইহুদী বণিকদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইহুদী চিকিৎসকদিগকে তাঁহারা চিকিৎসার জন্য আহ্বান করিতেন। মোল্লাদিগের আপত্তি থাকার জন্য তাঁহারা চাতুরী অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং বিধর্ম্মী ইহুদীদিগকে রাষ্ট্রের প্রজা বলিয়া গণ্য না করিয়া আপনাদিগের দাস বলিয়া ঘোষণা

করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগের রক্ষার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই তথাকথিত দাসত্বের জন্যই হউক, অথবা প্রকৃত স্বাধীনতা-ভোগের জন্যই হউক, ইহুদীগণ স্পেন ও পর্তুগালে যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত যেমন তাহাদের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তেমনি তাহাদের সংস্কৃতিরও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। আরবীয় গণিত, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া, তাহারা Cordova, Barcelona ও Seville এ যে সকল বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা হইতে ইহুদী প্রতিভা ও সংস্কৃতির জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রাচীন প্রাচ্যবিদ্যার প্রচারে তাহারা বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে Cordovaর Moses Maimonides তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন, এবং Guide to the Perplexed নামক বাইবেলের বিখ্যাত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে Hasdai Crescas যে সকল ইহুদী-ধর্ম্ম-বিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত ইহুদী জগৎ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ফার্ডিনাণ্ডকর্ত্তৃক গ্রানাডা-বিজয় ও মুরদিগের বহিষ্করণ পর্য্যন্ত স্পেন ও পর্তুগালের ইহুদীদিগের অবস্থা ভালই ছিল। ইহার পরে তাহাদের উপর ভীষণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। খৃষ্টান শাসনের অধীন হইয়া তাহারা ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইল, এবং খৃষ্ট-ধর্ম্ম-গ্রহণ এবং নির্বাসন, এই দুইটির মধ্যে একটি তাহাদের বাছিয়া লইতে হইল। এই আদেশ সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য Inquisition নামক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। খৃষ্টীয় সংঘ[1] এই উৎপীড়নের সমর্থন করে নাই। পোপ ইহার বিরুদ্ধে বারংবার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহুদীদিগের সম্পত্তির উপর লোভ থাকায় ফার্ডিনাণ্ড তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অধিকাংশ ইহুদীই ধর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা দেশত্যাগ বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিল, এবং দেশান্তরে আশ্রয়ের অনুসন্ধানে নানা দিকে ধাবিত হইয়াছিল। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? এক দল জাহাজে চড়িয়া ইতালীর নানা বন্দরে উপস্থিত হইল, কিন্তু কোথায়ও আশ্রয় না পাইয়া, অবশেষে আফ্রিকায় গমন করিল। সেখানে আফ্রিকাবাসিগণ অর্থলোভে তাহাদের অনেককে হত্যা করিল। কেহ কেহ ভেনিসে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। অনেকে অর্থ সাহায্য করিয়া কলম্বাসকে সমুদ্রপারে নূতন-দেশ-আবিষ্কারের জন্য পাঠাইল। যাহারা দেশে থাকিয়া গেল, তাহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও এই "নবখৃষ্টানগণ" অন্তরে ইহুদীই রহিয়া গেল, এবং সুযোগ পাইলেই তাহারা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই সকল "নবখৃষ্টান"দিগের অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ইয়োরোপে স্পেনের ক্ষমতা তখন ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই Inquisition প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং Inquisitionএর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়বিচার ও করুণা অন্তর্ধান করিয়াছিল। ইটালির যে যে প্রদেশে পূর্ব্বে ইহুদীরা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেখানে যাওয়া এখন নিরাপদ ছিল না। তিনশত বৎসর পূর্ব্বেই ইংলণ্ডবাসী যাবতীয় ইহুদী

[1] Church.

নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। সেখানে নূতন আশ্রয় মিলিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সঙ্কটকালে স্পেনের সাম্রাজ্যভুক্ত এক দেশ হইতেই মুক্তি আসিল। নেদারল্যাণ্ড স্পেনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা উড্ডীন করিয়' স্বাধীনতা অর্জ্জন করিল, এবং নেদারল্যাণ্ডেই স্পেন ও পর্তুগালের উৎপীড়িত "নবখৃষ্টানগণ" আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা আমস্টার্ডাম নগরে প্রথম উপস্থিত হয়। উদারমতাবলম্বী হল্যাণ্ডবাসিগণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে আপত্তি করে নাই। পরে আরও অনেকদল আসিয়া তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। বহু কষ্টভোগের পর এই দেশে ইহুদীগণ শান্তিতে বাস করিতে পারিয়াছিল। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে আমস্টার্ডাম নগরে ইহারা প্রথম উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করে। দ্বিতীয় মন্দির নির্ম্মাণকালে তাহাদের খৃষ্টীয় প্রতিবেশিগণ অর্থসাহায্য করিয়াছিল। হল্যাণ্ডবাসী ইহুদীদিগের মধ্যে Espinoza নামে এক পরিবার ছিল। নাম হইতে স্পেন দেশের সঙ্গে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুমিত হয়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, পর্তুগাল হইতে ইঁহারা আসিয়াছিলেন। এই বংশে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে Baruch de Espinozaর জন্ম হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হল্যাণ্ডবাসী ইহুদীদিগের মধ্যে গৃহকলহ উপস্থিত হয়। Uriel-da-Costa নামে এক ইহুদী রেনাসাঁর সন্দেহবাদ-কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া পরলোকে বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাচীন ইহুদীদিগের মধ্যে পরলোকে বিশ্বাস ছিল না, এবং Uriel এর গ্রন্থও যে ইহুদীধর্ম্মের বিরোধী ছিল, তাহাও নহে। কিন্তু পরলোকে বিশ্বাস খৃষ্টধর্ম্মের ভিত্তি। যাহারা ইহুদীদিগকে স্বদেশে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিতে পারে, এই আশঙ্কায় ইহুদীসংঘ এই গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন, এবং গ্রন্থপ্রকাশের জন্য গ্রন্থকারকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য করেন। প্রায়শ্চিত্তের জন্য গ্রন্থকারকে মন্দিরের দ্বারদেশে শয়ন করিয়া থাকিতে হইয়াছিল, এবং সংঘের সকল সভ্য তাহার শরীরের উপর দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অসহ্য অপমানে মর্ম্মপীড়িত Uriel তাঁহার উৎপীড়কদিগকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়া রাখিয়া আত্মহত্যা করেন। এই সময়ে Baruch Espinozaর বয়স আট বৎসর। তখন তিনি Synagogue এর বিদ্যালয়ের প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন। এই বিদ্যালয়েই ইহুদীধর্ম্ম ও ইতিহাস-সম্বন্ধে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার পিতা একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বণিক ছিলেন। কিন্তু বাণিজ্য-ব্যবসায়ের দিকে স্পিনোজার কোনও আকর্ষণ ছিল না। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন এই বালকের প্রতিভাদর্শনে ইহুদী-প্রধানগণ বিশেষ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে ইহুদী সমাজ ও ধর্ম্মসংঘের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের উপযুক্ত মনে করিয়া সোৎসুক হৃদয়ে তাঁহার প্রতিভার সম্যক বিকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। বাইবেল শেষ করিয়া স্পিনোজা তালমডের ভাষ্য পাঠ করিলেন। তাহার পরে Maimonides, Levi Ben Gerson, Ibn Ezra এবং Hasda Crescas এর গ্রন্থাবলী শেষ করিয়া Ibn Gabirol এবং Moses of Cordova-রচিত গুহ্যতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থসকলও পড়িয়া ফেলিলেন।

Moses of Cordovaর মতে বিশ্ব ঈশ্বরের মূর্ত্তি, ঈশ্বর ও বিশ্ব অভিন্ন। Ben Gerson

কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল (যেমন বাইবেলে আছে) বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি জগতকে অনাদি ও সনাতন বলিয়াছিলেন। Hasdai Crescas এর মতে এই জড় জগৎ ঈশ্বরের দেহ। Maimonides এর গ্রন্থে জীবাত্মার অমরতা-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। Averroes এই অমরতাকে ব্যক্তিত্বহীন অমরতা বলিয়াছিলেন। Maimonidesএর গ্রন্থে এই মতের আংশিক সমর্থন ছিল। এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্পিনোজার মনে বহু প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। Maimonides এর Guide to the Perplexed গ্রন্থে স্পিনোজা সে সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রাপ্ত হন নাই। Ibn Ezra অনেক সমস্যার সমাধান অসম্ভব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ স্পিনোজা যতই পাঠ করিতে লাগিলেন, ততই প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল।

ইহার পর Van-den-Enden নামক এক পণ্ডিতের নিকট স্পিনোজা লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। Van-den চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্বেও পারদর্শী ছিলেন। প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না; সকল ধর্ম্মের ও শাসন-প্রণালীরই তিনি সমালোচনা করিতেন। ১৬৭৪ সালে ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুইএর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। লোকে বলিত, তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে লাটিন ভাষার সঙ্গে "স্বাধীন-চিন্তা" শিক্ষা দিতেন। স্পিনোজা যে ইহার নিকট লাটিনের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্বে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। স্পিনোজার রচনায় এই দুই শাস্ত্রে তাঁহার যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে অন্য কাহারও নিকট হইতে লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। স্পিনোজার লাটিন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী হইতে তিনি যে এই ভাষা উত্তমরূপেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ থাকে না। গ্রীক ভাষাও তিনি মোটামুটি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত স্পেনিশ, পর্ত্তুগীজ, ইটালিয়্যান, ফরাসী এবং সম্ভবতঃ জার্ম্মান ভাষাও তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ভ্যান্‌ডেনের নিকট শিক্ষালাভের সময়েই সম্ভবতঃ Giordano Bruno ও দে-কার্ত্তের দর্শনের সহিত স্পিনোজা পরিচিত হন। ব্রুণোর মত খৃষ্টান ও ইহুদী উভয় সমাজেই ঘৃণিত ছিল, এবং তাঁহার গ্রন্থ স্পিনোজার হস্তগত হইবার সম্ভাবনা বেশী ছিল না। এই জন্য কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, যে ভ্যান্‌ডেনের নিকট হইতেই স্পিনোজা ব্রুণোর দর্শনের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। যাবতীয় পদার্থ একমাত্র কারণ হইতে উৎপন্ন, সেই কারণই ঈশ্বর, সমস্ত বিশ্ব এক; জড় ও চৈতন্য অভিন্ন, জগতের প্রত্যেক দ্রব্য জড় ও চৈতন্য উভয়রূপী; এবং দর্শনের উদ্দেশ্য বহুর মধ্যে এককে দর্শন করা, জড়ের মধ্যে চৈতন্য এবং চৈতন্যের মধ্যে জড়কে দেখা, যে সমন্বয়ের মধ্যে দৃশ্যমান যাবতীয় বিরোধের অবসান হয়, তাহার সন্ধান করা, এবং জ্ঞানের যে সর্ব্বোচ্চ শিখর হইতে সমগ্র বিশ্ব এক অবিভক্ত সত্তারূপে প্রতীত হয়, তাঁহাতে আরোহণ করা; ইহাই ছিল ব্রুণোর মত। এই ঐক্যজ্ঞান যে ঈশ্বরে প্রীতি হইতে অভিন্ন, ইহা যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঈশ্বরভক্তিরই রূপান্তর,

তাহাও তিনি বলিয়াছিলেন। সত্যধর্ম্মবিরোধী এই দুষ্টমত-প্রচারের পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্যই রক্তপাতে অনিচ্ছুক Inquisition তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ব্রুণোর এই সকল মতের প্রত্যেকটিই স্পিনোজার দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহা হইতে তাঁহার দর্শনের সহিত স্পিনোজার যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

ইহার পরে স্পিনোজা প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও মধ্যযুগের দর্শনের পরিচয় লাভ করেন। সক্রেটিস, প্লেটো ও আরিস্টটল, ডেমোক্রিটাস, এপিকিউরাস, লিউক্রেসিয়াস ও স্টোয়িক দর্শন তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। প্লেটো ও আরিস্টটল অপেক্ষা পরমাণুবাদী ডেমোক্রিটাস্ ও লিউক্রেসিয়াস ও এপিকিউরাসের মত তাঁহার অধিকতর মনোমত হইয়াছিল। স্টোয়িক দর্শন তাঁহার সম্পূর্ণ মনোমত না হইলেও তাহাদ্বারা তিনি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মধ্যযুগের দর্শন হইতে পারিভাষিক শব্দ ব্যতীত তাহার ব্যাখ্যা-প্রণালী—সংজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধ, প্রতিজ্ঞা, প্রমাণ, অনুসিদ্ধান্ত প্রভৃতিসহযোগে সিদ্ধান্তের প্রমাণ-প্রণালী—গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেকার্ত্তের গ্রন্থাবলী তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং তাহার দর্শনের উপর স্বীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ভ্যানডেনের এক বিদুষী কন্যা অধ্যাপনাকার্য্যে তাঁহার সহকারিণী ছিলেন। স্পিনোজা তাঁহার নিকট ল্যাটিনের পাঠ গ্রহণ করিতেন। এই সুন্দরী যুবতীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে স্পিনোজার মনে তাহার প্রতি গাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু এই অনুরাগ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। স্পিনোজার প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়া সুন্দরী তাঁহা অপেক্ষা অবস্থাপন্ন এক যুবককে পতিত্বে বরণ করেন। ইহার পরে স্পিনোজা একান্তভাবে দার্শনিক আলোচনায় নিবিষ্ট হন।

এইরূপে স্পিনোজার জীবনের প্রথম ২৩ বৎসর অতিবাহিত হয়। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন দুঃখের সহিত সংগ্রামের ইতিহাস। এই দুঃখের মধ্যে তিনি জগৎকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবিনশ্বর। চিরকাল তাহা মানবের বুদ্ধি ও কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

বহু অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তার ফলে প্রচলিত ধর্ম্মে স্পিনোজার বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছিল। সমাজপতিগণ ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁহার উৎসাহের অভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেন। ক্রমে এই সকল ব্যাপারে তাঁহার ঔদাসীন্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। কথিত আছে, এক দিন দুইজন ছাত্র স্পিনোজার নিকট গিয়া ধর্ম্ম-তত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহাকে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করে। স্পিনোজা মোজেজ ও পয়গম্বরদিগকে প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিলে, একজন ছাত্র বলে "ঈশ্বরের শরীর নাই, জীবাত্মা অমর, এবং দেবদূতগণ যে বাস্তব পুরুষ, এ রকম কোনও কথাই তাঁহাদের উপদেশের মধ্যে দেখিতে পাইনা। এ সকল বিষয়ে আপনার মত কি?" স্পিনোজা বলেন, ঈশ্বরের শরীর আছে, এবং দেবদূতগণ বিশেষ বিশেষ কার্য্যসম্পাদনের জন্য সৃষ্ট ছায়ামাত্র, একথা বলিলে শাস্ত্রবিরোধী কিছু বলা হয় বলিয়া আমি মনে করি না। শাস্ত্রে আত্মা ও প্রাণ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।" স্পিনোজার এই সকল মত ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের কর্ণগত হওয়ার ফলে তাঁহারা যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্যত হইলেন।

তাঁহারা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই জড়জগৎ ঈশ্বরের দেহ", "দেবদূতগণ কল্পনামাত্র," "আত্মা ও প্রাণের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই", "জীবাত্মার অমরত্ব-সম্বন্ধে প্রাচীন বাইবেলে কিছুই নাই" প্রভৃতি মত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন কি না। উত্তরে স্পিনোজা কি বলিয়াছিলেন, জানা যায় নাই, কিন্তু তাঁহার বিপদজনক মত-সম্বন্ধে সমাজপতিগণের সন্দেহ যে দূরীভূত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্পিনোজার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা-অবলম্বনের পূর্ব্বে, তাঁহারা উৎকোচদ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন, এবং তিনি যদি বাহ্যতঃ ইহুদী আচার পালন করেন এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধমতপ্রচারে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বাৎসরিক ৪০০ ডলারের এক বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হন। স্পিনোজা সম্মত না হওয়ায় ১৬৫৬ সালের ২৭শে জুলাই তারিখে আমস্টার্ডামের ইহুদী সংঘের[১] বিশেষ অধিবেশনে তিনি অভিশপ্ত ও সংঘ হইতে বহিষ্কৃত হন। এই অভিশাপ ও বহিষ্কারের আদেশ শাস্ত্রীয় ক্রিয়া সহ প্রচারিত হইয়াছিল। মন্দিরে সমবেত সভ্যমণ্ডলীর সম্মুখে আদেশ পঠিত হইবার সময় করুণ সুরে সিঙ্গা বাজিয়াছিল, এক এক করিয়া মন্দিরের বাতি নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং পাঠান্তে অভিশপ্তের আধ্যাত্মিক মৃত্যুর প্রতীক-স্বরূপে উপাসনা-গৃহ গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল। সেই দণ্ডাদেশ এই :—

"পুরোহিত সভার অধ্যক্ষগণ এতদ্বারা অবগত করাইতেছেন, যে Baruch de Espinozaর দুষ্ট মত ও কার্য্যাবলীর বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহারা তাহাকে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে নানা ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মত পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হন নাই। পরন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই তাহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ মতের ও সেই মতপ্রচারে দাম্ভিকতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বিশ্বাসযোগ্য অনেক লোক তাহার সম্মুখেই সাক্ষ্য দিয়াছেন। সেই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া স্পিনোজাকে দোষী স্থির করা হইয়াছে। সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া পুরোহিত সভার অধ্যক্ষগণ উক্ত স্পিনোজাকে অভিশপ্ত ও ইজরেল জাতি হইতে বহিষ্কৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার উপর নিম্নোক্ত অভিশাপ বর্ষিত হইল :—

"পবিত্র সমাজের সকলের মত লইয়া, ষোড়শ শত ত্রয়োদশ নিবন্ধ-সমন্বিত পবিত্র গ্রন্থাবলীর সম্মুখে দেবদূতগণের বিচার ও সন্তগণের দণ্ডাদেশ-অনুসারে এলিসা শিশুদিগকে যে অভিশাপ দিয়াছিলেন, এবং Book of Law এর মধ্যে যে সকল অভিশাপ লিপিবদ্ধ আছে, আমরা নিরতিশয় ঘৃণার সহিত Baruch de Espinoza কে সেই সকল অভিশাপে অভিশপ্ত করিতেছি।

"দিবাভাগে সে অভিশপ্ত হউক, রাত্রিকালে সে অভিশপ্ত হউক, শয়নে অভিশপ্ত হউক, শয্যাত্যাগে অভিশপ্ত হউক, বহির্গমনে অভিশপ্ত হউক, গৃহপ্রবেশে অভিশপ্ত হউক। ঈশ্বর যেন কখনও তাহাকে ক্ষমা না করেন, কখনও তাহাকে গ্রহণ না করেন; ঈশ্বরের ক্রোধ ও বিরাগ যেন এই লোককে দগ্ধ করে, Book of Law এর মধ্যে যে অভিশাপ লিখিত আছে,

[১] Synagogue

তাহার ভারে তাহাকে পীড়িত করে ; জগৎ হইতে যেন তাহার নাম বিলুপ্ত করিয়া ফেলে। ঈশ্বর যেন ইজ্‌রেলের যাবতীয় গোষ্ঠী হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করেন।

"সকলকে এতদ্বারা সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে, যে কেহ যেন তাহার সহিত বাক্যালাপ না করে, তাহার সহিত পত্রব্যবহার না করে, কেহ যেন তাহার কোনও কাজ করিয়া না দেয়, তাহার সহিত একগৃহে বাস না করে, অথবা তাহার চারি হাতের মধ্যে না যায়, কেহ যেন তাহার স্বহস্ত-লিখিত অথবা তাহার কথানুসারে অন্যকর্তৃক লিখিত কোনও লিখন পাঠ না করে।"

এই ভীষণ অভিশাপ পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। যাহারা উৎপীড়িত, তাহারা যখন উৎপীড়ন হইতে মুক্ত হয়, তখন অন্যায় পীড়ন করিবার দিকে তাহাদের একটা প্রবণতা দেখা যায় সত্য; কিন্তু ইহুদী সমাজপতিদিগের পক্ষে যে কোন যুক্তি ছিলনা, তাহা বলা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ সমাজেরই Da Costa খৃষ্টধর্ম্মের মৌলিক বিশ্বাস আক্রমণ করিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহার পরে স্পিনোজা যে মত প্রচার করিতেছিলেন, তাহা যে কেবল ইহুদী ধর্ম্মের বিরোধী ছিল, তাহা নয়, খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধীও বটে। যে হল্যাণ্ডবাসিগণ নির্বাসিত ইহুদীদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের আতিথ্যের এবংবিধ প্রতিদান নিতান্ত অকৃতজ্ঞতাসূচক বলিয়া সমাজপতিগণ মনে করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ইহুদী সমাজের সংহতি-রক্ষার জন্যও ইহুদী-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মতের প্রচার বন্ধ করার প্রয়োজন ছিল। তাহাদের নিজেদের রাষ্ট্র ছিল না, কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না, একমাত্র ধর্ম্মদ্বারাই এতদিন তাহাদের সংহতি রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। সেই ধর্ম্মকে আক্রমণ করা সমাজদ্রোহিতা ও তাহার গুরুতর শাস্তি সমাজস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

স্পিনোজা কিন্তু অবিচলিত রহিলেন। অভিশাপের ফলে বন্ধুবান্ধবের সহিত তাঁহার সমস্ত সম্পর্কের অবসান হইল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বর্জন করিতে বাধ্য হইলেন। পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিলেন। বিচারালয়ে জয়লাভ করিয়াও স্পিনোজা সে সম্পত্তি গ্রহণ করিলেন না, ভগিনীকে দান করিলেন। স্ব-সমাজকর্তৃক এইরূপ উৎপীড়িত হইয়া অন্য কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু স্পিনোজা অন্য কোনও সমাজে মিশিতে চেষ্টা করিলেন না; একাকী নিঃসঙ্গ জীবন বহন করিয়া চলিলেন। এমন নিঃসঙ্গ জীবন বুঝি আর কাহাকেও বহন করিতে হয় নাই। স্পিনোজার রচনায় রসের যে ঐকান্তিক অভাব, এইজন্যই তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যথা তাঁহার রচনার দুই এক স্থলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার Ethicsএর এক স্থলে আছে, "যাঁহারা (তথাকথিত) অপ্রাকৃত ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিতে উৎসুক, এবং প্রাকৃতিক ঘটনার দিকে মূর্খের মত অবাক হইয়া তাকাইয়া না থাকিয়া, পণ্ডিতের মত বুঝিতে অভিলাষী, তাঁহারা ভক্তিহীন ও বিধর্ম্মী বলিয়া পরিগণিত হন, এবং জনতা যাহাদিগকে দেবতা ও প্রকৃতি-সম্বন্ধে জ্ঞানী বলিয়া ভক্তি করে, তাহারাও তাঁহাদিগকে ভক্তিহীন বিধর্ম্মী বলিয়া থাকে। কেননা অজ্ঞতা হইতেই বিস্ময়ের উদ্ভব

হয়; জনতার বিস্ময়বোধ দূর হইলে, সঙ্গে সঙ্গে জনতার উপর তাহাদের প্রভাবও বিলুপ্ত হইয়া যায়”।

সমাজচ্যুতির পরে একদিন রাত্রিকালে এক ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি স্পিনোজাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া ছুরিকাদ্বারা আঘাত করে। স্পিনোজা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ইহার পরে আমস্টার্ডামে বাস করা নিরাপদ নহে বুঝিয়া তিনি নগরের উপকণ্ঠে একটি গৃহের ছাদের উপরস্থ একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই Baruch নাম বর্জন করিয়া তাহার ল্যাটিন রূপ Benedict নাম গ্রহণ করেন। উভয় নামের অর্থই “আশীষপ্রাপ্ত”[1]। তাঁহার গৃহস্বামী মেননাইট সম্প্রদায়ভুক্ত অহিংসাপন্থী খৃষ্টান ছিলেন। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই স্পিনোজাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। জীবিকা অর্জনের জন্য স্পিনোজা প্রথমে তাঁহার শিক্ষক ভ্যান্‌ডেনের বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার কার্য্য গ্রহণ করেন; পরে চসমার কাচ পালিশের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। পাঁচ বৎসর আমস্টার্ডামের উপকণ্ঠে বাস করিবার পরে তিনি তাঁহার গৃহস্বামীর সহিত লিডেন নগরের সন্নিকটে, Rhynsburghএ গিয়া বাসস্থাপন করেন।

স্পিনোজার জীবনীলেখক তাঁহার আকৃতির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন: দেহ নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, মুখের গঠন সুন্দর, কিন্তু গাত্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত মলিন। কেশ কুঞ্চিত ও কৃষ্ণবর্ণ; ভ্রূ দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহাকে দেখিয়া পর্তুগালদেশীয় ইহুদী বলিয়া চিনিতে পারা যাইত। পরিচ্ছদের দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। সাধারণ লোকে যেরূপ পোষাক পরিধান করিত, তিনি তাহাই পরিয়া থাকিতেন। একবার কোনও উচ্চপদস্থ বন্ধু তাঁহাকে নূতন পরিচ্ছদ কিনিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। বলিয়াছিলেন “ভালো পোষাক পরিলেই ভাল লোক হওয়া যায় না। যে দেহের কোনও মূল্য নাই, মূল্যবান পোষাকে তাহাকে সজ্জিত করিয়া রাখা যুক্তি-সঙ্গত নহে।” কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন “অপরিচ্ছন্ন থাকিলেই লোকে পণ্ডিত হয় না। পরিচ্ছদের প্রতি ঔদাসীন্যের ভাণ করা চিত্তের দৈন্যের পরিচায়ক। সেই দৈন্যের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান অবস্থান করিতে পারে না।”

পাঁচ বৎসর স্পিনোজা Rhynsburghএ বাস করিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার Improvement of the Intellect ও Ethics Geometrically Demonstrated নামক গ্রন্থদ্বয় লিখিত হয়। প্রথমোক্ত গ্রন্থ পূর্ব্বে আরব্ধ হইলেও, অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থের বক্তব্য অবশিষ্ট বিষয় Ethics এ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া স্পিনোজা উহা সমাপ্ত করিবার ততটা প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে Ethics সমাপ্ত হয়। আমস্টার্ডামে বাস করিবার সময় কয়েকজন বন্ধুর সহিত স্পিনোজা দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিতেন। Rhynsburgh এ বাস করিবার সময়ে তাঁহার গবেষণার ফল তিনি পত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে জানাইতেন। স্পিনোজার এই সকল বন্ধু দর্শনের আলোচনার জন্য একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। Ethics লিখিবার সময়

[1] Blessed.

স্পিনোজা এক একটি অধ্যায় লিখিয়া তাঁহার বন্ধুদিগকে পাঠাইতেন, তাঁহারা সমিতিতে সমবেত হইয়া সেই পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতেন। কোন অংশ বুঝিতে না পারিলে তাঁহারা স্পিনোজাকে লিখিয়া জানাইতেন। স্পিনোজার এই সকল বন্ধুদিগের মধ্যে ছিলেন Simon de Vries, Meyer, ও Adrian Koerbagh। Simon de Vries তখন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। স্পিনোজার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। এই সকল বন্ধু অথবা শিষ্য স্পিনোজাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন এবং স্পিনোজা তাঁহাদিগকে সে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাদের কতকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একখানা পত্রে de Vries লিখিয়াছিলেন, "আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহুদিন হইতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু কঠোর শীতের জন্য আসিতে পারি নাই। আপনার নিকট হইতে এত দূরে থাকিতে হইতেছে বলিয়া সময় সময় আমি আমার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই। আপনার সঙ্গী Causarius ভাগ্যবান। আপনার সঙ্গে একই গৃহে বাস করিবার এবং আপনার সঙ্গে ভোজন, ভ্রমণ ও ভাল ভাল বিষয় আলোচনা করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছে। কিন্তু আপনার নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থান করিলেও আমার মনের মধ্যে আপনি সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছেন। আপনার রচনা যখন পাঠ করি, তখনকার তো কথাই নাই।" স্পিনোজা তাঁহার বন্ধুগণের কতটা প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, এই পত্র হইতে তাহা বোধগম্য হয়।

১৬৬৫ সালে Ethics সমাপ্ত হয়। গ্রন্থসমাপ্তির দশ বৎসরের মধ্যে স্পিনোজা তাহার প্রকাশের কোনও চেষ্টা করেন নাই। ইহার কারণ ১৬৬৮ সালে তাঁহার বন্ধু Adrian Koerbagh তাঁহার মতের অনুরূপ মতসংবলিত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য দশবৎসর কারাদণ্ড ও তাহার পরে দশবৎসের দেশ হইতে নির্বাসন-দণ্ড প্রাপ্ত হন। ১৬৭৫ সালে গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে স্পিনোজা আমস্টার্ডামে গমন করেন। সেই সময়ে এক জনরব প্রচারিত হয়, যে স্পিনোজার একখানা গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে ঈশ্বর নাই। তখন কয়েকজন ধর্ম্মবৈজ্ঞানিক তাঁহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করেন। ইহার ফলে গ্রন্থপ্রকাশ স্থগিত থাকে। যতদিন স্পিনোজা জীবিত ছিলেন, ততদিন এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে ১৬৭৭ সালে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার সঙ্গে তাঁহার অসমাপ্ত গ্রন্থ Tractus Politicus এবং A Treatise on the Rainbowও প্রকাশিত হয়। এই সকল গ্রন্থই লাটিন ভাষায় লিখিত। ১৮৬২ সালে ডাচভাষায় লিখিত A Short Treatise on God and Man নামে তাঁহার আর একখানা গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

স্পিনোজার জীবিতকালে তাঁহার দুইখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল : The principles of the Cartesian Philosophy এবং A Treatise on Religion and the State. শেষোক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। গ্রন্থ প্রকাশিত হইবামাত্রই গবর্মেণ্টকর্ত্তৃক উহার প্রচার নিষিদ্ধ হয়। এই নিষেধে কিন্তু বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। পুস্তকের মলাটের উপর "ইতিহাস"-অথবা "চিকিৎসা"-ব্যঞ্জক নাম ব্যবহার করিয়া প্রকাশক বহুসংখ্যক পুস্তক বিক্রয় করিয়াছিল। পুস্তকে প্রকাশিত মতের খণ্ডনের জন্য বহু গ্রন্থও লিখিত হইয়াছিল।

একজন লিখিয়াছিলেন "স্পিনোজার মতো অধার্ম্মিক নাস্তিক কখনও পৃথিবীতে বাস করে নাই।" তাঁহার একজন প্রাক্তন ছাত্র, Albert Burgh, ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "আপনি অবশেষে সত্য দর্শন (Philosophy) পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন, কিন্তু কেমন করিয়া জানিলেন, যে পৃথিবীতে যত প্রকার দর্শন পূর্ব্বে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, অথবা বর্ত্তমানে দেওয়া হইতেছে, অথবা ভবিষ্যতে হইবে, তাহার মধ্যে আপনার দর্শনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট? ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা ছাড়িয়া দিলেও, আপনি কি প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত দর্শনশাস্ত্র, যাহা এদেশে, ভারতবর্ষে অথবা অন্যত্র শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন? যদি ধরিয়াও লওয়া যায়, সে সকলই আপনি ভাল রূপ পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইলেও কেমন করিয়া আপনি বুঝিতে পারিলেন, যে যে দর্শন সর্ব্বোত্তম আপনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন? যাবতীয় Patriarch, prophets, apostles, সহিদ, ডাক্তার ও Church এর Confessorদের উপর আপনাকে স্থাপন করিবার সাহস আপনি কোথায় পাইলেন? পৃথিবীর উপর কীটোপম তুচ্ছ মানুষ আপনি, ভস্মপরিণাম কীটভোগ্য মানুষ, আপনার অকথ্য ঈশ্বরনিন্দা লইয়া কিরূপে আপনি সেই সনাতন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের সম্মুখীন হইবেন? আপনার এই উন্মত্ত, শোচনীয় ও ঘৃণিত মতের ভিত্তি কি? ক্যাথলিকেরাও যে সকল রহস্য বুদ্ধির অগম্য বলিয়া মনে করেন, তাহাদের সম্বন্ধে মত-প্রকাশের পৈশাচিক অহংকার আপনি কোথায় পাইলেন?" ইহার উত্তরে স্পিনোজা লিখিয়াছিলেন, "তুমি মনে করিতেছ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অবথা গুরু প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং তাঁহাদের উপর তোমার বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ। কিন্তু কেমন করিয়া জানিলে, যে যাঁহারা অতীতে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন, বর্ত্তমানে দিতেছেন, এবং ভবিষ্যতে দিবেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে তোমার নির্ব্বাচিত উপদেষ্টাগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? প্রাচীন অথবা আধুনিক যে সকল ধর্ম্ম এখানে, ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সকলই কি তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ? যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে তুমি সে সকলই পরীক্ষা করিয়াছ, তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে যেটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাই যে তুমি বাছিয়া লইয়াছ, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে?"

কিন্তু এই স্বধর্ম্মত্যাগী ধর্ম্মধ্বজীর নিকট হইতে স্পিনোজা যে ব্যবহার পাইয়াছিলেন, তৎকালীন বহু সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ব্যবহার ছিল তাহার বিপরীত। পূর্ব্বে যে Simon de Vriesএর কথা লিখিত হইয়াছে, তাঁহার শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তিনি এক সহস্র ডলার স্পিনোজাকে উপঢৌকন দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু স্পিনোজা তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই। এই প্রতিভাবান যুবকের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তিনি স্পিনোজাকে দান করিতে চাহিয়াছিলেন। স্পিনোজা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া উক্ত সম্পত্তি তাঁহার (Vriesএর)ভ্রাতাকে দান করিতে তাঁহাকে সম্মত করাইয়াছিলেন। Vries এর মৃত্যুর পরে দেখা গেল, তাঁহার উইলে স্পিনোজার জন্য বাৎসরিক ২৫০ ডলারের বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। স্পিনোজা তাহাও গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন "প্রকৃতি সন্তুষ্ট হয় অতি অল্পে। প্রকৃতি তুষ্ট হইলে সাথে সাথে

আমারও তুষ্টি হয়।" অনেক অনুরোধের পরে তিনি বৎসরে ১৫০ ডলার গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটির সেক্রেটারি Henry Oldenburg স্পিনোজার বন্ধু ছিলেন। তিনি Rhynsburg এ গিয়া স্পিনোজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বহু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত স্পিনোজার পত্রব্যবহার চলিয়াছিল। তাঁহার দার্শনিক গবেষণার ফল প্রকাশিত করিবার জন্য তিনি স্পিনোজাকে উৎসাহিত করিতেন। স্পিনোজার Tractus Theologico—Politicus, De Intellectus Emendatione এবং Ethics এর মর্ম্ম তিনি অবগত ছিলেন। Royal Societyর President Boyleও Oldenburgh এর মাধ্যমে স্পিনোজাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। ১৬৬৫ সালে লিখিত Oldenburgh এর একখানা পত্র হইতে জানা যায়, যে স্মীর্ণা[1] নগরে Sabbatai Zevi নামক একজন প্রতারক আপনাকে মেসিয়া[2] বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, এবং বহুসংখ্যক ইহুদী তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার শিষ্য হইয়াছিল। ইংলণ্ডপ্রবাসী ইহুদীগণ বিশ্বাস করিয়াছিল, যে Zevi সত্বরই জেরুজালেমের রাজপদে অভিষিক্ত হইবে। কিন্তু Zevi ধৃত হইয়া Constantinople এর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া তাহার অনুগামীদিগকে পরিত্যাগ করে।

স্পিনোজার আর একজন বন্ধু ছিলেন Ehrenfried Walter Von Tschirnhausen.। সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব এই বোহিমিয়ার অধিবাসী যুবক বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন. এবং পরবর্ত্তী কালে গণিতের গবেষণায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি স্পিনোজার সহিত দেখা করিতেও আসিয়াছিলেন। তাঁহার Medicina Mentis গ্রন্থে তিনি স্পিনোজার Improvement of the Understanding গ্রন্থ হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার জন্য ঋণ স্বীকার করেন নাই। স্পিনোজার নামের উল্লেখ থাকিলে গ্রন্থের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-সৃষ্টি হইতে পারে, এই আশঙ্কা স্বীকার না করার কারণ হওয়া অসম্ভব নহে। স্পিনোজার দর্শনসম্বন্ধে তাঁহাকে লিখিত Tschirnhausen এর কয়েকখানি পত্র হইতে এই যুবকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার সমালোচনার সন্তোষজনক উত্তর দিতে স্পিনোজাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল।

হল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Huygens এর সহিত স্পিনোজার পত্রব্যবহার ছিল। জার্মানীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক লাইবনিজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তখনও লাইবনিজের দর্শন সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি-লাভ করে নাই। ১৬৭৬ সালে স্পিনোজার সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে পারিসনগরে Tschirnhaus এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন Tschirnhaus স্পিনোজার Ethics এর পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে দেখাইবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু স্পিনোজা তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। স্পিনোজাসম্বন্ধে লাইবনিজ যাহা শুনিতে

---

[1] Smyrna. [2] Messiah.

পাইয়াছিলেন, তাহাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই যে ১৬৭৬ সালে তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। স্পিনোজার সহিত লাইবনিজের যে দর্শন-সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। কিন্তু স্পিনোজার সহিত তাঁহার যে অনেকবার দেখা হইয়াছিল, এবং সাক্ষাৎ-কালে তিনি তাঁহার সহিত দর্শনসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। দে-কার্ত্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে প্রমাণ দিয়াছিলেন, স্পিনোজার সহিত তাঁহার সে সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। এই আলোচনা-কালে লাইবনিজ তাঁহার নিজের উদ্‌ভাবিত এক প্রমাণেরও আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং স্পিনোজা তর্কবিতর্কের পরে এই প্রমাণের অনুমোদন করিয়াছিলেন, লাইবনিজ নিজেই তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। লাইবনিজের সহিত স্পিনোজার সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল, যে তিনি অবশেষে তাঁহার Ethics এর পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে দেখিতে দিয়াছিলেন, ইহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে লাইবনিজ স্বকীয় দর্শনে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধনে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তখন স্পিনোজার মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছিলেন।

হল্যাণ্ডের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট Jan de Witt স্পিনোজাকে এতই শ্রদ্ধা করিতেন, যে তিনি রাষ্ট্র হইতে তাঁহাকে ৫০ ডলারের এক বৃত্তি দান করেন। ফ্রান্সের অধীশ্বর চতুর্দশ লুই তাঁহাকে একটি বিশেষ বৃত্তিদানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সেই প্রস্তাবের সহিত এই সর্ত্ত উহ্য থাকে, যে স্পিনোজার পরবর্ত্তী গ্রন্থ তাঁহাকে উৎসর্গ করা হইবে। বিনয়ের সহিত স্পিনোজা উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

১৬৬৫ সালে বন্ধুবান্ধবদিগের অনুরোধে স্পিনোজা হেগনগরের উপকণ্ঠে Voorburgএ বাসস্থাপন করেন। Voorburgএ বাসকালে Jan de Wittএর সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। ১৬৭২ সালে ফ্রান্সের রাজা হল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। অগণিত ফরাসী সৈন্য হঠাৎ আসিয়া দেশের উপর নিপতিত হয়। সমগ্র দেশ সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠে। Jan de Witt ও তাঁহার ভ্রাতা সমস্ত জীবন ধরিয়া নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে হল্যাণ্ডের পরাজয়ের ফলে দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, এবং Jan de Witt ও তাঁহার ভ্রাতা রাজপথের উপর উন্মত্ত জনতাকর্ত্তৃক নিহত হন। সংবাদ শুনিয়া স্পিনোজা এতই বিচলিত হন, যে প্রকাশ্যভাবে এই জঘন্য কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য তিনি বেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় বন্ধুবান্ধবেরা বলপ্রয়োগে তাঁহাকে নিরস্ত করেন। শোকে অভিভূত হইয়া তখন তিনি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে থাকেন। ইহার অত্যল্প কাল পরেই ফরাসী সেনাপতি Prince de Conde তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্পিনোজাকে নিমন্ত্রণ করেন। ফরাসী সম্রাটের প্রস্তাবিত যে বৃত্তির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রস্তাব করাই এই নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল। স্পিনোজা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে Utrecht নগরে গমন করেন, কিন্তু সেনাপতি তখন তথায় না থাকায় তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। স্পিনোজা কয়েকদিন তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া হেগনগরে প্রত্যাগমন করেন। Utrecht নগরে

অবস্থানের সময় তথাকার সৈন্যাধ্যক্ষগণ রাজার প্রস্তাবের কথা স্পিনোজাকে অবগত করিয়াছিলেন। স্পিনোজা যে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

স্পিনোজার হেগে প্রত্যাগমনের পরে শত্রু-সেনাপতির সহিত তাঁহার এই সাক্ষাৎকারের সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িলে, ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, এবং স্পিনোজার গৃহস্বামী তাঁহার গৃহ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করেন। তখন স্পিনোজা তাহাকে বলেন "আমার জন্য ভয়ের কোনও কারণ নাই। রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ হইতে সহজেই আমাকে আমি মুক্ত করিতে পারিব। ফরাসী সেনাপতির সহিত কোন উদ্দেশ্যে আমি দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তাহা দেশের অনেক লোকই অবগত আছেন। কিন্তু জনতা যদি আপনার গৃহ আক্রমণ করে, আমি গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইব; তখন তাহারা হতভাগ্য De Witts দিগকে যে ভাবে হত্যা করিয়াছে, আমাকেও যদি সেই ভাবে হত্যা করে, আমি আপত্তি করিব না"। গৃহ আক্রান্ত হয় নাই। জনতা যখন বুঝিতে পারিল, স্পিনোজা একজন দার্শনিকমাত্র, তাঁহা হইতে রাষ্ট্রের কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, তখন উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া গেল।

১৬৭৩ সালে Heidelburg এর বিশ্ববিদ্যালয় স্পিনোজাকে দর্শনের অধ্যাপক-পদে নিয়োগের প্রস্তাব করেন। এই পদ গ্রহণ করিলে তাঁহাকে দার্শনিক আলোচনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তিনিও রাষ্ট্রে প্রচলিত ধর্ম্ম-বিরোধী কিছু বলিয়া সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিবেন না, তাঁহাকেও এই প্রতিশ্রুতি দিতে বলা হইয়াছিল। উত্তরে স্পিনোজা লিখিয়াছিলেন "মাননীয় মহাশয়, কোনও বিষয়ে অধ্যাপক হইবার বাসনা যদি আমার থাকিত, তাহা হইলে মহামহিম Prince Palatine আপনার মাধমে আমাকে যে পদ দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিলেই সে বাসনা পূর্ণ হইত। দার্শনিক আলোচনার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিদ্বারা এই দানের মূল্য বিশেষ ভাবে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। যে নরপতির বিজ্ঞতা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার রাজ্যে বাস করিবার ইচ্ছাও আমার বহুদিন হইতেই আছে। কিন্তু প্রকাশ্যে বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা আমার কোন দিনই ছিল না, এবং বহু পর্য্যালোচনার পরেও আমি প্রস্তাবিত মহৎ অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতে পারিতেছি না। ইহার কারণ, প্রথমতঃ শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিলে দার্শনিক গবেধণার জন্য সময় পাওয়া যাইবে না। তাহার পরে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধতা পরিহার করিবার জন্য কোন্ নির্দ্দিষ্ট পরিধির মধ্যে প্রতিশ্রুত স্বাধীনতার ব্যবহার করিতে পারা যাইবে, তাহাও আমি অবগত নহি। ধর্ম্মের প্রতি গভীর অনুরাগ হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিরোধের উৎপত্তি হয় না। বিভিন্ন মানসিক প্রকৃতি এবং অন্যের কথার প্রতিবাদের প্রবৃত্তি হইতেই ইহার উদ্ভব হয়। এই প্রবৃত্তিবশতঃই অন্যের কথা যতই ন্যায়-সঙ্গত হউক না কেন, তাহার নিন্দার অভ্যাস জন্মে। ইহার প্রমাণ আমার নিঃসঙ্গ জীবনে আমি পাইয়াছি। এই সম্মানাস্পদ পদ গ্রহণ করিলে, ইহার আশঙ্কা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন, যে কোন উৎকৃষ্টতর পদের আশায় আমি এই দানগ্রহণে সঙ্কুচিত হইতেছি না। আমার শান্তি-প্রিয়তাই এই সংকোচের কারণ।

জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা হইতে বিরত হইলে শান্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাভ করা সম্ভবপর হইবে। এই জন্যই আপনাকে সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি, যে মহাধৃতিমান Elector আমাকে প্রস্তাবিত বিষয়-সম্বন্ধে আরও বিবেচনা করিবার অনুমতি দান করুন।”

সাংসারিক মান-সম্ভ্রম স্পিনোজার নিকট নিতান্তই তুচ্ছ ছিল। তাঁহার দৃষ্টি ছিল অনন্তে নিবদ্ধ! সাধারণ লোকের মনঃ যে সকল ব্যাপারে আলোড়িত হইত, তাঁহার চিত্তে তাহারা কোনও রেখাপাত করিতে পারিত না। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি জানিতেন, ঐ যুদ্ধ শেষ হইলে, নূতন যুদ্ধের আয়োজন আরব্ধ হইবে। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিদ্বেষের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার সহিত তাঁহার কোনও সংস্রব ছিল না। তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল জ্ঞানালোকিত, নিরুদ্বিগ্ন, শান্ত, সমাহিত জীবন। তাহা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য স্পিনোজার নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই ভার তিনি বিনা অভিযোগে বহন করিয়া চলিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য তাঁহার কোনও সময় ভাল ছিল না, শ্বাসযন্ত্র চিরদিনই দুর্বল ছিল। তাহার উপর যে ঘরে তিনি বাস করিতেন, তাহাও স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। কাচপালিসের কাজও শ্বাসযন্ত্রের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল ছিল। ক্রমশঃ তিনি শ্বাসকষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। যতদিন যাইতে লাগিল, কষ্ট ততই বাড়িতে লাগিল। মৃত্যুকে তিনি ভয় করিতেন না; তাঁহার ভয় ছিল, জীবিত কালে যে গ্রন্থ তিনি প্রকাশিত করিতে পারিলেন না, মৃত্যুর পরে তাহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, জগৎ তাঁহার ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফল হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। তাঁহার হস্তলিখিত গ্রন্থসকল এক পেটিকায় বন্ধ করিয়া তাহার চাবি গৃহস্বামীর হস্তে দিয়া, তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐ পেটিকা আমষ্টার্ডামের এক গ্রন্থপ্রকাশকের নিকট পাঠাইতে তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। ১৬৭৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। গৃহস্বামী সপরিবারে গীর্জ্জায় গিয়াছিলেন। চিকিৎসক ডাক্তার মায়ার স্পিনোজার নিকট ছিলেন। গীর্জ্জা হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্বামী দেখিলেন. স্পিনোজার মৃত দেহ পড়িয়া আছে, ডাক্তার চলিয়া গিয়াছেন। যাইবার সময় স্পিনোজার রূপার হাতলযুক্ত একখানা ছুরি ও টেবিলের উপরস্থ কিছু অর্থও লইয়া গিয়াছেন।

মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে এই মনীষীর মৃত্যুতে বহুলোক দুঃখিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যের জন্য শিক্ষিত লোক তাঁহাকে যেরূপ সম্মান করিত, সহৃদয়তার জন্য সাধারণে তাঁহাকে তেমনি ভালবাসিত। সাধারণ লোকদিগের সঙ্গে রাজপুরুষ ও পণ্ডিতেরা তাঁহার শবের অনুগমন করিয়াছিলেন, এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বহু লোক তাঁহার সমাধিস্থানে মিলিত হইয়াছিলেন।

Religion and State

Tract on Religion and State গ্রন্থই বাইবেলের প্রথম যুক্তিমূলক সমালোচনা[১]। এই সমালোচনার বর্ত্তমানে বিশেষ কোনও মূল্য নাই, কেননা সে সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কোনও মতভেদ নাই। স্পিনোজা বলিয়াছেন, বাইবেলে যে রূপক ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা উদ্দেশ্য-মূলক ও ইচ্ছাকৃত। প্রাচ্য দেশে আলংকারিক ভাষার একটা মোহ আছে; সেই জন্যও বটে, শ্রোতৃবর্গের কল্পনা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যও বটে, পয়গম্বরগণ ও খৃষ্টের প্রধান শিষ্যগণ রূপক ভায়ার ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশ জনসাধারণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, সে জন্যও এই প্রকার ভাষা-ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল। এই জন্য বহু অপ্রাকৃত ঘটনা ও ঈশ্বরের বারংবার আবির্ভাবের কথা বাইবেলে প্রবেশ করিয়াছে। অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেই সাধারণ লোকে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিতে পায়, অস্বাভাবিক ঘটনাদ্বারাই তাহাদের নিকট ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। নিয়মানুগত প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে তাহারা ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না, পরিচিত নিয়মানুসারে যতক্ষণ প্রকৃতির কার্য্য চলিতে থাকে, ততক্ষণ তাহারা ঈশ্বরকে নিষ্ক্রিয় মনে করে, এবং যখন ঈশ্বর সক্রিয় হন, তখন তাহারা প্রকৃতি ও তাহার শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকে বলিয়া বিশ্বাস করে। এইরূপে তাহারা দুইটি বিভিন্ন শক্তির কল্পনা করে—ঈশ্বর-শক্তি ও প্রকৃতি-শক্তি। কিন্তু বস্তুতঃ প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। ঈশ্বরই প্রাকৃতিক ব্যাপারের কর্ত্তা। মানুষ বিশ্বাস করিতে চায়, যে তাহার জন্য ঈশ্বর প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করেন। সেইজন্যই ঈশ্বরের মহত্ত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে ইহুদী শাস্ত্রে অনেক অপ্রাকৃত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ইহুদীদিগের বিশ্বাস, তাহারা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, এবং তাহাদের জন্য প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত করিতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন না। অত্যুক্তি-বর্জ্জিত সংযত ভাষায় লোকের চিত্ত প্রভাবিত করা সহজসাধ্য নহে। মিশরদেশ হইতে ইহুদীদিগের পলায়নের সময়, মোজেস ও তাহার অনুবর্ত্তীদিগকে পলায়নের সুযোগ দিবার জন্য লোহিত সাগরের দ্বিধা বিভক্ত হইবার কথা বাইবেলে বর্ণিত আছে। যদি বলা হইত পূর্ব্ব দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুদ্বারা সমুদ্রের জল এক ধারে সরিয়া যাইবার ফলে সমুদ্রগর্ভে পথের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা হইলে পাঠকের মনে বিশেষ কোনও ভাবের উৎপত্তি হইত না। ধর্ম্ম-সংস্থাপকেরা যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের অপেক্ষা অধিক প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হন, রূপক ভাষার ব্যবহারই তাহার প্রধান কারণ।

উপরোক্তভাবে ব্যাখ্যা করিলে, স্পিনোজার মতে বাইবেলে যুক্তিবিরুদ্ধ কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু আক্ষরিক অর্থ-অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিলে উহাতে বহু ভ্রান্তি, স্ববিরোধ ও স্পষ্ট অসম্ভাব্যতা দৃষ্টিগোচর হয়। দার্শনিক ব্যাখ্যায় কবিতা ও রূপকের কুহেলিকা ভেদ করিয়া বড় বড় চিন্তানায়কের গভীর চিন্তা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং বাইবেল যে কেমন করিয়া এতদিন টিকিয়া আছে, এবং জনমনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে,

[1] Higher criticism.

তাহা বুঝিতে পারা যায়। স্থানভেদে উভয়বিধ ব্যাখ্যারই উপযোগিতা আছে। সাধারণ লোকে চিরকালই অপ্রাকৃত-ঘটনাবহুল রূপসমলঙ্কৃত ধর্ম্ম চাহিবে; এই প্রকারের এক ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে, তাহারা অন্য আর একটি সৃষ্টি করিয়া লইবে। কিন্তু দার্শনিক জ্ঞানে প্রকৃতি ও ঈশ্বর অভিন্ন, উভয়ের কার্য্যই নিয়ত ও অচল নিয়মের অনুযায়ী। এই অচল নিয়মকেই দার্শনিক ভক্তি করেন, এবং তদনুসারে স্বকীয় কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি জানেন, শাস্ত্রে যে ঈশ্বরকে নিয়মের স্রষ্টা ও রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং তাঁহাকে ন্যায়বান্, করুণাময় প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ মানুষের অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও অপরিণত বুদ্ধির সৌকর্য্যের জন্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কার্য্য তাঁহার স্বভাবের অনুযায়ী ও নিয়ত। যাহা চিরদিনই সত্য, তাহাই তাঁহার আদেশ।

স্পিনোজা নূতন ও পুরাতন বাইবেলের[1] মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখিতে পান নাই। ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম্মকে তিনি এক ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতেন। যখন প্রচলিত কুসংস্কার ও বিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া দার্শনিক ব্যাখ্যাদ্বারা উভয় ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কৃত হয়, তখন উভয়ের ঐক্য স্পষ্ট হইয়া উঠে। "প্রেম, আনন্দ, শান্তি, মিতাচার, সর্ব্বমানবে প্রীতি খৃষ্টধর্ম্মের বিশিষ্ট শিক্ষা। আমি ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই, যাঁহারা আপনাদিগকে খৃষ্টান বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহারা কিরূপে পরস্পরের প্রতি ভীষণ বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারেন। পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা এতই সুতিক্ত, যে তাহা দেখিয়া বিদ্বেষই তাঁহাদের ধর্ম্মের বিশেষত্ব বলিয়া প্রতীত হয়।" ইহুদীগণ যে এতদিন বাঁচিয়া আছে, খৃষ্টানদিগের বিদ্বেষই তাহার কারণ। জাতির সংস্থিতির জন্য যে একতা ও সংহতির প্রয়োজন, উৎপীড়ন হইতেই তাহার উদ্ভব হয়। উৎপীড়ন না থাকিলে ইহুদীগণ হয় তো ইয়োরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে মিশিয়া গিয়া স্বকীয় সত্তা হারাইয়া ফেলিত। দার্শনিক ইহুদী এবং দার্শনিক খৃষ্টান বিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়া কেন শান্তি ও সহযোগিতায় বাস করিতে পারিবেন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

কিন্তু এই শান্তি ও সহযোগিতার প্রথম সোপান স্পিনোজার মতে যিশুকে বুঝিতে পারা। তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল অসম্ভব মত প্রচলিত আছে, তাহা বর্জ্জন করিলে ইহুদীগণ তাঁহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বরকে দেখিতে পাইবেন। স্পিনোজা খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। "ঈশ্বরের সনাতন জ্ঞান"[2] সর্ব্ব পদার্থে প্রকাশিত হইলেও, মানুষের মধ্যেই তাহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। আবার যাবতীয় মানুষের মধ্যে যিশু খৃষ্টের মধ্যেই তাহার সর্ব্বোত্তম প্রকাশ। কেবল ইহুদী জাতিকে নয়, সমগ্র মানবজাতিকে শিক্ষা দিবার জন্যই খৃষ্ট প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি তাঁহার শিক্ষা মানবীয় বুদ্ধির উপযোগী করিয়া রূপক[3] সহযোগে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যিশুর নীতি ও ভূয়োজ্ঞান[4] অভিন্ন। তাঁহার প্রতি ভক্তি হইতে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি "জ্ঞানভূয়িষ্ঠ

[1] Old and New Testments. [2] Eternal wisdom. [3] Parable. [4] Wisdom.

প্রেম"[১] প্রাপ্ত হয়। এতাদৃশ মহান্ চরিত্র ভেদ ও কলহের জনক মতের বাধা হইতে মুক্ত যাবতীয় লোককে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিবে; হয় তো তাঁহার নামের মধ্যেই বাক্য ও তরবারির আত্মঘাতী কলহে ব্যাপৃত জগৎ বিশ্বাস, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সন্ধান প্রাপ্ত হইবে।

Improvement of the Intellect

"On the Improvment of the Intellect" (বুদ্ধির উৎকর্ষ-সাধন) গ্রন্থের প্রারম্ভে স্পিনোজা লিখিয়াছেন "অভিজ্ঞতার ফলে আমি বুঝিতে পারিলাম, যে সাধারণ জীবনে যে সকল ব্যাপার প্রায়শঃই ঘটিয়া থাকে তাহাদের সকলই তুচ্ছ ও অর্থহীন; দেখিতে পাইলাম, যে সকল পদার্থ আমি ভয় করিতাম, ও যাহারা আমাকে ভয় করিত, তাহাদের মধ্যে ভালো ও মন্দ কিছুই নাই, কেবল মনঃ তাহাদের দ্বারা যে ভাবে প্রভাবিত হয়, তাহার উপরই ভালো মন্দ নির্ভর করে। অবশেষে আমি মনঃস্থ করিলাম, যে যাহা সত্যই কল্যাণকর, যাহা কল্যাণ দান করিতে সমর্থ এবং অন্য যাবতীয় পদার্থ অভিভূত করিয়া মনঃকে প্রভাবিত করিতে পারে, এমন কোনও পদার্থ আছে কি না, তাহা আমি অনুসন্ধান করিব। অনন্তকাল অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দ উপভোগ করিবার শক্তি আবিষ্কার ও অর্জ্জন করিতে পারি কি না, তাহারই অনুসন্ধানের জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।

"অবশেষে মনঃস্থ করিলাম", ইহা বলিবার কারণ এই, যে যাহা অধ্রুব, তাহার লোভে যাহা ধ্রুব, তাহা বর্জ্জন করা প্রথমে অনুচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। সম্মান ও অর্থ হইতে যে সকল সুবিধা ভোগ করা যায়, তাহা দেখিতে পাইতাম। কোনও নূতন বিষয় আন্তরিক ভাবে অনুসন্ধান করিতে যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে এই সকল সুবিধা যে আমি ভোগ করিতে পারিব না, তাহা বুঝিয়াছিলাম। আর ইহাও বুঝিয়াছিলাম, যে যাহার অনুসন্ধান করিতে চাই, সেই পরমানন্দ যদি যাহা বর্জ্জন করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যেই থাকে, তাহা হইলে তাহা বর্জ্জন করিয়া আমি পরমানন্দ হারাইব, আর পরমানন্দ যদি ইহাদের কিছুর মধ্যেই না থাকে, অথচ আমার শক্তি ইহাদের অর্জ্জনেই প্রয়োগ করি, তাহা হইলেও আমাকে তাহা হারাইতে হইবে। সুতরাং আমার জীবনের ধারা পরিবর্ত্তন না করিয়া, এই নূতন তত্ত্ব (পরমানন্দ)-প্রাপ্তি, অন্ততঃ তাহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভবপর কি না, তাহাই আমি ভাবিতে লাগিলাম। কেননা যে সমস্ত পদার্থ জীবনে প্রায়ই আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং যাহাদিগকে লোকে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলদায়ক বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—(১) সম্পদ্, (২) যশঃ ও (৩) সুখ। যশঃ, সম্পদ্ ও সুখের চিন্তায় মানুষের মনঃ এতই মগ্ন থাকে, যে অন্য কোনও উৎকৃষ্ট বস্তুর কথা তাহার মনে উদিত হয় না। সুখ যখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন তাহাকেই পরমার্থ বলিয়া মনে

[১] Intellectual love of God.

হয়।.......কিন্তু সুখের পরে দুঃখের আবির্ভাব হয়। তাহাতে মনঃ সম্পূর্ণ অবশ না হইলেও, বিচলিত হয়, এবং তাহার ক্রিয়া শিথিল হইয়া পড়ে। যশঃ ও অর্থের অনুসরণেও মনঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। যতই অধিক যশঃ অথবা অর্থ কেহ প্রাপ্ত হয়, ততই তাহার সুখের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং ততই আরও যশঃ ও অর্থের জন্য তাহার আগ্রহ জন্মে। আশাভঙ্গ হইলে গভীর দুঃখের উৎপত্তি হয়। যশের অনুসরণের ফলে লোকের সন্তোষ-বিধানের জন্য স্বকীয় জীবন পরিচালিত করিতে হয়, তাহারা যাহা ভালোবাসে না, তাহা বর্জ্জন করিতে হয়। চিরস্থায়ী ও অসীম পদার্থ যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতি প্রীতি হইতেই কেবল দুঃখ-সংযোগ-বিযুক্ত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমগ্র প্রকৃতির সহিত মনের যে সংযোগ আছে, তাহার জ্ঞানেই সর্ব্বোত্তম মঙ্গল।.......যতই প্রকৃতির শৃঙ্খলা বুঝিতে পারা যায়, ততই অনাবশ্যক দ্রব্যের বন্ধন হইতে শরীরকে মুক্ত করিবার সামর্থ্য লাভ হয়।"

অনেক চিন্তার পরে স্পিনোজা বুঝিতে পারিলেন জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানেই মুক্তি এবং জ্ঞানের অনুশীলনেই স্থায়ী সুখলাভ হয়। জ্ঞানে যে বুদ্ধি-গ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয় সুখলাভ হয়, তাহাই স্থায়ী সুখ। কিন্তু এই সুখের সন্ধানে সংসার-বর্জ্জনের প্রয়োজন নাই। নাগরিকের[1] কর্ত্তব্য অবশ্য পালনীয়। স্পিনোজা সাংসারিকের পালনীয় তিনটি নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন :—(১) সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে, এমন ভাবে কথা বলিতে হইবে, এবং সাধারণের মঙ্গলকর যে সকল কার্য্য উন্নত জীবনের পরিপন্থী নহে, তাহা করিতে হইবে। এই নিয়ম পালন করিলে আমাদের কথা শুনিবার জন্য জনসাধারণ আগ্রহান্বিত হইবে।

(২) স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যাহার প্রয়োজন, তাহা ভিন্ন অন্য সুখকর দ্রব্যের ভোগ বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৩) স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত অর্থ-উপার্জ্জনের চেষ্টা বর্জ্জন করিতে হইবে। যে সকল প্রথা আমাদের লক্ষ্য পরমানন্দের অবিরোধী, তাহা মানিয়া চলিতে হইবে।

কিন্তু পরমানন্দের সন্ধানে বহির্গত হইয়া প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, আমরা যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা যে সত্য, তাহা বুঝিবার উপায় কি? ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞানের যে সকল উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদের বুদ্ধি যে সকল উপাদানের উপর প্রযুক্ত হয়, তাহাদের উপর নির্ভর করা যায় কি? সেই সকল উপাদানের সাহায্যে বুদ্ধি যে সকল মীমাংসায় উপনীত হয়, তাহাদিগকে সত্য বলিয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যায় কি? জ্ঞানের যাহা সাধন, যে যানে আরোহণ করিয়া আমরা জ্ঞানরাজ্যে উপনীত হইতে চাই, তাহা নিরাপদে আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিতে পারে কি? এই প্রশ্নের প্রথমেই মীমাংসার প্রয়োজন। মীমাংসার জন্য আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরীক্ষা এবং বুদ্ধির মধ্যে যদি গলদ থাকে, তাহার সংশোধন আবশ্যক।

এই গ্রন্থে স্পিনোজা চারি প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ শ্রুতজ্ঞান।

---

[1] Citizen

নিজের জন্মতারিখ এবং পিতামাতার সম্বন্ধে জ্ঞান এই জ্ঞানের অন্তর্ভূত। দ্বিতীয়তঃ—অস্পষ্ট-ও অনিশ্চিত-অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞান। আমাকে যে মরিতে হইবে, এই জ্ঞান ইহার অন্তর্ভূক্ত। আমার পরিচিত অনেক লোককে মরিতে দেখিয়াছি; আলোর জন্য তৈল ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি; অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে জলের ব্যবহার দেখিয়াছি; এই সকল অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি আমাকেও মরিতে হইবে, তৈল দ্বারা আলো জ্বালানো যায়, এবং জল দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত হয়। তৃতীয়তঃ—কোনও বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান হইতে অন্য বস্তুর স্বরূপের অনুমান; কোন কার্য্য হইতে তাহার কারণের অনুমান, অথবা কোনও সাধারণ প্রতিজ্ঞা হইতে, কোনও দ্রব্য কোনও বিশেষ গুণবিশিষ্ট থাকে, এই প্রকার অনুমান। যখন আমাদের দেহের স্পষ্ট অনুভূতি হয়, এবং সেই অনুভূতি সেই দেহেরই অনুভূতি, অন্য কোনও দেহের অনুভূতি নয়, ইহা স্পষ্ট বোধ হয়, তখন আমরা অনুমান করি, যে সেই দেহের সহিত একটি আত্মা সংযুক্ত আছে, এবং সেই সংযোগই ঐ অনুভূতির কারণ। অথবা যখন অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারি, যে কোন দ্রব্য যত দূরে থাকে, তত ছোট দেখায়, তখন সূর্য্য যত বড দেখায়, তাহা অপেক্ষা যে বৃহত্তর, ইহা অনুমান করিতে পারি। অন্য দুই প্রকার জ্ঞান হইতে এই জ্ঞান উৎকৃষ্টতর হইলেও ইহারও ত্রুটি আছে। বহুদিন হইতে বৈজ্ঞানিকগণ ইথারের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া আসিতেছেন। এই অনুমানের ভিত্তিও নিতান্ত দুর্ব্বল ছিল না। কিন্তু সেই ভিত্তি বর্ত্তমানে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, এবং বর্ত্তমানে অনেক বৈজ্ঞানিক ইথারের অস্তিত্ব-স্বীকারে অনিচ্ছুক। অভিজ্ঞতাদ্বারা এই প্রকারের জ্ঞান খণ্ডিত হইতে পারে। চতুর্থতঃ—বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধি অথবা তাহার অব্যবহিত কারণের জ্ঞান হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। যখন কোনও বস্তুর জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞান হইতে 'জ্ঞান কি'—'কোনও বস্তুকে জানা কাহাকে বলে',—তাহা বুঝিতে পারি। মনের স্বরূপ কি যখন জানি, তখন ইহাও জানি, যে মনঃ দেহের সহিত সংলগ্ন। দুইএর সহিত তিন যোগ করিলে পাঁচ হয়, দুইটি রেখা অন্য কোনও রেখার সমান্তরাল হইলে তাহারা পরস্পর সমান্তরাল হয়, এই জ্ঞানও এই শ্রেণীর জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত। সমগ্র কোনও দ্রব্য তাহার অংশ হইতে বৃহত্তর, অথবা দুইএর সঙ্গে চারের যে সম্বন্ধ, তিনএর সঙ্গে ছয়এর সেই সমন্ধ (২ : ৪ : : ৩ : ৬) এই জ্ঞানও এই শ্রেণীর। ইউক্লিডের সকল প্রতিজ্ঞার জ্ঞান এই শ্রেণীর। স্পিনোজা বলিযাছেন, এই প্রকার জ্ঞানদ্বারা তিনি যে সকল পদার্থের জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই সামান্য। এই চতুর্থ প্রকারের জ্ঞানই দার্শনিক আলোচনার জন্য আবশ্যক। এই জ্ঞান উপজ্ঞালব্ধ।[1] স্পিনোজা ইহাকে "মহাকালিক জ্ঞান" বলিয়াছেন।[2]

জ্ঞানের উৎপত্তি-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের মনের মধ্যে বাহ্যবস্তুর প্রত্যয়[3] উৎপন্ন হয়। এই প্রত্যয় ইহার বিষয়[4] বাহ্যবস্তু হইতে ভিন্ন। বিষয় একদিকে অবস্থিত, তাহার প্রত্যয় তাহার বিপরীত দিকে আমাদের মনের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রত্যয় একটি সমুৎপাদ[5], এবং তাহার গুণ তাহার বিষয়ের গুণ হইতে ভিন্ন। ইহার কাজ

[1] Intuitive [2] Perception Sub-specie eternitatis [3] Idea.
[4] Object. [5] Phenomenon.

বাহ্য বিষয় কি, তাহার সার কি, সে সম্বন্ধে জ্ঞাতাকে সচেতন করা। কোনও বৃত্তের প্রত্যয় ও সেই বৃত্ত এক বস্তু নহে। বৃত্তের কেন্দ্র আছে, তাহার পরিমাপ[১] আছে, কিন্তু তাহার প্রত্যয়ের তাহা নাই। অথচ বৃত্তের সমস্ত গুণই তাহার প্রত্যয় মনের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। কিন্তু প্রত্যয় ও তাহার বিষয় ভিন্ন হইলেও, তাহাদের এক স্থানে সংযোগ আছে। বিষয়ের সার বস্তুতঃ[২] বিষয়ের মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু মানসিক আকারে[৩] মনের মধ্যেও বর্ত্তমান। একই সার আকারে ভিন্ন হইলেও উভয়ত্রই বর্ত্তমান। এই সম্প্রত্যয় বা ধারণা[৪] দ্বারা স্পিনোজা বস্তু[৫] ও চিন্তা, জড় ও চৈতন্যের মধ্যে সেতুনির্ম্মাণ করিয়াছেন ; উভয়ের মধ্যে যে সংযোগ আছে, তাহা ধরিয়া লইয়াছেন, এবং প্রকৃতির মধ্যে দ্বৈত স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার দর্শনের প্রারম্ভেই তিনি অধ্যাত্মবাদ[৬] বর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা যে কেবল আমাদের প্রত্যয়ই জানি, তাহা নয়। আমাদের প্রত্যয় জানিবার পূর্ব্বেই, তাহার "বিষয়"কে জানিতে হয়। প্রত্যয় ও বিষয় একজাতীয় নয়। উভয়ের গুণের মধ্যে কোনও সমতা নাই। প্রত্যয় যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাই তাহার সত্যতার প্রমাণ, প্রমাণান্তরের প্রয়োজন নাই। প্রমঃ অর্থাৎ সত্য প্রত্যয়ের[৭] কোনও বাহ্য প্রমাণের[৮] প্রয়োজন নাই। প্রত্যয় ও তাহার বিষয়ের মধ্যে যে মিল, তাহার কারণ একই সার উভয়ের মধ্যেই বর্ত্তমান। প্রত্যয়ের সার ও তাহার বিষয়ের সার এক ও অভিন্ন, যদিও তাহাদিগকে বিভিন্ন বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হয়। বিষয় হইতেই মনে তৎসংশ্লিষ্ট প্রত্যয়ের অধিষ্ঠান। সুতরাং ঐ সার পূর্ব্ব হইতেই বিষয়ে বর্ত্তমান বলিতে হইবে। বিষয় হইতেই উহা মনে সংক্রামিত হয়। এই "সার" একটি সত্য পদার্থ[৯], সদৃশ বস্তুর সাধারণ গুণাবলী বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত নামমাত্র নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে স্পিনোজার মত নামবাদ[১০] হইতেও বহুদূরে অবস্থিত।

কিন্তু সমস্ত প্রত্যয়ের মধ্যেই বস্তুর "সার" সমান পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে না। স্বপ্নে যে সকল প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, তাহাতে বিষয়ের "সার" সকল সময় থাকে না। জ্ঞানের জন্য এই সকল ভ্রান্ত ও কাল্পনিক প্রত্যয় হইতে সত্য প্রত্যয়ের পার্থক্য-বোধ আবশ্যক। সত্য প্রত্যয়ের লক্ষণ স্পষ্টতা[১১] ও বিশিষ্টতা[১২], প্রত্যয়ের আধেয়ের[১৩] ঔজ্জ্বল্য[১৪], ও তাহাদের সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা। প্রত্যয়ের সারের মধ্যে কি কি আছে, এবং কি কি নাই, তাহার স্পষ্ট জ্ঞান না হইলে, তাহার সত্যতা-সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না। তাহার মধ্যে যাহা নাই, এবং যাহা আছে, এই উভয়ের মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা বোধগম্য হওয়া চাই। যে প্রত্যয় এইরূপ স্পষ্ট, এবং অন্যান্য প্রত্যয়ের সহিত যাহার পার্থক্যের সীমারেখা সুনির্দ্দিষ্ট, তাহাই সত্য প্রত্যয়। প্রত্যয়ের সারের মধ্যে কি আছে এবং কি নাই, ইহার স্পষ্ট বোধ হইলে, তাহার মধ্যে ভ্রান্তি অথবা কল্পনা প্রবেশ করিতে পারে না। অসমান ব্যাসার্দ্ধ-সমন্বিত কোনও

---

[1] Area [2] Objectively [3] Formally, Subjectively. [4] Conception.
[5] Things. [6] Idealism. [7] True Ideas. [8] Criterion
[9] Reality. [10] Nominalism. [11] Clearness
[12] Distinctness [13] Contents [14] Luminousness

গোলাকার ক্ষেত্রের প্রত্যয় "বৃত্তের" সত্য প্রত্যয় হইতে পারে না। পৃথিবীকে থালার মত এবং অশ্বকে উড্ডীয়মান জন্তু বলিয়া কল্পনা করা তখনই সম্ভব, যখন পৃথিবীর ও অশ্বের প্রত্যয়ের মধ্যে তাহাদের "সার" সুস্পষ্ট ও স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধ থাকে না। যে সকল বস্তু নিয়ত[1], অথবা যাহা অসম্ভব, তাহাদের সম্বন্ধে কল্পনার স্থান নাই। সুতরং দেখা যাইতেছে, সত্যের লক্ষণ মনের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে; মনের প্রত্যয় যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রকৃতি বিশুদ্ধ ভাবে প্রতিবিম্বিত হইবে, অর্থাৎ প্রকৃতির জ্ঞান অন্তরের মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

মনঃ হইতে ভ্রান্ত প্রত্যয় সকল বহিষ্কৃত হইবার পরে, তাহার মধ্যে কেবল অনুভূত বস্তুর "সার"ই থাকে। কিন্তু এই সমস্ত সারের বিশৃঙ্খল অবস্থিতিদ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। জ্ঞানের জন্য তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত করা আবশ্যক, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তদনুসারে তাহাদিগকে সজ্জিত করাই বুদ্ধির কার্য্য। প্রত্যয় ও বিষয়ের মধ্যে মিল আছে বলিয়াই এইভাবে প্রত্যয়দিগকে সজ্জিত করা সম্ভবপর হয়। প্রকৃতির মধ্যে যদি কোনও বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে মনের মধ্যস্থ প্রত্যয়রাজির মধ্যেও কোনও সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভবপর হইত না। প্রকৃতির শৃঙ্খলাই চিন্তায় প্রতিফলিত হয়, এক প্রত্যয় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যয় হইতে অনুমানের যোগ্য হয়, দ্বিতীয় প্রত্যয় আবার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যয় হইতে অনুমিত হইতে পারে। এই ভাবে সমস্ত প্রত্যয়ই প্রকৃতির মূল উৎসের সহিত সংযুক্ত হয়।

দেখা গেল স্পিনোজার মতে পদার্থসকল দুই প্রকার, দুইটি ভিন্ন জগতে অবস্থিত—বস্তুজগৎ ও চিন্তাজগৎ। জ্ঞানের উৎস চিন্তাজগতে। বস্তুজগতে বস্তু আছে, কিন্তু জ্ঞান নাই। চিন্তাজগতে যেমন চিন্তার জ্ঞান আছে, তেমনি বস্তুর জ্ঞানও আছে। এই জ্ঞান অগ্রসর হয় অবরোহক্রমে[2]। সুতরাং চিন্তাজগতে চিন্তার পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে জ্ঞানের সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা নাই; চিন্তাজগতে শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠাই বাহ্যজগতের সত্যজ্ঞান।

Ethics (চরিত্র নীতি)

স্পিনোজার গ্রন্থাবলীর মধ্যে "Ethics" সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। Ethics শব্দের অর্থ চরিত্রনীতি অথবা কর্ম্মনীতি। আদর্শ চরিত্র কি এবং তাহা লাভের উপায় কি, তাহার আলোচনাই চরিত্র-নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। স্পিনোজার Ethicsএর উদ্দেশ্যও মুখ্যতঃ তাহাই। কিন্তু আদর্শ চরিত্র বুঝিতে হইলে মানুষ বস্তুতঃ কি, তাহার স্বরূপ কি, তাহার সহিত অন্য মানুষের কি সম্বন্ধ, জগতের স্বরূপ কি, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা অপরিহার্য্য। এই জন্যই স্পিনোজা এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনাও করিয়াছেন। পাঁচ অধ্যায়ে

---

[1] Necessary [2] In the order of deduction

এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে আছে ঈশ্বরের কথা[1]; দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে মনের প্রকৃতি ও উৎপত্তির কথা[2]; তৃতীয় অধ্যায়ে চিত্তাবেগের উৎপত্তি ও প্রকৃতি[3]; চতুর্থ অধ্যায়ে চিত্তাবেগের শক্তি[4]; এবং পঞ্চম অধ্যায়ে বুদ্ধির শক্তি[5] বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থের নামকরণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, যে স্পিনোজার নিকট দর্শনের আলোচ্য বিষয় মুখ্যতঃ চরিত্রনীতির সমস্যা। এই সমস্যা প্লেটো প্রথম উত্থাপিত করিয়াছিলেন। পরার্থ-পরতার সহিত স্বার্থপরতার যে বিরোধ, সেই বিরোধের মীমাংসাই এই সমস্যা। স্পিনোজার তত্ত্ববিদ্যা এই সমস্যা-সমাধানের সাধন। তিনি প্রমাণ করিতে চেস্টা করিয়াছেন, যে প্রকৃত পক্ষে পরার্থপরতা ও স্বার্থপরতার মধ্যে বিরোধ নাই; পরের মঙ্গল-দ্বারাই কেবল নিজের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। ইউক্লিডের জ্যামিতির পদ্ধতি অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। ফলে গ্রন্থ এতই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, যে ইহার প্রত্যেক পংক্তির জন্য ভাষ্যের প্রয়োজন। ইহা অপেক্ষাও সংক্ষিপ্ত আকারে ভারতীয় দর্শন লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাও অন্বয়, ভাষ্য ও টীকার সাহায্য ব্যতীত বোধগম্য হয় না! দে-কার্ত্ত বলিয়াছিলেন, গণিতের প্রণালীতে ব্যাখ্যাত না হইলে কোনও মীমাংসাকেই নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু তাঁহার আদর্শ প্রণালী তিনিও সর্ব্বত্র অবলম্বন করিতে পারেন নাই। এই প্রণালী-অবলম্বনের ফলে স্পিনোজার গ্রন্থ নীরস হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভাষার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সত্যই তাঁহার প্রিয়তর ছিল।

যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই স্পিনোজা মধ্যযুগের দর্শনশাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক দর্শনে যেস্থলে Reality (পরমার্থ) শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেখানে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন Substance; Complete অর্থে ব্যবহার করিয়াছে, Perfect; Object স্থলে Ideatum, Subjectively স্থলে Objectively, এবং Objectively স্থলে Formally শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইজন্য তাঁহার রচনার অর্থবোধ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। স্পিনোজাকে বুঝিতে হইলে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। তাঁহার জীবনের পরিণত চিন্তার ফল এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। দ্রুত পাঠ করিয়া গেলে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কোনও অংশ বর্জন করিলে পরের অংশ বোধগম্য হইবে না। সমগ্র গ্রন্থখানা পড়িয়া শেষ করিবার পূর্ব্বে কোনও অংশই সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায় না। Jacobi বলিয়াছেন, Ethicsএর কোনও পংক্তির অর্থ যদি পাঠকের মনে অস্পষ্ট থাকে, তাহা হইলে তিনি স্পিনোজাকে সম্পূর্ণ বুঝিয়াছেন বলা যায় না। স্পিনোজা নিজেও পাঠক-সমাজকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে এবং গ্রন্থ শেষ করিবার পূর্ব্বে কোনও মত-গঠন না করিতে উপদেশ দিয়াছেন। Will Durant লিখিয়াছেন, "গ্রন্থখানা একবারে পড়িয়া ফেলিবেন না, অল্প অল্প করিয়া পড়িবেন। গ্রন্থ শেষ হইলে মনে করিবেন, যে গ্রন্থ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। ইহার পর Pollock অথবা Martineau

[1] Concerning God [2] Nature and Origin of the mind)।
[3] Origin and Nature Of Emotions
[4] The Strength Of Emotions [5] Power of the Intellect

অথবা অন্য কাহারও লিখিত ভাষ্য পড়ুন। ভাষ্য শেষ করিয়া Ethics পুনরায় পড়ুন! তখন ইহার মধ্যে নূতন আলোর সন্ধান পাইবেন। দ্বিতীয়বার পাঠ সমাপ্ত হইলে চিরজীবন আপনি দর্শন শাস্ত্রের অনুরাগী হইয়া থাকিবেন।"

স্পিনোজার দর্শন তিনটি সম্প্রত্যয়ের[1] উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তিন প্রত্যয়ের সংজ্ঞা হইতে. মাকড়সার দেহ হইতে উর্ণার মত তাঁহার সমগ্র দর্শন বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইউক্লিড় যেমন কতকগুলি সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা হইতে তাঁহার জ্যামিতির সমস্ত তত্ত্ব নিষ্কর্ষণ করিয়াছেন, তেমনি স্পিনোজা তিন প্রত্যয়ের সংজ্ঞা হইতে তাঁহার সমগ্র দর্শন উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই তিনটি প্রত্যয়—(১) Substance, (২) Attribute ও (৩) Mode। দে-কার্ত্ত Substance শব্দের যে সংজ্ঞা দিয়াছিলেন, স্পিনোজা তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। যাহার অস্তিত্ব অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না, তাহা Substance (সৎ)। স্পিনোজার মতে এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে একাধিক Substance থাকিতে পারে না। যাহার অস্তিত্ব অন্য কিছুর উপব নির্ভর করে না, তাহা অসীম, অনন্তপার ; তাহা সসীম হইতে পারে না ; অন্য কোনও পদার্থ-দ্বারা তাহা সীমাবদ্ধ হইতে পারে না, অথবা অন্য কিছুই তাহার অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য্য হইতে পারে না। অস্তিত্বের অন্যনিরপেক্ষ শক্তির[2] অর্থ স্বয়ম্ভূ সত্তা, স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা—যে সত্তা অন্য কিছুর অপেক্ষা করে না। অন্য কোনও পদার্থে তাহার সীমা অথবা ব্যতিরেক থাকিতে পারে না। কেবল অসীম পদার্থই এতাদৃশ সত্তাবান্ Substance হইতে পারে। অসীমের বহুত্ব অসম্ভব—একের অধিক অসীম পদার্থ থাকিতে পারে না। কেননা বহুসংখ্যক অসীমের যদি অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে একটি অসীমকে অন্য অসীম হইতে পৃথক করা যাইত না। ভেদ যদি না থাকে, তাহা হইলে একটি হইতে অন্যটিকে ভিন্ন বলা যায় না ; তাহারা অভিন্ন, একই। দে-কার্ত্ত একাধিক Substance এর বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু 'অসীম বহুসংখ্যক'—ইহা একটি স্ব-বিরোধী উক্তিমাত্র। কেবলমাত্র একটি Substance এর অস্তিত্ব সম্ভবপর,—সেই Substance সম্পূর্ণ ভাবেই অসীম। যে সকল সসীম দ্রব্য আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রাপ্ত হই, তাহাদের অস্তিত্বের জন্য এইরূপ একটি স্বয়ংসিদ্ধ অদ্বিতীয় Substanceএর প্রয়োজন। কেবলমাত্র সসীম পদার্থ আছে, অসীম নাই, যাহারা অন্য পদার্থকর্তৃক উৎপন্ন ও অন্য পদার্থের উপব নির্ভরশীল, তাহারা আছে, কিন্তু যাহা স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহার অস্তিত্ব নাই, ইহা স্ব-বিরোধী উক্তি। অসঙ্গ Substanceই যাবতীয় সত্তার কারণ। ইহারই কেবল বাস্তব অনপেক্ষ সত্তা আছে। প্রত্যেক সসীম পদার্থের সত্তা ইহাতেই নিহিত। এই সত্তা-বর্জিত কিছুই নাই। সকলই ইহার সহিত সম্বদ্ধ। যাবতীয় সত্তা ইহার অন্তর্গত, কেননা ইহার পার্শ্বে অন্য স্বয়ংসিদ্ধ পদার্থ কিছু নাই। ইহাকে যাবতীয় সত্তার কারণ বলিলে ঠিক হইবে না ; ইহাই যাবতীয় সত্তা। প্রত্যেক বিশিষ্ট সত্তা এই সার্বিক Substanceএর ব্যক্তিত্বাপন্ন ভাব। এই সার্বিক Substance তাহার অন্তর্নিহিত নিয়তি

[1] Notions [2] Absolute Power to exist.

বশতঃ স্বীয় অসীম সত্তাকে সত্তার অপরিমেয় পরিমাণে প্রসারিত করে, এবং আপনার মধ্যে সত্তার যাবতীয় রূপকে ধারণ করে। এই এক ও অদ্বিতীয় Sudstanceকে স্পিনোজা ঈশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ঈশ্বর খৃষ্টধর্মের ঈশ্বর নহেন, ব্যক্তিত্বাপন্ন পুরুষ[১] নহেন। তিনি জগৎকে ইচ্ছাবশে সৃষ্টি করেন নাই। আদিতে কিছুই ছিল না, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন এবং তাহার ফলে স্বতন্ত্র জগৎ উৎপন্ন হইল, ইহা নহে। জগৎ ঈশ্বরেরই প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যাঁহারা জগতে ঐশ্বরিক সত্তার পরিণাম ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পান, স্পিনোজা তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়াছেন। তাঁহাদের মত দ্বৈতমূলক। সেই মতে যাবতীয় পদার্থের একত্ব বিনষ্ট হয়; জগতের স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিতে হয়, এবং ঈশ্বরের এককর্তৃত্ব অস্বীকৃত হয়। জগৎ ঈশ্বরের পার্শ্বে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত নহে—ইহা ঈশ্বরের সৃজনশীল সত্তার বিকিরণ।[২] সে সত্তা স্বরূপতঃ অসীম। ঈশ্বর সকল পদার্থের Substance। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং যাবতীয় পদার্থে একটি মাত্র Substance বর্ত্তমান, এই দুই উক্তির মধ্যে প্রভেদ নাই।

Substance (সৎপদার্থ)-সম্বন্ধে স্পিনোজার উক্তি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইল। এই Substance কি, সে-সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইযাছে। Substanceএর স্বরূপ কি, এই প্রশ্নের উত্তর সহজসাধ্য নহে। উপনিষদে ব্রহ্মকে 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং' বলা হইয়াছে, তাঁহাকে 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'-স্বরূপ বলা হইযাছে। কিন্তু স্পিনোজা এ প্রকারে Substanceএর কোনও স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাহার কারণ, তাঁহার মতে কোনও পদার্থের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করিতে হইলে, সংজ্ঞার মধ্যে উক্ত পদার্থের অব্যবহিত কারণের উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু Substanceএর বহিঃস্থ কোনও কারণ নাই। স্পিনোজার মতে All determination is negation অর্থাৎ কোনও পদার্থকে কোনও বিশেষণ-দ্বারা বিশেষিত করিলেই তাহাতে অন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। বিশেষীকরণ-দ্বারা পদার্থের সত্তার খর্ব্বতা সাধিত হয়, তাহা-দ্বারা আপেক্ষিক অসৎকে[৩] স্বীকার করা হয়। কোনও পদার্থকে বিশেষীকৃত করার অর্থ তাহাকে সত্তার একটা অংশ হইতে স্বতন্ত্র করা, তাহাকে সীমা দ্বারা আবদ্ধ করা। পদার্থের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশের অর্থ তাহার সীমার নির্দ্দেশ করা। "কোনও দ্রব্য হরিৎ-বর্ণ' বলিলে তাহাকে রক্ত, পীত ও অন্যান্য বর্ণযুক্ত দ্রব্য হইতে পৃথক করা হয়; কোনও দ্রব্যকে ভালো বলিলে তাহাকে মন্দ হইতে পৃথক করা হয়। "কোনও পদার্থ নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ" বলা আর "সেই পদার্থ সেই সীমার বাহিরে বর্ত্তমান,, ইহা অস্বীকার করা একই কথা। 'উহা হরিৎ', ইহার অর্থ 'উহা পীত নহে' বলা। কোনও পদার্থে কোনও গুণের আরোপ করিলেই উক্ত গুণের বিপরীত গুণের বর্ত্তমানতা অস্বীকার করা হয়। (Negation= Denial). All determination is negation—এই তত্ত্ব স্পিনোজার দর্শনের গোড়ার কথা।

Substanceকে কোনও বিশেষ নামে অভিহিত করিলে তাহাকে সসীমে পরিণত করা হয়। সুতরাং উহার সম্বন্ধে কেবল নেতিবাচক উক্তিই হইতে পারে। Substance ইহা

[১] Personal God [২] Emanation [৩] Relative non-being

নয়, উহা নয়, এইরূপ বলা চলে। Substanceএর বহিঃস্থ কোনও কারণ নাই, উহা বহু নয়, বিভাজ্য নয়, এইভাবে উহার বর্ণনা করা যায়। Substance যে এক ও অদ্বিতীয়, তাহা বলিতেও স্পিনোজা সঙ্কুচিত। কেননা 'এক'কে সংখ্যাবাচক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহা করিলে মনে হইতে পারে, ইহার বিপরীত 'বহু'র অস্তিত্ব আছে। যে সকল বিশেষণদ্বারা Substanceএর নিজের সহিত সম্বন্ধ ব্যক্ত হয়, কেবল সেই সকল বিশেষণই ইহার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই অর্থেই স্পিনোজা বলিয়াছেন—Substance তাহার নিজের কারণ, স্বয়ম্ভূ[1]। তাহার স্বরূপই সত্তা। Substaneeকে যখন সনাতন বলিয়াছেন, তখনও ঐ একই অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে। কেননা তাঁহার নিকট 'সনাতনত্ব' ও Subsatnceএর সত্তা একই অর্থ-বোধক। জ্যামিতিকগণ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের ধর্ম্মগুলিকে সনাতন বলেন, কেননা এক এক ক্ষেত্রের সংজ্ঞা-দ্বারাই তাহার ধর্ম্মগুলি প্রমাণিত হয়। ত্রিভুজের কোণসমষ্টি যে দুই সমকোণের সমান, ইহা ত্রিভুজের ত্রিভুজত্বের মতই সনাতন। Ethicsএর প্রথম খণ্ডের ৭ম প্রতিজ্ঞায় আছে—অস্তিত্ব Substanceএর স্বরূপের অন্তর্গত[2]। ৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞায় প্রমাণিত হইয়াছে, কোনও Substance অন্য Substance-দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না। অর্থাৎ Substance তাহার নিজেরই কারণ। 'নিজের কারণ'এর সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে—সত্তা যাহার স্বরূপের অন্তর্গত, তাহাই নিজের কারণ। সুতরাং Substance সনাতন পদার্থ। 'অসীম' বিশেষণও স্পিনোজা Substance-সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। অসীমত্ব ও প্রকৃত সত্তার অর্থ তাঁহার নিকট এক। যখন তিনি ঈশ্বরকে স্বাধীন বলিয়াছেন, তখনও ঐ একই অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বহিঃস্থ কোনও শক্তি-কর্ত্তৃক তিনি প্রভাবিত হন না। তিনি তাঁহার স্বরূপের অনুগত অর্থাৎ তাঁহার সত্তা ও তাঁহার প্রকৃতির নিয়ম পরস্পর সামঞ্জস্য-যুক্ত[3]। Substance-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ—যাহা নিম্নে অবস্থিত; এই দৃশ্যমান পরিণামশীল জগতের পশ্চাদ্দেশে যে নিত্য পদার্থ বর্ত্তমান, তাঁহাকেই স্পিনোজা Substance বলিয়াছেন। বস্তুর উপাদান পদার্থকে তিনি Substance বলেন নাই; কাষ্ঠনির্ম্মিত আসনের উপাদান যেমন কাষ্ঠ; সেইরূপ জগতের উপাদান জড় বস্তুকে তিনি Substance নাম দান করেন নাই। কাহারও বক্তৃতার বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া যখন তাঁহার Substance এর উল্লেখ করা হয়, তখন Substance শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, স্পিনোজা তদনুরূপ অর্থে উক্ত শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, প্রকৃতি অর্থে অনেকে পুঞ্জীভূত জড় পদার্থ বুঝিয়া থাকেন; সেই অর্থে তিনি প্রকৃতি ও ঈশ্বর-শব্দের ব্যবহার করেন নাই। কোনও গ্রন্থের মর্ম্ম যেমন গ্রন্থের প্রত্যেক অংশেই অনুস্যূত থাকে, তেমনি জগতের Substsnce জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে অনুস্যূত। গ্রন্থের মর্ম্ম তাহার উপাদান নয়; গ্রন্থের অবয়ব শব্দ, শব্দের অবয়ব অক্ষর, এই সকলই গ্রন্থের উপাদান। কিন্তু গ্রন্থের যাহা 'সার', তাহাই তাহার Substance। তেমনি জগতের বিশিষ্ট বস্তুসকল

[1] Causa sui [2] Existence appertains to the nature of Substance
[3] In agreement with himself

তাহার উপাদান, অণু-পরমাণু তাহার উপাদান, কিন্তু তাহার Substance নয়। যে অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস, অগন্ধবৎ, অব্যয় পদার্থ এই সমস্ত বিশিষ্ট বস্তু ও অণু-পরমাণু-দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাই Substsnce।

"Attribute বা গুণ"

দে-কার্ত্ত ঈশ্বর ব্যতীত আরও দুইপ্রকার সৎ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন—মননশীল[1] সৎ এবং দেহযুক্ত[2] সৎ। এই দ্বিবিধ সৎকে তিনি ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট বলিয়াছিলেন। মননশীল সতের স্বরূপ চিন্তা বা মনন, দেহযুক্ত সতের স্বরূপ বিস্তার বা ব্যাপ্তি। এই দ্বিবিধ সৎ—চিন্তাশীল সৎ এবং দেহযুক্ত সৎ—চিৎ ও জড়—স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বপ্রতিষ্ঠ না হইলেও, তাহারা ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট হইলেও, দে-কার্ত্ত Substance শব্দের অর্থ কথঞ্চিৎ প্রসারিত করিয়া তাহাদিগকেও সৎ বলিয়াছিলেন। স্পিনোজা চিন্তা এবং ব্যাপ্তিকে এক অদ্বিতীয় সতের গুণ বা attribute বলিয়াছেন, তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন নাই। সৎ আমাদের নিকট চিন্তা-ও-ব্যাপ্তি-রূপেই প্রকাশিত; অন্য কোনও রূপে আমরা তাহার দেখা পাই না। কিন্তু এই দুই গুণের সহিত সতের সম্বন্ধ কি? যদি এই দুই গুণ ভিন্ন সতের অন্য কোনও গুণ না থাকিত, তাহা হইলে এই দুই গুণদ্বারা সৎ বিশিষ্ট হইয়া পড়িত, এবং তাহার সংজ্ঞার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইত, তাহার অসীমত্বও সঙ্কুচিত হইত। সতের গুণের সংখ্যা অনন্ত; তাহাদের মধ্যে চিন্তা ও ব্যাপ্তিই কেবল আমাদের বুদ্ধির গ্রাহ্য। ইহা যদি হয়, ব্যাপ্তি এবং চিন্তার মধ্যে সতের সত্তা যদি অবসিত না হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় মানবের বুদ্ধির সৌকার্য্যের জন্য সৎ ঐ দুই গুণে আপনাকে রূপায়িত করে, আপনাকে চিন্তা ও ব্যাপ্তিতে বিভক্ত করে।"*

বুদ্ধি যাহা সতের স্বরূপ বলিয়া বোধ করে, স্পিনোজা তাহাকেই Attribute বা গুণ বলিয়াছেন। সুতরাং চিন্তা ও ব্যাপ্তি এই দুই গুণ মানবের বুদ্ধির নিকট সৎ কোন্ কোন্ রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাই মাত্র প্রকাশ করে। কিন্তু সৎ এইরূপ কোনও বিশিষ্ট রূপে নিঃশেষিত হইয়া যায় না। সুতরাং সৎ হইতে স্বতন্ত্র কোনও বুদ্ধির নিকট সৎ যেরূপে প্রকাশিত হয়, "গুণ" তাহাই মাত্র ব্যক্ত করে বলিতে হইবে। বুদ্ধি যে সৎকে কেবল চিন্তা ও ব্যাপ্তি-রূপেই দেখিতে পায়, তাহাতে সতের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কেননা সতের গুণ অসংখ্য, অর্থাৎ যতপ্রকার গুণ থাকিতে পারে, তাহারা যদি সীমাব্যঞ্জক না হয়, তাহা হইলে সতের সে সকল গুণই আছে, মনে করা যাইতে পারে। মানবীয় বুদ্ধিই কেবল উক্ত দুই গুণ সৎএ আরোপ করে। তদ্ব্যতীত যে অন্য গুণের আরোপ করে না, তাহার কারণ এই, যে মানবীয় বুদ্ধির আর যত গুণের ধারণা আছে, তাহাদের মধ্যে ইহারাই কেবল বস্তুতঃ অস্তিত্বব্যঞ্জক ও বাস্তবত্ব-প্রকাশক। সৎকে যখন চিন্তা-গুণান্বিত

[1] Thinking Substance. [2] Bodily Substanse.

* Schweglerএর এই উক্তির সহিত 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা' ("ব্রহ্মণো" এখানে কর্তরি ষষ্ঠী) এই বচনটির তুলনা করা যাইতে পারে।

দেখি, তখন বুদ্ধির নিকট সৎ চিৎস্বরূপ, যখন ব্যাপ্তি-গুণান্বিত দেখি, তখন জড়স্বরূপ। বস্তুতঃ এই দুই গুণ সৎ যেরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনামাত্র, সতের স্বরূপের সহিত তুলনায় অনুপযোগী। সৎ এই দুই গুণের অন্তরালে নির্ব্বিশেষ অসীমরূপে বর্ত্তমান, কোনও বিশিষ্ট প্রত্যয়-দ্বারা তাহাকে বিশেষিত করা যায় না। সৎ স্বরূপতঃ কি, তাহা এই গুণদ্বয়-দ্বারা ব্যক্ত হয় না। "অ-সঙ্গ সৎ এবং উক্ত গুণদ্বয়ে তাহা যে বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে স্পিনোজা কোনও যোগসূত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।"*

ব্যাপ্তি ও চিন্তা পরস্পর বিভিন্নধর্ম্মী। একই সতের গুণ হইলেও, তাহারা পরস্পর নিরপেক্ষ, যে সৎকে তাহারা প্রকাশ করে, তাহার মতই অন্য-নিরপেক্ষ। চিন্তা ও ব্যাপ্তির পরস্পরের উপর কোনও প্রভাব থাকিতে পারে না। যাহা জড়, তাহার কারণ জড় ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। যাহা আত্মিক, তাহার আত্মিক (যেমন প্রত্যয়, ইচ্ছা প্রভৃতি) ভিন্ন অন্য কারণ থাকা অসম্ভব। আত্মার উপর জড়ের ক্রিয়া যেমন অসম্ভব, জড়ের উপর আত্মার ক্রিয়াও তেমনি অসম্ভব। এই পর্য্যন্ত দে কার্ত্তের সহিত স্পিনোজার মিল আছে। কিন্তু সতের দিক হইতে দেখিতে গেলে উভয় গুণের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সাম্য ও সমবর্ত্তিতা বর্ত্তমান। একই সৎ উভয় গুণে বর্ত্তমান, একই পদার্থ উভয় গুণের বিবিধ বিকারের মধ্যে বর্ত্তমান। বৃত্তের প্রত্যয় ও বৃত্ত একই পদার্থ; একই সার, উভয়ের মধ্যেই বর্ত্তমান। চিন্তা-সম্বন্ধে সে পদার্থ 'প্রত্যয়', ব্যাপ্তি-সম্বন্ধে 'বৃত্ত'। অদ্বিতীয় পদার্থ হইতে পদার্থের একই অন্তহীন শ্রেণী উদ্ভূত। এই শ্রেণীর অন্তর্গত পদার্থসকল উভয়রূপী, তাহাদিগকে ব্যাপ্তির বিকার বলা যায়, চিন্তার বিকারও বলা যায়। সতের মত প্রত্যেক পদার্থেরই ব্যাপ্তি ও চিন্তা—এই দুই রূপ আছে। প্রত্যেক আত্মিক রূপের দৈহিক রূপ আছে, প্রত্যেক দৈহিক রূপের আত্মিক রূপ আছে। প্রকৃতি ও পুরুষ বিভিন্ন বটে, কিন্তু পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। সর্ব্বদাই তাহারা একসঙ্গে বর্ত্তমান; বস্তু ও তাহার প্রত্যয় বিষয় ও বিষয়ীর মত অবিচ্ছিন্ন। বিষয় বিষয়ীর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়, বাহ্য জগৎ অন্তর্জগতে 'প্রত্যয়'রূপে প্রতিফলিত হয়। চিন্তা ও ব্যাপ্তি যদি প্রতি বিন্দুতে অবিভাজ্য-রূপে অভিন্ন না হইত, তাহা হইলে জগৎ একই পদার্থ হইতে উৎপন্ন বলা যাইত না। দেহ ও জীবাত্মার সম্বন্ধও এইরূপ। এই একত্ব প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, যদিও বিভিন্ন পরিমাণে। দে-কার্ত্ত দেহ ও আত্মার মধ্যে সম্বন্ধের সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। উভয়ের একত্ব-দ্বারা স্পিনোজা এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র, তেমনি মানুষে ব্যাপ্তি ও চিন্তা এমনভাবে মিলিত আছে, যে তাহাদিগকে পৃথক্ করা অসম্ভব। বেদনা ও প্রত্যক্ষ প্রতীতি বা জ্ঞানের সঙ্গে স্বয়ং-সংবেদ্য প্রজ্ঞাও মানুষের চিন্তার অন্তর্গত। দেহ ও তাহার মাধ্যমে ক্রিয়াবান্ বাহ্যজগৎ যে সংবেদনের বিষয়, স্পিনোজা তাহাকেই জীবাত্মা বলিয়াছেন। যাহার অবস্থা ও যাহার উপর উৎপন্ন ক্রিয়া জীবাত্মায় প্রতিফলিত হইয়া জ্ঞানের বিষয়

* Schwegler.

হয়, তাহাই দেহ। কিন্তু একের উপর অন্যের প্রভাব নাই। আত্মার উপর দেহের কোনও ক্রিয়া নাই, দেহের উপর আত্মার কোনও ক্রিয়া নাই। আত্মা ও দেহ একই পদার্থ; দেহে ব্যাপ্তিরূপে, আত্মায় চেতন চিন্তা রূপে প্রকাশিত। তাহাদের রূপেরই কেবল প্রভেদ।

Attribute শব্দের সংজ্ঞায় স্পিনোজা বলিয়াছেন, বুদ্ধিতে যাহা সত্তের সার বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই Attribute। কিন্তু সতের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা হইতে তাহার Attribute-সম্বন্ধে কোনও ধারণাই করা যায় না। যাহার ধারণার জন্য অন্য কোনও বস্তুর প্রয়োজন হয় না, তাহাই সৎ—এই সংজ্ঞা হইতে ব্যাপ্তি ও চিন্তা যে সতের গুণ, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। বৃত্তের সংজ্ঞা হইতে তাহার ধর্ম্মের অনুমান সম্ভবপর। কিন্তু সতের সংজ্ঞা হইতে তাহার ধর্ম্ম বা গুণের অনুমান করা যায় না। ব্যাপ্তি ও চিন্তা আমাদের বুদ্ধির নিকট সতের সার বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতেই আমাদের ব্যাপ্তি ও চিন্তার জ্ঞান লাভ হয়; অন্য কোনও বস্তুর প্রত্যয় হইতে ইহাদের উৎপত্তি হয় না। এই জন্য এবং ইহারা অসীম বলিয়া আমরা সতের মধ্যে তাহাদিগকে স্থাপন করি। ব্যাপ্তি ও চিন্তা ব্যতীত সতের আর যে সকল গুণ আছে, সতের সংজ্ঞা হইতে তাহাদের অনুমান করাও অসম্ভব। প্রশ্ন উঠিতে পারে—ব্যাপ্তি ও চিন্তা-গুণের আরোপদ্বারা সৎকে সীমাবদ্ধ করা হয় কিনা। কিন্তু উভয় গুণই অসীম এবং তাহারা বিরুদ্ধধর্ম্মী বলিয়া সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। যাহা ব্যাপ্তি নহে, তাহাই যখন চিন্তা, যাহা চিন্তা নহে, তাহাই যখন ব্যাপ্তি, তখন উভয় গুণের আরোপে সীমাবদ্ধতার আপত্তি উঠিতে পারে না। চিন্তার অসংখ্য গুণের মধ্যে অন্য কোন গুণও ব্যাপ্তি ও চিন্তা নহে। সৎ সমস্ত গুণেরই আধার, সুতরাং এই সকল গুণের আরোপদ্বারা তাহার অসীমত্ব সঙ্কুচিত হয় না। কিন্তু এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মী অসংখ্য গুণের একত্র সমাবেশ সম্ভবপর হইলেও তাহাদের একীভবন সম্ভবপর কিনা—বিভিন্নমুখী অসংখ্য গুণের সমবায়ে জগতের একত্ব সাধন সম্ভবপর কিনা—সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

Modes বা বিকার

অনন্ত সৎ যে সকল বিশেষ বিশেষ রূপে আপনাকে প্রকাশিত করে, স্পিনোজা তাহাদিগকে Mode (বিকার) নাম দিয়াছেন। তরঙ্গের সহিত সমুদ্রের যে সম্বন্ধ, বিকারের সঙ্গে সতের সম্বন্ধ তদ্রূপ। তরঙ্গ উঠিয়া সমুদ্রে মিলাইয়া যায়; থাকে না। বিকার তেমনি সতের বক্ষে ওঠে ও পরে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সসীম কোন দ্রব্যেরই স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ সত্তা নাই। অসংখ্য প্রকারের বিশিষ্ট সসীম রূপের উৎপাদনই সতের অনন্ত সৃজনশক্তির ধর্ম্ম। সতের এই ধর্ম্মবশতঃই সসীম বিশেষ-সকলের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই সকল বিশেষের বাস্তবতা নাই—সতের মধ্যেই তাহাদের স্থিতি। সসীম পদার্থসকলের অবস্থিতি সত্তার সর্ব্বনিম্নস্তরে—সত্তার বহু স্তরের মধ্যে দবিষ্ঠ স্তরে;

তাহাই সর্ব্বশেষ স্তর। সার্ব্বিক জীবন এই সকল বিশিষ্ট সসীম পদার্থে আপনাকে প্রকাশিত করে। বিশ্বব্যাপী কারণশৃঙ্খলে যে এই সকল সসীম বস্তু বাঁধা পড়ে, ইহাই তাহাদের সসীমত্বের লক্ষণ। সৎ তাহার অন্তর্নিহিত স্বরূপেই স্বাধীন কিন্তু বিশিষ্ট দ্রব্য স্বাধীন নহে। প্রত্যেক বিশিষ্ট দ্রব্য তাহার বহিঃস্থ যাবতীয় বিশিষ্ট দ্রব্যের অধীন। তাহারা স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত নহে, অন্য-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অবিমিশ্র নিয়তির রাজ্যে তাহাদের বাস। আত্মরক্ষার জন্য প্রকৃতি তাহাদিগকে যতটুকু স্বাধীনতা দান করিয়াছে, কেবল ততটুকু স্বাধীনতাই তাহাদের আছে।

Attributeএর সহিত Substanceএর সম্বন্ধ

স্পিনোজার তাত্ত্বিক দর্শন উপরে বিবৃত হইল। বিভিন্ন দার্শনিক পণ্ডিত তাঁহার দর্শনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "বুদ্ধি যাহা সতের সার বলিয়া বোঝে", স্পিনোজা তাহাকে Attribute (গুণ) বলিয়াছেন। ইহা হইতে Erdmann ও Schwegler অনুমান করিয়াছেন, বুদ্ধির নিকট Attribute সতের সার হইলেও, প্রকৃতপক্ষে সতের মধ্যে Attributeএর স্থান নাও থাকিতে পারে, এবং সৎ স্বরূপতঃ কি, তাহা Attribute দুইটিদ্বারা ব্যক্ত হয় না। কিন্তু আমাদের মনে অনেক মিথ্যা অথবা কাল্পনিক প্রত্যয় থাকিলেও, স্পিনোজা বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করিবার ও মিথ্যা এবং কাল্পনিক প্রত্যয় মনঃ হইতে বহিষ্কৃত করিবার উপায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিশুদ্ধ বুদ্ধি যদি ব্যাপ্তি ও চিন্তাকে সতের 'সার' বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে বোধকে ভ্রান্ত বলিবার এবং বস্তুতঃ ব্যাপ্তি ও চিন্তা সতের 'সার' নয় বলিবার সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

Natura Naturans এবং Natura Naturata

স্পিনোজা Substance, ঈশ্বর ও প্রকৃতি অভিন্ন বলিলেও, তাঁহার "প্রকৃতির" রূপ দ্বিবিধ। এক রূপকে তিনি বলিয়াছেন—Natura Naturans, দ্বিতীয় রূপকে বলিয়াছেন Natura Naturata। Natura Naturansকেই তিনি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। Natura Naturans ক্রিয়াশীল, সৃজনশীল, যাহাকে Bergson বলিয়াছেন "Elan Vital", যাহা নিত্য নূতন পদার্থ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। Natura Naturata সৃষ্ট জগৎ; প্রকৃতির অন্তর্গত যাবতীয় পদার্থ, পর্ব্বত, অরণ্য, আকাশ, সমুদ্র, সকলই ইহার অন্তর্গত। শেষোক্ত অর্থে স্পিনোজা ঈশ্বর, প্রকৃতি ও Substanceএর অভেদ অস্বীকার করিয়াছেন। প্রথমোক্ত অর্থেই তিনি তাহাদিগকে অভিন্ন বলিয়াছেন[1]।

'Improvement of the Intellect' গ্রন্থে স্পিনোজা জগৎকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন-একটি সনাতন, অন্যটি কালাধীন। পরিণামশীল প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরালে যে নিত্য, অপরিণামী নিয়ম (ঋত) ও অব্যয় সম্বন্ধের শৃঙ্খলা বর্ত্তমান, তাহাকেই তিনি Ethicsএ Substance, ঈশ্বর, Natura Naturans নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সনাতন

[1] Will Durant

অব্যয় নিয়মের জগৎই বেদে "ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম বিশ্বরূপ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরিণামী সসীম পদার্থের প্রত্যক্ষ জগৎকে স্পিনোজা Modes ও Natura Naturata বলিয়াছেন। এই শেষোক্ত জগতের সত্যতা কতটুকু, তাহা বুঝিতে হইলে 'কাল'-সম্বন্ধে স্পিনোজা কি বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

কাল

ইমানুয়েল ক্যাণ্ট দেশ ও কালকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানবৃত্তির[1] আকার[2] বলিয়াছেন। বাহ্য বিষয় জ্ঞানবৃত্তির সংস্পর্শে আসিয়া এই আকারে আকারিত হয়। ক্যাণ্টের মতে দেশ ও কালের বাহ্য অস্তিত্ব নাই; সমগ্র জগতের একসঙ্গে ধারণা করিবার শক্তি আমাদের জ্ঞানবৃত্তির নাই, তাই একটির পরে একটি দ্রব্য গ্রহণ করে। এই গ্রহণ করিবার আকারই দেশ ও কাল। স্পিনোজার মত ইহা হইতে কিছু ভিন্ন। তিনি বিষয়ের বাহ্যিক অবস্থান, একত্র অবস্থিতি এবং পারম্পর্য্যকে মনের বুঝিবার রীতি বলিয়া গণ্য করেন নাই। মনের প্রত্যয়ে ও বাহ্যিক বিষয়ে একই সার বর্ত্তমান বলিয়া তিনি বিষয়ের বাহ্যিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মহাকালের বক্ষে চিহ্নিত বিশেষ বিশেষ কালকে তিনি কল্পনাসৃষ্ট বলিয়াছেন। বুদ্ধি-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, যে অস্তিত্ব যাহার সারের অন্তর্গত, সুতরাং যাহার অস্তিত্ব নিয়ত[3] ও সনাতন, তাহাই বুদ্ধির প্রকৃত বিষয়। এই সকল বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় দেশ ও কাল-নিরপেক্ষ। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন পদার্থেরই পূর্ণ সত্তা নাই। জ্যামিতিক তত্ত্বসকল যেমন দেশ ও কালাতীত, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সত্য, বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ও তেমনি কালাতীত। যাহার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী, সনাতন ও কালের অতীত, তাহার জ্ঞান ও তাহা হইতে ন্যায়ের নিয়মানুসারে উদ্ভূত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান,[4] তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই প্রকৃত জ্ঞান নহে। এই জ্ঞানের রাজ্যে—যেখানে সমস্ত জ্ঞানই পদার্থের 'সার' হইতে ন্যায়ের ক্রমে উদ্ভূত হয়—কালের প্রসর নাই। সেখানে কালের পারম্পর্য্য নাই, সেখানে আছে কেবল 'সত্য'—সেই সমস্ত প্রত্যয়, কালের গতি স্তব্ধ হইয়া পড়িলেও যাহারা পরিবর্ত্তিত হয় না, একই থাকে। বিশ্বগ্রন্থ যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহার মধ্যে আমরা এই সকল সনাতন 'সার' এবং তাহাদের আধেয় (তাহা হইতে ন্যায়ের ক্রমে যাহা অনুমিত হয়) ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু এই সকল সনাতন 'সার' পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় নানাবিধ সমুৎপাদের বা প্রতিভাসের—দৃশ্যমান সত্তা বা অনিত্য পদার্থের—আবির্ভাব হয়। ইহারাই জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বাপন্ন মূর্ত্ত বস্তু[5]। ইহারা বুদ্ধির বিষয় নহে, কল্পনার বিষয়। ইহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক করিবার জন্য কল্পনাকর্ত্তৃক কালের বিভাগ ও তাহাদের প্রকাশক ভাষার সৃষ্টি হয়। যখন কোনও দ্রব্য অন্য দ্রব্য হইতে দ্রুততর বেগে চলে, অথবা যখন বিভিন্ন সময়ে একই দ্রব্য বিভিন্ন গতিতে চলে, তখন দুইটি বর্ত্তমান অনুভূতি, অথবা অতীত অনুভূতি ও বর্ত্তমান অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য-নির্দ্দেশের জন্য 'কালের' ধারণার সহায়তা

---

[1] Perceptive faculty. [2] Form. [3] Necessary.
[4] Adequate knowledge. [5] Concrete particulars.

গ্রহণ করা হয়। তখন ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অস্তিত্ব কল্পিত হয়। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকে স্পিনোজা 'কল্পনার সাহায্যকারী'[১] নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহারা চিন্তার গণনার প্রণালী[২] ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা গণনা করিবার জন্য ইহারা ব্যবহৃত হয়, তাহা সত্তার ব্যতিরেক মাত্র। কালের পরিমাণদ্বারা—সে পরিমাণ বেশীই হোক, কমই হোক—বস্তু-বিশেষের সত্তার পরিমাণ কত কম, তাহাই সূচিত হয়। মহাকালের সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র 'কাল' অনিয়ত সত্তার বর্ণনামাত্র।

স্পিনোজা দুই প্রকারের সত্তার কথা বলিয়াছেন—নিয়ত ও অনিয়ত বা আগন্তুক। যাহা অবশ্যম্ভাবী—যাহার অনস্তিত্ব অসম্ভব—তাহাই নিয়ত। তাহাই প্রকৃত সত্তা। বিশেষ বিশেষ বস্তু অনিয়ত; তাহা অনিত্য, তাহার অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, কল্পনাপ্রসূত, অবিদ্যাসঞ্জাত। বিশিষ্টকাল—পরিমিত কাল—অবিদ্যাজাত। প্রজ্ঞা-চক্ষুদ্বারা সমস্ত বস্তু মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে[৩] পরিদৃষ্ট হয়। তাহাদের অন্তর্গত কল্পনাসৃষ্ট-অংশ-বর্জিত সনাতন অংশ প্রকৃতির নিয়ত শৃঙ্খলার অংশরূপে দৃষ্ট হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্পিনোজার মতে Modesএর জ্ঞান—Natura Naturataর জগতের যে জ্ঞান সাধারণতঃ উৎপন্ন হয়,—তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে; তাহা 'ব্যবহারিক' জ্ঞান, কল্পনাপ্রসূত জ্ঞান। প্রকৃত জ্ঞান বুদ্ধির জগতের জ্ঞান; পরিণামশীল জগতের অন্তরালে অবস্থিত 'ঋতের' জ্ঞান; মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্ট নিত্য পদার্থের জ্ঞান। স্পিনোজার এই মতের সহিত বেদান্তের অধ্যাত্মবাদের তুলনা করা যাইতে পারে।

Attribute ও Modeএর মধ্যে সম্বন্ধ

স্পিনোজা 'In se' এবং 'In alio' নামক দুইটি বিশেষণের ব্যবহার করিয়াছেন। In se বিশেষণের অর্থ, যাহা আপনাতে স্থিত, অন্য পদার্থে অবস্থিত নহে। In alioর অর্থ, যাহা অন্য পদার্থে অবস্থিত। কোনো বস্তুর গুণসমূহ সেই বস্তুর মধ্যে স্থিত, সুতরাং গুণসমূহ In alio। সৎ আপনাতেই অবস্থিত, সুতরাং In se। সতের গুণ সতের মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং In alio। জগতে সৎই একমাত্র পদার্থ, যাহা In se। সূর্য্যের আলো সূর্য্যে অবস্থিত বলিয়া In alio, কিন্তু সূর্য্যও In se নয়। জাগতিক যাবতীয় বিশিষ্ট পদার্থই সতের মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং সৎই একমাত্র In se—একমাত্র স্ব-প্রতিষ্ঠ পদার্থ। অন্য যাবতীয় পদার্থই সমুৎপাদ[৪] বা প্রতিভাস।

কিন্তু সৎ কেবল স্বপ্রতিষ্ঠ নহে, ইহা সর্ব্ব-কারণও বটে, সমুৎপাদ-জগতের সর্ব্ব কারণের কারণ; কেন না সৎ হইতেই সমুৎপাদ-জগতের উৎপত্তি। কিন্তু এই কারণত্ব গুণদ্বয়-সম্বন্ধে সতে আরোপ করা যায় না। কেন না গুণদ্বয় সৎ হইতে উদ্ভূত নহে, ইহারা সতের স্বরূপ, তাহার সার; তাহারা সতের মতই সনাতন। সতের সংজ্ঞা হইতে গুণের অনুমান করা যায় না। কিন্তু স্পিনোজা সৎকে Causa sui বলিয়াছেন—স্বকীয় সত্তার কারণ, বা স্বয়ম্ভু

[১] Aids of imagination.
[২] Calculus of thought.
[৩] Sub specie Eternitatis,
[৪] Phenomena.

বলিয়াছেন। সুতরাং এই দিক হইতে সৎকে গুণের কারণও বলা যায়। গুণদ্বয় বিকার নহে, কেননা বিকারের সংজ্ঞার সহিত তাহাদের মিল নাই। সতের যাহা পরিণাম, অথবা যাহা অন্য পদার্থে অবস্থিত এবং সেই পদার্থের প্রত্যয় হইতে যাহার অস্তিত্বের ধারণা হয়, তাহাকে স্পিনোজা বিকার বলিয়াছেন। গুণ সতের মধ্যে অবস্থিত বটে, কিন্তু সতের প্রত্যয় হইতে তাহাদের প্রত্যয়ের ধারণা হইতে পারে না। তাহা যদি পারিত, তাহা হইলে অসংখ্য-গুণ-সমন্বিত সতের সংজ্ঞা হইতে চিন্তা এবং ব্যাপ্তি সহ অন্যান্য গুণ অনুমিত হইতে পারিত। চিন্তা ও ব্যপ্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের আছে, তাই তাহাদিগকে আমরা জানি, এবং সতে তাহাদের আরোপ করি। সুতরাং গুণদ্বয় Mode নহে, এবং গুণ এবং বিকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সৎ এবং গুণের সম্বন্ধ তদ্রূপ নহে বলিতে হইবে।

গুণ দুইটি বিভিন্নধর্ম্মী; তাহারা এতই বিভিন্ন যে তাহাদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ কল্পনা করা অসম্ভব। সতের অসংখ্য গুণের মধ্যে অন্যান্য গুণ-সম্বন্ধে আমাদের কোনও অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু তাহারা বিভিন্ন। সমস্ত গুণ সতের মধ্যে মিলিত হইয়াছে, এবং বিকার-সমূহ যখন সতেরই বিকার, তখন প্রত্যেক বিকারের মধ্যেও সতের অসংখ্য গুণ বর্ত্তমান। সৎ এই সকল বিভিন্ন সীমাহীন গুণের আধার। এই আধারে গুণদিগের একত্রাবস্থান বোধগম্য হয়, কিন্তু তাহাদের একীভূত হওয়া কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে, তাহা দুর্ব্বোধ্য। জ্যামিতিক ক্ষেত্রের একাধিক গুণ আছে; কিন্তু সে সমস্ত গুণ পরস্পরবিরুদ্ধ নয়; তাহাদের একটি হইতে অন্যগুলির অনুমান করা যায়। কিন্তু ব্যাপ্তি ও চিন্তা বিরুদ্ধধর্ম্মী, ইহাদের একটি হইতে অন্যটির অনুমান অসম্ভব। কোনও বস্তুরই এবম্প্রকার বিরুদ্ধ গুণ আছে বলা যায় না। সতের মধ্যে গুণদ্বয়ের মিলনদ্বারা যদি একত্বের উদ্ভব সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বিশ্বকে এক[1] বলা যায় না, দ্বৈতমূলক[2], অথবা চিন্তা ও ব্যাপ্তি ব্যতিরিক্ত অন্যান্য গুণগুলিও যদি পরস্পর বিভিন্নধর্ম্মী হয়, তাহা হইলে বহুত্বমূলক[3] বলিতে হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য Erdmann গুণদ্বয়কে সত্তার জগৎ[4] হইতে অপসৃত করিয়া কেবল চিন্তার জগতেই তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধি গুণকে সতের সার বলিয়া বুঝিলেও, বাস্তবিক সতের মধ্যে তাহাদের অস্তিত্ব নাই, তাহারা বুদ্ধির সৃষ্টি বলিয়াছেন। কিন্তু স্পিনোজার ভাষার এতাদৃশ ব্যাখ্যা ক্যাণ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও দার্শনিকই করিতে পারিতেন না। স্পিনোজার মতে বুদ্ধিগ্রাহ্য সমস্তই সত্য[5], এবং সতের মধ্যে যাহা নাই, বুদ্ধির পক্ষে তাহা গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। কল্পনার ক্ষেত্রেই[6] বিভ্রম সম্ভব। স্পিনোজা স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে বস্তু যত বেশী সত্য, তাহার মধ্যে তত বেশী গুণ আছে বলিতে হইবে। কোনও বস্তুতে যত বেশী Attributes আরোপ করা যায়, তাহাতে তত বেশী সত্তা আরোপিত হয়, অর্থাৎ ততই বেশী পরিমাণে তাহার স্বরূপের ধারণা জন্মে। স্পিনোজার এই বস্তুবাদ অনুসারে বুদ্ধির বাহিরে গুণদিগের স্থান, এবং তাহারা যে

[1] Unity. [2] Dualistic. [3] Pluralistic.
[4] World of being. [5] Real. [6] Imagination.

সতের স্বরূপ ব্যক্ত করে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যাহার স্বরূপের মধ্যে অসম্বদ্ধ, বিভিন্নধর্ম্মী, বহু বর্ত্তমান, তাহা কিরূপে এক বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এ প্রশ্নের মীমাংসা দুরূহ। Pollock বলিয়াছেন, গুণদ্বয় সতেরএর বিভিন্ন রূপমাত্র,[1] অর্থাৎ মানুষের নিকট উহা ব্যাপ্তি ও চিন্তা-রূপে প্রকাশিত হয়; ব্যাপ্তি ও চিন্তা একই সতের বিভিন্ন প্রকাশ; উভয়ে দৃশ্যতঃ দুই হইলেও প্রকৃতপক্ষে একই সতের সার। যাহা চিন্তা তাহাই সৎ, যাহা ব্যাপ্তি তাহাই চিন্তা। স্পিনোজার কোনও কোনও উক্তির সহিত অসামঞ্জস্য থাকিলেও, ইহাই স্পিনোজার মত বলিয়া গণ্য করা যায়।

বিকারের উদ্ভব কেন হয়? নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতের পূর্ণতার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তাহারা তাহার মধ্যে অপূর্ণতার আমদানী কেন করে? অনন্ত কি স্বকীয় পূর্ণতার ভারে ক্লান্ত (Schelling)? এই প্রশ্নের উত্তরে স্পিনোজা বলেন, ইহাই ঈশ্বরের স্বভাব। বিকারদিগের আবির্ভাব আকস্মিক নহে, নিয়ত। ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে তাহাদের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে অনুস্যূত কারণশক্তির[2] অস্তিত্ববশতঃই বিকার-রূপ কার্য্যের আবির্ভাব হয়। এই অনুস্যূত কারণশক্তি-কর্তৃক সতের মধ্যে যাহা অব্যক্ত আছে, তাহা ব্যক্ত হয়।

সনাতন Modes

স্পিনোজা বিকারদিগের মধ্যে কতকগুলি "সনাতন বিকারের" কথা বলিয়াছেন। বিনশ্বর বিকারদিগের মধ্যে সনাতনত্বের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভবপর হয়? ইহার উত্তরে বলা যায়, বিশিষ্ট বস্তুর[3] 'সার' হইতে তাহার 'অস্তিত্ব'কে পৃথক করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যে তাহাদের 'অস্তিত্ব' ক্ষণস্থায়ী হইলেও, তাহাদের 'সার' সনাতন ও অবিনশ্বর। প্রত্যেক গুণেরই কতকগুলি ধর্ম্ম আছে। গুণের সংজ্ঞার মধ্যে স্পষ্টভাবে এই সকল ধর্ম্মের উল্লেখ না থাকিলেও, তাহাদের 'সার' হইতে এই সকল ধর্ম্মের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। স্পিনোজার মতে যাহার অস্তিত্ব সম্ভবপর, তাহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে। সুতরাং গুণদ্বয়ের এই সকল ধর্ম্ম, যাহা তাহাদিগের 'সার' হইতে অনুমিত হইতে পারে, তাহাদিগেরও বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলিতে হইবে। এই সমস্ত ধর্ম্ম গুণদ্বয়ের পরিণাম, তাহাদিগের 'সার' হইতে উদ্গত এবং তাহাদের মতই সনাতন। গতি ও স্থিতি ব্যাপ্তির ধর্ম্ম। বুদ্ধি চিন্তার ধর্ম্ম। সার্ব্বিক গতি ও স্থিতি এবং সার্ব্বিক বুদ্ধি গুণদ্বয়ের সনাতন বিকার। ইহারা অব্যবহিতভাবে গুণদ্বয় হইতে বহির্গত। গতি ও স্থিতি হইতে নির্গত সনাতন বিকারও আছে। গতি ও স্থিতির বিকারের দৃষ্টান্তস্বরূপ স্পিনোজা "সমগ্র বিশ্বের আকারে"র[4] উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অসংখ্য বিকারের অস্তিত্ব থাকিলেও এই আকার সর্ব্বদা একরূপ থাকে। বিশ্বের গতির পরিমাণ চিরকাল একই থাকে, কখনও তাহার পরিবর্ত্তন

---

[1] Aspects. [2] Immanent causality.
[3] Particular things. [4] Face of the total universe.

হয় না। কোনও বস্তুর অণু-পরমাণুর মধ্যে যতক্ষণ গতি ও স্থিতির অনুপাত একই থাকে, ততক্ষণ এই অণুদিগের আকার, গতি ও গতির দিক যতই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, সেই বস্তুর আকার ও প্রকৃতির তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। অসংখ্য বিশিষ্ট বস্তুর সমবায়ই জগৎ। অণু-পরমাণুর আকার, গতি ও দিক-পরিবর্ত্তনে যেমন কোনও বিশিষ্ট বস্তুর প্রকৃতি ও আকার পরিবর্ত্তিত হয় না, তেমনি বিশিষ্ট বস্তুদিগের গতি, আকার ও দিক পরিবর্ত্তনদ্বারা ও সমগ্র প্রকৃতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং জগতের সর্ব্বত্র সংঘটিত পরিবর্ত্তন-রাজির সমষ্টিমাত্র হইলেও, প্রকৃতি মোটের উপর একই থাকে; দশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই।

চিন্তা (Thought) ও মনঃ (Mind)

চিন্তারূপগুণ হইতে নির্গত বিকারদিগের মধ্যে একমাত্র 'বুদ্ধি'ই সনাতন বিকার। এই বুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধি নহে। সম্পূর্ণ অসীম বুদ্ধিকেই স্পিনোজা চিন্তার অব্যবহিত 'সনাতন বিকার, বলিয়াছেন। কিন্তু এই অসীম বুদ্ধির কোনও সনাতন বিকারের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন নাই। স্পিনোজা যে গুণকে Thinking অথবা Thought নাম দিয়েছেন, তাহা ও 'মনঃ' এক পদার্থ নহে। চিন্তা মনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা, চিন্তা হইতে মনের উৎপত্তি। আমাদের মনের মধ্যেই চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইলেও, যে চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয়, তাহা হইতে আত্মসংবিদ বর্জন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, স্পিনোজা তাহাকেই সত্তের গুণ বলিয়াছেন। সতের গুণ চিন্তারূপে জড় ও চেতন যাবতীয় বস্তুতেই বর্ত্তমান। কিন্তু মানুষের মধ্যে চিন্তার যে রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, ইতর জীব, উদ্ভিদ ও জড়বস্তুতে তাহার পরিচয় নাই। তাই মানুষের মধ্যে চিন্তার যে বিশেষত্ব আছে, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া ক্ষীণকায় চিন্তাকে স্পিনোজা বিশ্বতত্ত্বে[১] পরিণত করিয়াছেন। স্পিনোজার মতে দুইটি বস্তুর মধ্যে যদি সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলেই তাহাদের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্ভবপর হয়। চিন্তা ও ব্যাপ্তি সদৃশ পদার্থ নহে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অসম্ভব। অথচ জড় বস্তুর প্রত্যয় আমাদের মনে উৎপন্ন হয়। কিরূপে এই প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়, তাহার ব্যাখ্যার জন্যই প্রত্যেক জড় পদার্থে এমন কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়, যাহা প্রত্যয়ের অনুরূপ। প্রত্যেক জড় বস্তুতে যেমন ব্যাপ্তি আছে, তেমনি চিন্তাও আছে। ব্যাপ্তির মধ্যে যাহা জড়রূপে জ্ঞাত হয়, চিন্তার মধ্যে তাহাই তাহার প্রত্যয়রূপ। এই প্রত্যয় জড়ের মধ্যে আছে বলিয়াই তাহা আমাদের জ্ঞানগম্য হয়। কিন্তু বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞাত হইবার জন্যই জড়ের মধ্যে এই রূপ প্রত্যয়ের প্রয়োজন; বুদ্ধির বিষয় হইবার জন্যই প্রয়োজন। জ্ঞাতৃত্ব জড়ে নাই; তাহার মধ্যে যে চিন্তা আছে, তাহা জ্ঞাতার পদবীতে উন্নীত হয় নাই, তাহা আত্মসংবিদ নহে। তাহা যে চিন্তার সহিত আমরা পরিচিত, তাহা নহে, সেই চিন্তার শক্যতামাত্র। মানুষের মধ্যেই তাহা আত্মসংবিদে উন্নীত হইয়াছে;

---

[১] Cosmic Principle.

প্রকৃতির মধ্যে অন্তত্র তাহা সংবিৎ-এর ভূমিকামাত্র, তাহার উপাদান[1]মাত্র। ঈশ্বরে স্পিনোজা যে চিন্তার আরোপ করিয়াছেন, তাহা এই "মনের উপাদান", মনঃ নহে। তিনি বলিয়াছেন, "প্রকৃতির মধ্যে একমাত্র মননশীল বস্তু[2] বর্ত্তমান; অসংখ্য প্রত্যয়ে তাহা প্রকাশিত; জগতে যে অসংখ্য বস্তু আছে, তাহাদের মধ্যেই সেই প্রত্যয়সকল অবস্থিত। প্রকৃতির মধ্যে এমন কোনও বস্তুই থাকিতে পারে না, যাহার মধ্যে প্রত্যয় নাই। (Treatise De-Deo) "আমি বিশদভাবে প্রমাণ করিয়াছি যে, বুদ্ধি যদিও অসীম, তথাপি তাহা কেবল Natura Naturataর মধ্যেই আছে, Natura Naturansএর মধ্যে নাই।"* "ইচ্ছা, বুদ্ধি, মনোযোগ, শ্রবণ প্রভৃতি মানবীয় গুণদিগকে আমি ঈশ্বরের গুণের অন্তর্গত করি নাই। প্রত্যয়ের দ্বারা চিন্তাই মানবের বুদ্ধি,[3]—যে বোধের সহিত আত্মসংবিৎ জড়িত। প্রত্যয়বর্জিত চিন্তার স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে আমরা অক্ষম হইলেও, Natura Naturansএ তাহাই আছে। বুদ্ধি আছে Natura Naturataর মধ্যে, ঈশ্বরের মধ্যে নাই। Natura Naturata ঈশ্বরের মূর্ত্ত প্রকাশ। ইহার মধ্যে যে বুদ্ধি আছে, তাহা মানুষের বুদ্ধি। প্রকৃতির মধ্যে যত বস্তু আছে, চেতন ও অচেতন যত কিছু আছে, তাহাদের সমষ্টিই Natura Naturata। সেই সমষ্টির মধ্যে মানুষের বুদ্ধি আছে, এই অর্থে Natura Naturata-রূপী ঈশ্বরে বুদ্ধি আছে। স্পিনোজা বলিয়াছেন, "বুদ্ধিযুক্ত আমাদের মনঃ মননের[4] একটি সনাতন বিকার; অন্য একটি সনাতন বিকারদ্বারা তাহা সীমাবদ্ধ; এই শেষোক্ত বিকারও অন্য আর একটি সনাতন বিকারদ্বারা সীমাবদ্ধ; এইরূপে অসীমসংখ্যক মনঃ একটি আর একটিদ্বারা সীমাবদ্ধ। সকলের সমষ্টিই ঈশ্বরের সনাতন ও অসীম বুদ্ধি"।† ইহা হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয়, যে ঈশ্বরে যে বুদ্ধি আছে বলা হইয়াছে, তাহা মানুষ ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের বুদ্ধি নহে। সেইজন্যই Natura Naturansএ তাহার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই বিকারকে সম্পূর্ণ অসীম বলা যায় না; কেননা চিন্তারূপ গুণের অধিকাংশই, যাহা মানুষের বাহিরে অবস্থিত, তাহা ইহার মধ্যে নাই।

ঈশ্বরের কারণত্ব; অসীমের মধ্যে সসীম বিকার কেন উদ্ভূত হয়?

ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে কারণশক্তির অস্তিত্ববশতঃ তাঁহাতে বিকারের আবির্ভাব হয়, স্পিনোজা বলিয়াছেন। কিন্তু এই কারণশক্তি ও উপপত্তি[5] অভিন্ন। গতি বলিতে যাহা বোঝা যায়, তাহা স্পিনোজার কারণের মধ্যে নাই। সুতরাং যে কারণ হইতে বিকারের আবির্ভাব হয়, তাহা ন্যায়ের যুক্তিমাত্র[6]। ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা ও ব্যাপ্তির কোনও বিকারের সহিত এমন সম্বন্ধ নাই, যে তাহা হইতে সেই বিকারের আবির্ভাব অপরিহার্য্য। দুই ত্রিভুজের বাহুগুলি পরস্পর সমান হইলে তাহাদের কোণগুলিও যেমন সমান হইতে বাধ্য, তেমন কোনও বাধ্যবাধকতা গুণ ও বিকারদিগের মধ্যে নাই। তবু সতের বক্ষে বিকারের

[1] Mind stuff. [2] Res Cogitans—Thinking Substance
[3] Intellectus. [4] Thinking [5] যুক্তি—Reason. [6] Logical reason.
* Epistle, 9. 54 † Ethics V. XL.

আবির্ভাব নিয়ত। "সৎ"নিষ্কল, অংশহীন, এক। Natura Naturata অসংখ্য বিকারের সমষ্টি —অসংখ্য অংশে বিভক্ত। কিন্তু Natura Naturans এক, অবিভক্ত ও অংশহীন। এই অসীম, নিরংশক, নিরপেক্ষ, কেবল, Natura Naturans হইতে তাহারই অংশরূপে প্রতিভাত, তাহারই বক্ষে Natura Naturataর অঙ্গরূপে স্থিত বিকারের আবির্ভাব একটি প্রহেলিকা। এক হইতে বহুর উদ্ভব, নির্ব্বিশেষ হইতে বিশেষের উদ্ভব, কেন হয়, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা স্পিনোজা দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। উপনিষদে আছে 'এক সৎ' "আমি বহু হইব," ইচ্ছা করিলেন, আর বহুর উদ্ভব হইল। "একের" এই ইচ্ছা কারণশক্তি, সেই শক্তির প্রকাশ বহুতে। কিন্তু স্পিনোজার ঈশ্বরে, Natura Naturans-এ, ইচ্ছা নাই। তাহা হইতে নিয়তির বশে বিকারের আবির্ভাব হয় বলিলে সমস্যার সমাধান হয় না। সৎ ও বিকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা অসীম ও সসীমের সম্বন্ধ। অসীম ও সসীম অবিনাভাবী সম্বন্ধে আবদ্ধ[১]। সসীম ভিন্ন অসীম থাকিতে পারে না, অসীম ভিন্ন সসীমের অস্তিত্ব অসম্ভব। এই অর্থে, অসীমের সহিত সসীমের আবির্ভাব যুক্তির নিয়মে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু স্পিনোজা তাহা বলেন নাই। তাঁহার অসীমের মধ্যে শক্তিস্বরূপ কারণত্বেরও অস্তিত্ব নাই। সুতরাং বহুর সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই বলা যায়।

Ethicsএর প্রারম্ভে Modesএর যে সংজ্ঞা স্পিনোজা দিয়াছেন, তাহাতে সতের পরিণাম বা বিকারই[২] Mode। গুণদ্বয় যদিও সতের স্বরূপ, তথাপি সংজ্ঞানুসারে বিকার তাহাদের বিকার নয়, সতেরই বিকার। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে বহু স্থলেই বিকারদিগকে গুণদ্বয়ের পরিণাম বলা হইয়াছে। গুণ দুইটি; সুতরাং বিকারগণও দুইভাগে বিভক্ত—চিন্তার বিকার ও ব্যাপ্তির বিকার। ইহারা সমান্তরালভাবে অবস্থিত। 'প্রত্যয়', 'ইচ্ছা' প্রভৃতি চিন্তার বিকার; ভার, আকার, গতি প্রভৃতি ব্যাপ্তির বিকার। চিন্তার প্রত্যেক বিকারের সঙ্গে ব্যাপ্তির একটি বিকার এবং ব্যাপ্তির প্রত্যেক বিকারের সঙ্গে চিন্তার একটি বিকার সংযুক্ত। সসীমত্ববশতঃই তাহারা বিকার। চিন্তার বিকার অন্য একটি চিন্তার বিকারদ্বারা, এবং ব্যাপ্তির বিকার অন্য একটি ব্যাপ্তির বিকারদ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সমস্ত বিকারের মধ্যে আছে গুণ দুইটির একটি; নাই গুণদ্বয়ের মধ্যে তাহাদের বিকারদিগের সীমারেখার বাহিরে যাহা আছে, তাহা। এই সীমারেখা কে টানিয়া দেয়? অসীম গুণদ্বয় কিরূপে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়? ইহা কি দৃষ্টিবিভ্রম না সত্য? সত্য হইলে কিরূপে ইহা সংঘটিত হয়? স্পিনোজা ইহাকে সত্যই বলিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন নাই। তাঁহার মতে অসীম হইতে অসীম ভিন্ন কিছু বাহির হইতে পারে না। তবে সৎ হইতে বিকারদিগের আবির্ভাব কিরূপে হয়? ইহার উত্তরে স্পিনোজা বলিয়াছেন, সসীম দ্রব্যের স্বরূপ সসীম নয়, অসীম। সসীম দ্রব্যের অস্তিত্বমাত্রই সসীম; তাহাদের স্বরূপ সসীম নহে। অসীম 'স্বরূপ' ও সসীম অস্তিত্বের সমবায়ে সসীম বিকার গঠিত হয়। Ethicsএর প্রথম অধ্যায়ে স্পিনোজা প্রকৃতিকে অসীম

---

[১] Correlatives. [২] Modification.

বলিয়াছেন। অসীমের বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না। যাহা কিছু আছে, তাহা এই অসীমের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু যাহা নাই, কিন্তু হইতে পারে, তাহা ? যাহা হইতে পারে ও যাহা হইয়াছে, সকলই প্রকৃতির মধ্যে। ঈশ্বর ও প্রকৃতি এক। সুতরাং ঈশ্বরের বাহিরে কিছুই নাই। তবে যাহা তিনি সৃষ্টি করিতে সমর্থ, সকলই কি সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন ? তিনি সর্ব্বশক্তিমান; সুতরাং যাহা আছে, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার বেশী সৃষ্টি করিতে পারেন না, ইহা অসম্ভব। তিনি এতই সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন, যে আর কিছু সৃষ্টি করিতে পারেন না, বলিলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার অপহ্নব হয়। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, যে "ঈশ্বর কখনই এত সৃষ্টি করিতে পারেন না, যে তাহার বেশী সৃষ্টি করা অসম্ভব', ইহা একটি স্ববিরোধী উক্তি। ঈশ্বর সবই সৃষ্টি করিতে সমর্থ, সুতরাং "ঈশ্বর কখনই এত সৃষ্টি করিতে পারেন না" বলার অর্থ ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন না। ইহা স্পষ্টতঃই স্ববিরোধী উক্তি। এইরূপে স্পিনোজা ঈশ্বরকে প্রকৃতির মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন। প্রকৃতির অতীত তাঁহার সত্তা স্বীকার করেন নাই। তিনিই প্রকৃতি তিনিই প্রাকৃত, কিন্তু 'প্রকৃতির পর' নহেন। জগতে সকলই নিয়ত, অনিয়ত[1] কিছুই নাই। অনিয়তের ধারণা কল্পনার সৃষ্টি। যাহা আছে তাহা নিয়ত, তাহা অবশ্যম্ভাবী। যাহা আছে, তাহা ব্যতীত আর কিছুই থাকিতে পারে না। (১ম খণ্ড—২৯ প্রতিজ্ঞা।) যাহা হইতে পারে, তাহাও আছে, তাহাও প্রকৃতির মধ্যে।

ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে Natura Naturans এবং Natura Naturataর মধ্যে পার্থক্য কি? Natura Naturans সক্রিয় প্রকৃতি, প্রকৃতির সৃজনশীল শক্তি, যাহা Bergson's Elan vital বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাই। কিন্তু যাহা প্রকৃতিতে আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছু থাকা যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে নূতন সৃষ্টি অসম্ভব। তাহা হইলে প্রকৃতির 'সৃজনশীল শক্তি' নিরর্থক হইয়া পড়ে।

সত্যই স্পিনোজার দর্শনে "সৃষ্টি" শব্দের কোনও স্থান নাই। ত্রিভুজের সংজ্ঞা হইতে, তাহার 'সার' হইতে, যেমন তাহার ধর্ম্মসকলের (লক্ষণসকলের) সৃষ্টি হয় না, তাহারা বুদ্ধিতে স্পষ্টীকৃত হয় মাত্র, তেমনি সতের স্বরূপ হইতেও কিছুরই সৃষ্টি হয় না, তাহারা অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত হইয়া বাহির হয় মাত্র। ত্রিভুজের 'সার'কে তাহার ধর্ম্মের কারণ বলা যাইতে পারে। সৎকেও তাহার বিকারদিগের কারণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু এই কারণত্বের মধ্যে যুক্তির শক্তি, যুক্তির নিয়তি ভিন্ন অন্য কোনও শক্তি নাই। স্পিনোজার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ এই যুক্তির সম্বন্ধের অতিরিক্ত কিছু নহে।[2] সুতরাং প্রকৃতির সক্রিয়তা বলিলে প্রকৃতির অন্তর্গত এই যুক্তির নিয়তি ভিন্ন অন্য কোনও শক্তির অস্তিত্ব বোধগম্য হয় না। "যাহা আছে, তাহা ব্যতীত আর কিছু থাকিতে পারে না", ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির স্বরূপ হইতে ন্যায়ের নিয়তিবশতঃ যাহা বাহির হয়, তাহা বাস্তবিকই আছে। 'যাহা বাহির হয়' অর্থ যাহা মানুষের বুদ্ধির নিকট স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয় মাত্র। তাহার নূতন সৃষ্টি হয় না। Natura Naturata এবং Natura Naturansএর মধ্যে পার্থক্য প্রকৃতির স্বরূপ ও

---

[1] Contingent, [2] Logical necessity.

তাহার স্বরূপের সহিত যাহা যুক্তির নিয়মে সংযুক্ত, এই উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহাই মনে হয়।

স্পিনোজা বুদ্ধি[1] ও কর্ম্মকে[2] অভিন্ন বলিয়াছেন। 'সার' ও 'কারণ'ও অভিন্ন বলিয়াছেন। বুদ্ধি বলিতে জ্ঞান, জ্ঞানক্রিয়া, 'সার' একপ্রকার সত্তা। কিন্তু 'কর্ম্ম' ও 'কর্ম্মোৎপত্তি' অর্থ 'করা'। 'জ্ঞান' ও 'সত্তা হইতে কিরূপে কর্ম্ম ও কর্ম্মোৎপত্তিতে পৌছান যায়, তাহা বোধগম্য হয় না। তাঁহার কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি ন্যায়ের নিয়মে হয়, তাহাতে কোনও শক্তির প্রয়োজনও নাই, স্থানও নাই; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, "প্রত্যেক বস্তু যতটা পারে, স্বকীয় সত্তায় স্থির থাকিবার জন্য চেষ্টা করে (৩য় খণ্ড —৬ষ্ঠ প্রঃ); এই চেষ্টা বস্তুর স্বরূপ ভিন্ন কিছুই নহে।" এই স্বরূপ হইতেই নিয়ত কার্য্যের আবির্ভাব হয়, নিয়ত কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্যের আবির্ভব হইতে পারে না। আত্মরক্ষার চেষ্টাস্বরূপ বস্তুর স্বরূপ হইতে যে নিয়ত কার্য্যের আবির্ভাব হয়, তাহা যখন নিয়ত, তাহার সহিত বস্তুর স্বরূপের সম্বন্ধ যখন কেবল ন্যায়েরই সম্বন্ধ, তখন সেই চেষ্টাকে শক্তির প্রয়োগ বলা যায় না। তাহাকে ইচ্ছাও বলা যায় না, যদিও মানুষের এই আত্মরক্ষার চেষ্টাকে স্পিনোজা 'Voluntus' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং এই 'আত্মরক্ষার চেষ্টাদ্বারাও প্রকৃতির সক্রিয়তার কোনও ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না।*

---

[1] Understanding. [2] Action. [3] Conatus

*Martineau স্পিনোজার 'আত্মরক্ষার চেষ্টা' (conatus) মতের এইরূপ সমালোচনা করিয়াছেন :—প্রত্যেক জড় দ্রব্যের মধ্যে এক একটি প্রত্যয় আছে। Conatus (কৃতি) সেই জড়পদার্থের অথবা তাহার মধ্যস্থ প্রত্যয়ের ধর্ম্ম। ইহা Thinking Attrtbute অথবা Extension Attributeএর অন্তর্গত ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে, ইহা জড় দ্রব্যস্থ প্রত্যয়েরই অন্তর্গত। মানুষে এই 'কৃতি' তাহার জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত, অর্থাৎ এই চেষ্টা সজ্ঞানে হয়। প্রকৃতির ম.., এই চেষ্টা প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্গত প্রত্যয়ের মধ্যগত। কিন্তু এই চেষ্টা প্রযুক্ত হয় অন্য জড় দ্রব্যের বিরুদ্ধে, Extensionএর জগতে। সসীম দ্রব্যজাতের মধ্যে আপনার স্থান রক্ষা করিবার জন্য জড় দ্রব্যের বিরুদ্ধে যখন এই চেষ্টা প্রযুক্ত হয়, তখন 'কৃতি' যে প্রত্যয়ে অবস্থিত, তাহা হইতে তাহার সহিত সংহত জড়দ্রব্যে সংক্রামিত হইয়াই অন্য জড়দ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং Thinkingও Extensionএর মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া অসম্ভব, এই মতের সহিত conatus তত্ত্বের সামঞ্জস্য নাই। Ethicsএর তৃতীয় অধ্যায়ে ২য় প্রতিজ্ঞায় আছে, দেহ হইতে মনে চিন্তার উদ্ভব হইতে পারে না, মনঃদ্বারাও দেহের গতি অথবা স্থিতি, অথবা স্থিতি ও গতি ভিন্ন যদি অবস্থান্তর কিছু থাকে, তাহা উৎপন্ন হয় না।" কিন্তু এই প্রতিজ্ঞার টীকায় স্পিনোজা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত এই প্রতিজ্ঞার প্রথমাংশের সামঞ্জস্য নাই। মনের ইচ্ছাদ্বারা দেহ চালিত হয়, এই বিশ্বাসের খণ্ডনের জন্য এই টীকায় স্পিনোজা বলিয়াছেন, দেহের সামর্থ্য যে কত, তাহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। উৎস্বপ্নদ্রষ্টা (Somnambulists) ও ইতর জীবের কার্য্য হইতে দেহ যে কত সুকৌশলে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং চিত্র-অঙ্কন অথবা গৃহনির্ম্মাণে যে দেহ সক্ষম নহে, তাহা বলা যায় না। দেহ এতই সুকৌশলে গঠিত, যে তাহাদ্বারা যাহা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, এমন বহু কার্য্য করিতেও হয়তো তাহা সক্ষম হইতে পারে। ইহাতে ইচ্ছাদ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইচ্ছাবর্জিত দেহ তাহাই সম্পন্ন করিতে পারে—এই আশা ব্যক্ত হইয়াছে; এবং বুদ্ধির ধর্ম্ম দেহে আরোপিত হইয়াছে।

মানুষের মনের ব্যাখ্যা করিতে স্পিনোজা বলিয়াছেন, "মানুষের মনঃস্বরূপ যে প্রত্যয়, দেহ অথবা ব্যাপ্তির বাস্তব একটা বিশেষ বিকারই তাহার object" (২য় খণ্ড—১৩ প্রঃ)। অন্যত্র বলিয়াছেন, "প্রত্যেক দেহযুক্ত বস্তুর সহিত একটা প্রত্যয় যুক্ত আছে ; সুতরাং সমস্ত বস্তুই চেতন।" এখানে object' শব্দের অর্থ না বুঝিলে স্পিনোজার অর্থবোধ হয় না। মানুষের মনঃরূপী প্রত্যয়ের object তাহার দেহ", ইহার অর্থ, যে প্রত্যয় মানুষের মনঃ, তাহার উৎপত্তির উৎস তাহার দেহ ; অর্থাৎ মানুষের দেহই তাহার চিন্তার উৎপত্তি-স্থান। মানুষের দেহের উপর ক্রিয়ার সঙ্গে যে বেদনা ও সংবিদের উৎপত্তি হয়, তাহাই মানুষের মনঃ। তেমনি বৃক্ষের প্রত্যয় অর্থ, "বৃক্ষের মধ্যে যে প্রত্যয় আছে।" কিন্তু দেহ হইতে কোন প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয় না। ব্যাপ্তি হইতে চিন্তার উৎপত্তি হয় না। গতি হইতে চিন্তার উৎপত্তি হয় না, চিন্তা হইতেও গতি উৎপন্ন হয় না। প্রত্যয়-পরম্পরা হইতেই প্রত্যয়ের উৎপত্তি। দেহের উৎপত্তি ব্যাপ্তির জগতে। কিন্তু দেহ ও মনঃ পাশাপাশি বর্ত্তমান (Parallel)। কিন্তু যে প্রত্যয় মানুষের মনঃ, যাহা ঈশ্বরের চিন্তার বিকার, তাহার বিষয় দেহ নহে। তাহা দৈহিক অবস্থার সহবর্ত্তী, কিন্তু সে অবস্থা নহে।

২৮ প্রতিজ্ঞায় স্পিনোজা বলিয়াছেন' "যাহারই সীমাবদ্ধ ও সসীম অস্তিত্ব আছে, এরূপ বিশিষ্ট কোনও দ্রব্য থাকিতেও পারে না অথবা কার্য্য করিতেও পারে না, যদি তাহার কার্য্যও অস্তিত্ব অন্য সসীম ও সীমাবদ্ধ অস্তিত্ববিশিষ্ট কারণান্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়; আবার এই শেষোক্ত কারণও থাকিতে পারে না অথবা কার্য্য করিতে পারে না, যদি তাহার কার্য্য ও অস্তিত্ব অন্য সসীম ও সীমাবদ্ধ অস্তিত্ববিশিষ্ট কারণান্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় ; এইরূপে কারণের অনন্ত ধারা চলিবে।" ইহা দ্বারাই আদি কারণ এক সতের বহুত্বে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করিয়াও স্পিনোজা বহু সসীম বিকারকে এক সতের অথবা তাহার অসীম গুণদ্বয়ের পরিণাম বলিয়াছেন। কিন্তু অসীম গুণ সসীম বিকারের আকারে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত, 'কেবল' অথবা 'অসঙ্গ' অবস্থা হইতে বহির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহার অসীমত্ব সঙ্কুচিত না হওয়া পর্যন্ত, ইহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, স্পিনোজা সৎ অথবা তাহার গুণে যে কারণত্বের আরোপ করিয়াছেন—ন্যায়ের যুক্তির নিয়তি—তাহা কোনও সসীম দ্রব্যের উৎপাদনে সমর্থ নহে, তাঁহার মতানুসারে কোনও সসীম দ্রব্যের উৎপত্তির কারণের জন্য সসীম কারণান্তরের অস্তিত্বের প্রয়োজন। ন্যায়ের যুক্তি এই কারণ-উৎপাদনে সক্ষম নহে।

Martiueau এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন' "যে কারণ-তত্ত্ব এত বিস্তারিতভাবে স্পিনোজা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কোনও বিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদনে সমর্থ নহে। ঈদৃশ কোনও দ্রব্যের অস্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্য অন্য একটি সদৃশ দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যদি সসীমের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সসীমের অস্তিত্বের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যেখানে সৎ হইতেই সকল উদ্ভূত হয়, এবং সে সৎ অসীম, সেখানে সসীমের আবির্ভাব হয় কিরূপে?

[1] Absolute.

অসীম হইতে সসীমের এই আকস্মিক উদ্ভবের ব্যাখ্যা তো করাই হয় নাই, পরন্তু যে পরিস্থিতির মধ্যে সসীমের উদ্ভব হয় বল হইয়াছে, তাহার মধ্যে সসীমের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব বলিয়াই প্রমাণ করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের গুণ হইতে যুক্তির নিয়মে আবির্ভাবের সহিত কারণত্বকে অভিন্ন বলা হইয়াছে; কার্য্যের এবংবিধ আবির্ভাব কেবল যুক্তিতে আবির্ভাব নয়, বাস্তব আবির্ভাবও বটে; ইহা ঈশ্বরের অসীম স্বরূপের অব্যক্ত আধেয়ের ব্যক্ত-অবস্থাপ্রাপ্তি। এই প্রকার কারণত্বদ্বারাই স্পিনোজা তাঁহার সমস্যার সমাধান করিতে প্রথমে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এবং পরে যে নূতন মত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ইহার সামঞ্জস্য কত কম, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই, এই ধারণা বর্জন করা কঠিন। দুই গুণকে তিনি যেমন ঈশ্বরের মধ্যে একীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ-সম্বন্ধে দ্বিবিধ মতও তিনি তেমনি ঈশ্বরের নামে একত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সসীমের উৎপত্তি-ব্যাপারে যে দ্রব্যের স্বরূপ হইতে যুক্তির সাহায্যে তাহার অন্তঃস্থিত পদার্থের নির্গমন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার কারণত্বের প্রয়োজন, তাহাও স্পিনোজা সময়ে সময়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। Hughensকে লিখিত এক পত্রে তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, যদি কোনও দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় বর্ত্তমান থাকে, যেমন ২০ জন লোক, তাহা হইলে সেই দ্রব্যের বিশিষ্ট প্রকৃতি অথবা সার ব্যতিরিক্ত সেই সংখ্যারও একটি কারণ থাকা প্রয়োজন এই কারণ নিশ্চয়ই সেই দ্রব্যের বহিঃস্থ কারণ। সুতরাং সসীম দ্রব্যের মধ্যে তাহাদের সসীমত্বের জন্যই একটি কারণত্ব আছে, যাহা তাহার স্বরূপের অন্তর্গত জ্যামিতিক কার্য্যকারিতা[1] হইতে ভিন্ন। সেই কারণত্ব শক্তিমূলক কার্য্যকারিতা[2] যাহাদ্বারা সসীম দ্রব্যের আদিহীন ও অন্তহীন পারম্পর্য্য চিন্তার নিয়ম[3] দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হইতে ভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকৃতির মধ্যে সমগ্র ভাবে দেখিলে এই নূতন প্রকারের নিয়তিই প্রকৃতির শৃঙ্খলা অথবা কারণসূত্র বলিয়া প্রতীত হয়। ইহা প্রত্যেক দ্রব্যের 'সারে'র বিরুদ্ধে কার্য্য করে, এবং তাহার পূর্ণ আত্ম-প্রকাশের পরিপন্থী।

"স্পিনোজা সসীম দ্রব্যকে অসীমের ব্যতিরেক[4] বলিয়াছেন। আত্মপ্রকাশে অসীম সত্তার আংশিক অক্ষমতাবশতঃ দ্রব্যের স্বরূপের আংশিক প্রকাশই সসীম; স্বরূপ আত্মপ্রকাশে সক্ষম হইলে তাহা হইতে কার্য্যের উৎপত্তি বোধগম্য হয়, কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইয়া কিরূপে বাস্তব দ্রব্যের সৃষ্টি করে, যাহা তাহার স্বাধীন সত্তা পারে না, ইহা বোঝা যায় না।

সৎ ও তাহার গুণদ্বয় হইতে অসীম সনাতন বিকারদিগের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা করিয়া স্পিনোজা যখন সমুৎপাদের জগতের[5] প্রান্তদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্বকীয় কারণ-তত্ত্বের অনুপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে আর অগ্রসর হওয়া যে অসম্ভব, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই 'যুক্তি'কে কারণ নামে অভিহিত করিতে থাকিয়াও তিনি অন্যবিধ এক কারণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন

[1] Geometrical ehiciency. [2] Dynamic efficiency.
[3] Laws of thought. [4] Negation [5] Phenomenal world.

প্রকারের 'কারণদ্বারা' সসীমের সৃষ্টির ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক বিশিষ্ট দ্রব্যে এই দ্বিবিধ কারণের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন—তাহার অসীম ও সনাতন স্বরূপ এবং তাহার 'সসীমত্ব'। তাহার সসীমত্ব পূর্ব্ববর্ত্তী সসীম দ্রব্যের ফল এবং পরবর্ত্তী সসীম দ্রব্যের কারণ। এই পারম্পর্য্য অন্তহীন। সমগ্র প্রকৃতির মধ্যেও এই দ্বিবিধ কারণ বর্ত্তমান, —অসীম গুণদ্বয়, যাহা সর্ব্বকালে অনুস্যূত[1], প্রকৃতির ভিত্তি[2], এবং স্বরূপদ্বারা অনিয়ন্ত্রিত সমুৎপাদের প্রবাহ ও দ্রব্যজাতের উৎপত্তির কারণজাল। দ্বিতীয় কারণ হইতে সনাতন কিছুর উদ্ভব হয় না। Ethics-এই তিনি প্রথমে সসীম দ্রব্যকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে দ্রব্যের স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছুকেই তিনি কারণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। De Deo গ্রন্থে বলিয়াছিলেন, যদিও দ্রব্যবিশেষের অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের গুণদ্বয় যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি একটি বিশেষ বিকারেরও প্রয়োজন, তথাপি ইহাদ্বারা ঈশ্বরের অব্যবহিত স্রষ্টৃত্ব অপ্রমাণিত হয় না। কেননা কোনও দ্রব্যের অস্তিত্বের জন্য যাহা যাহার প্রয়োজন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি না থাকিলে তাহার অস্তিত্বের উদ্ভবই হইতে পারে না, যেমন সেই দ্রব্যের স্রষ্টা। অন্যগুলি দ্বারা ঐ দ্রব্যের সৃষ্টি সাধ্য হয়। যেমন, যখন আমি কোনও ঘরের মধ্যে আলো চাই, তখন দেয়াশলাই জ্বালিতে পারি, অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। অথবা জানালা খুলিয়া দিতেও পারি; তাহাতে আলোর সৃষ্টি না হইলেও বাহির হইতে ঘরে আলোর প্রবেশ সম্ভবপর করে। এইরূপে স্পিনোজা 'কারণ' ও 'পরিস্থিতির'[3] মধ্যে পার্থক্য করিয়াছিলেন। ব্যাপ্তির জগতে 'গতি' এবং চিন্তার জগতে 'বুদ্ধি'কে তিনি স্রষ্টৃ-কারণ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। ইহারা অব্যয়[4] এবং সনাতন। 'গতি ও স্থিতির ব্যাপ্তির মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে অবস্থিতিকে, এবং চিন্তার জগতে বিশেষ বিশেষ অনিত্য প্রত্যয়ের আবির্ভাবকে পরিস্থিতি বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও সসীমের উৎপত্তি সমস্যার সমাধান হয় না দেখিয়া, অবশেষে তিনি দ্রব্যের বহিঃস্থ এক কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সসীম পদার্থের একত্র সন্নিবেশ-ই সেই বাহ্য কারণ। প্রত্যেক সসীম পদার্থে তিনি দুইটি কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন, একটি তাহার সনাতন স্বরূপ বা সার। অন্যটি বাহ্য প্রকৃতির ব্যবস্থা[5] কর্তৃক তাহার আংশিক ব্যতিরেক। এই ব্যতিরেকদ্বারা তাহার সনাতন স্বরূপের পূর্ণ প্রকাশ প্রতিরুদ্ধ হয়। সনাতন "সার"দ্বারা সমগ্র প্রকৃতি অনুস্যূত, দ্বিতীয়টিদ্বারা সমুৎপাদ-জগতের সৃষ্টি। মানুষের মনঃ এই ব্যতিরেক হইতে, সমুৎপাদ জগতের বন্ধন হইতে, মুক্ত হইয়া তাহার পূর্ণ-স্বরূপে উপনীত হইতে সক্ষম। এই সক্ষমতাই স্পিনোজার কর্ম্মনৈতিক ও তাত্ত্বিক মতের ভিত্তি। কিন্তু সসীমের মধ্যে সসীম ও অসীম কারণদ্বয়ের কিরূপ সমন্বয় হয়, ঈশ্বরের স্বভাবের মধ্যে ব্যতিরেকরূপী কারণের কি প্রয়োজন, সসীম দ্রব্যের উৎপাদক সসীম

---

[1] Eternally immanent. [2] Constitutive ground. [3] Conditions

[4] Fixed. [5] Order.

দ্রব্যদ্বারা, যে সনাতন "সার" তাহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহাও উৎপন্ন পদার্থ কিরূপে প্রাপ্ত হয়, এ সমস্ত প্রশ্নের কোনও উত্তর স্পিনোজা দেন নাই।"

বিশিষ্ট সসীম

প্রত্যেক সসীম দ্রব্য অন্য বহু সসীমের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ। সম্বদ্ধ দ্রব্যসমূহের সহিত সম্বন্ধ-বর্জিত ভাবে কোনও সসীম দ্রব্যের কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। পৃথিবী যে তাহার স্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি তাহার চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহায় অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে, ও তাহাকে চালনা করিতেছে বলিয়াই তাহা সম্ভব-পর হইয়াছে। তাহারা না থাকিলে পৃথিবীর অস্তিত্ব শূন্যে বিলীন হইয়া যাইত। পৃথিবীর উপরিস্থ ও বহিঃস্থ প্রত্যেক দ্রব্য-সম্বন্ধেই এই কথা সত্য। তাই স্পিনোজা বলিয়াছেন, সসীমের উৎপত্তির জন্য সসীমের প্রয়োজন। "সসীমের" স্বরূপ অসীম। এই অসীম সত্তা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে গিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া অসীম-স্বরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না, অসংখ্য সসীমে বিভক্ত হইয়া পড়ে। পর্ব্বত-সঞ্চিত জলরাশি যখন নিম্নে আসিয়া লোকচক্ষুর সমীপে আপনাকে প্রকাশিত করিতে প্রয়াসী হয়, তখন বায়ুর বাধা প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য অংশে বিভক্ত হইয়া জলকণারূপে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তেমনি সতের অসীম সত্তা প্রকাশোন্মুখ হইয়া অসংখ্য অংশে বিভক্ত হয়; তাহার প্রত্যেক গুণ হইতে প্রথমে সনাতন বিকারের উদ্ভব হয়, পরে প্রত্যেক সনাতন বিকার হইতে অসংখ্য বিশিষ্ট বিকার উৎপন্ন হয়। কিন্তু অসীমের বাহিরে তো কিছুই নাই; সতের বাহিরে তাহার বিরোধী কোন শক্তি নাই; তাহার প্রকাশে এই বাধা আসে কোথা হইতে? বাধা না থাকিলে তা'পা পূর্ণভাবেই আত্মপ্রকাশে সক্ষম হইত; বাধার অস্তিত্ববশতঃই তাহা হইতে সসীমের উদ্ভব হয়। ফলে প্রত্যেক সসীম দ্রব্য কেবল তাহার অন্তর্নিহিত স্বরূপের ক্রীড়াক্ষেত্রই থাকে না, তাহার উপর অন্য বহু সসীমের ক্রীড়া উৎপন্ন হয়। সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা উভয়ে মিলিয়াই প্রত্যেক সসীম বিশিষ্ট দ্রব্য। সৃষ্টির রঙ্গক্ষেত্রে, প্রতিভাসের জগতে, সেইজন্যই কোনও সসীমের আবির্ভাব নিয়ত নহে; তাহা আগন্তুক[১], ও পরনির্ভরশীল। বহিঃস্থ দ্রব্যজাতের সামর্থ্যের উপর তাহার আবির্ভাব নির্ভর করে। তাহারা যথেষ্ট প্রবল হইলে এই আবির্ভাবকে অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু এই অনিশ্চিতি বাস্তব নহে, আমাদের বুদ্ধির নিকট-ই এই আবির্ভাব অনিশ্চিত। প্রকৃতির ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্টই আছে, তাহা নিয়ত। সুতরাং সেই ব্যবস্থার মধ্যে যাহার আবির্ভাব সম্ভবপর, তাহার আবির্ভাব নিয়ত। যাহার আবির্ভাব সম্ভবপর নহে, তাহার আবির্ভাব নিতান্তই অসম্ভব, তাহা আগন্তুক নহে। জ্যামিতিক ক্ষেত্র-বিশেষ-সম্বন্ধে তাহার জ্ঞাত ধর্ম্ম হইতে অজ্ঞাত ধর্ম্ম যে নিঃসন্দেহে অনুমান করা সম্ভবপর হয়, তাহার কারণ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের পারিপার্শ্বিক-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থা-সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। আমাদের বুদ্ধি সে ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ধারণা করিতে অক্ষম।

[১] Contingent

প্রত্যেক বিশিষ্ট দ্রব্যের স্বরূপের আবির্ভাব যখন সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত, তাহা তাহার নিজের উপর যখন নির্ভর করে না, অন্য বহু বিশিষ্ট দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল, তখন আবির্ভাবের পরে তাহার স্থিতিও অনিশ্চিত হইতে বাধ্য। তাহা চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। বিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপত্তি-ও-স্থিতি-সম্বন্ধে এই অনিশ্চিতি হইতে ইহার মধ্যে সত্তার ব্যাতিরেকের[1] পরিমাণ অনুমান করা যায়, এবং যতটুকু সত্তা ইহার মধ্যে আছে, তাহা যে অসৎ হইতে উদ্ভূত তাহাও বোধগম্য হয়। আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই স্বল্পপরিমিত সত্তা ছিল না, ভবিষ্যতেও ইহার স্থিতি অনিশ্চিত। অসৎ হইতে ইহার উদ্ভব, কালে ইহার উৎপত্তি। অনস্তিত্বের অন্ধকার হইতে অস্তিত্বের আলোকে আবির্ভাবের পরে, ইহার স্বরূপকর্ত্তৃক ইহার তিরোভাবের কোনও কারণ নাই; কেননা সে স্বরূপ অনন্ত, নির্দ্দিষ্ট কালদ্বারা তাহা সীমাবদ্ধ নহে। কিন্তু যে বাহ্য কারণদ্বারা তাহার আবির্ভাব প্রতিহত হইয়াছিল, আবির্ভাবের পরে তাহাই তাহাকে অস্তিত্বের রঙ্গক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দিবে। নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে এই প্রকারে আবদ্ধ থাকাই তাহার সসীমত্বের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু তাহার স্বরূপ অনন্ত। সুতরাং যাবতীয় সসীমত্ব ত্রুটিরই নামান্তর; তাহা সত্তাবান্[2] অসীমের ব্যতিরেক বা নিরাকরণ।

অনন্তপার অসীম সৎ হইতে সনাতন বিকারের আবির্ভাবের কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। স্পিনোজার মতে যাহার অস্তিত্ব সম্ভবপর, তাহা আছে, তাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান। ইহার অর্থ যাহা সম্ভবপর বলিয়া বুদ্ধিতে বোধগম্য হয়, বাস্তবজগতে তাহার অস্তিত্ব আছে। চিন্তা-গুণের মধ্যে অসীম বুদ্ধি, ব্যাপ্তি-গুণের মধ্যে গতি ও স্থিতি বুদ্ধিগম্য। তাহাদের বাস্তব অস্তিত্বও আছে। ইহারা চিন্তা ও ব্যাপ্তির অব্যবহিত বিকার। প্রত্যয়[3], অনুভূতি[4], ইচ্ছা[5] প্রভৃতি বুদ্ধির বিকার। ভার, আকার, কাঠিন্য, তরলত্ব, বায়বীয়ত্ব প্রভৃতি ব্যাপ্তির বিকার। কিন্তু ইহারা 'বিশেষ' নয়, সামান্য। গতি ও স্থিতিরূপ genus হইতে ভ র, আকার, কাঠিন্য প্রভৃতি রূপ speciesএর উদ্ভব। বুদ্ধি-রূপ genus হইতে ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতি রূপ speciesএর উদ্ভব। কিন্তু অসীম সতের একত্ব হইতে এই বহুত্বের আবির্ভাব কিরূপে হয়, স্পিনোজা তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই। ইহাদের আবির্ভাবকে নিয়ত বলিয়াছেন; বিকারে বিভক্ত হওয়াই সতের স্বভাব বলিয়াছেন। কিন্তু genus হইতে speciesএর অনুমান করা অসম্ভব, যুক্তির কোনও নিয়মেই তাহা সম্ভবপর নহে। এই সমস্ত 'সামান্য' হইতে 'বিশেষে'র আবির্ভাবেরও কোনও যুক্তিমূলক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেইজন্যই সসীম দ্রব্যরাজির মধ্যে স্পিনোজা কারণান্তরের অনুসন্ধান করিয়াছেন। সসীমে বিভক্তি পর্য্যন্ত সতের গতি বিভাগের দিকে। কিন্তু সসীমে পৌছিয়া আমরা এই গতির পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, সসীমের মধ্যে সমন্বয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হই। চিন্তা ও ব্যাপ্তির সমবায়ে প্রত্যেক সসীম দ্রব্য গঠিত; ইহা ব্যতীত ব্যাপ্তির বহু বিকারের সমবায় তাহার প্রত্যেক বিশিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে, এবং বুদ্ধির বিকারদিগের সমবায় তাহার প্রত্যেক বিকারের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জড়

---

[1] Negation [2] Positive.
[3] Idea [4] Feelling [5] Will

দ্রব্য রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ প্রভৃতি বহু বিকারের সমবায়। প্রত্যেক মানসিক বিকারও প্রত্যয়, অনুভূতি ইত্যাদির সমবায়। সুতরাং প্রত্যেক দ্রব্যই বহুর সমবায়।

আত্ম-সংবিদ

সসীম পদার্থের মধ্যে মানুষ একটি পদার্থ। মানুষে প্রত্যয়ের সাহায্যে চিন্তা ও আত্ম-সংবিদ বর্ত্তমান। আত্মসংবিদের আবির্ভাব-সম্বন্ধে স্পিনোজার মতের আলোচনা করা প্রয়োজন। স্পিনোজা সক্রিয় প্রকৃতিকেই[1] ঈশ্বর বলিয়াছেন, এবং Ethicsএর প্রথম অধ্যায়ের ৩১ প্রতিজ্ঞায় বুদ্ধি, ইচ্ছা ভালবাসা প্রভৃতি যে এই প্রকৃতি অথবা ঈশ্বরের মধ্যে নাই, তাহা বলিয়াছেন। মানুষের মধ্যে এই সকল চিন্তার বিকার আছে, সুতরাং নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির[2] (Nature Naturata) মধ্যেও তাহারা আছে। যেখানে যাহা কিছু আছে, সকলই এই Natura Naturataর মধ্যে ; সুতরাং Natura Naturataর মধ্যে বুদ্ধি, ইচ্ছা প্রভৃতিও আছে। মানুষে ইহারা আসিল কোথা হইতে ? যে চিন্তা ঈশ্বরের একটা গুণ, তাহা বুদ্ধি অথবা কামনা অথবা ইচ্ছা নহে, তাহাতে আত্মসংবিদ[3] নাই। ইহারা চিন্তার বিকার-মাত্র। চিন্তা হইতে ইহাদের উদ্ভব। ব্যাপ্তির প্রত্যেক বিকারের অনুরূপ এক একটি প্রত্যয় আছে, স্পিনোজা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যয়গণ সংবিদ-সম্পন্ন নহে। যিনি প্রত্যয়কে জানেন, এইরূপ জ্ঞাতাই সংবিদসম্পন্ন। মানুষে ভিন্ন এইরূপ জ্ঞাতা প্রকৃতির অন্য কোথাও নাই। মানুষে এই জ্ঞাতৃত্ব আসিল কিরূপে ?

স্পিনোজা বলিয়াছেন, মানুষের মনঃ (Ethics ২য় অধ্যায় ১৩ প্র) একটি প্রত্যয়, এবং সে প্রত্যয় তাহার দেহেরই প্রত্যয়, অর্থাৎ একটি বাস্তব ব্যাপ্তির বিকারের প্রত্যয়মাত্র। দেহের সার যেমন দেহের মধ্যে ব্যাপ্তির জগতে বর্ত্তমান, তেমনি তাহাই চিন্তার জগতে প্রত্যয়রূপে বর্ত্তমান—চিন্তার বিকার রূপে। মনঃ মননশীল পদার্থরূপে যে সম্প্রত্যয় গঠন করে, তাহাকেই স্পিনোজা Idea অথবা প্রত্যয় বলিয়াছেন। মনোরূপী এই প্রত্যয় একটি মৌলিক পদার্থ নহে ; বহু প্রত্যয়ের সমবায়ে মনের সৃষ্টি। শরীরের বিভিন্ন অবস্থায় যে সকল বিভিন্ন প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়, তাহাদের সমবায়ে উদ্ভূত যৌগিক প্রত্যয়ই মানবের মনঃ। দেহও যেমন একটি মৌলিক পদার্থ নহে, জগতে বিভিন্ন সমুৎপাদের সমবায়ই দেহ, তেমনি চিন্তার জগতের বিভিন্ন সমুৎপাদের সমবায়ই মনঃ। প্রত্যেক প্রত্যয়ই যদিও চিন্তার জগতে বর্ত্তমান, ব্যাপ্তির জগতে তাহার বিষয় অবস্থিত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোনও সংযোগ নাই। এই অবস্থা একত্বমূলক ব্যক্তিত্বের[4] উদ্ভবের পক্ষে আশাপ্রদ না হইলেও, ইহার মধ্যেই তাহার উদ্ভব হইয়াছে। দেহের প্রত্যয় যখন আবির্ভূত হয়, তখন তাহার সঙ্গে সেই প্রত্যয়েরও একটি প্রত্যয়ের আবির্ভাব হয়। দেহ ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে একটি সমুৎপাদ। তাহার প্রত্যয়, সেই সমুৎপাদের জ্ঞান, চিন্তার মধ্যে অবস্থিত। এই প্রত্যয়ের প্রত্যয় যখন

[1] Active Nature [2] Passive Nature

[3] Self Consciousness. [4] Individuality

আবির্ভূত হয়, তখন চিন্তার মধ্যেই তাহার আবির্ভাব; দেহের প্রত্যয়ের সহিত তাহারই প্রত্যয়রূপ দ্বিতীয় প্রত্যয় যুক্ত হয়। দ্বিতীয় প্রত্যয়টি প্রথম প্রত্যয়ের জ্ঞান, 'জ্ঞানের' জ্ঞান, অর্থাৎ আমরা যে দেহের প্রত্যয়টি জানি, এই তথ্যের জ্ঞান। এই দ্বিতীয় জ্ঞানের আবির্ভাব একটি নূতন ব্যাপার, এবং ইহারও একটি প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। এইরূপে প্রত্যেক পরবর্ত্তী ব্যাপারের এক একটি প্রত্যয়ের উৎপত্তি অনন্ত ধারায় চলিতে থকে। এই জ্ঞানপ্রবাহে ইহার জ্ঞানশ্রেণীর প্রত্যেক জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিলেও, তাহার (জ্ঞান-প্রবাহের) স্বতন্ত্র জ্ঞান নাই; এবং শ্রেণীভুক্ত সকল জ্ঞানের সমবেত ভাবে অবস্থানের বিষয়ও তাহা অবগত নহে। কেননা প্রতেক প্রত্যয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতায়ের সঙ্গে যে জ্ঞান আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, এবং তাহার ফলে যাবতীয় প্রত্যয়সঞ্জাত জ্ঞান পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক জ্ঞানে পরিণত হয়। এই জ্ঞানই 'মনের জ্ঞান'; ইহাই আত্মসংবিদ, অবিচ্ছিন্ন চিন্তার প্রবাহ। দেহবিষয়ক প্রত্যয় যেমন দেহের সহিত সংযুক্ত, এই মনোবিষয়ক প্রত্যয়ও তেমনি মনের সহিত সংযুক্ত।

উপরোক্ত জটিল বাক্যসকলের সরল অর্থ এই যে বাহ্য দ্রব্যের জ্ঞানের সহিত আত্মসংবিদ যুক্ত থাকে, এবং আত্মসংবিদের সহিত সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে আত্মার অনবচ্ছিন্ন সাতত্যের জ্ঞানও থাকে! Ethicsএর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০ প্রতিজ্ঞায় আছে, "মানব মনের প্রত্যয় অথবা জ্ঞান (যে জ্ঞান অথবা প্রত্যয়ের বিষয় মানব-মনঃ) ঈশ্বরে আছে। মানুষের দেহের প্রত্যয় অথবা জ্ঞান যেমন মানুষের মধ্যে আছে বলিয়া ঈশ্বরের মধ্যেও আছে, ও তাঁহাতে সেই জ্ঞান আরোপিত হয়. তেমনি তাহাব মনের প্রত্যয় ও জ্ঞানও মানুষের আছে বলিয়া ঈশ্বরে আরোপিত হয়।" ইহা প্রমাণ করিতে স্পিনোজা বলিয়াছেন, চিন্তা ঈশ্বরের একটি গুণ; সুতরাং চিন্তার প্রত্যয় ও যাবতীয় বিকারের প্রত্যয় যে ঈশ্বরে আছে, তাহা বলিতেই হইবে। মানব-মনঃ চিন্তার একটা বিকার। সুতরাং তাহার প্রত্যয়ও ঈশ্বরে আছে বলিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরকে যখন অসীমরূপে ধারণা করা হয়, তখন তাঁহাতে মানব-মনের এই প্রত্যয় ও জ্ঞানের আরোপ করা যায় না। যখন অন্য কোনও বিশিষ্ট দ্রব্যের প্রত্যয়-সমন্বিতভাবে তাঁহার ধারণা করা হয়, তখনই তাঁহাতে এই প্রত্যয় ও জ্ঞানের আরোপ হয়। প্রত্যয়ের কারণ-পরম্পরার মধ্যে শৃঙ্খলা ও সম্বন্ধ যেরূপ, প্রতায়-পরম্পরার মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধ ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান। সুতরাং মানুষের দেহের জ্ঞান অথবা প্রত্যয় যেভাবে ঈশ্বরে বর্ত্তমান, এবং তাহা যে অর্থে ঈশ্বরে আরোপিত হয়, তাহার মনের জ্ঞান অথবা প্রত্যয়ও সেইভাবেই তাঁহাতে বর্ত্তমান এবং সেই অর্থে তাঁহাতে তাহাদের আরোপ করা হয়।" ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয়, যে ঈশ্বরে মানবমনের যে জ্ঞানের অস্তিত্বের কথা স্পিনোজা বলিয়াছেন, মানবমনের মাধ্যমেই ঈশ্বরে সেই জ্ঞানের অস্তিত্ব; মানব-মনে যে জ্ঞান বর্ত্তমান, তাহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে তাহার অস্তিত্ব নাই। মানব-মনঃ ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং যাহা মানবমনের মধ্যে আছে, তাহা ঈশ্বরের মধ্যেই আছে। এই অর্থেই স্পিনোজা বলিয়াছেন, অসীম ঈশ্বরে (মানবের সম্বন্ধ বিরহিত ঈশ্বরে) এই জ্ঞানের আরোপ করা যায় না। চিন্তাগুণ অসীম। বিকার-বর্জিত চিন্তা-গুণের মধ্যে যে এই জ্ঞান আছে, তাহা স্পিনোজা

বলেন নাই। চিন্তাগুণের যে বিকার আমাদের মনোরূপদেহের প্রত্যয়রূপে আবির্ভূত হয়, এবং সেই প্রত্যয়ের প্রতিফলন হইতে যে প্রত্যয়ের উদ্ভব হয়, তাহার ও পরবর্ত্তী সমস্ত প্রত্যয়ের প্রতিফলন হইতে উদ্ভূত প্রত্যয়রাজির মধ্যে এই জ্ঞান আছে বলিয়াছেন। ঈশ্বর ও প্রকৃতি স্পিনোজার মতে অভিন্ন। মানুষের দেহ ও মনঃ উভয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত; সুতরাং যে প্রত্যয় ও জ্ঞান ঈশ্বরের মধ্যে আছে তিনি বলিয়াছেন,[৩] তাহা মানুষের মধ্যে আছে, ইহা বলাই তাঁহার অভিপ্রায়। দেহের প্রত্যয় যেমন দেহের বিশেষ বিশেষ অবস্থা হইতে উদ্ভূত হয়, তেমনি মানুষের মনের বিশেষ বিশেষ সমুৎপাদ হইতে সমগ্র মনের একটি প্রত্যয়ের আবির্ভাব হয়। যেখানেই ব্যাপ্তি আছে, সেইখানেই চিন্তা আছে। চিন্তার সর্ব্ব প্রকার বিকারেরই প্রত্যয় আছে। দেহের প্রত্যয় চিন্তার বিকার; তাহারও একটা প্রত্যয় আছে। এই শেষোক্ত প্রত্যেয়েরও প্রত্যয় আছে। এইরূপ প্রত্যয়-প্রবাহের সমবায়ের ফলই মানব-মনঃ।

উল্লিখিতভাবে স্পিনোজার আত্মসংবিদের ব্যাখ্যা করিয়া Martinea নিম্নোক্তভাবে সমালোচনা করিয়াছেন :—

"যখন আমার মনে কোনও প্রত্যয়ের আবির্ভাব হয়, তখন আমি জানি, যে আমার মনে উহার আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা সত্য, কিন্তু তখনই সত্য, যখন 'আমি' সেই প্রত্যয়ের আধাররূপে বর্ত্তমান। যখন 'আমি' বর্ত্তমান, এবং আমাতে কোনও প্রত্যয়ের আবির্ভাব হয়, তখন সেই প্রত্যয় 'আমি'রূপ বিষয়ীর নিকট প্রত্যয়রূপ 'বিষয়'রূপে আবির্ভূত হয়; সেই বিষয়ী সেই প্রত্যয়কে তাহার জ্ঞানের বিষয় করিয়া তাহাকে জানে। কিন্তু এই 'আমি'র আবির্ভাবই যে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রমাণের বিষয়, তাহার অস্তিত্ব পূর্ব্ব হইতেই স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। পূর্ব্বে যে জ্ঞানের আবির্ভাবের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে কিরূপে ব্যক্তিগত সংবিদযুক্ত আত্মার[১] আবির্ভাব হয়, তাহাই তো প্রশ্ন। প্রথমে তো ছিল কেবল 'দৈহিক পরিণাম' এবং তাহার অনুষঙ্গী 'প্রত্যয়'। এই প্রত্যয়কে সেই দৈহিক পরিণামের 'জ্ঞান'ও বলা হইয়াছে। এখানে এই জ্ঞানের আধার যে জ্ঞাতা, তিনি কোথায়? এই প্রত্যয় কি জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়ই? তাহা যদি হয়, এই প্রত্যয় যদি জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়ই হয়, তাহা হইলে জ্ঞাতৃরূপে ইহা বিষয়ী, এবং দৈহিক পরিণাম অর্থাৎ ব্যাপ্তির বিকারবিশেষ সেই বিষয়ীর বিষয়। কিন্তু যখন এই প্রত্যয়ের প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, তখন দ্বিতীয় প্রত্যয়ের বিষয়ে পরিণত হয় এই প্রথম জ্ঞাতৃরূপ প্রত্যয়। দ্বিতীয় প্রত্যয় তখন প্রথম প্রত্যয়ের জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়ই; তখন প্রথম প্রত্যয় চিন্তার বিকারবিশেষ মাত্র, কেবলই দ্বিতীয় প্রত্যয়ের বিষয়। এই খানেই আত্মজ্ঞানের[২] উদ্ভব বলা হয়। এই 'আত্মজ্ঞান' কি কেবল দ্বিতীয় প্রত্যয়ের উদ্ভব ও প্রথম প্রত্যয়ের তাহার বিষয়ে পরিণত হওয়ার ফল, অথবা প্রথম প্রত্যয়ের আবির্ভাব হইতে দ্বিতীয় প্রত্যয়ের আবির্ভাবের পর পর্য্যন্ত যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহাদের সমবায়ের ফল? যদি প্রথম প্রত্যয়ের বিষয়ে পরিণত হওয়ার ফল হয়, তাহা হইলে যে আত্মজ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাহা প্রথম প্রত্যয়েরই জ্ঞান এবং প্রথম

[১], Self. [২], Self-knowlecge.

প্রত্যয়টিকে 'আত্মা' বলিতে হইবে। এই প্রথম প্রত্যয় চিন্তার একটি বিকার মাত্র। যদি সমস্ত ব্যাপারের সমবায়ের ফল হয় ঐ আত্মজ্ঞান, তাহা হইলে সেই আত্মজ্ঞানের মধ্যে আছে (১) প্রথম প্রত্যয়-কর্তৃক জ্ঞাত বিষয় (দৈহিক বিকার) এবং (২) দ্বিতীয় প্রত্যয়-কর্তৃক জ্ঞাত বিষয় (মানসিক বিকার)। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম জ্ঞাতা দ্বিতীয় ব্যাপারে বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। মনে উদ্ভূত সমস্ত সমুৎপাদের একমাত্র জ্ঞাতাই আমরা অনুসন্ধান করিতেছি। এই যুক্তি-অনুসারে প্রত্যেক প্রত্যয়ের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন জ্ঞাতার আবির্ভাব হইতেছে; সমস্ত ব্যাপারের একমাত্র জ্ঞাতা—যিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান—এইরূপ জ্ঞাতার অভাব হইতেছে। একমাত্র জ্ঞাতার স্থলে প্রত্যেক প্রত্যয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে অনন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত জ্ঞাতৃ-শ্রেণীর উদ্ভব হইতেছে। ব্যক্তিগত আত্মসংবিদের, যাহার কখনও বিরাম নাই, তাদৃশ আত্মসংবিদের সহিত এই প্রত্যয়-প্রবাহের অভেদ কল্পনা করা যায় না।

Martineau আরও বলিতেছেন: মনঃ যেভাবে দেহের সহিত সংযুক্ত, মনের প্রত্যয়ও (মনঃ যে প্রত্যয়ের বিষয়) সেইভাবে মনের সহিত সংযুক্ত। (২১ প্রঃ Ethics ২য় অধ্যায়) ইহার অর্থ দেহ ও তাহার প্রত্যয় দুইটি পদার্থ নহে; তাহারা অভিন্ন—একই 'বিশেষ'। ব্যাপ্তি-গুণের দিক হইতে দেখিলে সেই পদার্থ দেহ, চিন্তাগুণের দিক হইতে 'প্রত্যয়'। তদ্রূপ মনঃ ও তদ্বিষয়ক প্রত্যয় (একই গুণের অন্তর্গত) অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং মনঃ ও আত্মজ্ঞানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাতে সাতত্যের অবচ্ছেদ[1] নাই। প্রত্যয়ের বিষয় হওয়া যেমন দেহের স্বভাবগত, কোনও বিশেষ প্রত্যয়েরও প্রত্যয়ান্তরের বিষয় হওয়া তেমনি স্বভাবগত। প্রত্যয়ান্তরের বিষয় হওয়া প্রত্যয়ের আকার[2] মাত্র। কিন্তু প্রত্যয় ও প্রত্যয়ের প্রত্যয়[3] দেহও তাহার প্রত্যয়ের মত একসঙ্গে উদ্ভূত হইলেও, এবং এই সমসাময়িকতা-বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও, অন্য বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। প্রত্যয় ও তাহার প্রত্যয়ের মধ্যে সমসাময়িক উদ্ভব ভিন্ন কার্য্যকারণ সম্বন্ধও বর্ত্তমান। উভয়েই একই গুণের মধ্যগত এবং একটি আর একটির কারণ। কিন্তু দেহ ও তাহার প্রত্যয় বিভিন্ন গুণের অন্তর্গত, তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের অভাব; তাহাদের মধ্যে একত্বের কোনও ভিত্তি নাই, তাহা নামমাত্র একত্ব। দেহ ও তাহার প্রত্যয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাদ্বারা মনঃ ও আত্মজ্ঞানের সম্বন্ধ যদি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে মনঃ ও আত্মজ্ঞানকে বিভিন্ন সমুৎপাদ বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তাহাদিগকে বিভিন্নধর্ম্মী ও মিশ্রণের অনুপযোগী মনে করিতে হয়; উভয়েই সমুৎপাদ, ইহা ভিন্ন অন্য কোনও সাদৃশ্য তাহাদিগের মধ্যে নাই, মনে করিতে হয়। এইরূপ পদার্থের সংমিশ্রণ হইতে ব্যক্তিগত আত্মজ্ঞান ও আত্মার অভেদ জ্ঞান বা আত্মস্মৃতির[4] উদ্ভব কল্পনা করা অসম্ভব।

কিন্তু Martineauর সমালোচনা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, যে তিনি মনের মধ্যে যে জ্ঞাতার অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাকে স্পষ্টরূপে কোথাও পাওয়া যায় না, তাহার জ্ঞানকে

[1]. Breach of continuity. [2]. Form. [3]. Idea ideae. [4]. Self identity.

পাওয়া যায় এবং সেই জ্ঞানের কর্তা বলিয়াই আমরা তাহার অস্তিত্ব অনুমান করি। যখনি মনের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন প্রত্যয়-প্রবাহই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। "আমি প্রত্যয়সকল দেখিতেছি" এই জ্ঞান আমাদের হয় সত্য, কিন্তু সে জ্ঞানও একটা সমুৎপাদ মাত্র। এই সকল প্রত্যয়ের যিনি দ্রষ্টা, দৃশ্য হইতে বিযুক্ত অবস্থায় তাহাকে কখনও আমরা পাই না। তাহাকে পাইবার জন্য, তাহার দর্শনের জন্য, নানা সাধনের বিষয় নানা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য নহে বলিয়া দর্শনশাস্ত্রে তাহার স্থান নাই। সুতরাং প্রত্যয়রাজির মধ্যে আমরা যদি সেই জ্ঞাতার সাক্ষাৎ নাও পাই, তাহাদ্বারা স্পিনোজার মতের ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হয় না। মনের মধ্যে অবস্থিত প্রত্যয়াবলীর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞানকে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলেই স্পিনোজার প্রমাণ সিদ্ধ। দেহের প্রত্যয়ের সহিত দেহের সংযোগের সঙ্গে মনের সহিত তাহার প্রত্যয়ের সংযোগের সম্বন্ধ যদি সর্ব্ববিষয়ে একবিধ নাও হয়, তাহা হইলেও মনোমধ্যস্থ যাবতীয় প্রত্যয়ের সংযোগে আত্মজ্ঞানের উদ্ভব—তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই এই নূতন সমুৎপাদের উদ্ভব—অসম্ভব নহে। এই আত্মজ্ঞান চিন্তার বিকার; Res cogitansএর সারের যে অংশ মানবের মনোরূপ বিকারে আত্মপ্রকাশে সমর্থ হইয়াছে, নিজে দৃশ্যের বহির্ভূত হইলেও তিনিই ইহার আধার, তিনি জ্ঞাতা। আত্মজ্ঞান তাহাতে অবস্থিত সমুৎপাদমাত্র। সেই জ্ঞাতা মানবে নিত্যবর্ত্তমান, প্রত্যেক প্রত্যয়ের তিনিই জ্ঞাতা; প্রত্যয়রাজি তাহাতে উদ্ভূত জ্ঞান-বুদ্বুদ।

কর্ম্মনীতি।

আদর্শ চরিত্র ও নৈতিক জীবনের আলোচনাই কর্ম্মনীতি-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে যত আলোচনা হইয়াছে, তাহার মধ্যে তিনটি মত পরিস্ফুট। প্রথম মত গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর বর্দ্ধমান, এবং পরে যীশু খৃষ্টকর্ত্তৃক প্রচারিত। এই মতে সকল মানুষের মূল্যই সমান, অহিংসা পরমো ধর্ম্ম, অক্রোধদ্বারা ক্রোধ জয় করিতে হইবে, উপকার করিয়া অপকারের উত্তর দিতে হইবে, প্রেমদ্বারা বিদ্বেষ পরাভূত করিতে হইবে, প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। দ্বিতীয় মত ইহার বিপরীত। ম্যাকিয়াভেলি ও নিৎসে ইহার প্রচারক ক্ষমতা-অর্জন এই মতে মানুষের প্রধান কাজ ও সেই উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ প্রয়োজনীয়। মানুষে মানুষে প্রভেদ বিস্তর, সকল মানুষের মূল্য সমান হইতে পারে না। শক্তি-অর্জ্জনের জন্য ও শাসন ক্ষমতালাভের জন্য বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধ সমর্থনযোগ্য। ক্ষমা এই মতে দুর্ব্বলতা। শক্তি[1] ও ধর্ম্ম[2] অভিন্ন। তৃতীয় মত সক্রেটিস্, প্লেটো ও আরিষ্টটলের এই মতে স্থান-ও-কালভেদদ্বারা কর্ম্মের দোষ গুণ নির্ণীত হয়। কোন কর্ম্মই সর্ব্ব কাল ও সর্ব্ব অবস্থায় নিন্দনীয় নহে। আবার কোনও কর্ম্মই সর্ব্ব কালে সর্ব্ব অবস্থায় প্রশংসনীয় নহে। কেবল পণ্ডিতেরাই হিসাব করিয়া বলিতে পারেন, কোন কর্ম্ম কোন অবস্থায় ধর্ম্ম, কোন অবস্থায় অধর্ম্ম; কখন প্রেমের প্রয়োজন, কখন শক্তির প্রয়োজন। জ্ঞান ও ধর্ম্ম অভিন্ন।

স্পিনোজার কর্ম্মনীতিতে এই সকল বিভিন্ন মতের একপ্রকার সমন্বয় হইয়াছে।

---

[1] Power [2] Virtue

তাঁহার কর্ম্মনীতি তাঁহার দার্শনিক মতের অনুগামী। স্বাধীন ইচ্ছা তিনি স্বীকার করেন নাই। মানুষ যখন অসংখ্য বিকারের মধ্যে একটি বিকারমাত্র, তখন অন্যান্য বিকারসম্বন্ধে যাহা সত্য, তাহার সম্বন্ধেও তাহা সত্য না হইবার কোন কারণ নাই। বস্তুর অন্তহীন শ্রেণীর মধ্যে মানুষ একটি বস্তু মাত্র। শ্রেণীর অন্যান্য বস্তু যেমন কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ, মানুষও তেমনি। তাহার ইচ্ছা বাহ্য অথবা আভ্যন্তরীণ কারণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষ যে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া মনে করে, তাহার কারণ নিজের কার্য্য-সম্বন্ধে সচেতন হইলেও কার্য্যের প্রেরক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা যখন নাই, কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল যখন নিয়ত ও অচ্ছেদ্য, মানুষের সমস্ত কর্ম্মই যখন এই শৃঙ্খলে বদ্ধ ও নিয়ত, তখন প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মের ভাল, মন্দ, ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ঘটে, সকলই নিয়ত, সকলই ভালো। Ethicsএর দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৮ প্রতিজ্ঞায় স্পিনোজা বলিয়াছেন "স্বাধীন ইচ্ছা কোনও মনেই নাই। বিশেষ কারণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া মনঃ কোনও কিছু ইচ্ছা করে। সেই কারণ কারণান্তরদ্বারা নিয়ন্ত্রিত।" ৪৯ প্রতিজ্ঞায় স্পিনোজা মানুষের ইচ্ছাকে তাহার বুদ্ধি হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন (অনুসিদ্ধান্ত)। বুদ্ধি ন্যায়ের নিয়মে বাঁধা, ইচ্ছাও তদ্রূপ। স্পিনোজা আনন্দকে সর্ব্ব কর্ম্মের লক্ষ্য বলিয়াছেন, এবং সুখের সদ্‌ভাব ও দুঃখের অভাবক আনন্দ[1] বলিয়াছেন। সুখ[2] ও দুঃখ[3] আপেক্ষিক, তাহা মানবমনের কোনও নির্দ্দিষ্ট অবস্থা নহে, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমনের অবস্থামাত্র, অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে পূর্ণতর অবস্থায় পরিণতিই সুখ। Ethicsএর তৃতীয় ভাগের ৭ম প্রতিজ্ঞায় স্পিনোজা বলিয়াছেন "স্বকীয় সত্তায় স্থির থাকিবার জন্য বস্তুর প্রয়াসই[4] তাহার স্বরূপ।" চতুর্থ ভাগের অষ্টম সংজ্ঞায় আছে ধর্ম্ম ও শক্তি অভিন্ন। মানুষের স্বরূপই তাহার ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্ম ও স্বরূপে অবস্থানের জন্য প্রচেষ্টা (শক্তি) একই পদার্থ। যে তাহার সত্তা রক্ষা করিতে যত বেশী সমর্থ, তাহাকে তত বেশী ধার্ম্মিক বলা যায়। (৪র্থ ভাগ ২০ প্রতিজ্ঞা) বাহ্য কারণদ্বারা প্রতিহত না হইলে, কেহই যাহা তাহার পক্ষে হিতকর ও তাহার সত্তার রক্ষার জন্য আবশ্যক, তাহা অগ্রাহ্য করে না। এই আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি হইতে আত্ম-সুখানুসন্ধান উৎপন্ন হয়। যাহা কেহ উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে, তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর কিছু প্রাপ্তির আশায় ভিন্ন কেহ তাহা অগ্রাহ্য করে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধ কিছুই বুদ্ধি দাবি করে না। আপনাকে ভালবাসাই প্রকৃতির নিয়ম। সুতরাং যাহা হিতকর, তাহাই যে লোকে আকাঙ্খা করে, ইহাতে অযৌক্তিকতা নাই। এই আত্মপ্রীতির উপরই স্পিনোজার কর্ম্মনীতি প্রতিষ্ঠিত। যে নীতি মানুষকে শক্তিহীন ও দুর্বল হইতে শিক্ষা দেয়, তাহার কোনও মূল্য তাঁহার কাছে নাই। আপনার সত্তা রক্ষা করিবার চেষ্টাই ধর্ম্মের ভিত্তি। আপনাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতার উপর মানুষের সুখ নির্ভর করে। মানুষ আপনাকে ভালবাসিবে এবং যাহা তাহার উপকারী—সত্যই উপকারী—তাহা প্রার্থনা করিবে, ইহাই

[1] Happiness. [2] Pleasure. [3] pain.
[4] Endeavour to persist in its being.

স্বাভাবিক। স্বকীয় সত্তা রক্ষা করাই যখন ধর্ম্ম, তখন যাঁহা নিজের, তাহা রক্ষার চেষ্টাই ধর্ম্মের ভিত্তি। যাহা নিজের, তাহা রক্ষা করিবার সামর্থ্যের উপরই সুখ নির্ভর করে। কিন্তু ধর্ম্ম তাহার নিজের জন্যই কাম্য, ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অথবা অধিকতর হিতকর এমন কিছুই নাই, যাহার লাভের জন্য ধর্ম্ম কাম্য হইতে পারে। আত্মরক্ষার জন্য বাহ্য কিছুরই প্রয়োজন হইবে না, ইহা অসম্ভব। বাহিরের বহু পদার্থ আমাদের প্রকৃত উপকারী, এবং সেই জন্য বাঞ্ছনীয়। আমাদের স্বভাবের সহিত যাহার মিল আছে, তাহাই উৎকৃষ্ট। মানুষ অপেক্ষা মানুষের অধিকতর উপকারী কিছুই নাই। সমপ্রকৃতি-বিশিষ্ট দুইজন লোক মিলিত হইয়া উভয়ের শক্তি-সমন্বিত এক ব্যক্তিতে পরিণত হইতে পারে। দুইজনের শক্তি মিলিত হইয়া আত্মরক্ষার পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়। পৃথিবীর যাবতীয় লোক যদি এক মতাবলম্বী হইয়া মিলিত হইতে পারিত, সকলেই যদি একমনা হইতে পারিত, সকলেই যদি একসঙ্গে তাহাদের সত্তা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কিছুই হইতে পারিত না। যুক্তিদ্বারা চালিত হইয়া মনুষ এমন কিছুই নিজের জন্য কামনা কবিতে পারে না, যাহা সমগ্র মানব-জাতির হিতকর নহে। "যাহারা ধার্ম্মিক, তাহাদের যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ, তাহা সর্ব্বসাধারণে সমান ভাবে ভোগ করিতে পারে।" (৪র্থ ভাগ, প্রঃ ৩৬)। কেননা যাহা সমগ্র মানবজাতির হিতকর নহে, তাহা কাহারও হিতকর নহে। যুক্তিদ্বারা তাহাই নিজের হিতকর বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, যাহা সমগ্র মানবজাতির হিতকর। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে স্পিনোজা পরের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ দাবী করেন নাই। সর্ব্বমানব-সাধারণ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিদ্বারা প্রমাণিত হয়, যে স্বার্থপরতার[1] প্রয়োজন আছে। কিন্তু মানুষের প্রকৃত স্বার্থ ও পরের স্বার্থের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই! যুক্তিদ্বারা বিচার করিলে যাহা কাহারও প্রকৃত পক্ষে উপকারী, তাহা সকলেরই উপকারী। স্পিনোজা পরার্থপরতার উপর তাঁহার কর্ম্ম-নীতির প্রতিষ্ঠা করেন নাই, স্বার্থপরতার উপরও তাহা প্রতিষ্ঠিত নহে। তিনি চাহিয়াছেন মানুষকে যুক্তির পথে পরিচালিত করিতে। সেই পথে মানুষ দেখিতে পাইবে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা একই।

আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসকে স্পিনোজা বিনতি[2] বলিয়াছেন। মানুষ যখন তাহার শক্তির অভাব কল্পনা করে, তখন দুঃখিত হয় (৩য়, ৫৫ প্রঃ)। পূর্ণতা হইতে অপূর্ণতার দিকে গতিই দুঃখ। স্পিনোজার মতে[3] "আপনার প্রতি অবজ্ঞার[4] অর্থ আপনার মূল্য কম বলিয়া গণ্য করা। দুঃখ-প্রাপ্তি হইতে ইহার (২৯ সংজ্ঞা) উদ্ভব। যে আপনার অতিরিক্ত প্রশংসা করে, যে নিজের ভাল ভাল কাজের ও অপরের অন্যায় কার্য্যের গল্প করে, যে অন্য অপেক্ষা বড় বলিয়া গণ্য হইতে চায়, এবং আপনার অপেক্ষা উচ্চপদস্থ লোকের মত জাকজমকের সঙ্গে চলিতে যায়, তাহাকে আমরা গর্ব্বিত বলি। আবার যে নিজের ত্রুটির উল্লেখ করে, কথা বলিতে বলিতে যাহার মুখ লাল হইয়া পড়ে, অন্যের গুণ ও কাজের গল্প করে, অন্যের নিকট নত হইয়া থাকে, মাথা নীচু করিয়া হাঁটে, ভাল অলংকার অথবা পোষাক পরিধান

[1] Egoism. [2] Humility. [3] Definition of Emotion. [4] Abjectio

করে না, তাহাকে আমরা বিনীত বলি। কিন্তু এরূপ মনোভাব বেশী লোকের নাই। মানব-প্রকৃতিই ইহার বিরোধী। যাহাদিগকে খুব বিনীত বলিয়া মনে করা যায়, সাধারণতঃ তাহারাই অতিরিক্ত পরিমাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র।" "যে আপনাকে অবজ্ঞা করে ও যে গর্ব্বিত, ইহাদের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য।" কিন্তু বিনতি সমর্থন না করিলেও স্পিনোজা নম্রতার[1] প্রশংসা করিয়াছেন। গর্ব্বিত লোক তাঁহার মতে অপরের বিরক্তি-জনক; তাহাদের অপেক্ষা হীনতর যে সকল লোক তাহাদের দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকে, তাহাদিগের সঙ্গই তাহাদের প্রিয়। তাহারা অবশেষে এই সকল লোকদ্বারাই প্রতারিত হয়। গর্ব্বিত লোক চাটু বাক্যদ্বারা যত প্রতারিত হয়, অন্যে সেরূপ হয় না।

এই পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইল, তাহা হইতে স্পিনোজার কর্ম্মনীতি শক্তিমূলক বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহার মতে যাহা শক্তি বৃদ্ধি করে, তাহাই ধর্ম্ম, যাহাতে শক্তির হ্রাস হয়, তাহা অধর্ম্ম। কিন্তু এখানেই তাঁহার কর্ম্মনীতি পরিসমাপ্ত হয় নাই। মানুষের মধ্যে ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা ও ঘৃণার বাহুল্য দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছেন। এই সমস্ত চিত্তাবেগের ফলে মানুষ মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ইহাদের উচ্ছেদ ব্যতীত সমাজের মঙ্গল অসম্ভব। তিনি বলিয়াছেন, ঘৃণা প্রেমদ্বারা বিদূরিত করা যত সহজ, ঘৃণাদ্বারা বিদূরিত করা তত সহজ নহে। অন্যের ঘৃণা হইতে ঘৃণা পুষ্টিলাভ করে। কিন্তু ঘৃণার বিনিময়ে যদি প্রেম দান করা যায়, যদি ঘৃণাকারীর বিশ্বাস উৎপন্ন করা যায়, যে তাহার ঘৃণার পাত্র তাহাকে ভালবাসে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে ঘৃণা ও প্রেমের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কেননা প্রেমের উৎপাদনই প্রেমের ধর্ম্ম। 'এই দ্বন্দ্বের ফলে ঘৃণার তেজ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসে। নিজের অপকর্ষজ্ঞান ও ভয় হইতে ঘৃণার উৎপত্তি হয়। যে শত্রুকে পরাজিত করিবার সামর্থ্য আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, তাহাকে আমরা ঘৃণা করি না। ঘৃণাদ্বারা যে ঘৃণার প্রতিশোধ লইতে যায়, দুঃখ ভিন্ন তাহার অন্য কিছু লাভ হয় না। কিন্তু প্রেমদ্বারা যে ঘৃণা বিদূরিত করিবার চেষ্টা করে, সে বিশ্বাস ও আনন্দের সহিত ঘৃণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ঘৃণাকারী সংখ্যায় এক জন হউক, অথবা বহু হউক, সে সকলের ঘৃণার বিরুদ্ধেই প্রেমাস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম। ভাগ্যের সহায়তার প্রয়োজন তাহার হয় না। যাহারা তাহার নিকট পরাভূত হয়, তাহারা সানন্দে আত্মসমর্পণ করে। "পরের মনঃ অস্ত্রদ্বারা জয় করা যায় না। প্রেম ও ঔদার্য্য-দ্বারাই মনঃ বিজিত হয়।"

কিন্তু প্রেমের মহত্ত্ব বর্ণিত হইলেও স্পিনোজার কর্ম্মনীতি মুখ্যতঃ জ্ঞানমূলক। তাহা খৃষ্টের "পর্ব্বত শিখরে উপদেশ[2]" অপেক্ষা, সক্রেটিস্ ও প্লেটো-কর্ত্তৃক অধিকতর প্রভাবিত। "প্রজ্ঞা-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যাহাই করিতে আমরা চেষ্টা করি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনঃ যখন প্রজ্ঞার ব্যবহার করে, তখন যাহা বুঝিবার সহায়ক, তাহা ভিন্ন আর কিছুই হিতকর বলিয়া গণ্য করে না। সুতরাং বুঝিবার এই প্রচেষ্টাই ধর্ম্মের প্রথম ও একমাত্র ভিত্তি" (চতুর্থ ভাগ-২৬ প্রঃ)। তাই স্পিনোজা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বিভিন্ন মানসিক

[1] Modesty. [2] Sermon on the mount

আবেগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "বিভিন্নমুখী বায়ু-তাড়িত তরঙ্গের ন্যায়, বাহ্য কারণদ্বারা নানা দিকে চালিত হইয়া আমরা আমাদের কার্য্যের পরিণাম কি, তাহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া পড়ি। ভাবি, যে চিত্তাবেগ যখন প্রবলতম হয়, তখনই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রাপ্ত হই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রবলতম চিত্তাবেগ আমাদিগকে অতিতম নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করে। কেননা পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত কোনও প্রবৃত্তি অথবা চিত্তাবেগের স্রোতে যখন আমরা পতিত হই, তাহার অচিরকাল পরেই তাহার প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। এই প্রবৃত্তি ও আবেগের ঘাত এবং প্রতিঘাতের মধ্যে আমরা আমাদের তদানীন্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া পড়ি। ইহার ফলে সেই অবস্থায় যাহা করা উচিত, তাহা ভাল ভাবে করিয়া উঠিতে পারি না। সহজাত প্রবৃত্তি কর্ম্মের উৎকৃষ্ট প্রবর্ত্তক বটে, কিন্তু তাহদের নেতৃত্ব বিপজ্জনক। কেননা, প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তি তাহার নিজের পরিতৃপ্তির অনুসন্ধান করে, সমগ্র পুরুষের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। অসংযত লোভ, কলহপ্রিয়তা এবং কামুকতা হইতে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই সমস্ত প্রবৃত্তির অধীন হইয়া লোকে তাহাদের দাসে পরিণত হইয়াছে। যে সমস্ত চিত্তাবেগ-দ্বারা আমরা প্রতিদিন আক্রান্ত হই, শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ। এই সম্বদ্ধ অংশ ভিন্ন অন্যান্য অংশের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অতি সামান্য। এই জন্যই ঐ সকল চিত্তাবেগ অতিরিক্ত হইয়া পড়ে, এবং মনকে এক বিষয়ের চিন্তায় এত ব্যাপৃত রাখে, যে অন্যান্য বিষয়ের চিন্তার অবসর তাহার থাকে না। যদিও মানুষ বহু চিত্তাবেগের অধীন হইতে পারে, এবং সর্ব্বদা একমাত্র চিত্তাবেগের অধীন লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি এ প্রকার লোকেরও অভাব নাই, যাহাদের মনঃ হইতে কোনও বিশেষ চিত্তাবেগ কিছুতেই বিদূরিত হয় না। কিন্তু দেহের কোনও একটি অংশ অথবা মাত্র কয়েকটি অংশের সুখ অথবা দুঃখ হইতে যে কামনার উদ্ভব হয়, তাহা মানুষের কোনও মঙ্গল সাধন করে না। (৬০ প্রঃ ৪র্থ খণ্ড)

যুক্তি ও বলবান চিত্তাবেগের[1] বিরোধ প্রদর্শনেই স্পিনোজার কর্ম্মনীতি পরিসমাপ্ত হয় নাই। যুক্তি-বিহীন চিত্তাবেগ যেমন অন্ধ, তেমনি আবেগহীন যুক্তিও প্রাণহীন। বিপরীত-মুখী বলীয়ান্ অন্য চিত্তাবেগ ব্যতীত কোনও চিত্তাবেগই প্রতিহত অথবা শান্ত হয় না। চিত্তাবেগ পূর্ব্বপুরুষ হইতে সংক্রামিত হয়। যুক্তির মূল হইতে ইহার মূল গভীরতর। যুক্তিদ্বারা চিত্তাবেগ শান্ত করিবার চেষ্টা নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হয়। যুক্তি ও চিত্তাবেগের দ্বন্দ্বে চিত্তাবেগই সাধারণতঃ জয়ী হয়। যুক্তি চিত্তাবেগের সহিত মিলিত হইলে, তৎকালিক অবস্থার সামগ্রিক দৃষ্টিলাভ হয়, এবং সেই সামগ্রিক দৃষ্টির ফলে চিত্তাবেগ স্বস্থানে স্থাপিত হয়। তাই স্পিনোজা চিত্তাবেগের বিরুদ্ধে যুক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া, যুক্তিহীন চিত্তাবেগের বিরুদ্ধে যুক্তি-সমন্বিত দ্বিতীয় চিত্তাবেগকে উপস্থাপিত করিবার কথা বলিয়াছেন। কামনা-বর্জ্জিত চিন্তা এবং চিন্তাবর্জ্জিত কামনা উভয়ই বন্ধ্যা। চিত্তাবেগের সুস্পষ্ট প্রত্যয়

---

[1] Passion.

উপজাত হইলে তাহার আবেগ অন্তর্হিত হয় (৫ম ভাগ—৩ প্রঃ)। মনের মধ্যে অস্পষ্ট প্রত্যয় যত বেশী থাকে, ততই মন চিত্তাবেগের বশীভূত হয়। যখন বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত পদার্থই নিয়ত এবং অবশ্যম্ভাবী, তখন চিত্তাবেগের উপর প্রভুত্বলাভ হয়, এবং চিত্তাবেগের বল হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কামনা যখন অস্পষ্ট প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত হয়, তখন তাহা চিত্তাবেগরূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু যখন তাহা সুস্পষ্ট প্রত্যয়[১] হইতে উদ্ভূত হয়, তখন সেই কামনা হয় ধর্ম্ম। যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ অবস্থিত, অনবরত তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেও তাহার প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে। পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকে। বুদ্ধিপুর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায়, সমগ্র পরিবেশের বিচার করিয়া যে কর্ম্মকৃত হয়, তাহাই পরিবেশের উপযোগী প্রতিক্রিয়া। বিচার করিয়া দেখিলে বুদ্ধি ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম নাই।

স্পিনোজার কর্ম্মনীতি তাঁহার তাত্ত্বিক দর্শনের অনুগামী। তাত্ত্বিক দর্শনে শৃঙ্খলাহীন বস্তুদিগের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মের আবিষ্কারই প্রজ্ঞার কার্য্য। কর্ম্মনীতিতেও শৃঙ্খলাহীন কামনা-প্রবাহের মধ্যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞার কার্য্য। তত্ত্ববিদ্যায় মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বস্তু দর্শনকরা, কর্ম্মনীতিতে মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে কর্ম্মকরা— উভয়ত্রই প্রজ্ঞাই নিয়ামক। খণ্ড জ্ঞান ও খণ্ড কর্ম্মকে সমগ্রের পরিপ্রেক্ষণের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত করাই প্রজ্ঞার কার্য্য। কল্পনা-সহায় চিন্তা এই কার্য্যের সহায়ক। যখন কোনও কর্ম্মের দিকে মনের প্রবৃত্তি জন্মে, তখন তাহার গুণাগুণ বিচারের জন্য, তাহার ভাবী ফল মনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্য, কল্পনার প্রয়োজন। পরিবেশের উপর মনের প্রতিক্রিয়া যদি অব্যবহিত হয়, যদি তাহা যুক্তির অপেক্ষা না করে, তাহা হইলে আমাদের কর্ম্মের সমস্ত দূরবর্ত্তী ভাবী ফলদ্বারা আমাদের মনের প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত হইবার অবকাশ পায় না। কল্পনাশক্তি সেই সকল ফল মনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া মনের প্রতিক্রিয়া বিলম্বিত করে। তখন মনের উপর যুক্তির প্রভাব পতিত হয়, এবং তাহার প্রতিক্রিয়া যুক্তি-নির্দ্দেশিত পথ অবলম্বন করে। বর্ত্তমানের অনুভূতি ভবিষ্যতের কল্পনাসৃষ্ট চিত্র হইতে স্পষ্টতর; ইহাই বুদ্ধিচালিত কর্ম্মের সম্মুখে প্রধান প্রতিবন্ধক। কিন্তু মনের সম্মুখে উপস্থিত কোনও বস্তুর ধারণা যদি যুক্তি-অনুসারী হয়, তাহাহইলে সে বস্তু বর্ত্তমানই হউক, অতীতই হউক, অথবা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিতই হউক, মনঃ সমান ভাবেই প্রভাবিত হইবে। কল্পনা ও যুক্তির সহায়তায় অভিজ্ঞতা দূরদর্শনে পরিণত হয়, এবং তাহার ফলে অতীতের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই। মানুষের পক্ষে যতটুকু স্বাধীনতালাভ সম্ভবপর, এই রূপেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিত্তাবেগের অধীনতাই বন্ধন। প্রজ্ঞার সক্রিয়তাই তাহা হইতে মুক্তি ও স্বাধীনতা। কার্য্যকারণের নিয়ম হইতে, অথবা সেই নিয়মের ফলোৎপাদন-পদ্ধতি হইতে মুক্তি স্বাধীনতা নহে। যুক্তি-বিহীন চিত্তাবেগ ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে মুক্তিই স্বাধীনতা; চিত্তাবেগ হইতে মুক্তি নয়,

---

[1] Adeqnate, ideas

অসংযত এবং অসম্পূর্ণ চিন্তাবেগ হইতে মুক্তি। জ্ঞানেই মুক্তি। "অতিমানবের" অর্থ সমাজের বিচার এবং সামাজিক জীবনের সুখ সুবিধা হইতে মুক্ত মানুষ নয়; অসংহত সহজাত প্রবৃত্তির ব্যক্তিগত প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়াই অতিমানবত্ব। এই সম্পূর্ণতা ও সমগ্রতার ফলই জ্ঞানীর মহত্ত্ব। অন্যকে শাসন করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেই লোকে বড় হয় না। জ্ঞানবর্জ্জিত কামনার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া ও আপনাকে শাসন করাই মহত্ত্ব। সাধারণতঃ যাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা বলা হয়, তাহা হইতে এই স্বাধীনতা মহত্তর। ইচ্ছা তো স্বাধীন নহেই, ইচ্ছা বলিয়াই হয়তো স্বতন্ত্র কিছুই নাই। (যাহাকে ইচ্ছা বলা হয়, তাহা জ্ঞানমাত্র)। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন, যে তাঁহার স্বাধীনতা নাই বলিয়া নৈতিক দায়িত্বও নাই, এবং তাঁহার কর্ম্ম ও চরিত্রের জন্য তিনি দায়ী নহেন। মানুষের কর্ম্ম তাহার স্মৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতীতে যে কর্ম্ম হইতে দুঃখের উদ্ভব হইয়াছে, মানুষ তাহা পরিহার করিতে, ও যাহা হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা করিতে ইচ্ছা করে। অতীত সুখদুঃখের স্মৃতিদ্বারা, সুখের আশা ও দুঃখের ভয়দ্বারা, তাহার কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। এই জন্যই সমাজের আত্মরক্ষার জন্য সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মনে যে আশা ও ভয় আছে, তাহার সাহায্যে তাহাদের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করা, এবং তাহাদ্বারা সামাজিক শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা করা সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক। নিয়তিতে—কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফলোৎপাদকত্বে—বিশ্বাসই শিক্ষার মূল। শিশুর চিত্তে যখন কোনও বিশ্বাস উৎপন্ন হয় নাই, তখনই তাহাতে অনেক কর্ম্ম নিষিদ্ধ বলিয়া ধারণার সৃষ্টি করা হয়। তাহার দ্বারা শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রিত হইবে, এই বিশ্বাসেই তাহা করা হয়। "অশুভ কর্ম্ম হইতে যে অশুভের উৎপত্তি হয়, নিয়ত বলিয়া, অবশ্যম্ভাবী বলিয়া, যে তাহা ভয় করিতে হইবে না, তাহা নহে। কর্ম্ম আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা-প্রসূত হউক বা না হউক, আশা ও ভয় যে আমাদের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমার দর্শনে উপদেশ ও আদেশের স্থান নাই, একথা মিথ্যা।" এই কথা স্পিনোজা এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন। নিয়তিবাদের ফল উন্নত নৈতিক জীবন। নিয়তিবাদ কাহাকেও অবজ্ঞা অথবা উপহাস না করিতে, অথবা কাহারও উপর রুষ্ট না হইতে, শিক্ষা দেয়। মানুষকে "দোষী" বলা যায় না; অপরাধীদিগকে শাস্তি দিলেও, সে শাস্তি ঘৃণা বর্জ্জিত হওয়া উচিত। অপরাধিগণ অজ্ঞ, কি করিতেছে, তাহা বোঝে না বলিয়া তাহারা ক্ষমার পাত্র। সকলই ঈশ্বরের সনাতন নিয়ম হইতে উদ্ভূত, নিয়তিবাদের এই শিক্ষা হইতে ভাগ্যের প্রসন্নতা ও বিরূপতা সমানভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই শিক্ষা হইতে আমরা "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি[1]" লাভ করিতে পারি। এই ভক্তি-লাভ হইলে প্রকৃতির নিয়মাবলী আমরা আনন্দের সহিত মানিয়া চলি, এবং প্রকৃতির পরিধির মধ্যেই আমাদের সার্থকতার সন্ধান করি। সমস্ত বস্তুই যিনি নিয়ত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি অবাঞ্ছিত ঘটনার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু তাহার জন্য অভিযোগ

---

[1] Intellectual Love of God

করিতে পারেন না। কেননা সকলই তিনি মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন করেন। তিনি জানেন, তাঁহার পক্ষে যাহা দুর্দৈব[1], সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তাহা আপতিক নহে। জগতের সনাতন পারম্পর্য্য ও গঠনের মধ্যে তাহার যৌক্তিকতা আছে। এই বিশ্বাসে চিত্তাবেগের সাময়িক সুখ বর্জ্জন করিয়া, তিনি ধ্যানের[2] উচ্ছ্রিত শান্তিতে আরোহণ করেন, এবং সকলই এক সনাতন ব্যবস্থা ও অভিব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পান। যাহা অপরিহার্য্য, তাহা তিনি সস্মিত মুখে গ্রহণ করেন, এবং যাহা তাঁহার প্রাপ্য, আজি হউক অথবা সহস্র বৎসর পরেই হউক, যখনই তাহার প্রাপ্তি হউক না কেন, গ্রাহ্য না করিয়া তিনি সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান করেন। তিনি জানেন, ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদিগের ব্যক্তিগত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট "খেয়ালী" পুরুষ নহেন। বিশ্বের ধারক যে অপরিবর্ত্তনীয় ব্যবস্থা, তাহাই তিনি। এই দর্শন জীবনকে অস্বীকার করে না, মৃত্যুকেও অমঙ্গল বলিয়া গণ্য করে না। "মুক্ত পুরুষ মৃত্যুর কথা চিন্তা করেন না; মৃত্যুর চিন্তাতে নয়, জীবনের চিন্তাতেই তাঁহার বিজ্ঞতা। আমাদের ক্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই দর্শনের বিশাল পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিলাভ করে এবং যে বেষ্টনীর মধ্যে আমাদের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়, তাহা সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেয়। বিনা প্রতিবাদে অশুভ-গ্রহণ ও নিশ্চেষ্টতা ইহা হইতে উদভূত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, ইহা ভিন্ন জ্ঞান ও শান্তির অন্য ভিত্তি নাই।"*

স্পিনোজার ধর্ম্ম

দার্শনিকের তত্ত্ববিদ্যা ও কর্ম্মনীতি হইতে তাহার ধর্ম্মবিশ্বাস অনুমান করা যায়। কিন্তু স্পিনোজার ভাষ্যকারদিগের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ বর্ত্তমান। ঈশ্বর-সম্বন্ধে স্পিনোজা যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন, ভক্তিমান খৃষ্টীয় সাধকদিগের ঈশ্বরস্তুতির ভাষার সহিত তাহার বিশেষ পার্থক্য নাই। ঈশ্বরের সাযুজ্য-সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এক্‌হার্টের ভাষার সহিত তুলনীয়। এইজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে "ঈশ্বরোন্মাদও" বলিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও কেহ কেহ তাঁহাকে নাস্তিক অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার কারণ তাঁহাদের মতে স্পিনোজা ঈশ্বরে বুদ্ধি ও ইচ্ছা আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইহাদের সমালোচনায় উত্তরে কোল্‌রিজ্‌ লিখিয়াছিলেন, "জেকোবি স্পিনোজার মতকে নিরীশ্বরবাদ বলিয়াছেন। কিন্তু এবিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত নহি। যে সকল বস্তু মূলতঃ বিভিন্ন, তাহাদিগকে স্পিনোজা একই নামে অভিহিত করেন নাই। সেই জন্যই তিনি ঈশ্বরে মানবীয় বুদ্ধির আরোপ করেন নাই। কিন্তু তিনি ঈশ্বরে যে জ্ঞান আছে, তাহা বলিয়াছেন।........তিনি নিয়তি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দুইটি বিভিন্ন জাতীয় নিয়তির কথা বলিয়াছেন। এক প্রকার নিয়তি স্বাধীনতা হইতে অভিন্ন। খৃষ্টীয় মতেও ঈশ্বরের সেবাই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। দ্বিতীয় প্রকারের নিয়তি দাসত্বের সমতুল্য। নিয়তি ও স্বাধীনতা যদি একই বস্তুর দ্বিবিধ রূপ না হয়, একটি তাহার আকার, অন্যটি তাহার

---

[1] Mischance. [2] Contemplation. * Will Durant

সার পদার্থ না হয়, তাহা হইলে যাবতীয় দর্শন ও যাবতীয় কর্ম্মনীতিকে বিদায় দেওয়াই শ্রেয়ঃ। নিয়তি-বর্জ্জিত স্বাধীনতা যদি কেবল সত্য হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার স্বাধীনতাবর্জ্জিত নিয়তিই যদি কেবল সত্য হয়, তাহা হইলে সুনীতি বলিয়াও কিছু থাকে না। কিন্তু ইহা সহসা বোধগম্য না হইলেও সত্য, যে বিজ্ঞানের যাহা চালক, যাহা ইহার ভিত্তি, যে প্রেরণা হইতে ইহার উদ্ভব, স্বাধীনতা-বর্জ্জিত নিয়তি তাহা হইতেই বিজ্ঞানকে বঞ্চিত করে এবং নিয়তি-বর্জ্জিত স্বাধীনতা সমস্ত সুনীতিকে নাস্তিক্য দোষে দূষিত করে। "আর্নেষ্ট রেণা লিখিয়াছেন, তিনি (স্পিনোজা) সম্পূর্ণ সুখী ছিলেন; এই সুখের মূল কি তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। যাহাকে নাস্তিক শিরোমণি বলা হইয়াছে, ঈশ্বরে ভক্তিকেই তিনি সুখের উপায় বলিয়াছেন। ঈশ্বরে ভক্তি করা এবং তাঁহাতে বসতি করা একই কথা। তাঁহার সময়ে ঈশ্বরে এত গভীর অন্তর্দৃষ্টি কাহারও ছিল না।

স্পিনোজার দর্শন ঈশ্বরের কথায় পূর্ণ। কিন্তু সে ঈশ্বর ইহুদী, খৃষ্টান্ অথবা মুসলমান ধর্ম্মের ঈশ্বর নহেন। তাঁহার ঈশ্বরের স্বরূপ কি, এবং মানুষের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি, তাহা না বুঝিতে পারিলে তাঁহার ধর্ম্মমত বোধগম্য হইবে না।

ইহুদীগণ আপনাদিগকে ঈশ্বরানুগৃহীত জাতি বলিয়া মনে করিত। কিন্তু ইহুদী জাতির দুঃখ কষ্টের অন্ত ছিল না। স্পিনোজার নিজের অদৃষ্টও তাঁহার স্বজাতির অদৃষ্টের অনুরূপ ছিল। তিনিও তাঁহার জাতির মতই উৎপীড়ন ভোগ করিয়াছিলেন। নির্দ্দোষ লোককে কেন দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়, তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছিলেন। জগৎ ব্যক্তিত্ব-বিহীন অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের কার্য্য বলিয়া তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপ্রবণ তাঁহার চিত্ত তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাই এই জগতের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মাবদ্ধ ব্যবস্থা তাঁহার দর্শনে এমন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যে তাহা প্রীতির পাত্র হইয়া উঠিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই সার্ব্বিক ব্যবস্থার মধ্যে তিনি স্বকীয় কামনা নিমজ্জিত করিয়া প্রকৃতির অচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। "তিনি বুঝিয়াছিলেন সমগ্র প্রকৃতির সহিত মানবমনের যে ঐক্য আছে, তাহার জ্ঞানেই মানুষের পরম মঙ্গল।" আমাদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের যে বোধ আমাদের আছে, তাহাকে ভ্রান্তিমূলক বলা যায়। আমরা ঈশ্বরের অংশ, নিয়ম ও কারণের বিশাল প্রবাহের অংশ, আমাদের অপেক্ষা বৃহত্তর সত্তার আমরা চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী অংশ। আমাদের মৃত্যু হয়, কিন্তু সে সত্তার বিনাশ নাই। আমাদের দেহ জাতি-দেহের এক একটি কোষ, জাতি জীবন-নাট্যের ঘটনা বিশেষ, আমাদের জীবন সনাতন আলোকের ক্ষণিক দীপ্তি।" আমাদের মনের বুদ্ধি চিন্তার একটি সনাতন বিকার, যাহা অন্য একটি চিন্তার বিকার-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত; শেষোক্ত বিকারও বিকারান্তর-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তাহাও আবার অন্য বিকারকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত; এইরূপ অনবস্থা চলিয়াছে। এই সকল বিকারের সমবায়ে ঈশ্বরের সনাতন ও অনন্ত বুদ্ধি গঠিত। ইহাই স্পিনোজার সর্ব্বেশ্বর-বাদ।" এই ঈশ্বরের দ্বারা মানুষেরা ধর্ম্মপিপাসা কতটা পরিতৃপ্ত হইতে পারে তাহা বিবেচ্য।

স্পিনোজার মতে উপরিউক্ত সনাতন সমগ্রের অংশরূপে আমরা অবিনশ্বর। তিনি

বলিয়াছেন, দেহের বিনাশের সঙ্গে মানবমনের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না, তাহার অংশবিশেষ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু সে কোন অংশ? যে অংশ সকল বস্তু মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে পায়, অর্থাৎ সকলই সেই অসীম সনাতন ঈশ্বরের অংশ ও তাহার সনাতন অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অঙ্গরূপে তাহাতেই অবস্থিত দর্শন করে। এই ভাবে সমস্ত বস্তু দেখিবার ক্ষমতা যতই লাভ করা যায়, ততই আমাদের চিন্তা অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। স্পিনোজার এই উক্তি অত্যন্ত অস্পষ্ট। এখানে তিনি যে অমরত্বের কথা বলিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, তাহাদ্বারা খ্যাতির অমরত্ব উক্ত হইয়াছে। আমাদের জীবন ও চিন্তার মধ্যে যে টুকু যুক্তিপূর্ণ ও সুন্দর, তাহা কালের প্রবাহে বাহিত হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া লোকের মন: প্রভাবিত করে। তাহার ফল অনন্তকালস্থায়ী বলা যায়। কখনও কখনও স্পিনোজা ব্যক্তিগত অমরত্বের কথাও বলিয়াছেন বলিয়া মনে হইলেও, তিনি চিরস্থায়িত্ব[১] ও সনাতনত্বের[২] মধ্যে পার্থক্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Ethics এর ৫ম খণ্ডের ৩৪ প্রতিজ্ঞায় তিনি বলিয়াছেন, মানুষের মধ্যে প্রচলিত মতের বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে মানুষ তাহার মনের সনাতনত্ব সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু তাহারা সনাতনত্ব ও স্থায়িত্বের কাল এক বলিয়া মনে করে, কল্পনা ও স্মৃতিতে সনাতনত্বের আরোপ করে, এবং মৃত্যুর পরে কল্পনা ও স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে বলিয়া বিশ্বাস করে।" ইহা হইতে দেখা যায় স্পিনোজা ব্যক্তিগত স্মৃতির অতিবর্ত্তনে বিশ্বাস করিতেন না। যখন দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে কেবল তখনই মনঃ কল্পনা করিতে এবং গত বিষয় স্মরণ করিতে পারে। দেহবিযুক্ত হইলে কিছুই কল্পনা অথবা স্মরণ করিতে পারে না।" (৫ম খণ্ড ২১ প্রতিজ্ঞা)। স্মৃতিহীন অমরতাকে জীবাত্মার অমরতা বলা যায় না।

স্বর্গে পুণ্যবান লোক পুরস্কৃত হয়, স্পিনোজা তাহা বিশ্বাস করিতেন না। যাঁহারা আশা করেন, যে পুণ্যের জন্য ঈশ্বর তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন, ধর্ম্মের প্রকৃত ধারণা তাঁহাদের নাই। পুণ্যের জন্য পুরস্কারের আশা করা আর ধর্ম্মাচরণকে দাসত্ব বলিয়া গণ্য করা, একই কথা। পুণ্য ও ঈশ্বরের সেবাই সুখ[৩]। এই সুখ সর্ব্বোত্তম স্বাধীনতা হইতে অভিন্ন। (২য় খণ্ড-৪৯ প্রতিজ্ঞা—note)। তদ্ভিন্ন অন্য সুখের আশা করা দাসত্ব মাত্র। "পরমসুখ[৪] ধর্ম্মের পুরস্কার নহে। ধর্ম্মই পরমসুখ।" একজন সমালোচক এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,* "এই ভাবে হয়তো সুস্পষ্ট চিন্তার পুরস্কার অমরতা নহে; সুস্পষ্ট চিন্তাই অমরতা। সুস্পষ্ট চিন্তা অতীতকে বর্ত্তমানে বহন করিয়া আনিয়া ভবিষ্যতের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং কালের সীমা ও সংকীর্ণতা অতিক্রম করিয়া পরিণাম-প্রবাহের পশ্চাতে অবস্থিত সনাতন পরিপ্রেক্ষিতকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে। এই রূপ চিন্তা অবিনশ্বর, কেননা প্রত্যেক সত্যই এক অবিনশ্বর সৃষ্টি, মানবের অর্জিত চিরস্থায়ী সম্পদের অংশ। ইহাদ্বারা অনন্ত কাল মানব প্রভাবিত হইতে থাকে।"

[1] Everlastingness [2] Eternity [3] Happinass.
[4] Blessedness. * Will Durant.

উপরে স্পিনোজার ধর্ম্মভাবের যে পরিচয় দেওয়া হইল, তাহা হইতে ঈশ্বর-সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা স্পষ্ট হয় না। Ethicsএর প্রথম অধ্যায়ে ১৭ প্রতিজ্ঞার টীকায় তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "বুদ্ধি ও ইচ্ছা যদি ঈশ্বরের সনাতন স্বরূপ বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি ও ইচ্ছা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা হইতে অনেক কম অর্থ বুঝাইতে শব্দ দুইটির প্রয়োগ করিতে হইবে। কেননা ঈশ্বরের স্বরূপ যে বুদ্ধি ও ইচ্ছা, তাহা আমাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছার সহিত তাহাদের কেবল নামেরই ঐক্য আছে, যেমন সারমেয়[১] নক্ষত্রের সহিত পার্থিব কুকুরের ঐক্য আছে।" "ঈশ্বরের বুদ্ধি, তাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি অভিন্ন। ঈশ্বরের বুদ্ধি সমস্ত বস্তুর কারণ, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর স্বরূপ ও অস্তিত্ব উভয়েরই কারণ। সুতরাং সমস্ত বস্তুর স্বরূপও অস্তিত্ব ঈশ্বরের বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। কেননা, কারণ হইতে কার্য্য যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই কারণ হইতে কার্য্যের ভিন্নতা। পিতা তাহার পুত্রের অস্তিত্বের কারণ, কিন্তু তাহার স্বরূপের কারণ নহেন। কেননা পুত্রের স্বরূপ সনাতন পদার্থ। এইজন্য স্বরূপে তাহাদের ঐক্য থাকিলেও, অস্তিত্বে তাহারা ভিন্ন। সুতরাং এক জনের অস্তিত্বের ধ্বংস হইলেও অন্যের অস্তিত্বের ধ্বংস হয় না। কিন্তু একজনের স্বরূপ বিনষ্ট করা সম্ভব হইলে, অন্যের স্বরূপও বিনষ্ট হইত। এই জন্য যে বস্তু অন্য আর একটি বস্তুর স্বরূপ ও অস্তিত্ব উভয়েরই কারণ, তাহার স্বরূপ ও অস্তিত্ব উভয়ই তাহার কার্য্য বস্তুর স্বরূপ ও অস্তিত্ব হইতে পৃথক। এখন ঈশ্বরের বুদ্ধি আমাদের বুদ্ধির স্বরূপ ও অস্তিত্ব উভয়েরই কারণ। সেইজন্য ঈশ্বরের বুদ্ধি তাঁহার স্বরূপের অংশ বলিয়া গণ্য হইলে, আমাদের বুদ্ধি হইতে স্বরূপ ও অস্তিত্ব উভয় বিষয়েই পৃথক, এবং কেবল নামে ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে আমাদের বুদ্ধির সহিত তাহার মিল হইতে পারে না।" মানবীয় বুদ্ধি হইতে যে বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, তাহার স্বরূপ কি, তাহা আমরা জানি না। আমরা ঈশ্বরে যে বুদ্ধির আরোপ করি, তাহা অসীম হইলেও মানবীয় বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে। আমাদের বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন বস্তুকে বুদ্ধি নামে অভিহিত করিলেও, আমরা যাহাকে বুদ্ধি বলি, তাহা তাহা নহে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্পিনোজা ঈশ্বরে যে Intellect এর আরোপ করিয়াছেন, তাহা Natura Naturansএর বুদ্ধি নয়, Natura Naturataতে অর্থাৎ বিশ্বরূপ ঈশ্বরে তাহা আরোপিত হইয়াচে। এই বিশ্ব যখন ঈশ্বরের দেহ, তিনি যখন বিশ্বরূপ, তখন এই বিশ্বের মধ্যে মানবে যে বুদ্ধি আছে, তাহা তাঁহারই বুদ্ধি। Natura Naturtaতে অসংখ্য বুদ্ধির একত্র সমাবেশ আছে। জীবদেহে অসংখ্য জীবকোষের সমবায়ে যে স্বতন্ত্র প্রাণের আবির্ভাব হয়, যে প্রাণদ্বারা দেহ সঞ্জীবিত হইয়া দেহে একত্বের উদ্ভব হয়, অসংখ্য মানবীয় বুদ্ধির সমবায়ে সেইরূপ কোনও স্বতন্ত্র বিশ্বপ্রকাশক বুদ্ধি ও জ্ঞানের আবির্ভাব Natura Naturataতে হয় কিনা, তাহা স্পিনোজা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।

[১] Sirius

এই প্রসঙ্গে Martineau বলিয়াছেন, যে যুক্তিতে স্পিনোজা ঈশ্বরে মানবীয় গুণের আরোপ নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কেবল বুদ্ধি কেন, সৃষ্ট বস্তুর কোনও গুণেরই তাঁহাতে আরোপ করা চলে না। ব্যাপ্তি ও চিন্তার আরোপও সম্ভবপর হয় না। স্পিনোজার যুক্তির অপরিহার্য্য পরিণাম অজ্ঞেয়বাদ[1]। ঈশ্বরের অসংখ্য গুণের মধ্যে ব্যাপ্তি ও চিন্তার সহিতই আমরা পরিচিত, এবং সেই জন্যই এই দুই গুণের ঈশ্বরে আরোপ সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপ্তি ও চিন্তা সৃষ্ট বস্তরই গুণ—জড়ের ধর্ম্ম ব্যাপ্তি, মনের ধর্ম্ম চিন্তা। ঈশ্বর যাবতীয় সৃষ্ট বস্তর "সার" ও "অস্তিত্ব" উভয়েরই কারণ; সৃষ্ট বস্তু "কার্য্য"। "কার্য্য" যাহা "কারণের" নিকট প্রাপ্ত হয়, কারণে তাহার অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে যে ব্যাপ্তি ও চিন্তা সৃষ্ট বস্তু ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে ঈশ্বরে তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু স্পিনোজা ঈশ্বরকে Res Extenso (ব্যাপ্তি গুণযুক্ত পদার্থ) ও Res Cogitans (চিন্তাগুণ-যুক্ত পদার্থ) বলিয়াছেন।

Trendelburg, Busolt এবং Sigwart এর মতে Res Cogitans আত্মসংবিদ সম্পন্ন সত্তা[2]। তাঁহারা বলেন স্পিনোজা Res Cogitans এ এমন কতকগুলি প্রত্যয়ের অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন, যাহাদের অস্তিত্ব মানুষের মনের মধ্যে থাকা অসম্ভব। মানুষের মনের মধ্যে যে প্রত্যয় নাই, Natura Naturataর মধ্যেও তাহা নাই। সুতরাং Natura Naturans কেই এই সকল প্রত্যয়ের আধার বলিতে হইবে। Ethicsএর দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় প্রতিজ্ঞায় স্পিনোজা বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের মধ্যে যে কেবল তাঁহার স্বরূপের প্রত্যয়ই আছে, তাহা নহে। তাঁহার স্বরূপ হইতে নিয়তি-ক্রমে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রত্যয়ও আছে।" ঈশ্বরের স্বরূপের প্রত্যয় এবং তাহা হইতে উদ্ভূত যাবতীয় বস্তর প্রত্যয় সসীম মানুষের মনে থাকিতে পারে না। সুতরাং স্পিনোজা যখন এই সকল প্রত্যয় ঈশ্বরে আছে বলিয়াছেন, তখন তাহারা Natura Naturasএর মধ্যে আছে, ইহা বলাই তাঁহার অভিপ্রেত বলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ স্পিনোজা বলিয়াছেন, যে সকল প্রত্যয় আমাদের মধ্যে অসম্পূর্ণ[3], তাহারা ঈশ্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ[4]। আমাদের মনে অনেক প্রত্যয়ই অসম্পূর্ণ; এই সমস্ত অসম্পূর্ণ প্রত্যয় যেমন আমাদের মনের মধ্যে বর্ত্তমান, তেমন আমাদের মনঃ Natura Naturataর অন্তর্গত বলিয়া, তাহারা Natura Naturataর ও অন্তর্গত। কিন্তু Natura Naturataতে আরোপদ্বারাই অসম্পূর্ণ প্রত্যয় সম্পূর্ণ হইয়া যায় না। সুতরাং বলিতে হইবে, আমাদের মনে যে সমস্ত প্রত্যয়ের সম্পূর্ণ ও সত্যরূপ প্রকাশিত হয় না, তাহাদের সম্পূর্ণ ও সত্য রূপ এক সার্ব্বিক আত্মসংবিদ-সম্পন্ন চৈতন্যে বর্ত্তমান, ইহা বলাই স্পিনোজার অভিপ্রায়। তৃতীয়তঃ—স্পিনোজার মতে বস্তুজগৎ ও প্রত্যয়-জগৎ অবিনাভাব-সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং উভয় জগতের ব্যবস্থা পরস্পরের অনুরূপ। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুরই একটি প্রত্যয় আছে, এবং বাস্তবজগতে

[1] Agnosticism. [2] Self Conscious Being.
[3] Inadequate. [4] Adequate.

বস্তুজাতের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান, প্রত্যয়রাজির মধ্যেও সেই পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সুতরাং বাস্তব সত্তা আছে, অথচ তাহার প্রত্যয় নাই, ইহা অসম্ভব। স্পিনোজা সমগ্র প্রকৃতিকে একটি বাস্তবসত্তা[1] বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সমগ্র প্রকৃতি একটি "ব্যক্তি"; Substance, তাহার attributes, ও modes সকলে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন সত্তা মাত্র নহে। পরস্পরে মিলিতভাবে একটি "ব্যক্তি"। সুতরাং প্রকৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন প্রত্যয় ব্যতিরিক্ত সমগ্র প্রকৃতির একটি স্বতন্ত্র প্রত্যয় নিশ্চয়ই আছে। সামান্য প্রত্যয়ের সহিত তাহার অন্তর্গত বিশিষ্ট প্রত্যয়সকলের যে সম্বন্ধ, সমগ্র প্রকৃতির প্রত্যয়ের সহিত প্রাকৃত বস্তু জাতের প্রত্যয়েরও সেই সম্বন্ধ। সমগ্র প্রকৃতির এই প্রত্যয় কেবল আত্মসংবিদ সম্পন্ন পুরুষের মধ্যেই থাকিতে পারে। এই জন্য অধ্যাপক Van den Wijkও বলিয়াছেন "তাঁহার ঈশ্বর সৃজনশীল অন্ধ প্রকৃতিমাত্র নহেন, বস্তুর সংবিদ্‌হীন সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন।.........ঈশ্বর যে mind (মনঃ), তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই। আমরা যাহাকে পুরুষ[2] বলি, ঈশ্বর যে সেইরূপ পুরুষ, তাহাই তিনি অস্বীকার করিয়াছেন," *

উপরোক্ত যুক্তিসমূহের উত্তরে Martineau বলিয়াছেন, "Res Cogitans"এর "প্রত্যয়" শব্দ স্পিনোজা যদি সকল ক্ষেত্রেই আত্ম সংবিদ্-যুক্ত অবস্থা বুঝাইতে ব্যবহার করিতেন, এবং যেখানে তিনি এবংবিধ প্রত্যয়ের কথা বলিয়াছেন, সেখানে যদি মানবমনঃ এবং কোনও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন অনন্ত পুরুষ, এই দুই ভিন্ন উক্ত প্রত্যয়ের আধারের অন্য কোনও বিকল্পের সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে এই প্রমাণ অখণ্ডনীয় হইত। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত দুই 'প্রতিবন্ধের[3] একটিও পালিত হয় নাই। স্পিনোজা "প্রত্যয়" শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভিন্ন বলিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত যে প্রত্যয় যুক্ত, তাহা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যে কোনটি হইতে পারে। এই তিনের মধ্যে জ্ঞাতাই মাত্র আত্মসংবিদ-সম্পন্ন। সুতরাং প্রত্যয় থাকিলেই তাহার আধারকে যে আত্মসংবিদ-সম্পন্ন হইতেই হইবে, তাহা বলা যায় না। সমগ্র প্রকৃতির সহিত যেমন তাহার প্রত্যয় আছে, তেমনি প্রকৃতির অন্তর্গত পর্ব্বত, নদী প্রভৃতি জড় পদার্থেরও প্রত্যয় আছে। কিন্তু পর্ব্বতে অথবা নদীর আত্ম-সংবিদ আছে, তাহা কেহই বলিবে না। এই জন্যই স্পিনোজা ঈশ্বরে প্রাণের আরোপ করেন নাই; যে প্রাণের সহিত আমরা পরিচিত, ঈশ্বরে তাহা নাই বলিয়াছেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, সমস্ত প্রত্যয়ের সহিত আত্মসংবিদ না থাকিলেও, ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাহা হইতে উদ্ভূত যাবতীয় পদার্থের যে প্রত্যয়, তাহার সহিত আত্মসংবিদ আছে, ইহা অনুমান করা যায়। অনুমান করা যায়, সত্য। কিন্তু যে যুক্তিতে, মানুষের মনে

[1] Individuam. [2] Person. [3] Conditions.

*. Quoted in Martineau's Study of Spinoza.

ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাহার কার্য্যের প্রত্যয় না থাকিলে, সে প্রত্যয় এক অতি-মানুষিক পুরুষে থাকিবে বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়, তাহা স্পিনোজার ভাষাদ্বারা সমর্থিত হয় না। স্পিনোজা বলিয়াছেন "কোনও প্রত্যয় ঈশ্বরে থাকিতে পারে দুই প্রকারে। ঈশ্বর মানবীয় মনের স্বরূপ, এই অর্থে মানুষের প্রত্যয় ঈশ্বরে বর্ত্তমান। অথবা "অনন্ত ঈশ্বরে"ও সে প্রত্যয় থাকিতে পারে। "অনন্ত ঈশ্বরে" কোন প্রত্যয় থাকার অর্থ—মানবমনো-রূপী প্রত্যয়ের সঙ্গে (মানবের মনঃ=দেহের প্রত্যয়) অন্য যাবতীয় প্রত্যয়ের আধার-স্বরূপ ঈশ্বরে, সেই প্রত্যয়ের অস্তিত্ব। স্পিনোজা ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, আমাদের সম্পূর্ণ অর্থাৎ সত্য প্রত্যয় সমূহই প্রথমোক্ত প্রকারে ঈশ্বরে বর্ত্তমান। দ্বিতীয় প্রকারে বর্ত্তমান আমাদের অসম্পূর্ণ অথবা ভ্রান্ত প্রত্যয়,- যে সকল প্রত্যয় এখন পর্য্যন্ত সত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হয় নাই। উভয় ক্ষেত্রেই স্পিনোজা মানবীয় প্রত্যয়ের অবস্থার কথাই বলিয়াছেন—সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ অবস্থা, বাস্তব[1] প্রত্যয় ও সত্যে অনুত্তীর্ণ কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাযুক্ত প্রত্যয়। দ্বিতীয় প্রকারে ঈশ্বরে অবস্থিত প্রত্যয়ের বিষয়ের মানবমনের যে জ্ঞান আছে, তাহা আংশিক অথবা অসম্পূর্ণ। সুতরাং স্পিনোজা যখন কোনও প্রত্যয় ঈশ্বরে আরোপ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ভাষা-অনুসারে সেই প্রত্যয়ের আধারের অনুসন্ধানে সসীম মনঃ হইতে স্বতন্ত্র কোনও বিষয়ীর প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন নাই। সসীম মনের সংখ্যা অনন্ত; ইহাদের আদিও নাই, অন্তও নাই। এই জন্যই এই সমস্ত সসীম মনের সমষ্টিকে স্পিনোজা অসীম বুদ্ধি বলিয়াছেন। এই অনন্ত মনঃ-শ্রেণী জাগতিক যাবতীয় দ্রব্যের প্রত্যয়-ধারণে সমর্থ। কোনও সত্য প্রত্যয় যদি কোনও বিশেষ স্থানে কোনও মনে না থাকে, অন্যস্থানে তাহা থাকা সম্ভবপর; কোনও বিশেষ সময়ে যদি না থাকে, সময়ান্তরে তাহার আবির্ভাব সম্ভবপর। যেখানে প্রত্যয় শব্দ স্পিনোজা আত্মসংবিদ-যুক্ত প্রত্যয় অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, সেখানে উপরোক্ত ভাবেই তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যেখানে উক্ত ব্যাখ্যা খাটে না, সেখানে "ঈশ্বরে অবস্থিত প্রত্যয়ে"র অর্থ, "জাগতিক ব্যবস্থায় অনুস্যূত বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ব"[2]। এই তত্ত্ব প্রকৃতির মূল গুণ হইতে অনুমান করা যায়। অসংখ্য দ্রব্যের সমবায় এই জগৎকে যে যুক্তি-সমন্বিত শৃঙ্খলাযুক্ত ব্যবস্থা-রূপে বুঝিতে পারা যায়, ইহা যে যুক্তির সম্বন্ধ-বিহীন বিচ্ছিন্ন দ্রব্যজাতের সমষ্টি নয়, পরন্তু যুক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ সু-সমঞ্জস সমবায়, সৃষ্ট বস্তু-সমূহ যে-নিয়তি-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তাহা যে আমাদের চিন্তারও নিয়ামক, এই তথ্যকেই স্পিনোজা জগতের অন্তর্নিহিত প্রত্যয় অথবা "ঈশ্বরে অবস্থিত প্রত্যয়" বলিয়াছেন। জাগতিক দ্রব্যজাতের পারস্পরিক সম্বন্ধের অনুরূপ সম্বন্ধ চিন্তা-জগতেও বর্তমান রহিয়াছে। ব্যক্তই হউক, আর অব্যক্তই হউক, সংবিদ-সম্পন্ন জ্ঞানে ইহার উত্তীর্ণ হইবার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। কোনও ব্যক্তির বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বহুদিন ইহা অজ্ঞাত

[1] Actual.

[2] Intelligible principle or Ralionale of the system of things.

থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব আছে, ইহা সত্য। স্পিনোজা যে বলিয়াছেন, যে আমাদের অসম্পূর্ণ প্রত্যয়সকল ঈশ্বরে সত্য, ইহাই তাহার অর্থ।

ঈশ্বরে আত্ম-সংবিদ আছে বলা যদি স্পিনোজার অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তিনি বলিতেন "God has an idea" (ঈশ্বরের একটি প্রত্যয় আছে), "God thinks infinite things in infinite ways (অসংখ্য বিষয় ঈশ্বর অসংখ্য প্রকারে চিন্তা করেন); কিন্তু তাহা না বলিয়া বলিয়াছেন "There *must* be in God", "God *can* think-infinite things," "God *can* form an idea of his essence and of all that necesarily follow from it" ইহা হইতে ঈশ্বরে এই প্রত্যয় বর্ত্তমানে আছে, ইহা বলা স্পিনেজার অভিপ্রায় ছিল বলিয়া মনে হয় না।

উপরে Martineauর মত বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। স্পিনোজার ভাষার যে অর্থ তিনি করিয়াছেন, তাহার উত্তরে বলা যায়—Ethicsএর দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় প্রতিজ্ঞায় আছে "In God there *is granted* not only the idea of his essence but also the Idea of all things which follow necessarily from his essence। ইহা modalityর ভাষা নহে। ঐ প্রতিজ্ঞার উপপত্তিতে তিনি বলিয়াছেন বটে, "God can think infinite things etc." এবং ইহাতে তিনি ঈশ্বরের ক্ষমতার কথাই বলিয়াছেন, ইহা মনে হইতে পারে সত্য, কিন্তু প্রথম অধ্যায়ের ৩৫ প্রতিজ্ঞায় বলিতেছেন, whatever we conceive to be in the power of God, necessarily exists অর্থাৎ যাহাই ঈশ্বরের ক্ষমতাভুক্ত বলিয়া আমরা ধারণা করি, তাহার অস্তিত্ব আছে। যে ক্ষমতার কথা ৩য় প্রতিজ্ঞায় বলা হইয়াছে, তাহা অসীমসংখ্যক দ্রব্যের চিন্তা করিবার ক্ষমতা, সুতরাং এই চিন্তা যে কেবল ক্ষমতায় আছে তাহা নহে, বাস্তবক্ষেত্রেও আছে বলিতে হইবে। God can form an idea of his essence এই উক্তি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। যে প্রত্যয় গঠন করিবার ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে, সে প্রত্যয় বাস্তব ক্ষেত্রে বর্ত্তমান, ইহা বলিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতিতে অনুস্যূত যে বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বকে Martineau আত্ম-সংবিদে অনুত্তীর্ণ বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, তাহা এই। Ethics এর প্রথমাধ্যায়ে ৩০ প্রতিজ্ঞায় আছে—"বাস্তব বুদ্ধিতে, তাহা সসীম হউক অথবা অসীম হউক, ঈশ্বরের গুণ এবং ঈশ্বরের বিকারের জ্ঞান থাকিতেই হইবে, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই তাহাতে থাকিতে পারে না।" এখানে অসীম বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এবং সেই বুদ্ধিতে ঈশ্বরের গুণ ও তাহার বিকারের জ্ঞান থাকিতে যে বাধ্য, তাহাও বলা হইয়াছে। ৩১ প্রতিজ্ঞায় এই অসীম বুদ্ধি যে Natura naturataর তাহাও বলা হইয়াছে। Comprehend শব্দদ্বারা বাস্তব জ্ঞানই সূচিত হয় শক্য জ্ঞান নয়। ইহা হইতে জগতে অনুস্যূত বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ব যে বাস্তবিক Natura Naturata তে অসীম বুদ্ধিদ্বারা গৃহীত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে গৃহীত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে না, ইহাই বোধগম্য হয়। Ethics এর ২য় খণ্ডের ৩য় প্রতিজ্ঞার উপপত্তিতে বলা হইয়াছে, ঈশ্বর আপনাকে জানেন।

"উক্ত" খণ্ডের চতুর্থ প্রতিজ্ঞাতেও অসীম বুদ্ধিতে ঈশ্বরের গুণেরও ঈশ্বরের বিকারের জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। পঞ্চম প্রতিজ্ঞায় বলা হইয়াছে "ঈশ্বর মননশীল" বলিয়া ঈশ্বরই প্রত্যয়সকলের স্বগত সত্তার (তাহাদের বিষয়ের সত্তা হইতে পৃথক) কারণ"। ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে ঈশ্বর তাঁহার স্বরূপের এবং তাহা হইতে নিয়তিক্রমে উদ্‌ভূত যাবতীয় বস্তুর প্রত্যয়-গঠনে সমর্থ। ইহার কারণ এই, যে ঈশ্বর মননশীল। ঈশ্বর তাহার স্বরূপের প্রত্যয়ের কারণ, শুধু এইমাত্র বলা হইলে সন্দেহ করা যাইত, যে প্রত্যয় যখন নিয়তিক্রমে ন্যায়ের নিয়মে গঠিত, তখন সেই প্রত্যয়ের সংবিদ না থাকিতেও পারে। কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে জানেন, ইহার অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপের প্রত্যয় সজ্ঞান[2]। ইহা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ঈশ্বরের স্বরূপের এই প্রত্যয়ই Martineauর Intelligible Priniciple। ঈশ্বর যখন এই Principle জানেন, তখন তাহা নিশ্চয়ই আত্মসংবিদে উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিতে হইবে। ২১ প্রতিজ্ঞার ব্যাখ্যায় আছে যখন কেহ কিছু জানে, তখন সে যে তাহা জানে, তাহাও জানিতে পারে।

Martineauর Intelligible Priniciple বর্তমানে কাহারও জ্ঞানের বিষয় না হইলেও ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা-যুক্ত। অসীম প্রকৃতিতে অনুস্যূত এই তত্ত্বও নিশ্চয়ই প্রকৃতির মতই অসীম। সুতরাং ইহা যে বুদ্ধির বিষয় হইবে, সে বুদ্ধিও অসীম। সে বুদ্ধির অস্তিত্ব Martineauর মতে বর্তমানে নাই, ভবিষ্যতে তাহার উদ্‌ভব হইতে পারে। ইহার অর্থ এই Intelligible Priniciple বর্তমানে Inellect না হইলেও ভবিষ্যতে Intellectরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে। এই ভাবে অসীম বুদ্ধি বাস্তব নহে, শক্য। কিন্তু ১ম খণ্ডের ৩১ প্রতিজ্ঞায় স্পিনোজা শক্য বুদ্ধির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।

আরও একটি কথা এই : স্পিনোজা প্রত্যয়ের প্রত্যয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে যাবতীয় প্রত্যয়েরই প্রত্যয়[3] আছে বলিয়া মনে হয়। মানুষের মনঃ তাহার দেহের প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের যে প্রত্যয়ের কথা[4] স্পিনোজা বলিয়াছেন (II—XXI ব্যখ্যা) তাহা ঈশ্বরের মধ্যেই যে নিয়তি[5] আছে, এবং ঈশ্বরে যে চিন্তা-শক্তি আছে, তাহা হইতে উদ্‌ভূত হয়। মনোরূপ যে প্রত্যয়, তাহার প্রত্যয়ের উদ্ভব যদি নিয়ত হয়, তাহা হইলে জাগতিক যাবতীয় দ্রব্যের ও সমগ্র প্রকৃতির প্রত্যয়েরও প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রত্যয়ের উদ্ভবও অবশ্যম্ভাবী। এই সমস্ত প্রত্যয়ই ঈশ্বরে অবস্থিত, অর্থাৎ এই সমস্ত প্রত্যয়রূপ বিষয়ের বিষয়ী ঈশ্বর স্বয়ং। সুতরাং ঈশ্বরে কেবল যে যাবতীয় পদার্থের প্রত্যয় আছে, তাহা নহে; সেই সকল প্রত্যয়েরও প্রত্যয় আছে। এই প্রত্যয়ের প্রত্যয়ের অর্থই আত্মসংবিদ। আমার মনে কোনও প্রত্যয়ের প্রত্যয় যখন উদিত হয়, তখন "আমি এই প্রত্যয় জানিতেছি"

[1] Thinking Thing [2] Conscious
[3] Idea, Idee [4] Idea of the mind [5] necessity

এই জ্ঞানের উদ্ভব—"আমি"র জ্ঞানের উদ্ভব—হয়। এই জ্ঞানের জ্ঞাতা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ঈশ্বর স্বয়ং। তিনি নিত্য বর্ত্তমান, উদ্‌ভূত নহেন। তাঁহার আত্ম-সংবিদ কিরূপে উৎপন্ন হয়, ইহা তাঁহার বর্ণনা। মানুষে জ্ঞাতার প্রাকৃভাবের অভাবের যে আপত্তি মানুষেব আত্ম সংবিদের বেলায় উঠিতে পারে, ঈশ্বরে আত্ম সংবিদের বেলায় তাহা উঠে না। সুতরাং তাহাতে আত্ম-সংবিদের অস্তিত্ব স্পিনোজা অস্বীকার করিয়াছেন—একথা বলা যায় না।

Martineau প্রকৃতির যে Rationale অথবা Intelligible Principleএর কথা বলিয়াছেন, তাহা জগতে অনুস্যূত প্রজ্ঞা, ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রজ্ঞার যে নিয়মানুসারে জাগতিক দ্রব্যজাত ব্যবস্থিত, যে যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থায় জাগতিক যাবতীয় দ্রব্য সজ্জিত, যে ব্যবস্থা যুক্তিতে প্রকাশিত হয়, তাহাই জগতের Rationale। সেই ব্যবস্থাই বেদে "ঋতং" নামে অভিহিত। Plotinusএর এক হইতে যে "Nous" উদ্‌ভূত, "একের" যাহা বিকিরণ,[২] সেই "Nous" অথবা অনন্ত বুদ্ধিই সেই Rationale। বেদের "ঋতং" পুরুষ; তিনি ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম, পুরুষ এবং বিশ্বরূপ, অচেতন নিয়মমাত্র নহেন। Plotinusএর Nousও অচেতন নহেন। আধুনিক বিজ্ঞান জগতের মূলে গণিতের যে শৃঙ্খলা দেখিতে পাইয়াছে, তাহাও চিত্তের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু নহে। চিৎ হইতে তাহাকে বিযুক্ত করিলে তাহা নিরাধার abstraction মাত্র। কল্পনায় তাহাকে বিযুক্ত করিলেও বস্তু হইতে তাহাকে বিযুক্ত করা সম্ভবপর নহে। স্পিনোজা নিজেও চিন্তা-গুণ হইতে অব্যবহিতভাবে উদভূত সনাতন বিকারকে absolutely Infinite Inteligence বলিয়াছেন। Martineau আপত্তি করিয়াছেন, যে এই বুদ্ধি সম্পূর্ণ অসীম হইতে পারে না, কেননা তাহা যে চিন্তা-গুণের বিকার, তাহাই সম্পূর্ণ অসীম নহে। দ্বিতীয়তঃ সেই চিন্তা-গুণেরই অন্তর্গত যে সমস্ত প্রত্যয় আত্ম-সংবিদ-যুক্ত নহে, তাহারা ইহার মধ্যে নাই। এই আপত্তিও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কেননা, বস্তুতঃ ব্যাপ্তি ও চিন্তা Substanceএর দুইটি স্বতন্ত্র অংশ নহে। একই Substance এক ভাবে দেখিলে ব্যাপ্তি, অন্যভাবে চিন্তা। সুতরাং Substance যদি অসীম হয়, তাহা হইলে তাহার চিন্তা-গুণকেও অসীম বলা যায়। চিন্তা-গুণের বিকার বুদ্ধি, ইহা সত্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা Substance এরই বিকার। বুদ্ধি ও তাহার বিষয়ীভূত ব্যাপ্তির বিকার একই পদার্থ। এই বিকারকে স্পিনোজা যখন absolutely infinite বলিয়াছেন, তখন স্পিনোজার মতে Snbstance ও এই বুদ্ধির ব্যাপ্তি সমান। Substance এর যাবতীয় বিকার ইহার বিষয়, সমগ্র প্রকৃতিরূপ "ব্যক্তি"র প্রত্যয় ইহার বিষয়, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতি তথাকথিত অচেতন পদার্থের প্রত্যয়ও ইহার বিষয়, এবং এই সমস্ত প্রত্যয়ের প্রত্যয় সকলও ইহার বিষয়। এই অনন্ত প্রত্যয়রাজি আত্ম-সংবিদে উত্তীর্ণ একমেবাদ্বিতীয়ং চিন্ময় পদার্থ।

[১] Reason. [২] Emanation.

স্পিনোজার রাজ-নৈতিক মত

Tractus Politicus স্পিনোজার পরিণত বয়সের লেখা। স্বল্পায়তন গ্রন্থখানি গভীর চিন্তাপূর্ণ। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যখন স্পিনোজার মানসিক শক্তি পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তখনই তাহার জীবনেব পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। এই মূল্যবান গ্রন্থ শেষ করিবার সময় তিনি প্রাপ্ত হন নাই।

স্পিনোজার সম সময়ে ইংলণ্ডে Hobbs অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ইংরেজ জাতির রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্পিনোজা তাঁহার গ্রন্থে হল্যাণ্ডের তৎকালীন উদারনৈতিক গণতন্ত্রবাদ ব্যাখা করিয়াছিলেন। তাহারই চিন্তা পরবর্ত্তী কালে রুসোর ভিতর দিয়া ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল।

সমস্ত রাজনৈতিক দর্শনই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ও কর্ম্মনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ভেদের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ-সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা ও তাহার পরের অবস্থার সম্যক জ্ঞান রাজনৈতিক দর্শনের আলোচনার জন্য অত্যাবশ্যক। যখন সমাজ ছিল না, মানুষ পৃথক পৃথক বাস করিত, তখন আইন ছিল না, ন্যায়ান্যায়ের ধারণা ছিল না, সুবিচার-অবিচারের বোধ ছিল না। বল ও ন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল না। "জোর যার মুলুক তার" ছিল প্রচলিত নীতি। প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে মানুষ নিজের সুবিধাই অন্বেষণ করে। নিজের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিজের খেয়ালমত কাজ করে। মানুষ তখন নিজের নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট তাহার দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে করে না। এই প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে "পাপ" বলিয়া কোনো কিছুর ধারণার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

সমাজ গঠিত হইবার পরে, যখন সকলের সম্মতি অনুসারে, কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, তাহার নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়, এবং এই নির্দেশানুসারে প্রত্যেকে আপনাকে সমাজের নিকট দায়ী বলিয়া গণ্য করিতে শিখে, তখনই পাপের ধারণার উদ্ভব সম্ভবপর। প্রকৃতির যে নিয়মের শাসনাধীনে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তাহাতে যাহা কেহ করিতে ইচ্ছা করে না, অথবা করিতে সক্ষম নহে, তাহা ভিন্ন অন্য কিছু করিতেই বাধা নাই। এই নিয়মের সহিত ঘৃণা, দ্বেষ, ক্রোধ, কলহ, বিশ্বাসঘাতকতা কিছুরই বিরোধ নাই। এই প্রাকৃতিক অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় বর্ত্তমানে রাষ্ট্রদিগের পরস্পারের সহিত ব্যবহারে। রাষ্ট্রদিগের পরস্পরের প্রতি আচরণে পরার্থপরিতা বলিয়া কিছু নাই। সর্ব্ব-স্বীকৃত সমাজ-ব্যবস্থা ও তাহার সহিত সেই ব্যবস্থার সংরক্ষণের জন্য সর্ব্বস্বীকৃত সমাজ-রক্ষক যেখানে আছে, সেইখানেই আইন ও কর্ম্মনীতির স্থান। বর্ত্তমানে রাষ্ট্রের অধিকার, সমাজ-গঠনের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তির অধিকারের সমতুল্য, অর্থাৎ বলই সেখানে "অধিকার"। এই জন্য জগতের প্রধান জাতি কয়েকটি "বড়শক্তি"[১] বলিয়া অভিহিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও ঐ একই নিয়ম অর্থাৎ সেখানে পরস্পরের প্রতি ন্যায়া-ন্যায়ের বিচারের কোনও সর্ব্বস্বীকৃত নিয়মেও নাই,

১ Great Powers.

নিয়মের রক্ষাকর্ত্তাও নাই। প্রত্যেক-জাতীয় প্রাণীর অন্য-জাতীয় প্রাণীর প্রতি আচরণ স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত।

নিঃসঙ্গ জীবন সকলেই ভয় করে। সঙ্গীহীন কেহই আত্মরক্ষায় সক্ষম হয় না। জীবন-রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সংগ্রহের জন্যও অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন। এই জন্য স্বভাবতঃই মানুষ সমাজ-গঠনের প্রয়োজন উপলব্ধি করে, এবং বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য একজনের বল যথেষ্ট হয় না বলিয়া পরস্পরের সাহায্যের ব্যবস্থা করে। সামাজিক জীবনের জন্য সহিষ্ণুতা, সংযম প্রভৃতি যে সকল গুণের প্রয়োজন হয়, প্রকৃতির নিকট মানুষ তাহা প্রাপ্ত হয় নাই। বিপদ হইতে এই সকল গুণের উদ্ভব হয়, এবং সামাজিক জীবনের মধ্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া উহারা বলীয়ান্ হয়। নাগরিকের গুণ সহজাত নয়; তাহা অর্জ্জন করিতে হয়।

অন্তরে প্রত্যেক মানুষই স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়, এবং নিয়ম ও প্রথার বিরোধী। সামাজিক প্রবৃত্তি[1] ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির[2] পরবর্ত্তী, এবং তাহা অপেক্ষা দুর্ব্বল। সামাজিক প্রবৃত্তিকে সবল করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। মানুষ স্বভাবতঃই ভালো নহে; পরিবারের মধ্যে স্বজনের সহিত একত্র বাসের ফলে সমবেদনার সৃষ্টি হয়; সমবেদনার ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হইয়া একজাতীয়তা-বোধ উৎপন্ন হয়, তাহার পরে "দয়া"র আবির্ভাব হয়। যাহা আমাদের সদৃশ, তাহা আমরা ভালবাসি। যাহাকে আমরা ভালবাসি, কেবল তাহার প্রতিই যে আমাদের অনুকম্পা হয়, তাহা নহে; যাহারা আমাদের সদৃশ, তাহাদের প্রতিও অনুকম্পা হয়। এইরূপে চিত্তাবেগের মত কিছুর উৎপত্তি হয়; অবশেষে ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেকের অঙ্কুরোদ্গম হয়। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেক অর্জিত গুণ, জন্মগত নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভি.. ভিন্ন অবস্থায় ইহার রূপ বিভিন্ন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তির মনে তাহার স্বজাতির নৈতিক ঐতিহ্যের যে প্রতিক্রিয়া সঞ্চিত হয়, তাহাই ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেক। এই বিবেকের উদ্ভাবন করিয়া সমাজ তাহার শত্রু স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় ব্যক্তির মনের মধ্যে এক মিত্র লাভ করে।

এইরূপে সংগঠিত সমাজে ব্যক্তির ক্ষমতা সমগ্রের বিধিগত ও নীতিগত ক্ষমতার অধীনতা স্বীকার করে। তখনও অধিকার নির্ভর করে বলের উপর, কিন্তু সমাজের বল-কর্তৃক ব্যক্তির বল নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তির বল-প্রয়োগের ক্ষেত্র সংকীর্ণতর হয়। তখন এই মতবাদের উদ্ভব হয়, যে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া সকলেই প্রয়োজন মত বল-প্রয়োগ করিতে পারে। ব্যক্তির স্বাভাবিক ক্ষমতার কিয়দংশ সমাজকে অর্পিত হয়, এবং তাহার বিনিময়ে তাহার ক্ষমতার অবশিষ্ট অংশের ব্যবহারের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হয়। সে ক্ষেত্রে কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে না। ক্রোধবশতঃ বলপ্রয়োগের অধিকার বর্জন করিয়া আমরা প্রাপ্ত হই অন্যের এবংবিধ বলপ্রয়োগ হইতে অব্যাহতি। মানুষ প্রবল চিত্তাবেগের অধীন বলিয়াই নিয়মের আবশ্যক। সকলেই যদি যুক্তিকর্তৃক

[1] Social instinct [2] Individual instinct

চালিত হইত, তাহা হইলে নিয়মের প্রয়োজন হইত না। দোষলেশহীন যুক্তি ও প্রবল চিন্তাবেগের মধ্যে যে সম্বন্ধ, দোষহীন আইন ও ব্যক্তির মধ্যেও সেই সম্বন্ধ। সমগ্রের ধ্বংসের নিরোধ ও তাহার শক্তিবৃদ্ধির জন্য পরস্পর-বিরোধী শক্তির সমন্বয় যেমন চিত্তক্ষেত্রে যুক্তির কাজ, তেমনি সমাজ-ক্ষেত্রে তাহা আইনের কাজ। তত্ত্ববিদ্যায় বস্তু সকলের মধ্যে ব্যবস্থার[1] উপলব্ধি, এবং কর্মনীতিতে বাসনা-রাজির মধ্যে এবং রাজনীতিতে মানুষের মধ্যে ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই প্রজ্ঞার কাজ। নাগরিকদিগের ক্ষমতার যতটুকু পরস্পরের ধ্বংসাত্মক, ততটুকুই পূর্ণতা-প্রাপ্ত রাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। পূর্ণতর স্বাধীনতা দানের উদ্দেশ্যে ভিন্ন এরূপ রাষ্ট্র প্রকৃতিপুঞ্জকে কোনও স্বাধীনতা হইতেই বঞ্চিত করে না। "লোকের উপর প্রভুত্ব করা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নহে। ভয়দ্বারা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করাও ইহার উদ্দেশ্য নহে। নাগরিকগণ যাহাতে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে নিজের ও প্রতিবেশীর অনিষ্ট না করিয়া বাস ও কার্য্য করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ভয় হইতে মুক্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য। প্রজ্ঞাবান জীবকে পশুত্বে অথবা যন্ত্রে পরিণত করা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নহে। তাহাদের দেহ ও মনঃকে নিরাপদে কর্ম্ম করিবার সুযোগ দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। ঘৃণা, ক্রোধ ও শঠতায় শক্তির অপব্যয় না করিয়া এবং পরস্পরের প্রতি অন্যায় ব্যবহার না করিয়া যাহাতে তাহারা স্বাধীন যুক্তির ব্যবহার ও তদনুযায়ী জীবন-যাপন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই ইহার লক্ষ্য। এইরূপে দেখিলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সত্য সত্যই স্বাধীনতা।"

প্রকৃতি-পুঞ্জের উন্নতির সহায়তা করাই রাষ্ট্রের কার্য্য। সামর্থ্যের অবাধ ব্যবহারের উপর উন্নতি নির্ভর করে। লোকের মধ্যে যে সামর্থ্য আছে, তাহার ব্যবহার যদি বাধা-প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উন্নতি হইতে পারে না। রাষ্ট্রের আইন যদি উন্নতি ও স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়, রাষ্ট্র (অর্থাৎ রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ) যদি আপনাদিগের প্রভুত্ব-রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে এবং জনগণকে ব্যবহার করে, তাহা হইলে নাগরিকের কর্ত্তব্য কি? স্পিনোজা বলেন, "তখনও অন্যায় আইন মানিয়া চলা উচিত, যদি যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ ও আলোচনা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন-সাধনের জন্য বাক-স্বাধীনতা নিষিদ্ধ না হয়। এবংবিধ স্বাধীনতা হইতে সময়ে সময়ে অসুবিধার উদ্ভব হয়, স্বীকার করি; কিন্তু কোন্ সমস্যার কখন এমন ভাবে সমাধান করা সম্ভবপর হইয়াছে, যে তাহা হইতে অনাচারের উদ্ভব অসম্ভব হইয়াছে?" বাক্যের স্বাধীনতা খর্ব্ব করে যে আইন, তাহাদ্বারা সমস্ত আইনের মূলোচ্ছেদ হয়, কেননা যে আইনের সমালোচনা করিবার ক্ষমতা নাই, বেশী দিন সে আইন লোকে মানিয়া চলে না।" "যতই গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক বাক্যের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়, ততই লোকে দৃঢ়তার সহিত তাহাতে বাধা দেয়। এই বিরুদ্ধতা যে স্বার্থপর লোভী লোকদিগের নিকট হইতে আসে, তাহা নহে। আসে সেই সমস্ত লোক হইতে, যাহারা উৎকৃষ্ট শিক্ষা, নির্দ্দোষ নীতিও ধর্ম্মের বলে সাধারণ লোক হইতে অধিকতর স্বাধীনতা

[1] Order

লাভ করিয়াছে।” “মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ, যে যাহা তাহারা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, আইনের দৃষ্টিতে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারে না।···এরূপ অবস্থায় আইনের প্রতি ঘৃণা ও গবর্ণমেণ্ট-বিরোধী কর্ম্মকে তাহারা অন্যায় বলিয়া তো মনেই করে না; বরং সম্মানজনক বলিয়াই মনে করে।” “বাক্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, যদি কেবল কার্য্যের বিরুদ্ধেই দণ্ডনীতি প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোন সমর্থন-যোগ্য কারণ থাকে না।”

রাষ্ট্রের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও রাষ্ট্রের উপর স্পিনোজার বিশ্বাস ছিল না। তিনি জানিতেন, হাতে ক্ষমতা আসিলে দোষলেশশূন্য লোকও দূষিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য লোকের দেহ ও কার্য্যের উপর রাষ্ট্রের যে কর্তৃত্ব আছে, তাহাদের চিন্তা ও আত্মার উপর তাহার প্রসার তিনি অনুমোদন করিতেন না। রাষ্ট্রের ক্ষমতার এতাদৃশ বিস্তারে উন্নতি প্রতিহত হয়। এই জন্যই তিনি রাষ্ট্র-কর্তৃক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ, অনুমোদন করিতেন না। “রাষ্ট্রের ব্যয়ে যে সকল শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদের উদ্দেশ্য যতটা শিক্ষার্থীদিগকে সংযত করা, ততটা তাহাদিগের প্রকৃতি-দত্ত ক্ষমতার উন্নতি-সাধন নয়। স্বাধীন রাষ্ট্রে যাহারা নিজের ব্যয়ে প্রকাশ্য ভাবে শিক্ষা দান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে অনুমতি দিলে বিজ্ঞান-ও-কলা-চর্চ্চার উপকারই হইবে।” ইহা লিখিবার সময় সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্টদিগের কথা স্পিনোজার মনে হইয়াছিল।

স্পিনোজার মতে বাক্যের স্বাধীনতা ও শিক্ষার স্বাধীনতা থাকিলে শাসন-প্রণালীর প্রকার-ভেদে যায় আসে না। যে সমস্ত শাসন-প্রণালী প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের সকলই এমন ভাবে গঠিত করা যায়, যাহাতে রাষ্ট্রের প্রত্যেক লোক নিজের স্বার্থ অপেক্ষা সাধারণের অধিকারকে অধিকতর গুরুত্বদান করে। এই ভাবে শাসনতন্ত্র গঠনকরাই ব্যবস্থাপকদিগের কাজ। রাজতন্ত্র কার্য্যক্ষম বটে, কিন্তু সাধারণতঃ উৎপীড়ক ও সৈন্যবলের উপর নির্ভরশীল। যদি রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা এক জনের উপর ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের শান্তি ও ঐক্য বৃদ্ধি পায়, ইহা দেখা যায়। রাজতন্ত্র-শাসিত তুর্কসাম্রাজ্যের মত দীর্ঘকাল-স্থায়ী কোনও রাষ্ট্রই হয় নাই। অন্যদিকে গণতন্ত্র-শাসিত রাষ্ট্রের মত স্বল্পকালস্থায়ী রাষ্ট্রও দেখা যায় নাই। ইহার বিরুদ্ধে যত বিদ্রোহ হইয়াছে, অন্য কোনও শাসনতন্ত্রের বিরু... তত হয় নাই। তবুও দাসত্ব ও বর্ব্বরতার মত দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।

গোপনীয় কূট রাজনীতি[1] সম্বন্ধে স্পিনোজা বলিয়াছেন:—নিরঙ্কুশ-ক্ষমতা-লোভীদিগের সকলেই বলেন, রাষ্ট্রের স্বার্থ-রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় কার্য্য গোপনে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। জনকল্যাণের ছদ্মবেশে এই প্রকার যুক্তি যতই বেশী সজ্জিত হয়, ততই তাহার ফলে অধিকতর দাসত্বের উদ্ভব হয়। ন্যায়সঙ্গত অভিসন্ধি শত্রুর কর্ণগত হয়, সেও ভাল,

[1] Secret diplomacy

তবু যথেচ্ছাচারী শাসকবর্গের অশুভকর গুপ্ত ব্যাপার জনগণের নিকট হইতে গুপ্ত রাখা উচিত নহে। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যদি রাষ্ট্র-সংক্রান্ত ব্যাপার গোপনে নির্বাহ করিতে পারে, তাহা হইলে জনগণ তাহাদের সম্পূর্ণ পদানত হইয়া পড়ে। যুদ্ধের সময় তাহারা যেমন শত্রুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, শান্তির সময় তেমনি তাহারা প্রজাদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করে।

স্পিনোজার মতে গণতন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত শাসন-প্রণালী। গণতন্ত্রে প্রত্যেকের কার্য্য গভর্নমেণ্ট-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু সকলেরই যুক্তি ও বিচার স্বাধীন। সকলেই একভাবে চিন্তা করে না; এইজন্য অধিকাংশের মতই আইনের মর্য্যাদা লাভ করে। গণতন্ত্রের অধীনস্থ প্রত্যেক নাগরিকেরই সৈন্যদলভুক্ত হইয়া রাষ্ট্ররক্ষায় সাহায্য করা উচিত। শান্তির সময় প্রত্যেক নাগরিকের অস্ত্র তাহার নিজের কাছেই রাখা উচিত। রাষ্ট্রে একটি মাত্র কর থাকা উচিত। দেশের সমস্ত জমি ও গৃহ রাষ্ট্রের সম্পত্তি হইবে, এবং বাৎসরিক কর নির্দ্ধারিত করিয়া জমি নাগরিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন শান্তির সময় অন্য কর দিতে হইবে না। প্রজাতন্ত্রের দোষ এই, যে ইহাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে অনুৎকৃষ্ট লোকদিগের হস্তগত হয়। শাসনকার্য্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ লোকের মধ্যে রাষ্ট্রীয়পদ সীমাবদ্ধ করা ভিন্ন এই ত্রুটি এড়াইবার অন্য উপায় নাই। সংখ্যা হইতে বিজ্ঞতার উৎপত্তি হয় না। সংখ্যা-বলের সাহায্যে হীনতম চাটুকারও উচ্চপদ লাভ করিতে পারে। অস্থির-চিত্ত জনতা চিত্তাবেগদ্বারাই চালিত হয়, যুক্তির ধার তাহারা ধারে না। তাহাদের আচরণ দেখিয়া অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন উপযুক্ত লোক হতাশ হইয়া পড়ে। এই জন্য গণতান্ত্রিক শাসন জনতার অনুগৃহীত বাচালদিগের স্বল্পকাল-স্থায়ী মিছিলপরম্পরায় পর্য্যবসিত হয়, এবং উপযুক্ত লোক নিকৃষ্টতর লোকের বিচারপ্রার্থী হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে ঘৃণা বোধ করেন। শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, দক্ষতর লোকেরা এই শাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, এবং গণতন্ত্রের স্থানে অভিজাত-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিজাত-তন্ত্র অবশেষে রাষ্ট্রতন্ত্রে পরিবর্ত্তিত হয়। লোকে বিশৃঙ্খলা অপেক্ষা যথেচ্ছাচারও সহ্য করিতে স্বীকৃত হয়।

ক্ষমতার সাম্য একটা অস্থির অবস্থা। মানুষে মানুষে স্বভাবতঃই প্রভেদ বর্ত্তমান। অসমান লোকদিগের মধ্যে যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, সে অসম্ভবকে সম্ভবপর করিতে চায়। গণতন্ত্রের প্রধান সমস্যা শিক্ষিত ও উপযুক্ত শাসনকর্ত্তার নির্ব্বাচনদ্বারা দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শক্তির শাসন-কার্যে নিয়োগ। সকলকে এই নির্ব্বাচনে অধিকার দিয়াও কিরূপে এইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তির নির্বাচন সম্ভবপর হইতে পারে, তাহাই সমস্যা। প্লেটো তাঁহার Republic গ্রন্থে এক সমাধান দিয়াছেন। এপর্য্যন্ত কোনও দেশেই এই সমস্যার সমাধান হয় নাই। সকল দেশেই রাজনীতি শান্তির সময় শাসন-ক্ষমতা-লিপ্সু ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হইয়াছে।*

'ill Durant

স্পিনোজার প্রভাব

স্পিনোজা কোনও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী যাবতীয় দর্শনের উপর তাঁহার চিন্তার প্রভাব সুস্পষ্ট। তিনি যে কত বড় ছিলেন, যতই দিন যাইতেছে, ততই তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। কোনও সমালোচক লিখিয়াছেন, পর্ব্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া তাহার উচ্চতার ধারণা করা যায় না। পর্ব্বত হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই তাহার উচ্চতার স্পষ্টতর জ্ঞান হয়। স্পিনোজাও তেমনি যত দূরে সরিয়া যাইতেছেন, ততই তাঁহার মহত্ব অধিকতর উপলব্ধ হইতেছে। "তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের জন্যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন; কেহ কেহ উত্তম চসমা-নির্ম্মাতা বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তাঁহার জীবিত-কালে কেহই যে তাঁহার প্রতিভার ধারণা করিতে পারেন নাই, তাহাও নহে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই তখন তাঁহাকে ধর্ম্মহীন জড়বাদী বলিয়া ঘৃণা করিত। তাঁহার মৃত্যুর পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার গ্রন্থ অধিক লোকেই পাঠ করিত না। ইংরেজ দার্শনিক David Hume তাঁহার মতকে "বিকট"[১] ও "কলঙ্কিত"[২] বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। বিখ্যাত সমালোচক লেসিং লিখিয়াছেন "মৃত কুকুর-সম্বন্ধে লোকে যেরূপ ঘৃণার সহিত কথা বলে, স্পিনোজা-সম্বন্ধেও সেই ভাবে কথা বলিত।" এই ঘৃণার কারণ স্পিনোজার দার্শনিক মত। তিনি ঈশ্বর ও প্রকৃতি অভিন্ন বলিয়াছিলেন, এবং মানবের স্বাধীন ইচ্ছা অস্বীকার করিয়াছিলেন। লোকে বিশ্বাস করিত, তিনি জীবাত্মার অমরত্ব ও মানুষের নৈতিক দায়িত্বও স্বীকার করেন নাই। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার অদ্বৈতবাদই জার্ম্মান Romantic school এর পণ্ডিতদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। এই Romanticদিগের ছিল প্রকৃতি-প্রিয় কবি-মনঃ। ঈশ্বর ও প্রকৃতির অভেদ-বাদ তাঁহারা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু ন্যায় ও অন্যায় যে আপেক্ষিক, স্পিনোজার এই মতও মানব-সমাজে প্রচলিত পরম্পরাগত ধারণার বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় বলিয়া তাঁহারা সানন্দে অভিনন্দন করিয়া লইয়াছিলেন। এই মতের সাহায্যে সভ্যতার ভারে পীড়িত মানব-সন্তান স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও মত প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন। ১৭৮০ সালে লেসিং জেকোবিকে বলেন, যে পরিণত-বয়ঃ-প্রাপ্তির পর হইতেই তিনি স্পিনোজার শিষ্য, এবং দর্শন বলিতে তিনি একমাত্র স্পিনোজার দর্শনই বোঝেন। তাঁহার Nathan de Wise নামক নাটকে লেসিং যে আদর্শ ইহুদী চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, বহুলপরিমাণে তাহা স্পিনোজা-চরিত্রের আদর্শে অঙ্কিত। কয়েক বৎসর পরে স্পিনোজার দর্শন-সম্বন্ধে হার্ডারের এক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার ফলে উদার-নৈতিক ধর্ম্মতাত্ত্বিকদিগের দৃষ্টি স্পিনোজার Ethicsএর দিকে আকৃষ্ট হয়। এই ধর্ম্মতাত্ত্বিকদিগের নেতা Schliermacher স্পিনোজার নাম উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহাকে

[১] Hideous. [২] Infamous.

"পবিত্র, সমাজচ্যুত স্পিনোজা" বলেন। ক্যাথলিক কবি Novalis তাঁহাকে ঈশ্বরোন্মত্ত বলিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। Ethics পাঠ করিয়া গেটেও স্পিনোজার প্রতি আকৃষ্ট হন, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি গভীরতর হয়, এবং যৌবনের উচ্ছল ভাবপ্রবণতা হইতে তাঁহার অন্তর প্রৌঢ়ত্বের প্রশান্তি ও স্থৈর্য্যে উন্নীত হয়। পরবর্ত্তী তাঁহার সমস্ত গদ্য ও পদ্য রচনা স্পিনোজার ভাবে অনুপ্রাণিত। ফিক্‌টে, শেলিং ও হেগেলের অদ্বৈতবাদে স্পিনোজার প্রভাব সুস্পষ্ট। ক্যাণ্টের জ্ঞান-তত্ত্বের সহিত স্পিনোজার দর্শনের মিশ্রণ হইতেই ইহাদের দর্শনের উৎপত্তি। ফিক্‌টের Ich ও সোপেনহরের "will to live", স্পিনোজার "কৃতি"রই নামান্তর। নিৎসের 'will to power" এবং বার্গসঁর Elan vital এর উৎপত্তিও এই "কৃতি" হইতে। স্পিনোজার Law রূপান্তরিত হইয়া হেগেলের Absolute Reason হইয়াছে। হেগেল যখন স্পিনোজার দর্শনকে জীবনহীন ও গতিহীন বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার "আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার" (কৃতি) কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। স্পিনোজার দর্শন জীবন-ও-গতি-বিহীন বলা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি হেগেলের অসীম শ্রদ্ধা ছিল। হেগেল বলিয়াছিলেন, যদি কেহ দার্শনিক হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রথমে স্পিনোজার মতাবলম্বী হইতে হইবে।" Absolute Reason হইতে ন্যায়ের যুক্তিক্রমে সৃষ্টি ও স্পিনোজার Substance হইতে সৃষ্টি মূলতঃ একই ধারণা।

ইংলণ্ডেও স্পিনোজার প্রভাব কম হয় নাই; কোলরিজ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলী তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় স্পিনোজার প্রভাব সুস্পষ্ট। শেলী তাঁহার Treatise on Religion and the State গ্রন্থের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হার্বাট স্পেন্‌সারের অজ্ঞেয়ের ধারণার জন্য তিনি স্পিনোজার নিকট ঋণী বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। Belfort Box বলিয়াছেন "বর্ত্তমান কালে এমন বিখ্যাত লোকের অভাব নাই, যাহারা বলেন আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ণতা স্পিনোজার দর্শনের মধ্যেই নিহিত আছে।"

বিভিন্ন লোকে স্পিনোজার দর্শনের বিভিন্ন ব্যাখা করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সময়ের প্রয়োজন। Will Durant লিখিয়াছেন, Wisdom (বিজ্ঞতা)-সম্বন্ধে Ecclesiastes গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে, স্পিনোজা-সম্বন্ধেও তাহা বলা চলে। প্রথম মানব তাহাকে সম্পূর্ণ জানিতে পারে নাই, সর্ব্বশেষ মানবও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইবে না। কেননা তাঁহার উপদেশ[1] সমুদ্র হইতে গভীরতর।"

---

[1] Counsels.

পঞ্চম অধ্যায়

জ্ঞানালোকের যুগ*

ব্রিটিশ জ্ঞানালোক

ইউরোপীয় নব্য দর্শনের দ্বিতীয় যুগকে বলে জ্ঞানালোকের যুগ। চার্চের শাসন-নিয়ন্ত্রিত এবং ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যহীন জনগণকে এই যুগে সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। সকলের উপরে যুক্তির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ব্যক্তির অধিকার ঘোষিত হইয়াছিল। প্রকৃতি-ও-সত্তা-সম্বন্ধীয় তর্কমূলক সমস্যাসকল পরিহার করিয়া মানবজীবন ও তাহার কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে আলোচনা এই যুগের দর্শনের বিশেষত্ব। বস্তুর উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহার আলোচনা বর্জ্জন করিয়া মানবমনের প্রকৃতি এবং তাহার শক্তি-সম্বন্ধে গবেষণা এই যুগের আর একটী বিশেষত্ব। জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, বাহ্যবস্তুর সহিত মনের সম্বন্ধ কি, বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ জ্ঞান সম্ভবপর কি না, প্রভৃতি বিষয় এই যুগে আলোচিত হইয়াছিল। তাত্ত্বিক গবেষণা বর্জ্জন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আমাদের মনের বৃত্তি-নিচয় ও মানসিক ভাবের গবেষণায় দার্শনিক চিন্তা নিযুক্ত হইয়াছিল। অভিজ্ঞতা[1] অথবা অনুভবে কি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার অনুসন্ধান করিয়া, তাহার উপর দর্শনের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছিল। দর্শনের অন্যান্য বিভাগ উপেক্ষা করিয়া মনোবিজ্ঞানের দিকে দার্শনিক চিন্তা ধাবিত হইয়াছিল। "মানবজাতির গবেষণার খাঁটি বিষয় মানুষ," আলেকজাণ্ডার পোপের এই উক্তিতে এই যুগের দর্শনের আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছিল।[2] মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদিগের পাঠাগার হইতে দর্শনকে বাহিরে আনিয়া জনসাধারণের সহিত তাহার পরিচয়-সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরব্ধ হইয়া এই আন্দোলন ইয়োরোপের বহুদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রাচীন সংস্থা এবং আচারের বিরুদ্ধ সমালোচনায় এই আন্দোলনের আরম্ভ হয়। সামাজিক এবং রাজনৈতিক যাবতীয় বিষয়ই যুক্তির আলোকে পরীক্ষিত হয়, এবং মানুষের ব্যক্তিগত বুদ্ধি সমস্ত বিষয়ের বিচারে মানদণ্ড বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রচলিত ধর্ম্ম ও নীতির বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ সাহিত্যে ধ্বনিত হইয়া উঠে, এবং সামাজিক ও নৈতিক সংযম হইতে ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা আরব্ধ হয়। চিন্তায় ও কর্ম্মে ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবী উত্থিত হয়। এই সকল সমালোচকদিগের নিকট কিছুই পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত না। প্রত্যেক ধর্ম্মীয় মনোভাব এবং প্রত্যেক পরম্পরাগত

---

* Enlightenment [1] Experience

[2] The proper study of mankind is man.

বিশ্বাস, তাহারা বুদ্ধির কঠোর আলোকে পরীক্ষ করিতেন, এবং যাহাই আপনাকে যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইত, তাহাই বর্জ্জন করিতেন। ফরাসী দেশে এই আন্দোলন বিপ্লবে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তাহার পরে প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হয়৮

এই আন্দোলনের আরম্ভ হয় ইংলণ্ডে। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডে অধিকতর রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল এবং সমাজও অপেক্ষাকৃত স্থায়ীফু ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া তথায় এই আন্দোলন বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। ফলে, স্বাভাবিক সংস্কৃতির সহায়রূপে তথায় ইহা প্রসার-লাভ করিয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে এই আন্দোলন ফরাসী দেশে বিস্তৃত হয়। ফ্রান্সে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নূতন মত-প্রচারের ফলে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতার সৃষ্টি হয়, এবং তাহা হইতে বিপ্লবের উদ্ভব হয়। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড হইতে এই আন্দোলন জার্ম্মানীতে প্রসারিত হয়, কিন্তু জার্ম্মানীর দর্শন ও সাহিত্য ইহা দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হইলেও ইহা হইতে কোনও বিপ্লবের উদ্‌ভব হয় নাই।

ইংলণ্ডে জন লক এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন। লক দে-কার্ত্তের দর্শনকে অভিজ্ঞতা-মূলক[1] দর্শনের রূপ দান করেন। লকের পরে বার্কলে এই দর্শনকে অধ্যাত্ম-দর্শনে[2] রূপান্তরিত করেন। বার্কলের পরে হিউমের হস্তে এই দর্শন সন্দেহবাদে ইহা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে। তাহার পরে আবির্ভূত হয় স্কটলণ্ডের "সাধারণ বুদ্ধির দর্শন[3]।"

ফরাসীদেশে এই আন্দোলনের স্রষ্টা ছিলেন পিয়ের বেইল[4]। তাঁহার Dictionnaire এর প্রকাশের ফলে শিক্ষিত সমাজে সন্দেহবাদ প্রচলিত হয়। এই সন্দেহবাদ ভল্টেয়ার ও বিশ্বকোষ-প্রকাশকদিগের হস্তে জড়বাদও প্রত্যক্ষ বাদে পরিণত হইয়াছিল।

জার্ম্মানীতে লাইবনিট্জ এবং হার্ডারের কবি-প্রতিভার সাহায্যে এই আন্দোলন সর্ব্বজনবোধ্য সাহিত্যের আকার ধারণ করিয়াছিল।

---

[1] Empiricism. [2] Idealism. [3] Common Sense Philosoply.
[4] Pierre Bayle.

নব্য দর্শন—ব্রিটিশ জ্ঞানালোক—জন লক্

(১)

জন লক্ (১৬৩২—১৭০৪)*

আধুনিক দর্শনের এক সন্ধিক্ষণে লক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চিন্তা ও সত্তা, চিৎ ও জড়ের মধ্যে দেকার্ত্ত যে বিরোধ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার সমন্বয় করিয়া তিনি উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি চিৎ ও জড় উভয়কেই স্বাধীন ও সৎ পদার্থ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, একটিকে অন্যটির সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মী বলিয়াছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে সংযোগ-সাধনের জন্য তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রত্যয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে দেকার্ত্তের শিষ্যগণ যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও সফল হয় নাই। জড় ও চৈতন্যকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিপরীত-ধর্ম্মী পদার্থ গণ্য করিয়া উহাদের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের কোনও চেষ্টাই সফল হইতে পাবে না। এই জন্যই স্পিনোজা জড় ও চৈতন্যকে স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা বলিয়া গণ্য করেন নাই। তাঁহার মতে ইহারা একই সৎ পদার্থের বিভিন্ন গুণ। এক অখণ্ড সৎপদার্থের মধ্যে তিনি এই দুই গুণকে মিলিত করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারাও সমস্যার সমাধান হয় নাই। একই দ্রব্যের মধ্যে চিৎ ও জড় মিলিত হইলেও তাহারা পরস্পর ভিন্ন। যদি উভয়েব মধ্যে কোনও ভিন্নতা না থাকিত, তাহা হইলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারিত। সৎ পদার্থের মধ্যে কোনও ভিন্নতা স্পিনোজা স্বীকার করেন নাই। চিন্তা ও ব্যাপ্তি আপনারা সৎ নহে, তাহারা সতের গুণমাত্র, কিন্তু তাহারা পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং তাহাদের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই, এবং স্পিনোজাও দেকার্ত্তের দ্বৈতবাদ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারেন নাই। তিনিও চিৎকে চিৎমাত্রই এবং জড়কে জড়মাত্রই মনে করিয়াছিলেন, সুতরাং উভয়ের মধ্যের ব্যবধান দূব করিতে সক্ষম হন নাই। উভয়ের সংযোগ-সাধক কোনও আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে, এই ব্যবধান দূর করিতে হইবে। ইহার জন্য দ্বিবিধ চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টা হইতেই দুইটি দার্শনিক মত উদ্ভূত হইয়াছে। এক পক্ষ চিৎ-দ্বারাই জড়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। অন্য পক্ষ চিতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া জড়দ্বারা চৈতন্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম মত অধ্যাত্মবাদ[১] বা প্রত্যয়বাদ নামে খ্যাত; দ্বিতীয় মত বস্তুবাদ[২], অভিজ্ঞতা-বাদ[৩], সংবেদনবাদ[৪] অথবা জড়বাদ নামে পরিচিত। জন লক দ্বিতীয় মতের উদ্ভাবক।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে ব্রিষ্টল নগরের নিকট রিংটন নামক স্থানে লক্ জন্মগ্রহণ করেন।

---

* John Locke

[1] Idealism [2] Realism [3] Empiricism [4] Sensationalism.

এই বৎসরই আমষ্টার্ডাম নগরে স্পিনোজার জন্ম হয়। লক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের জন্য তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই। তিনি তিন বৎসর বার্লিনের রাষ্ট্র-দূতের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৬৬৬ সালে আর্ল অব সাফ্টসবেরীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই পরিচয় পরে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। সাফ্টসবেরী দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে একজন ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন। তিনি রাজরোষে পতিত হইলে, লক ফ্রান্সে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৬৭৫ হইতে ১৬৭৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি ফ্রান্সে বাস করিয়াছিলেন; তাহার পরে হল্যাণ্ডে গমন করেন। উইলিয়ম অব অরেঞ্জ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিলে লক্ ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। ১৭০৪ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি লকের লিখিত গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভূক্ত:—(১) An Essay on Civil Government (১৬৯০) (অসামরিক শাসন ব্যবস্থা-সম্বন্ধে প্রবন্ধ); (২) Letters on Education (১৬৯৩) (শিক্ষা-সম্বন্ধে পত্রাবলী)। (৩) Essay on the Human Understanding, (১৬৯০) (মানবীয় বুদ্ধি-সম্বন্ধে প্রবন্ধ), (৪) The Reasonableness of Christianity (১৬৯৩) (খৃষ্ট-ধর্ম্মের যুক্তিমত্তা) (৫) Letters on Toleration (পরমত-সহিষ্ণুতা-সম্বন্ধে পত্রাবলী)।

লকের দার্শনিক মত তাঁহার Essay on the Human Understanding গ্রন্থে বর্ণিত আছে। গ্রন্থপ্রকাশের ২০ বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় বন্ধুর সহিত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কোনও মীমাংসার উপনীত হইতে সক্ষম না হওয়ায়, লকের মনে হয়, যে যে পথে তাঁহারা বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা ঠিক পথ নহে। আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের আপনাদের সামর্থ্যের বিষয়, এবং মানবীয় বুদ্ধি কোন্ কোন্ বিষয়ের মীমাংসায় সমর্থ, তাহারও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ছিল। Essay on the Human Understanding গ্রন্থে লক্ সেই অনুসন্ধান করিয়াছেন। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে সত্যের আবিষ্কার লকের ততটা উদ্দেশ্য ছিল না, যতটা ছিল সত্যের আবিষ্কারের উপায়ের আবিষ্কার। তিনি লিখিয়াছেন, মানবীয় জ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহার নিশ্চিতি কতটা এবং তাহার সীমা কোথায়, ইহার নির্দ্ধারণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। দে-কার্ত্ত যেমন সর্ব্ববিষয়ে সন্দেহ হইতে তাঁহার দর্শনের আরম্ভ করিয়াছিলেন, লক্ও তেমনি মানুষের জ্ঞান-লাভের শক্তির প্রতি সন্দেহ হইতে তাঁহার গবেষণা শুরু করিয়াছিলেন। কোন কিছুই তিনি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, যতক্ষণ তাহা তাঁহার মনের নিকট সত্য বলিয়া প্রমাণিত না হইত। সংবেদন[১], এবং চিন্তার[২] সীমা অতিক্রম না করিতে তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

---

[১] Sensation. [২] Thought

লক্‌কে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের উদ্‌ভাবনকর্তা বলা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমানে আমি মনের সহিত সংশ্লিষ্ট শারীরিক ব্যাপারের আলোচনা করিব না। মনের স্বরূপ কি, তাহার আলোচনাও করিব না। আমার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য মানুষের জ্ঞানের বিষয়সকলের সহিত তাহার জ্ঞান-বৃত্তির[১] আলোচনাই যথেষ্ট।" ইহা-দ্বারা লক্ তাঁহার আলেচ্য বিষয়ের সীমা স্পষ্ট ভাবেই নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে তত্ত্ববিদ্যার[২] অথবা সত্তাবিজ্ঞানের আলোচনা নাই। ইহা একান্ত ভাবেই মনো-বিজ্ঞান। বুদ্ধির[৩] মূলতত্ত্বের[৪] আলোচনা ইহাতে নাই। বুদ্ধির কার্য্যই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। যে সকল ব্যাপারে বুদ্ধি প্রকাশিত হয়, যাহা দেখিয়া বুদ্ধির অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়, যাহার ভিতর দিয়া বুদ্ধির বিকাশ সাধিত হয়, তাহাই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। এই সকল ব্যাপারকে লক্ "Idea" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

Idea (প্রত্যয়) শব্দের ব্যাখ্যায় লক্ বলিয়াছেন, "যাহা কিছু লইয়া মনঃ ব্যাপৃত থাকে—ছায়া,[৫] সামান্য প্রত্যয়, প্রজাতি[৬] প্রভৃতি বলিতে যাহা বুঝায়—তাহা বুঝাইতেই আমি এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছি"

এই সংজ্ঞা হইতে দেখা যায়, বিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞান বা প্রত্যয়, এবং সামান্যজ্ঞান বা সম্প্রত্যয় উভয়ই লকের Ideaর অন্তর্গত। মনে যত প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সকলই লকের Idea। এই Ideaর আলোচনাই তাঁহার দর্শন। ক্যাণ্ট Critique of Pure Reasonএ মানবীয় জ্ঞানের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারও পূর্ব্বে লক বলিয়াছিলেন, যে মানবের বুদ্ধির প্রসার সীমাবদ্ধ। সেই সীমা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। তাহা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলে, এমন স্থানে গিয়া উপনীত হইতে হয়, যেখানে পদে পদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা। ফলে নিশ্চিত জ্ঞান-লাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে, এবং সন্দেহের উৎপত্তি হয়। আমাদের জ্ঞান-বৃত্তির ক্ষমতার কথা যদি আমরা ভালরূপে বিবেচনা করি, এবং কি আমাদের বোধগম্য, কি আমাদের বুদ্ধির অতীত, ইহা জানিয়া অগ্রসর হই, এবং যাহা আমাদের বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে, তাহারই জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা অধিকতর সফল হইবার সম্ভাবনা।

লক্‌এর দর্শনের প্রধান কথা দুইটি। প্রথমতঃ সহজাত প্রত্যয়[৭] বলিয়া কিছুই নাই, দ্বিতীয়তঃ আমাদের সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন। লক্ বলেন, অনেকের মতে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহার জ্ঞান আমাদের আত্মার মধ্যে নিহিত থাকে। সেই জ্ঞান লইয়াই আমরা জন্মগ্রহণ করি, এবং কোনও বাহ্য পদার্থ হইতে তাহাদের জ্ঞান আমরা লাভ করি না। এই সমস্ত সহজাত প্রত্যয় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বর্ত্তমান। এমন কোনও মানুষ নাই, যাহার মনে এই সকল প্রত্যয় নাই। এ কথা যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায়, প্রত্যেক

[1] Discerning faculties. Metaphysics.
[3] Understanding. Principles.
Phantom Species. [7] Innate Ideas

মানুষের মনে এই সকল প্রত্যয় আছে, ইহা যদি সত্যও হয়, তাহা হইলেও তাহারা যে সহজাত, তাহা প্রমাণিত হয় না। অন্য উপায়ে এই সকল জ্ঞান লাভ সম্ভবপর, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে, তাহাদিগকে সহজাত বলিবার কোনও যুক্তি থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের মনেই যে এই সকল প্রত্যয় আছে, ইহা সত্য নহে। জ্ঞানের ক্ষেত্রেই হউক, অথবা কর্ম্মের ক্ষেত্রেই হউক, এমন কোনও তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, যাহার সত্যতা সর্ব্বসম্মত। কর্ম্মের ক্ষেত্রে যে এরূপ কোনও তত্ত্ব নাই, তাহা বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এমন কোনও নৈতিক নিয়মই[1] পাওয়া যায় না, যাহা সকল জাতি মানিয়া লইয়াছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন নৈতিক নিয়মেব সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের জ্ঞান লইয়া মানুষ জন্ম গ্রহণ করে না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান বিভিন্ন হয়। "অন্যের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে তুমি ইচ্ছা কর, অন্যের সহিত সেইরূপ ব্যবহার কর", এই নীতির বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে অসভ্য জাতীয় লোকেরা এরূপ কোনও নীতি স্বীকার করে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও যে এইরূপ কোনও সহজাত প্রত্যয় নাই, ইহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে সকল প্রতিজ্ঞা সর্ব্বলোক-বিদিত বলিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে, তাহারাও বাস্তবপক্ষে তাহা নহে। "ক কএর সমান" এই তাদাত্ম্য নিয়ম,[2] এবং "একই সময়ে কোনও পদার্থের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ই সম্ভবপর নহে", এই বিরোধের নিয়ম[3] কি সকলেই জানে? শিশু, মূর্খ এবং অসভ্যেরা এই দুই নিয়মের অস্তিত্ব একেবারেই অবগত নহে। তাদাত্ম্য ও বিরোধের নিয়ম আধারহীন প্রত্যয়।[4] জন্মের সময় উহাদের জ্ঞান আমাদের থাকে না, দীর্ঘ কালব্যাপী অভিজ্ঞতার পূর্ব্বে ঐ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যে সকল সাধারণ প্রতিজ্ঞার অর্থ বোধগম্য হইবামাত্র তাহাদের সত্যতা-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকে না, তাহাদিগকে সহজাত জ্ঞান গণ্য করিয়া তাহাদের নৈশ্চিত্যের ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা-দিগকে সহজাত বলিলেই যে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয়, তাহা নহে। বস্তুতঃ কোনও জ্ঞানই সহজাত নহে। সকল জ্ঞানই অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের জ্ঞানও সহজাত নহে। এমন জাতিও আছে, যাহাদের ঈশ্বরের কোনও প্রত্যয়ই নাই। ঈশ্বর বলিতে কি বুঝায়, তাহা তাহারা জানে না। যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তাহাদের মধ্যেও ঈশ্বরের স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রচুর মত-ভেদ বর্ত্তমান। যে সমস্ত প্রত্যয়কে সহজাত বলা হয়, তাহারা যে স্পষ্ট ভাবে না হইলেও অস্পষ্ট ভাবে আত্মার মধ্যে নিহিত থাকে, এবং বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে তাহারাও বিকাশ প্রাপ্ত হয়, লক্ ইহাও স্বীকার করেন না। কেন না, কোনও প্রত্যয় অস্পষ্ট ভাবে আত্মার মধ্যে নিহিত আছে, বলিলে সেই প্রত্যয়ের জ্ঞান আছে, স্বীকার করা হয়; কিন্তু সেই জ্ঞানের অস্তিত্বের বিষয় আত্মা অবগত নহে।

[1] Moral Law
[2] Law of Identity
[3] Law of Contradiction
[4] Abstraction.

প্রকৃত পক্ষে এইরূপ জ্ঞানের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণই নাই। গণিতের সত্যের জ্ঞান সহজাত বলা হয়। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে দেশ-ও-সংখ্যা-সম্বন্ধীয় সমস্ত সত্যের জ্ঞানকেই সহজাত বলিতে হইবে, এবং যে সকল প্রতিজ্ঞা স্বতঃ সিদ্ধ, তাহাদের সকলকেই সহজাত বলিতে হয়। "মিষ্ট তিত নয়", "কালো সাদা নয়", ইহারাও তাহা হইলে সহজাত।

লকের এই যুক্তির উত্তরে কুর্জ্যা বলিয়াছেন, শিশুদিগের ও অসভ্যদিগের উদাহরণের প্রয়োগ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সঙ্গত নহে, বৈজ্ঞানিক রীতি-সম্মতও নহে। শিশুদিগের ও অসভ্যদিগের মানসিক অবস্থা-সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা নিতান্তই দুরূহ। তাদাত্ম্য-নিয়ম ও বিরোধের নিয়ম-সম্বন্ধে শিশু ও অসভ্যদিগকে কোনও প্রশ্ন করিলে, তাহারা সেই প্রশ্নের অর্থ বুঝিতেই সক্ষম হয় না। ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রশ্নও তাহারা বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া প্রশ্ন গঠন করিতে পারিলে, দেখা যায়, যে যে সকল প্রত্যয় শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করা হয়, তাহাদের অনেক গুলিই তাহাদের জানা আছে।

লক বলিয়াছেন, সকল প্রত্যয়ই অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয়। অভিজ্ঞতা ভিন্ন কোনও জ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে না। অভিজ্ঞতা দ্বিবিধ: (১) বাহেন্দ্রিয়-দ্বারা বাহ্য পদার্থের জ্ঞান; (২) আত্মার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার জ্ঞান। প্রথমোক্ত অভিজ্ঞতাকে লক্ Sensation অথবা সংবেদন নাম দিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রকারের অভিজ্ঞতাকে বলিয়াছেন Reflection অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি। লক্ বলিয়াছেন, "আমরা ধরিয়া লইব, আমাদের মনঃ সাদা কাগজের মত, তাহাতে কোনও লেখাই নাই, কোনও প্রত্যয়ই নাই। তাহা হইলে মনে জ্ঞান আসে কোথা হইতে?....এক কথায় আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিব—অভিজ্ঞতা হইতে। ইহাই সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি।....বহিঃস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অবেক্ষণ অথবা মনের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার অবেক্ষণ হইতেই আমাদের বুদ্ধি চিন্তার যাবতীয় উপকরণ প্রাপ্ত হয়। এই দুইটিই জ্ঞানের উৎস। এই উৎস হইতে আমাদের যে জ্ঞান আছে তাহা. অথবা যাহা আমরা লাভ করিতে সক্ষম, তাহা উৎপন্ন হয়।" লকের এই বিশ্লেষণ-সম্বন্ধে কুর্জ্যা বলিয়াছেন, লক্ সংবিদের সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টির গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। সংবিদ প্রত্যেক মানুষেরই আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি আছে অল্পসংখ্যক লোকের। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টিকে সকলের অভিজ্ঞতার একটি উপায় বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ লক্ অন্তর্দৃষ্টির কার্য্য আত্মার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া ইহার পরিধি সংকুচিত করিয়াছেন। আমাদের মনের যাবতীয় ব্যাপারই অন্তর্দৃষ্টির অধীন, মানসিক কার্য্য ও সংবেদন সকলই।" ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ও অন্তর্দৃষ্টি এই দুইটির মধ্যে প্রথমে কোন্‌টি আরব্ধ হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে লক বলেন, আমাদের প্রথম প্রত্যয় সকল আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারেই প্রাপ্ত হই। অন্তর্দৃষ্টি হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা আসে পরে। "এই দুই বাতায়ন-দ্বারাই অন্ধকার কক্ষে আলো প্রবেশ করে। আমার মনে হয়, যে যে ঘরের দরোজা ও জানালাসকল সম্পূর্ণ বন্ধ, এবং যাহার

মধ্যে আলোর প্রবেশের জন্য ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র ভিন্ন অন্য পথ নাই, তাহার সহিত বুদ্ধির বিশেষ পার্থক্য নাই। "ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে লকের মতে মনঃ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়,[১] এবং ইন্দ্রিয় দ্বারপথে যাহা ইহার নিকট উপস্থিত হয়, তাহা গ্রহণ করা ভিন্ন ইহার অন্য কোনও কাজ নাই। কোনও প্রত্যয় যেমন ইহা সৃষ্টি করিতে পারে না, তেমনি যে প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার বিনাশও করিতে পারে না। দর্পণে যেমন বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, তেমনি মনের সম্মুখে উপস্থাপিত বস্তু প্রতিফলিত করাই মনের কার্য্য। ইহা সত্বেও লক্ যখন মনের ক্রিয়ার আলোচনা করিয়াছেন, তখন তাহার কিয়ৎ-পরিমাণ সক্রিয়তা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যদিও সংবেদন ও অন্তর্দৃষ্টি হইতে মন জ্ঞানের উপাদান সকল প্রাপ্ত হয়, তথাপি এই সকল উপাদানকে একত্রিত করিয়া যৌগিক প্রত্যয়ের[২] গঠন মনের সক্রিয়তাভিন্ন সম্ভবপর হয় না। কিন্তু এই কার্য্য লকের মতে নিতান্তই "মামুলি"[৩] ব্যাপার, এবং মনের এই ক্ষমতার ফলে প্রত্যয়সকলে নূতন কিছুই সংযোজিত হয় না। কিন্তু মামুলি হইলেও, যখন এই কার্য্য মনঃ-কর্ত্তৃক কৃত হয় বলিয়া লক্ স্বীকার করিয়াছেন, তখন মনঃ যে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, তাহা বলা যায় না, এবং জ্ঞানের উৎপাদনে বাহ্যপদার্থের ক্রিযার সহিত মনেরও যে ক্রিয়া আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মনের এই ক্রিয়া পরে ক্যাণ্ট বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অস্পষ্ট ভাবে হইলেও লক্ও এই ক্রিয়ার কথা বলিয়াছেন।

প্রত্যয় দিগের শ্রেণী-বিভাগ

লক্ প্রত্যয়দিগকে মৌলিক[৪] ও যৌগিক[৫] এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যে সকল প্রত্যয় মনের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহারা মৌলিক। একটিমাত্র অথবা একাধিক ইন্দ্রিয়-পথে এই সকল মৌলিক প্রত্যয় মনের মধ্যে প্রবেশ করে। বর্ণের প্রত্যয়, শব্দের প্রত্যয়, কাঠিন্যের প্রত্যয়, যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক ইন্দ্রিয়ের পথে প্রবেশ করে। কিন্তু ব্যাপ্তি, আকার অথবা গতির প্রত্যয় এক সঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয় পথে প্রবেশ করে। কেবল অন্তর্দৃষ্টি হইতেও মৌলিক প্রত্যয়ের উদ্‌ভব হয়। "সন্দেহ", "বিশ্বাস" ও "ইচ্ছার" প্রত্যয় অন্তর্দৃষ্টি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার এমন কতক-গুলি মৌলিক প্রত্যয় আছে, যাহারা অন্তর্দৃষ্টি ও সংবেদন উভয় হইতেই উদ্‌ভূত হয়। "সুখ", "দুঃখ", "একত্ব", "শক্তি", "পারম্পর্য্য", এই সকল প্রত্যয় এই রূপেই পাওয়া যায়। 'দেশ', 'কাল', ও সংখ্যার প্রত্যয় লকের মতে মৌলিক। ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহ হইতে যে সকল প্রত্যয় মনে প্রবিষ্ট হয়, অথবা ইন্দ্রিয় হইতে উদ্‌ভূত প্রত্যয়ের মনের মধ্যে আবির্ভাবের ফলে তথায় যে সকল ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহাদের অবেক্ষণ হইতে

[১] Passive. [২] Complex Ideas [৩] Formal.
[৪] Simple. [৫] Complex.

যে সকল প্রত্যয়ের উদ্‌ভব হয়, এই উভয়বিধ প্রত্যয়ের উপর মনের বৃত্তির[1] স্বাভাবিক প্রয়োগ হইতেই দেশ, কাল ও সংখ্যার প্রত্যয় উদ্‌ভূত হয়। দে-কার্ত্ত জড় ও ব্যাপ্তিকে অভিন্ন বলিয়াছিলেন। তাহা স্বীকার না করিয়া লক্‌ কাঠিন্যকেই[2] জড়ের বিশিষ্ট গুণ বলিয়াছেন। স্পর্শেন্দ্রিয় হইতে কাঠিন্যের প্রত্যয় উদ্‌ভূত হয়। প্রত্যেক দ্রব্য তাহার মধ্যে দ্রব্যান্তরের প্রবেশে যে বাধা দেয়, স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা তাহা অনুভূত হয়। সেই অনুভব হইতে কাঠিন্যের প্রত্যয়ের উদ্‌ভব। দেশ ও দ্রব্য এক নহে। কিন্তু দেশের ধারণা বর্জ্জন করিয়া দ্রব্যের ধারণা হইতে পারে না। শূন্য অথবা পূর্ণ, এই দুই ভাবে দেশের ধারণা করা যায়। বিশিষ্ট পরিমাণ শূন্য দেশে সমপরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্য স্থাপন করা যায়। পূর্ণ দেশে—কঠিন দ্রব্যে পূর্ণ দেশে,—তাহা সম্ভবপর হয় না। দর্শন ও স্পর্শেন্দ্রিয় হইতে দেশের প্রত্যয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংবেদন এবং অন্তর্দৃষ্টি, জ্ঞানের এই উভয় উৎস হইতে কালের প্রত্যয় উদ্‌ভূত হয়। মনের মধ্যে চিন্তা ও অনুভূতি একটির পরে একটি আবির্ভূত হয়। এই পৌর্ব্বাপর্য্যের ক্রমের পর্য্যবেক্ষণ হইতে 'কালে'র প্রত্যয়ের উদ্‌ভব। প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকিলে কালের কোনও ধারণাই হইত না। দেশ ও কালের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়ই অসীম, এবং কোনটিই জড় জগৎ-দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। দেশ হইতে তাহার মধ্যস্থিত জড়-দ্রব্যসকলের অস্তিত্ব এবং গতির অন্তর্ধান কল্পনা করা যায়, কিন্তু দেশ ও কালের কোনও সীমা কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই, যে দেশ নানা দিকে বিস্তৃত, কিন্তু কালের গতি একই দিকে। লকের মতে সংখ্যার প্রত্যয়ের মত সরল অন্য কোনও প্রত্যয় নাই। সংবেদন এবং অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা মনের সম্মুখে যে অসংখ্য দ্রব্য উপস্থাপিত হয়, 'সংখ্যা'র প্রয়োগ হইতে তাহাদিগের স্থিতি[3] ও নির্দ্দেশ্যতা[4] উদ্‌ভূত হয়।

লকের মতে মৌলিক প্রত্যয়সকল আমাদের সকল জ্ঞানের উপাদান। বর্ণমালার অন্তর্গত বর্ণসমূহের বিভিন্ন প্রকার সংযোগ ও সন্নিবেশদ্বারা যেমন শব্দাংশ ও শব্দের উৎপত্তি হয়, মৌলিক প্রত্যয়সকলের বিভিন্ন প্রকার সংযোগদ্বারা তেমনি যৌগিক প্রত্যয়ের উদ্‌ভব হয়। যৌগিক প্রত্যয় ত্রিবিধ :—বিকারের[5] প্রত্যয়, দ্রব্যের[6] প্রত্যয় এবং সম্বন্ধের[7] প্রত্যয়। যাহাদের স্বাধীন সত্তা নাই, যাহারা দ্রব্যের মধ্যে অবস্থিত, যাহারা দ্রব্যের গুণ অথবা অবস্থা, এবং দ্রব্য-বর্জ্জিত যাহাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তাহারাই বিকার। ত্রিভুজ, কৃতজ্ঞতা, হত্যা প্রভৃতির প্রত্যয় "বিকার"। বিকারের প্রত্যয় মিশ্র ও অমিশ্র ভেদে দ্বিবিধ। দেশ, কাল, মনন, সংখ্যা প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকার অবস্থা (দেশের দূরত্ব, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ, তল,[8] আকৃতি, বিপুলতা প্রভৃতি ; কালের ব্যাপ্তি,[9] ও চিরস্থায়িত্ব ; মননের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, স্মৃতি, প্রভৃতি) সকলই বিকারের প্রত্যয়। যে সকল প্রত্যয় বাস্তব পদার্থের অনুরূপ, তাহারাই দ্রব্যের প্রত্যয়। সংবেদন ও অন্তর্দৃষ্টি হইতে আমরা

[1] Faculty [2] Solidity. [3] Fixity. [4] Definiteness.
[5] Modes. [6] Substance. [7] Relation. [8] Surface. [9] Duration.

জানিতে পারি কতকগুলি মৌলিক প্রত্যয় এক সঙ্গে মনে আবির্ভূত হয়। এই সকল প্রত্যয়কে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ মনে করা সম্ভবপর হয় না বলিয়া, আমরা তাহাদের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপে একটি স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ[1] পদার্থের কল্পনা করি, এবং সেই প্রতিষ্ঠা-ভূমিকে দ্রব্য নাম দান করি। যে অজ্ঞাত পদার্থকে মৌলিক প্রত্যয়ের উৎপাদক গুণাবলীর বাহন[2] বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহাই দ্রব্য। কিন্তু যদিও দ্রব্যের প্রত্যয় আমাদের মনেরই সৃষ্টি, তথাপি আমাদের বাহিরে তাহার যে অস্তিত্ব নাই, তাহা নহে। অন্যান্য যৌগিক প্রত্যয়ের সহিত দ্রব্যের প্রত্যয়ের পার্থক্য এই, যে বাহ্য জগতে এই প্রত্যয়ের অনুরূপ পদার্থ বর্তমান, কিন্তু মনঃ অন্যান্য যে সকল যৌগিক প্রত্যয় গঠন করে, তাহাদের সেরূপ বিষয়গত অস্তিত্ব নাই। কিন্তু দ্রব্যের স্বরূপ কি, তাহা আমরা অবগত নহি। তাহার গুণসকলের সহিতই কেবল আমাদের পরিচয়। লকের এই অজ্ঞাত পদার্থই ক্যাণ্টের দর্শনের Thing-in-itself—স্ব-গত বস্তু।

ইহার পরে সম্বন্ধের প্রত্যয়। যখন মনঃ দুইটি পদার্থকে এমন ভাবে সংযুক্ত করে, যে একটিকে দেখিলেই অন্যটির চিন্তা উদিত হয়, তখনি সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। দুইটি প্রত্যয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে, যখনি একটি প্রত্যয় মনের মধ্যে আবির্ভূত হয়, তখনি অন্যটি আসিয়া উপস্থিত হয়। বুদ্ধিদ্বারা সকল দ্রব্যের মধ্যেই এইরূপ সম্বন্ধের সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং সকল সম্বন্ধের উল্লেখ করা অসম্ভব। কার্য্য, কারণ, ভিন্নতা ও অভিন্নতা প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান সম্বন্ধের আলোচনা লক্ করিয়াছেন। যখন কোনও দ্রব্য অথবা কোনও গুণকে অন্য কোনও দ্রব্যের ক্রিয়ার ফলে আবির্ভূত হইতে দেখা যায়, তখন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের উদ্ভব হয়।

দ্রব্যের গুণাবলী লক্ দ্বিবিধ বলিয়াছেন—মুখ্য ও গৌণ। দ্রব্যের অবস্থা নির্বিশেষে যে যে গুণ দ্রব্য হইতে অবিচ্ছেদ্য, অর্থাৎ দ্রব্যের অবস্থা যাহাই হউক না কেন, যে যে গুণ তাহার সকল অবস্থাতেই বর্তমান থাকে, তাহারাই তাহার মুখ্য গুণ। কাঠিন্য, ব্যাপ্তি, আকৃতি, গতি ও সংখ্যা মুখ্যগুণের অন্তর্ভুক্ত। আবার এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাহারা, প্রকৃত পক্ষে তাহারা যে দ্রব্যের গুণবলিয়া গণ্য হয়, তাহার মধ্যে নাই। কিন্তু সেই সেই দ্রব্যের এমন শক্তি আছে, যে তাহারা তাহাদের মুখ্য গুণদ্বারা আমাদের মনে সেই গুণসকলের সংবেদন উৎপন্ন করিতে পারে। বিভিন্ন সংবেদন উৎপাদনের এই সকল শক্তিই তাহাদর গৌণ গুণ। বর্ণ, শব্দ, স্বাদ প্রভৃতি গুণ গৌণ গুণের অন্তর্ভুক্ত। লকের মতে প্রকৃত পক্ষে কোনও দ্রব্যেরই বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ প্রভৃতি নাই। আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর দ্রব্যের মুখ্য গুণাবলীর ক্রিয়াদ্বারা আমাদের মনে এই সমস্ত গুণের অনুভূতি উৎপন্ন হয়। শব্দ বীণার গুণ নহে; বীণার মধ্যে শব্দ নাই; বীণার তারের স্পন্দন আমাদের কর্ণপটহে সংক্রমিত হইয়া শব্দের অনুভূতি উৎপন্ন করে। তেমনি স্বর্ণের মধ্যে পীতবর্ণ নাই; স্বর্ণের উপর পতিত আলো আমাদের অক্ষিগোলকে পতিত হইয়া পীতবর্ণের অনুভূতি

[1] Self-subsisteut. [2] Vehicle.

উৎপন্ন করে। আম্রের মধ্যে মিষ্ট স্বাদ নাই; রসনার সহিত আম্ররসের সংস্পর্শ হইতে মিষ্টতার অনুভূতি উদ্‌ভূত হয়। "দ্রব্যের মুখ্য গুণের প্রত্যয়-সমূহ মুখ্য-গুণের অনুরূপ। মুখ্য গুণ—প্রত্যয় যে গুণের প্রতিরূপ, তাহা—দ্রব্যের মধ্যে বর্ত্তমান। কিন্তু যাহাদিগকে গৌণ গুণ বলা হয়, তাহাদের প্রত্যয়ের সহিত সেই সকল গুণের (অর্থাৎ সেই সকল প্রত্যয়-উৎপাদক শক্তির) কোনও সাদৃশ্য নাই। গৌণ গুণাবলীর প্রত্যয়ের অনুরূপ কিছুই দ্রব্যের মধ্যে নাই। গৌণগুণ যে দ্রব্যে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়, তাহার মধ্যে গৌণ গুণের অনুভূতি উৎপাদনের শক্তিমাত্র আছে। আমাদের নিকট যাহা মিষ্ট অথবা নীল অথবা উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা যে সকল দ্রব্য আমরা মিষ্ট অথবা নীল অথবা উষ্ণ বলিয়া বোধ করি, তাহাদের ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশের বিশেষ বিশেষ পরিমাণ, আকার এবং গতি ভিন্ন অন্য কিছু নহে।" এখন কথা এই, যে গৌণ গুণসকল যদি আমাদের মনের প্রত্যয়মাত্র হয়, এবং তাহাদের অনুরূপ কিছুই যদি দ্রব্যের মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে মননশীল বিষয়ী[1] ও বস্তু-জগতের মধ্যে ব্যবধান বিদূরিত করিবার উপায় কি? লক্ বলিয়াছেন "অব্যবহিত ভাবে কোনও দ্রব্যকে মনঃ জানিতে পারে না। মনে যে সকল প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, তাহা-দ্বারাই জানিতে পারে। আমাদের প্রত্যয় ও দ্রব্যের মধ্যে যতটা সাদৃশ্য থাকে, ততটাই আমাদের জ্ঞান সত্য হয়।" মনঃ যখন তাহার প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতে পারে না, দ্রব্যের সহিত যখন মনের অব্যবহিত কোনও যোগ নাই, তখন দ্রব্যের সহিত তাহার প্রত্যয়ের সাদৃশ্য আছে কি না, তাহা তাহার জানিবার উপায় কি? দর্শনের এই চিরন্তন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া লক যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ইহার তাৎপর্য্য তিনি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে আমাদের প্রত্যয়সকলের অনুরূপ দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে। মনের উপর দ্রব্যসকলের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফলে আমাদের প্রত্যয়সকল উৎপন্ন হয়; আমাদের স্রষ্টা তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছার প্রয়োগ করিয়া ঐসকল প্রত্যয় উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে উহাদের উৎপাদনের উপযোগী করিয়া সকল দ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয়, যে মৌলিক প্রত্যয় সকল আমাদের কল্পনার সৃষ্টি নহে, পরন্তু আমাদের বহিঃস্থ দ্রব্যকর্ত্তৃক নিয়মানুযায়ী ও স্বাভাবিক ভাবে তাহারা উৎপন্ন হয়। সুতরাং অবস্থা-বিবেচনায় দ্রব্যের সহিত তাহাদের যতটা সাদৃশ্যের প্রয়োজন, ততটা সাদৃশ্য তাহাদের আছে।" ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে লক্ উপরিউক্ত সমস্যার সমাধানে সমর্থ হন নাই। দে-কার্ত্ত ও মালেব্রাঁর মতো তিনি ঈশ্বরকে আনিয়া প্রত্যয়-জগৎ ও বস্তু-জগতের মধ্যে ঐক্য-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। লকের মতে সমস্ত জ্ঞানই বিষয়ীগত, এবং তাহার নিশ্চিতি আপেক্ষিক। নির্ব্যূঢ় ভাবে সত্য না হইয়াও আমাদের প্রত্যয়সকল আমাদের পক্ষে সত্য হইতে পারে।

জ্ঞানের প্রকৃতি ও সীমা

লকের মতে মনের সমস্ত মনন ও তর্কের মধ্যে তাহার স্বকীয় প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কিছুর সহিতই তাহার অব্যবহিত সংযোগ নাই। তিনি জ্ঞানের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন: "কোনও

[1] Thinking Subject.

প্রত্যয়ের (অন্য প্রত্যয়ের সহিত) সম্বন্ধ, সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্য এবং বিরোধের বোধই জ্ঞান।' যেখানে এই বোধ আছে, সেখানেই জ্ঞান আছে; যেখানে নাই, সেখানে জ্ঞান নাই। আমরা কল্পনা করিতে পারি, অনুমান করিতে পারি, বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু সে কল্পনা, অনুমান ও বিশ্বাস জ্ঞান পর্য্যন্ত পৌঁছায় না।

কিন্তু যদি স্বকীয় প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কিছুর জ্ঞানই মনের না থাকে, তাহা হইলে আমাদের বহিঃস্থ লোক অথবা দ্রব্যের সত্য জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর হয় কিরূপে? ঈশ্বর ও জড় জগতের জ্ঞান তাহা হইলে আমরা প্রাপ্ত হই কিরূপে? আমাদের অন্তরস্থ জ্ঞান-বৃত্তি এবং জ্ঞানের বহিঃস্থ বিষয়ের মধ্যে সেতু কি? লক্‌ বলেন, আমাদের মনে ঈশ্বর, আত্মা এবং জগতের প্রতিবিম্ব অথবা আদর্শ[১] আছে। লক্‌ সহজাত প্রত্যয়ের অস্তিত্ব নিরসন করিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া গ্রন্থশেষে মনের মধ্যে কতকগুলি পদার্থের আদর্শের অথবা উপজ্ঞাত প্রত্যয়ের[২] অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

লক্‌ জ্ঞানের ত্রিবিধ নিশ্চিতির কথা বলিয়াছেন। যখন দুইটি প্রত্যয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অথবা ভেদ অব্যবহিত ভাবে অনুভূত হয়, অন্য কোনও প্রত্যয়ের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, তখন যে অব্যবহিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপজ্ঞা বলে। ইহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকে না। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞানে প্রত্যয়দিগের মধ্যে সাদৃশ্য অথবা ভেদের জ্ঞান থাকে, কিন্তু সে জ্ঞান অব্যবহিত ভাবে উৎপন্ন হয় না। এই জ্ঞানকে ঔপপত্তিক[৩] জ্ঞান বলে। তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান অনিশ্চিত। জড় জগতের জ্ঞান এই শ্রেণীর।

লকের মতে তিন বিষয়ে আমাদের সত্য জ্ঞান আছে। আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের জ্ঞানের জন্য কোনও প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। আবার ঈশ্বরের জ্ঞান অব্যবহিত না হইলেও সত্য জ্ঞান। ঈশ্বরের জ্ঞান উপপত্তি-মূলক হইলেও সত্য। বাহ্য জগতের সৃষ্টি-কৌশল এবং আমাদের অস্তিত্ব ও শক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। অসীম শক্তির আধার, জ্ঞানবান্ এক জন পুরুষ ভিন্ন জগৎ-ও-মনুষ্য-সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না। জড় পদার্থের জ্ঞান সংবেদন হইতে উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের ও আমাদের নিজের অস্তিত্বের জ্ঞানের ন্যায় নিশ্চিত না হইলেও, জড় জগতের জ্ঞান যে সত্য, তাহা খুবই সম্ভবপর। কার্য্যতঃ সে জ্ঞানকেও নিশ্চিত জ্ঞান বলা যাইতে পারে। আমাদের সংবেদনের উৎপাদনের জন্য কারণের প্রয়োজন। সে কারণ কি? মনঃ তাহার উৎপাদন করিতে পারে না। বাহ্য পদার্থ সেই কারণ হইতে পারে। বাহ্যজগতের জ্ঞানে সকল লোকের মধ্যে মিলও সেই জ্ঞানের সত্যতার প্রমাণ। এই তিনটি বিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত, অন্য কোনও বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান আমাদের নাই। অন্য সকল জ্ঞান সম্ভাব্যতা, অনুমান, এমন কি অজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল দ্রব্য ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্ত্তমান নাই, তাহাদের সম্বন্ধে অথবা প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ-সম্বন্ধে, অথবা আত্মিক পদার্থের গুণের সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, সকলই অনিশ্চিত। আমাদের

[১] Archetypes. [২] Intuitive Ideas. [৩] Demonstrative.

জীবন সম্ভাব্যতা-কর্তৃক পরিচালিত হয়। কোনও বিষয়ের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তির তুলনা করাই বুদ্ধির প্রধান কাজ। ঈশ্বর ও আত্মিক জগতের স্বরূপ-সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞানই নাই। আপ্ত বচন ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করা ভিন্ন, তাহাদের জ্ঞানলাভের অন্য উপায় নাই।

লক্ কোনও স্বতন্ত্র নৈতিক মতের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অনেক উক্তির সহিত কর্ম্ম-নীতির সম্পর্ক আছে। তিনি বলিয়াছেন, আত্মানুস্মরণ অথবা আত্মৈকত্বই[1] সমস্ত দায়িত্ব-বোধের ভিত্তি। তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রচলিত অর্থে স্বীকার করেন নাই। কোনও কার্য্য করা অথবা না করার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তিকেই তিনি 'ইচ্ছা' বলিয়াছেন। সে শক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক অথবা অজ্ঞানপূর্ব্বক ব্যবহৃত হউক না কেন, তাহাই ইচ্ছা। স্বীয় চিন্তা-অনুসারে কার্য্যকরিবার যতটা শক্তি কাহারও থাকে, ততটাই সে স্বাধীন। যখন কেহ কোনও অবস্থার মধ্যে থাকিয়া তৃপ্তি অনুভব করে, তখন সেই তৃপ্তিই তাহার সেই অবস্থায় থাকিবার প্রবর্ত্তক[2]। যখন কোনও কাজ করিবার সময় তৃপ্তি হয়, তখন সেই তৃপ্তিই সেই কাজ করিতে থাকিবার প্রবর্ত্তক। কোনও প্রকারের অস্বস্তিই পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। দুঃখ-পরিহারের কামনা, অথবা সুখের কামনাই আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক। লক্ ইচ্ছা ও কামনার মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। যদিও সাধারণতঃ কামনা-দ্বারাই আমাদের ইচ্ছা চালিত হয়, তথাপি কামনা দমন করিবার এবং তাহার পূরণের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইবার শক্তিও আমাদের আছে। বিভিন্ন কামনা পরস্পরের সহিত তুলনা করিবার ক্ষমতা এবং তাহাদের পরিপূর্ত্তির ফল গণনা করিবার ক্ষমতাও আমাদের আছে। এই ক্ষমতাতেই মানুষের স্বাধীনতা। মনের মধ্যে কামনার তুলনা ও ফলের আলোচনার পরে মনঃ যে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সেই সিদ্ধান্তদ্বারাই ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয়। যাহা হইতে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহাই মঙ্গল, এবং যাহা হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহা অমঙ্গল বলিয়া বিবেচিত হয়। কোনও বিধানের[3] সহিত আমাদের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের যে সঙ্গতি বা অসঙ্গতির ফলে উক্ত বিধানকর্ত্তার ইচ্ছা-এবং-শক্তি-অনুসারে আমাদের মঙ্গল অথবা অমঙ্গল সাধিত হয়, তাহাকেই লক্ কর্ম্মনৈতিক সুকৃতি অথবা দুষ্কৃতি বলিয়াছেন। নৈতিক নিয়মকে যদিও তিনি সহজাত বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তথাপি তাঁহার মতে সামাজিক সুবিধা, অসুবিধার অপেক্ষা না করিয়াও তাহারা অবশ্য পালনীয়। এই সকল নিয়মের সমষ্টিকেই তিনি ঈশ্বরের নিয়মাবলী বলিয়াছেন।

লক্‌সম্বন্ধে সোপেনহর লিখিয়াছেন, "দার্শনিকদিগের মধ্যে লক্‌ই প্রথমে এই মত প্রচার করেন, যে কোনও দার্শনিক যদি কোনও প্রত্যয় হইতে অন্য কোনও পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রথমে তাঁহাকে উক্ত প্রত্যয়ের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।" লকের মীমাংসা সম্পূর্ণ সন্তোষ-জনক হয় নাই। যাবতীয় জ্ঞান যদি সংবেদন ও অন্তর্দৃষ্টি হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে

[1] Personal Identtiy. [2] Motive. [3] Law.

সংবেদন এবং অন্তর্দৃষ্টির বাহিরে কোনও পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু লক্ বাহ্যপদার্থের জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই দিক হইতে তাঁহার দর্শন সঙ্গতিপূর্ণ নহে। কখনও কখনও তিনি বলিয়াছেন, যে বাহ্য পদার্থ মনের উপর ক্রিয়া করে; আবার কখনও বলিয়াছেন, যে প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কিছুই মনের জানিবার উপায় নাই এই দুই মতের সমন্বয় অসম্ভব।

(২)

বার্কলে

লক্ বলিয়াছিলেন, প্রত্যয় হইতে আমাদের যাবতীয় জ্ঞান উদ্ভূত হয়; প্রত্যয় উদ্ভূত হয় সংবেদন এবং অন্তর্দৃষ্টি হইতে; সংবেদন ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শের (মাত্রাস্পর্শের) ফল। প্রত্যয়-সমূহ যদিও বাহ্য পদার্থ-কর্তৃক উৎপন্ন হয়, তথাপি তাহারা বাহ্য পদার্থের স্বরূপের জ্ঞান দিতে পারে না। বাহ্য পদার্থের বিবিধ গুণ আছে বলিয়া প্রতীত হয়। বাহ্য পদার্থের প্রত্যয় তাহার বিবিধ গুণের সহিত আমাদের পরিচয়-সাধন করে। কিন্তু এই বিবিধ গুণের একটি, গৌণ গুণ, বাহ্য পদার্থের মধ্যে নাই; যদিও গৌণ গুণ বাহ্য পদার্থের গুণ বলিয়াই প্রতীত হয়, তথাপি বাহ্য পদার্থের মধ্যে গৌণ গুণের বোধ-উৎপাদনের শক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নাই। লকের মতে, মুখ্য গুণাবলী বাহ্য পদার্থের মধ্যে অবস্থিত হইলেও, এই গুণের অতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের মধ্যস্থিত অন্য কিছুর সহিত আমরা পরিচিত নহি। বাহ্য দ্রব্যকে মুখ্যগুণের আধার-রূপে আমরা জানি, ইহার অতিরিক্ত কিছুই জানি না। লকের এই মীমাংসায় সমস্যার সমাধান হয় নাই। যে বাহ্য দ্রব্যের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবার কোনও উপায় নাই। সুতরাং তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। লক বলিয়াছেন বটে, মুখ্যগুণাবলী দ্রব্যের মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু যে যুক্তিতে তিনি গৌণগুণের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, মুখ্যগুণ-সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। গৌণ গুণের অস্তিত্ব যদি মনের বাহিরে না থাকে, তাহা হইলে মুখ্য গুণেরও মনোবাহ্য অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, যুক্তিতে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। বিশপ বার্কলে এই যুক্তিতেই মনের বাহিরে, মনঃ হইতে স্বতন্ত্র বাহ্য দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।

বার্কলে জাতিতে ছিলেন আইরিশ। ১৬৮৪ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অসাধারণ বুদ্ধি এবং নিষ্কলুষ উদার চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইত। প্রাচীন গ্রীক দর্শন তিনি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন; উক্ত দর্শনে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পারমেনিদিস্ যে সত্তা ও জ্ঞানকে অভিন্ন বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থ "সিরিস"[১]এ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। আনক্সগোরাস্-সম্বন্ধে

[১] Siris.

লিখিয়াছেন, যে তাঁহার মতে আদিতে জগতে কোনও শৃঙ্খলা ছিল না; যাবতীয় দ্রব্য বিশৃঙ্খলভাবে মিশ্রিত হইয়া এক পিণ্ডে পরিণত হইয়াছিল, পরে "মনঃ"[১] আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে স্থাপিত করে। ঈশ্বর, মানবমনঃ ও পুরুষার্থ[২]-সম্বন্ধে যে বিশেষ চিন্তা করে নাই, তাহার সম্বন্ধে বার্কলে লিখিয়াছেন, এরূপ লোক হয়তো উন্নতি লাভ করিয়া সমৃদ্ধিশালী মহীলতা[৩] হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত দেশ-প্রেমিক অথবা উৎকৃষ্ট রাজপুরুষ হইবার সম্ভাবনা তাহার নাই। খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ-সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে হেগেল তাহার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। যে সমস্ত দার্শনিক মত নাস্তিকতা অথবা অদ্বৈতবাদ বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে বার্কলে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার বিদ্যা ও চিন্তার গভীরতা এবং তাঁহার সরলতা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। ষ্টার্লিং লিখিয়াছেন যে, বার্কলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু এই, যে তিনি খৃষ্টান।

বার্কলের বয়স যখন ২৪ বৎসর তখন তাঁহার "দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে নূতন মত"[৪] নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পর বৎসর প্রকাশিত হয় "মানবীয় জ্ঞানের তত্ত্বাবলী"[৫]। গ্রন্থদ্বয়ের বিশদ রচনা-শৈলী এবং তাহাতে প্রতিপাদিত মতের নূতনত্ব সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। ১৭১৩ সালে লণ্ডনে গমন করিয়া তিনি পোপ, এডিসন, সুইফ্‌ট্ প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকদিগের সহিত পরিচিত হন। জড় পদার্থের অস্তিত্ব নাই, তাঁহার এই মত অনেক হাস্য-রসের সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে কেহই তাঁহার শত্রু হয় নাই। বার্কলের চরিত্র-সম্বন্ধে ষ্টার্লিং লিখিয়াছেন, "প্রত্যেক দিক্ হইতেই বার্কলে এক বিরাট ও মহান্ ব্যক্তি; নিজের স্বরূপে তিনি বিরাট ও মহান্ ছিলেন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ-ও-সুন্দর-চরিত্র লোকদিগের তিনি অন্যতম। তাঁহার কর্ম্মের ফলের দিক হইতেও তিনি বিরাট ও মহান্।" হ্যামান্ লিখিয়াছেন, বার্কলের আবির্ভাব না হইলে হিউমের আবির্ভাব হইত না; হিউমের আবির্ভাব না হইলে ক্যাণ্টের আবির্ভাব হইত না। তিনি দর্শনে যে গতি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহার জন্য এবং জার্মান দর্শনের জন্য আমরা তাঁহার নিকট ঋণী। ধর্ম্মসম্বন্ধে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় তিনি অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কার্লাইল ও এমারসন তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পোপ বলিয়াছেন, মর্ত্ত্যলোকে যত গুণ আছে, তিনি তাহাদের সকলেরই অধিকারী ছিলেন। "প্রাচীন কালে প্লেটো, ডেমোক্রিটাস্ এবং এলিয়াটিক পারমেনিদিসকে লোকে যেরূপ শ্রদ্ধা করিত, বার্কলের কথা মনে উদিত হইবামাত্র সেইরূপ শ্রদ্ধা আমাদের মনে উদ্ভূত হয়। পারমেনিদিসের চরিত্রের মহত্ত্ব, পবিত্রতা ও ধৃতি বার্কলের চরিত্রেও বর্ত্তমান ছিল"।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশের পরে বার্কলে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন। এই সময়

[1] Mind. [2] Summum Bonum. [3] Earthworm.
[4] New Theory of Vision. [5] Principles of Human Knowledge

মালেব্রাঁর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দেশে ফিরিয়া বার্কলে উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিন্তু পার্লামেণ্ট-কর্ত্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থ না পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। ইহার পরে আয়রলণ্ডের "ক্লয়েন"এর বিশপ নিযুক্ত হইয়া, বার্কলে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

"হাইলাস এবং ফিলোলাসের কথোপকথন"[1] প্রবন্ধে বার্কলে তাঁহার দার্শনিক মত কথোপকথন-ছলে বিবৃত করিয়াছেন।

নাস্তিকদিগের আক্রমণ হইতে খৃষ্টধর্ম্মকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই বার্কলে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। জড়বাদিগণের মতানুসারে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্ম্ম সকলই অচেতন জড়পদার্থ-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। দুর্নীতি-পরায়ণ লোকেরা জড়বাদের দোহাই দিয়া আপনাদিগের দায়িত্ব অস্বীকার করিত। অধ্যাত্মিক জগতের এই গ্লানি বিদূরিত করিবার জন্যই বার্কলে দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। যে জড়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুর্নীতির উপাসকগণ আপনাদিগের দোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করিত, সেই জড়ের অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন, এবং লকের মুখ্যগুণের আধারভূত অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় "স্বগত বস্তুর[2]" অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া তিনি লকের দর্শনে সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই তিনি প্রত্যয় যে জড়ের প্রতিরূপ অথবা জড়পদার্থ-কর্ত্তৃক উৎপন্ন, এই মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

জড় জগৎ প্রকাশিত হয় মানুষের মনে। মানুষের মনঃ এই প্রকাশকে জানে। জ্ঞাতা মনঃ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে জড় জগতের অস্তিত্ব নাই। ইহা প্রমাণ করিয়া বার্কলে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, যে প্রত্যয় ও প্রত্যয়সমূহের আধার জীবাত্মার বাস্তব সত্তা আছে। অবশেষে পরমাত্মা ঈশ্বর যে প্রত্যয়-সমূহের, এবং প্রত্যয়দিগের পরস্পরের সহিত সংহতির কারণ, এবং সেই জন্যই যে তাহাদের অস্তিত্ব ও সত্যতা, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "মানব জ্ঞানের তত্ত্বাবলী" গ্রন্থের প্রারম্ভে বার্কলে বলিয়াছেন: "মানুষের জ্ঞানের বিষয়-সম্বন্ধে আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারে, যে এই সকল বিষয় হয় ইন্দ্রিয়গণের উপর মুদ্রিত প্রত্যয়, নতুবা মনের কার্য্য কিংবা চিত্তাবেগসমূহের[3] পর্য্যবেক্ষণ হইতে উদ্ভূত প্রত্যয়, অথবা স্মৃতি এবং কল্পনার সাহায্যে গঠিত প্রত্যয়। এই সকল প্রত্যয়ের সহযোগী আর একটি পদার্থ আছে, যাহা ইহাদিগকে জানে, অথবা প্রত্যক্ষ করে, এবং ইহাদিগের সম্বন্ধে ইচ্ছা, কল্পনা, স্মরণ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে। (অর্থাৎ যাহার ইচ্ছা, স্মরণ, কল্পনা প্রভৃতি ক্রিয়া এই সকল প্রত্যয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট,)। এই প্রত্যক্ষকারী এবং ক্রিয়াবান্ সত্তাকে আমি মনঃ অথবা 'আত্মা'[4] বলি। আমাদের চিন্তা, চিত্তাবেগ অথবা কল্পনা-কর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রত্যয়সমূহ যে মনের বহিঃস্থ নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

---

[1] Dialogues of Hylas and Philolaus [2] Thing it itself
[3] Passions [4] Spirit or Mind

ইহাও স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে ইন্দ্রিয়দিগের উপর মুদ্রিত বিভিন্ন সংবেদন অথবা প্রত্যয়সমূহ যে রকম ভাবেই সংযোজিত অথবা মিশ্রিত হউক না কেন, তাহারা তাহাদের প্রত্যক্ষকারী মনের মধ্যে ভিন্ন থাকিতে পারে না।

আমাদের সংবেদন-সমূহ বিষয়ীগত[১]। যখন আমরা মনে করি, যে কোন বাহ্যদ্রব্য আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন আমাদের ভুল হয়। যাহা আমরা বাহ্যদ্রব্য বলিয়া অনুভব অথবা প্রত্যক্ষ করি, তাহা আমাদের সংবেদন[২] ও প্রতীতি[৩] ভিন্ন কিছুই নহে। যখন কোনও দ্রব্য আমরা দেখি, তখন সেই দ্রব্যের দূরত্ব, অথবা পরিমাণ অথবা আকার যে আমরা দেখি না, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই সমস্ত গুণ আমরা অনুমান করি। আমাদের অভিজ্ঞতায় বিশিষ্ট প্রকার আলোর অনুভূতির সহিত বিশিষ্ট প্রকার স্পর্শানুভূতি এক সঙ্গে উৎপন্ন হওয়ার ফলে, তাহারা পরস্পর সংহত হইয়া পড়ে। যখন কোনও দ্রব্য হইতে প্রতিফলিত আলো চক্ষুতে পতিত হয়, তখন তাহার অনুভূতির সহিত তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট স্পর্শানুভূতিও মনে উদিত হয়, এবং তাহার পরিমাণ ও আকার আমরা অনুমান করি। যাহা আমরা দেখি, তাহা বর্ণমাত্র, নানাবিধ বর্ণমাত্র। আমরা যে একই দ্রব্য বিভিন্ন সময় দেখি এবং অনুভব করি, ইহা বলা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু বর্ণের অনুভূতি আমাদের মনের মধ্যে, বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে চক্ষুকেই আমরা প্রাধান্য দেই। এই চক্ষুর অনুভূতি সম্পূর্ণ রূপেই মনের মধ্যে বর্ত্তমান। মনের সকল বিষয়ই মনের মধ্যে অবস্থিত, এবং এই সকল বিষয় মনেরই অবস্থামাত্র। বাহ্য দ্রব্যবিষয়ক সমস্ত প্রত্যয়ই আমাদের সংবেদনমাত্র। মনঃ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে কোনও প্রত্যয় অথবা সংবেদন থাকিতে পারে না। সুতরাং যাহাকে দ্রব্য[৪] বলা হয়, তাহা জ্ঞাতা মনের মধ্যেই কেবল বর্ত্তমান। তাহার সত্তা এবং তাহার প্রতীতি (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) একই[৫]। সংবেদন এবং প্রতীতি (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন-জাতীয় পদার্থ। জড়পদার্থ হইতে তাহাদের উৎপত্তি কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। সুতরাং বাহ্য জড় জগৎ বলিয়া কিছু নাই। আত্মাদিগেরই[৬] কেবল অস্তিত্ব আছে। আত্মা মননশীল পদার্থ। সম্প্রতীতি[৭] এবং ইচ্ছাই[৮] তাহার প্রকৃতি। কিন্তু বাহ্য জগৎ যদি না থাকে, তাহা হইলে সংবেদন আসে কোথা হইতে। তাহাদের উৎপাদনে আমাদের তো কোনও হাত নাই। আমরা চাই বা না চাই, তাহারা আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। বার্কলে বলেন, আমরা তাহাদিগকে পাই অন্য আর একটি আত্মার নিকট হইতে, যিনি আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আত্মা ভিন্ন আত্মার মধ্যে প্রত্যয়ের সৃষ্টি অন্য কিছুতেই করিতে পারে না। যে আত্মার নিকট হইতে আমরা আমাদের প্রত্যয়সকল প্রাপ্ত হই, তিনি ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে যদি ঐ সকল প্রত্যয় না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে তাহা দান করা সম্ভবপর হইত না। সুতরাং যে সকল প্রত্যয় আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই,

[1] Subjective [2] Sensations [3] Perception
[4] Substance [5] Their esse is a mere perception
[6] Spirits [7] Conception [8] Volition

তাহারা ঈশ্বরের মধ্যে বর্ত্তমান। ঈশ্বরের মধ্যে তাহারা আদর্শ-রূপে বর্ত্তমান। আমাদের মধ্যে সেই সমস্ত প্রত্যয় আদর্শের প্রতিরূপ[1]। জড় জগতের অস্তিত্ব বার্কলে অস্বীকার করিয়াচেন, কিন্তু জ্ঞানের বিষয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, আমাদের মনঃ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। তবে কোনও না কোনও মনের মধ্যে ভিন্ন তাহাদের অস্তিত্ব, অসম্ভব, ইহা বলিয়াছেন। যে মনের মধ্যে তাহারা অবস্থিত, তাহা ঈশ্বরের মনঃ, ইহাও বলিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার মনঃ হইতে এই সকল প্রত্যয় আমাদের মনে প্রেরণ করেন।*

বার্কলে-কর্ত্তৃক জড় জগতের অস্তিত্ব-অস্বীকৃতির উত্তরে তাঁহাকে পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকিতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি "বাহ্যের" অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। অস্বীকার করিয়াছিলেন জড়ের অস্তিত্ব, লক যে অজ্ঞাত স্বগত দ্রব্যকে দ্রব্যের গুণসকলের আধার বলিয়াছিলেন, তাহারই অস্তিত্ব। আমরা যাহা দেখি ও অনুভব করি, তাহা যে মিথ্যা, বার্কলে তাহা বলেন নাই, কিন্তু আমরা যাহা দেখি ও অনুভব করি, তাহার অতিরিক্ত কিছুর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা কি পাই? পাই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। এই সমস্ত গুণের অস্তিত্ব, আমাদের মনোবাহ্য অস্তিত্ব, বার্কলে অস্বীকার করেন নাই। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের মধ্যে আমাদের নিজের অস্তিত্বও আমরা জানিতে পারি। আমাদেরই যে রূপ, রস, গন্ধ শব্দ, ও স্পর্শের জ্ঞান হইতেছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। ইহার অধিক বোধ আমাদের হয় না। এই রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের (প্রত্যয় রূপী) আমরা সৃষ্টি করি না। তাহারা শৃঙ্খলা-বদ্ধ ভাবেই আমাদের মনে আবির্ভূত হয়! বিশৃঙ্খল জনতার মতো নহে, তাহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব নিয়মানুসারে হয়। যিনি এই সমস্ত প্রত্যয় আমাদের মনে প্রেরণ করেন নিশ্চয়ই তিনি মননশীল, বুদ্ধিমান ও ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট পুরুষ। তাঁহার যদি এই সকল গুণ না থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যয়দিগকে সুশৃঙ্খল ভাবে আমাদের মনের মধ্যে প্রেরণ করা সম্ভবপর হইত না। যিনি প্রত্যয়দিগকে প্রেরণ করেন, তিনি অসীম শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান না হইলে, অসংখ্য জীবাত্মার মধ্যে অসংখ্য প্রকার প্রত্যয়ের প্রেরণ ও সন্নিবেশ সম্ভবপর হইত না। ঈশ্বর-সৃষ্ট পরস্পর-সম্বদ্ধ এই প্রত্যয়সমূহের সমষ্টিই প্রকৃতি, এবং তাহাদের পারম্পর্য্যের অব্যভিচারী নিয়মাবলীই প্রাকৃতিক নিয়ম। ঐশ্বরিক কার্য্যের অব্যভিচারিতা এবং প্রকৃতির সুসঙ্গতি ও অপরিবর্ত্তনীয় ব্যবস্থায় ঈশ্বরের জ্ঞান ও মাঙ্গল্যের যেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, অপ্রাকৃত কার্য্যের[2] মধ্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যখন কোনও লোককে কথা বলিতে শুনি, তখন আমরা তাহার অস্তিত্বের অনুমান করি। জগতের বিভিন্ন কার্য্যদ্বারা যিনি আমাদিগের সহিত কথা বলিতেছেন, তাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়?

বার্কলের দর্শনে প্রত্যয় ও তাহাদের মধ্যে 'সম্বন্ধ' ভিন্ন অন্য পদার্থের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু এই সকল সম্বন্ধ অ-বশ্য[3] নহে। পদার্থের প্রকৃতি হইতে তাহাদের উদ্ভব হয় নাই। বাহ্যজগতে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের অস্তিত্ব বার্কলে স্বীকার করেন নাই। প্রত্যয়-সমূহের মধ্যে

---

* ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। [1] Ectype [2] Miracle. [3] Necessary.

সমবর্ত্তিত্য[1] অথবা অপরিবর্ত্তনীয় পারম্পর্য্য-সম্বন্ধই কেবল তিনি স্বীকার করিয়াছেন। যে অব্যভিচারী নিয়মানুসারে ঈশ্বর আমাদিগের মনে বিভিন্ন প্রত্যয়ের আবির্ভাব করান, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। ভাষাদ্বারা মনের ভাব আমরা ব্যক্তকরি। বাহ্য জগতের পরিবর্তনরাজি ঈশ্বরের ভাষা। তাহাদের দ্বারা ঈশ্বরের চিন্তা প্রকাশিত হয়। প্রত্যয়দিগের মধ্যে পারম্পরিক সম্বন্ধ অভিজ্ঞতাদ্বারাই জানিতে পারা যায়। এই অভিজ্ঞতা হইতে এক প্রকার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আমরা লাভ করি, যাহাদ্বারা আমাদের জীবন সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত করিতে সমর্থ হই।

প্রাকৃতিক নিয়মে যে ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রকাশিত, তাহার জ্ঞানলাভের চেষ্টাই দর্শনের উদ্দেশ্য। কোনও দ্রব্যের বহির্দিকে গমনের প্রবণতাদ্বারা যেমন গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, ইচ্ছাও তেমনি নিয়ন্ত্রিত হয় উদ্দেশ্য[2] দ্বারা। বার্কলের মতে জগতের সৃষ্টির মূলে উদ্দেশ্যের কার্য্য আছে।

বার্কলে ধর্ম্মের[3] সহিত তাঁহার দর্শনের সামঞ্জস্য প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সন্দেহবাদের প্রধান স্তম্ভ যেমন জড়বাদ, তেমনি তাঁহার অধ্যাত্মবাদ নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সর্ব্বোত্তম রক্ষাকবচ। ঈশ্বরের স্বরূপ যে আমরা জানিতে পারি না, তাহা সত্য। আমাদের প্রত্যয়সকল নিষ্ক্রিয়, অন্ততঃ সম্পূর্ণ ভাবে সক্রিয় নহে। সুতরাং তাহারা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, কেন না ঈশ্বর অ-বিমিশ্র ক্রিয়াশক্তি[4]। কিন্তু আমরা আমাদিগকে ও অন্যান্য আত্মাদিগকে যেমন জানি, তেমনি ঈশ্বরকেও জানিতে পারি। আমাদের নিজের ও অন্যান্য আত্মার ভাল জ্ঞান আমাদের নাই, কেননা কোনও দ্রব্যের প্রকাশের মাধ্যমে ভিন্ন তাহাকে জানিবার উপায় নাই। আমাদের নিজের ও অন্যের সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা আমাদের আছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার প্রকাশ তাঁহার কার্য্যদ্বারা জানিতে পারা যায়। আমাদের মনের প্রত্যয় তাঁহারই সৃষ্ট। সেই প্রত্যয়দ্বারাই তাঁহার জ্ঞান লাভ হয়।

বার্কলের উক্তি হইতে মনে হয়, জড় জগতের অস্তিত্ব অসিদ্ধ প্রমাণ করিবার প্রচেষ্টায় তিনি চিৎ-জগৎকেও একপ্রকার অস্বীকার করিয়াছেন। যদি মনের প্রত্যয় ও অনুভূতি ভিন্ন অন্য কিছুর জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর না হয়, এবং যে প্রত্যয় ও অনুভূতির অব্যবহিত জ্ঞান আমাদের হয়, তাহারা যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তাহাদের নিজের যদি কোনও কার্য্য না থাকে, তাহা হইলে, তাহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান যে স্থায়ী শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য্যকে বার্কলে ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহার আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয় কিরূপে? প্রত্যয়দিগের মধ্যে কোনও গঠন-শক্তির অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে সংবেদনদিগের সংহতি কিরূপে সংঘটিত হয়, এবং এক মননশীল বিষয়ীতে তাহাদিগের আরোপই বা সম্ভবপর হয় কিরূপে? জীবাত্মাও তাহার প্রত্যয়-রাজির মধ্যে সেতু কোথায়? মোটের উপর এই মতদ্বারা প্রত্যয়-প্রবাহের অতিরিক্ত কোনও নিত্য পদার্থে পৌঁছিতে পারা যায় না।

[1] Co-existence. [2] Ends. [3] Religion [4] Pure activity

আবার মনোমধ্যস্থ প্রত্যয়রাজি ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থের জ্ঞানই যদি আমাদের না থাকে, তাহা হইলে, আমাদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র পুরুষান্তরের জ্ঞান হওয়াও অসম্ভব। এইজন্য বার্কলে বলিয়াছেন, "যদিও প্রকৃতপক্ষে অন্য কিছুর অস্তিত্বই মনের মধ্যে নাই, তথাপি অন্য জীবাত্মার এবং ক্রিয়াবান পদার্থের কিছু কিছু ধারণা আমাদের আছে বলা যায়।" ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে যুক্তিদ্বারা অন্য বস্তুর জ্ঞানের অস্তিত্ব-প্রমাণে অসমর্থ হইয়া, বার্কলে বিভিন্ন জীবাত্মার মধ্যে ব্যবধান দূর করিবার জন্য 'গোজামিলে'র সাহায্য লইয়াছেন। জড়জগতে স্থায়ী দ্রব্যের[1] অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও চিন্তাজগতে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যদি, "জ্ঞাত হওয়া"ই প্রকৃত সত্তা হয়, তাহা হইলে, আমা হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু আমার মতই চিন্তা, কল্পনা এবং ইচ্ছা করিতে সমর্থ পদার্থের অস্তিত্ব কিরূপে স্বীকার করিতে পারা যায়? আমার চিন্তায় ভিন্ন অন্যত্র তাঁহার অস্তিত্বের যখন নিশ্চয়তা নাই, তখন ঈশ্বরে বাস্তব অস্তিত্বের আরোপ-ই বা কিরূপে করা যায়? ঈশ্বরকে আমাদের সমগ্র মানসিক কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া মালেব্রাঁর মতো বার্কলে ঈশ্বরকে তাঁহার দর্শনের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন।

বার্কলের শেষ গ্রন্থ Siris-এ প্লেটনিক ও নবপ্লেটনিক দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থে Idea শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়াছে, এবং উক্তশব্দ প্লেটোর Idea-র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বার্কলে বলিয়াছিলেন, যে Idea ও তাহার প্রতীতি অভিন্ন। ইন্দ্রিয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই Idea। প্রত্যক্ষ প্রতীতিই Idea-র স্বরূপ। এই অর্থে Idea-গণ নশ্বর, তাহারা শক্তিহীন প্রতিভাসমাত্র। কিন্তু Siris গ্রন্থের Idea বুদ্ধিগ্রাহ্য, অপরিণামী, সৎ পদার্থ, মানবের তীক্ষ্ণতম-বুদ্ধি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ক্ষণেকের জন্য তাহাদের অস্পষ্ট দর্শনমাত্র লাভ করিতে পারে। জগৎ কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু দৃশ্যমান জগতে আমরা যে-সকল কারণের সাক্ষাৎ লাভ করি, তাহারা প্রাতিভাসিক কারণমাত্র। তাহাদের মধ্যে কারণশক্তি নাই। তাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুৎপাদ বা প্রতিভাসমাত্র। তাহাদের প্রত্যেকেই পূর্ব্বসংঘটিত সমুৎপাদের ফলমাত্র। এই সকল "ফলে"র সমষ্টিই জগৎ। তাহারা যদি কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত না হইত, তাহা হইলে যে শৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের সহিত আমরা পরিচিত, তাহা থাকিত না। জগৎরূপ এই সমুৎপাদিক সম্বন্ধ-জালের মধ্যে সম্বন্ধের অতীত, প্রতিভাসের অতীত, কোনও কারণকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই পরস্পর-সম্বদ্ধ সমুৎপাদ-জালের মধ্যে, যাহাকে আমরা জগৎ বলি, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহা জগৎরূপ যবনিকার পশ্চাৎ দেশে অবস্থিত। সেখানে তাহার অনুসরণ করা সম্ভবপর কি? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে, যাহা প্রাতিভাসিক নহে, তাহার জ্ঞান সম্ভবপর কি-না, তাহার উপর। সেই প্রত্যক্ষের অতীত জগতে বুদ্ধির প্রবেশ এবং ক্রিয়া সম্ভবপর কি-না, এই প্রশ্নের উত্তরের উপর। বার্কলের পরে ক্যাণ্ট বলিয়াছিলেন, বুদ্ধি সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। বায়ুমণ্ডলে উড্ডীন

---

[1] Substance

পারাবত বায়ুকে তাহার বাধা বলিয়া মনে করে, কিন্তু বায়ুহীন প্রদেশে কোন পক্ষীই উড়িতে পারে না। জগতের সীমা অতিক্রম করিতে গিয়া মানবের চিন্তা সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু বার্কলে বলিয়াছেন, অতীন্দ্রিয় জগতের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। এই অতীন্দ্রিয় জগতেই আমাদের আত্মার বাস, এবং আমাদের আত্মার অনুভূতি আমাদের আছে। তিনি বলিয়াছেন, যদিও আমাদের আত্মার কোনও প্রত্যয় আমাদের নাই, কেননা আত্মা কোনও সমুৎপাদ নহে, তথাপি তাহার সম্প্রত্যয় আমাদের আছে। তাহাই "আমি" ও "তুমি" শব্দদ্বারা ব্যক্ত হয়। অন্তর্বিশ্বে যাহা আমরা পূর্ব্বেই অঙ্কুররূপে দেখিতে পাইয়াছি, বহির্বিশ্বে তাহাই স্পষ্ট প্রকাশিত দেখিতে পাই। বহির্বিশ্ব ও আমাদের অন্তরে প্রকাশিত প্রজ্ঞা একই সার্বিক প্রজ্ঞার অংশ। বার্কলের মতে সার্বিক প্রজ্ঞা আমাদের ইন্দ্রিয়ে অনুস্যূত। তিনি বলিয়াছেন "প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়গণ কিছুই জানিতে পারে না। শ্রবণদ্বারা শব্দের জ্ঞান হয়; দর্শনদ্বারা অক্ষরের জ্ঞান হয়, সত্য। কিন্তু দর্শনদ্বারা অথবা শ্রবণদ্বারা আমরা শব্দ অথবা অক্ষর বুঝিতে পারি না"। "জড়ের মধ্যে মগ্ন প্রজ্ঞাই প্রকৃতি," । "জড়ে অনুস্যূত প্রজ্ঞাকে জড় হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখাই দর্শন"। "ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রজ্ঞার প্রবেশই জীবন।" প্রজ্ঞা-ব্যতীত ইন্দ্রিয় দুর্বোধ্য।*

স্পিনোজার মতো বার্কলে বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপার এক পরমাত্মার কার্য্য বলিয়া গণ্য করেন নাই, এবং সমস্ত বিশ্বকে ঈশ্বর ও সমুৎপাদে পরিণত করেন নাই। তিনি মানবাত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহাদের নৈতিক দায়িত্ব আছে বলিয়াছেন।

সত্তা ও প্রতীতি অভিন্ন—বার্কলের এই মতের জন্য কেহ কেহ তাঁহার দর্শনকে বিষয়ীগত আধ্যাত্মবাদ[1] বলিয়াছেন। কিন্তু সত্তা ও প্রতীতি অভিন্ন হইলেও, যখন কোনও বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয় না (যেমন যখন আমি আমার পাঠগৃহের বাহিরে যাই, তখন তন্মধ্যস্থ চেয়ার, টেবিল, পুস্তক প্রভৃতির প্রতীতি আমার হয় না) তখন তাহার অস্তিত্ব থাকে না, একথা বার্কলে বলেন নাই। ঈশ্বরের অসীম অনিদ্র চিন্তা সর্ব্ব প্রাকৃতিক বস্তুকেই সর্ব্বদা ধারণ করিয়া আছে। ঈশ্বরের চিন্তায় প্রতীতিই প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের কারণ। সুতরাং কোনও বস্তু আমি যখন প্রত্যক্ষ করিনা, তখন তাহার অস্তিত্ব থাকে না, একথা বার্কলে বলেন নাই। বার্কলের দর্শন "সলিপসিস্‌ম" নহে। জার্ম্মান দার্শনিকগণ ইহাকে যুক্তিবর্জিত আধ্যাত্মবাদ[2] বলিয়াছেন। ইহাকে বিষয়ীগত আধ্যাত্মবাদ বলা সঙ্গত নহে।

---

[1] Subjective Idealism. [2] Dogmatic Idealism.

* Vide Berkeley by W. Knight Pp. 193-196.

(৩)

সংশয়বাদ

ডেভিড হিউম

দে-কার্ত্ত যাবতীয় পদার্থকে জড় ও চিৎ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে জড় ও চিৎ সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্ম্মী। দুই বিভিন্নধর্ম্মী দ্রব্যের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহার তিনি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হন নাই। লক্ জড় ও চিৎকে স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে গণ্য করিয়াও আমাদের সংবেদন ও মনের প্রত্যয়গণ বাহ্য দ্রব্যদ্বারা উৎপন্ন হয়, বলিয়াছেন। জড়ের মুখ্য গুণদিগকে তিনি জড়ের মধ্যে বর্ত্তমান বলিয়াছিলেন, কিন্তু গৌণ গুণদিগের জড়ের মধ্যে অস্তিত্ব অস্বীকার



ডেভিড হিউম

করিয়াছিলেন। তাহাদের উৎপাদনের শক্তি জড়ের থাকিলেও, জড়ের মধ্যস্থিত কিছুরই সহিত তাহাদের সাদৃশ্য নাই, বলিয়াছিলেন। তিনি জড়ের মনঃ-নিরাপেক্ষ সত্তা স্বীকার করিয়াছিলেন। মনঃকেও স্বতন্ত্র দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। বার্কলে মনের বহিঃস্থ কোনও দ্রব্যের অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। মনের সহিত যাহার সংস্পর্শ নাই, মনের মধ্যে যাহার অস্তিত্ব নাই, মনের তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। মনের মধ্যে আছে শুধু সংবেদন ও প্রত্যয়। তাহাদের সহিতই মনের অব্যবহিত সংস্পর্শ হয়। দৃতভিন্ন অন্য কিছুর জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। এইজন্য বাহ্য জড়পদার্থের অস্তিত্ব

অস্বীকার করিলেও তিনি মনের প্রত্যয়, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতি পরিণামপ্রবাহের তলদেশে বর্ত্তমান চিৎ পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। তাহা করিয়াছিলেন হিউম। তিনি বলিলেন, যে যে যুক্তিতে বার্কলে তাঁহার মুখ্য ও গৌণ গুণরাজির তলদেশে অবস্থিত জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, ঠিক সেই যুক্তি মনের প্রত্যয়রাজির তলদেশে কোনও স্থায়ী পদার্থের সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য। তাহার অস্তিত্বেরও কোনও প্রমাণ নাই।

১৭১১ সালে এডিনবরা নগরে ডেভিড হিউমের জন্ম হয়। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা-লাভ করেন। তাহার পর তিন বৎসর ফ্রান্সে বাস করেন। এই সময়ে তেইশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার A Treatise on Human Nature প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থ সমাদর-লাভে সক্ষম হয় নাই। ইহাই পরে সংশোধিত আকারে "মানবীয় বুদ্ধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান"[1] নামে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি "প্রাকৃতিক ধর্ম্ম-বিষয়ে কথোপকথন"[2] নামক গ্রন্থ এবং বহুসংখ্যক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। মধ্য বয়সে তিনি এডিনবরার আইন-ব্যবসায়ীদিগের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে তিনি ইংলণ্ডের একখানা ইতিহাস রচনা করেন। এই ইতিহাস বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল, এবং প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

ইহার পরে হিউম ফরাসী দেশে বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত রুসোর পরিচয় হয়। ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া ১৭৬৭ সালে তিনি আণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেটএর পদে নিযুক্ত হন। রুসোর শেষ বয়সে উৎপীড়ন-ভয়ে যখন তিনি দেশান্তরে আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন হিউম তাঁহাকে ইংলণ্ডে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন রুসো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডে আসিয়া কিছুদিন হিউমের সহিত বাস করিয়াছিলেন।

হিউমের "মানব প্রকৃতি বিষয়ে গ্রন্থ" সম্বন্ধে বেন লিখিয়াছেন, যে এত অল্প বয়সে এরূপ গভীর চিন্তার উদাহরণ ইতিহাসে আর নাই। জার্মান সমালোচকগণ হিউমকে ইংরেজ দার্শনিকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

লকের মতো হিউমও মৌলিক প্রতীতিকে[3] যাবতীয় জ্ঞানের প্রাথমিক উপাদান বলিয়াছেন। এই মৌলিক প্রাথমিক জ্ঞান-উৎপাদনে মনের নিজের কোনও ক্রিয়া নাই; মনঃ তখন নিশ্চেষ্ট থাকে। এই মৌলিক জ্ঞানকে হিউম দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সংবেদন[4] ও প্রত্যয়[5]। লকের মতো হিউমও দুইটি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন—বাহ্য ও আন্তর। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের জ্ঞান হয় বাহ্য ইন্দ্রিয়-পথে। মনের মধ্যস্থ জ্ঞানক্রিয়া, চিত্তাবেগ,[6] ইচ্ছা প্রভৃতি অবস্থার জ্ঞান হয় অন্তরিন্দ্রিয়-দ্বারা। সংবেদন ও প্রত্যয়ের মধ্যে প্রভেদ এই, যে সংবেদন প্রত্যয় অপেক্ষা স্পষ্টতর। প্রত্যয় সংবেদনের

[1] Enquiry concerning the Human Understaending.
[2] Dialogues on Natural Religeon
[3] Simple perception
[4] Imrpessions
[5] Ideas
[6] Emotion

অস্পষ্ট মূর্ত্তি। হিউম লিখিয়াছিলেন, যে সংবেদনদিগকে impression নামে অভিহিত করিলেও, এই শব্দদ্বারা তাহারা কিরকম ভাবে উৎপন্ন হয়, অথবা তাহারা কোথা হইতে আসিয়া মনের মধ্যে উপস্থিত হয়, সে সম্বন্ধে কিছু বলা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। উক্ত শব্দ-দ্বারা পদার্থান্তর-দ্বারা সংবেদন উৎপন্ন হয়, এই ধারণা হইতে পারে বলিয়াই হিউম এই কথা বলিয়াছিলেন। আমাদের অভিজ্ঞতা বাহ্য জগৎ-সম্বন্ধে আমাদিগকে সংবাদই দেয় না, সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রত্যয়সকল কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহারা কোথা হইতে আসে, সে সম্বন্ধে হিউম কিছুই বলেন নাই; তবে তিনি যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতে সংবেদন যে অন্য কিছু-কর্তৃক উৎপন্ন হয়, তাহা অনুমান করা যায়। তাহা হিউম অস্বীকারও করেন নাই। তবে যাহা-কর্তৃক সংবেদন উৎপন্ন হয়, তাহা জড়পদার্থ নহে বলিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী সংবেদন ব্যতীত প্রত্যয়ের আবির্ভাব হইতে পারে না। সুতরাং হিউমের মতে সংবেদনই বাস্তবতার ভিত্তি; কোনও প্রত্যয়ের সত্যতা পরীক্ষা করিতে হইলে, কোন্ সংবেদন হইতে তাহার উৎপত্তি, তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। আমাদের চিন্তার মধ্যে কোনও কিছুর মূলে কোনও সংবেদনের সন্ধান যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, তাহাকে ভ্রান্ত অথবা অযৌক্তিক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু লক্ যাহাদিগকে যৌগিক প্রত্যয় বলিয়াছেন, তাহাদের সহিত সংবেদনের সাদৃশ্য সকল সময় না থাকিতেও পারে, ইহাও হিউম স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের বুদ্ধি অথবা কল্পনাশক্তিকর্তৃক মৌলিক প্রত্যয়সকলের সহযোগে যৌগিক প্রত্যয়সকল গঠিত হয়; কেবল সংবেদন হইতেই যে প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, তাহা নহে; প্রত্যয়ের প্রতিবিম্বও নূতন প্রত্যয়রূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রথম প্রাপ্ত প্রত্যয়সকল সংবেদন হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া, যাবতীয় মৌলিক প্রত্যয় সংবেদন হইতে উদ্ভূত হয়—তাহা অব্যবহিত ভাবেই হউক অথবা ব্যবহিত ভাবেই (মৌলিক প্রত্যয়ের প্রতিবিম্বরূপে) হউক। সংবেদন পূর্ব্বে সংঘটিত না হইলে, প্রত্যয়ের আবির্ভাব হইতে পারে না, বলিয়া হিউম সহজাত প্রত্যয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।

হিউম বাহ্য ও অন্তের, এই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় স্বীকার করিয়াছেন। সংবেদনদিগকেও তিনি বাহ্যেন্দ্রিয় জাত ও অন্তরিন্দ্রিয় জাত এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমোক্ত শ্রেণী আবির্ভূত হয় অজ্ঞাত কারণ হইতে, দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎপত্তি হয় প্রত্যয়ের পর্য্যবেক্ষণ হইতে। কিন্তু প্রত্যয়ের পর্য্যবেক্ষণ-রূপ অন্তর্দৃষ্টি উদ্বোধিত হয় বাহ্যেন্দ্রিয়-সংবেদনদ্বারা। সুতরাং বাহ্যেন্দ্রিয়-সংবেদন ও তৎ-প্রসূত প্রত্যয়দিগকে অন্তরিন্দ্রিয় সংবেদন ও তৎপ্রসূত প্রত্যয়সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হইবে। কেননা, মনে অনুভূতির আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ সম্ভবপর নহে।

হিউম স্মৃতির প্রত্যয় ও কল্পনার প্রত্যয়ের মধ্যেও পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। স্মৃতির প্রত্যয় আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের "নকল"[1] অথবা পুনরাবির্ভাব বলিয়া কল্পনার প্রত্যয় অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও বলবান। বিষয় যে আকারে মনের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়,

[1] Copy.

স্মৃতিতে সেই আকারে রক্ষিত হয়, কিন্তু কল্পনায় তাহাদের সন্নিবেশ ও আকারের পরিবর্ত্তন ঘটে। কল্পনা অভিজ্ঞতা অতিক্রম করিয়া যায়, ফলে ভ্রান্তির উদ্ভব হয়।

প্রত্যয়দিগের মধ্যে সম্বন্ধ

মনের মধ্যে সংবেদন এবং তাহাদের প্রতিরূপ প্রত্যয় তো আছেই। তদ্ব্যতীত প্রত্যয় দিগের মধ্যে সম্বন্ধও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রত্যয় অনবরত সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইতেছে। এই সংযোগ ও বিযোগ যে যদৃচ্ছা-বশতঃ সংঘটিত হয়, তাহা কল্পনা করা অসম্ভব। প্রত্যয়দিগের মধ্যে সংযোগসাধক কোনও তত্ত্ব নিশ্চয়ই আছে; তাহাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহার জন্যে একটি প্রত্যয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে প্রত্যয়ান্তরের আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ হিউমের মতে প্রত্যয়দিগের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান। হিউম তিন প্রকার সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন: (১) সাদৃশ্য, (২) দেশ অথবা কালে সান্নিধ্য, (৩) কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ। প্রত্যয়দিগের সংযোগের মূলে এই তিন সম্বন্ধমূলক তত্ত্ব বর্ত্তমান। তর্ক ও গবেষণার যাবতীয় বিষয়ই এই তিন সম্বন্ধ-ঘটিত। হিউম বিশেষ ভাবে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীবনে এই তত্ত্বের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই তত্ত্বের আলোচনায় হিউম প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে কারণের সহিত কার্য্যের যে নিয়ত সম্বন্ধের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি, সেই সম্বন্ধের-স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞান নাই। কারণত্বের জ্ঞান যে সহজাত প্রত্যয়-সম্ভূত নহে, তাহা প্রমাণ করিতে হিউম বলিয়াছেন, যে কোনও প্রত্যয়ই সহজাত নহে, যাবতীয় প্রত্যয়ই অভিজ্ঞতা-জাত। যে সকল প্রত্যয় অভিন্ন, কেবল তাহাদেরই প্রত্যক্ষ পূর্ব[1] জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু কার্য্য কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কারণের মধ্যে তাহার কার্য্যকে কখনও পাওয়া যায় না। যে রকম ভাবেই কারণের বিশ্লেষণ করা হউক না কেন, তাহার মধ্যে কার্য্যকে পাওয়া যাইবে না। একটি বিলিয়ার্ড গোলক যখন অন্য একটি গোলককে আঘাত করে, তখন শেষোক্ত গোলক চলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু প্রথম গোলকের গতির মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা হইতে দ্বিতীয়টির গতির কথা মনে হইতে পারে। অভিজ্ঞতা হইতেও উভয় গোলকের গতির মধ্যে কোনও অবশ্যক সম্বন্ধের প্রত্যয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইন্দ্রিয় হইতে কেবল একটির পরে অন্য একটি সংবেদন পাওয়া যায়। কিন্তু উভয় সংবেদনের সংযোগ-সাধক কিছুই পাওয়া যায় না। যখন প্রথমে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তাহার পরে বারুদের বিস্ফোরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তখনও একটি ঘটনার পরে আর একটির সংঘটন, এই অনুক্রম ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি বলিতে যাহা বোঝা যায়, তাহা ও এই অনুক্রম এককথা নহে।

কোনও বস্তুকে অন্য বস্তুর কারণ বলিয়া যখন আমরা মনে করি, তখন উভয়ের মধ্যে কোনও সংযোগসূত্রই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। একটি ঘটনার পরে অন্য একটি ঘটনা

[1] A priori.

সংঘটিত হয়, ইহাই কেবল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটি ঘটনা ঘটনান্তরের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেই, আমরা সকল সময় পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাকে পরবর্ত্তী ঘটনার কারণ বলিয়া মনে করি না। যখন পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাকে পরবর্ত্তীর কারণ বলি, তখন পূর্ব্ববর্ত্তিতার ধারণার সহিত অন্য একটি ধারণার যোগ করি। সে ধারণা অবশ্যম্ভাবিতা অথবা নিয়তির[1] ধারণা। প্রথম ঘটনা ঘটিলে দ্বিতীয়টি ঘটিবেই, এই ধারণা। কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবিতার ধারণা আসে কোথা হইতে? কোনও ঘটনাকে বারংবার যখন অন্য একটি ঘটনার পরে ঘটিতে দেখি, তখনই পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাকে পরবর্ত্তী ঘটনার কারণ বলিয়া গণ্য করি। প্রথমবার যখন এই অনুক্রম লক্ষ্য করি, তখন কেবল এই অনুক্রমের বোধ হয়। কিন্তু ঘটনাদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি-কালে যখন প্রত্যেক বারই ঐ অনুক্রম লক্ষিত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে এই অনুক্রম-সম্বন্ধের অব্যভিচারিত্বের ধারণা উৎপন্ন হয়,। অনুক্রমের এই অব্যভিচারিতার ধারণাই কার্য্য কারণত্বের ধারণা। বারংবার ঘটনাদ্বয়ের পূর্ব্ব-পর ক্রমে সংঘটিত হওয়ার ফলে, তাহাদের প্রত্যয়ের মধ্যে সংহতির[2] উৎপত্তি হয়। এবং এই সংহতিবশতঃই আমরা একটি ঘটনাকে অন্যটির সহিত অবশ্যম্ভাবীরূপে সংবদ্ধ মনে করি। ঘটনাদ্বয়ের পরম্পরা-ক্রমে ঘটিবার অভ্যাস লক্ষ্য করিয়া, আমরা বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করি,যে অতীতে যখন তাহাদের এই অভ্যাস ছিল, তখন ভবিষ্যতেও এই অভ্যাস বর্ত্তমান থাকিবেই। যাহাকে অতীত কালে কাহারও পরে আসিতে দেখিয়াছি, ভবিষ্যতেও তাহা তাহার পরে আসিবে। কোনও বিষয় হইতে তাহার সহবর্ত্তী বিষয়ান্তরের প্রত্যয়ে গমন করিবার জন্য মনের যে প্রবণতা অভ্যাস হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই অবশ্যম্ভাবিতা অথবা নিয়তি। কিন্তু এই প্রবণতা মনের; ইহা উৎপন্ন হয় মনের ভাবদ্বারা; মনের বাহিরে এই নিয়তির কোনও অস্তিত্ব নাই। পূর্ব্ব ও পর ঘটনার মধ্যে যে বাস্তব কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রমাণ করিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু সেই সম্বন্ধের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় সংস্কার আছে। যখন উহাদের একটি সংঘটিত হয়, তখন আপনা হইতেই মনে হয়, দে দ্বিতীয়টি আসিতে বিলম্ব নাই। কিন্তু এই সংস্কার সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। হিউমের মতে অবশ্যক অথবা নিয়ত সত্য বলিয়া কিছু নাই। গণিতের সত্য যে কেবল বুদ্ধির ক্রিয়ার দ্বারা বোধগম্য হয়, তাহা তিনি মনে করেন না। তাঁহার মতে চিন্তার সমস্ত ক্রিয়ার মূলেই বিশেষ বিশেষ সংবেদন বর্ত্তমান। তাঁহার দর্শনে অবশ্যক সত্যের স্থান নাই।

কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বিষয়ে হিউম যাহা বলিয়াছেন, অন্যান্য অবশ্যক সম্বন্ধ বিষয়েও তাহারা প্রযোজ্য। কার্যকারিতা[3], কর্ত্তৃত্ব[4], শক্তি প্রভৃতি কিছুর মধ্যেই অবশ্যক বলিয়া কিছুই নাই। জড় জগতে, প্রকৃতির একরূপতায়, জগতের কর্ত্তাস্বরূপ এক প্রথম কারণে, এবং ইচ্ছার কর্ত্তৃত্বে, কোথায়ও তিনি অবশ্যকতার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "ইচ্ছার কোনও কার্য্য ও (তাহার পরবর্ত্তী) দেহের সঞ্চালন, উভয়ের মধ্যে

---

[1] Necessity. [2] Association. [3] Efficiency.
[4] Ageney.

কোনও সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর তো হয়ই না, পরন্তু ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, যে চিন্তা ও জড়ের স্বরূপ ও শক্তি বিবেচনা করিলে ইহা (ইচ্ছা-কর্তৃক দেহ চালিত হওয়ার) অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার আর নাই। মনের উপর ইচ্ছার কর্তৃত্ব যে ইহা অপেক্ষা (দেহের উপর ইচ্ছার কর্তৃত্ব অপেক্ষা) সহজবোধ্য তাহাও নহে। মনের মধ্যে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে তাহার কারণ হইতে পৃথক করা যায়, কিন্তু তাহাদের অব্যভিচারী সংযোগের অভিজ্ঞতা যদি না থাকিত, তাহা হইলে একটি হইতে অন্যটির উৎপত্তি অনুমান করা সম্ভবপর হইত না। কল্পনা-কর্তৃক কার্য্য হইতে কারণের অনুমান অভ্যাসদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কল্পনার এই অনুমান ও বিশ্বাস একই কথা।

দ্রব্যের[1] প্রত্যয়

বার্কলের মতো হিউম্‌ও বলিয়াছেন, যে বাহ্যবস্তুর গুণাবলীর তলদেশে বর্তমান স্বতন্ত্র কোনও পদার্থের কোনও প্রত্যয় আমাদের নাই। কোনও দ্রব্য-সম্বন্ধে আমাদের যে প্রত্যয়, তাহা তাহার সমবেত গুণাবলীর প্রত্যয়, তদ্ব্যতীত সেই গুণাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোনও দ্রব্যের প্রত্যয় আমাদের নাই। বাহ্য দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া হিউম বলিয়াছেন, মানসিক ঘটনাবলীর তলদেশেও মনঃ-নামক কোনও দ্রব্যের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। মনের মধ্যে আবির্ভূত প্রত্যয়, ইচ্ছা, অনুভূতি, প্রভৃতির সহিতই আমাদের সাক্ষাৎ হয়; ইহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র কোনও পদার্থের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। দ্রব্যের জ্ঞান বাহ্য ইন্দ্রিয় হইতেও পাওয়া যায় না, অন্তরিন্দ্রিয় হইতেও পাওয়া যায় না। বাহ্য ইন্দ্রিয় হইতে পাওয়া যায় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ। ইহারা দ্রব্য নহে। আন্তরিন্দ্রিয় হইতে পাওয়া যায় চিন্তাবেগ, অথবা অনুভূতি। তাহারাও দ্রব্য নহে। সুতরাং বলিতে হইবে দ্রব্যের কোনও প্রত্যয়ই আমাদের নাই।

বাহ্যজগতের মিথ্যাজ্ঞান

জ্ঞানের যাহা বিষয়, আমরা তাহাতে স্থায়িত্বগুণের আরোপ করি কেন? মনঃ-এবং-প্রতীতি-নিরপেক্ষ সত্তা যে তাহাদের আছে, তাহাই বা কেন মনে করি? ইন্দ্রিয় হইতে তো বর্তমান কালে যে জ্ঞান হইতেছে, তাহার অতিরিক্ত কিছুই পাওয়া যায় না। ঘরের মধ্যে আমার টেবিল দেখিতে পাইতেছি। ঘরের বাহিরে গিয়া আবার যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন যে টেবিল ঘরের মধ্যে দেখিতে পাই, তাহা যে পূর্ব্বদৃষ্ট টেবিল, তাহার প্রমাণ কি? বিভিন্ন সময়ে উৎপন্ন দুইটি বিভিন্ন সংবেদনের অতিরিক্ত কিছুই তো আমার মনের মধ্যে আসে না। সেই সংবেদনদ্বয় যে অভিন্ন, তাহার জ্ঞান কোথা হইতে হয়? এখানেও অভ্যাস ও প্রত্যয়ের সংহতি হইতে টেবিলের স্থায়িত্ব এবং টেবিল-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন-সময়জাত সংবেদনের অভিন্নতা কল্পিত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুইটি বিভিন্ন সংবেদন ভিন্ন অন্য কিছুর জ্ঞানই আমার হয় না। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের মনের মধ্যে বর্তমান পদার্থের জ্ঞান, যে সংবেদন আমাদের মনে উপস্থিত হয়, তাহারই জ্ঞান। মনের বাহিরে অবস্থিত

[1] Substance.

কোন পদার্থের জ্ঞানই সেই সংবেদন দিতে পারে না। লক্ যে সকল গুণকে গৌণ গুণ আখ্যা দিয়াছিলেন, মনের বাহিরে যে তাহাদের অস্তিত্ব নাই, তাহা স্বীকৃত। মুখ্য গুণের যে মনঃ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? আমাদের মনে আবির্ভূত সংবেদনদ্বারাই মুখ্যগুণের প্রত্যয় উৎপন্ন হয়; সে প্রত্যয় সংবেদনেরই প্রত্যয়। সুতরাং মুখ্যগুণ মনের বাহিরে বর্ত্তমান বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। আমাদের মনের বাহিরে যাইবার কোনও পন্থাই আমাদের নাই। আমাদের দেহের জ্ঞানও আমাদের হয় আমাদের মনের মধ্যস্থ অনুভূতি হইতে; সুতরাং দেহকেও মনের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া গণ্য করিবার কারণ নাই। জগৎ সংবেদনের সমবায়ে গঠিত একটি জটিল পদার্থ। তবুও তাহাকে আমরা মনঃ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করি। যাহা ক্ষণস্থায়ী সংবেদনের সমষ্টি ভিন্ন কিছু নহে, তাহার স্থায়িত্ব এবং সেই সকল সংবেদনের মধ্যে সম্বন্ধের অস্তিত্ব কল্পনা করি। ইহার কারণ, যে পথে আমাদের কল্পনা-শক্তি চালিত হয়, সেই পথে চলিবার তাহার একটা প্রবণতা উৎপন্ন হয়। অভ্যাসজাত এই প্রবণতা হইতেই বাহ্য-জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক সংবেদন হইতে তাহার প্রত্যয়ের উদ্ভব হয়। যাহাকে এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে করি, তৎসম্বন্ধী বিভিন্ন সময়ে উৎপন্ন বিভিন্ন সংবেদনের সহিত তাহাদের প্রত্যয়ের সংহতিবশতঃ সেই সকল সংবেদনের প্রত্যেকের আবির্ভাবের সময় পূর্ব্ববর্ত্তী সংহত সংবেদনদিগের দিকে চিন্তা ধাবিত হয়, এবং সংহত সকল সংবেদনই অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। সংবেদনের পারম্পর্য্য বস্তুর অভিন্নতা রূপে প্রতীত হয়। প্রত্যয় ও সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য এই, যে সংবেদন প্রত্যয় অপেক্ষা স্পষ্টতর। কিন্তু সংবেদনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংহতির ফলে প্রত্যয়ের অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়, এবং প্রত্যয় বাস্তব পদার্থ বলিয়া প্রতীত হয়। তখন যাহা মানসিক প্রত্যয়মাত্র, তাহা সংবেদনের জনক বাহ্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তাহার বিষয় বিভিন্ন পদার্থ, এই মতের এই রূপেই উৎপত্তি হয়।

হিউম এইরূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে বিভিন্ন সময়ে আমাদের যে প্রতীতি হয়, তাহারা বিভিন্ন, এবং এই বিভিন্ন সত্তার মধ্যে কোনও সম্বন্ধই মনের বোধাগম্য হয় না, এবং আমাদের প্রতীতির উৎপাদক কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ জগৎ বাহিরে বর্ত্তমান নাই।

দেশ, কাল ও আত্মা

হিউম বলেন, যে দর্শন-ও-স্পর্শ-যোগ্য বিষয়ের বিন্যাস[1] হইতে "দেশের" জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং সংবেদন ও প্রত্যয়ের পারম্পর্য্য হইতে কালের প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। দেশ ও কালের প্রত্যয় স্বতন্ত্র প্রত্যয় নহে। বস্তুসকল যে প্রকারে[2] বর্ত্তমান, অথবা যে ক্রমে[3] বিন্যস্ত, তাহার প্রত্যয় বস্তুর প্রত্যয়ের সহিত মিশ্রিত থাকে। হিউম যে "প্রকার" ও "ক্রমের" কথা বলিয়াছেন, ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, তাহার জ্ঞান বাহির হইতে আসে না; তাহা সহজাত। বাহ্যজগতের অস্তিত্বের অস্বীকার করিয়াই হিউম নিরস্ত হন নাই। তিনি আত্মার অস্তিত্বও

[1] Disposition. [2] Manner. [3] Order.

অস্বীকার করিয়াছেন, এবং আত্মার বিভিন্ন অবস্থার তলদেশে কোনও চিরস্থায়ী পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়াছেন। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই সংবেদন হইতে উৎপন্ন, কিন্তু বাহ্যেন্দ্রিয় অথবা অন্তরিন্দ্রিয় হইতে এমন কোনও পদার্থের জ্ঞান আমরা প্রাপ্ত হই না, এমন কোনও সংবেদনের সাক্ষাৎ আমরা পাই না, যাহা আমাদের সমস্ত জীবন ধরিয়া অপরিবর্ত্তিত থাকে। সুখ ও দুঃখের বেদনা, আমাদের যাবতীয় অনুভূতি, যাবতীয় চিত্তাবেগ মনে উদিত হয়, পরে বিলীন হইয়া যায়; কোনটিই থাকে না। আমাদের মন চিন্তার প্রবাহ-মাত্র, অনবরত চিন্তার স্রোতঃ বহিয়া যাইতেছে, কিছুই তাহার মধ্যে স্থির থাকে না। কোনও স্থায়ী পদার্থ তাহার মধ্যে নাই। সুতরাং যাহাকে আত্মা বলা হয়, তাহা কল্পনার সৃষ্টিমাত্র, তাহার অস্তিত্ব নাই।

গ্রন্থের শেষ ভাগে হিউম আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও, ইহার পূর্ব্বের সমস্ত আলোচনাতেই প্রত্যয়দিগের মধ্যে সংযোগসাধক মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মনের মধ্যে যে সকল সংযোজক গুণ, অথবা "স্বাভাবিক সম্বন্ধের" তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা মনের একত্ব এবং তাহার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে তাহার অভিন্নতা সূচিত হয়। এই একত্ববিধায়ক তত্ত্বকে স্মৃতি, অথবা কল্পনা নামে অভিহিত করা হউক, অথবা তাহাকে "আত্মা" বলা হউক, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। হিউমের সমস্ত তর্ক আমিত্বের[1] ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশেষে সেই "আমি" অথবা আত্মা নাই বলায়, তাহার তর্কের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু মনঃ যদি সংবেদনের সমষ্টিমাত্রই হয়, তাহা হইলে আত্মার অজড়ত্ব ও অমরতা বলিয়া কিছু থাকে না। হিউমের নিকট "আত্মার অজড়ত্বের" ও যেমন কোনও অর্থ নাই, তেমনি তাহার চিন্ময়ত্বও তাহার নিকট অর্থহীন; কেননা, চিৎ অথবা জড় বলিয়া কিছু তাঁহার দর্শনে নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয়, হিউমের যুক্তি তাহাদের ভিত্তিও শিথিল করিয়া দিয়াছে। তাঁহার Dialogues on Natural Religion গ্রন্থে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। কোনও পদার্থকে যখন আমরা অন্য পদার্থের কারণ বলি, তখন প্রথমোক্ত পদার্থে দ্বিতীয় পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তিতা ভিন্ন অন্য কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই দুই পদার্থকে এক সঙ্গে না দেখিতে পাওয়া গেলে, এই কার্য্য-কারণত্ব সম্বন্ধে কোনও অনুমান করা সম্ভবপর হয় না। একটা ঘড়ি দেখিয়া ঘড়ির একজন নির্ম্মাতা আছে, অনুমান করা যায়। কেননা ঘড়ি-নির্ম্মাতাকে আমরা ঘড়ি নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়া থাকি। কিন্তু জগতের নির্ম্মাণ আমরা দেখি নাই, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও অভিজ্ঞতাই নাই। সুতরাং জগতের অস্তিত্ব হইতে তাহার কারণ-সম্বন্ধে কিছুই অনুমান করা যায় না। জগতের একজন কর্ত্তা যে আছেন, এই অনুমান সম্ভবপর হয় না। এই যুক্তির উত্তরে রীড্ বলিয়াছেন, প্রকৃতিতে উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থা হইতে তাহার একজন বুদ্ধি-মান সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ইহার উত্তরে হিউম বলিয়াছিলেন, কারণ না থাকিলে যদি কার্য্যোৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তারও একজন সৃষ্টিকর্ত্তা থাকা আবশ্যক। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, যে জগতের শৃঙ্খলা

---

[1] Ego.

হইতে একজন সসীম কর্তারই অনুমান করা যাইতে পারে; অসীম এবং পূর্ণ সৃষ্টিকর্তার অনুমান সম্ভবপর হয় না।

"অতিপ্রাকৃত" প্রবন্ধে হিউম অতি-প্রাকৃত প্রত্যাদেশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাকে তিনি অসম্ভব বলিতে পারেন নাই, কেননা তাঁহার মতে যখন কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের অস্তিত্ব নাই, ঘটনাবলীর মধ্যে যখন কোনও সম্বন্ধ নাই, তখন কোনও ঘটনাকেই অসম্ভব বলা চলে না। অতি-প্রাকৃতের সন্তোষজনক প্রমাণ নাই, ইহাই তিনি বলিয়াছেন। প্রকৃতির একবিধত্ব[১] সম্বন্ধে সকলের একই অভিজ্ঞতা দেখা যায়, কোথাও তাহার ব্যভিচার নাই। অতিপ্রাকৃত ঘটনা এই একবিধত্বের বিরোধী বলিয়া, তাহার স্বপক্ষের প্রমাণ বিরুদ্ধ প্রমাণের তুল্য বলবান্ হইতে পারে না। মানুষ স্বভাবতঃ ভয়, বিস্ময়, এবং কল্পনাদ্বারা প্রভাবিত। অপ্রাকৃত ঘটনার প্রমাণ কতটা এই সকলদ্বারা প্রভাবিত, তাহা বলা যায় না। অপ্রাকৃত ব্যাপার-সম্বন্ধে হিউমের এই মত বিশেষ বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। খৃষ্টীয় শাস্ত্রে যে সকল অপ্রাকৃত ব্যাপারের উল্লেখ আছে, তাহাদের প্রমাণ-সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই। অন্যান্য শাস্ত্রে বর্ণিত ব্যাপারেরও কোনও অনুসন্ধানও তিনি করেন নাই। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, অস্বাভাবিক ঘটনা যে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী, তাঁহার তাহা বলিবার অধিকার আছে কি? আপাতদৃষ্টিতে যাহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী বলিয়া মনে হয়, এইরূপ অস্বাভাবিক ঘটনাকে তাঁহার মতে একটি অভিনব প্রতীতি অথবা অভিজ্ঞতার একটি নূতন তথ্য বলিয়া গণ্য করা উচিত। অপ্রাকৃত অথবা অস্বাভাবিক ব্যাপার যে অসম্ভব নহে, তাঁহার যুক্তি-প্রণালী হইতে তাহাই মনে করা স্বাভাবিক। বাহ্যজগতে যদি বাস্তবিক কোনও শৃঙ্খলাই না থাকে, প্রকৃতির কার্য্যে একবিধত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাহার কার্য্যপ্রণালী কখনও লঙ্ঘিত হইবে না, অথবা আমরা কখনও যাহা প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহা কখনও প্রত্যক্ষ হইবে না, এরূপ আশা করা যায় না। তথাকথিত অপ্রাকৃত ব্যাপার কেহ দেখিয়াছে বলিয়া যদি বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই প্রত্যক্ষের সহিত অন্য প্রত্যক্ষের পার্থক্য কি? অপ্রাকৃত ব্যাপার বিরল ঘটনা হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ বলা যায় না।

কর্ম্মনীতি

ঔপপত্তিক গবেষণা[২] হইতে কর্ম্মনৈতিক গবেষণাকে হিউম অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়াছেন। মানুষের আচরণ প্রাকৃতিক ব্যাপারের মতোই যান্ত্রিক[৩] ও নিয়মানুগত। সুখ ও দুঃখের ধারণাদ্বারা মানুষের যাবতীয় কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং এই ধারণা হইতেই কল্যাণ ও অকল্যাণের ধারণা উদ্ভূত হয়। হিউম ছিলেন পাকা নিয়তিবাদী[৪]। একই কারণ হইতে একই ফল উদ্ভূত হয়, মানব-চরিত্রেও তাহার অন্যথা হয় না; কোনও

[১] Uniformity. [২] Theoretical Research.
[৩] Mechanical. [৪] Determinist.

মানুষের প্রকৃতি যদি জানা যায়, তাহা হইলে তাহার কার্য্য অনুমান করা যায়। মানবের সমগ্র ইতিহাস, রাজনীতি ও কর্ম্মনীতি যে অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা এই, যে নির্দ্দিষ্ট প্রবর্ত্তনা[১] হইতে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম উদ্ভূত হয়। এই নিয়মানুসারে মানুষের ভাবী কর্ম্ম যদি গণনা করিয়া বলা যায়, তাহা হইলে যাহাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা বলা হয়, তাহার অস্তিত্ব থাকে না।

কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকিলেও ধর্ম্ম[২] ও অধর্ম্মের[৩] মধ্যে প্রশংসা ও নিন্দার যে কিছু নাই, তাহা নহে। সৌন্দর্য্য ও প্রতিভার সহিত ইচ্ছার সম্বন্ধ নাই, তবুও তাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। তেমনি স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব না থাকিলেও, কতকগুলি কর্ম্ম আমাদের প্রীতি উৎপাদন করে; কতকগুলি উৎপাদন করে বিরক্তি।

হিউমের মতে কর্ম্ম প্রজ্ঞা[৪]-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না। প্রজ্ঞা একটি বিশুদ্ধ ঔপপত্তিক বৃত্তি[৫]; ইহা হইতে কর্ম্মের উদ্ভব হয় না। তবে তৃষ্ণা ও প্রবৃত্তি হইতে যে কর্ম্ম-প্রেরণা উদ্ভূত হয়, তাহা প্রজ্ঞাকর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। সত্য কি, তাহাই প্রজ্ঞাকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হয়, কিন্তু প্রজ্ঞা আমাদের আচরণ প্রভাবিত করিতে পারে না।

অনুভূতি[৬] এবং বলবান চিত্তাবেগ[৭]ই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক[৮]। বলবান চিত্তাবেগদিগকে হিউম শান্ত এবং প্রবল, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্য দেখিয়া যে চিত্তাবেগ উদ্‌ভূত হয়, তাহা শান্ত। প্রেম ও ঘৃণা, শোক ও আনন্দ, দম্ভ ও দীনতা[৯] ইহারা প্রবল। চিত্তাবেগের বিষয় ও তাহার কারণের মধ্যে হিউম পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহাকে ভালবাসা যায়, সে ভালবাসার "বিষয়," কিন্তু তাহার সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহাই ভালবাসার কারণ।

হিউম কর্ম্মের গুণাগুণের কষ্টিপাথর-সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। প্রজ্ঞাকে কর্ম্মের বিচারক বলিয়া হিউম স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে কর্ম্মের গুণাগুণ নির্ভর করে অনুভূতির উপর। মানুষের মনের মধ্যে একটি নৈতিক সংস্কারের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন। নৈতিক ভাল ও মন্দ নির্ভর করে, কোনও কর্ম্ম দেখিয়া মনে যে সন্তোষ অথবা বিরাগ উৎপন্ন হয়, তাহার উপর। যে কর্ম্ম দেখিয়া দ্রষ্টার মনে সন্তোষ অথবা অনুমোদনের ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাই ধর্ম্ম, আর যে কর্ম্ম দেখিয়া বিরাগ উৎপন্ন হয় তাহা অধর্ম্ম।

অন্যের কৃত কর্ম্মে আমাদের মনে সুখ উৎপন্ন হয় কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে হিউম বলিয়াছেন, অন্যের অনুভূতির মধ্যে প্রবেশ করিবার (এবং তাহা অনুভব করিবার) একটা ক্ষমতা মানুষের আছে। কল্পনার সাহায্যে আমরা আমাদিগকে অন্যের অবস্থার মধ্যে স্থাপিত করি, এবং সেই লোকের মধ্যে যাহা আমাদের নিজের থাকিলে গর্ব্ব অনুভব করিতাম, তাহার

[১] Motive. [২] Virtue. [৩] Vice.
[৪] Reason. [৫] Theoretical faculty [৬] Feeling.
[৭] Passion. [৮] Motive. [৯] Humility.

প্রশংসা করি, এবং যাহা থাকিলে আপনাকে হীন মনে করিতাম, তাহার নিন্দা করি। "সমবেদনা'র অনুভূতিই নৈতিক অনুমোদনের ভিত্তি। আমরা সকল সময় যে আত্ম-প্রীতিদ্বারা চালিত হই, একথা সত্য নহে। দূরবর্ত্তী কাল ও দূরবর্ত্তী দেশে কৃত সৎকার্য্যের আমরা প্রশংসা করি, এবং আমাদের শত্রুর সাহসিক কার্য্য আমাদের অনিষ্টকর হইলেও, আমাদের শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হয়। অন্যের সুখ ও দুঃখের সহিত সহানুভূতি অপেক্ষা মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অন্য কোনও সূক্ষ্মতর তত্ত্ব পাওয়া সম্ভবপর নহে।

উপাদেয়তা[1] অথবা উপযোগিতা[2] হিউম সকল কর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের নিজের নিকট কোন্ কোন্ গুণ উপাদেয় অথবা উপযোগী, এবং কোন্ কোন্ গুণ অন্যের নিকট উপাদেয় অথবা উপযোগী, তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও মনের প্রফুলতা, ভদ্রতা, বিনয়, প্রভৃতি গুণের কোনও উপযোগ না থাকিলেও তাহারা প্রীতিকর হয়, এবং লোকের প্রশংসা আকর্ষণ করে, তথাপি প্রধানতঃ উপযোগই প্রধান নৈতিকগুণ সকলের ভিত্তি। বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, সাধুতা, এমন কি ন্যায়পরায়ণতা এবং উদারতার ভিত্তিও উপযোগ। ইহা হইতে প্রতীত হয়, যে সাধারণতঃ হিউম যদিও "উপযোগী" ও কল্যাণকরকে অভিন্ন বলিয়াছেন, তথাপি যে উপযোগের কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহা সকল সময় কর্ম্মকর্ত্তার উপযোগ নহে, তাহা সর্ব্বসাধারণের উপযোগ। পরোপকার প্রবৃত্তির মূল্য স্বার্থপরতার মূল্য অপেক্ষা যে অধিক, তাহা তাহার নিজের স্বরূপের জন্য নহে, তাহা অধিকতর উপযোগী বলিয়াই তাহার মূল্য অধিক। স্বার্থপরতাদ্বারা কেবল একজনের কল্যাণ হয়, পরোপকার প্রবৃত্তিদ্বারা সকলের কল্যাণ হয়।

কার্য্যপটুতা, বিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি গুণ উহাদের যাঁহারা অধিকারী, তাঁহাদেরই উপকারী হইলেও, উহাদেরও মূল্য আছে। কিন্তু পরার্থপরতা ও ন্যায়পরতা উৎকৃষ্টতর, কেননা তাহাদের উপযোগ বিস্তৃততর। কর্ত্তার স্বার্থ ভিন্ন সৎকর্ম্মের অন্য কোনও উদ্দেশ্য স্বীকার না করিলেও, অন্যের প্রতি কর্ত্তব্যসাধনদ্বারা, কর্ত্তার স্বার্থসিদ্ধ হয়, ইহা হিউম বলিয়াছেন। হিউমের এই মতের বিরুদ্ধে বলা যায়, যে উপযোগ ও সুখকে কর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইলে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ সকলের ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না। ইহাদ্বারা নৈতিক সৎ কর্ম্মের মূল তত্ত্বে পৌছানো যায় না। যাহা উপযোগী, কেন তাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবার জন্য বাধ্যতা কোথায়? হিউমের মত-অনুসারে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। স্বকীয় স্বার্থের সহিত সাধারণের উপকারের ইচ্ছার সমন্বয়ও এই মতদ্বারা সম্ভবপর হয় না। হিউমের প্রধান ত্রুটি এই, যে তিনি অনুভূতিকেই কর্ম্মের উৎস বলিয়াছেন, এবং চিত্তাবেগদিগকে কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন। কিন্তু মানব-মনঃকে প্রজ্ঞা ও চিত্তাবেগ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া চিত্তাবেগকে একেবারে যুক্তিবর্জ্জিত বলা যায় না। প্রজ্ঞাবান জীবের সকল কর্ম্মেই প্রজ্ঞার প্রবেশাধিকার আছে। তাহার যাবতীয় কামনা প্রজ্ঞাকর্ত্তৃক রূপান্তরিত হয়, এবং প্রজ্ঞা-দ্বারাই তাহার অভিষ্ট যাবতীয় পদার্থের মূল্য নিরূপিত হয়। অন্যান্য কামনা হইতে

---

[1] Agreeableness. [2] Utility.

বিশ্লিষ্ট কোনও বিশেষ কামনার পরিতৃপ্তি নৈতিক সৎকর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে, আত্মার সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করাই তাহার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত অন্যান্য জীবাত্মা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। সম্বন্ধ-বর্জিত অবস্থায় ইহাদের কোনও অর্থ অথবা অস্তিত্বই নাই।

হিউমের দর্শনের সমাপ্তি সংশয়বাদে[1]—জড়ের অস্তিত্বে সংশয়, চিতের অস্তিত্বে সংশয়, সত্যজ্ঞান লাভের সম্ভাবনার সংশয়। যুক্তিদ্বারা যুক্তির দুর্ব্বলতা প্রমাণিত হইয়াছে; জ্ঞান জ্ঞানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে। তর্কের ক্ষেত্রেই হউক অথবা কর্ম্মের ক্ষেত্রেই হউক, হিউমের মনোভাব হতাশামূলক। তাঁহার গ্রন্থের শেষে তিনি লিখিয়াছেন "যখন মানবীয় বুদ্ধির মূলদেশে তাহার প্রথম তত্ত্বগুলিতে গিয়া উপস্থিত হই, তখন মনে যে ভাবের উদ্‌ভব হয়, তাহাতে আমাদের অতীতের যাবতীয় পরিশ্রম ও চেষ্টা হাস্য-জনক বলিয়া মনে হয়, এবং আমাদের গবেষণায় আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না।" তাঁহার গবেষণার ফল কেহ স্বীকার করিবেন বলিয়া হিউম আশা করেন নাই। "চিন্তার অথবা কর্ম্মের কোনও সুনিশ্চিত কষ্টিপাথর প্রজ্ঞার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সংস্কার ও অভ্যাস হইতেই আমাদের বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়। সন্দেহবাদের আক্রমণ হইতে আমরা আত্মরক্ষায় অক্ষম। আমাদের বুদ্ধি অথবা ইন্দ্রিয়দিগকে সমর্থন করা (সত্যের সাধনরূপে) কোনও দর্শনের পক্ষেই সম্ভবপর নহে।" "প্রজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে আপনাকে উন্মুক্তিত করে[2] এবং দর্শনেই হউক অথবা ব্যবহারিক জীবনেই হউক কোন বিষয়েই বন্দু পরিমাণ প্রমাণও রাখিয়া যায় না।" অভিজ্ঞতাই জ্ঞান। তাহার বাহিরে জ্ঞান নাই। কানও বিষয়েই কোনও নিশ্চিতি নাই। অভ্যাসই আমাদের একমাত্র নির্ভর স্থল, এবং সম্ভাব্যতাই জীবনের একমাত্র পথনির্দ্দেশক।

(৪)

হার্টলি ও প্রিস্ট্‌ল

ডেভিড্‌ হার্টলি ও জোসেফ প্রিস্টলী শরীরের কার্য্য-দ্বারা চিন্তার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মনঃ যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তাহার সংবেদন যদি বাহ্য বস্তুদ্বারাই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে জড় পদার্থকেই জ্ঞানের কারণ বলিতে হয়? শরীরের অবস্থার সহিত মানসিক অবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। স্নায়বিক যন্ত্র ও তাহার স্পন্দন হইতে চিন্তার ও ইচ্ছার উৎপত্তি হয়, বলিয়া হার্টলি ও প্রিষ্টলি মীমাংসা করিয়াছিলেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা জীবাত্মা ও তাহার অবিনশ্বরতা-সম্বন্ধে এবং ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। প্রিস্টলী হলব্যাকের নাস্তিকতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

[1] Stepticism [2] Reasoii entirely Sub-verts itself.

(৫)

বৈজ্ঞানিক, ধর্ম্মতাত্ত্বিক ও কর্ম্মনৈতিক গবেষণা

লকের অভিজ্ঞতাবাদ হইতে বার্কলের অধ্যাত্মবাদ ও হিউমের সংশয়বাদের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু লকের দর্শনের প্রভাব কেবল ঔপপত্তিক দর্শনেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব ও কর্ম্মনৈতিক দর্শনের উপরও তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। নিউটন বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কিন্তু জগৎ-সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা লকের দর্শন-কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিল। হার্টলিও প্রিষ্টলীর শারীরতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত মনোবিজ্ঞানের উপরও লকের প্রভাব কম ছিল না।

নিউটন

১৬৪২ খৃষ্টাব্দে নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। এই বৎসরই গ্যালিলিওর মৃত্যু এবং ইংলণ্ডে অন্তর্বিদ্রোহ আরব্ধ হয়। প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়মাণ শক্তিসমূহের ব্যাখ্যার জন্য আরিস্টটলের সময় হইতে যে প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল, নিউটনকর্ত্তৃক তাহা সাফল্যমণ্ডিত হয়। জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর গতির মধ্যে তিনি একটি সাধারণ নিয়মের আবিষ্কার করেন। কেপলার ও গ্যালিলিওর অসমাপ্ত কর্ম্ম তিনি সমাপ্ত করিয়াছিলেন। জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান মহাকর্ষণ তাঁহারই আবিষ্কার। একটা আপেল বৃক্ষ পতিত হইতে দেখিয়া তিনি তাহার পতনের কারণের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। পৃথিবীর আকর্ষণই এই পতনের কারণ বলিয়া তাঁহার মনে প্রতীত হয়। এই আকর্ষণের অস্তিত্ব তিনি গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছিলেন।

প্রাকৃতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যাতেই নিউটন আপনার শক্তির নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু প্রকৃতির শৃঙ্খলার মধ্যে তিনি এক জ্ঞানময় স্রষ্টাকে দর্শন করিয়াছিলেন। জ্ঞানের উৎপত্তি-সম্বন্ধে তাঁহার মত তিনি লকের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাবতীয় বস্তুই তিনি ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন। তাঁহার Principia দ্বারা কেবল বিজ্ঞান নয়, জ্ঞানের যাবতীয় বিভাগই প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রাকৃতিক জগৎ-সম্বন্ধে তাঁহার মত সর্ব্বত্র শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে অভিব্যক্তিবাদ চিন্তাজগতে যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, নিউটনের যুগে মহাকর্ষণের সেই স্থান ছিল।

(৬)

Deism বা জগদতীত-ঈশ্বর-বাদ

লর্ড হারবার্ট অব চারবেরী

এই সময়ে Deism নামক এক প্রকার ধর্ম্মমতের উদ্ভব হইয়াছিল। এই মতে ঈশ্বরের জ্ঞানলাভের জন্য কোনও প্রকার প্রত্যাদেশের প্রয়োজন নাই। তাঁহার সৃষ্ট প্রকৃতি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা সকলই জ্ঞাত হওয়া যায়। Deistদিগের সকলের মত

একরূপ ছিলনা, কিন্তু বাইবেল সকলেই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।এই মতে ঈশ্বর জগতের বাহিরে অবস্থিত। জগৎ একটি বিরাট যন্ত্র। ঈশ্বর ইহার জন্য যে নিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই নিয়মানুসারে ইহা পরিচালিত হয়। ইহার কার্য্যে তাঁহার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না। অপ্রাকৃত ঘটনায় Deistগণ বিশ্বাস করিতেন না। যাহা যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতেন। তাহাদের মতে যুক্তিই ঈশ্বর-সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের একমাত্র পন্থা, অন্য পন্থা নাই, তাহার প্রয়োজনও নাই।

লর্ড হারবার্ট অব চারবেরী Deismএর প্রতিষ্ঠাতা (১৫৮১-১৬৪৮)। তিনি সৈনিক ছিলেন। হল্যাণ্ডের যুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরে ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। De Veritate এবং De Religione গ্রন্থে তিনি তাঁহার মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধর্ম্মের সার পাঁচটি সত্য: (১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব, (২) উপাসনার আবশ্যকতা, (৪) অনুতাপ এবং (৫) মৃত্যুর পরে পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার। খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিশেষ করিয়া তিনি কিছু বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার মতে সমস্ত ধর্ম্মই কুসংস্কার এবং পুরোহিতদিগের স্বার্থপরতা হইতে উদ্ভূত। ঈশ্বরের অস্তিত্বের জ্ঞান প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই আছে, তাহার জন্য প্রত্যাদেশের প্রয়োজন নাই।

অন্যান্য Deistদিগের মধ্যে জন টোলাণ্ড, এণ্টনি কলিন্স্, উলষ্টন, চাব, মরগ্যান, বলিংব্রোক এবং টিণ্ডাল বিখ্যাত ছিলেন। জন টোলাণ্ড ১৬৭৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার Christianity not mysterious গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন খৃষ্টধর্ম্মে যুক্তির বিরোধী যেমন কিছু নাই, তেমনি যুক্তির অতীত—যুক্তিদ্বারা যাহা জানিতে পারা যায় না—এমন কিছুও নাই। বুদ্ধিদ্বারা সকলই বুঝিতে পারা যায়; যাহা পারা যায় না, তাহার কোনও মূল্যই নাই। সত্য কি, তাহা জানিবার জন্য অন্য কোনও বৃত্তি মানুষের নাই। বুদ্ধির যাহা অগম্য, তাহা বর্জ্জনীয়। আদিম খৃষ্টধর্ম্মে গুহ্য কিছুই ছিল না। যাহা কিছু গুহ্য তাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহুদী ধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে তাহা উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

এণ্টনি কলিন্স্ (১৬৭৬-১৭২৯) তাঁহার Discourse on Free thinking" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে চিন্তাকে বাঁধিয়া রাখা অসম্ভব। স্বাধীন ভাবে চিন্তা না করা মানুষের পক্ষে অপরাধ। কাহারও ধর্ম্মমত সত্য হইলেই যে সে মুক্তি পাইবে, তাহা নহে। যাজকেরা আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য লোকের স্বাধীন চিন্তায় বাধা দিয়াছে। তাহাদের ভয়, যে তাহাদের উদ্ভাবিত ধর্ম্মে লোকের বিশ্বাস নষ্ট হইলে তাহাদের রুটি মারা যাইবে। জগতের শ্রেষ্ঠতম সকল লোকেই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। সত্য হইতে কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, এবং ভ্রান্তি হইতেও কোনও উপকারের আশা নাই। কলিন্সের Liberty and Necessity গ্রন্থে নিয়তিবাদ সমর্থিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উত্তরে স্যামুয়েল ক্লার্ক লিখিয়াছিলেন, মানুষের ইচ্ছা যদি স্বাধীন না হইত, তাহা হইলে ঘড়ির সহিত তাহার কোনও পার্থক্য থাকিত না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা তিনি অবগত আছেন, ইহা সত্য। কিন্তু ইহাদ্বারা স্বাধীন ইচ্ছা অপ্রমাণিত হয় না। কেননা, যে সকল কর্ম্ম স্বাধীন ইচ্ছা হইতে

উদ্ভূত, তাহাদেরও অবশ্যম্ভাবী হওয়া অসম্ভব নহে। ভবিষ্যতের জ্ঞান মানুষেরও কিছু কিছু আছে। ঈশ্বরে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে মাত্র।

উলষ্টন ছিলেন বাইবেলের রূপক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। টিণ্ডালের Christianity as old as Creation or The Gospel—A Republication of the Religion of Nature (১৭৩০) গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, যে প্রাকৃতিক ধর্ম্মদ্বারা মানুষের সকল ধর্ম্মীয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়। খৃষ্ট-ধর্ম্মের মধ্যে যাহা সত্য, তাহা প্রাকৃতিক ধর্ম্মের পুনরুক্তি। ঈশ্বর পূর্ণ। তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে জানিবার এবং সেবা করিবার শ্রেষ্ঠতম উপায়ই মানুষকে দান করিয়াছেন। প্রথম হইতেই তিনি মানুষকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিয়াছেন। সুতরাং যুক্তিদ্বারা যে ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। যুক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য মানুষ দায়ী।

বলিংব্রোক Deist ছিলেন অথবা Deism এর বিরোধী ছিলেন, তাঁহার রচনা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। তিনি প্রত্যাদেশের প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতের প্রতিবাদে এডমণ্ড বার্ক ছদ্ম নামে যে A Vindication of Natural Society নামক শ্লেষাত্মক, গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, বহু দিন যাবত তাহার শ্লেষ বুঝিতে না পারিয়া অনেকে তাহা বলিংব্রোকের লিখিত বলিয়া মনে করিয়াছিল।*

হিউমের হস্তে Deism সংশয়বাদে পরিণত হয়। অবশেষে জোসেফ্ বাটলার অখণ্ডনীয় যুক্তিদ্বারা এই মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। বাটলার যুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যাদেশের সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্যও আমাদের যুক্তি ভিন্ন অন্য কোনও বৃত্তি নাই। কিন্তু ঈশ্বরকে বুঝিতে হইলে, এবং তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি, তাহা জানিতে হইলে, শ্রদ্ধা আবশ্যক। আমরা তাঁহার তুলনায় কত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ, এবং আমাদের জ্ঞান যে কত সামান্য, সে সম্পর্কেও ধারণা থাকা প্রয়োজনীয়। যুক্তির অনুসরণ খুব ভাল, কিন্তু ক্ষুদ্র জীব আমরা, আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সৃষ্টিতে ভুল ও ত্রুটীর কথা বলা শোভা পায় না। বাট্‌লারের Analogy of Religion, Natural & Revealed, to the Constitution and Course of Nature (১৭৩৬) গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, যে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত, প্রাকৃতিক ধর্ম্মের উপরেই খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃতিক ধর্ম্মের যাহা মত, ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত খৃষ্টধর্ম্ম খৃষ্টের মুখ-নিঃসৃত বাণীদ্বারা তাহার সমর্থন এবং পূর্ণতা সাধন করে।

ইংলণ্ডের কর্ম্মনীতি

Deism ধর্ম্মকে কর্ম্ম-নীতির ব্যাপারে পরিণত করিয়াছিল। ইহার ফলে ধর্ম্ম হইতে পৃথক ভাবে কর্ম্ম-নীতির আলোচনা আরব্ধ হইয়াছিল, এবং ধর্ম্মের বাহিরে কর্ম্ম-নীতির ভিত্তির অনুসন্ধান সুরু হইয়াছিল।

* Vide Morley's Burke P. P. 12-14.

হবসের মতে মানুষ স্বভাবতঃ স্বার্থপর। স্বকীয় স্বার্থ-সিদ্ধিই তাহার সর্ব্ব কর্ম্মের লক্ষ্য। এই স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই সমাজ-গঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং সমাজের অন্তর্গত সকল লোকের ক্ষমতা এক হস্তে অর্পণ করিয়া রাষ্ট্র-বিধির সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। রাষ্ট্রের যাহা অনুমত, তখন তাহাই হইল 'ন্যায়', যাহা রাষ্ট্র-কর্তৃক নিষিদ্ধ তাহা অন্যায়। মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহার প্রয়োজন, তাহাই হইল কর্ত্তব্য ও সুবিচার; কর্ম্মনীতি হইল নিষেধ-মূলক। এই মতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল। প্রথম প্রতিবাদ উত্থিত হয় কেম্ব্রিজ হইতে। কেম্ব্রিজে তখন প্লেটোর মতাবলম্বী এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। দে-কার্ত্তের দর্শনের প্রভাবও তাহাদের উপর পড়িয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাল্‌ফ্‌ কাডওয়ার্থ, হেনরী মোর এবং রিচার্ড কাম্বারল্যাণ্ড। কর্ম্ম-নীতির বিধিমূলক অংশের উপর তাঁহারা গুরুত্ব আরোপ করিতেন, এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ের অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন। Eternal and Immutable Morality (সনাতন ও অপরিবর্ত্তনীয় সুনীতি) গ্রন্থে কাড্‌ওয়ার্থ মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে মূলগত পার্থক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই পার্থক্য কাহারও খেয়াল হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ইহা স্বরূপগত এবং সনাতন। নৈতিক কর্ম্মের মূলতত্ত্ব প্রত্যেকেই অন্তরের মধ্যে অব্যবহিত ভাবে বুঝিতে পারে। কিন্তু এই তত্ত্বের কোনও সুশৃঙ্খল ব্যাখ্যা কাড্‌ওয়ার্থ দিতে পারেন নাই। হেনরী মোর তাঁহার Enchiridion Ethicum গ্রন্থে কতকগুলি স্বয়ংসিদ্ধ নৈতিক নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। সুবিচার এবং পরোপচিকীর্ষা এই সকলের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার মতে অনপেক্ষ মঙ্গল বুদ্ধিদ্বারা অথবা বুদ্ধির একটি বিশিষ্ট রূপদ্বারা জানিতে পারা যায়। বুদ্ধির এই রূপের নাম "মাঙ্গলিক বৃত্তি" পরোপকার "অনপেক্ষ মঙ্গলে"র অন্তর্ভুক্ত। এই বৃত্তিদ্বারা মঙ্গলের মাধুর্য্য এবং সৌরভ মানুষের নিকট প্রকাশিত হয়। ইহা ন্যায়সঙ্গত কার্য্যে মানুষকে প্রণোদিত করে।

রিচার্ড কাম্বারল্যাণ্ডের মতে মানুষের সামাজিক প্রকৃতি তাহার স্বার্থপরতার মতই স্বাভাবিক। স্বার্থপরতাদ্বারা মানুষ যেমন তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে চালিত হয়, সামাজিক প্রকৃতি তেমনি তাহাকে সর্ব্বজনীন মঙ্গলের দিকে চালিত করে। সকলের মঙ্গল ব্যতীত ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধিত হওয়াও প্রকৃত পক্ষে অসম্ভব। কাম্বারল্যাণ্ডই প্রথম বলিয়াছিলেন, সকলের মঙ্গল'ই যাবতীয় মঙ্গল কর্ম্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত, এবং তাহাই সকল কর্ম্মের গুণাগুণের কষ্টিপাথর। ব্যক্তির মঙ্গল এবং সকলের মঙ্গলের মধ্যে এই সম্বন্ধ ঈশ্বরের সৃষ্ট।

সামুয়েল ক্লার্ক (১৬৭৫-১৭২৯) তাঁহার A Discourse Concerning the Being and Attributes of God গ্রন্থে যেমন ঈশ্বর-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তেমনি নৈতিক সমস্যা-সমূহের আলোচনাও করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর এমন ভাবে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে যাবতীয় বস্তুর মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সম্বন্ধ বর্ত্তমান। বস্তুর স্বরূপ হইতে এই সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। সেই জন্য তাহা সনাতন। এই সামঞ্জস্য-পূর্ণ বস্তুজগতের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত জীবনই নৈতিক জীবন। সকলেই বস্তুজগতের এই সামঞ্জস্য স্বীকার করিলেও তদনুসারে স্বীয় আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে না। যে তাহার প্রবৃত্তিবেগের দ্বারা চালিত হয়,

সে যে কেবল জগদ্ব্যবস্থার বিরোধী কার্য্য করে, তাহা নহে, সে তাহার নিজের অন্তঃস্থিত প্রজ্ঞাকেও অস্বীকার করে। ক্লার্ক কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাদ্বারা কর্ম্মনীতির তত্ত্ব গণিতের নিয়মানুসারে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া কর্ম্মনীতিকে একটা বিজ্ঞানে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উইলিয়াম ওয়ালাষ্টন (১৬৫৯-১৭২৪)এর মত ক্লার্কের মতের অনুরূপ। "প্রকৃতির অনুসরণ কর, এবং প্রত্যেক বস্তু যাহা, তাহাকে তাহাই গণ্য কর।" ইহাই তাঁহার মতে সুনীতির মৌলিক নিয়ম। তাঁহার মতে প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যে একটি তত্ত্ব আছে, এবং সেই কর্ম্মে সেই তত্ত্বই প্রকাশিত হয়। যে বস্তু আমার নহে, তাহা যখন আমি লই, তখন সেই বস্তুকে আমার বলিয়া গণ্য করি। এখানে আমরা কর্ম্মের যাহা তত্ত্ব—(বস্তুটি আমার)—তাহা মিথ্যা। যখন কর্ম্মের এবংবিধ তত্ত্ব মিথ্যা হয়, তখন তাহা অন্যায়। তাহার বিপরীত কর্ম্ম ন্যায়। ন্যায় ও অন্যায় কর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী কর্ম্মের কোন নৈতিক মূল্য নাই। বস্তু-জগতের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া কার্য্য করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যখন জগতের সত্য জ্ঞান মনের মধ্যে থাকে, কেবল তখনই ইহা সম্ভবপর। এতাদৃশ কর্ম্মের পুরস্কার আনন্দ। সুখের পরিমাণ হইতে দুঃখের পরিমাণ বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আনন্দ।

এই যুগের সর্ব্বপ্রধান লেখক ছিলেন আর্ল অব স্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরি (১৬৭১-১৭১৩)। তাঁহার প্রধান গ্রন্থের নাম Characteristics, or Men, Manners, Opinions and Uses.

স্বার্থপরতাই যদি মানুষের প্রকৃতিগত হয়, তাহা হইলে তাহার উপর কর্ম্মনৈতিক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। কর্ম্মনৈতিক দর্শনের পথে এই বাধা দূর করিবার জন্য সাফ্‌ট্‌স্‌বেরি বলিয়াছেন, যে প্রথমতঃ মানুষের সামাজিক গুণই ছিল। সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা না করিয়া তিনি সামাজিক গুণগুলি যে মানুষের প্রকৃতিগত তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। Inquiry concerning Virtue and Merit গ্রন্থে স্বার্থপরতা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি, হব্‌সের এই মত খণ্ডন করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, যে হব্‌সের মতে মানুষের সমস্ত অনুভূতির ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না। মানুষের সহিত যদি অন্য কাহারও কোন সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে হব্‌সের মত গ্রহণযোগ্য হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষ একটা বৃহত্তর ব্যবস্থার অংশমাত্র, স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে। কোনও ব্যক্তিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। অন্যের সহিত মিলিত হইয়াই ব্যক্তি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে সমগ্রের সে অংশ, তাহার মঙ্গল যখন তাহার কর্ম্মের লক্ষ্য হয়, তখনই তাহাকে ভাল বলা যায়। মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ, যে সমগ্রের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সে নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। যতক্ষণ সে নিজের সুখ না চাহিয়া নিজের মঙ্গল চায়, ততক্ষণ সমগ্রের সহিত তাহার বিরোধের সৃষ্টি হয় না। নিজের মঙ্গলের সহিত সমগ্রের মঙ্গলের বিরোধ নাই। মানুষের স্বার্থপর প্রকৃতি যে আছে, তাহা সাফ্‌ট্‌স্‌বেরী অস্বীকার করেন নাই। স্বার্থপর প্রবৃত্তির সহিত পরার্থপর প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য-স্থাপনই তিনি নৈতিক জীবনের লক্ষ্য বলিয়াছেন। পরস্পর বিরোধী বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য্য। নৈতিক সৌন্দর্য্যও মানব-চরিত্রের বিবিধ

বিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য। নৈতিক সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের জন্য আমাদের সহজাত এক বৃত্তি আছে। এই বৃত্তিই "নৈতিক ইন্দ্রিয়"। নিজের কতটুকু প্রাপ্য, অপরের প্রাপ্যই বা কতটুকু, তাহা নিদ্ধারণ করাই এই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। এই ইন্দ্রিয় সহজাত। শিক্ষাদ্বারা ইহা মার্জিত হয় সত্য, কিন্তু শিক্ষা হইতে ইহার উৎপত্তি হয় না। সঙ্গীত বুঝিবার শক্তি মানুষের স্বভাবজ হইলেও, শিক্ষাদ্বারা যেমন তাহার উন্নতি হয়, ইহাও সেই-রূপ। আমাদের দ্বিবিধ প্রবৃত্তির মধ্যে একটি যখন অতিরিক্ত পরিমাণে প্রবল হইয়া উঠে, তখনই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। অন্যথা সমগ্রের মঙ্গলই ব্যক্তির মঙ্গলরূপে এবং ব্যক্তির মঙ্গল সমগ্রের মঙ্গল রূপে অনুভূত হয়। সাফ্‌ট্‌স্‌বেরীই প্রথমে "নৈতিক ইন্দ্রিয়" রূপ স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছিলেন। অন্তর্জগতের অভিজ্ঞতার উপর সুনীতির প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও তিনিই প্রথমে করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে সব সময় পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনেকে পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরীর মতে এই মত স্বার্থপরতা মূলক ও ঘৃণ্য প্রবৃত্তির উত্তেজক।*

সাফ্‌ট্‌স্‌বেরীর এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ম্যাণ্ডেভিল্। ম্যাণ্ডেভিলের মতে ধর্ম্ম নিষেধমূলক ও বৈরাগ্যমূলক। কেবল স্বার্থত্যাগই যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তি যাহা চায়, তাহা না করাই ধর্ম্ম। বাস্তব কোনও লক্ষ্য মানুষের থাকে না। Fable of the Bees, or Private Vices, Public Benefits (১৭২৪) (মধুমক্ষিকার উপকথা, ব্যক্তির দুষ্কৃতি, সাধারণের উপকার) গ্রন্থে ম্যাণ্ডেভিল্ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে সমাজের মঙ্গল যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের কার্য্যের উপর নির্ভর করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যক্তির কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার স্বার্থানুসন্ধায়ী প্রবৃত্তিদ্বারা। প্রকৃত পক্ষে তাহার প্রবল চিত্তাবেগ ও দুষ্ক্রিয়ার প্রবৃত্তিদ্বারাই তাহার কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। লোভ, অমিতব্যয়িতা, হিংসা, অসূয়া, উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাহার সমস্ত কর্ম্মের মূলে। কামনার দমন দ্বারা সমাজের যতটা মঙ্গল হয়, এই সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তিদ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। যে সমস্ত বড় বড় কর্ম্ম পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যাহাদ্বারা সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে, তাহাদের মূলে ছিল এই সমস্ত প্রবৃত্তি। ধর্ম্ম যেখানে কপটতা নহে, সেখানে তাহা কৃত্রিমতা দোষে দূষিত। ধর্ম্মের দ্বারা পৃথিবীর প্রকৃত উপকার হয় না, অধর্ম্মই উন্নতির মূল।†

ফ্রান্সিস হাচিসন (১৬৯৪—১৭৪৬)

হাচিসন গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মনীতির অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থগুলি এই: (১) Inquiry into our Ideas of Beauty and Virtue (১৭২০)

---

* বার্কলের Alciphron or the Minute Philosopher গ্রন্থে এই মতের আলোচনা আছে।

† বার্কলের Alciphron or the Minute Philosopher গ্রন্থে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে।

(২) Essay on the Nature of the Passions and Affections (১৭২৮) (৩) A system of Moral Philosophy (১৭৫৫)। শেষোক্ত গ্রন্থ তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হাচিসন স্বার্থপর এবং পরার্থপর মনোভাব, এবং প্রবল চিত্তাবেগ এবং শান্ত মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের কামনা-সকল ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাহাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহার জন্য শান্ত মনোভাবই আমাদের অধিকতর মনঃপূত হয়, এবং যাহার জন্য স্বার্থপর মনোভাব অপেক্ষা পরার্থপর ভাবগুলিই আমাদিগের নিকট উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতীত হয়। আমাদের নৈতিক ইন্দ্রিয়ই ইহার কারণ। "সঙ্গীতের কাণ" থাকিলে যেমন তাল লয়-সঙ্গত সুর ভাল লাগে, তেমনি এই নৈতিক ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব বশতঃই পরার্থপর মনোভাব আমাদের প্রীতিকর হয়। কিন্তু মানুষের প্রজ্ঞা হইতে এই সকল শান্তভাবের কিরূপে উৎপত্তি হয়, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই। এই সকল শান্ত মনোভাবের প্রতি পক্ষপাতিতা যদি কেবল রুচি হইতে উদ্ভূত হয়, তাহার যদি যৌক্তিক ভিত্তি কিছু না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত কামনার মধ্যে তাহাদিগকে প্রভুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার কোনও যুক্তি-সঙ্গত হেতু নাই।

জোসেফ বাটলার

জোসেফ বাটলারের Analogyর কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৬৯২ সালে বাট্‌লারের জন্ম হয়। তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ যাজকদিগের অন্যতম ছিলেন। হাচিসন "নৈতিক ইন্দ্রিয়"কে রুচির ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। যে রুচির অস্তিত্ববশতঃ পরার্থপর কর্ম্ম প্রীতিকর হয়, তাহাই তাঁহার মতে নৈতিক ইন্দ্রিয়। কিন্তু বাটলারের নৈতিক ইন্দ্রিয় প্রভুস্থানীয়—ক্যান্টের Categorical Imperative এর সদৃশ। Analogyর মতো Butlerএর ১৫টি ধর্ম্ম-বক্তৃতাও প্রসিদ্ধ। Analogyতে বাটলার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হয়, প্রকৃতির গঠন-সম্বন্ধে তাহার সমস্ত গুলিই তুল্যরূপে প্রয়োজ্য, এবং শাস্ত্রে বর্ণিত ঐশ্বরিক শাসনবিধি এবং প্রকৃতিতে ব্যক্ত শাসনবিধির মূল তত্ত্বগুলির মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায়, তাহা হইতে শাস্ত্রকর্ত্তা ও প্রকৃতির স্রষ্টা অভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। বাটলার ধর্ম্ম-বিবেককে ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহাকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়াছেন। কর্ত্তব্যপালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তাঁহার মতে প্রথমে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে স্বার্থপরতা ছিল না। পরে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে যখন কতকগুলি বস্তু সুখের বলিয়া প্রমাণিত হয়, তখন তাহা পাইবার জন্য কামনার উদ্ভব হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিবেকেরও আবির্ভাব হয়, এবং তাহা আমাদিগকে শাসন করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু বিবেকের এই কর্ত্তৃত্ব কোথা হইতে আসিল? কেন বিবেকের আদেশ পালন করিতে আমরা আমাদিগকে বাধ্য বলিয়া মনে করি? বাট্‌লার ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার মতে, যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহাই

বিবেকের অনুমত, যাহাই বিবেকের অনুমত, তাহাই ন্যায়সঙ্গত। ইহা চক্রক দোষ দুষ্ট[১]

আদম স্মিথ

১৭২৩ সালে আদম স্মিথের জন্ম হয়। অর্থশাস্ত্রবিদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও, কর্ম্ম-নীতি-সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত Wealth of Nations অর্থনীতি-সম্বন্ধে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের জন্য তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মনীতিসম্বন্ধীয় তাঁহার গ্রন্থ, A Theory of the Moral Sentimentsও, বিশেষ প্রসিদ্ধ। স্কটল্যাণ্ডের দর্শন ও ইংলণ্ডের কর্ম্মনৈতিক দর্শনের মধ্যে এই গ্রন্থকে যোগসূত্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। স্মিথ গ্লাসগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

স্মিথের মতে অপরের কর্ম্মই মুখ্যতঃ আমাদের নৈতিক বিচারের বিষয়, অর্থাৎ অপরের কর্ম্ম দেখিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্ম্ম করিবার সময় তাহার যে মনোভাব থাকে, তাহার কল্পনা করিয়া, আমরা তাহার কর্ম্মের ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের বিচার করি। অপরের অবস্থার মধ্যে আমাদিগকে অবস্থিত কল্পনা করিয়া, আমরা তাহার মনোভাবের পরিচয় লাভ করি, এবং সেই মনোভাবের দ্বারা তাহার কর্ম্মের বিচার করি। স্মিথের মতে এই উপায়ে পরের মনোভাব বুঝিবার জন্য আমাদের এক বৃত্তি আছে, তাহার নাম সমবেদনা[২]। এই সমবেদনাই স্মিথের কর্ম্ম-নীতির মূলতত্ত্ব। এই বৃত্তিদ্বারা অন্যের মনোভাবের পরিচয় পাইয়া, আমরা তাহার কর্ম্মের যে বিচার করি, অনুরূপ স্বকৃত কর্ম্মের বিচারও সেই ভাবে করি। পরের যে কর্ম্মকে অন্যায় বলিয়া মনে করি, তদনুরূপ স্বকৃত কর্ম্মকেও তাহাই মনে করি। সমবেদনা আছে বলিয়া ইহা সম্ভবপর হয়। অন্যের আচরণের বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই, স্বকীয় আচরণের উপর তাহার প্রয়োগ হইতেই কর্ত্তব্য জ্ঞানের[৩] উদ্ভব হয়। কিন্তু কেন কোনও আচরণকে ভাল বলা হয়? ইহার উত্তর সেই আচরণ উপযোগী এবং প্রীতিদায়ক বলিয়া। কিন্তু লোকের সমবেদনা অথবা অনুমোদন ভিন্ন সুনীতির যদি অন্য কোনও ভিত্তি না থাকে, তাহা হইলে সে ভিত্তিকে নিতান্তই দুর্ব্বল বলিতে হইবে।

হেনরি হোম (লর্ড কেম্‌স্)

(১৬৯৬-১৭৮২)

হেনরি হোম হিউমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, কিন্তু উভয়ের মতের মিল ছিল না। তাঁহার Morality and Natural Religion গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আত্মপ্রীতি,

[১] Petitio Principii [২] Sympathy [৩] Sense of duty

পরোপচিকীর্ষা, সমবেদনা, উপযোগ প্রকৃতি বহু তত্ত্বদ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। এই সকল তত্ত্বের অতিরিক্ত আর একটি তত্ত্বও তাহাদের মধ্যে আছে। সে তত্ত্ব ধর্ম্মবিবেক অথবা ন্যায়ান্যায় বোধ। ধর্ম্মবিবেক মানুষের সমস্ত প্রবর্ত্তনার বিচার করিয়া তাহার কর্ম্ম একটি মনোরম লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত করে। সে লক্ষ্য তাহার সমগ্র প্রকৃতির পরম আনন্দ।" তাঁহার মতে আমাদের কর্ম্ম আমাদের ইচ্ছাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয় কামনাদ্বারা। কামনা নিয়ন্ত্রিত হয় কর্ম্মের প্রীতিকরত্ব অথবা অপ্রীতিকরত্ব দ্বারা। সুতরাং যে কারণ-শৃঙ্খল কর্ত্তৃক মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা প্রকৃতির নিয়মের মতই নিয়ত এবং অপ্রতিবিধেয়। কিন্তু কর্ম্ম যদি এইভাবে নিয়ত হয়, তাহা হইলে কাহাকেও তাহার কর্ম্মের জন্য দায়ী করা যায় না। এই মতের জন্য হোম্‌কে হিউমের সঙ্গে এক শ্রেণীতে ফেলা হয়, এবং তাঁহাকে সন্দেহবাদী বলা হয়।

স্কটল্যাণ্ডের দর্শন

ডেভিড হিউমের সন্দেহবাদের প্রতিবাদে এই দর্শনের উদ্ভব হয়। ইউরোপের সংস্কৃতির ইতিহাসে সুপরিচিত অনেকে এই দার্শনিকদিগের মধ্যে ছিলেন। এই দর্শন Common Sense Philosophy (সাধারণ জ্ঞানমূলক দর্শন) নামেও অভিহিত হয়।

Common sense শব্দের ব্যবহার প্রথমে করিয়াছিলেন স্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরী। তাঁহার কর্ম্ম-নৈতিক মত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, যে কতকগুলি দার্শনিক ও নৈতিক সত্য এতই স্বতঃসিদ্ধ, যে তাহাদের সত্যতায় সন্দেহ করা যায় না। মানবজাতির অর্দ্ধেক পাগল হইয়া গিয়াছে, ইহাও কল্পনা করা যায়, কিন্তু এই সকল স্বতঃ সিদ্ধ সত্য, যাহা মৌলিক যুক্তি ও "সাধারণ জ্ঞানের" উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা সত্য নয়, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। ইহার পরে হাচিসন স্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরীর মতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া মানুষের মানসিক বৃত্তির শ্রেণীবিভাগ করেন। এই সকল বৃত্তির মধ্যে তিনি "সাধারণ করণ" (Public Sense) নামে একটি বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরের সুখে সন্তুষ্ট এবং দুঃখে বিচলিত হইবার প্রবৃত্তিই এই করণ। সকল মানুষের মধ্যে এই প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, তিনি ইহাকে "Common Sense বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই অর্থে এই শব্দ ধর্ম্মবিবেকেরই নামান্তর। পরবর্ত্তী স্কট দার্শনিকগণ এই নাম গ্রহণ করিয়া ইহার অর্থের বিস্তার সাধন করিয়াছেন, এবং ইহাকে যাবতীয় সত্যজ্ঞানের করণ—কর্ম্ম নৈতিক ও তাত্ত্বিক সমস্ত সত্যজ্ঞানের কষ্টিপাথর-অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সমগ্র মানব-জাতির সাধারণ অনুভূতি অর্থেই এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মূলে আছে কতকগুলি মৌলিক সত্যের অব্যবহিত উপজ্ঞামূলক জ্ঞান, যাহা সকল মানুষকর্ত্তৃকই বিনা সংকোচে গৃহীত হয়।

টমাস্ রীড (১৭১০-৯৬), ডুগাল্ড্ ষ্টুয়ার্ট (১৭৫৩-১৮২৮) এবং স্যার উইলিয়াম হ্যামিলটন এই দার্শনিক দিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন।

(১)

টমাস রীড

টমাস রীড প্রথমে এবর্ডিন, পরে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। Essays on the Intellectual Powers of Man (১৭৮৫) এবং Essays on the Active Powers (১৭৮৮), তাঁহার দুইটি প্রধান গ্রন্থ।

লক্ বলিয়াছিলেন আমাদের মনের উপর বাহ্য বস্তুর যে ছাপ পড়ে, তাহাই জ্ঞান। বাহ্য বস্তুর সহিত মনের প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই, তাহা মনের বাহিরেই পড়িয়া থাকে। ইহা হইতে বার্কলে বলিলেন, মনের উপর ছাপ ভিন্ন অন্য কিছুর সহিত যখন মনের যোগ নাই, তখন মনের বাহিরে অবস্থিত কিছু থাকিলেও, তাহার জ্ঞান আমাদের নাই। মনের মধ্যস্থিত প্রত্যয়ের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর জ্ঞানই আমাদের নাই। ইহার পরে হিউম বলিলেন, কেবল বাহিরে কেন, আমাদের ভিতরেও প্রত্যয়ের অতিরিক্ত কিছু নাই। প্রত্যয়ের তলদেশে মনঃ বলিয়াও কিছুই নাই। রীড বলিলেন, তাহা কেন হইবে? তোমরা যে ব্যবহিত জ্ঞানের কথা বলিতেছে, সেরূপ কোনও জ্ঞানের অস্তিত্বই নাই। আমাদের মনঃ ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে জ্ঞেয়ের প্রতিরূপ বলিয়া যে প্রত্যয়ের কথা বলিতেছে, সেইরূপ কোন প্রত্যয়ের সাহায্যে আমাদের জ্ঞান হয় না। জ্ঞান হয় অব্যবহিত[1] ভাবে। মনঃ সোজাসুজি বাহ্য বস্তু জানিতে পারে, তাহার স্বরূপেই জানিতে পারে। তাহার জন্য কোনও যুক্তির অথবা অনুমানের প্রয়োজন হয় না। যখনই ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শ-জনিত অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তখনি তাহাকে বাহ্য বস্তু বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি। ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ হইতে যে প্রথমে অনুভূতির উৎপত্তি হয়, তাহা রীড স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই অনুভূতি হইতে বাহ্য বস্তুর ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। Suggestion (ইঙ্গিত) শব্দ রীড বস্তুদিগের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝাইতে ব্যবহার করিয়াছেন। গোলাপের গন্ধ নাসিকায় প্রবিষ্ট হইলে সেই গন্ধ হইতে গোলাপ ফুলের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ইঙ্গিতই মনোজগতের ও বাহ্য জগতের জ্ঞানের প্রধান তত্ত্ব। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সময় মনে যে সকল ক্রিয়া হয়, তাহা লক্ষ্য করিলে তিনটি বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়: (১) জ্ঞাত বস্তুর ধারণা[2] বা সম্প্রত্যয় (২) তাহা যে বর্ত্তমানে বিদ্যমান, এই নিশ্চিত জ্ঞান ও তাহাতে অপরিহার্য্য বিশ্বাস, এবং (৩) এই নিশ্চিত জ্ঞান এবং বিশ্বাস অব্যবহিত, তাহাতে যুক্তির বা অনুমানের কোনও ক্রিয়া নাই।

রীড "প্রকৃতির ভাষার" কথা বলিয়াছেন। শব্দ আমাদের মনের ভাব-প্রকাশক চিহ্নমাত্র। আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা সংবেদন বাহ্য বস্তুর চিহ্ন; তাহারা প্রকৃতির ভাষার শব্দ। তাহারা বাহ্য বস্তুর ইঙ্গিত করে, এবং তাহাদিগকে মনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহাদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করে। এই সকল ইঙ্গিত বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি নহে, চিহ্ন মাত্র। কিন্তু বস্তু ও মনের মধ্যে এই চিহ্নের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া রীড তাঁহার অব্যবহিত জ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। দ্রব্যের প্রতিরূপ প্রত্যয় ও রীডের চিহ্নের

[1] Immediately. [2] Conception.

মধ্যে প্রভেদ কি ? এই চিহ্নের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তিনি বাহ্য বস্তু ও মনের মধ্যে তৃতীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

"সাধারণ জ্ঞান" বস্তুটি কি ? রীড কখনও কখনও "উত্তম জ্ঞান"[1] অথবা বিজ্ঞতা অর্থে এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এই জ্ঞান যে সকলের নাই, তাহা অস্বীকার্য্য। আবার কোনও প্রতিজ্ঞা মনের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার যে ক্ষমতা, প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে আছে, তাহা বুঝাইতেও রীড় এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এই Common Sense কি সকলের মধ্যেই একরূপ ? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সাধারণ ব্যাপারেও এত মতভেদ দেখা যাইত না।

রীড় মানুষের মনের মধ্যে কতকগুলি নিয়ত ও অবশ্যক সত্য আছে বলেন। এই সকল সত্য আমাদের মানসিক গঠনের অংশ এবং প্রত্যেক সুস্থমনা ব্যক্তিই তাহাদিগের সত্যতা স্বীকার করে। ন্যায়ের কোন্ যুক্তিবলে আমরা এই সকল সত্যের সত্যতা স্বীকার করি, তাহা বলা অসম্ভব। তাহারা যুক্তির রাজ্যের বাহিরে, "Common Sense"এর মধ্যে, সর্ব্বমানব-সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে, অবস্থিত। আমাদের মনঃ যে ভাবে গঠিত, তাহার ফলেই এই সকল সত্যের অব্যবহিত জ্ঞান হয়। তাহারা যে সত্য, তাহা প্রমাণ করা অসম্ভব। সমস্ত প্রমাণের তাহারাই ভিত্তি। এই সাধারণ জ্ঞানের তত্ত্বসকল রীড দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) অবশ্যক সত্যের তত্ত্ব ও (২) আগন্তুক সত্যের তত্ত্ব। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আছে: (১) যাহাই আমাদের সংবিদের মধ্যে আবির্ভূত হয়, তাহার অস্তিত্ব, নিজের অভিন্নতা, অথবা আত্মস্মৃতি,[2] (২) দ্রব্যসকল যে রূপে আমাদের নিকট প্রতীত হয়, তাহারা সেইরূপ এই জ্ঞান, (৩) ইচ্ছার স্বাধীনতা, (৪) অন্যান্য লোক এবং তাহাদের বুদ্ধির অস্তিত্ব এবং (৫) প্রকৃতির একরূপতা। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আছে (১) সকল গণিতের সত্য, এবং ন্যায়ের যুক্তিতে যাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা, (২) সকল নৈতিক ও তাত্ত্বিক সত্য, যেমন যাহার অস্তিত্বের আরম্ভ আছে, তাহার কারণ আছে, কার্য্যের প্রকৃতি হইতে কারণে উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। রীড বলেন, প্রত্যেক প্রত্যক্ষ প্রতীতির মধ্যে একটী বিচার আছে, যেমন ইহা এই বস্তু, অন্যবস্তু নহে, এই প্রকার জ্ঞান (সংকল্প)। এই প্রকার বিচারের সমবায়ই জ্ঞান, এবং ইহার সহিত প্রত্যক্ষকারী বিষয়ীর, এবং প্রত্যক্ষকৃত বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস জড়িত থাকে।

(২)

ডুগাল্ড্ স্টুয়ার্ট (১৭৫৩-১৮২৮)

ডুগাল্ড্ স্টুয়ার্ট এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। The Elements of the Philosophy of the Human Mind. তাঁহার প্রধান গ্রন্থ।

স্টুয়ার্ট বুদ্ধিতে যে সকল শক্তি আছে, তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে শ্রেণী-বিভাগ ভাল হয় নাই। "আত্মসংবিদ"কে তিনি মনের একটি স্বতন্ত্র গুণ

[1] Good Sense. [2] Personal identity.

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু কোনও শ্রেণীর মধ্যে "প্রজ্ঞার" স্থান নির্দ্দেশ করেন নাই। Common Sense শব্দের ব্যবহার না করিয়া তিনি তাহার স্থানে "বিশ্বাসের মৌলিক নিয়ম" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

স্টুয়ার্ট "স্মৃতিশক্তি" ও প্রত্যয়ের সংহতির[1] বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধেরও তিনি আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা বহুল পরিমাণে হিউমের মত-দ্বারা প্রভাবিত। ক্যাণ্ট-সম্বন্ধে স্টুয়ার্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, ক্যাণ্টের গ্রন্থের সহিত পরিচয়ের অভাববশতঃই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে।

দেশে সংশয়বাদের প্রবল স্রোতঃ রুদ্ধ করিতে রীড ও স্টুয়ার্টের দর্শন বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। তাঁহাদের দর্শনের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক। কিন্তু মনের বৃত্তিদিগের এবং মানুষের মৌলিক নিশ্চিত জ্ঞানসমূহের অনুসন্ধানদ্বারা তাঁহারা দর্শনের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। অবশ্যক ও সার্ব্বিক সত্যের আবিষ্কারের জন্য তাঁহারা মনের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। এই বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গ হয় নাই, ইহা সত্য। কিন্তু মনের মধ্যে যে কতকগুলি চরম সত্য আছে, যাহা অন্য কোনও উৎস হইতে উদ্ভূত হয় না, তাহা তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কষ্টিপাথরদ্বারা এই সকল সত্যের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন নাই। এই সকল সত্য কি, তৎসম্বন্ধেও মতভেদের অবকাশ আছে। অনেক সময় ইহাদের নির্দ্ধারণের কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদিগকে যুক্তিদ্বারা এক সূত্রে গ্রথিত করিবার কোনও প্রচেষ্টারও পরিচয় পাওয়া যায় না। Common Sense হইতে বিষয় ও বিষয়ী, উভয়ের অস্তিত্বের নিশ্চিতিই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তাহার সমাধানের কোনও চেষ্টা এই দর্শনে নাই। "সাধারণ জ্ঞান" দ্বারা বিষয়ী ও বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় বলিলেই, এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় না।

(৩)

সার উইলিয়ম হ্যামিল্টন্

বৃটেনের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের অন্যতম সার উইলিয়ম হ্যামিল্টনের জন্ম হয় ১৭৮৮ সালে। তিনি প্রথমে স্কটল্যাণ্ডে, পরে অক্স্ফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। সাহিত্য, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও আইনে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি আইনের ব্যবসায় আরম্ভ করেন, পরে ১৮২১ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন, এবং ১৮৩৭ সালে তত্ত্ব-বিদ্যা ও ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক পদ প্রাপ্ত হন। সাহিত্য, শিক্ষা ও দর্শন-সম্বন্ধে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যা-সম্বন্ধীয় তাঁহার বক্তৃতাবলী অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

এডিনবরা রিভিউ পত্রিকায় Philosophy of the Conditioned শীর্ষক এক

[1] Association of ideas.

প্রবন্ধ লিখিয়া হ্যামিল্টন্ খ্যাতি লাভ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি কুঁজ্যা ও তাঁহার গুরু শেলিংএর অসঙ্গবাদ[1] খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রতিবন্ধদিগের[2] আবিষ্কার করা অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তি কিসের উপর নির্ভর করে, তাহার আবিষ্কার করা। সুতরাং মনঃই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মানসিক ব্যাপারদিগকে হ্যামিল্টন্ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) জ্ঞান, (২) অনুভূতি ও (৩) কৃতি।[3] ইচ্ছা ও কামনা কৃতির অন্তর্গত। হ্যামিল্টনের মতে যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা প্রতিভাসমাত্র, এবং জড় ও মনের জ্ঞান তাহাদের প্রাতিভাসিক অবস্থারই জ্ঞান। কোন বিষয় চিন্তা করার অর্থ হইতেছে সেই বিষয়কে অপর বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ভাবে চিন্তা করা।[4] সুতরাং অসঙ্গের[5] চিন্তা করা সম্ভবপর নহে। যাহার সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই, সেই-স্ব-গত বস্তুর কোনও জ্ঞানই আমাদের হয় না। কিন্তু এতাদৃশ বস্তুর যে অস্তিত্ব নাই, তাহা নহে। হ্যামিল্টন্ "প্রাকৃতিক বস্তুবাদী।"[6] স্ব-গত বস্তুর অস্তিত্ব থাকিলেও, আমরা জানিতে পারি কেবল বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ, বস্তুকে জানিতে পারি না। আমাদের সকল জ্ঞানই সম্বন্ধের জ্ঞান, সম্বন্ধের অতীত বস্তুর—অসম্বদ্ধ ও অপ্রতিবদ্ধ বস্তুর—কোনও জ্ঞানই আমাদের হইতে পারে না। সম্বন্ধের মধ্যে আনিয়া বস্তুকে সীমাবদ্ধ করাই চিন্তার মৌলিক নিয়ম। কিন্তু সম্বন্ধের অতীত বস্তু স্বরূপে অজ্ঞেয় হইলেও, যুক্তির অগম্য হইলেও, তাহার মধ্যে কোনও স্ব-বিরোধ নাই। আমাদের মানসিক বুত্তি যে জ্ঞান আমাদিগকে দিতে পারে না, প্রত্যাদেশ হইতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই আপেক্ষিকতাবাদ[7] অনুসারে আত্মা[8] ও অনাত্মা[9] অজ্ঞেয় হইলেও, হ্যামিল্টনের মতে, আমাদের মনের মধ্যে যে সকল পরিবর্তন অনবরত সংঘটিত হয়, সেই পরিবর্তনরাজির মধ্যে আমরা একটা একত্ব অনুভব করি, একটা একত্বের সূত্রে সমস্ত পরিবর্তন গ্রথিত থাকে, ইহা বোধ করি। এই একই আত্মা। বাহ্য জগতের অভিজ্ঞতা হইতেও বাহ্য জগৎকে একটা স্থায়ী দ্রব্য বলিয়া আমরা অনুভব করি।

A. W. Benn লিখিয়াছেন "মর্ত্ত্য মানব-কর্তৃক দর্শন-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে, হ্যামিল্টন্ তাহা সমস্তই পড়িয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। কিন্তু স্পষ্টতঃই তিনি হেগেলের গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। কেন না তিনি যে কার্য্য অসম্ভব বলিয়াছেন (অসঙ্গের চিন্তা) হেগেল তাহা সম্পাদন করিয়াছেন।"

ক্যাণ্টের দর্শন হ্যামিল্টন্ ভালভাবে পাঠ করেন নাই। সেই দর্শনের যতটুকু জ্ঞান তাঁহার, ছিল, তাহার সাহায্যে তিনি তাঁহার মত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার আপেক্ষিকতাবাদ পরে হাক্স্‌লি ও টিণ্ডালের অজ্ঞেয়বাদে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

---

[1] Absolutism. [2] Condition. [3] Conation.
[4] To think is to condition. [5] Absolute. [6] Natural Realist.
[7] Relativity of knowledge. [8] Self. [9] Not self.

(৪)

ম্যানসেল

ম্যানসেল হ্যামিল্‌টনের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার The Limits of Religious Thought (ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিন্তার সীমা) বক্তৃতায় তিনি প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মের সমর্থনে হ্যামিল্‌টনের মতের ব্যবহার করিয়াছিলেন। সম্বন্ধবর্জ্জিত কোনও কিছুর জ্ঞান যখন অসম্ভব, তখন ধর্ম্মসম্বন্ধে কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করা চলে না, এবং বাইবেলে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও অবিশ্বাস্য বলিয়া বর্জন করা যায় না। যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা নেতিবাচক—তিনি কি নহেন, তাহার জ্ঞান, তাঁহার স্বরূপের জ্ঞান নহে। তাঁহার স্বরূপের জ্ঞানের জন্য আপ্ত বচনের প্রয়োজন।

ম্যানসেলের যুক্তির কোনও সারবত্তা নাই। হার্বার্ট স্পেনসার ও হাক্‌স্‌লির অজ্ঞেয়বাদ গ্রহণের জন্য ইহার ফলে লোকের মনঃ প্রস্তুত হইয়াছিল।

(৫)

জেম্‌স্‌ ফেরিয়ার (১৮০৮-১৮৬৪)

জেম্‌স্‌ ফেরিয়ার জাতিতে স্কট্ হইলেও স্কটিশ দর্শনের বিরুদ্ধ-বাদী ছিলেন। হেগেলের দর্শন তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, এবং জার্ম্মাণ অধ্যাত্ম-বাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। হ্যামিলটন ও ম্যানসেলের জ্ঞানের আপেক্ষিকতাবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। হ্যামিলটন বলিয়াছিলেন, যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাই জ্ঞান। সুতরাং মনঃ এবং জড়ের সমস্ত ধর্ম্মই আমাদের নিকট সম্বন্ধ-রূপেই জ্ঞাত হয়। সম্বন্ধের বাহিরে কিছুই আমরা জানিনা, অর্থাৎ কোনও বস্তু স্বরূপতঃ কি, অন্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ-বর্জ্জিত অবস্থায় তাহার স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞানই নাই। জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য বুদ্ধির যে বৃত্তি আছে, তাহাদ্বারা ভিন্ন কোনও জ্ঞানই লাভ করা যায় না। এই বৃত্তির সহিত বস্তুর যে সম্বন্ধ, তাহাদ্বারাই সেই বস্তুর জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং কোনও বস্তুর স্বরূপ-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। ঐশ্বরিক বুদ্ধিও জ্ঞেয় বিষয়কে বিষয়রূপেই জানে, সেখানেও সে জ্ঞান বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধের অতিরিক্ত কিছু নহে। কিন্তু ফেরিয়ার বলেন, যাহা কখনই কোনও বুদ্ধিরই বিষয় হইতে পারে না, তাহা কোনও অজ্ঞাত বা গুপ্ত বস্তু নহে, তাহা স্ব-বিরোধের নামান্তর। তাহার কোনও অর্থই নাই। যাহা অসম্ভব, তাহা করিতে না-পারাই "জ্ঞানের আপেক্ষিকতা"-বাদ-অনুসারে যাবতীয় জ্ঞানের ত্রুটি। এই ত্রুটিকে ত্রুটি বলিয়া গণ্য করা যায় না।*

* Vide Scottish Philosophy by Pringle Pattison Pp. 164-196.

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফরাসী দেশে জ্ঞানালোক

ইংলণ্ড হইতে জ্ঞানালোক ফরাসী দেশে বিস্তৃত হইলেও, বহু মনস্বীর আবির্ভাবে তথায় ইহার প্রসার বিস্তৃততর এবং ফলও ভিন্ন হইয়াছিল। ইংলণ্ডে জ্ঞানালোক বিস্তৃতির ফলে লোকের মনের বিস্তার সাধিত হইলেও, তথায় ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু ফ্রান্সে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্ট হইয়াছিল, যাজকদিগের ক্ষমতার ধ্বংস করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন আরব্ধ হইয়্যছিল, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ল্যেকের মনোভাব এতই বিষাক্ত হইয়াছিল, যে তাহা হইতে ভীষণ বিপ্লবের উদ্ভব হইয়াছিল এবং ফ্রান্সের রাজ-সিংহাসন বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থাই ইহার কারণ। প্রজা সাধারণের স্বাধীনতা বলিয়া ফ্রান্সে কিছু ছিল না। চার্চ্চের বিরোধী কোনও মত কেহ প্রচার করিলে বলপ্রয়োগে তাহা দমন করা হইত। দরিদ্রদিগের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। রাজ-শক্তি যথেচ্ছাচারী, যাজকগণ কদাচারী, সমাজ ব্যভিচারে কলঙ্কিত। এই ছিল তখনকার ফ্রান্সের অবস্থা। জ্ঞানচর্চ্চা যখন আরব্ধ হইল, তখন প্রাচীন যাবতীয় প্রথা এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল; যাহাই যুক্তিহীন বলিয়া বিবেচিত হইল, তাহারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত হইল। এই জন্য এই যুগের দর্শনকে "জ্ঞানালোক" দর্শন বলা হয়। ধর্ম্মীয় ও রাজনৈতিক সমস্ত বন্ধন হইতে মানবচিন্তাকে মুক্ত করিবার চেষ্টাই এই যুগের বিশেষত্ব। এই যুগের চিন্তা-নায়ক দিগের মধ্যে ছিলেন (১) মোঁতেস্‌কিউ, (২) কোঁদিয়াক্, (৩) হেলভেটিয়াস্, (৪) ভল্‌টেয়ার, (৫) ডিডেরা, (৬) লা মেত্রী, (৭) দালেম্বার্ট, (৮) টারগো, (৯) হলব্যাক প্রভৃতি। ইহাঁরা সকলেই বিশেষাধিকারভোগী শ্রেণীদিগের বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ লোকের ঘৃণা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিয়া, মানবীয় অধিকারের দাবী করিতে সকলকে উদ্বোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে জগদতীত ঈশ্বরবাদ-সম্বন্ধীয় আলোচনা পণ্ডিতদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ফ্রান্সে এই আন্দোলন সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং প্রথমে ইহা কু-সংস্কার ও মানসিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইলেও, পরে ইহা নাস্তিকতা ও জড়বাদে পর্য্যবসিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্ঞানালোকের বহুল প্রসার হইলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেও ফরাসী দেশে বহু পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু যুক্তিবাদের সমর্থন করিলেও তাঁহারা ধর্ম্ম ও সমাজে বিপ্লবমূলক কিছুরই প্রচার করেন নাই।

(১)

পাস্কাল

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পাস্কাল সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গণিত ও বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম্ম ও কর্ম্মনীতি-সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, যদিও তাঁহার ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে চার্চ্চের সন্দেহ ছিল।

(২)

বসুএ (১৬২৭-১৭০৪)

বসুএ মো-নগরের বিশপ ছিলেন। খৃষ্টকে ঈশ্বরের অবতার এবং বাইবেলকে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিলেও, তিনি যুক্তির অনুসরণের বিরোধী ছিলেন না। তাঁহার প্রতিভা ছিল অসাধারণ এবং রচনাশৈলী অনিন্দনীয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের তিনি অন্যতম ছিলেন।

বসুএর প্রধান তিনখানি গ্রন্থের নাম—Connoisance de Dieu et de Soimeme (ঈশ্বরের এবং অহমের জ্ঞান), Discours Sur l' Histoire Universelle (ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবন্ধ) এবং Politique Tiree de l' Ecriture Sainte (পবিত্র ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রনীতি। মানবের চিন্তার ইতিহাসে এই তিনখানি গ্রন্থের স্থান অতি উচ্চে। এই তিন গ্রন্থে ধর্ম্ম, ইতিহাস এবং রাজনীতি আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনায় বসুএ যুক্তিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। যুক্তির অনুসরণ করিয়াই তিনি প্রত্যাদেশে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "আমাদিগকে পথ দেখাইবার জন্যই ঈশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধির আলোক দান করিয়াছেন।" এই বুদ্ধির আলোক আত্মা, বিচার-শক্তি ও ধর্ম্মবিবেক, এই তিন বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও, পাপ এবং ভ্রান্তি হইতে মানুষকে রক্ষা করা এবং সত্যের পথে পরিচালিত করাই ইহার কাজ। "প্রজ্ঞা যখন প্রবল চিন্তাবেগ-কর্ত্তৃক বিপথে চালিত না হয়, তখন তাহার নির্দেশ অভ্রান্ত।" রেণা বলিয়াছেন, "বসুএর মধ্যে মিষ্টিক ভাব থাকিলেও, তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন।" খৃষ্টধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হইলেও বসুএর রচনা ভ্রান্তি-নিরসন এবং বন্ধন-মুক্তির সহায়ক ছিল।

বসুএ তাঁহার "ঈশ্বর ও অহমের জ্ঞান" গ্রন্থে ইতর জীবদিগকে স্বতশ্চল যন্ত্র[1] বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাহাদের বুদ্ধি ও সুখ-দুঃখ বোধ নাই বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইতর জীবের যাবতীয় কার্য্য যান্ত্রিক নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়। বসুএর পূর্ব্বে দে-কার্তও এই কথা বলিয়াছিলেন। বাইবেলে আছে, যে ইভের পাপের ফলেই জগতে মৃত্যু প্রবেশ করে। কিন্তু পাপ করিল মানুষ, আর তাহার জন্য শাস্তি পাইল সমগ্র জীব-জগৎ ; ইহা অন্যায় বলিয়া প্রতীত হয়। ইহা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে জগতের শাসন-কার্য্যে যুক্তি এবং ন্যায়

[1] Automaton.

বিচারের স্থান নাই, বলিতে হয়। এই আপত্তি-খণ্ডনের জন্তে অনেকে দে-কার্ত্তের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতর জগতের যদি বোধশক্তিই না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি সুবিচার অবিচারের কথা উঠিতে পারে না। বয়্‌এ অতি বিস্তারিত ভাবে যুক্তিদ্বারা তাঁহার মীমাংসা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার কোনও মূল্য নাই।*

(৩)

ফোঁত্‌নেল

বয়্‌এর যশঃ যখন চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, চতুর্দশ লুইএর ক্ষমতা যখন মধ্যাহ্ন গগনে উপনীত হইয়াছিল, তখন ফোঁৎনেলের আবির্ভাব হয়। ১৬৫৭ সালে রুাউএন নগরে ফোঁৎনেলের জন্ম হয়। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহার জীবনের অর্দ্ধভাগ অতিবাহিত হইলেও তাঁহার চিন্তা অষ্টাদশ শতাব্দীরই অনুরূপ! বয়্‌এর চিন্তা ছিল গঠনমূলক, ফোঁৎনেলের ধ্বংসাত্মক। সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মানুষের চিন্তাকে মুক্ত করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তাঁহাকে ফরাসী বিদ্রোহের অগ্রদূত বলা হইয়া থাকে। সত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল না। তাঁহার চিন্তার মধ্যেও বিশেষ গভীরতা নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তা-নায়কদিগের মধ্যে তাঁহাকে গণ্য করা যায় না। জ্ঞানের জন্ত সামান্ত কৌতূহল এবং আরাম-প্রিয়তা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। সামান্ত-পরিমাণ কবিত্ব শক্তি, এবং হাস্তরসাত্মক প্রবন্ধ রচনার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। বিজ্ঞানের দিকেও একটু ঝোঁক ছিল। কিন্তু কোনও বিষয়েই গভীরতা ছিল না। বেইল, ভল্‌টেয়ার এবং সেই যুগের নেতৃস্থানীয় আরও অনেকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে তিনি কিছু লিখিতেন না, কিন্তু তাঁহার রচনার মধ্যে যে সংশয়ের সুর ধ্বনিত হইত, তাহাদ্বারা এবং ইঙ্গিতদ্বারা তিনি খৃষ্টধর্ম্মের ভিত্তি শিথিল করিতে চেষ্টা করিতেন। পারী নগরে একটি ক্ষুদ্র গৃহে বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া ফোঁৎনেল সেখান হইতে অবিশ্বাস এবং যথেচ্ছাচারের বীজ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিতেন। এই গৃহ অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের শৈশবশয্যা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

(৪)

পিএর বেইল্

Historical and Critical Dictionaryর রচয়িতা পিএর বেইল জন্মিয়াছিলেন ১৬৪৭ সালে। ১৬ খণ্ডে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। নানাবিষয়ের প্রবন্ধ ইহাতে

* Vide Study of Religion. Vol. II. P. 58-63, by Martineau.

সন্নিবেশিত হইত। যাজকদিগের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবার সমস্ত যুক্তি তাহাদের মধ্যে থাকিত। বেইলের পিতা ছিলেন, ক্যাল্‌ভিন সম্প্রদায়ের যাজক। বেইল্ সেই সম্প্রদায় বর্জন করিয়া রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আন্তরিকতা-সম্বন্ধে যাজকদিগের সন্দেহ জন্মে বলিয়া তিনি পৈত্রিক ধর্ম্মে ফিরিয়া আসেন। ইহার পরে তিনি সেডান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার চিন্তার মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল না। তাঁহার সাহিত্যিক রচনায় তিনি যাজকদিগের পরমতাসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকিলেও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া অসম্ভব নহে।

(৫)

মোঁতেস্‌কিউ

১৮৬৪ সালে মোঁতেস্‌কিউর জন্ম হয়। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ Letteıs Persanesএ তিনি সমসাময়িক সমাজের শ্লেষাত্মক বর্ণনা করিয়া ষোড়শ লুইএর ব্যভিচার-পূর্ণ রাজত্বের উপর কষাঘাত করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে গমন করিয়া মোঁতেস্‌কিউ লকের রাজনৈতিক রচনাবলী পাঠ করেন, এবং পার্লিয়ামেন্টের কার্য্যপ্রণালী মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করেন। ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার জ্ঞান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "রোমের উন্নতি ও পতনের কারণে" তিনি রোমের ইতিহাসের আরম্ভ হইতে কনষ্টান্টিনোপলের পতন পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। Spirit of Laws তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ২০ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ১৭৪৮ সালে তিনি এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থ "ব্যবহারশাস্ত্রের দর্শন" সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক গ্রন্থ। "Spirit of Laws" শব্দের অর্থ আইনের অন্তঃস্থ সার অথবা যুক্তি। যে যুক্তি কোনও আইনে রূপায়িত, তাহাই তাহার Spirit বা আত্মা। কোনও জাতির চরিত্রের এবং দেশের ও জলবায়ুর যে যে বিশেষত্ব-কর্ত্তৃক সেই জাতির আইনের রূপ ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাই সেই আইনের Spirit। যে যে কারণে আইনসকল তাহাদের নির্দ্দিষ্টরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণের চরিত্রে, এবং দেশের মাটি ও জলবায়ুর মধ্যে অবস্থিত যে যে কারণদ্বারা আইনের রূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা এই গ্রন্থে আছে। এক জাতির পক্ষে যে আইন উপকারী, অন্য জাতির পক্ষে তাহা অনুপযোগী হইতে পারে। স্পিনোজা ও হবস্ বলিয়াছেন, যে রাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্ব্বে আইনের সৃষ্টি হয় না। মোঁতেস্‌কিউ তাহা স্বীকার করেন নাই। ন্যায় ও সুবিচারের মৌলিক তত্ত্বসকল তাঁহার মতে রাষ্ট্রগঠনের পূর্ব্ববর্ত্তী। মানুষের যে সহজাত সংস্কারবশতঃ তাহারা পরস্পর মিলিত হইতে বাধ্য হয়, তাহার মধ্যে এই তত্ত্বদ্বয়ের মূল নিহিত। ইংরেজ শাসনতন্ত্রের বিশ্লেষণ করিয়া তিনি তাহাকে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন। প্রাকৃতিক অবস্থার পরেই জাতির জীবনে ধর্ম্মের স্থান। ধর্ম্ম

অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। রাষ্ট্রের কার্য্যের পূর্ণতাসাধনের পক্ষে খৃষ্টধর্ম্মের মত অন্য কোনও ধর্ম্ম নহে। ইয়োরোপের রাজনৈতিক ও আইনবিষয়ক চিন্তার উপরে এই গ্রন্থের প্রভাব অত্যধিক। কিন্তু দেশে বিদেশে সমাদরে গৃহীত হইলেও, লোকের মনে যে অসন্তোষ এবং বিদ্রোহের প্রবৃত্তি অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই গ্রন্থদ্বারা তাহার গতিরোধ করা সম্ভবপর হয় নাই।

মোঁতেস্কিউর গ্রন্থসম্বন্ধে সার হেনরি মেইন লিখিয়াছেন, যে এই গ্রন্থে বহুসংখ্যক উদাহরণ এমন ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে, যে যে সকল প্রথা ও প্রতিষ্ঠান তাহাদের কুৎসিত রূপ, নূতনত্ব এবং অশ্লীলতাদ্বারা সভ্য মানব-মনঃ বিস্ময়ে অভিভূত করিতে সমর্থ, তাহাদিগকেই বিশেষ গুরুত্ব দান করা হইয়াছে। এই সকল উদাহরণ হইতে অনুমিত হইতে পারে, যে যাহা হইতে প্রত্যেক দেশের আইন তাহার বিশিষ্টরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতেছে প্রত্যেক দেশের বিশিষ্ট জলবায়ু, তাহার ভৌগোলিক সংস্থান এবং প্রবঞ্চনা; অথবা সেই বিশিষ্টতা আপতিকও হইতে পারে। কিন্তু যে কারণ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে বর্ত্তমান, মোঁতেস্কিউ তাহার উল্লেখ করেন নাই। তিনি মানব-প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ নমনীয় এবং নিষ্ক্রিয় বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস বাহিরের প্রভাবদ্বারাই তাহা সম্পূর্ণ পরিচালিত হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে যে একটি স্থায়ী অংশ আছে, যাহা সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না, যাহা বংশানুক্রমে পিতা হইতে পুত্রে সংক্রমিত হয়, প্রত্যেক জাতির উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সেই অংশের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই। ইহা তাঁহার উদ্‌ভাবিত মতের একটি প্রধান দোষ।*

লকের রাজনৈতিক মতের প্রভাব মোঁতেস্কিউর গ্রন্থের উপরে সুস্পষ্ট।

(৬)

কোঁদিয়াক (১৭১৫-১৭৮০)

ইংলণ্ডে লকের প্রত্যক্ষবাদ সম্পূর্ণ জড়বাদ ও নিরীশ্বরবাদে পরিণত হয় নাই। হিউমের সংশয়বাদ আবির্ভূত হইবার পরেই তাহার প্রতিবাদে স্কটিশ দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল। লকের প্রত্যক্ষবাদ চরম সংবেদনবাদ ও জড়বাদে পরিণত হইয়াছিল ফ্রান্সে। ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে লোকে এইমত গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল।

লক্ বলিয়াছিলেন সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয়। অভিজ্ঞতা দ্বিবিধ, বাহ্য ইন্দ্রিয়-জাত এবং অন্তরিন্দ্রিয়-জাত। কোঁদিয়াক জ্ঞানের এই দ্বিবিধ উৎসের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখিতে পান নাই। তাঁহার মতে বাহ্য ইন্দ্রিয় হইতে ও অন্তরিন্দ্রিয় হইতে

* Maine's Ancient Law P. 68-69 (Everyman's Library).

একই প্রকার অনুভূতি উৎপন্ন হয়। বাহ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং অন্তরিন্দ্রিয়ানুভূতি উভয়েই সংবেদন, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছু নাই।

কোঁদিয়াক ১৭১৫ সালে ফ্রান্স দেশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি লকের মতাবলম্বী ছিলেন, পরে নিজেই স্বতন্ত্র এক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার রচনা ২৩ খণ্ডে বিভক্ত। তাহাতে নৈতিক জীবন এবং ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ লক্ষিত হয়।

Traite de System গ্রন্থে কোঁদিয়াক স্পিনোজার মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। লাইবনিট্জ অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই বলিয়া তাঁহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি Traite des Sensations এবং Traite des Animaux গ্রন্থে লকের সহিত তাঁহার মতের পার্থক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

কোঁদিয়াক বলিয়াছেন, লক্ জ্ঞানের যে দুইটি উৎসের কথা বলিয়াছেন, সংবেদন এবং অন্তর্দৃষ্টি, উভয়ই এক, উভয়ই ইন্দ্রিয়ানুভূতি। আমাদের মনের যাবতীয় অবস্থা, আমাদের ইচ্ছা ও প্রত্যয়, সকলই সংবেদন ভিন্ন আর কিছুই নহে। লক যাহাকে অন্তর্দৃষ্টি বলিয়াছেন, তাহাও সংবেদন, যৌগিক প্রত্যয়ও সংবেদন। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোঁদিয়াক একটি রক্তমাংসগঠিত কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্জিত মানুষের কল্পনা করিয়াছেন। এই মানুষের মনের মধ্যে প্রথমে কোনও প্রত্যয়, ইচ্ছা, সংবেদন প্রভৃতি কোনও মানসিক অবস্থাই ছিল না। পরে এক এক করিয়া এক একটি ইন্দ্রিয় জাগরিত হইতে আরম্ভ করিল। তখন তাহার মনে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এক এক করিয়া সকল প্রত্যয় উদ্ভূত হইতে লাগিল। অবশেষে সে সম্পূর্ণ মানুষে পরিণত হইল। মানুষের সমস্ত জ্ঞান, তাহার কর্ম্মের সমস্ত প্রবর্ত্তনা, বাহ্যেন্দ্রিয়ের অনুভূতি হইতে উৎপন্ন হয়। এই হিসাবে ইতর জন্তুর সহিত তাহার পার্থক্য নাই। সেইজন্য কোঁদিয়াক মানুষকে পূর্ণতা-প্রাপ্ত জীব এবং জন্তুদিগকে অপূর্ণ মানুষ বলিয়াছেন। কোঁদিয়াক ঈশ্বর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, আত্মাকেও জড় পদার্থ বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার দর্শন হইতে এই দুই মত বেশী দূরবর্ত্তী নহে। কেননা সত্য অথবা যাহারই অস্তিত্ব আছে, তাহা যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই হয়, তাহা হইলে যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কেবল তাহারই অস্তিত্ব আছে, এবং জড়বস্তু ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই, এই জড়বাদ স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে।

কোঁদিয়াকের মতে নৈতিক ভাল ও মন্দের জ্ঞানও সংবেদন হইতে উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক সংবেদনের সহিত সুখ অথবা দুঃখ যুক্ত থাকে, সেই জন্যই যাহা হইতে দুঃখ হয়, তাহা মন্দ বলিয়া পরিহার করিতে আমরা চেষ্টা করি।

আমাদের মনের কার্য্য "মনন" অথবা "চিন্তা"। কোঁদিয়াক বলেন "মনন" এবং অনুভূতি একই। কোথায় যে অনুভূতি শেষ হইয়া চিন্তার আরম্ভ হয় তাহা বলা অসম্ভব। এই মত পরে সংবেদনবাদে পরিণত হইয়াছিল।

কোঁদিয়াক চিন্তা ও ভাষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছেন। শব্দের সাহায্য ব্যতীত মানসিক শক্তির বিকাশ হওয়া অসম্ভব। চিন্তার অভিব্যক্তি ও ভাষার অভিব্যক্তি সমান্তরাল ভাবে সংঘটিত হইয়াছে। ভাষার সাহায্যেই নানা প্রত্যয়ের সংযোগ

সাধিত হয়, এবং এই খানেই পশু হইতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। পশুর ভাষা নাই, তাহার জীবন বর্ত্তমানে সীমাবদ্ধ, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের অনুভূতি লইয়াই তাহার জীবন। ইহার অধিক তাহার জীবনে কিছু নাই। তাহার অতীত অথবা ভবিষ্যতের কোনও বোধ নাই, কিন্তু মানুষ তাহার সংবেদন হইতে যৌগিক প্রত্যয়ের গঠন করিতে পারে, এবং শব্দের আকারে তাহা অন্যের নিকট প্রকাশিত করিতে পারে। ভাষার সাহায্যে অতীতের জ্ঞান বর্ত্তমানে এবং বর্ত্তমানের জ্ঞান ভবিষ্যতে নীত হয়।

কোঁদিয়াকের দর্শন জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। কর্ম্ম-নীতিতে তাহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন হেলভিটিয়াস।

(৭)

হেলভেটিয়াস্ (১৭১৫-৭১)

এড্রিয়ান হেলভেটিয়াস্ পারি নগরে ১৭১৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। চরিত্রের সাধুতা এবং অমায়িকতার জন্য তিনি লোকের প্রিয় পাত্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক মত ছিল তাঁহার চরিত্রের বিপরীত। তাঁহার De l'Espirit গ্রন্থের জন্য এবং জেসুইটদিগের সমালোচনা করিবার জন্য তাঁহাকে যাজকদিগের হস্তে গুরুতর উৎপীড়ন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

২৩ বৎসর বয়সে উচ্চ রাজ-পদে নিযুক্ত হইয়া আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিয়াও হেলভেটিয়াস কয়েক বৎসর পরেই পদত্যাগ করেন। এই পদে থাকিবার সময় তিনি দরিদ্রগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন, এবং তাহাদিগকে নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। লকের গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি তাঁহার দার্শনিক মত গঠন করেন।

হেলভেটিয়াসের মতে আত্মপ্রীতিই সমস্তকার্য্যের মূল। জ্ঞানচর্চ্চা ও বিদ্যানুরাগও আত্মপ্রীতি হইতে উদ্ভূত। শারীরিক সুখেই আত্মপ্রীতির সমাপ্তি। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ভিন্ন আমাদের শারীরিক ও মানসিক কার্য্যের অন্য কোনও প্রবর্ত্তক কারণ নাই।

আমাদের মনের মধ্যে যাহা কিছু আছে, প্রত্যয়, অনুভূতি ও ইচ্ছা, সকলই যখন ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের স্পর্শ হইতে উৎপন্ন, তাহাদের উৎপাদনে আমাদের কর্ত্তৃত্ব যখন কিছুই নাই, তখন মানুষে মানুষে যে পার্থক্য, তাহা ঘটনার উপর, এবং পরিবেশের উপর নির্ভর করে। কাহার স্বভাব কোন রকম হইবে, তাহা নির্ভর করে তাহার মনের মধ্যে বাহির হইতে কি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার উপর। সুতরাং চরিত্রগঠনে শিক্ষাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। শিশুদিগের শিক্ষা যত সত্বর আরম্ভ করা যায়, ততই ভাল।

জীবনের লক্ষ্য সুখ, সুতরাং সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। শারীরিক সুখকেই হেলভেটিয়াস জীবনের লক্ষ্য বলিয়াছেন।

সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহারই আমাদের সকল কর্ম্মের লক্ষ্য। যখন অপরের উপকার করিতে আমরা অগ্রসর হই, তখনও ইহাই আমাদের লক্ষ্য। আত্মপ্রীতি এবং সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনই সকল শিক্ষার ও সকল আইনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভাল বলিয়াই ভাল কাজ করিবে, লোকের নিকট ইহা আশাকরা অসঙ্গত। ইহা মানুষের ক্ষমতার অতীত। সুতরাং সুনীতিকে যদি ফলপ্রসূ করিতে হয়, তাহা হইলে সকল কর্ম্মের মূল তত্ত্বকেই সুনীতিরও মূলতত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে, এবং স্বার্থ ও সুখকেই সুনীতির ভিত্তি করিতে হইবে। যিনি অন্যের স্বার্থের হানি না করিয়া নিজের স্বার্থের অনুসরণ করেন, তিনিই ভাল লোক। চিত্তের আবেগের সম্পূর্ণ বিনাশ-সাধন করিলে মানুষ পশুতে পরিণত হয়। চিত্তের আবেগের দ্বারা আত্মার সম্পদ-বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহাদিগের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। প্রত্যেকেই যাহাতে আর্থিক ব্যাপারে স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে, এবং মুষ্টিমেয়-সংখ্যক লোকে অপরের পরিশ্রমলব্ধ ফল আত্মসাৎ করিয়া ধনী না হইতে পারে, তাহার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রের অন্তর্ভূত জনগণের স্বার্থপর প্রবৃত্তির কথা চিন্তা করিয়া এইরকম আইন প্রণয়ন করা উচিত, যে পুরস্কারের লোভে এবং শাস্তির ভয়ে সকলে আইনানুসারে চলে, এবং আইনদ্বারা রাষ্ট্রের অধিকাংশের মঙ্গল সাধিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই, যাহাতে রাষ্ট্রের জনগণের মঙ্গল হয়, তাহাই কর্ত্তব্য, যাহাতে অমঙ্গল হয়, তাহা বর্জ্জনীয়। হেলভেটিয়াসের দর্শনে ঈশ্বরের কোনও স্থান নাই।

হেলভিটিয়াসের দর্শন হব্স্, লক্, হিউম এবং মোঁতেস্কিউর দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠীত।

(৮)

ডিডেরো ও বিশ্বকোষ

উপরি উক্ত লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী ছিলেন। তাঁহাদের দর্শনে নিরীশ্বরবাদ প্রচারিত হইলেও, প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করিবার বিশেষ প্রচেষ্টা তাহার মধ্যে ছিল না। তাহাদের পরে যাহাদের আবির্ভাব হইল, তাহাদের উদ্দেশ্যই ছিল রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মে যে অত্যাচার ও অনাচার ছিল, তাহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করিয়া তাহার উচ্ছেদের জন্য জনমতকে জাগরিত করা। এই কার্য্যে তাঁহাদের অনেকে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ডিডেরো, দালেম্বার্ট, হলব্যাক্, ভলটেয়ার প্রভৃতি এই লেখকদিগের মধ্যে ছিলেন। ১৭৫৭ সালে ডিডেরো ও দালেম্বার্ট মিলিত হইয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য একটি বিশ্বকোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নানা খণ্ডে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। চার্চ্চকর্ত্তৃক ইহার প্রথম কয়েক খণ্ড বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। চার্চ্চের বিরোধিতার ফলে প্রথমে যাঁহারা বিশ্বকোষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহাদের অনেকে ইহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। বহু

মনস্বীর রচনায় বিশ্বকোষ সমৃদ্ধ। বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, কলা, লোকব্যবহার, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি নানাবিষয়ে প্রবন্ধ ইহাতে থাকিত। এই পত্রিকা ফরাসী জনসাধারণের স্বাধীনতার সমর্থক ও দুর্নীতির প্রবল শত্রু ছিল। সকল বিপদ মাথায় করিয়া কুড়ি বৎসর যাবৎ ডিডেরো এই পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। একাধিক বার তাঁহাকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিবার ভয় দেখানো হইয়াছিল। ফলে ইহার পৃষ্ঠপোষকগণ এক এক করিয়া ইহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। কিন্তু ডিডেরো অটল অবিচলিত ছিলেন। সাহিত্যের যাবতীয় বিভাগেই তিনি লিখিতেন। উপন্যাস, নাটক, ব্যঙ্গরচনা কিছুই তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল না। সাহিত্য-রচনায় ভলটেয়ার ও রুসো তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক জ্ঞান তাহাদের অপেক্ষা অধিক ছিল। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস কি ছিল, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তাঁহার দার্শনিক মত ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রচনায় জগদতীত ঈশ্বরবাদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহার মত সর্ব্বেশ্বরবাদে পরিণতি লাভ করে। অবশেষে তাহা নিরীশ্বরবাদের সান্নিধ্যে উপনীত হয়। প্রথমে তিনি আত্মার অ-জড়ত্ব ও অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু শেষে প্রচার করিয়াছিলেন, যে কেবল গণই[1] টিকিয়া থাকে, গণের অন্তর্ভূত "ব্যক্তি" বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং অমরত্ব পরবর্ত্তী কালের লোকের স্মৃতিতে বর্ত্তমান থাকা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। জড়-বাদের চরম রূপ তিনি কখনও অবলম্বন করেন নাই। সুনীতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই তাঁহাকে তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

Interpretation de le Nature এবং দালেম্বর্টের সহিত কথোপকথনে ডিডেরো মানসিক যাবতীয় ক্রিয়াকেই মস্তিষ্কের ক্রিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, মানবের স্বাধীনতা এবং মানবাত্মার অমরতা অস্বীকার করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাহাদিগকে উপহাস করিয়াছিলেন।

ডিডেরো ভল্‌টেয়ার ও রূসো উভয়েরই বন্ধু ছিলেন।

লা মেত্‌রি (La Metrie) (১৭০৭-৫১)

লা মেত্রি সৈনিক বিভাগে চিকিৎসক ছিলেন। A Natural History of the Soul নামক গ্রন্থ লিখিয়া তিনি কর্ম্মচ্যুত হন, এবং Man a Machine লিখিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হন। নির্ব্বাসনে ফ্রেডারিক দি গ্রেট কর্ত্তৃক তিনি সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে জগৎ একটি বিরাট যন্ত্র, মানুষের আত্মা সেই যন্ত্রের একটা অংশ মাত্র। আত্মার স্বরূপ যাহাই হউক, জড় ও আত্মার মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বর্ত্তমান, একের বৃদ্ধিতে অন্যের বৃদ্ধি, একের ধ্বংসে অন্যের ধ্বংস হয়। আত্মা যদি বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র হয়, তাহা হইলে মনের উৎসাহের উদয় হইলে শরীর উত্তেজিত হয় কেন? শরীর অসুস্থ হইলেই বা মনের

[1] Genus.

ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় কেন ? এক মূল বীজ হইতে যাবতীয় দেহধারী জীবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। দেহ ও তাহার পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াই এই অভিব্যক্তির কারণ। উদ্ভিদের বুদ্ধি নাই, প্রাণীর আছে। ইহার কারণ প্রাণীকে আহারের আহরণে ঘুরিতে হয়; উদ্ভিদের খাদ্য তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। যাবতীয় জীবের মধ্যে মানুষের বুদ্ধি যে অধিক, ইহার কারণ মানুষের অভাব ও গতিশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যে সমস্ত জন্তুর অভাব নাই, তাহাদের মনঃও নাই। লা মেত্রি তাঁহার Man a Machine গ্রন্থে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে জড় পদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থের অস্তিত্ব নাই। মনঃ হয় জড় অথবা জড়ের সূক্ষ্ম অবস্থা।

লা মেত্রির মতে আত্মা বলিয়া কিছুই নাই। শারীরিক সুখই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিবার কোনও যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই। যতদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হয়, ততদিন মানুষের সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাসের ধ্বংস হইলে ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ হইবে না, ধর্ম্মবিজ্ঞানীরূপ ভীষণতম যোদ্ধগণ তখন অন্তর্হিত হইবে, যে পৃথিবীকে তাহারা বিষাক্ত করিয়াছে, তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। যাহাকে মানবের আত্মা বলা হয়, তাহা একটি শূন্য-গর্ভ নামমাত্র। যখন মস্তিষ্ক-অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখনই তাহার অর্থ হয়। মানুষের মস্তিষ্ক ইতর জীবের মস্তিষ্ক অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাবে ব্যবস্থিত বলিয়া, এবং মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বলিয়া, মানুষ ইতর জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। মানুষের মরণোত্তর অস্তিত্ব একটা অসম্ভব কথা। যাহাকে আত্মা বলা হয়, তাহা দেহেরই অংশ, এবং দেহের সঙ্গেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুতে সমস্তই শেষ হইয়া যায়। সুতরাং যতদিন পার, ভোগ কর। ভোগের কোনও সুযোগ পরিত্যাগ করিও না।

১৭৭০ সালে লণ্ডন হইতে System de la Nature (প্রকৃতির ব্যবস্থা) নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ফরাসী একাডেমীর সেক্রেটারী পরলোকগত মীরাবদ্ এর নাম এই গ্রন্থের লেখক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। ব্যারণ হল্ব্যাকের গৃহে যে সকল লেখক সমবেত হইতেন, গ্রন্থখানি যে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও লেখা, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ইহা হলব্যাক্ অথবা তাঁহার গৃহশিক্ষক লাগ্রাঞ্জ অথবা কয়েকজনের সমবেত চেষ্টার ফল। এই গ্রন্থে নাস্তিকতা ও জড়বাদের চরম রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।*

কোথায়ও জড়পদার্থ এবং গতি ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। জড় ও গতি অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। জড় বস্তু যখন চলিতে বাধা পায়, তখনই তাহা গতিহীন, কিন্তু স্বরূপতঃ গতিহীন ও নিশ্চল নহে। গতির দুই রূপ:—আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। অন্যান্য রূপ এই দুই রূপ হইতে উৎপন্ন। এই সমস্ত গতির সংযোগ হইতেই যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি হয়। যে সকল নিয়মানুসারে এই সকল ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহা শাশ্বত এবং অপরিবর্ত্তনীয়।

---

* Schwegler's History of philosophy Pp. 189-190

মানুষ জড় পদার্থ, জড় ও চিতের সংযোগে গঠিত নহে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, মানুষ যদি জড় পদার্থই হয়, তাহা হইলে যাহাকে মনঃ (চিৎ) বলা হয়, তাহা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়া থাকে, যে দার্শনিক বেষণাদ্বারা প্রমাণিত হয়, যে মানুষের মধ্যে যে পরিচালক তত্ত্ব, তাহা স্বরূপে দুর্বোধ্য হইলেও, তাহা অবিভাজ্য, বিস্ত রহীন এবং অদৃশ্য। কিন্তু নেতিবাচক বর্ণনাদ্বারা কোনও বস্তুর ধারণা করা যায় না। যাহাতে কোনও প্রত্যয়েরই আরোপ করা যায় না, তাহার ধারণা করাই অসম্ভব। পরন্তু মনঃ যদি জড় পদার্থ না হয়, তাহা হইলে জড় বস্তুর উপর তাহার ক্রিয়া কিরূপে সংঘটিত হয়? মনঃ ও জড়বস্তুর তো কোনও বিন্দুতেই সংস্পর্শ হইতে পারে না। বস্তুতঃ যাঁহারা আত্মাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাঁহারা তাহাদের মস্তিষ্কের কার্য্যকেই আত্মার কার্য্য বলিয়া মনে করেন। মস্তিষ্কের বিকারই চিন্তা; ইচ্ছাও মস্তিষ্কেরই বিকার। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসের মতো আর একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস মানুষের আছে। তাহা ঈশ্বরে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের মূলে আছে প্রকৃতির দ্বিবিধ রূপ-কল্পনা। মানুষ যে সকল দুঃখকষ্ট ভোগকরে, এবং প্রকৃতির মধ্যে যাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহার ব্যাখ্যার জন্য এক ঈশ্বরের কল্পনা করে। ভয়, দুঃখ ও অজ্ঞান, এই তিনটি হইতেই ঈশ্বরের ধারণার উদ্ভব হয়। আমরা ঈশ্বরের ভয়ে কাঁপি, কেন না, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও এই রকমই কাঁপিতেন। ইহা হইতে ঈশ্বর-সম্বন্ধে ভাল ধারণা হইবার কথা নয়। কিন্তু ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে স্থূল ধারণা আছে, তাহাই যে কেবল তুচ্ছ, তাহা নহে। ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের ঈশ্বরের ধারণাও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। তাহাও অসঙ্গতি-পূর্ণ। তাহাদ্বারা একটি প্রাকৃতিক ঘটনারও ব্যাখ্যা হয় না। ঈশ্বরে নৈতিক গুণের আরোপ করিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে মানুষে পরিণত করেন, কিন্তু তাঁহাতে কতকগুলি নেতি-বাচক গুণের আরোপ করিয়া, অন্যান্য পুরুষ হইতে তাঁহার পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন।

অজ্ঞান ও ভয় হইতে দেবতাদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং মানুষের দুর্ব্বলতা হইতে তাহাদের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে। কল্পনা, উদ্দীপনা ও চাতুরী তাহাদের সম্বন্ধে নানা কাহিনীর প্রচার করিয়াছে। মানুষের বিশ্বাস-প্রবণতার ফলে তাহারা এতদিন জীবিত আছে। ক্ষমতাশালী লোকেরা আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহাদের নামের ব্যবহার করিয়াছে। স্বেচ্ছাচারের আনুগত্যের সহিত ঈশ্বর-বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উভয়ের বৃদ্ধি ও পতন হয় এক সঙ্গে যতদিন পর্য্যন্ত রাজার ও পুরোহিতদিগের শাসন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন মানুষের স্বাধীনতা-লাভ ঘটিবে না। স্বর্গের বিনাশ না হইলে পৃথিবী তাহার প্রাপ্য প্রাপ্ত হইবে না। জড়বাদদ্বারা জগতের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না হইতে পারে। হয়তো সকল জড়পদার্থই প্রাণদ্বারা সঞ্জীবিত। সংবিদের একত্ব জড় ও গতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর না হইতেও পারে। কিন্তু চার্চ্চের সহিত সংগ্রামে জড়বাদই প্রকৃষ্ট অস্ত্র, এবং উৎকৃষ্টতর অস্ত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত উহারই ব্যবহার করিতে হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন জ্ঞান ও শিল্পের প্রসারের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। শিল্প হইতে শান্তি আসিবে, জ্ঞান হইতে নূতন কর্ম্মনীতির উদ্ভব হইবে।

যাহা সত্য, যাহা প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য-যুক্ত, তাহা হইতেছে নাস্তিকতা বা নিরীশ্বরবাদ। ইহা গ্রহণের জন্য একদিকে যেমন শিক্ষার, তেমনি অন্য দিকে সাহসেরও প্রয়োজন। এখনও ইহা সকলের কেন অনেকেরই অধিগত হয় নাই। নাস্তিকশব্দদ্বারা যদি কেবল নিশ্চেষ্ট জড়ে বিশ্বাসী, এবং 'ঈশ্বর' শব্দদ্বারা প্রকৃতির চালক শক্তি বুঝায়, তাহা হইলে একজন নাস্তিকেরও অস্তিত্ব নাই বলিতে হইবে। যদি কেহ থাকে, সে মূর্খ। কিন্তু 'নাস্তিক' শব্দদ্বারা যদি এমন লোককে বুঝায়, যিনি অজড় এমন কোনও পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যাহার কাল্পনিক গুণাবলী কেবল মানুষের মনের শান্তি নষ্ট করিতে সমর্থ, তাহা হইলে নাস্তিকের অস্তিত্ব আছে এবং বুদ্ধির উন্নতি এবং প্রকৃতির সত্য ধারণার প্রসারের সঙ্গে তাহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে। নাস্তিকতাই সত্য দর্শন, সুতরাং ইহার প্রচার আবশ্যক। এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা আপনারা ধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইলেও, সাধারণের জন্য, জন সাধারণকে সংযত রাখিবার জন্য, ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। কিন্তু ইহা কাহারও ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য তাহাকে বিষ-প্রয়োগের সমতুল্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে ভাবেই স্বীকার করা হউক না কেন, তাহা কুসংস্কারমাত্র।

আত্মা যদি না থাকে, ঈশ্বর যদি কল্পনামাত্র হয়, তাহা হইলে 'অমরতা' এবং স্বাধীন ইচ্ছার কথাই উঠিতে পারে না। প্রাকৃতিক অন্যান্য বস্তু ও মানুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। তাহারাও যেমন, মানুষও তেমনি, এক অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলের অংশ, নিয়তির হস্তে অন্ধ যন্ত্রমাত্র। অন্য কোনও বস্তুর সাহায্য ব্যতীত কোনও বস্তুর যদি গতি-উৎপাদনের স্বকীয় ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে সে এই বিশ্বের গতি বন্ধ করিয়া দিতে পারিত। ব্যক্তিগত অমরতা একটা মূর্খের কল্পনা। দেহের ধ্বংসের পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে, বলার অর্থ কোনও যন্ত্রের ধ্বংসের পরেও তাহার কার্য্য চলিতে থাকে। কীর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার অমরতা নাই।

কোনও মত সত্য কিনা, তাহার উপকারিতা তাহার শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর। ধর্ম্মোপদেষ্টার মতদ্বারা কেবল অশান্তি এবং দুঃখের সৃষ্টিই হয়। কিন্তু নাস্তিকতা মানুষকে দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করে, এবং বর্ত্তমানের সুখ উপভোগ করিতে শিক্ষা দেয়। সুনীতি যদি কার্য্যে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে আত্মপ্রীতি এবং স্বার্থের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখাইতে হইবে, কোন্ পথে তাহার প্রকৃত স্বার্থ সিদ্ধ হইবে। যিনি এমন ভাবে আপনার স্বার্থের অনুসরণ করেন, যে অন্য লোকে তাহাদের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার স্বার্থের সহায়ক হয়, তিনিই ভালো লোক।

লক্ হইতে যে বস্তুবাদের দর্শন আরব্ধ হইয়াছিল, এই রকম নাস্তিকতা ও জড়বাদে তাহা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছিল, এবং সুনীতি স্বার্থবাদে পরিণত হইয়াছিল। জড়বাদের সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যাত্মবাদও বিকাশিত হইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানীর দর্শনে আমরা তাহা দেখিতে পারিব।

ভলটেয়ার

পাশ্চাত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই শতাব্দীতে আমেরিকা বৃটেনের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া জাতিসংঘের মধ্যে আপনার স্বতন্ত্র স্থানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই শতাব্দীতেই ফরাসী জাতি স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর ধ্বজা উত্তোলিত করিয়া স্বদেশে স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধন এবং অত্যাচার-পীড়িত জনগণের মধ্যে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন করিয়াছিল। যে সমস্ত মনীষী মানবের ইতিহাসের এই অভিনব অধ্যায়-রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন ভলটেয়ার তাঁহাদের অন্যতম।



ভলটেয়ার

ভলটেয়ার যখন জন্মগ্রহণ করেন, চতুর্দ্দশ লুই তখন ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অসাধারণ ক্ষমতাশালী এই রাজার ৭২ বৎসরব্যাপী রাজত্বের যখন শেষ হয়, (১৭১৫ সালে) তখন ফ্রান্সের প্রজার স্বাধীনতার কণামাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। তখন রাজকর্ম্মচারীদিগের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সম্মুখে বিষম করভারে পীড়িত প্রজাকুল সন্ত্রস্ত, পুরোহিত সম্প্রদায় দুশ্চরিত্র ও কলুষ-পঙ্কে নিমজ্জিত, সমাজের মর্ম্মস্থল কদাচারে জর্জ্জরিত। দেশের ও সমাজের এই অবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভলটেয়ার

সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। লা-মার্টিন লিখিয়াছেন, "কার্য্যের দ্বারা যদি লোকের বিচার করিতে হয়, তাহা তাহা হইলে ইউরোপের আধুনিক সাহিত্যিকদিগের মধ্যে ভলটেয়ারকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। শনৈঃ শনৈঃ সেই জীর্ণ যুগের ধ্বংসসাধন করিবার জন্য নিয়তি তাঁহাকে ত্র্যশীতিবর্ষ পরমায়ু দান করিয়াছিল। যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, জয় তখন তাঁহার করতলগত।"

ভলটেয়ার দেখিতে কুৎসিৎ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে দম্ভ ও চপলতা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। অশ্লীলতা ও অসাধুতারও অভাব তাহাতে ছিল না। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে করুণার ফল্‌গুধারা অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইত। পরের উপকারের জন্য শ্রম ও অর্থব্যয়ে তিনি অকুণ্ঠিত ছিলেন: বন্ধুদিগের সাহায্যে তাঁহার হস্ত সতত উন্মুক্ত ছিল, এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী সর্ব্বদা উদ্যত থাকিলেও, মিলন-প্রয়াসী প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্ত তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না।

কিন্তু এই সমস্ত দোষগুণ ভলটেয়ারের চরিত্রের প্রধান কথা নয়। তাঁহার চরিত্রের সার ছিল তাঁহার অতুলনীয় মানসিক সম্পদ—তাঁহার মনের অফুরন্ত ধারণাশক্তি ও সৃষ্টিশক্তি। নিরানব্বই খানি গ্রন্থে নিবদ্ধ তাঁহার রচনার প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার প্রতিভা প্রতিফলিত। যে কোন বিষয়েই তিনি লেখনী-নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার মনের ঔজ্জ্বল্যে রচনা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে তাঁহার লেখা অধিক লোকে পড়ে না। তাহার কারণ, তিনি যে যে বিষয়ে লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে বর্ত্তমানে লোকের কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়াছে। যে যে সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহার জয়লাভের সঙ্গে তাহাদের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

ভলটেয়ারের কর্ম্মক্ষমতা অসাধরেণ ছিল। কখনও তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, "কার্য্যে ব্যস্ত না থাকা আর অস্তিত্বের বিলোপ একই কথা।

জীবিতকালে এত প্রভাব বিস্তার করিবার সৌভাগ্য অন্য কোনও লেখকেরই হয় নাই। কারাগার, নির্ব্বাসন, রাষ্ট্র ও চার্চ্চ-কর্ত্তৃক পুস্তকের প্রকাশ-নিষেধ, কিছুতেই তাঁহার প্রভাব খর্ব্ব করিতে পারে নাই। সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহার বাণী চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। অর্দ্ধ জগৎ তাঁহার কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, রাজন্যবর্গ ও পোপের সিংহাসন কম্পিত হইয়াছিল। অত্যাচার-সহনশীল ফ্রান্সকে তিনি চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন; এই চিন্তার ফলে ফরাসী জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল।

বাল্য ও যৌবন

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিস নগরে ভলটেয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ নোটারী ছিলেন। মাতাও ছিলেন সম্ভ্রান্তবংশের-কন্যা। পিতার নিকট তিনি পাইয়াছিলেন কোপন স্বভাব এবং বৈষয়িক বুদ্ধি, মাতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন চরিত্রের তরলতা ও বৈদগ্ধ্য। তাঁহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। এই ক্ষুদ্রকায় শিশুর বাঁচিয়া থাকিবার আশা কেহই করে নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হয় ৮৪ বৎসর বয়সে। এই দীর্ঘজীবনে অনবরত তাঁহাকে পীড়ার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল।

ভলটেয়ারের পিতৃদত্ত নাম ছিল ফ্রানকয় মেরী এরাউয়েট্। ফ্রানকয় লিখিতে শিখিয়াই কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দেখিয়া পিতা বুঝিলেন, এ ছেলে কোনও কাজের হইবে না। কিন্তু তৎকালীন বিখ্যাত বারনারী নাইনন্ বালকের আকৃতিতে তাহার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিদর্শন দেখিতে পান, এবং মৃত্যুকালে পুস্তক-ক্রয়ের জন্য দুই হাজার ফ্রাঙ্ক তাহাকে দান করিয়া যান। এই অর্থদ্বারাই ভলটেয়ারের বাল্যশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ফ্রানকয় সাহিত্যসেবার ইচ্ছা-প্রকাশ করিলে পিতা বলিলেন, "আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া যে থাকিতে চায়, অথবা অনাহারে মরিতে চায়, সাহিত্য তাহাদেরই জন্য।" কিন্তু ফ্রানকয় জীবিকার জন্য সাহিত্যই অবলম্বন করিলেন।

ফ্রানকয় যে খুব অধ্যয়নশীল ও শান্তস্বভাব ছিলেন, তাহা নয়; দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে তিনি গৃহে ফিরিতেন না; উৎপথগামী বন্ধুদিগের সহিত হুল্লোলে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। বিরক্ত হইয়া পিতা তাঁহাকে কেইন নগরে এক আত্মীয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, এবং যাহাতে কাহারও সহিত তিনি মিশিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আত্মীয়কে বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ফল হইল না। ফ্রানকয়কে সত্বরই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল। ইহার পরে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তিনি হেগ নগরে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু সেখানে গিয়াই তিনি এক যুবতীকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন, এবং তাহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে এবং চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। চিঠিতে প্রায়ই লিখিতেন, "চিরজীবন আমি তোমায় ভালবাসিব।" ব্যাপারটি ধরা পড়িবার পরে গৃহে ফিরিয়া কয়েক সপ্তাহ তিনি প্রেমিকাকে মনে রাখিয়াছিলেন, একথা সত্য।

কারাবাস

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রানকয় প্যারিসে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই চতুর্দ্দশ লুইএর মৃত্যু হইল। পঞ্চদশ লুই তখন নিতান্ত শিশু। রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য Regent নিযুক্ত হইলেন। Regentএর সময় প্যারিসে আমোদ-প্রমোদের ঢেউ বহিয়া গেল। ফ্রানকয় সেই স্রোতে গা-ভাসাইয়া দিলেন। বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ব্যয়সংক্ষেপের জন্য Regeut যখন রাজকীয় মন্দুরার অর্দ্ধেক অশ্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, ফ্রানকয় বলিলেন, "রাজসভার গর্দ্দভদিগের অর্দ্ধেক বিক্রয় করিলেই ইহা অপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ হইত।" এই সময়ে Regent রাজ-সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই মর্ম্মে দুইটী কবিতা প্রকাশিত হয়, এবং ফ্রানকয় তাহাদের লেখক বলিয়া জনরব প্রচারিত হয়। Regent শুনিয়া ভীষণ রুষ্ট হইলেন, এবং একদিন উদ্যানে ফ্রানকয়ের দেখা পাইয়া বলিলেন, "মুসো আরুয়েট, আমি তোমাকে এমন কিছু দেখাইতে পারি, যাহা তুমি কখনও দেখ নাই।" ফ্রানকয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন দ্রব্যটী কি, মহাশয়? Regent উত্তর করিলেন, "Bastille কারাগারের অভ্যন্তর।" পরদিনই (১৭১৭ ১৫ই এপ্রিল) ফ্রানকয়কে তাহা দেখিতে হইল।

নাটক রচনা

Bastilleএ অবরুদ্ধ থাকিবার সময়ই ফ্রানকয় 'ভলটেয়ার' নামগ্রহণ করিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই তিনি Henriade কাব্য রচনা করেন। তাঁহার ১১ মাস কারাভোগের পর Regent তাঁহাকে নিরপরাধী জানিতে পারিয়া কারামুক্ত করিয়া একটি বৃত্তি দান করিলেন।

কারাগার হইতে বাহির হইয়া ভটটেয়ার Oedipi নামক এক বিয়োগান্ত নাটক লিখিলেন। রঙ্গমঞ্চে এই নাটক একাদিক্রমে ৪৫ রাত্রি অভিনীত হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী নাটক প্রশংসালাভে সমর্থ হয় নাই। এই সময় তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। রোগমুক্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার Henriade কাব্য সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে!

ইংলণ্ডে বাস

ইহার পরে ৮ বৎসর যাবৎ তিনি সর্ব্বত্র সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন। তাহার পরে ভাগ্যদেবী অপ্রসন্ন হইলেন। অভিজাত শ্রেণীর অনেকে তাঁহাকে সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রতিভা ভিন্ন সম্মানের দাবী তাঁহার যে আর কিছুই নাই, ইহা তাঁহারা ভুলিতে পারিতেন না। একদিন এক ডিউকের প্রাসাদে ভোজনের সময় ভলটেয়ার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতা ও রসিকতার সহিত আলাপ করিতেছিলেন। এমন সময় Chevalier de Rohan অনতি-মৃদুস্বরে কহিলেন, "কে ঐ যুবক উচ্চৈঃস্বরে আলাপ করিতেছে?" ভলটেয়ার তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "মহাত্মন, যাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি কোনও মহৎ নাম বহন করেন না। কিন্তু যে নাম বহন করেন, তাঁহার গুণে সকলেই তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।" Rohan ভয়ানক রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য একদল গুণ্ডা নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পরদিন রঙ্গালয়ে ভলটেয়ার মস্তকে পটি বাধিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে Rohanএর আসনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা Rohanএর ছিল না। আত্মরক্ষার জন্য তিনি পুলিস বিভাগের মন্ত্রী তাঁহার পিতৃব্যপুত্রের শরণাপন্ন হইলেন। Bastilleএর দ্বার আবার ভলটেয়ারের জন্য উন্মুক্ত হইল, কিন্তু তিনি অবিলম্বে দেশত্যাগ করিয়া যাইবেন, এই সর্ত্তে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। ফরাসী পুলিস তাঁহার সহিত Dover পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিল। ইহার অনতিকাল পরেই প্রতিহিংসা-গ্রহণের অভিলাষে ভলটেয়ার ছদ্মবেশে প্যারিসে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রত্যাগমন পুলিসে জানিতে পারিয়াছে, তখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন।

তিন বৎসর ভলটেয়ার ইংলণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। এক বৎসর মধ্যে তিনি তদানীন্তন ইংরাজী-সাহিত্যের পরিচয় লাভ করেন। তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, যে ইংরেজ সাহিত্যিকেরা যাহা খুসী লিখিতে পারেন। তাহার জন্য তাঁহাদিগকে শাস্তি পাইতে

হয় না। "আশ্চর্য্য জাতি এই ইংরেজেরা! ইহাদের দেশে Bastille নাই, Letters de Cachet নাই! বিনাবিচারে এখানে কেহ কারারুদ্ধ হয় না! ইহাদের ধর্ম্ম ইহারা সংস্কৃত করিয়া লইয়াছে, রাজার ফাঁসি দিয়াছে, বিদেশ হইতে রাজা আনিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছে এবং ইয়োরোপের যাবতীয় নরপতি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহাদের দেশে ত্রিশটি ধর্ম্ম বর্ত্তমান, কিন্তু পুরোহিত একজনও নাই। যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নির্ভীকতম Quaker সম্প্রদায় ইহাদের দেশেই উদ্ভূত হইয়াছে। অদ্ভুত মানুষ এই Quakerরা। খৃষ্টের বাণী সত্য সত্যই ইহারা অন্তরে গ্রহণ করিয়াছে, এবং তাঁহার উপদেশমত জীবন যাপন করিয়া খৃষ্টীয় জগৎকে অবাক্ করিয়া দিয়াছে!" জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ভলটেয়ার Quakerদিগের আচরণে বিস্ময় বোধ করিতেন।

ইংলণ্ডে তখন বিদ্যালোচনার প্রবল স্রোত বহিতেছিল। বেকনের প্রভাব তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। Hobbs যে জড়বাদ প্রচার করিয়াছিলেন, ফ্রান্সে হইলে তাহার জন্য তাঁহাকে প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। Lockeএর Essay on the Human Understanding দর্শনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। Collins, Tyndal ও অন্যান্য Deistগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস অঙ্গীকার করিয়াও প্রচলিত ধর্ম্মের প্রত্যেক মতেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিউটনের গ্রন্থাবলী ভলটেয়ার আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন, এবং ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে যাহা কিছু শিখিবার ছিল, অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। ইংল্যাণ্ডের প্রতি তাঁহার মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মে। Letters on the English গ্রন্থে তাঁহার ধারণা বর্ণনা করিয়া তিনি হস্তলিখিত অবস্থাতেই ঐ গ্রন্থ বন্ধুদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে সাহসী হন নাই। এই গ্রন্থে ফ্রান্সের যথেচ্ছাচার-পীড়িত ব্যক্তিস্বাধীনতা-বর্জ্জিত অবস্থার সহিত তিনি ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক স্বাধীনতার তুলনা করিয়াছিলেন, এবং ফ্রান্সের মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীকে রাষ্ট্রে উপযুক্ত স্থান অর্জ্জন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না, যে তাঁহার এই গ্রন্থই ফ্রান্সে স্বাধীনতার ঊষার প্রথম ঘোষণাধ্বনি।

স্বদেশে প্রত্যাগমন

১৭২৯ খৃষ্টাব্দে ভলটেয়ার ফ্রান্সে ফিরিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং ৫ বৎসর প্যারিসে স্ফূর্ত্তির জীবন যাপন করিলেন। হঠাৎ স্ফূর্ত্তিতে বাধা পড়িল। একজন পুস্তক-প্রকাশক তাঁহার অনুমতি না লইয়া Letters on the English গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। প্যারিসের Parliament অবিলম্বে ঐ গ্রন্থ ধর্ম্ম-ও-নীতিবিরোধী এবং রাজার অসম্মানজনক বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং প্রকাশ্য ভাবে উহা পোড়াইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিলেন। তখন পুনরায় Bastille-বাস আসন্ন জানিয়া বুদ্ধিমানের মত ভলটেয়ার পলায়ন করিলেন, সঙ্গে লইয়া গেলেন তাঁহার প্রণয়িনী এক মহিলাকে।

কাইরি

ভলটেয়ারের এই প্রণয়িণী Marquise du Chatelet ছিলেন এক অসাধারণ মহিলা। গণিতে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। Newtonএর Principiaর একখানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা তিনি রচনা করিয়াছিলেন, এবং পরে "অগ্নি" সম্বন্ধে এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি French Academy হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ভলটেয়ারকে তিনি "সর্ব্বপ্রকারে ভালবাসার উপযুক্ত," এবং "ফ্রান্সের সর্ব্বোত্তম অলংকার" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভলটেয়ারও এই মহিলা-সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "তিনি Great man (মহৎলোক)। তাঁহার একমাত্র দোষ এই যে তিনি স্ত্রীলোক।" কাইরিতে মার্কিজের এক দুর্গ ছিল। তথায় তিনি প্রণয়ীকে আশ্রয় দিলেন। তাঁহার স্বামী তাঁহার গণিত-চর্চ্চা সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার সৈন্যদলের সহিত দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। পারিসের সমাজে তখন অবস্থাপন্ন মহিলাদের স্বামীর সঙ্গে দুই একটী প্রণয়ী রাখার প্রথা ছিল। বাহিক ঠাট বজায় রাখিতে পারিলে, ইহাতে কোনও কথা উঠিত না। প্রণয়ী যদি প্রতিভাবান কেহ হইতেন, তাহা হইলে তো কথাই ছিল না।

কাইরীতে প্রণয়-চর্চ্চার সহিত অধ্যয়ন ও গবেষণাও চলিতে লাগিল। গবেষণার জন্য ভলটেয়ার এক মূল্যবান পরীক্ষাগার পাইলেন। কয়েক বৎসর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আলোচনায় অতিবাহিত হইল। তাঁহাদের অতিথির অভাব ছিল না। সত্বরই কাইরী বিদ্বজ্জনের সমাগম-ক্ষেত্রে পরিণত হইল। সন্ধ্যাকালে অতিথিদিগের সম্মুখে ভলটেয়ার স্বরচিত উপন্যাস পাঠ করিতেন। কখনও বা তাঁহার নাটকের অভিনয় করিতেন। আমোদপ্রমোদ ভলটেয়ারের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। কাইরীতে বিদ্যাচর্চ্চা ও আমোদ, দুইই প্রচুর পরিমাণে চলিত। এইখানেই ভলটেয়ার Zadig Micromegas, L' Ingenu, Le monde প্রভৃতি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহারা ঠিক উপন্যাস নয়, রহস্যপূর্ণ ছোট রূপক গল্প।

L' Ingenu এক Red Indianএর গল্প। কয়েকজন পর্য্যটকের সহিত ফ্রান্সে আসিবার পরে এই Red Indianকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা হইল। New Testament পড়িয়া সে এতই মুগ্ধ হইল, যে সে কেবল খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেই সম্মত হইল না, অধিকন্তু সুন্নত[1] লইবার জন্য জেদ ধরিল! "বাইবেলে যাহাদের কথা আছে, সকলেরই সুন্নত হইয়াছিল, সুতরাং আমাকেও সুন্নত লইতেই হইবে।" এই সমস্যার সমাধান হইতেই পাপ-স্বীকারের[2] প্রশ্ন উঠিল। সে বলিল "কোথায় পাপ-স্বীকারের কথা আছে, দেখাও।" তখন তাহাকে Epistle of St John দেখানো হইল। তাহাতে আছে "পরস্পরের নিকট পাপ স্বীকার করিবে।" দেখিয়া সে পুরোহিতের নিকট পাপ-স্বীকার করিল, কিন্তু পাপ-স্বীকার শেষ হইবামাত্রই পুরোহিতকে চেয়ার হইতে টানিয়া নামাইয়া নিজে তথায় উপবেশন করিল, এবং কহিল, "এখন তোমার পাপ আমার নিকট স্বীকার কর"। ইহার,

[1] Circumcision. [2] Confession.

পরে সে Miss St. Yvesকে ভালবাসিয়া ফেলিল। দীক্ষা-কালে উক্ত মহিলা তাহার ধর্ম্মমাতা হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারে না, শুনিয়া সে ভয়ানক রুষ্ট হইয়া বলিল, "তবে আমার দীক্ষা ফিরাইয়া লও।" বিবাহের অনুমতি পাইয়া দেখিল, বিবাহে ঝঞ্ঝাট কম নয়। নোটারি চাই, পুরোহিত চাই, সাক্ষী চাই, চুক্তিপত্র চাই; আরো কত কি চাই। শুনিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরা দেখছি ভীষণ দুষ্ট লোক। এত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তোমাদের বিবাহ হয়।" এইরূপে গল্পের প্রবাহ ছুটিয়াছে, এবং পুরোহিত-তন্ত্রশাসিত খৃষ্টধর্ম্মের সহিত আদিম খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে।

Micromegas গ্রন্থে আছে পাঁচ লক্ষ ফুট দীর্ঘ Sirius নক্ষত্রের এক অধিবাসীর সহিত কয়েক সহস্র ফুট দীর্ঘ শনিগ্রহের এক অধিবাসীর পৃথিবী-ভ্রমণের কাহিনী। ভূমধ্যসাগর পদব্রজে অতিক্রম করিবার সময় সিরিয়ানের জুতার গোড়া ভিজিয়া গেল। শনিবাসী বলিল, তাহাদের মাত্র ৭২টি ইন্দ্রিয় আছে, তাহাতে চলে না। সিরিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের পরমায়ু কত? শনিবাসী বলিল "বেশী নয়; পনের হাজার বৎসরের বেশী কম লোকই বাঁচে।" এমন সময় একখানা জাহাজ আসিয়া পড়িল। সিরিয়ান তাহা হাতে লইয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগে রাখিয়া দোলাইতে লাগিল। জাহাজে হুল স্থুল পড়িয়া গেল। সিরিয়ান জাহাজের আরোহীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে বুদ্ধিমান্ ক্ষুদ্র জীবগণ, আমার বিশ্বাস, তোমরা এই পৃথিবীতে যে আনন্দ উপভোগ কর, তাহা অতি নির্ম্মল। কেন না জড়ের ভার তোমাদিগকে বেশী বহন করিতে হয় না। তোমাদের দেহ এত ক্ষুদ্র, যে তোমাদের মধ্যে আত্মা ভিন্ন আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ কর।" জাহাজস্থ একজন দার্শনিক কহিলেন, "দেহ ক্ষুদ্র হইলে কি হইবে? প্রচুর অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় জড় পদার্থের অভাব তাহাতে নাই। এই মুহূর্ত্তেই আমাদেরই সংশ্রেণীস্থ একলক্ষ জীব সমসংখ্যক সমশ্রেণীর জীবের প্রাণ-সংহারে নিযুক্ত আছে। অনাদিকাল হইতে ইহাই পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে।" তখন ক্রুদ্ধ হইয়া সিরিয়ান্ কহিলেন "পাপিষ্ঠগণ, আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনি তোমাদের সমগ্র জাতিকে পদতলে পিষ্ট করিয়া হত্যা করি।" দার্শনিক বলিলেন, "আপনার সে কষ্ট-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। আমরা আপনাদের চেষ্টাতেই আপনাদের ধ্বংস-সাধন করিতে পারিব। দশ বৎসর পরে আমাদের একশতাংশও জীবিত থাকিবে না। কিন্তু এই অবস্থার জন্য দায়ী রাজপ্রাসাদবাসী বর্ব্বরগণ। তাহারা নিজেরা বসিয়া থাকিয়া লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করিবার আদেশ দেয়। শাস্তি তাহাদেরই হওয়া উচিত।"

Zadig গল্পের নায়ক বেবিলনের Zadig নামক এক দার্শনিক। সেমিরানাম্নী এক মহিলাকে ভালবাসেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। একদিন দস্যুহস্ত হইতে সেমিরাকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি চক্ষুতে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। মিশরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইবে। কবে কোন সময় দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবে, তাহাও গণনা করিয়া বলিয়া দিলেন। আরও বলিলেন, যে আঘাত যদি দক্ষিণ

চক্ষুতে হইত' তাহা হইলে আরোগ্য করা যাইত, কিন্তু বাম চক্ষুতে বলিয়া তাহা সম্ভবপর হইবে না। বেবিলনের অধিবাসিগণ শুনিয়া দুঃখিত হইল, এবং হার্মিসের জ্ঞানের তারিফ্ করিতে লাগিল। জাডিগের চক্ষুর ক্ষত কিন্তু শুকাইতে আরম্ভ করিল এবং দুই দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া গেল। তখন এক গ্রন্থ লিখিয়া হার্মিস নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দিলেন, যে জাডিগের চক্ষুর আরোগ্যলাভ করা উচিত হয় নাই। জাডিগ সে গ্রন্থ স্পর্শও করেন নাই।

আরোগ্যলাভ করিয়াই জাডিগ সেমিরার নিকট গিয়া শুনিলেন, অন্য একজনের সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। এক-চক্ষু লোককে তো আর বিবাহ করা চলে না!

তখন জাডিগ এক কৃষক রমণীকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পরে স্ত্রীর ভালবাসা পরীক্ষা করিবার জন্য এক বন্ধুর সহিত ষড়যন্ত্র করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে বন্ধু গিয়া দেখিলেন, জাডিগ মৃতের মত পড়িয়া আছেন, তাঁহার স্ত্রী রোদন করিতেছেন। বন্ধু কিছুক্ষণ সান্ত্বনার কথা বলিয়া পরে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। জাডিগের স্ত্রী প্রথমে ভীষণ আপত্তি করিয়া পরে সম্মত হইলেন। জাডিগ উঠিয়া পড়িলেন, এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বনে চলিয়া গেলেন।

বনবাস ত্যাগ করিয়া জাডিগ এক রাজার উজির হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে রাণী তাঁহার প্রেমে পড়িয়া গেলেন। রাজা দুই জনকেই বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিতে মনস্থ করিলেন! জানিতে পারিয়া জাডিগ আবার বনবাসী হইলেন।

বনে গিয়া জাডিগের অন্তঃকরণে নির্বেদ সঞ্জাত হইল। মনে হইল মনুষ্য-জাতি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের এক কণার উপর অবস্থিত, পরস্পর হত্যাকারী এক দল কীটমাত্র। তাঁহার মনের গ্লানি বিদূরিত হইয়া গেল। তিনি বিশ্বের ইন্দ্রিয়াতীত রূপের ধ্যান করিতে লাগিলেন। হঠাৎ রাণীর কথা মনে পড়িয়া গেল, এবং বাস্তব জগতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। তিনিও বনবাস ত্যাগ করিয়া লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলেন।

পথে যাইতে যাইতে জাডিগ দেখিতে পাইলেন, একটা লোক একটি স্ত্রীলোককে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেছে। স্ত্রীলোকটির সাহায্যে অগ্রসর হইলে লোকটি তাহাকে আক্রমণ করিল। আত্মরক্ষার জন্য জাডিগ সেই দুর্বৃত্তকে প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে লোকটির মৃত্যু হইল। স্ত্রীলোকটী তখন তাহার প্রণয়ীকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া জাডিগকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে জাডিগ বন্দী হইয়া ক্রীতদাসে পরিণত হইলেন। প্রভুকে দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা দিয়া জাডিগ তাঁহার বিশ্বাস অর্জন করিলেন। তাঁহার পরামর্শে রাজা বিধবাদের সহমরণ বন্ধ করিবার জন্য এক আইন প্রণয়ন করিলেন। সেই আইনে বিধিবদ্ধ হইল, কোনও বিধবা সহমরণে ইচ্ছুক হইলে সহমরণের পূর্বে কোনও সুন্দর পুরুষের সহিত তাঁহাকে এক ঘণ্টা কাটাইতে হইবে।

এইরূপে গল্প চলিয়াছে।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডারিকের সহিত ভলটেয়ারের পত্রব্যবহার আরব্ধ হয়। ফ্রেডারিক তখনও যুবরাজ, The great হন নাই। ভলটেয়ারকে লিখিত প্রথম পত্রে ফ্রেডারিক লিখিয়াছিলেন "আপনি ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমি যে আপনার সমকালে জন্মলাভ করিয়াছি, ইহা আমার জীবনের একটি বিশিষ্ট গৌরব বলিয়া মনে করি।" ফ্রেডারিক স্বাধীন চিন্তার উপাসক[1] ছিলেন। ভলটেয়ার আশা করিয়াছিলেন, যে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি জ্ঞানালোক-বিস্তারে সাহায্য করিবেন, এবং ডায়োনিসাসের উপর প্লেটো যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ফ্রেডারিকের উপর তিনিও সেইরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইবেন। Anti-Machiavel নামক গ্রন্থে ফ্রেডারিক যুদ্ধের অনৌচিত্য এবং শান্তি-রক্ষা-সম্বন্ধে রাজার দায়িত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভলটেয়ার আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কয়েকমাস পরেই কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ফ্রেডারিক সাইলেসিয়া আক্রমণ করেন, এবং ইয়োরোপ একপুরুষ স্থায়ী রক্তস্রোতে নিমজ্জিত হয়।

১৭৪৫ সালে প্রণয়িনী সহ প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া ভলটেয়ার French Academyর সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী ক্যাথলিক বলিয়া তিনি আপনাকে অভিহিত করেন, এবং অক্লান্ত ভাবে মিথ্যা বলিতে থাকেন। সেবার তাঁহার চেষ্টা সফল না হইলেও, পরবৎসর তিনি Academyর সভ্য নির্ব্বাচিত হন। Academyতে তাঁহার বক্তৃতা ফরাসী সাহিত্যে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য বলিয়া[2] পরিগণিত হইয়াছে।

১৭৪৮ সালে ভলটেয়ারের প্রণয়িনী একটী নূতন প্রণয়ী লাভ করেন। জানিতে পারিয়া ভলটেয়ার ভীষণ রুষ্ট হন। কিন্তু Marquis de St. Lambert (নূতন প্রণয়ী) ক্ষমা প্রার্থনা করায় বিগলিত হইয়া বলিলেন, "তা—বেশ করেছ! তুমি যুবক, আমি বৃদ্ধ। তোমার প্রতি মার্কিজের অনুরাগ অসঙ্গত নয়। স্ত্রীলোকের স্বভাবই এই। আমি Richelieuকে স্থানচ্যুত করেছিলাম। তুমি আমাকে বহিষ্কৃত করেছো। এই রূপই হয়ে থাকে। একটা পেরেক অন্য পেরেককে বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে সংসার চলে।" ১৭৪৯ সালে সন্তান-প্রসবে Mme du Chateletএর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে তাঁহার স্বামী ও দুই প্রণয়ীই উপস্থিত ছিলেন। কেহই কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নাই, প্রত্যেকের প্রতি সমবেদনায় প্রত্যেকের হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল।

নির্ব্বাসন

ইহার পরে ফ্রেডারিকের নিমন্ত্রণে ১৭৫০ সালে ভলটেয়ার বার্লিনে উপনীত হন, এবং প্রচুর সমাদরের সহিত গৃহীত হন। দুই বৎসর পরে বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয়, এবং ভলটেয়ার বার্লিন হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু জার্ম্মাণির সীমান্ত অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই জানিতে পারিলেন, ফরাসী সরকার তাঁহার প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

[1] Freethinker. [2] Classic.

ভলটেয়ারের "An Essay on the Morals, and the Spirit of the Nations from Charlemagne to Louis XIII" গ্রন্থই এই নির্বাসন দণ্ডের-কারণ। এই গ্রন্থ তাঁহার লিখিত সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বৃহত্তম এবং তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। কাইরীতে অবস্থানকালে Madame du Chateleteএর তৎকালীন প্রচলিত ইতিহাসের সমালোচনা হইতে ইহার উৎপত্তি। Madame বলিয়াছিলেন, "বর্ত্তমান ইতিহাসের সহিত পঞ্জিকার পার্থক্য কি? ইহা তো ঘটনাপরম্পরার একত্র সমাবেশমাত্র। কোন্ রাজা কখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কে কাহার পুত্র, কাহার সহিত কাহার যুদ্ধ হইল, তাহা জানিয়া লাভ কি? কোনও ঘটনার সহিত অন্য ঘটনার সম্বন্ধ বর্ণনার চেষ্টা এ ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না।" ভলটেয়ার বলিয়াছিলেন "ইতিহাসে দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ না করিলে, এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অন্তরালে মানব-মনের ইতিহাসের অনুসন্ধান না করিলে, প্রকৃত ইতিহাস-রচনার সম্ভাবনা নাই। ইতিহাস-রচনার কাজ দার্শনিকের। সকল জাতির মধ্যেই ইতিহাসের সহিত উপকথা মিশিয়া গিয়াছে, এবং বহু শতাব্দীর ভ্রান্তি-জালে মানুষের মনঃ এতই জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, যে দর্শনের প্রয়োগদ্বারাও সে ভ্রান্তির অপনয়ন সহজসাধ্য নহে। ভবিষ্যতে আমরা যাহা চাই, ইতিহাসে তাহারই উপযোগী করিয়া অতীতকে রূপান্তরিত করি। এইরূপ ইতিহাসদ্বারা প্রমাণিত হয়, যে যাহা ইচ্ছা তাহাই ইতিহাস-দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

এই ইতিহাস লিখিতে ভলটেয়ারকে বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল; বহু লোকের নিকট পত্র লিখিয়া প্রকৃত ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণ-সংগ্রহই ইতিহাস-রচনার জন্য একমাত্র প্রয়োজনীয় নহে। সংগৃহীত ঘটনাবলীর একত্ববিধানকারী তত্ত্বের আবিষ্কার এবং সেই তত্ত্বসূত্রে ঘটনাবলী গ্রথিত করা ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য্য। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে সংস্কৃতির ইতিহাসই এই সূত্র। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, যে তাঁহার ইতিহাসে রাজাদিগের কাহিনী থাকিবে না; থাকিবে প্রজা সাধারণের কথা, থাকিবে যে সমস্ত শক্তি সমাজে পরিবর্ত্তনসাধন করে, সেই সমস্ত শক্তি ও তাহা হইতে উদ্ভূত আন্দোলনের কাহিনী। যুদ্ধের বর্ণনা থাকিবে না, থাকিবে মানব-মনের অগ্রগতির ইতিহাস। ইতিহাসের যে চিত্র তিনি মনে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে যুদ্ধ ও বিপ্লবের জন্য সামান্য স্থানই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এক বন্ধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন, আমি যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, বসিয়াছি সমাজের ইতিহাস লিখিতে, পরিবারের মধ্যে মানুষ কি ভাবে বাস করে, এবং কোন্ কোন্ কলার অনুশীলন করে, তাহারই বর্ণনা করিতে। আমার উদ্দেশ্য মানবমনের ইতিহাস রচনা করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বর্ণনা নয়; বড় বড় লর্ড-দিগের ইতিহাস লেখাও আমার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। বর্ব্বর অবস্থা অতিক্রম করিতে মানুষ কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাই আমি আবিষ্কার করিতে চাই"। ইতিহাস হইতে রাজাদিগের বর্জ্জনেই দেশের শাসনযন্ত্র হইতে তাহাদিগের বহিষ্কারের সূত্রপাত। ভলটেয়ারের ইতিহাস হইতে বুর্বনদিগের সিংহাসনচ্যুতির আরম্ভ। ইহাই প্রথম দার্শনিক ইতিহাস। ইয়োরোপে মানব-মনের ক্রমবিকাশের কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার আবিষ্কারের ইহাই প্রথম স্পর্দ্ধ

উদ্ভব। এই উদ্ভবে অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যার স্থান নাই। প্রচলিত ধর্মতত্ত্বের ভিত্তির উপর এইরূপ ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। বাক্‌ল্ বলেন, ভলটেয়ারের এই গ্রন্থে আধুনিক ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হইয়াছে। গিবন্, নাইবুহুর, বাক্‌ল্ ও গ্রোট তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন। এখনও এই ক্ষেত্রে কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে সক্ষম হন নাই।*

সত্য বলিতে গিয়া ভলটেয়ার সকলেরই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। পুরোহিত সম্প্রদায় রুষ্ট হইয়াছিলেন, কেননা ইয়োরোপে প্রাচীন ধর্মের উপর খ্রীষ্টীয় ধর্মের বিজয় ও তাহার দ্রুত প্রসারকে ভলটেয়ার রোমান সাম্রাজ্যের সংহতি-বিনাশের ও বর্ব্বরদিগের দ্বারা তাহার পরাজয়ের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহাদের রোষের আরও একটা কারণ এই ছিল, যে তিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া চীন, ভারতবর্ষ ও পারস্যদেশ ও তাহাদের ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং প্রচলিত ইতিহাস-গ্রন্থে জুডিয়া ও খ্রীষ্টান দেশসকলের বর্ণনা যতটা স্থান অধিকার করিয়া থাকিত, তাঁহার গ্রন্থে তাহা অপেক্ষা স্বল্পতর স্থান তাহার জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। ফলে, পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে এক নূতন জগৎ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল; ভূ পৃষ্ঠে এশিয়া যতটা স্থান ব্যাপিয়া আছে, ভলটেয়ারের ইতিহাসে তাহা তদনুপাতিক স্থানলাভ করিয়াছিল। এতাদৃশ ইতিহাসের দেশপ্রেম-বর্জ্জিত লেখককে ক্ষমা করা সম্ভবপর ছিল না। যে লেখক আপনাকে মুখ্যতঃ মানব ও গৌণতঃ ফরাসী বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, রাজার আদেশে ফ্রান্সে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।

নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভলটেয়ার কোথায় যাইবেন প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। জেনিভার সন্নিকটে উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে 'Les-Delices' নামক ভূ-সম্পত্তির সন্ধান পাইয়া তিনি তাহা কিনিয়া ফেলিলেন এবং তথায় বাস স্থাপন করিলেন। চারি বৎসর তথায় বাস করিয়া ১৭৫০ সালে সুইস ও ফরাসী সীমান্ত প্রদেশে (সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে) ফার্ণি নামক স্থানে তিনি স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি ফার্ণিতেই ছিলেন।

ফার্ণি

ফার্ণিতে ভলটেয়ার নিজের বাগানে স্বহস্তে কাজ করিতেন, অনেক বৃক্ষও তিনি রোপণ করিয়াছিলেন। তাহাদের ফল ভোগ করিবার আশা তাঁহার ছিল না—বয়স তখন তাঁহার ৬৪ বৎসর। একদিন তাঁহার এক ভক্ত তিনি ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন বলায়, ভলটেয়ার বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, চারিহাজার বৃক্ষ আমি রোপণ করিয়া গেলাম।"

* Will Durant's Story of Philosophy.

অচিরেই ফার্ণি বিদ্বজ্জনদিগের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। বিশ্বাসহীন পুরোহিত, উদারমতাবলম্বী অভিজাত, বিদুষী মহিলা, সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহাকে দেখিতে আসিত। ইংলণ্ড হইতে গিবন ও বস্‌ওয়েল আসিয়াছিলেন। ফ্রান্স হইতে আসিতেন হেলভেটিয়াস্, দালেম্‌বার্ট ও অন্যান্য পণ্ডিত। অতিথির সংখ্যা ক্রমে অসম্ভবরূপে বাড়িয়া চলিল। ভলটেয়ার বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এক বন্ধু আসিয়া কহিলেন, তিনি ছয় সপ্তাহ থাকিবেন। ভলটেয়ার বলিলেন, "তোমাতে ও ডন্ কুইক্‌সোট্ এ তফাৎ কি? ডন্ কুইক্‌সোট্ অতিথিশালাকে দুর্গ বলিয়া ভুল করিয়াছিল, আর তুমি আমার দুর্গকে অতিথিশালা বলিয়া ভুল করিয়াছ। ভগবান বন্ধুদিগের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করুন। শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে আমি নিজেই পারিব।" এই অবিরল প্রবাহিত অতিথি-স্রোতের মধ্যে সকল শ্রেণীর পত্রলেখকের পত্রের উত্তর দিতে হইত। জার্ম্মাণীর কোনও নগরের মেয়র লিখিয়াছিলেন, "গোপনে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ঈশ্বর কি বাস্তবিকই আছেন না নাই? ফেরৎ ডাকে উত্তর দিবেন।" ডেনমার্কের রাজা তৃতীয় ক্রিশ্চিয়ান রাজ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিতে না পারার জন্য ক্রটী স্বীকার করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। রুশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয়া ক্যাথেরাইণ তাঁহাকে বহু উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া ঘন ঘন চিঠি লিখিতেন। ফ্রেডারিক দি গ্রেট লিখিয়াছিলেন, "আপনি আমার সহিত ভয়ানক অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। সকলই আমি ক্ষমা করিয়াছি, সকলই ভুলিয়া যাইতেই আমার ইচ্ছা। আমি যদি উন্মাদ না হইতাম, এবং আপনার প্রতিভার প্রতি যদি আমার শ্রদ্ধা না থাকিত, তাহা হইলে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইতেন না। মিষ্ট কথা শুনিতে চান? শুনুন তবে সত্য কথা বলি। জগতে যত প্রতিভাশালী ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমি আপনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। আপনার কবিতাকে আমি শ্রদ্ধা করি, আপনার গদ্য আমি ভালবাসি। আপনার পূর্ববর্ত্তী কোনও লেখকই এরূপ বিচক্ষণ বাগ্-বৈদগ্ধ্য এবং সূক্ষ্ম ও নিশ্চয়াত্মিক' রুচির অধিকারী ছিলেন না। কথোপকথনে আপনি মনোহারী, একসঙ্গে আনন্দদান ও শিক্ষাবিধান করিতে আপনি সুদক্ষ। আপনার অপেক্ষা অধিকতর চিত্তহারী আমি কাহাকেও জানি না। যখন আপনি ইচ্ছা করেন, তখন সমগ্র জগৎকে দিয়া আপনি আপনাকে ভালবাসাইতে পারেন। আপনার মনের সৌন্দর্য্য এত অধিক, যে আপনি বিরক্তি উৎপাদন করিলেও কেহই আপনার উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারে না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আপনি যদি মানুষ না হইতেন, তাহা হইলে পূর্ণ হইতেন।"

দুঃখবাদ

এত গুণের অধিকারী, এমন সদানন্দ যিনি, তিনি যে দুঃখবাদী হইবেন, ইহা কেহই ভাবিতে পারে নাই। প্যারিসে যখন ছিলেন, সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকিয়াও তিনি লাইব্‌নিট্‌জের অত্যধিক আশাবাদের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এক যুবক তখন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ লেখায়, তিনি তাহাকে লিখিয়াছিলেন, "আমি শুনিয়া সুখী হইলাম, আপনি আমাকে আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাঁতে আমি আপনাকে

সম্মানিত বোধ করিতেছি। যাবতীয় সম্ভবপর জগতের মধ্যে সর্ব্বোত্তম এই জগতে কেন এত লোকে আত্মহত্যা করে, পদ্যেই হউক, কিংবা গদ্যেই হউক, তাহা যদি আপনি বলিতে পারেন, আমি বিশেষ বাধিত হইব। আপনার যুক্তি, কবিতা ও তিরস্কারের অপেক্ষায় রহিলাম। অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে আপনাকে কিন্তু নিশ্চয়তা দিয়া আমি বলিতেছি, যে এই বিষয়ে আপনিও কিছু জানেন না, আমিও কিছু জানিনা।"

মানব-জীবনের মূল্যসম্বন্ধে তাঁহার যে বিশ্বাস ছিল, উৎপীড়ন ও সংসারের অভিজ্ঞতার ফলে তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বার্লিনে ফ্রেডারিকের নিকট যে ব্যবহার পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আশাও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ইহার পরে ১৭৫৫ সালের নভেম্বরে লিসবনের ভূমিকম্পের সংবাদে তাঁহার আশা ও বিশ্বাস একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেদিন ছিল একটি পর্ব্বদিন। ত্রিশ সহস্র লোক উপাসনা মন্দিরে সমবেত হইয়াছিল উপাসনার জন্য। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে তাহাদের অনেকেই নিহত হয়। এই ভীষণ আঘাতে ভলটেয়ারের চিত্তের তারল্য অন্তর্হিত হইয়া যায়। পরে, ফরাসী পুরোহিতগণ সেই ভীষণ সংহারলীলাকে যখন লিসবনের অধিবাসিগণের পাপের শাস্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মনে ভীষণ রোষের সঞ্চার হইল। অমঙ্গলের অস্তিত্বের যে সমস্যায় প্রাচীনকাল হইতে মানব-চিত্ত আলোড়িত হইয়া আসিতেছিল, এক ভাবোদ্দীপ্ত কবিতায় তিনি তাহা ব্যক্ত করিলেন: "হয় ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তিনি এইরূপ অমঙ্গল রোধ করিতে সমর্থ, কিন্তু করেন না; অথবা তিনি ইহা রোধ করিতে ইচ্ছুক হইলেও, ইহা রোধ করিবার শক্তি তাঁহার নাই।" স্পিনোজা বলিয়াছিলেন, "মঙ্গল ও অমঙ্গল শব্দ মানুষের সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য, সমগ্র বিশ্ব-সম্বন্ধে তাহাদের প্রয়োগ করা যায় না। মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অমঙ্গল গণনীয়ই নহে।" ভলটেয়ার কবিতায় লিখিলেন, "সত্য বটে, আমি সমগ্রের একটী তুচ্ছ পরমাণুমাত্র, কিন্তু সমস্ত প্রাণীর অবস্থাইতো মানুষের সমান। মানুষের মতনই তাহারা দুঃখ ভোগ করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শকুনি তাহার শিকারের অঙ্গ ছিঁড়িয়া খায়, ঈগল্ শকুনিকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে। ঈগল আবার মানুষের শরে বিদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত মানুষ হিংস্র পক্ষীর খাদ্যে পরিণত হয়। জগতের প্রত্যেক অঙ্গই যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। সকলেই জন্মিয়াছে যন্ত্রণাভোগের জন্য ও পরস্পরের সংহারের জন্য। এই ভীষণ সংহারলীলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তুমি বলিবে, "প্রত্যেকের অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হয়?" কি সুন্দর সুখের অবস্থা! অনুকম্পার্হ মরণশীল তুমি যখন কম্পিতকণ্ঠে উচ্চরবে ঘোষণা কর, "সকলই মঙ্গলময়", বিশ্ব তখন তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তোমার অন্তর শতবার তোমার বুদ্ধিকে লঙ্ঘন করিয়া যায়। কোথা হইতে মানুষ আসিয়াছে, তাহার গন্তব্য স্থান কি, তাহা সে জানে না। পঙ্কশয্যাশায়ী, যন্ত্রণা-পীড়িত মৃত্যুগ্রস্ত, ভাগ্যের ক্রীড়নক, কিন্তু চিন্তা-শক্তির অধিকারী মানুষ। তাহার দূরদৃষ্টিক্ষম চক্ষু বুদ্ধিবলে অস্পষ্ট নক্ষত্ররাজির পরিমাপ করিয়াছে। আমাদের সত্তা অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে আমরা দেখিতেও পাইনা, জানিও না। অহঙ্কার ও অন্যায়ের রঙ্গক্ষেত্র এই পৃথিবী মূর্খে পরিপূর্ণ। সেই মূর্খেরাই সুখের কথা বলে।....এক সময় ছিল

যখন আমি সুখের গান গাহিয়াছি। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সহিত অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে,....গভীর অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সন্ধান করিয়া এখন কেবলই দুঃখ ভোগ করিতেছি। কিন্তু তজ্জন্য আমার আক্ষেপ নাই।"

রুসোর সহিত কলহ

ইহার কয়েক মাস পরেই Seven years' war আরব্ধ হইল। "কানাডার কয়েক একর বরফের জন্য" এই যুদ্ধকে ভলটেয়ার উন্মত্ততা ও আত্মহত্যা ব‌ি‌য়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাহার পরে আসিল রুসোকর্তৃক তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কবিতার উত্তর। রুসো লিখিয়াছিলেন, "মানুষ নিজের দোষে দুঃখভোগ করে। নগরে বাস না করিয়া মানুষ যদি উন্মুক্ত প্রান্তরে বাস করিত, তাহা হইলে ভূমিকম্পে মারা যাইত না।" পড়িয়া ভলটেয়ারের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিন দিনের মধ্যে তিনি Candide গ্রন্থ লিখিয়া শেষ করিলেন। এই গ্রন্থে তিনি রুসোর বিরুদ্ধে তাঁহার ভীষণতম অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সে অস্ত্র "ভল্‌টেয়ারের শ্লেষ।"

এই গ্রন্থে নিরাশাবাদের স্বপক্ষে যেরূপ স্ফূর্ত্তির সহিত যুক্তিপ্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা সাহিত্যে দুর্লভ। জগৎ দুঃখময় প্রতিপাদন করিতে পাঠককে ইহার পূর্ব্বে কেহই এত প্রাণ খুলিয়া হাসাইতে পারে নাই। Anatole France বলিয়াছেন, "ভল্‌টেয়ারের অঙ্গুলিতে লেখনী দ্রুত চলিতে চলিতে হাস্যমুখর হইয়া উঠিয়াছে।"

গ্রন্থের নায়ক ক্যাণ্ডিডে, Westphaliর Baron-of-Thunder-Ton-Trochএর আত্মীয়। লোকে বলিত ক্যাণ্ডিডে ছিলেন উক্ত ব্যারণের ভগিনীর পুত্র এবং তাহার পিতা ছিলেন প্রতিবাসী একজন সাধু চরিত্রের লোক, কিন্তু যে বংশে তাহার পিতার জন্ম হইয়াছিল, ব্যারণের বংশের মত তাহার প্রাচীনতার দাবী ছিল না বলিয়া, তাঁহার মাতা তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। Candide সরল-প্রকৃতি ও সাধু-চরিত্র যুবক। ব্যারণের এক সুন্দরী কন্যা ছিল, তাহার নাম কুনেগণ্ডে। প্যানগ্লস্‌নামীয় এক পণ্ডিত ব্যারণ পরিবারের শিক্ষা গুরু ছিলেন। তিনি Metaphysico-Theologico-Cosmonigologyর অধ্যাপক। তিনি বলিলেন "ইহা প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়, যে যাহা কিছু ঘটে, সকলই অবশ্যম্ভাবী। জগৎ যেরূপ, তাহা অপেক্ষা অন্যরূপ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। প্রত্যেক দ্রব্যই বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। সুতরাং সে উদ্দেশ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে বাধ্য।"

একদিন কুনেগণ্ডে দুর্গের সন্নিকটবর্ত্তী এক উদ্যানে ভ্রমণকালে দেখিতে পাইলেন, প্যানগ্লস্ তাহার মাতার এক সুন্দরী যুবতী পরিচারিকাকে পরীক্ষামূলক দর্শনে শিক্ষা দান করিতেছেন। কুনেগণ্ডের বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আনুরক্তি ছিল। নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি তাহাদের দার্শনিক পরীক্ষামূলক কার্য্যাবলী দেখিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, কারণ হইতে কার্য্যের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। ক্যাণ্ডিডের সঙ্গে ইহার

পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা লইয়া 'কনেগণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে ফিরিয়া ক্যাণ্ডিডের সঙ্গে দেখা হইলে লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া গেল। ক্যাণ্ডিডের মুখও তথৈবচ। পরদিন নৈশাহারের পরে ক্যাণ্ডিডের সঙ্গে কনেগণ্ডে পর্দার পশ্চাতে প্রবেশ করিলেন। কনেগণ্ডের রুমাল কক্ষতলে পড়িয়া গেল। ক্যাণ্ডিডে রুমাল তুলিয়া লইলেন। কনেগণ্ডে নিষ্কলুষ মনে তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন! তিনিও নিষ্কলুষ মনে তাহার হস্ত চুম্বন করিলেন। তার পরে অধরে অধর মিলিত হইল, নয়ন উজ্জ্বলতা ধারণ করিল, জানু কম্পিত হইল এবং উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন। এমন সময়ে ব্যারণ Thunder-ten-Troch পর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং পদাঘাতে ক্যাণ্ডিডেকে দুর্গের বাহির করিয়া দিলেন। ক্যাণ্ডিডে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে ব্যারণের স্ত্রী তাহাকে চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। দুর্গে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

ইহার পরে-একদিন ক্যাণ্ডিডে বন্দী হইয়া বুলগেরিয় সৈন্য-শিবিরে নীত হইলেন। সেখানে তাহাকে সৈন্যদলভুক্ত করা হইল। একদিন পলায়ন করিবার সময় ধৃত হইয়া তিনি শিবিরে আনীত হইলেন। Court Martial আদেশ করিলেন, তাহাকে হয় সমগ্র সৈন্যদলের প্রত্যেক সৈন্যকর্তৃক ছত্রিশবার বেত্রাঘাত অথবা একবার মস্তকে বারোটি বন্দুকের গুলি, ইহার মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হইবে। মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন, এই জন্য তিনি দুইটির একটিও পছন্দ করিলেন না। কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতার যুক্তি কোনও কাজে লাগিল না। অগত্যা তিনি বেত্রাঘাতে সম্মত হইলেন। সৈন্যদলে দুই হাজার সৈন্য ছিল। দুই বারে চারিহাজার আঘাত গ্রহণ করিয়া ক্যাণ্ডিডে রক্তাক্ত দেহে শুইয়া পড়িলেন, এবং অবশিষ্ট বেত্রাঘাতের পরিবর্ত্তে তাহাকে গুলি করা হউক, এই প্রার্থনা জানাইলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। তাহার চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হইল। হঠাৎ বুলগেরিয়ার রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন ক্যাণ্ডিডে সংসার-জ্ঞানাভিজ্ঞ দার্শনিক। তিনি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসায় ক্যাণ্ডিডে সুস্থ হইয়া দেখিলেন, বুলগেরিয়ার রাজার সহিত অন্য এক রাজার যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। কামানের গোলায় প্রথমে এক এক পক্ষে ছয় হাজার লোক মরিল। তার পরে বন্দুকের গোলায়, এই সর্ব্বোত্তম জগতের বক্ষ-কলুষিতকারী নয় দশ হাজার পাষণ্ড নিহত হইল। সঙ্গীণের আঘাতে কয়েক সহস্রের মৃত্যু হইল। মোট প্রায় ত্রিশ হজার লোককে ধরাধাম ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। ক্যাণ্ডিডে এই হত্যাকাণ্ডের সময় দার্শনিকের মত কাঁপিতে লাগিলেন, এবং ইহার পরে একদিন যখন উভয় সৈন্যদলে "Te deums" (ঈশ্বরের গৌরবগান) গীত হইতে লাগিল, তখন পলায়ন করিলেন। রাশীকৃত মৃত ও মুমূর্ষু নরদেহের উপর দিয়া তাহাকে যাইতে হইল। ভস্মীভূত গ্রাম সকলের মধ্যে যুদ্ধের পরিণাম দেখিতে দেখিতে তিনি চলিতে লাগিলেন। দেখিলেন রক্তাক্ত দেহে ভূপতিত বৃদ্ধ অদূরে শায়িত তাহার স্ত্রীর মৃত দেহের দিকে চাহিয়া আছে; স্ত্রীর রক্তপ্লাবিত দেহের উপর শিশু সন্তান পড়িয়া আছে। ধর্ষিতা নারী ভূমিতলে পতিত হইয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। অর্দ্ধ-দগ্ধ অনেকে উচ্চৈঃস্বরে মৃত্যু কামনা

করিতেছে। পদ, বাহু, মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। সম্ভাব্য যাবতীয় জগতের মধ্যে সর্ব্বোত্তম জগৎ!!!

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ক্যাণ্ডিডে হল্যাণ্ডে রিক্তহস্তে উপস্থিত হইলেন। আশা করিয়াছিলেন খ্রীষ্টানের বাসভূমিতে তাঁহাকে অনাহারে মরিতে হইবে না। কয়েকজন ভদ্রবেশী লোকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করায়, তাহারা তাহাকে জেলে পাঠাইতে চাহিলেন।* একজন ভদ্রলোক "দানশীলতা"-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করায়, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বিশ্বাস কর, খৃষ্ট-শত্রু (anti-Christ সয়তান) পৃথিবীতে 'আছে'? ক্যাণ্ডিডে কহিলেন, "তা তো শুনি নাই। কিন্তু তিনি থাকুন বা না থাকুন, আমার খাবার চাই"। বক্তা বলিলেন "ভাগো! খাবার তোমার মত লোকের জন্য নয়।" বক্তার স্ত্রী নিকটবর্ত্তী গৃহের জানালা দিয়া ক্যাণ্ডিডের মাথার উপর এক বাল্তি ময়লা জল নিক্ষেপ করিলেন। জেম্‌স নামক একজন Ana-Baptist দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। তিনি ক্যাণ্ডিডেকে গৃহে লইয়া গিয়া আহার্য্য ও নগদ দুই ফ্লোরিন দান করিলেন।

পরদিন রাস্তায় এক শীর্ণকায় ভিক্ষুকের সহিত ক্যাণ্ডিডের দেখা হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, চক্ষু দীপ্তিহীন, নাসিকার অগ্রভাগ খসিয়া পড়িয়াছে, মুখ বাঁকিয়া গিয়াছে। ভিক্ষুক তাহার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিল; ক্যাণ্ডিডে তাহাকে প্যানগ্লস্ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তাহার নিকট শুনিলেন, বুলগেরিয়ার সৈন্য ব্যারণের দুর্গ আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়াছে; কুনেগণ্ডেকে ধর্ষণ করিয়া পরে হত্যা করিয়াছে, ব্যারণ ও তাহার স্ত্রীকেও হত্যা করিয়াছে; শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে প্যানগ্লসের শোচনীয় অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্যানগ্লস্ কহিলেন "প্রেম, মানবজাতির সান্ত্বনা, বিশ্বের রক্ষক, প্রাণী-জগতের আত্মা, সুকোমল প্রেমই তাঁহার দুর্গতির কারণ।" এমন পবিত্র প্রেম হইতে কিরূপে এই ভীষণ অবস্থা উৎপন্ন হইল, ক্যাণ্ডিডে জিজ্ঞাসা করিলে, প্যানগ্লস কহিলেন "ব্যারণ-মহিষীর পরিচারিকার বক্ষলীন হইয়া আমি স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছি। তাহারই ফল এই। তাহার শরীরে উপদংশের বীজ ছিল। একজন পণ্ডিত সন্ন্যাসীর শরীর হইতে তাহা তাহার শরীরে সংক্রামিত হইয়াছিল। এক বৃদ্ধা Countess এর শরীর হইতে সন্ন্যাসীর শরীরে সেই বীজ যায়। Countess এর শরীরে আসে এক সৈন্যাধ্যক্ষের শরীর হইতে; সৈন্যাধ্যক্ষের শরীরে সংক্রামিত হয় এক মার্কুইস্-পত্নী কর্ত্তৃক, মার্কুইসপত্নী পেয়েছিলেন এক Spaniardএর শরীর হইতে। এ সমস্তই অপরিহার্য্য ছিল"। ক্যাণ্ডিডে তাহাকে জেম্‌সের নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে সুচিৎকসায় প্যান্‌গ্লস্ আরোগ্যলাভ করিলেন। দুই মাস পরে জেম্‌সকে লিসবন যাইতে হইল। প্যানগ্লস্‌কে তিনি সঙ্গে লইয়া গেলেন।

জাহাজে তিনজনের মধ্যে অনেক দার্শনিক আলোচনা হইল। প্যানগ্লস্ বলিলেন "প্রত্যেক দ্রব্যই এমন ভাবে সৃষ্ট, যে তাহার উৎকৃষ্টতর হইবার সম্ভাবনা ছিল না।" জেম্‌স তাহা স্বীকার না করিয়া কহিলেন, "মানুষ তাহার প্রকৃতি কলুষিত করিয়াছে। হিংস্র প্রকৃতি লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে নাই, অথচ ব্যাঘ্রের মত হিংস্র হইয়া পড়িয়াছে। কামান

অথবা সঙ্গীন ঈশ্বর মানুষকে দান করেন নাই, অথচ পরস্পরের বিনাশের জন্য মানুষ তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছে।" প্যানগ্লস্ বলিলেন "সকলই অপরিহার্য্য ছিল। ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যই সর্ব্বজনীন মঙ্গল, সুতরাং ব্যক্তির দুর্ভাগ্য যত বেশী হয়, সাধারণের মঙ্গলও ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"

হঠাৎ আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, ও প্রবল ঝটিকা আরব্ধ হইল। মাস্তুল ভাঙ্গিয়া গেল, পাল ছিঁড়িয়া উড়িয়া গেল। যাত্রিগণের মধ্যে কলরব উত্থিত হইল। ডেকের উপর গিয়া জেম্‌স্ নাবিকদিগকে সাহায্য করিতেছিলেন, এমন সময় এক নাবিক তাহাকে ভীষণ আঘাত করিয়া ডেকের উপর ফেলিয়া দিল, কিন্তু প্রহারকালে পদস্খলিত হইয়া সে জাহাজের বাহিরে পড়িয়া গেল। ভাঙ্গা মাস্তুল ধরিয়া সে ঝুলিতেছিল, জেম্‌স্ তাহাকে টানিয়া তুলিতে গিয়া নিজে সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। নাবিক ডেকে উঠিয়া তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। ক্যাণ্ডিডে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু বাধা দিয়া প্যানগ্লস্ কহিল, "সমুদ্রে ডুবিয়া মরাই তাহার নিয়তি, সেই জন্যই সে লিসবন যাত্রা করিয়াছিল।" জাহাজ ডুবিয়া গেল। সেই দুর্বৃত্ত নাবিক এবং প্যানগ্লস ও ক্যাণ্ডিডে ব্যতীত সকলেরই মৃত্যু হইল। তাহারা তীরে উঠিবামাত্র লিসবনের ভীষণ ভূমিকম্প আরব্ধ হইল। প্রকৃতির সেই ভীষণ তাণ্ডবে ত্রিশ সহস্র নরনারী প্রাণ হারাইল। রাস্তা-ঘাট ভস্ম ও লাভায় আচ্ছাদিত হইয়া গেল। অসংখ্য গৃহ ভূপতিত হইল। সেই দুর্বৃত্ত নাবিক তখন লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল, এবং এক যুবতীসহ আমোদে মত্ত হইল। প্যানগ্লস্ ও ক্যাণ্ডিডে আর্ত্তজনগণের সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। প্যানগ্লস্ কহিলেন "ভূমিকম্পের না হইবার উপায় ছিল না। আগ্নেয় গিরি যখন লিসবনে অবস্থিত, তখন তাহা অন্যত্র ফাটিবে কিরূপে? সকলই মঙ্গলের জন্য সংঘটিত হয়।" কৃষ্ণ পরিচ্ছদ-পরিহিত Inquisitionএর সহিত সংশ্লিষ্ট একটি লোক শুনিয়া কহিল, "আপনি কি প্রাথমিক পাপে[১] বিশ্বাস করেন না? সকলই যদি মঙ্গলের জন্য হয়, তাহা হইলে মানুষের পতন[২] হয় নাই, তাহার শাস্তিও নাই?" প্যানগ্লস্ কহিলেন, "মানুষের পতন ও তাহার জন্য অভিশাপ উভয়েরই এই সর্ব্বোত্তম জগতে প্রবেশ অপরিহার্য্য ছিল।" "তাহা হইলে আপনি স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাস করেন না?" প্যানগ্লস্ কহিলেন, "নিরবচ্ছিন্ন নিয়তির"[৩] সহিত স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধ নাই। স্বাধীন ইচ্ছাও অপরিহার্য্য।"

ভূমিকম্পের পরেই ক্যাথলিক ধর্ম্মে অবিশ্বাসীদিগের বিচারের জন্য Inquisitionএর প্রতিষ্ঠা হইল। স্থির হইল, যে ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরোধী পাপিষ্ঠদিগকে আস্তে আস্তে পোড়াইয়া মারিলে ভূমিকম্প বন্ধ হইবে। প্যানগ্লস্ ও ক্যাণ্ডিডে ধৃত হইয়া Inquisition সমীপে নীত হইলেন। প্যানগ্লসের ফাঁসী হইল, ক্যাণ্ডিডেকে বেত মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ভীত ও বিস্মিত ক্যাণ্ডিডে ভাবিলেন, "এই যদি যাবতীয় সম্ভাব্য জগতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জগৎ, তবে অবশিষ্ট জগৎগুলি কিরূপ? দার্শনিক শ্রেষ্ঠ প্যানগ্লস্, নরোত্তম জেম্‌স্, রমণীরত্ন কুনেগণ্ডে, এই সর্ব্বোত্তম জগতে তোমাদের এত কষ্ট কেন?"

---

[1] Original Sin. [2] Fall. [3] Absolute necessity.

কয়েক দিন পরে এক অচিন্তিত উপায়ে কুনেগণ্ডের সহিত ক্যাণ্ডিডের দেখা হইল, কিন্তু এই মিলন স্থায়ী হইল না। আবার কুনেগণ্ডে ক্যাণ্ডিডে হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। ক্যাণ্ডিডে পলায়ন করিয়া আমেরিকায় গেলেন। প্যারাগুয়ে গিয়া দেখিতে পাইলেন দেশের যাবতীয় সম্পত্তি Jesuit পুরোহিতদিগের হস্তগত, প্রজাসাধারণের কিছুই নাই—যুক্তি ও ন্যায়-বিচারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এক ওলন্দাজ উপনিবেশে একহস্ত ও একপদ-বিশিষ্ট ছিন্নবস্ত্র পরিহিত এক নিগ্রো বলিল, "কলে কাজ করিবার সময় কোনও শ্রমিকের একটা আঙ্গুল যদি কলে আটকাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত হাতটিই কাটিয়া ফেলা হয়। কেহ যদি পলায়নের চেষ্টা করে, তাহার এক পা কাটিয়া ফেলে। তোমাদের চিনির অভাব দূর করিবার জন্য এই মূল্য দিতে হয়।" El Dorado দেশে গিয়া ক্যাণ্ডিডে অনেক স্বর্ণ ও রত্ন সংগ্রহ করিলেন, এবং তাহা লইয়া দেশে ফিরিবার জন্য এক জাহাজ ভাড়া করিলেন। স্বর্ণ-রত্ন জাহাজে বোঝাই হইবামাত্র তাহার মালিক ক্যাণ্ডিডেকে তীরে ফেলিয়া রাখিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিল। সামান্য যাহা ছিল, তাহা লইয়া দেশে ফিরিবার পথে জাহাজে মার্টিন-নামক এক বৃদ্ধ পণ্ডিতের সহিত ক্যাণ্ডিডের আলাপ হইল। ক্যাণ্ডিডে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষ কি চিরকালই বর্ত্তমানের মত মানুষকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া আপনি বিশ্বাস করেন? মানুষ কি চিরকালই মিথ্যাবাদী, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ, দস্যু, মূর্খ, তস্কর, পাপিষ্ঠ, ঔদরিক, মাতাল, কৃপণ, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, উচ্চাভিলাসী, রক্ত-পিপাসু, পরনিন্দুক, লম্পট, ধর্ম্মোন্মত্ত ও ভণ্ড?" মার্টিন কহিলেন "তুমি কি বিশ্বাস কর, বাজপক্ষী চিরকালই দেখিবামাত্র কপোত মারিয়া খাইয়াছে?" ক্যাণ্ডিডে কহিলেন "নিশ্চয়।" মার্টিন—তবে? বাজের চরিত্র যদি চিরকালই অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া থাকে, তবে মানুষের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস কর কেন? ক্যাণ্ডিডে—"ওঃ। কিন্তু মানুষ ও পশুতে প্রভেদ বিস্তর। ইচ্ছার স্বাধীনত—।" তর্ক করিতে করিতে তাহারা বোর্ডোতে পৌছিলেন। ক্যাণ্ডিডে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র কুনেগণ্ডের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বহু অনুসন্ধানের পরে তাহাকে তুরস্ক দেশে প্রাপ্ত হইলেন। কুনেগণ্ডে এক রাজবাড়ীতে পরিচারিকার কাজ করিতেছিলেন। তাহার সৌন্দর্য্যের কণামাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। দেখিয়া ক্যাণ্ডিডে দুঃখে অভিভূত হইলেন। কুনেগণ্ডে তখন ক্যাণ্ডিডে যে তাহাকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। ক্যাণ্ডিডে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন, এবং কুনেগণ্ডেকে বিবাহ করিয়া তুরস্ক দেশেই বসতি স্থাপন করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

ক্যাণ্ডিডে গ্রন্থের বহুল প্রচার হইয়াছিল। রোমান ক্যাথলিক ফরাসী জাতির মধ্যে এই অশ্রদ্ধধান গ্রন্থের জনপ্রিয়তালাভে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। জার্মানী ও ইংলণ্ডের লোকে তাহাদের ধর্ম্মের সংস্কার করিয়া লইয়াছিল। চার্চ্চের অভ্রান্তত্ব অস্বীকার করিয়াও বাইবেলের প্রামাণ্যতা স্বীকার করিয়া, যুক্তির সাহায্যে তাহারা যখন বাইবেলের ব্যাখ্যা করিয়াছিল, ফ্রান্স তখন যুক্তির আশ্রয়গ্রহণ করে নাই। কিন্তু যখন তথায় বিস্তার আলোচনা আরম্ভ হইল, তখন অন্ধবিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্ত্তী কোনও আশ্রয় মিলিল না। ফলে

ফরাসী মন একেবারে অবিশ্বাসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। যখন লা মেত্রী, হেলভেটিয়াস্, হলব্যাক্, ডিডোরো, দালেম্বার্ট শত্রুর মত পৈতৃক ধর্ম্ম আক্রমণ করিলেন, তখন বহু লোক তাঁহাদের কথা আগ্রহের সহিত শুনিল। ভলটেয়ারের ক্যাণ্ডিডে ও তাহারা সাদরে গ্রহণ করিল।

দার্শনিক অভিধান

ভলটেয়ার কিছুদিন বিশ্বকোষের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং বিশ্বকোষ-সংঘের নেতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। বিশ্বকোষে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি নিজেই Philosophic Dictionary নামে এক দার্শনিক কোষ লিখিতে আরম্ভ করেন। বর্ণমালাক্রমে বহু বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি এই কোষে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রবন্ধই জ্ঞানে সমুজ্জ্বল। দে-কার্ত্তের "সন্দেহ" হইতে তিনি দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বেইল্ তাঁহাকে সন্দেহ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রত্যেক দর্শনের উদ্ভাবয়িতাই না জানিয়া জানার ভাণ করিয়াছেন। জ্ঞান যাহাদের কম, তাহারাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়া বসে। প্রথম তত্ত্ব[1]-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। ইচ্ছাকর্তৃক কিরূপে আমাদের অঙ্গ সঞ্চালিত হয়, ইহাই যখন আমরা জানি না, তখন ঈশ্বর, দেবতা এবং মনঃ-সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা অহমিকার চূড়ান্ত। মনের সন্দেহাকুল অবস্থা প্রীতিকর নহে, কিন্তু উপরি উক্ত বিষয়-সম্বন্ধে নৈশ্চিত্য নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার। কিরূপে আমার জন্ম হইল, তাহাও আমার অজ্ঞাত। জীবনের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত না হওয়া পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি অথবা অনুভব করিয়াছি, তাহার কারণ জানিতে পারি নাই। যাহাকে জড় বলা হয়, তাহাকে সিরিয়াস্ নক্ষত্রের আকারেও দেখিয়াছি, আবার অণুবীক্ষণদৃশ্য ক্ষুদ্রতম কণার আকারেও দেখিয়াছি। কিন্তু এই জড়পদার্থ কি, তাহা জানি না। "উত্তম ব্রাহ্মণ" নামক প্রবন্ধে[2] ভলটেয়ার লিখিতেছেন: ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার জন্ম না হইলেই ভাল হইত।" আমি বলিলাম "কেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "গত ৪০ বৎসর যাবৎ আমি অধ্যয়ন করিতেছি। এখন দেখিতেছি, এই চল্লিশ বৎসর বৃথা নষ্ট হইয়াছে। আমার শরীর যে জড়পদার্থদ্বারা গঠিত, তাহা আমার বিশ্বাস। কিন্তু চিন্তা কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই। ভ্রমণ ও পরিপাক কার্য্যের মত আমার বুদ্ধিও দেহেরই একটি স্বাভাবিক শক্তি কি না, আমার হস্তদ্বারা কোনও বস্তু যেমন গ্রহণ করি, চিন্তাও মস্তকের সেইরূপ কোনও কাজ কি না, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। অনেক কথা আমি বলি, কিন্তু বলা যখন শেষ হয়, তখন যাহা বলিয়াছি, তাহার জন্য লজ্জাবোধ করি।" সেইদিন প্রতিবাসিনী এক বৃদ্ধার সহিত কথোপকথনকালে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার আত্মার কিরূপে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা জানিতে না পারার জন্য তিনি কি দুঃখবোধ করেন। বৃদ্ধা প্রথমে আমার প্রশ্ন বুঝিতেই

---

[1] First Principles. [2] The Good Brahmin.

পারিলেন না। ব্রাহ্মণ যে যে বিষয়ের চিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ক্ষণকালের জন্যও তিনি সেই সকল বিষয়ের চিন্তা করেন নাই। বিষ্ণুর নানা অবতারে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, এবং গঙ্গাস্নান করিতে পারিলেই তিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী মনে করেন। আমি এই সরল স্ত্রীলোকের সুখের পরিচয় পাইয়া সুখী হইলাম, এবং ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া বলিলাম, "আপনার গৃহের অদূরে যে বৃদ্ধা বাস করেন, তিনি কোনও বিষয়েই চিন্তা না করিয়াও সুখে আছেন, ইহা দেখিয়া কি আপনি লজ্জা বোধ করেন না?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আমিও অনেক বার ভাবিয়াছি, ঐ বৃদ্ধার মত যদি অজ্ঞ হইতে পারিতাম, তাহা হইলে সুখী হইতে পারিতাম। কিন্তু ওরূপ সুখ আমি কামনা করি না।"

ভলটেয়ার বলিয়াছেন "দর্শন যদি নিরবচ্ছিন্ন সন্দেহে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলেও সেই সন্দেহ মানুষের বৃহত্তম ও মহত্তম সম্পদ। মায়াবী কল্পনার বলে নূতন নূতন মতের উদ্ভাবন না করিয়া জ্ঞানের অনতিপ্রসর অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট থাকাই আমাদের কর্ত্তব্য। নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা না করিয়া, পদার্থের নির্ভুল বিশ্লেষণ করিয়া, কোন্ তত্ত্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য আছে, তাহাই আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করাই উচিত। কোন্ পথে বিজ্ঞানের অনুসরণ করা উচিত, বেকন তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। দে-কার্ত্তে সে পথ অবলম্বন না করিয়া বিপরীত পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন....প্রকৃতির অধ্যয়ন না করিয়া তিনি তাহার রহস্য অনুমানদ্বারা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়া উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। গণনা, পরিমাপ, তৌল ও পর্য্যবেক্ষণ করাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, আর যাহা কিছু তাহার প্রায় সমস্তই কপোল কল্পনা।"

চার্চ্চের সহিত কলহ

এই সময়ে কয়েকটি ঘটনায় ভলটেয়ারের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যে তরলতা ও হাস্যরসিকতা তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল, হঠাৎ তাহা গাম্ভীর্য্য ও কাঠিন্যে পরিণত হইল। রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন, এবং অক্লান্ত ভাবে সেই যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

ফার্ণি হইতে অনতিদূরে টুলু[১] নগর। তখন ক্যাথলিক পুরোহিতগণই তথায় সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কোনও প্রোটেষ্টাণ্ট তথায় আইন অথবা চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে অথবা পুস্তক, ঔষধ, কিংবা পরিচ্ছদদ্রব্যের দোকান করিতে অথবা মুদ্রাযন্ত্র রাখিতে পারিত না। কোনও ক্যাথলিক প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ভৃত্য রাখিতে পারিত না! ১৭৪৮ সালে একটি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধাত্রীনিয়োগের অপরাধে এক স্ত্রীলোকের ৯০০০ ফ্রাঙ্ক অর্থদণ্ড হইয়াছিল। নগরে প্রতি বৎসর St. Bertholomewর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিবার্ষিকী আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইত। এখানে ক্যালাস নামক এক প্রোটেষ্ট্যাণ্টের কন্যা ক্যাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করে। ইহার কিছুদিন পরে ক্যালাসের পুত্র ব্যবসায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আত্মহত্যা করে।

[১] Toulouse.

কিন্তু জনরব প্রচারিত হয়, যে পুত্রও ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার উদ্যোগ করায় পিতা তাহাকে হত্যা করিয়াছে। ক্যালাসকে বন্দী করিয়া পুরোহিতগণ তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। ইহার ফলে তাহার মৃত্যু হয়। ক্যালাসের পরিবারগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ফার্ণিতে ভলটেয়ারের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং ভলটেয়ার তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আশ্রয় দেন। (১৭৬১ সালে)

এই সময়ে এলিজাবেথ সারভেনস্ নামক এক মহিলার মৃত্যুর পরে (১৭৬২ সালে) জনরব রটে, যে উক্ত মহিলা ক্যাথলিক ধর্ম্ম-গ্রহণের আয়োজন করিতেছিলেন বলিয়া প্রোটেষ্টাণ্টগণ তাঁহাকে কূপের মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। ১৭৬৫ সালে লা বার নামে এক যুবককে কয়েকটি ক্রুশকাষ্ঠ ভঙ্গ করার অভিযোগে বন্দী করা হয়। পীড়নের ফলে যুবক অপরাধ স্বীকার করে। তখন তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া, দেহ অগ্নিতে পোড়াইয়া ফেলা হয়। তাহার নিকট ভলটেয়ারের Philosophic Dictionaryর এক খণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। তাহাও পোড়াইয়া ফেলা হয়।

ভলটেয়ার জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্মিত প্রফুল্ল আনন হইতে হাস্য অন্তর্হিত হইল। অন্তর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইল। লেখনী আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হইল, এবং তাহা হইতে অনল ও লাভা নির্গত হইতে লাগিল। দালেম্বার্টকে লিখিলেন, "আর পরিহাসের সময় নাই। হত্যাকাণ্ডের মধ্যে হাস্যপরিহাস চলে না, আমাদের বার্থোলোমুর হত্যাকাণ্ডের দেশে দর্শনালোচনা ও আনন্দের অবকাশ নাই।" দর্শনের আলোচনা ছাড়িয়া ভলটেয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। বন্ধুবান্ধবদিগকে যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান পাঠাইলেন। "কোথায় ডিডেরো, কোথায় বীর দালেম্বার্ট, সকলে অগ্রসর হও, ধর্ম্মান্ধ প্রতারকদিগের শূন্যগর্ভ বক্তৃতা, ঘৃণিত কূটতর্ক, কল্পিত ইতিহাস, অন্তহীন অসঙ্গতির বিনাশ কর। যাহাদিগের বুদ্ধি আছে, বুদ্ধিহীনের দাসত্ব হইতে তাহাদিগকে মুক্ত কর, এবং যাহারা এখন জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহাদিগকে প্রজ্ঞা ও স্বাধীনতালাভে সাহায্য কর।" ভলটেয়ারের সুনিপুণ হস্তে দর্শন ডিনামাইটে পরিণত হইল। সেই ডিনামাইটে পোপের সিংহাসন বিপর্য্যস্ত হইল, তাঁহার মুকুট-দণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িল, ফ্রান্সের রাজসিংহাসনের ভিত্তি চূর্ণ হইয়া গেল।

Madame de Pompadour তাঁহাকে কার্ডিনাল পদের লোভ দেখাইয়া চার্চ্চ ও তাঁহার মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভলটেয়ার অচল অটল। কার্থেজের ধ্বংস যেমন কেটোর একমাত্র কাম্য ছিল, তেমনই চার্চ্চের ধ্বংস তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইল। Treatise on Toleration গ্রন্থে তিনি লিখিলেন, "পুরোহিতেরা যদি তাহাদের প্রদত্ত উপদেশানুযায়ী জীবন যাপন করিত, এবং মতভেদ সহ্য করিত, তাহা হইলে তাহাদের মতের অসঙ্গতি গ্রাহ্য করিতাম না। বাইবেলে যে সমস্ত কূটতর্কের বিন্দুমাত্রও সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহাই খৃষ্টীয় ইতিহাসের রক্তাক্ত কলহের মূল। আজ যে বলিতেছে, 'আমি যাহা বলি, তাহা বিশ্বাস না করিলে ঈশ্বর তোমাকে নরকে পাঠাইবেন, কাল সে বলিবে, 'আমি যাহা বিশ্বাস করি, তাহা যদি বিশ্বাস না কর, তোমাকে হত্যা করিব।' সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য পরমতাসহিষ্ণুতার মূল পুরোহিত-তন্ত্রের ধ্বংস অপরিহার্য্য।"

ইহার পর অবিরল স্রোতে পুস্তিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। দার্শনিকতত্ত্ব ইহার পূর্ব্বে এমন সরল ভাষায় ও এমন জীবন্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। ভলটেয়ারের রচনা পড়িয়া দর্শন পড়িতেছি বলিয়া কাহারও মনে হইত না। কোনও কোনও পুস্তকের তিনলক্ষ সংখ্যাও বিক্রীত হইয়াছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে এমনটী পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই।

বাইবেলের ঐতিহাসিকতা ও অভ্রান্ততার তিনি যে সমালোচনা[1] করিয়াছিলেন, তাহার উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্পিনোজা হইতে। তাঁহার হস্তে এই উপাদান ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

"জাপেতার প্রশ্নাবলীর"[2] জাপেতা পৌরাহিত্যের প্রার্থী। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, শত শত ইহুদীকে আমরা পোড়াইয়া মারিয়াছি। এখন কিরূপে প্রমাণ করিব, যে ইহুদী জাতি চারি সহস্র বৎসর যাবৎ ঈশ্বরের অনুগৃহীত ছিল। পুরাতন বাইবেলে উল্লিখিত তারিখ ও বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে অসঙ্গতি দেখাইয়া জাপেতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুই খৃষ্টীয় কাউন্সিলের মধ্যে যখন একটী অপরকে অভিসম্পাত করে, তখন তাহাদের কোনটী অভ্রান্ত, জানিবার উপায় কি?" উত্তর না পাইয়া তিনি সরলচিত্তে প্রচার আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন, ঈশ্বর সকলের পিতা, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের শাস্তা; তিনি ক্ষমাশীল। মিথ্যা হইতে সত্যকে, ধর্ম্মান্ধতা হইতে ধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়া তিনি যে উপদেশ দিতে লাগিলেন, নিজের জীবনে তাহা অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইলেন। তিনি শান্ত, দয়ালু ও বিনীত ছিলেন। ১৬৩১ সালে তাঁহাকে আগুনে পোড়াইয়া মারা হইল।

গ্রীস, ভারতবর্ষ ও মিশর দেশকে ভলটেয়ার খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মাচারের উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এই সকল দেশে প্রচলিত মত গ্রহণ করার ফলেই খৃষ্টধর্ম্ম জয়যুক্ত হইয়াছে বলিয়াছেন।

Religion প্রবন্ধে একস্থলে বলিয়াছেন, "এত নষ্টামী[3] ও অর্থহীন প্রলাপ[4] সত্ত্বেও যে খৃষ্টধর্ম্ম ১৭০০ বৎসর বাঁচিয়া আছে, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়, যে ইহা ঐশ্বরিক ধর্ম্ম!!" অন্যত্র লিখিয়াছেন "এই সমস্ত হাস্যকর ও মারাত্মক কলহের যাহারা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা সমাজের সাধারণ লোক নয়। যাহারা তোমাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিয়া আরামে বাস করিতেছে, তাহারাই তোমাদিগের মনে ধর্ম্মান্ধতার বিষ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, তোমাদিগকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; উদ্দেশ্য তোমাদের মনে, ঈশ্বরের ভয় নয়, তাহাদের নিজেদের প্রতি ভয়ের সৃষ্টি।"

ধর্ম্মমত

চার্চ্চের সহিত এই কলহ হইতে ভলটেয়ারের যে ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল না, তাহা অনুমান করিলে ভুল হইবে। নাস্তিকতা তিনি স্পষ্টই বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরে

---

[1] Higher Criticism. [2] Questions of Zapeta.
[3] Villainy [4] Nonsense.

বিশ্বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার Encyclopedist বন্ধুদের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল The Ignorant Philosopher প্রবন্ধে তিনি স্পিনোজার মত নাস্তিকতার সমান বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ডিডেরো-কে তিনি লিখিয়াছিলেন "আমি Sandersonএর মতাবলম্বী নহি। Sanderson জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছেন। আমার ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অবস্থায় আমি এক বুদ্ধিমান মহান পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতাম, যিনি আমাকে দৃষ্টিশক্তি না দিলেও অনেক কিছু দিয়াছেন। যাবতীয় পদার্থের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অসীম ক্ষমতাশালী এক কর্ত্তা আছেন বলিয়া সন্দেহ করিতাম। তাঁহার স্বরূপ কি, এবং যাবতীয় সত্তাবান পদার্থের কেন তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অনুমান করা যেমন দুঃসাহসিকতার কাজ, তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করাও তেমনই দুঃসাহসিকতামূলক। তুমি আপনাকে তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের অন্যতম বলিয়া মনে কর, অথবা সনাতন এবং নিয়ত জড়ের ভাণ্ডার হইতে খণ্ডীকৃত অংশ বলিয়া গণ্য কর, তোমার সহিত তাহা আলোচনা করিবার জন্য আমি উৎসুক হইয়া আছি। তুমি যাহাই হওনা কেন, তুমি সেই বিরাট সমগ্রের একটী মূল্যবান অংশ, যে বিরাটকে আমি বুঝিতে প্যরি না।"

ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেও ভলটেয়ার অপ্রাকৃত ঘটনায় ও উপাসনার ফলোপধায়িত্বে বিশ্বাস করিতেন না। "প্রকৃত উপাসনা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমের জন্য প্রার্থনা নয়। প্রাকৃতিক নিয়মকে ঈশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয় ইচ্ছা বলিয়া গ্রহণ করাই প্রকৃত উপাসনা।"

"স্বাধীন ইচ্ছা"তেও[1] ভলটেয়ার বিশ্বাস করিতেন না। আত্মার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। "আত্মা কি, চারি হাজার দার্শনিক গ্রন্থ পড়িয়াও তাহা কেহ বলিতে পারিবে না।" আত্মার মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়াও তিনি বাধা পাইয়াছেন। "মক্ষিকার মধ্যে আত্মা আছে, একথা কেহ বলেনা। তবে, হস্তী, বানর, অথবা আমার ভৃত্যের মধ্যে আত্মা আছে বলা হয় কেন? মাতৃগর্ভে থাকিবার সময় দেহে আত্মা প্রবেশ করিবার পরেই যে শিশুর মৃত্যু হয়, সেও কি আত্মার পুনরুত্থানের দিনে উত্থিত হইবে। যদি উত্থিত হয়, তাহা হইলে কোন্ রূপে উঠিবে....ভ্রূণ, শিশু অথবা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের রূপে? যদি পুনরুত্থান হয়....যদি পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা হইয়াই উঠিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বের স্মৃতি লইয়াই উঠিতে হইবে। স্মৃতি যদি না থাকে, তাহা হইলে অনন্যতা কোথায় থাকিল! মানুষ কেন মনে করে, যে কেবল তাহার মধ্যেই অবিনশ্বর চৈতন্য বর্ত্তমান? তাহার অভিমানই হয়তো এই বিশ্বাসের কারণ! ময়ূরের যদি বাক্‌শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সেও হয়তো তাহার আত্মার গর্ব্ব করিত, এবং বলিত, সেই আত্মা তাহার পুচ্ছে অবস্থিত।"

কর্ম্মনীতির জন্য যে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস অপরিহার্য্য, ভলটেয়ার প্রথমে তাহা স্বীকার করিতেন না। প্রাচীন হিব্রুগণ আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিত না। আত্মার

[1] Free will.

অমরত্বে বিশ্বাস না করিয়াও স্পিনোজা নৈতিক চরিত্রের আদর্শ ছিলেন। কিন্তু ভলটেয়ারের মত পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, যে পরকালে শাস্তি ও পুরস্কার না থাকিলে, ঈশ্বরে বিশ্বাসের কোন নৈতিক মূল্য থাকে না। সাধারণ লোকের জন্য পুরস্কার ও শাস্তিদাতা একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন। নাস্তিকদিগের সমাজ স্থায়ী হইতে পারে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে ভলটেয়ার বলিয়াছিলেন, "পারে, যদি তাহারা দার্শনিক হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে দার্শনিকের সংখ্যা কম। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা যদি শান্তিতে বাস করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের ধর্ম্মের প্রয়োজন স্বীকার করিতেই হইবে।" "A. B. C." প্রবন্ধে বলিতেছেন, "আমার উকীল, আমার দর্জ্জি ও আমার স্ত্রীর ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, ইহা আমি চাই। তাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে আমি কম প্রতারিত হইব।" এক চিঠিতে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, "আমি সত্য অপেক্ষা জীবন ও সুখকে অধিক মূল্যবান মনে করি।" 'God' প্রবন্ধে নাস্তিক বন্ধু হলব্যাককে বলিতেছেন, "তুমি নিজেই বলিতেছ, ঈশ্বরে বিশ্বাস কাহাকেও কাহাকেও পাপ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। এই স্বীকৃতিই আমার পক্ষে যথেষ্ট। যদি এই বিশ্বাসে দশটী মাত্র হত্যা ও পরকুৎসাও বন্ধ হয়, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীরই এই বিশ্বাস অবলম্বন করা উচিত।" "ঈশ্বর যদি নাও থাকিতেন, তাহা হইলেও তিনি আছেন বলিয়া প্রচার করার প্রয়োজন হইত।" "তুমি বলিতেছ, ধর্ম্ম অসংখ্য অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে। ধর্ম্ম অমঙ্গলের সৃষ্টি করে নাই, করিয়াছে পৃথিবীব্যাপী কুসংস্কার। পরম পুরুষের উপাসনার প্রধান শত্রু এই রাক্ষস, যে মাতার গর্ভে তাহার জন্ম, তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছে। যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তাঁহারা মানবজাতির বন্ধু! ধর্ম্মমাতাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া এই কাল সর্প তাহার নিশ্বাস রোধ করিতেছে, মাতাকে আহত না করিয়া আমাদিগকে এই সর্পের মস্তক চূর্ণ করিতে হইবে।" Sermon on the Mount ভলটেয়ার আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যে ভক্তি-অর্ঘ্য তিনি যীশুকে দান করিয়াছেন, সন্তদিগের গ্রন্থেও তাহা দুর্লভ। যীশু তাঁহার নামে অনুষ্ঠিত পাপের জন্য রোদন করিতেছেন বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। ভলটেয়ার নিজের জন্য একটি গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। Theist প্রবন্ধে তিনি তাঁহার বিশ্বাস এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "যিনি যেমন শক্তিমান, তেমনি মঙ্গলময়, যিনি যাবতীয় পদার্থের স্রষ্টা, যিনি নিষ্ঠুর না হইয়াও পাপের শাস্তিদাতা, যিনি স্বীয় কল্যাণ-প্রবৃত্তিবশতঃ পুণ্যকর্ম্মের পুরস্কর্ত্তা, এবংবিধ পরম পুরুষের অস্তিত্বে যিনি দৃঢ় বিশ্বাস করেন, তিনিই ঈশ্বরবাদী; তিনি এই পুরুষের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের সহিত যুক্ত, পরস্পর বিবদমান কোনও সম্প্রদায়ের তিনি অন্তর্ভূ'ত নহেন। তাঁহার এই ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও দূরপ্রসারী। কেন না, সরল ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা যাবতীয় ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্ববর্ত্তী। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বরবাদী যাহা বলেন, তাহা বুঝিতে পারে।…পিপিং হইতে কেইএন্ পর্য্যন্ত ভূভাগের যাবতীয় অধিবাসীই তাঁহার ভ্রাতা। যাবতীয় পণ্ডিত তাঁহার সহকর্ম্মী। তিনি বিশ্বাস করেন, দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে অথবা অর্থবিহীন আচারের মধ্যে ধর্ম্ম নাই; ভক্তির সহিত পূজা ও ন্যায়পরতাই ধর্ম্ম।

পরের উপকারই তাঁহার পূজা, ঈশ্বরে আত্মনিবেদনই তাঁহার ধর্ম্মমত। মুসলমান তাহাকে বলে "সাবধান, মক্কাতীর্থ করিতে ভুলিও না।" ক্যাথলিক পুরোহিত বলে "Notre Dame de Loretteএ যদি না যাও, তো তোমার নিপাত হউক।" ঈশ্বরবাদী মক্কা ও লোরেট্ উভয়ই অগ্রাহ্য করিয়া দরিদ্রের সেবা ও অত্যাচারপীড়িতকে রক্ষা করেন!"

রাজনৈতিক মত

চার্চ্চের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিবার পরে ভলটেয়ার সেই সংগ্রামে এতই ব্যস্ত ছিলেন, যে শাসনতন্ত্রের পীড়ন ও অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার অবসর তাঁহার ছিল না। রাজনীতিতে তাঁহার শ্রদ্ধাও বেশী ছিল না। তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "রাজনৈতিক আন্দোলন আমার কর্ম্ম নয়। মানুষের নির্বুদ্ধিতার হ্রাস করিতে ও তাহাকে অধিকতর সম্মানের যোগ্য করিতেই আমি চিরকাল চেষ্টা করিয়াছি।" আর এক সময় ব্যবস্থাপ্রণেতাদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "যাহারা আপনাদিগের স্ত্রী ও পরিবার শাসন করিতে পারেন না, তাহাদেরই বিশ্ব পরিচালিত করিবার জন্য আগ্রহের অন্ত নাই।" ভলটেয়ার প্রভূত অর্থের মালিক হইয়াছিলেন, তাঁহার রাজনৈতিক মতও এইজন্য রক্ষণশীল ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিস্তারই তিনি সমস্ত রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিকার বলিয়া মনে করিতেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে চরিত্রের বিশেষত্ব ও আত্মসম্মানের উদ্ভব হয়। কৃষক যদি নিজে জমির মালিক হয়, তাহা হইলে জমির চাষও ভাল হয়। দেশের শাসনতন্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল না। যুক্তির দিক হইতে যদিও তিনি প্রজাতন্ত্রই পছন্দ করিতেন, প্রজাতন্ত্রের ত্রুটি-সম্বন্ধে তিনি অন্ধ ছিলেন না। প্রজাতন্ত্রে দলাদলির সৃষ্টি হয়। দলাদলিতে অন্তর্বিপ্লব যদি নাও হয়, তথাপি জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। ছোট ছোট যে সমস্ত রাষ্ট্রের ধনসম্পদ বেশী নাই, এবং যাহাদের ভৌগলিক অবস্থান এরূপ, যে বহিঃশত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয় নাই, প্রজাতন্ত্র সেই সমস্ত রাষ্ট্রেরই উপযোগী। সাধারণতঃ আপনাদিগকে শাসন করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। যতই ভাল হউক, কোনও প্রজাতন্ত্রই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যাবতীয় শাসনপ্রণালীর মধ্যে প্রজাতন্ত্রই প্রথমে উদভূত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক পরিবারের সমবায় হইতে ইহার উৎপত্তি। আমেরিকার Red Indianদিগের বিভিন্ন দল প্রজাতন্ত্রদ্বারাই শাসিত হইত। আফ্রিকার নিগ্রোদিগের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের অভাব নাই। কিন্তু আর্থিক অবস্থার বৈষম্য হইলেই প্রজাতন্ত্রের বিনাশ হয়। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক বৈষম্যের আবির্ভাব অপরিহার্য্য। রাজতন্ত্র ভাল, কি প্রজাতন্ত্র ভাল, চারি হাজার বৎসর ধরিয়া তাহা আলোচিত হইয়া আসিতেছে। ধনীরা বলিবে, অভিজাততন্ত্র ভাল; সাধারণ লোকে বলিবে, প্রজাতন্ত্র ভালো। মুষ্টিমেয়-সংখ্যক রাজারাই কেবল রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। তবু প্রায় সমস্ত পৃথিবী রাজতন্ত্রশাসিত কেন? উত্তর যদি চাও, তবে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার প্রস্তাব যে ইন্দুরেরা করিয়াছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।" একজন পত্রপ্রেরক রাজতন্ত্রের সমর্থন করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, "হাঁ রাজতন্ত্র ভালো, যদি মার্কাস

অরেলিয়াসের মত রাজা হয়। অন্যথা একটা সিংহেই খাউক, অথবা একশত ইন্দুরেই খাউক, তাহাতে দরিদ্র লোকের কি এসে যায়?"

সাধারণতঃ দেশপ্রীতি বলিতে যাহা বোঝায়, ভলটেয়ারের তাহা ছিল না। স্বদেশপ্রীতির অর্থ নিজের দেশ ব্যতীত অন্য সকল দেশকে ঘৃণা করা। অন্য দেশের ক্ষতি না করিয়া যিনি নিজের দেশের উন্নতি কামনা করেন, ভলটেয়ারের মতে তিনি স্বদেশহিতৈষী ও বিশ্ব-নাগরিক উভয়ই। ফ্রান্সের সঙ্গে যখন ইংলণ্ড ও প্রাসিয়ার যুদ্ধ চলিয়াছিল, তখন ভলটেয়ার প্রাসিয়ার রাজা ও ইংলণ্ডের সাহিত্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। যুদ্ধকে তিনি ঘৃণা করিতেন। "নরহত্যা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। সুতরাং সব হত্যাকারীরই শাস্তি হয়; হয়না কেবল সেই সকল লোকের, যাহারা ভেরী ও দামামার তালে তালে হাজার হাজার লোক হত্যা করে।" "মাতৃগর্ভে অবস্থানের সময় মানুষের অবস্থা থাকে উদ্ভিদের মত। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে তাহার অবস্থা হয় ইতর জন্তুর মত। পরিণত বুদ্ধির অবস্থা প্রাপ্ত হইতে কুড়ি বৎসর লাগে। তাহার শারীরিক গঠনের সম্বন্ধে সামান্য একটু জ্ঞানলাভ করিতে মানুষের লাগিয়াছে তিন হাজার বৎসর। তাহার আত্মাসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে অনন্ত কালের প্রয়োজন। কিন্তু তাহাকে হত্যা করিতে একটিমাত্র ক্ষণই যথেষ্ট।"

বিপ্লবদ্বারা সমস্যার সমাধান হয় বলিয়া ভলটয়ার বিশ্বাস করিতেন না। সাধারণ লোকের বুদ্ধির উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। "সাধারণ লোকে যখন তর্ক করিবার ভার লয়, তখন সর্বনাশ হয়।" 'যাহারা বলে সকল মানুষই সমান, তাহাদের কথার অর্থ যদি হয় যে সকল মানুষেরই স্বাধীনতায়, নিজের সম্পত্তিতে ও রাষ্ট্রকর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণে সমান অধিকার, তাহা হইলে তাহারা ঠিকই বলে। সাম্য একদিকে যেমন খুবই স্বাভাবিক পদার্থ, অন্যদিকে ইহা মায়া-মরীচিকামাত্র। যখন লোকের অধিকার-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন ইহা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যখন ইহার দোহাই দিয়া সমানভাবে সকলের মধ্যে সম্পত্তি ও ক্ষমতা-বণ্টনের চেষ্টা হয়, তখন নিতান্তই অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। স্বাধীন হওয়া অর্থ আইন ভিন্ন অন্য কিছুরই অধীন না হওয়া।" ট্যরগো, কঁদরসেট ও মীরাবো প্রভৃতি ভলটেয়ারের শিষ্যগণের মতও ইহাই ছিল। তাঁহারা সকলেই শান্তিপূর্ণ বিপ্লব চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যাচারপীড়িত জনসাধারণ ইহাতে সন্তুষ্ট ছিল না। তাহারা স্বাধীনতা ততটা চাহে নাই, যতটা চাহিয়াছিল সাম্য। স্বাধীনতার বিনিময়েও সাম্যই তাহাদের কাম্য ছিল। রুসোও এই মতাবলম্বী ছিলেন; তিনিও চাহিয়াছিলেন "সাম্য।" যখন তাঁহার শিষ্য মরাট ও রোবস্‌পিয়ার ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্বলাভ করিল, তখন স্বাধীনতার ফাঁসী হইল এবং সাম্যই বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হইল।

এক সময়ে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, "যাহাই চোখে পড়ে, তাহাই বিপ্লবের বীজ ছড়াইতেছে বলিয়া মনে হয়। একদিন বিপ্লব আসিবেই, কিন্তু তাহা দেখিবার সৌভাগ আমার হইবে না। বর্ত্তমানে যাহারা যুবক, তাহারা ভাগ্যবান। অনেক ভাল ভাল জিনিষ তাহারা দেখিতে পাইবে।" যখন ইহা লিখিয়াছিলেন, তখন ভাবিতেও পারেন নাই, ফ্রান্সে বিপ্লব কি ভীষণরূপে দেখা দিবে।

আইন করিয়া আদর্শ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা যায়, ইহা ভলটেয়ার বিশ্বাস করিতেন না। তিনি জানিতেন, মানব-সমাজের বিকাশ ঘটে কালের শক্তিতে, ন্যায়ের যুক্তিবলে নয়। টারগো যখন ষোড়শ লুইএর মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন, তখন ভলটেয়ার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন, "সত্যযুগ সমাগত। এইবার রাষ্ট্রে সমস্ত সংস্কার সাধিত হইবে, জুরীর বিচার প্রবর্ত্তিত হইবে, করভারের লাঘব হইবে, দরিদ্রদিগকে কোন করই দিতে হইবে না।" তখন বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার সুচিন্তিত আদর্শ বর্জন করিয়া ফ্রান্স রুসোর ভাবে ভাবিত হইয়া সর্ব্বধ্বংসী রক্তাক্ত পথ অবলম্বন করিবে। ফ্রান্সের বিপ্লবমুখী জটিল মন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—এক অংশ ভলটেয়ার-কর্তৃক প্রভাবিত, অপর অংশ রুসোর প্রভাবের অধীন। "এক অংশে লঘুক্ষিপ্র পদসঞ্চার, বৈদগ্ধ্য, তেজ, মাধুর্য্য, বলবতী যুক্তি, দর্পিত বুদ্ধি ও নক্ষত্রের চারু নৃত্য, অন্যদিকে নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ, উদ্দাম কল্পনা ও ভবিষ্যতের মনোহারী চিত্র[১]।" কিন্তু রক্তাক্ত বিপ্লব রুসোও চাহেন নাই। ১৭৯৪ সালের ৭ই মে তারিখে তাহার শিষ্য রোবস্‌পিয়ার যখন তাঁহাকে বিপ্লবীদিগের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া মানব জাতির শিক্ষাগুরু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, এবং ওক-পত্রের মুকুট উপহার দিয়াছিলেন, তিনি যদি তথায় তখন উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেন, এবং বিপ্লবের নায়কদিগকে শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন।

ভলটেয়ার ছিলেন যুক্তিবাদী[২], রুসো ছিলেন অনুভূতিকর্ত্তৃক চালিত[৩]।" সত্য ও কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে ভলটেয়ারের অবলম্বন ছিল যুক্তি, রুসোর অবলম্বন ছিল অনুভূতি। রুসো বলিয়াছিলেন "মস্তকের মত হৃদয়েরও যুক্তি আছে, যাহা মস্তক বুঝিতে পারে না।" উভয়ের মধ্যে এই বিরোধ বুদ্ধি ও সহজাত প্রবৃত্তির বিরোধ। যুক্তিতে রুসোর বিশ্বাস ছিল না। তিনি চাহিতেন কর্ম্ম। রক্তাক্ত বিপ্লবে তাঁহার তত ভয় ছিল না। বিপ্লবের ফলে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও মানবের অন্তরস্থ ভ্রাতৃভাব তাহাদিগকে পুনর্মিলিত করিবে বলিয়া তিনি আশা করিতেন। স্বাধীনতার বাধা আইনগুলি অপসারিত হইলে, সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার মত।*

Discourse on Inequality গ্রন্থে রুসো লিখিয়াছেন, মানুষ স্বভাবতঃ দোষহীন। সমাজে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলেই মানুষ মন্দ হয়।

ইহার পূর্ব্বেই রুসো বিজ্ঞান ও কলাকে মানুষের প্রধান শত্রু বলিয়াছিলেন, এবং সভ্যতাকে মানুষের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, "মানব-জাতির বিরুদ্ধে লিখিত আপনার নূতন গ্রন্থ আমি পড়িয়াছি। তাহার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।....আমাদিগকে পশুতে পরিণত করিবার চেষ্টায় আপনি যে রসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। আপনার গ্রন্থ পাঠ করিয়া চারি হাতপায়ে হাঁটিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সে অভ্যাস ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বর্জ্জন করিয়াছি, সুতরাং

---

[১] Nietzsche. [২] Rationalist. [৩] Romanticist.

* Durant's Story of Philosophy. P.p. 187-8

দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব।" Social Contract গ্রন্থে অসভ্য অবস্থার গুণকীর্ত্তন দেখিয়া তিনি এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "বানরের সঙ্গে মানুষের যেরূপ সাদৃশ্য, রুসোর সহিত দার্শনিকের সাদৃশ্য তাহা অপেক্ষা অধিক নহে।" অন্যত্র তিনি "রুসোকে ডায়োজিনিসের পাগলা কুকুর" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তবুও যখন জেনিভা-গবর্ণমেণ্ট রুসোর গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই কার্য্যের নিন্দা করিয়াছিলেন, এবং রুসোকে লিখিয়াছিলেন, "আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটা কথাও আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। তবু প্রাণ দিয়াও আমি আপনার তাহা বলিবার অধিকার রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব।" বহু শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য রুসো যখন পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত বাস করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

রুসোর সভ্যতার নিন্দা ভলটেয়ার বালসুলভ প্রলাপ বলিয়া গণ্য করিতেন, এবং সভ্য মানুষ যে অসভ্য মানুষ হইতে অধিক সুখী, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। তিনি রুসোকে বলিয়াছিলেন "স্বভাবতঃ মানুষ পশু। সভ্য সমাজে মানুষের অন্তরস্থ পশু শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে, এবং তাহার বুদ্ধি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য সুখের বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে।" ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থা যে ভাল নহে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাহাতে ভাল যে কিছুই নাই, তাহাও নহে, বলিতেন। "The world as it goe''s গ্রন্থে ভলটেয়ার এক গল্প বলিয়াছেন। পার্সি-পলিস্ নগরের অধিবাসীদিগের কদাচারে ভীষণ রুষ্ট হইয়া এক দেবতা ঐ নগর ধ্বংস করা উচিত কিনা, তাহা প্রতিবেদন[1] করিবার জন্য বাবুক নামক এক দূত প্রেরণ করিলেন। বাবুক নগরে পাপের প্রবল্য দেখিয়া নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেও, নগরবাসিগণের ভদ্রতা, সদ্ব্যবহার ও পরোপকারপ্রবৃত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। পাপের যথাযথ বর্ণনা দিলে, নগরের ধ্বংস অনিবার্য্য জানিয়া তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বহুমূল্য ধাতু ও মণিমুক্তার সহিত অকিঞ্চিৎকর ধাতু, প্রস্তর ও মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া তৎ-দ্বারা তিনি এক সুন্দর মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন "কেবল স্বর্ণ-ও-হীরক-নির্ম্মিত নহে বলিয়া কি এই সুন্দর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন?" নগর রক্ষা পাইল। পূর্ব্বে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন-সাধন না করিয়া, তাহাদের প্রতিষ্ঠান সকলের পরিবর্ত্তন করিলে, মানুষের অপরিবর্ত্তিত প্রকৃতির ফলে তাহারা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। Church, State প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে মানুষ। আবার মানুষের প্রকৃতিও গঠিত হয় এই সকল প্রতিষ্ঠানদ্বারা। মানুষের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান, আবার প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ মানুষ। ভলটেয়ারের মতে এই দুষ্টচক্র ভেদ করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষাদ্বারা মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করা। কিন্তু রুসোর বিশ্বাস ছিল, যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগচালিত কর্ম্মের দ্বারাই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সম্ভবপর। ধ্বংসের পরে হৃদয়ের প্ররোচনায় নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। তাহাদ্বারাই সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

[1] Report

প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস যে কেবল বুদ্ধিদ্বারা সম্ভবপর নহে, তাহা সত্য ; মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিদ্বারাই যে তাহা সম্ভবপর হয়, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু গঠনকার্য্য যদি কেবল হৃদয়াবেগদ্বারাই সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে তাহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা কম। সহজাত প্রবৃত্তি ও হৃদয়াবেগ, উভয়েরই জন্ম অতীতের গর্ভে, অতীতের প্রতি উভয়েরই প্রবল আকর্ষণ আছে। অতীতের প্রতিষ্ঠানের উপযোগী হইয়াই তাহারা অতীত প্রতিষ্ঠান হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। সুতরাং এই সহজাত প্রবৃত্তি ও হৃদয়াবেগদ্বারা যে প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হইবে, তাহা অতীত প্রতিষ্ঠানের অনুরূপই হইবে। রুসোর মতের মধ্যেই প্রতিক্রিয়ার বীজ লুক্কায়িত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের উন্মাদনা যখন তিরোহিত হইল, তখন অতীতের "সুখ ও শান্তির দিনে"র জন্য ফরাসী হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রতিক্রিয়ার ফল Chatean briand, De Stael, De Maistre ও Kant.*

শেষ জীবন

১৭৭০ সালে ভলটেয়ারের বয়স যখন ৭৬ বৎসর, তখন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার এক আবক্ষ মূর্ত্তি নির্মাণের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করেন। সহস্র সহস্র লোক চাঁদা দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ধনীদিগের চাঁদা এক মাইটে (অর্দ্ধ ফার্দিং) সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল। Frederick the Great জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাকে কত দিতে হইবে ; উত্তর দেওয়া হইল "এক ক্রাউন ও তাঁহার নিজের নাম।" ভলটেয়ার তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া লিখিলেন, "অন্যান্য বিজ্ঞানের সহায়তার উপর একটি কঙ্কালের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অর্থ-সাহায্য করিয়া আপনি দৈহিকগঠন বিদ্যার[1] চর্চ্চায় সহায়তা করার জন্য আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।" এই মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠায় ভলটেয়ারের আপত্তি ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার মুখের তো কিছুই অবশিষ্ট নাই। চক্ষু কোটরের মধ্যে তিন ইঞ্চি ঢুকিয়া গিয়াছে, গণ্ডদেশ জীর্ণ পার্চ্চমেণ্টে পরিণত হইয়াছে, সামান্য কয়েকটি দাঁত ছিল, তাহাও আর নাই।" একদিন তাঁহার প্রিয় কোন ব্যক্তি তাঁহাকে চুম্বন করিলে বলিয়াছিলেন, "জীবন মৃত্যুকে চুম্বন করিতেছে।"

ভলটেয়ার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছিলেন। এক সময় বলিয়াছিলেন "ভয় হয়, পাছে মানুষের হিতকর কিছু করিবার পূর্ব্বেই মরিয়া যাই।" হিতকর অনেক কার্য্যই এই দীর্ঘজীবনে তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার ফার্ণির গৃহ অত্যাচারপীড়িত অনেক বিপন্ন লোকের আশ্রয় স্থান ছিল। বহুদূর হইতে বহুলোক সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট আসিত, আপদবিপদে লোকে তাঁহার পরামর্শ চাহিত। কাহাকেও তিনি বিমুখ করিতেন না। দরিদ্রলোকে অপরাধ করিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিত, তিনি তাহাদিগকে আইনের কবল হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়া তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া

* Durant's Stoiy of Philosopley P. 189

[1] Anátomy

দিতেন। এক দম্পতী একবার তাঁহার অর্থ চুরি করিয়া নতজানু হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে। তাহাদিগকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন "আমার ক্ষমা তোমাদের করায়ত্ত। ঈশ্বরের ক্ষমা-ভিক্ষা কর।" নিজের সম্বন্ধে একবার বলিয়াছিলেন "আমাকে কেহ আক্রমণ করিলে, দৈত্যের মত লড়াই করি, কিন্তু অন্তরে আমি একটি সাধু দৈত্য। হাসির মধ্যে আমার লড়াই শেষ হয়।"

৮৩ বৎসর বয়সে প্যারিসে যাইবার জন্য তাঁহার অদম্য ইচ্ছা হইল। চিকিৎসকেরা দীর্ঘপথ-ভ্রমণে আপত্তি করিলেন। যে নগর হইতে তিনি নির্বাসিত হইয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তাহা দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ভলটেয়ার অতিকষ্টে প্যারিসে উপনীত হইলেন, এবং একেবারে বন্ধু দালেম্বার্টের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "মরণ মুলতুবী রাখিয়া আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।" পর দিন হইতে দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। বেন্‌জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। যুবকের মাথায় হাত দিয়া ভলটেয়ার তাহাকে ঈশ্বর ও স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে উপদেশ দিলেন।

কিন্তু শরীরে সহ্য হইল না। সত্বরই ভলটেয়ার পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়া একজন পুরোহিত আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভলটেয়ারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন, "আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছি।" ভলটেয়ার কহিলেন, "তাহার প্রমাণ?" পুরোহিত ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর ভলটেয়ার নিজেই একজন পুরোহিতকে ডাকাইয়া আনিলেন। কিন্তু "ক্যাথলিক ধর্ম্মে আমি পূর্ণ বিশ্বাসী" ইহা লিখিয়া সহি না করিলে, তিনি তাঁহার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। ভলটেয়ার তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন তিনি নিজে একখানা কাগজে লিখিলেন, "ঈশ্বরে ভক্তি, বন্ধুদিগের প্রতি ভালবাসা, কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিয়া এবং শত্রুদিগকে ঘৃণা না করিয়া আমি মৃত্যুবরণ করিতেছি। ইতি ভলটেয়ার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৭৭৮।" লিখিয়া কাগজখানা আপনার সেক্রেটারিকে দিলেন।

মৃত্যুর কিছু বিলম্ব ছিল। পীড়িত অবস্থায় একদিন French Academyতে গমন করিলেন। পথে উদ্দাম জনতা তাঁহার যে অভিনন্দন করিয়াছিল, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত কোনও বিজয়ী সেনাপতিও কখনও তাহা প্রাপ্ত হন নাই। একাডেমিতে গিয়া তিনি অভিধান-সংস্কারের প্রস্তাব করিলেন, এবং 'A' অক্ষরের নিম্নস্থ সমস্ত শব্দের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

একদিন তাঁহার নূতন নাটক Irene এর অভিনয় দেখিতে ভলটেয়ার থিয়েটারে গমন করিলেন। নাটকটি ভাল হয় নাই, কিন্তু দর্শকেরা নাটকের গুণাগুণ বিচার করিল না। ৮৩ বৎসরের বৃদ্ধ যে নাটক লিখিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল: মুহুর্মুহু করতালিধ্বনিতে রঙ্গগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই দিন গৃহে ফিরিয়া ভলটেয়ার বুঝিতে পারিলেন, আর বিলম্ব নাই, মরণ নিকটবর্ত্তী। ১৭৭৮ সালের ৩০শে মে তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। প্যারিসের ধর্ম্মযাজকগণ খৃষ্টীয় মতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার

ব্যাঘাত উৎপন্ন করায়, বন্ধুগণ তাঁহার দেহ গোপনে প্যারিসের বাহিরে লইয়া গেলেন। তথায় একজন পুরোহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হইলেন। "পবিত্র ভূমিতে" ভলটেয়ারের সমাধি হইল। ১৭৯১ সালে তাঁহার দেহ প্যারিসে আনীত হইয়া Pantheonএ সমাহিত হইয়াছিল। সমাধির উপরে মাত্র তিনটি শব্দ উৎকীর্ণ আছে— "এখানে শায়িত ভলটেয়ার।"*

ভলটেয়ারের জীবনী শক্তি অসাধারণ ছিল, এবং এই শক্তির প্রয়োগ করিয়া তিনি যাহা প্রায় অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভবপর করিয়া তুলিয় ছিলেন। ভিকটর হিউগোর মতে "ভলটেয়ারের নাম উচ্চারণ করিলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষত্বের বর্ণনা করা হয়।" সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী তাঁহার প্রতিভার জ্যোতিতে সমুজ্জল। লুথার, ক্যালভিন্ প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংস্কারকদিগের অপেক্ষাও কঠোরতর ভাবে তিনি কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। মিরাবো, ড্যালটন্, মরাট ও রোব্‌স্‌পিয়ার যে অস্ত্রের দ্বারা প্রাচীন সমাজের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন, তিনি তাহার উৎপাদনে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার যুগে তিনিই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, একথা তাঁহার শত্রু মিত্র সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি যে অসাধারণ বিদ্বান ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে বড় দার্শনিক বলা যায় না। কার্লাইল তাঁহাকে "বড়লোক" বলিয়া স্বীকার করিতেই কুণ্ঠিত ছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল, তাহা বলা যায় না। স্বার্থসাধনের জন্য মিথ্যা বলিতে তাঁহার সংকোচ ছিল না। "ইতিহাস তিনি পিতৃভক্ত পুত্রের চক্ষু দিয়া পাঠ করেন নাই, সমালোচকের চক্ষু দিয়াও পাঠ করেন নাই, পাঠ করিয়াছিলেন ক্যাথলিক্ ধর্ম্ম-বিরোধী চসমা পরিয়া। ইতিহাস তাঁহার নিকট "নিয়মের আলোকে আলোকিত অনন্তের রঙ্গমঞ্চে মহাকালের পটভূমির সম্মুখে অভিনীত, ঈশ্বর-রচিত বিরাট নাটক ছিল না।" কিন্তু তিনি নাস্তিক ছিলেন না, জগতের স্রষ্টা চিন্ময় ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস করিতেন হৃদয় তাঁহার দুঃখীর দুঃখে সর্ব্বদাই বিগলিত হইত। কিন্তু তাঁহার দুঃখবাদের সহিত ঈশ্বরে বিশ্বাসের সঙ্গতি ছিল না।

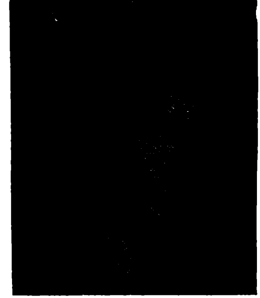
---

* এই অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাবলী মুখ্যতঃ Will Durant এর Story of Philosophy হইতে গৃহীত।

রুসো

বাল্য ও যৌবন

যে সকল মনীষী ফরাসীদেশে নূতন ভাবের প্রচার করিয়া ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, রুসো তাঁহাদের অন্যতম। তিনি প্রথমে ফরাসী বিশ্বকোষের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ডিডেরো ও ভলটেয়ার তাঁহার বন্ধু ছিলেন, পরে মতভেদের ফলে বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। বিশ্বকোষ-সংঘ ছিলেন—প্রজ্ঞাবাদী[1], যুক্তিকেই তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে বিচারের মানদণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রুসো হৃদয়বৃত্তিকেই[2] প্রাধান্য দিতেন। রুসো প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক ছিলেন না; কিন্তু সাহিত্য, রাজনীতি ও প্রচলিত রুচি ও আচার-ব্যবহারের সহিত দর্শনের উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।


রুসো

১৭১২ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে জেনিভা নগরে রুসো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা ফরাসীবংশীয় এবং ক্যালভিন[3] সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে রুসো নিষ্ঠাবান ক্যালভিনীয়ের উপযোগী শিক্ষাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়া ও নৃত্যশিক্ষা দিয়া তিনি জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। শৈশবেই রুসোর মাতার মৃত্যু হওয়ায় এক আত্মীয়া তাঁহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি একটির পরে একটি করিয়া নানা ব্যবসায়ে শিক্ষানবিসী করেন, কিন্তু কোন ব্যবসায়ই তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায়, ষোড়শ বৎসর বয়সে গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া কপর্দ্দকহীন অবস্থায় ইটালী দেশের স্যাভয় প্রদেশে উপস্থিত হন। তথায় জীবিকা-উপার্জ্জনের কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, তিনি এক ক্যাথলিক পাদ্রীর নিকট গিয়া ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, এবং টিউরিণ নগরে ক্যাথলিক-ধর্ম্মগ্রহণেচ্ছুদিগের শিক্ষাশ্রমে প্রেরিত হন। সেই আশ্রমে বাসকালে আশ্রমবাসী এক পাষণ্ডকর্ত্তৃক তাঁহার উপর পাশবিক বলপ্রয়োগের এক কাহিনী রুসো তাঁহার জীবন-চরিতে বর্ণনা করিয়াছেন। আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিলে, তাহারা দুর্বৃত্তের শাস্তিবিধান তো করিলেনই না, পরন্তু ঘটনাটি প্রকাশ না করিতে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। শিক্ষা-শেষে রুসো ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু যে

---

[1] Rationalist [2] Feeling [3] Calvinist

আশায় পৈতৃক ধর্মত্যাগ, তাহা পূর্ণ হইল না। প্রভূত উপদেশ ও সামান্ত অর্থ (২০ ফ্রাঙ্কের কিছু বেশী) দিয়া আশ্রমের অধ্যক্ষ তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কয়েক দিন ঘোরাঘুরির পরে এক পোষাকের দোকানে রুসো সহকারীর পদে নিযুক্ত হইলেন। দোকানের মালিক বিদেশে ছিলেন। তাঁহার যুবতী স্ত্রী—ম্যাডাম্ বেস্‌ল্—রুসোর প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চারও হইয়াছিল। কিন্তু ব্যাপার অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই দোকানের মালিক দেশে ফিরিয়া আসিলেন! রুসো কর্ম্মচ্যুত হইলেন।

ইহার পরে ম্যাডাম্ ডি ভার্সেলি নাম্নী এক মহিলা রুসোকে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করেন। তিন মাস পরে মহিলার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার একগাছি ফিতা রুসোর নিকট পাওয়া যায়। রুসো ফিতা চুরী করিয়াছিলেন, কিন্তু ধরা পড়িয়া মেরিয়ন্ নাম্নী এক যুবতী পরিচারিকার নিকট উহা পাইয়াছেন, বলিলেন। ফলে যুবতী কর্ম্মচ্যুত হইল। এই মিথ্যা অভিযোগের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া রুসো লিখিয়াছেন, যুবতীকে তিনি ভালবাসিতেন, এবং তাহার কথা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত। আপনার দোষক্ষালনের উপায় যখন চিন্তা করিতেছিলেন, তখন যুবতীর কথা মনে হইল, এবং বিবেচনা না করিয়াই তিনি তাহার নাম করিলেন। অদ্ভুত ব্যাখ্যা!! অভিযোগ শুনিয়া যুবতী কাতর-দৃষ্টিতে রুসোর দিকে চাহিয়াছিল, একটি নির্দ্দোষ বালিকার সর্ব্বনাশ না করিতে তাহাকে অনুনয় করিয়া বলিয়াছিল; কিন্তু রুসোর ভালবাসা তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। এই হীন কার্য্যের জন্ত রুসো চিরকাল অনুতপ্ত ছিলেন।

আশ্রয়-প্রাপ্তি

ইহার পরে টিউরিণ ত্যাগ করিয়া রুসো এনেসি নগরে গমন করিলেন। সেখানে Madame de Warrens তাহাকে আশ্রয় দান করেন। সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভবা এই মহিলা স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া এনেসি নগরে বাস করিতেছিলেন, পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং স্যাভয়ের রাজার নিকট হইতে বাৎসরিক ১৫০০ লিভার বৃত্তি পাইতেছিলেন। নয় বৎসর রুসো এই মহিলার সহিত বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তিনি "মা" বলিয়া ডাকিতেন, কিন্তু তাহার সহিত যে তাঁহার অবৈধ সংসর্গ ছিল, তাহা তিনি লিখিয়াছেন। ক্লোসি নামে মহিলার এক কর্ম্মচারী ছিলেন। মহিলা ক্লোসি ও রুসো উভয়েরই শয্যাসঙ্গিনী ছিলেন। ক্লোসির মৃত্যু হইলে তিনি আর একজনকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করেন। মর্ম্মাহত হইয়া রুসো তখন অন্যত্র চলিয়া যান (১৭৪১)

রুসোকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত, তিনি যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিতে পারেন, তাহার জন্ত, ম্যাডাম্ ডি ওয়ারেনস্ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রুসোর ইচ্ছাশক্তির দুর্ব্বলতার জন্ত কোনও চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। কেহই তাহাকে কোনও কর্ম্মের উপযুক্ত মনে করে নাই। অস্থিরচিত্ত, অলস ও স্বপ্নাতুর প্রকৃতির জন্ত কোন কার্য্যেই

রুসো সফলতা-লাভে সমর্থ হন নাই। ভবিষ্যতের জন্য তাহার কোনও চিন্তাই ছিল না; উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা তিনি কখনও অনুভব করিতেন না। বেশী কিছু তিনি চাহিতেন না, কোনও প্রকারে শান্তিতে থাকিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হইতেন। অভাবের তাড়না না থাকিলেও যৌন-লিপ্সা প্রবল ছিল, এবং জীবনে একাধিক স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ সংসর্গ তাহার সংঘটিত হইয়াছিল।

ম্যাডাম্ ডি ওয়ারেনসের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিন বৎসর রুসো তাহার সহিত চারমেৎ নামক পল্লীগ্রামে এক মনোরম গৃহে বাস করিয়াছিলেন। এই তিন বৎসর তাঁহার নিরতিশয় সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ে নানা বিষয়ে গ্রন্থপাঠ করিয়া তিনি জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যয়নের কোনও সুচিন্তিত প্রণালী না থাকায় ইচ্ছানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। ভলটেয়ারের গ্রন্থ তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। মন্‌টেইন্, ল' ব্রুয়ের, বইল ও বসুএর গ্রন্থও যত্নের সহিত পড়িয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে Locke's Essay, মালেব্রেঁা, লাইব্‌নিট্‌জ, দেকার্ত্ত, লজিক্ অব পোর্ট রয়াল প্রভৃতি পড়িয়াছিলেন। দর্শনের পরে দৈহিকগঠনবিদ্যা, জ্যামিতি, বীজগণিত, জ্যোতিষ ও লাটিন ভাষার চর্চ্চাও করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন-প্রণালী-সম্বন্ধে তিনি তাঁহার জীবনচরিতে লিখিয়াছেন: "এই সময়ে আমার ভ্রান্ত ধারণা ছিল, যে কোনও গ্রন্থ পড়িয়া লাভবান হইতে হইলে, তাহা বুঝিবার জন্য যে যে বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক, সেই সেই বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। তখন জানিতাম না, যে এই প্রকার জ্ঞান অনেক সময় গ্রন্থকারদিগেরও থাকে না। তাঁহারা প্রয়োজনমত অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেন। আমার ভ্রান্ত ধারণার ফলে পাঠে অগ্রগতি বিলম্বিত হইত। প্রত্যেক গ্রন্থেই পদে পদে পাঠ স্থগিত করিয়া গ্রন্থান্তর হইতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া স্থগিত পাঠ আরম্ভ করিতে হইত। এমন ঘটিয়াছে, যে আরব্ধ গ্রন্থের দশ পৃষ্ঠামাত্র শেষ করিবার পূর্ব্বেই গ্রন্থ বন্ধ করিয়া অন্য বহু গ্রন্থ পড়িয়া লইতে হইয়াছে।" ভুল বুঝিতে পারিয়া রুসো পাঠপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করেন। Encyclopediaর বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"২৫ বৎসর বয়সে যে যুবক কিছুই জানিত না, অথচ যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক হইয়াছিল, সময়ের যথোচিত ব্যবহার করা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছিল। মৃত্যু অথবা দুরদৃষ্ট-বশতঃ যে কোনও সময়ে আমার চেষ্টা ব্যাহত হইতে পারে জানিয়া, আমার ক্ষমতার স্বাভাবিক প্রবণতা কোন্ দিকে, এবং কোন্ কোন্ বিদ্যা চর্চ্চা করিবার আমি উপযুক্ত, তাহা জানিবার জন্য সকল বিষয়েই কিছু কিছু জ্ঞান-সঞ্চয়ের জন্য আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। * * * অধ্যয়নের জন্য নিশ্চয়ই আমি জন্মগ্রহণ করি নাই। কোনও বিষয়েই

আমি অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক কাল মনঃসংযোগ করিতে পারিতাম না। অন্তের চিন্তা অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়া অল্পেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম, কিন্তু নিজের চিন্তায় অনেক সময় অধিক ক্ষণ কাটাইতে সক্ষম হইতাম। * * * এমনো হইয়াছে, যে কোনও গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা পড়িবার পরেই আমার মন অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তখন মনঃসংযোগের চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, মন স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে, কিছুই ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ একটির পর একটি অবিচ্ছেদে পড়িতে গিয়া দেখিয়াছি, মনোযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে। এক বিষয়ে অধ্যয়নের ক্লান্তি বিষয়ান্তরে মনোনিয়োগের ফলে বিদূরিত হয়। * * * এই ভাবে পাঠপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া সমস্ত দিনই বিনা ক্লান্তিতে পড়িতে পারিয়াছি।"

দর্শনশাস্ত্র-পাঠকালে রুসো বিভিন্ন দার্শনিকদিগের পরস্পর বিরোধী মতের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হন। অবশেষে সমন্বয়ের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া তিনি প্রত্যেক দার্শনিকের মত বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়া, তাহার বিকাশ ও পরিণতি বুঝিবার চেষ্টা করেন। তখন সেই মতের বিরুদ্ধ কোনও যুক্তি মনে উঠিলেও তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, "আমি ভাবিলাম, প্রথমে আমার মনের ভাণ্ডারে কতকগুলি ভাব সঞ্চয় করিয়া লইব। সে সকল ভাব যদি বিশদ হয়, তাহা হইলে তাহারা সত্য কি মিথ্যা, তাহা সঞ্চয়কালে দেখিব না; পরে যখন যথেষ্ট পরিমাণে ভাব সঞ্চিত হইবে, তখন তুলনা করিয়া কোন্‌টি গ্রহণ করিব, কোন্‌টি বর্জ্জন করিব, তাহা ভাবা যাইবে। কয়েক বৎসর অন্তের চিন্তার দ্বারা চালিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, যথেষ্ট বিদ্যা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি। তখন অপরের চিন্তার সাহায্য বর্জ্জন করিয়াও চিন্তা করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছি, এবং স্বকীয় বুদ্ধিদ্বারা অধীত বিষয়ের বিচার করিবার সামর্থ্যও লাভ করিয়াছি।" যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও রুসোর শিক্ষা কখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। Encyclopedistদিগের সর্ব্বতোমুখী বিদ্যার সহিত তাঁহার অর্জ্জিত বিদ্যার তুলনা হইত না। Plutarch, Tacitus, Seneca, এবং Plato ও Virgil তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু গ্রীক ও লাটিন ভাষার অন্যান্য লেখকদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না।

চারমেতে বাস করিবার সময় রুসো প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, এবং ভ্রমণের সময় প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তার উপাসনা করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার উপাসনা কেবল কতকগুলি শব্দের উচ্চারণেই শেষ হইত না। আনন্দ-দায়িনী প্রকৃতির স্রষ্টার দিকে আমার হৃদয় তুলিয়া ধরিয়া রাখিতাম। ঘরের মধ্যে উপাসনা করিতে ভাল লাগিত না, ঘরের দেওয়াল ও ঘরের মধ্যের যাবতীয় দ্রব্য ভগবান ও আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিত। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিতে আমার ভাল লাগে। * * * যাঁহার জীবন আমার জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা ছিল, তাঁহার ও নিজের জন্য পাপ-যন্ত্রণা-ও-অভাবমুক্ত নির্দ্দোষ শান্তিপূর্ণ জীবন, এবং ধার্ম্মিকোচিত গতি ভিন্ন অন্য কিছুই আমার প্রার্থনীয় ছিল না। প্রার্থনার সঙ্গে ভগবানের ধ্যান করিতাম। আমি জানিতাম সর্ব্বমঙ্গল-দাতা ভগবানের অনুগ্রহের উপযুক্ত হওয়াই তাঁহার অনুগ্রহ পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায়—প্রার্থনা নয়।"

প্যারিসে গমন

১৭৪১ সালে ম্যাডাম ডি ওয়ারেন্সের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া রুসো প্যারিস নগরে গমন করিলেন। তখন তাঁহার সম্বল ছিল ১৫ লুই (রৌপ্য), একখানা নাটকের হস্তলিপি, এবং সঙ্গীতের স্বরলিপির এক নূতন পদ্ধতি, যাহা হইতে তিনি অর্থ ও যশঃ, উভয়ই আশা করিয়াছিলেন। প্যারিসে কিছুদিন ইতস্ততঃ গমনাগমনে অতিবাহিত হইল। ফোঁৎনেল, কোঁডিয়াক ও ডিডেরো ও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত এই সময় তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। ডিডেরোর সহিত পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। একজন মহিলার অনুরোধে রুসো ভিনিসস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন (১৭৪২)। কিন্তু রাষ্ট্রদূতের সহিত কলহ করিয়া সে পদত্যাগ করিলেন। এই কলহে রুসোর দোষ ছিল না। রাষ্ট্রদূত তাঁহার বেতন না দেওয়ায় তিনি প্যারিসে আসিয়া গবর্মেণ্টের নিকট বিচারপ্রার্থী হন। বহুদিন পরে তিনি প্রাপ্য বেতন পাইয়াছিলেন। প্যারিসে ফিরিয়া আসিবার পরে রুসোর কয়েকখানা নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, কিন্তু তাহা হইতে অর্থাগম হয় নাই। ১৭৫৪ সালে তিনি Therese le Vassuer নাম্নী এক হোটেল পরিচারিকার প্রণয়ে আবদ্ধ হন, এবং তাহার সহিত স্বামী স্ত্রীর মত বাস করিতে থাকেন। Theresse অশিক্ষিতা ও দেখিতে কুৎসিৎ ছিলেন। লিখিতে অথবা পড়িতে জানিতেন না, বৎসরের মাসগুলির নাম কখনও একাদিক্রমে বলিতে পারিতেন না, সংখ্যা গণনা করিতেও শেখেন নাই। Thresseএর মাতা তাহার সহিত বাস করিত, এবং মাতা ও কন্যা উভয়েই রুসো এবং তাঁহার বন্ধুদিগকে অর্থোপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিত। Theresseএর প্রতি রুসোর যে বিন্দুমাত্রও ভালবাসা ছিল না, তাহা তিনিই লিখিয়াছেন। তবুও ২৫ বৎসর তাহার সহিত বাস করিয়া অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার গর্ভে রুসোর পাঁচটি সন্তান হইয়াছিল। সকলগুলিকেই তিনি মাতৃহীন শিশুদিগের হাসপাতালে দান করেন। এই জঘন্য কাজের জন্য রুসো তাহার গ্রন্থে অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বীয় সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ না করিয়া রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করিয়া তিনি যে গুরুতর অন্যায় করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অনুতপ্ত ধর্ম্মবুদ্ধিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন, "স্বীয় সন্তানদিগকে উপযুক্ত ভাবে লালনপালন করিবার আর্থিক সামর্থ্য আমার ছিল না। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা আমার সাধ্যাতীত ছিল। ভাবিয়াছিলাম, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আমার সন্তানেরা সাধু উপায়ে ভদ্রজীবনযাপন করিতে পারিবে না। Theresse এর মাতা ও তাহার ভ্রাতা-ভগিনীদিগের সংসর্গও কাহারও পক্ষে মঙ্গলকর হইতে পারে না। অথচ আমার সন্তানগণ গৃহে প্রতিপালিত হইলে, তাহাদের সংসর্গ অপরিহার্য্য হইবে। এরূপ অবস্থায় সরকারী শিশু-আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়া তাহারা যদি কৃষক অথবা শিল্পীর ব্যবসায়ে সাধুভাবে জীবিকা-উপার্জ্জনে সক্ষম হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। প্লেটোর কল্পিত Republicএ জন্মের পরেই শিশুদিগকে পিতামাতার নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিয়া রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

কোনও শিশুরই সেখানে স্বীয় পিতামাতার সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা নাই। প্লেটোর আদর্শে রাষ্ট্রের নাগরিকের কর্ত্তব্য আমি পালন করিয়াছি।" তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সন্তানদিগের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু তাহাদের প্রস্তাব রুসো স্বীকার করিলে, তাঁহার সন্তানদিগের জীবন অধিকতর সুখী হইত বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। অন্যকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া তাহারা আপনাদের পিতা-মাতাকে ঘৃণা করিতে শিখিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্যা ও কলা বনাম নৈতিক উন্নতি

৩৭ বৎসর বয়সেও রুসোর জীবনে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোনও চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই। তখনও তিনি তাঁহার জীবনের লক্ষ্যের সন্ধান পান নাই। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছিলেন। তার পরে হঠাৎ একদিন অচিন্তিত ভাবে তাঁহার জীবনের গতি ফিরিয়া গেল, তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান পাইলেন। ১৭৪৯ সালে একদিন রুসো তাঁহার বন্ধু ডিডেরোর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিলেন। ডিডেরো তখন প্যারিস হইতে ছয় মাইল দূরে এক কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। পদব্রজে পথ চলিবার সময় রুসো একখানা সাহিত্যিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল সেই পত্রিকায় মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপনের উপর। Academy of Djion "বিজ্ঞান ও কলার উন্নতিদ্বারা মানুষের নৈতিক উন্নতি অথবা অবনতি হইয়াছে" এই সম্বন্ধে প্রবন্ধের জন্য একটা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই ঘোষণা-পাঠমাত্র রুসোর মনে প্রবল আন্দোলন আরব্ধ হইল। শত শত ভাব তাঁহার মনের মধ্যে কলরব করিয়া উঠিল। ভাবের উত্তেজনায় তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া তিনি অর্দ্ধঘণ্টা প্রগাঢ় চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। মনে হইল, তিনি অন্য জগতের অধিবাসী অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছেন। Academyর প্রশ্নের উত্তরই যে কেবল তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল, তাহা নহে। অন্য বহু সত্যও তাঁহার মনে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে রুসো আপনার স্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন যে সত্যের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যতের সমস্ত রচনা তাহার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

ফরাসী সমাজে তখন অশান্তির অগ্নি অল্পে অল্পে ধূমায়িত হইতেছিল। অনিয়ন্ত্রিত রাজশক্তির অধীনে নৈতিক শিথিলতা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছিল। মানব-জীবনের মহত্ত্বে সন্দেহ সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে প্রসারিত হইতেছিল। সাইত্রিশ বৎসর যাবৎ রুসো ভবঘুরের জীবন যাপন করিয়াছিলেন। সমাজের বিধি ও নিষেধ গ্রাহ্য করেন নাই রাজশক্তির যথেচ্ছাচার ও সামাজিক দুর্নীতি দেখিয়া তাঁহার মন মাঝে মাঝে বিচলিত হইত, বিরক্তি দমন করিয়া রাখিতেন। কিন্তু দমিত বিরক্তি ও বিদ্রোহী ভাব মনে সঞ্চিত হইতেছিল। আজি তাহা বিস্ফুরিত হইয়া পড়িল। সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান দুর্নীতি ও অনাচার তাঁহার লেখনী-মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল।

রুসো Academy of Djion এর প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার এই প্রথম রচনা পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহা তিনি আশা করেন নাই। কিন্তু যাহা অপ্রত্যাশিত ছিল, তাহাই সংঘটিত হইল। তাঁহার প্রবন্ধই পরীক্ষকগণ-কর্ত্তৃক পুরস্কারের জন্য নির্ব্বাচিত হইল। হঠাৎ তাঁহার যশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। বিপ্লবসৃষ্টির কোনও উদ্দেশ্য তাঁহার না থাকিলেও পাঠকেরা তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে বিপ্লবের ইঙ্গিত দেখিতে পাইল। প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান সুনীতির প্রধান শত্রু। অনাবশ্যক দ্রব্যের অভাব-বোধের সৃষ্টি করিয়া তাহারা মানবের স্বাধীনতা অপহরণ করে, এবং তাহাকে দাসে পরিণত করে। সভ্যতা হইতে পরিচ্ছদের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে; আমেরিকায় অসভ্যদিগের মত যাহারা উলঙ্গ থাকে, তাহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় না। বিজ্ঞান ও সুনীতি পরস্পর-বিরোধী। নীচ ও ঘৃণিত মূল হইতে যাবতীয় বিজ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে। কুসংস্কার-প্রসূত ফলিত জ্যোতিষ হইতে জ্যোতিষশাস্ত্রের জন্ম; অর্থলোভ হইতে জ্যামিতির উৎপত্তি; বৃথা কৌতূহল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জনক; মানুষের অভিমান হইতে কর্ম্ম-নীতির উদ্ভব; উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাগ্মিতার প্রসূতি। শিক্ষা ও মুদ্রাযন্ত্রদ্বারা মানুষের কোনও উপকারই হয় নাই। অসভ্য মানুষ হইতে সভ্য মানুষের ব্যাবর্ত্তক সমস্ত গুণ ও আচারই অমঙ্গলের আকর। শৈশবে পঠিত Plutarch's Lives রুসোর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এথেন্‌স্ অপেক্ষা স্পার্টার জীবনযাপন প্রণালী তাঁহার অধিকতর মনোমত ছিল। লাইকারগাস্ তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ রুসো গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ইয়োরোপীয়দিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত অসভ্যদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। মানবের সুখ ও শান্তিবিধানে সভ্যতার কোনও কৃতিত্বই তিনি দেখিতে পান নাই। সভ্যতার উন্নতিতে তিনি মানবজাতির অবনতিই দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং তাহার সর্ব্বধ্বংসী সংস্পর্শ হইতে যদিও তাঁহার জন্মভূমি জেনিভা ও আপনাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কোন সুফলের প্রত্যাশা তিনি করেন নাই।

হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া রুসো থামিতে পারিলেন না। প্রথম প্রবন্ধের সফলতায় তাঁহার চিন্তার স্রোত প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং যে সমস্ত চিন্তা মনে উদিত হইতে লাগিল, বিস্তারিত করিয়া তাহা বর্ণনা করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার মূত্রাশয়ের পীড়া প্রবল হইয়া উঠিল। চিকিৎসকেরা বলিলেন, ছয় মাসের অধিক তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিয়া শেষ করিবার জন্য তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। যে সমস্ত দার্শনিকের মত তিনি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের শিক্ষায় ভ্রান্তি ও নির্ব্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কিছুই এখন তিনি দেখিতে পাইলেন না। সমাজের সর্ব্বাঙ্গে বর্ত্তমান অত্যাচার ও দুর্গতি তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল নিজের বিশ্বাসের সহিত যদি তাঁহার জীবনের সামঞ্জস্য না থাকে, তাহা হইলে কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। এই বিশ্বাসে তিনি স্বকীয় জীবনযাপন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। সাদা মোজা ও

সূক্ষ্ম বস্ত্র বর্জ্জন করিলেন, ঘড়ি বিক্রয় করিলেন, মোটা কাপড়ের সাধারণ স্যুট্ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি এক অফিসে ধনরক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সে কাজ ছাড়িয়া দিয়া স্বরলিপি নকল করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার অন্তরে যে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, এ সকল তাহার বাহ্যিক প্রকাশ। শতবর্ষ পরে তাঁহারই শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া কাউণ্ট টলষ্টয় সর্ব্ববিধ বিলাস বর্জ্জন করিয়াছিলেন। রুসোর স্বভাবেও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। ভয় ও লজ্জার সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়া গেল। প্রচলিত আচার ও সংস্কারের বশীভূত লোকের শ্লেষ ও ব্যঙ্গ অবজ্ঞাভরে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অসম সাহসে সমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কারের প্রতি কশাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে ও দশ বৎসর পরেও যিনি মনের ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেন না, তাঁহার শ্লেষোক্তি সমগ্র পারিসের মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ফলে অনেকের মনে তাঁহার প্রতি দারুণ বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল।

অসাম্যের উৎপত্তি

১৭৫৩ সালে রুসোর "Discourse on the Origin of Inequality" "অসাম্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি পূর্ব্বগ্রন্থে প্রকাশিত মত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সামাজিক বৈষম্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, রাষ্ট্রকর্তৃক এই অসাম্য-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ধনী সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক রাষ্ট্র-ক্ষমতা অন্যায়পূর্ব্বক অধিকৃত হইলে যে রাষ্ট্রের অবনতি হয়, ও প্রজাসাধারণ দাসে পরিণত হয়, তিনি তাহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতকের অনেকে পূর্ব্বে এই দার্শনিক মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহই স্বকীয় মতকে সাধারণ-বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ দান করিয়া রুসোর মতো দৃঢ় ভাবে ব্যক্ত করেন নাই। এই সময়ে কোনো কার্য্যই রুসো অর্দ্ধসমাপ্ত করিয়া ফেলিয়া রাখিতেন না। চিন্তা তাঁহার নিকট ক্রীড়া অথবা বিলাসের উপকরণমাত্র ছিল না। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, মানুষ স্বভাবতঃ নিষ্পাপ; তাহার সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানই তাহাকে কলুষিত করে। এই মত খৃষ্টধর্ম্মের "আদি পাপ" ও "চার্চ্চের মাধ্যমে মুক্তি"বাদের বিরোধী। রুসোর পূর্ব্বে কেহ কেহ "প্রাকৃতিক অবস্থা"র কথা বলিয়াছিলেন। রুসো এই অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই অবস্থা যে কোথায়ও বর্ত্তমান নাই, কখনও বর্ত্তমান ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও কখনো ইহার উদ্ভব হইবে না, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মানুষের বর্ত্তমান অবস্থার সম্যক্ জ্ঞানের জন্য এইরূপ এক অবস্থার কল্পনা করা আবশ্যক। মানুষে মানুষে যে স্বাভাবিক ভেদ আছে, তাহাতে রুসোর আপত্তি নাই। বয়স, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে ভেদ অপরিহার্য্য। কিন্তু সমাজকর্ত্তৃক অনুমোদিত বিশেষ অধিকার সমর্থনযোগ্য নহে।

"ব্যক্তিগত সম্পত্তি"ই সামাজিক বৈষম্যের মূল। প্রথমে যে লোক একখণ্ড জমিতে বেড়া দিয়া বলিয়াছিল "এই জমি আমার," এবং তাহার কথা সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া তাহার প্রতিবাসীদিগকে তাহার স্বামিত্ব স্বীকার করিতে দেখিয়াছিল, সেই লোকই সমাজের[1] প্রতিষ্ঠাতা। তাহার পরে ধাতুর ব্যবহার ও কৃষিকার্য্যের উদ্ভাবনদ্বারা এক অনিষ্টকর বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। শস্য মানুষের দুর্ভাগ্যের প্রতীক, ইয়োরোপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শস্য ও লৌহ উৎপন্ন হয়। এই জন্য ইয়োরোপের দুঃখকষ্ট অধিক। এই অনিষ্টের প্রতীকার করিতে হইলে সভ্যতা বর্জ্জন করিতে হইবে। কেননা সভ্যতাবর্জ্জিত স্বাভাবিক মানুষ দোষহীন; অসভ্য মানুষের যখন উদর পূর্ণ থাকে, তখন সমগ্র প্রকৃতি ও তাহার মধ্যে শান্তি বিরাজ করে; তখন সে স্বজাতীয় সকলেরই বন্ধু।

ভলটেয়ারের সহিত কলহ

নূতন গ্রন্থের একখণ্ড রুসো ভলটেয়ারকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, "মানবজাতির বিরুদ্ধে লিখিত আপনার গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদিগের সকলকে মূর্খে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে এরূপ চতুরতা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। আপনার গ্রন্থ পড়িয়া চারি হাতে পায়ে হাঁটিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ৬০ বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে যে অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছি, দুর্ভাগ্যক্রমে এখন তাহাতে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। ক্যানাডার অসভ্যদিগের অনুসন্ধানে যাত্রা করাও আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেননা যে সমস্ত পীড়ায় আমি ভুগিতেছি, তাহার জন্য একজন ইয়োরোপীয় চিকিৎসক আমার আবশ্যক। দ্বিতীয় কারণ এই, যে ক্যানাডায় এখন যুদ্ধ চলিতেছে, এখন আমাদের দৃষ্টান্তে সেখানকার অসভ্যগণও আমাদের মতই দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছে।" ইহা হইতেই ভলটেয়ার ও রুসোর কলহের সূত্রপাত।

"Discourse on Inequality" রুসো জেনিভার "নগরপিতাদিগের[2]" নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থপাঠে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন নাই। সাধারণ নাগরিকদিগের সমান বলিয়া গণিত হওয়া তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় মনে হয় নাই। কিন্তু রুসোর যশঃ বিস্তৃত হইতে দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে জেনিভায় নিমন্ত্রণ করিলেন। রুসো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, এবং ক্যালভিনীয় সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন কেহ জেনিভার নাগরিক হইতে পারিত না বলিয়া, তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে পুনরায় দীক্ষিত হইলেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই তিনি আপনাকে জেনিভার নাগরিক বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছিলেন। জেনিভায় বাস করিবার ইচ্ছাও তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু জেনিভার শাসনকর্ত্তাদের তাঁহার গ্রন্থের প্রতি বিরাগ দেখিয়া সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। জেনিভায় বাস না করিবার আরও একটি কারণ ছিল। ভলটেয়ার তখন জেনিভার নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে বাস করিতেছিলেন। জেনিভায় কোনও নাটক অভিনীত

[1] Civil Society [2] City Fathers

হইতে পারিত না। ভলটেয়ার এই বাধা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল জেনিভায় তাঁহার নাটকের অভিনয় হয়। রুসো নাট্যাভিনয়ের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিলেন। অসভ্যেরা নাটকের অভিনয় করে না। প্লেটো নাট্যাভিনয়ের অনুমোদন করেন নাই। যাহারা অভিনয় করে, ক্যাথলিক পুরোহিতগণ তাহাদের বিবাহে অথবা অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় পৌরোহিত্য করেন না। বসুএ নাটককে ইন্দ্রিয়-লালসার পাঠশালা[1] বলিয়াছেন। ইত্যাদি যুক্তির প্রয়োগ করিয়া রুসো বিলাসবর্জ্জিত কঠোর জীবনের পক্ষে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

১৭৫৫ সালে ভীষণ ভূমিকম্পে লিসবনে বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সংবাদে বিচলিত হইয়া ভলটেয়ার এক কবিতায় করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই কবিতা পাঠ করিয়া রুসো বিরক্ত হইয়া লিখিলেন, "যশঃ, পৌরুষ ও সম্পদের গর্ব্বে অভিভূত ব্যক্তিকে মানবজীবনের দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে সুতিক্ত তীব্র বচন প্রয়োগ করিতে এবং যাবতীয় পদার্থকে অমঙ্গলময় বলিয়া ঘোষণা করিতে দেখিয়া, তাহাকে স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, ও জগতের প্রত্যেক পদার্থই যে উৎকৃষ্ট, তাহা প্রমাণ করিবার অর্থহীন ইচ্ছা আমার মনে উদিত হইল। ভলটেয়ার দৃশ্যতঃ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেও, প্রকৃতপক্ষে শয়তান ভিন্ন কাহারও অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। যে ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাসের ভাণ করেন, তিনি এক ঈর্ষ্যান্বিত পুরুষমাত্র, অনিষ্টকর কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুতেই তাঁহার সুখ হয় না। তাঁহার এই মত স্পষ্টতঃই যুক্তিহীন। সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যের অধিকারী ও সুখের ক্রোড়ে শায়িত ব্যক্তির পক্ষে তিনি নিজে যে দুঃখকষ্টের আঘাত ভোগ করেন নাই, তাহার ভয়াবহ নিষ্করুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া অপরকে নিরাশার গহ্বরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা নিতান্তই বিরক্তিকর। মানবজীবনের দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগের অধিকার তাঁহার অপেক্ষা আমার অধিক থাকিলেও, আমি নিরপেক্ষ বিচারদ্বারা প্রমাণ করিয়া দিলাম, যে মানুষের দুঃখ-কষ্টের জন্য ঈশ্বর বিন্দুমাত্রও দায়ী নহেন। মানবীয় বৃত্তি নিচয়ের[2] অপব্যবহারই তাহার জন্য দায়ী। পদার্থের স্বরূপের সেজন্য কোনও দায়িত্বই নাই।" রুসো ভলটেয়ারের কবিতার কঠোর সমালোচনা করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন, "ভূমিকম্প লইয়া এত হৈ চৈ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। মধ্যে মধ্যে কতকগুলি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহাতে অমঙ্গলের কিছুই নাই। লিসবনের লোকেরা যদি সপ্ততল গৃহ নির্ম্মাণ না করিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে অরণ্যের মধ্যে বাস করিত, তাহা হইলে তাহাদের বিপদ ঘটিত না। প্রকৃতির বিরোধী আচরণদ্বারাই তাহারা বিপদ আহ্বান করিয়াছিল।" ভলটেয়ার রুসোর পত্রের উত্তরে কোনও পত্র তাহাকে লেখেন নাই। উত্তর দিয়াছিলেন তাঁহার ক্যানডিডে নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তাঁহার ভীষণতম অস্ত্র—"ভলটেয়ারের শ্লেষ"[3] রুসোর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

এইরূপে ভলটেয়ার ও রুসোর মধ্যে যে কলহের সূত্রপাত হইল, তৎকালের সমস্ত

---

[1] School of Concupiscence [2] Faculties [3] The Mockery of Voltair

দার্শনিকই তাহাতে একতর পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভলটেয়ার রুসোকে "অনিষ্টকারী উন্মাদ" বলিতেন। রুসো ভলটেয়ারকে "অধর্ম্মের ভেরী, উৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী, কিন্তু নীচ আত্মা" প্রভৃতি অভিধানে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৭৬৯ সালে তিনি ভলটেয়ারকে লিখিয়াছিলেন, "আমি বস্তুতঃ আপনাকে ঘৃণা করি, কেননা, আমার ঘৃণাই আপনি চাহিয়াছিলেন। যদি আপনি চাহিতেন, আপনাকে ভালবাসিতেও পারিতাম। এক সময়ে আপনার সম্বন্ধে যে সমস্ত ভাবে আমার অন্তর পূর্ণ ছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল আপনার প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আপনার রচনার প্রতি আকর্ষণই অবশিষ্ট আছে। আপনার প্রতিভা ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি যদি আমার শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আমার দোষ নাই।"

Discourse on Inquality গ্রন্থে রুসো ক্রমবর্দ্ধমান যথেচ্ছাচারের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে উত্থাপিত বিদ্রোহকে "বিধিসঙ্গত কার্য্য" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এতাদৃশ মত-প্রচারে বিপদ তো ছিলই। অধিকন্তু রুসো সাধারণের উপর প্রভূত প্রভাববিস্তারে সমর্থ বাক্পটুতার অধিকারী ছিলেন। তিনি মুক্ত বাতাসে বক্তৃতার উপযোগী এক রচনা-শৈলীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহা পাঠে জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিত। ১৭৫৮ সালে তিনি দালেম্বার্টকে যে ২৮৩ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্র লেখেন, তাহাতে এই রচনা-শৈলীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পত্রে উন্মাদিনী বাগ্মিতার স্রোত প্রবাহিত ছিল। পাঠ করিয়া সাধারণে বিশেষভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত, বহু বিদ্বৎপরিষদের সভ্য দালেম্বার্ট তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। তিনি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "আপনার লেখনীর মত লেখনীব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বিপজ্জনক। যে অবজ্ঞা আপনি সাধারণের প্রতি প্রদর্শন করেন, তাহাদ্বারাই কিরূপে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তাহা আপনিই জানেন।" এই পত্রে তিনি লুথারের সঙ্গে রুসোর তুলনা করিয়াছিলেন।

নির্জনবাস

কিন্তু এ সকলের কিছুতেই রুসোর তৃপ্তি হইতেছিল না। সংসার হইতে বিদায় লইয়া পারিস হইতে দূরবর্ত্তী কোনও স্থানে নির্জনে বাস করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার এই ইচ্ছার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার এক বান্ধবী মণ্ট্‌ মরেন্‌সির অরণ্যের মধ্যে তাঁহার নিজের গৃহের সম্মুখে তাঁহার জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। গৃহের নাম হইল Hermitage (নিভৃত কুটীর)। ১৭৫৬ সালে রুসো পারিস ত্যাগ করিয়া এই কুটীরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার এই নির্জন-প্রিয়তার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। কেহ তাঁহাকে মানব-বিদ্বেষী বলিলেন; কেহ বলিলেন, প্রশংসা-লোভী। ১৭৬২ সালে Malesherbesকে লিখিত এক পত্রে রুসো তাঁহার নির্জন বাসের কারণ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, লোকালয়-ত্যাগের প্রকৃত কারণ আমার অদম্য স্বাধীন প্রকৃতি। এই প্রকৃতির নিকট সম্মান, ধনসম্পদ, যশঃ কিছুরই কোনও

মূল্য নাই। এই প্রকৃতি আমার অহঙ্কার হইতে উদ্‌ভূত নহে; মজ্জাগত আলস্য হইতে ইহার উদ্‌ভব। আমার এই আলস্যের পরিমাণ এত বেশী, যে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। ইহার জন্য সকল ব্যাপারেই আমার ভয় পায়। নাগরিক জীবনের সামান্যতম কর্ত্তব্যও অসহনীয় হইয়া পড়ে! যখন প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখন একটা কথা বলা, একখানা পত্র লেখা, অথবা কোথাও গিয়া কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করা, আমার ভীষণ পীড়াদায়ক হইয়া উঠে!" রুসোর যৌবনের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে ছিল এক আকাঙ্ক্ষা—অবসর ও শান্তি। অবসর ও শান্তির সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। Therese ও তাহার মাতাও রুসোর সহিত Hermitageএ বাস করিতে লাগিলেন।

La Nouvelle Heloise

রুসো চিরকাল ভালবাসার কাঙ্গাল ছিলেন। নিজের স্নেহের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে দান করিতেন; স্বার্থ-চিন্তার লেশ তাঁহার ছিল না। কিন্তু সে ভালবাসার উপযুক্ত প্রতিদান কখনও প্রাপ্ত হন নাই। থেরেসের নিকট যে স্নেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তর তৃপ্ত হয় নাই। Montmorencyর অরণ্যের বিজনতার মধ্যে তাঁহার স্মৃতির দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইত, এবং অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিত। তিনি লিখিয়াছিলেন, "বাঁচা ও ভালবাসা আমার কাছে অভিন্ন, তবুও কেন আমাতে সম্পূর্ণ অনুরক্ত একজন বন্ধুও পাইলাম না? *** কেন আমার অন্তর স্নেহে পূর্ণ ও সহজেই আবেগে বিচলিত হইলেও কোনও ব্যক্তিবিশেষকে আমি ভালবাসিতে পারিলাম না? ভালবাসিবার ইচ্ছার আগুনে দগ্ধ হইতে হইতে বার্দ্ধক্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াও আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রকৃতপক্ষে বাঁচা আমার ঘটিয়া উঠিল না। *** যদি আমার সুকোমল বৃত্তিনিচয়ের ব্যবহারই করিতে পারিব না, তবে কেন তাহা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? নিয়তি আমার ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে নাই; তাহার নিকট এখনও আমার কিছু প্রাপ্য আছে।"

জুন মাসে একদিন বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া রুসো চিন্তা করিতেছিলেন; নাইটিংগেল তখন মধুর সুরে গান করিতেছিল; অদূরে স্রোতস্বতী কুলকুলনাদে বহিয়া যাইতেছিল। রুসোর দেহ আলস্যে অবশ ও মনঃ স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া আসিল। অকস্মাৎ স্মৃতির দ্বার খুলিয়া গেল। তাঁহার প্রেমাতুর মনের সম্মুখে পূর্ব্বপরিচিতা সুন্দরীগণের জীবন্ত চিত্র ভাসিয়া আসিল। সুন্দরীগণ-পরিবেষ্টিত রুসোর প্রেমতৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠিল, চিত্ত অস্থির হইল। অস্থিরতার মধ্যে মনে হইল তাঁহার প্রেমলীলার বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাস্তব জগতে প্রেম-পিপাসার পরিতৃপ্তি অসম্ভব জানিয়া কল্পনার জগতে মনঃ ধাবিত হইল, স্বকীয় সৃষ্টির মধ্যে পরিতৃপ্তির সন্ধানে ছুটিল[1]। তাঁহার অমর উপন্যাস La Nouvelleএর

[1] Misanthrope

নায়িকা জুলি ও ক্লেয়ার তখন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার মানস চক্ষুর সমীপে আবির্ভূত হইল। রুসো গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ করিলেন। ১৭৬৬ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সাহিত্যিকগণ ঈর্ষ্যাবশে গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। ভলটেয়ার অতি নীচ ও জঘন্য ভাষায় রুসোকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ ঐ সমস্ত সমালোচনা অগ্রাহ্য করিয়া বিপুল সমাদরে গ্রন্থের অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

Hermitageএ রুসো বহু দিন বাস করিতে পারেন নাই। তিনি ১৭৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে Montmorencyতে উঠিয়া যান, এবং সেখানে Duke of Luxemburghএর আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। চারি পাঁচ বৎসর তিনি এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়েই তাঁহার La Nouvelle Helloise সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হয়। Letter to D' Alembert on the theatre, Emile, ও Social Contractও এই সময়ে রচিত ও প্রকাশিত হয়।

Emile শিক্ষাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ-রক্ষা করিয়া কিরূপে শিক্ষা দেওয়া যায়, গ্রন্থে তাহারই আলোচনা আছে। এই শিক্ষাপ্রণালীতে আপত্তিজনক কিছু না থাকিলেও "The Confession of a Savoyard Vicar" নামক অধ্যায়ে "প্রাকৃতিক ধর্ম্মে"র[1] যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা পাঠ করিয়া রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যাণ্ট উভয় সম্প্রদায়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

সভ্যতা তাঁহার মতে যাবতীয় অনর্থের মূল। সভ্যতার অনিষ্টকর প্রভাব হইতে মুক্ত পরিবেশের মধ্যে শিশুর শিক্ষা হওয়া উচিত। সভ্য মানুষ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরাধীন। জন্মমাত্র তাহাকে কাপড় পরাইয়া দেওয়া হয়, মৃত্যু হইলে কফিনে বন্দী করা হয়। প্রকৃতি তাহার সন্তানদের শিক্ষার জন্য যে পথ অনুসরণ করে, তাহাই শিশুদিগের শিক্ষায় অবলম্বিত হওয়া উচিত। নানাবিধ অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলিয়া প্রকৃতি শিশুদিগের শরীর কষ্টসহ করিয়া তোলে—দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করিতে শিক্ষা দেয়। শিশুদিগকে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। কষ্ট সহ্য করাই তাহাদিগের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা হওয়া উচিত।

অভাব অপেক্ষা তাহা পূরণ করিবার শক্তি যাহার কম, তাহাকেই দুর্বল বলে। এই দুর্বলতা দূর করিতে হইলে, অভাবপূরণের শক্তি অর্জন করিতে শিক্ষা দিতে হইবে।

যে ব্যক্তি, যাহা সে সম্পন্ন করিতে সক্ষম, তাহাই ইচ্ছা করে, এবং যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই করে, সেই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন। পরনির্ভরতা দ্বিবিধ—দ্রব্যের উপর নির্ভর ও ও মানুষের উপর নির্ভর। প্রথমটির কোনও নৈতিক ফল নাই, কিন্তু দ্বিতীয়টি যাবতীয় দোষের আকর। শিশুদিগকে মানুষের উপর নির্ভর হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। শিশু যাহা চায়, তাহাই তাহাকে দিওনা; যাহা তাহার প্রয়োজন, কেবল তাহাই দেওয়া উচিত। প্রকৃতির প্রথম তাড়নায় কোনও দোষ নাই। "আদিম পাপ" বলিয়া মানুষের অন্তরে

---

[1] Natural Religion

কোনও পাপ-প্রবৃত্তি নাই। কিরূপে কেন পাপ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, তাহা লক্ষ্য করা যায়। শিশুদিগকে তাহাদিগের কর্ত্তব্য কি, তাহা শিক্ষা না দিয়া, তাহাদের অন্তরকে পাপের স্পর্শ হইতে রক্ষা করাই উচিত। শিশুর উপযুক্ত একমাত্র নৈতিক শিক্ষা এই—"কাহাকেও আঘাত করিও না।"

জ্ঞানের অভাব হইতে কাহারও কোনও অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ভুলের ফল মারাত্মক। শিশুদের শিক্ষার জন্য পুস্তকের প্রয়োজন নাই। তাহাদের ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করিয়া তাহারা শিখুক। সমগ্র পৃথিবীই তাহাদের পুস্তক, যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাই তাহাদের শিক্ষার বিষয়। প্রকৃতির ব্যাপার সকল তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে দাও; তাহাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে দাও; শীঘ্র শীঘ্র সে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। আপনার চেষ্টাতেই তাহাকে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে দাও। অনেক বিষয় তাহাকে শিখাইও না। কিন্তু কোনও বিষয়েই ভুল শিখিতে দিও না। স্মৃতি ও বিচার-শক্তি ধীরে ধীরে আসে, কিন্তু মিথ্যা সংস্কার আসে দলে দলে। তাহা হইতে শিশুদিগকে রক্ষা করা চাই। যদি কোনও পুস্তক শিশুদিগকে দিতেই হয়, তবে সে পুস্তক Robinson Crusoe.

সামাজিক যে সকল সম্বন্ধ শিশু বুঝিতে অক্ষম, সে সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা করিও না। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষ যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, তাহা বুঝাইবার জন্য শিল্পের দিকে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট কর। কৃষিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সম্মানজনক শিল্প; তাহার পরেই ধাতু-শিল্প, তাহার পরে সূত্রধরের কর্ম্ম। এইরূপে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের জ্ঞান হইবে।

যদি এমন অবস্থা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়, যে কাহারও পক্ষে অন্যায় কর্ম্ম না করিয়া জীবনধারণ অসম্ভব হয়, এবং লোকে অন্যায় কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে অন্যায়কারীর ফাঁসী না দিয়া, যাহারা তাহাকে অন্যায় করিতে বাধ্য করে, তাহাদেরই ফাঁসী দেওয়া উচিত। বর্ত্তমান সামাজিক শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিয়া থাকিও না। এ শৃঙ্খলা চিরস্থায়ী নহে। ভবিষ্যতে সমাজে কি বিপ্লব আসিতে পারে, তাহা বলা যায় না। সে বিপ্লবে ধনী দরিদ্র হইয়া যাইতে পারে, দরিদ্র ধনী হইতে পারে; রাজা সাধারণ লোকের একজন হইতে পারেন। অদৃষ্টের আঘাত কি এতই বিরল, যে তাহার আঘাত তোমার সন্তানদিগের উপর পড়িবে না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? সে সঙ্কটকাল অদূরবর্ত্তী। বিপ্লবের ধারে আমরা দাঁড়াইয়া আছি। সমাজের বাহিরে নির্জ্জনে যে বাস করে, সে যেরূপ ইচ্ছা, সেই ভাবেই বাস করিতে পারে। কাহারও নিকট তাহার কোনও ঋণ নাই। কিন্তু সমাজে যে বাস করে, হয় তাহাকে অন্যের ব্যয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে হইবে, অথবা তাহার জীবিকার জন্য যাহা ব্যয়িত হয়, তাহা নিজের পরিশ্রমদ্বারা পরিশোধ করিতে হইবে। ধনী, নির্ধন, সবল অথবা দুর্ব্বল, সমাজের প্রত্যেককেই খাটিতে হইবে। যে পরিশ্রম করে না, সে তস্কর। বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিলেও, সকল মানুষই সমান। যে শ্রেণীতে অধিকসংখ্যক লোক, সেই শ্রেণীই অধিক সম্মান পাইবার উপযুক্ত।

শিশুদিগের সঙ্গীনির্ব্বাচন এমন ভাবে করিতে হইবে, যে তাহারা সঙ্গীদিগকে ভাল বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু সংসারের সহিত তাহার পরিচয় এমন ভাবে করিয়া দিতে হইবে, যে সংসারে যাহা ঘটে, তাহার সকলই সে মন্দ মনে করে। মানুষ যে স্বভাবতঃ ভাল, তাহা শিশুকে বুঝিতে দিতে হইবে, কিন্তু সমাজ কিরূপে মানুষকে দূষিত করে তাহাও দেখাইতে হইবে। সাবধানে চলিতে, বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সম্মান করিতে, মিতভাষী হইতে, সত্য বলিতে এবং সাহসী হইতে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবে।

শিশুদিগকে বিবাদ-বিসংবাদ ঘৃণা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। পরের উপর প্রভুত্ব করিয়া অথবা অন্যের কষ্ট দেখিয়া যেন তাহারা আনন্দ না পায়। কষ্ট দেখিয়া স্বভাবতঃ যেন তাহাদের কষ্ট হয়।

মানুষকে অসভ্যে পরিণত করা, অথবা পুনরায় জঙ্গলে পাঠাইয়া দেওয়া, আমার ইচ্ছা নহে। সংস্কার অথবা অদম্য প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত না হইয়া তাহারা যুক্তিসম্মত জীবনযাপন করে, ইহাই আমার লক্ষ্য। চক্ষুদ্বারা যেমন দেখা যায়, তেমনি হৃদয়দ্বারা অনুভব করা চাই।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে শিক্ষার প্রয়োজন রুসো স্বীকার করেন নাই। অল্প বয়সে ভুল শিক্ষা পাইবার বিপদ আছে। "মুক্তির জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রয়োজন"....ইহা ঠিক ভাবে বুঝিতে না পারার জন্যই পরমতাসহিষ্ণুতার উদ্ভব হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলেও মুক্তি ক্ষেত্র-বিশেষে সম্ভবপর। শিশু ও উন্মাদদিগের ঈশ্বরসম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। কেহ যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক অবিশ্বাস পোষণ না করে, তাহা হইলে বৃদ্ধ অবস্থায় অবিশ্বাসী হইলেও, পরলোকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য হইতে তাহার বঞ্চিত হইবার কারণ নাই। যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহাদিগের নিকট সত্য-প্রচারের ফলে ভুলের প্রচার হইবে। ঈশ্বরসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা না থাকাই ভাল। ঈশ্বরকে অপমান করা অপেক্ষা তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়াই ভাল।

উৎপীড়ন

Emile ও Social Contract, উভয় গ্রন্থই ১৭৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। উভয় গ্রন্থ হইতে ৮০০০ ফ্রাঙ্ক লাভ হইবে বলিয়া রুসো আশা করিয়াছিলেন। এই অর্থ হস্তগত হইলে তিনি সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজের একখানা সত্য জীবনচরিত লিখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিপদের মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল। বহুসংখ্যক শত্রু তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছিল। তাঁহার "Julie" গ্রন্থের একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন "রাজপুত্রের উপপত্নী অপেক্ষা কয়লা-খনির শ্রমিকও অধিকতর সম্মানের উপযুক্ত।" ইহা পড়িয়া রাজার উপপত্নী ম্যাডাম ডি পম্পাডোর তাঁহার উপর ভীষণ রুষ্ট হন। প্রধান মন্ত্রীও তাহার উপর ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। Encyclopedist-গণ তাঁহাকে দলত্যাগী বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তাঁহার দেশব্যাপী খ্যাতি ভলটেয়ারের অসহ্য হইয়াছিল। পার্লিয়ামেন্টের সভ্যগণ তাঁহার প্রচারিত মত দেশের অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন। প্রোটেষ্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণই তাঁহার

"প্রাকৃতিক ধর্ম্মের" প্রচারে স্ব স্ব ধর্ম্মের বিপদ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই সময়ে Encyclopedist ও খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসীদিগের মধ্যে ভীষণ কলহ চলিতেছিল। রুসো লিখিয়াছেন "উন্মত্ত ব্যাঘ্রের মত তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। উপযুক্ত নেতা কোনও দলের ছিল না, তাই রক্ষা, নতুবা দেশে অন্তর্বিদ্রোহ সংঘটিত হইত। নিষ্করুণ পরমতাসহিষ্ণুতাজাত ধর্ম্মসংক্রান্ত যুদ্ধের ফল কি হইত, তাহা ঈশ্বরই জানেন।" এই বিরোধের শান্তির জন্যই রুসো Nouvelle Heloise এবং Emile গ্রন্থে পরমত সহ্য করিবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফল হইয়াছিল বিপরীত। উভয় দল মিলিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনে উদ্যত হইল। রুসোর চতুর্দ্দিকে যে বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, রুসো তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। নির্জ্জন পল্লী-নিবাসে নিজের গ্রন্থের সফলতার আনন্দে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতেছিল। মেঘগর্জ্জন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। যখন বিপদের কথা জানিতে পারিলেন, তখন অপরিসীম ভয়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, এবং যেখানে বিপদ ছিল না, সেখানেও বিপদ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি আরব্ধ হইল। সকলেই তাঁহার শত্রু, সকলেই তাঁহাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, এই বিশ্বাসে তাঁহার মনের সমতা হারাইয়া ফেলিলেন; উৎপীড়নের ভীতি তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। তাঁহার মূত্রাশয়ের পীড়া এই উত্তেজনায় অসম্ভব-রূপে বাড়িয়া উঠিল। যন্ত্রণায় অনেক সময় আত্মহত্যার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। Emile গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল হল্যাণ্ডে। হল্যাণ্ডে গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইবার পরে কুড়ি দিন গত না হইতেই প্যারিসের পার্লিয়ামেণ্ট রুসোর নিকট হইতে কোনও কৈফিয়ত না লইয়াই উক্ত গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলিবার এবং রুসোকে বন্দী করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। ৯ই জুন আদেশ প্রদত্ত হয়, ১০ই তারিখে প্যালে ডি জাষ্টিসের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে গ্রন্থ প্রথমে ছিঁড়িয়া ফেলা হইল, তারপরে আগুনে পোড়ানো হইল। অনেকে প্রকাশ্যভাবেই বলিতে লাগিল, গ্রন্থের সহিত গ্রন্থকারকে পোড়াইয়া মারা উচিত। রুসোর সম্ভ্রান্ত বন্ধুগণ তাঁহাকে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। ১১ই জুনই রুসো পলায়ন করিয়া সুইজারল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি নিরাপদ হইতে পারিলেন না। তাঁহার শত্রুগণ সেখানেও তাঁহাকে অনুসরণ করিল। ৯ দিন পরে জেনিভাতেও তাঁহার গ্রন্থ আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হয়। বার্ণ ও নিউস্যাটলও জেনিভার অনুসরণ করিল। সমস্ত ইউরোপে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিসম্পাত উচ্চারিত হইতে লাগিল। এরূপ প্রচণ্ড রোষ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। সর্ব্বত্রই রুসোকে অবিশ্বাসী, নাস্তিক, উন্মাদ, হিংস্র পশু, ব্যাঘ্র প্রভৃতি অভিধানে সকলে অভিহিত করিতে লাগিল। রুসোর মনে হইল সমগ্র পৃথিবী তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। রুসোর অন্তর ছিল অতি দুর্ব্বল ও কোমল। ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে তিনি ভুগিতেছিলেন। এরকম অবস্থায় যে ভীষণ বিদ্বেষের বন্যা তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল, তাহার চাপে তিনি যে বুদ্ধি-বিবেচনা হারাইয়া ফেলিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত উৎপীড়ন-ভীতি তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত।

সুইজারল্যাণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া রুসো প্রাসিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের রাজ্যে মোটিয়ার্স গ্রামে আশ্রয় লইলেন। আড়াই বৎসর তিনি তথায় বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে অবস্থান-কালে জেনিভার রাষ্ট্র ও চার্চ্চকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ লেখার জন্য পুরোহিতেরা ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মেটিয়ারের গীর্জ্জায় তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল, এবং গীর্জ্জার পুলপিট হইতে ধর্ম্মোপদেষ্টা তাঁহাকে anti-Christ (খৃষ্টশত্রু) বলিয়া অভিহিত করিলেন। সাধারণ লোক উত্তেজিত হইয়া পথে ঘাটে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। একদিন রাত্রিকালে বহুসংখ্যক লোক মিলিত হইয়া তাঁহার গৃহ আক্রমণ করিলে তিনি পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। Bienne হ্রদের তীরে একমাস বাস করিবার পরে বার্ণ নগরের শাসনকর্ত্তাগণের আদেশে তাঁহাকে সে স্থানও ত্যাগ করিতে হইল। রুসো ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দার্শনিক পণ্ডিত ডেভিড হিউম রুসোকে ইংলণ্ডে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই বিপদের সময় তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। ইংলণ্ডে সকলেই রুসোকে সাদরে গ্রহণ করিল। ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জ তাঁহাকে এক বৃত্তি দান করিলেন। প্রসিদ্ধ বক্তা বার্কের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইল, কিন্তু সে বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় নাই। বার্ক লিখিয়াছেন "একমাত্র আত্মাভিমান ভিন্ন, তাঁহার হৃদয়কে প্রভাবিত অথবা বুদ্ধিকে চালিত করিবার উপযোগী কোনও নীতি[1] তাঁহার ছিল না।" হিউম বহুদিন পর্য্যন্ত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, এবং শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু রুসোর উৎপীড়নভীতি তাঁহাকে সকলকেই অবিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস হইল, হিউম তাঁহার শত্রুদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। মাঝে মাঝে এই অমূলক ধারণায় লজ্জিত হইয়া তিনি হিউমকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেন "না, না। হিউম বিশ্বাসঘাতক নয়।" কিন্তু অবশেষে অবিশ্বাসেরই জয় হইল, রুসো পলায়ন করিলেন। হিউম তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তাঁহার সমস্ত জীবনই বেদনার[2] জীবন। তাঁহার বেদনাবোধ এত তীব্র হইতে দেখিয়াছি, যে অন্য কোথাও তাহার তুলনা মিলে না। কিন্তু এই বেদনাবোধ তাঁহাকে সুখ অপেক্ষা দুঃখের তীব্রতর অনুভূতিই দিয়াছে। যদি কোনও লোকের পরিচ্ছদের সহিত তাহার শরীর হইতে ত্বকও খুলিয়া লওয়া হয়, এবং সেই অবস্থায় সে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সম্মুখীন হয়, তাহা হইলে তাহার যে অবস্থা হয়, রুসোর অবস্থাও তদ্রূপ।"

আত্ম-চরিত

ইংলণ্ড হইতে পলায়নের পরে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রুসো স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাকে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি প্রদত্ত হইল। প্যারিসে একটি সামান্য গৃহে স্বরলিপি নকল করিয়া তিনি দরিদ্রভাবে জীবন যাপন

[1] Principle
[2] Feeling

করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার জীবনচরিত লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। এই জীবনচরিতের নাম দিয়াছিলেন Confessions (স্বীকারোক্তি)। এই গ্রন্থ তিনি কয়েকজন বন্ধুকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহাদের গুপ্তকথা প্রকাশিত হইবার ভয়ে পুলিশের সাহায্যে ইহার পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার চিঠিপত্রও গবর্ণমেণ্টের আদেশে খুলিয়া পড়া হইতে লাগিল। ফলে রুসোর মানসিক ব্যাধি বাড়িয়া চলিল। তিনি "নির্জ্জন দ্বীপে রবিনসনক্রুসো" অপেক্ষা প্যারিসে আপনাকে অধিকতর নিঃসঙ্গ মনে করিতে লাগিলেন। সমস্ত পৃথিবী তাঁহাকে শত্রু বলিয়া গণ্য করে, এই বিশ্বাসে তিনি "Dialogues de Rousseau Jean Jaeks" লিখিলেন। এই প্রবন্ধে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের তিনি যে ভীষণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উন্মাদের প্রলাপমাত্র। তাঁহার হতাশার আর্ত্তনাদ কোনও মানুষের কর্ণে প্রবেশ করিবে না, এই বিশ্বাসে তিনি প্যারিসের Notre Dame গীর্জ্জার বেদীর উপর তাঁহার গ্রন্থ ঈশ্বরকে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বেদীর পথ রুদ্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই আঘাতে তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে হইল ঈশ্বরও তাঁহার প্রতি বিরূপ। গভীর ধর্ম্মবিশ্বাসের ফলে তখন তাঁহার মনে হইল, ঈশ্বর যখন তাঁহার উপর উৎপীড়ন হইতে দিতেছেন, তখন ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার "সনাতন আদেশের"[1] অন্তর্ভূত। সুতরাং সেই আদেশের নিকট দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে বিশ্বাসের সহিত নত হওয়া ভিন্ন তাঁহার করণীয় কিছু নাই। এই বিশ্বাসে তিনি কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। এই সময়ে নির্জ্জন চিন্তা Les Reveries du promeneur solitare গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। (১৭৭৬ সালে এই গ্রন্থ আরব্ধ হয়, কিন্তু শেষ হয় নাই)। এই গ্রন্থে তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "পৃথিবীতে আমি একা। ভাই নাই, প্রতিবাসী নাই, সখা নাই, আমি ভিন্ন আমার কেহই নাই। মানবের মধ্যে যে ছিল সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহশীল ও মিশুক, সকলেই তাহাকে বর্জন করিয়াছে :......কিন্তু গহ্বরের তলদেশে হতভাগ্য মরণশীল মানুষ আমি শান্তই আছি—শান্ত কিন্তু ঈশ্বরের মতই সুখ দুঃখের অতীত।" তাঁহার Reveries সম্বন্ধে Roman Rolland লিখিয়াছেন "এই গ্রন্থে তাঁহার কলা-কৌশলের কোনও অপকর্ষের পরিচয় নাই ; বরং তাহার বিশুদ্ধিই দৃষ্ট হয়। অরণ্যের নিস্তব্ধতার মধ্যে বিষাদমগ্ন বৃদ্ধ নাইটিংগেলের মধুর সঙ্গীতের মতই রুসোর এই শেষ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার জীবনের অল্পসংখ্যক সুখের দিনগুলির আলোচনা করিয়াছেন, যখন তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সঙ্গে একীভূত হইয়াছিলেন। অন্য সমস্ত অনুভূতিবর্জিত হইয়া, সত্তার গভীরে[2] মনঃ নিমজ্জিত করিয়া আপনার স্বরূপের আলিঙ্গনে বদ্ধ[3] হইয়া তিনি যে বিপুল উল্লাস[4] অনুভব করিয়াছিলেন পাশ্চাত্ত্যদেশের কেহই তাঁহার মত তাহা অনুভব করে নাই। জীবনের

[1] Eternal decrees
[2] Depth of Being
[3] Entwined with himself
[4] Ecstasy

শেষের দিকে তিনি উদ্‌ভিদ-বিদ্যার আলোচনা করিতেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অপেক্ষা পৃথিবীর প্রাণের স্পর্শ এবং মাঠ, জলাশয়, বন, নির্জনতা, সর্ব্বোপরি শান্তি ও বিশ্রামের যে স্মৃতি এই আলোচনা হইতে উদ্‌বুদ্ধ হইত, তাহাই তাঁহার কাম্য ছিল।" সঙ্গীতেও তিনি আনন্দ পাইতেন।

রাজনৈতিক মত—সামাজিক চুক্তি

রুসোর রাজনৈতিক মত তাঁহার Social Contractএ বিবৃত আছে। এই গ্রন্থে ভাবুকতা বেশী নাই, যুক্তিতর্ক প্রচুর আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই আছে "মানুষ জন্মিয়াছে স্বাধীন, কিন্তু সর্ব্বত্রই সে অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। একজন আপনাকে অন্যের প্রভু বলিয়া মনে করে, কিন্তু বস্তুতঃ সে তাহাদিগের অপেক্ষাও অধিকতর পরাধীন।" স্বাধীনতাই দৃশ্যতঃ রুসোর চিন্তার লক্ষ্য হইলেও, সাম্যই তাঁহার নিকট অধিকতর মূল্যবান ছিল, এবং স্বাধীনতার বিনিময়েও তিনি সাম্যপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন।

গ্রন্থে প্রজাতন্ত্রের প্রশংসা আছে। কিন্তু প্রজাতন্ত্র বলিতে রুসো প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রই বুঝিয়াছিলেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষেই রাষ্ট্রশাসনের সহিত সংযুক্ত থাকা সম্ভবপর, কিন্তু বড় বড় রাষ্ট্রের অসংখ্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। এই জন্য বড় বড় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রজাতন্ত্র তাঁহার মতে উপযোগী নহে। বর্ত্তমানে যাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়, রুসো সেই প্রতিনিধিমূলক শাসনকে নির্ব্বাচন-মূলক অভিজাত তন্ত্র বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ছোট ছোট রাষ্ট্রের পক্ষে "প্রজাতন্ত্র"ই ভাল; মধ্যম আকারের রাষ্ট্রের পক্ষে "অভিজাত তন্ত্র", এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে রাজতন্ত্র উৎকৃষ্ট।

"নির্ব্বাচনমূলক অভিজাত তন্ত্র"ই রুসোর মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহা সকল দেশের উপযোগী নহে। যে দেশের জল বায়ু নাতিশীতোষ্ণ, যে দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয় না, এই শাসন কেবল সেই দেশেরই উপযোগী। কোন দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের অধিবাসিগণ বিলাসী হইয়া পড়ে। সমগ্র সমাজের মধ্যে বিলাসের প্রসার অপেক্ষা দেশের রাজা ও তাঁহার সভাসদ্‌গণের মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ থাকাই মঙ্গলকর। এই মত অনুসারে পৃথিবীর বহু দেশই প্রজাতন্ত্র-শাসনের উপযুক্ত নহে, যথেচ্ছাচারী রাজশাসনই তাহাদের উপযোগী। ইহা সত্ত্বেও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট যে এই গ্রন্থের প্রতি ভীষণ বিদ্বেষ পোষণ করিতেন, তাহার কারণ ইহাতে প্রজাতন্ত্রের প্রশংসা ছিল, এবং রাজাদিগের "ঈশ্বরদত্ত অধিকার" ইহাতে স্পষ্টতঃ অস্বীকার করা না হইলেও, "চুক্তি" হইতে রাষ্ট্রশাসনের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মত-দ্বারা তাহা অস্বীকৃত হইয়াছে।

মানুষের যখন সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন তাহারা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত না।

প্রত্যেকেই স্বাধীন ছিল, ও নিজের ইচ্ছানুসারে চলিত। কিন্তু কালক্রমে এইরূপে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভবপর হইল না। পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি না করিয়া পরস্পরের রক্ষার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হইল। সকলের সম্মিলিত শক্তিদ্বারা প্রত্যেকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিয়া কিরূপে প্রত্যেকের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়, ইহাই হইল তখনকার সমস্যা। "সামাজিক চুক্তি"দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইয়াছিল। এই চুক্তি অনুসারে প্রত্যেকের যাবতীয় অধিকারসহ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমাজের নিকট সমর্পণ করিতে হয়; কোনও অধিকারই নিজের জন্য রাখিয়া দেওয়া চলে না। কিন্তু ইহাতে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষিত হইল কোথায়? ইহার উত্তরে রুসো বলিয়াছেন, "প্রত্যেকেই যদি সম্পূর্ণভাবে আপনাকে দান করে, তাহা হইলে সমাজের সকলের অবস্থাই সমান হইয়া যায়, সুতরাং এই অবস্থা কাহারও পক্ষে কষ্টকর করিয়া তুলিবার ইচ্ছা কাহারও মনে উদিত হয় না। যদি সম্পূর্ণরূপে আপনাকে দান না করিয়া প্রত্যেকে কতকগুলি অধিকার রাখিয়া দিত, তাহা হইলে ফল হইত এই, যে রক্ষিত অধিকার-সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহার মীমাংসা করিবার কেহই থাকিত না। ইহার ফলে প্রত্যেকেই আপন ইচ্ছামত আপনার অধিকারের ব্যাখ্যা করিত; সমাজ-সংহতি বিনষ্ট হইয়া যাইত, নতুবা সমাজই যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িত।" এই মতে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির কোনও অধিকারই থাকে না, সমস্ত অধিকারই রাষ্ট্রে সমর্পিত। অন্যত্র রুসো বলিয়াছেন, "যদিও সামাজিক চুক্তিদ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রকে পূর্ণ ক্ষমতাই প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি মানুষের স্বাভাবিক অধিকারও আছে। সার্ব্বভৌম শক্তি অধীনস্থ লোকদিগকে রাষ্ট্রের পক্ষে অনাবশ্যক কোনও শৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধ করিতে পারেন না। এরূপ করিবার ইচ্ছাই তাহার হইতে পারে না।" কিন্তু সার্ব্বভৌম শক্তিই যখন সমাজের প্রয়োজনের বিচারকর্ত্তা, তখন রাষ্ট্রের অত্যাচার ইহাদ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কম।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল এইভাবে সামাজিক চুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন: আমাদের প্রত্যেকে তাহার দেহ ও সমস্ত ক্ষমতা সর্ব্বনিয়ন্তা সাধারণ ইচ্ছার[1] নিয়ন্ত্রণের অধীনে স্থাপিত করি; এবং আমাদের সম্মিলিত অবস্থায় প্রত্যেককে সমগ্রের অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গ্রহণ করি।" এই সমবায়দ্বারা একটী নৈতিক সমবায়ী অঙ্গীর সৃষ্টি হয়। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় এই অঙ্গীকে 'রাষ্ট্র' বলে; সক্রিয় অবস্থায় ইহার নাম Sovereign (সর্ব্বশক্তিমান), এবং সদৃশ অন্য সমবায়ীর সম্পর্কে ইহার নাম "শক্তি[2]।" 'সাধারণ ইচ্ছা' বলিতে রুসো সমাজের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইচ্ছার সমষ্টি বোঝেন নাই, অথবা তাহাদের অধিকাংশের ইচ্ছা বোঝেন নাই, সকলের সমবায়ে যে অঙ্গীর উদ্ভব হয়, তাহার ইচ্ছাই বুঝিয়াছেন। হব্‌সের মতে বহুর সমবায়ে গঠিত সমাজ একটি পুরুষ[3]। এই মত গ্রহণ করিলে পুরুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই অঙ্গীর আছে। সুতরাং ইচ্ছাও আছে। কিন্তু সমবায়ী পুরুষের এই ইচ্ছার নিদর্শন কি? সাধারণ ইচ্ছা সকল সময়েই ন্যায়সঙ্গত এবং সাধারণের

---

[1] General will [2] Power [3] Person

মঙ্গল-দায়ক বলা হইয়াছে। কিন্তু "সাধারণ ইচ্ছা" ও "সকলের ইচ্ছা" এক পদার্থ নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির রাজনৈতিক মত তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু প্রত্যেক "স্বার্থের"ই দুইটি অংশ আছে। একটি ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়টি সকল ক্ষেত্রেই অভিন্ন। যদি ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পরের মধ্যে কোনও চুক্তি না হয়, তাহা হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ স্বার্থের কাটাকাটি হইয়া যাইবে, তাহাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না; সকল ক্ষেত্রে অভিন্ন অংশই অবশিষ্ট থাকিবে; সেই অভিন্নাংশই "সাধারণ ইচ্ছা"। পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণু বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করে; আমাদের উপরিস্থিত বায়ু আমাদিগকে উর্দ্ধ দিকে আকর্ষণ করে, পদতলস্থ মৃত্তিকা নিম্ন দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেই সমস্ত বিভিন্ন "স্বার্থপর" আকর্ষণ কাটাকাটি হইয়া অকার্য্যকর হইয়া পড়ে; অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণ উৎপন্ন হয়। পৃথিবীকে সমাজ বলিয়া গণ্য করিলে, তাহার কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণকে তাহার সাধারণ ইচ্ছা বলা যায়। "সাধারণ ইচ্ছা সর্ব্বদাই ন্যায়সঙ্গত", ইহার অর্থ এই, যে এই ইচ্ছা সকল ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সামান্যের প্রতীক বলিয়া, ইহাদ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সমবেত স্বার্থসিদ্ধি সম্ভবপর হয়।

Sovereignএর ইচ্ছাই "সাধারণ ইচ্ছা"। তাহা সকল সময়ই ন্যায়সঙ্গত। প্রত্যেক নাগরিকের ইচ্ছা ইহার অন্তর্গত। কিন্তু সাধারণ ইচ্ছাও তাহার আছে। কেহ তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছার বশে যদি সাধারণ ইচ্ছার আদেশ পালন না করে, তাহা হইলে তাহাকে তাহা পালন করিতে বাধ্য করা আবশ্যক। রুসো বলিয়াছেন এই বাধ্য করার অর্থ—তাহাকে "স্বাধীন" হইতে বাধ্য করা।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, "এই স্বাধীন হইতে বাধ্য করার অর্থ অত্যধিক পরিমাণে দার্শনিকতাজড়িত[১]। গ্যালিলিওর সময় কোপারনিকাসের মত সাধারণে গ্রহণ করে নাই। পৃথিবী যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, তাহা কেহ বিশ্বাস করিত না। তখন "সাধারণ ইচ্ছা" নিশ্চয়ই কোপারনিকাশের বিরোধী ছিল। Inquisition যখন গ্যালিলিওকে সেই মত প্রত্যাহার করিতে বলিল, তখন কি গ্যালিলিওকে স্বাধীন হইতে বাধ্য করা হইল? দুরাচার ব্যক্তিকে অপরাধের জন্য যখন কারাগারে আবদ্ধ করা হয়, তখন কি তাহাকে স্বাধীন হইতে বাধ্য করা হয়? রুসোর Romanticism দ্বারা অনুপ্রাণিত বায়রণের রচিত Corsair গ্রন্থে যে নৌ-দস্যু অতল নীল সমুদ্রেরই মত অসীম চিন্তা ও স্বাধীন হৃদয় লইয়া বিচরণ করিত, তাহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলে কি সে অধিকতর 'স্বাধীন' হইত? হেগেলও রুসোর মতই "স্বাধীনতা" শব্দের অপব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রের আদেশ পালন করিবার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলিয়াছেন।" এই সমালোচনা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে, স্বার্থপর ইচ্ছার আবিলতা হইতে মুক্ত হওয়াকেই রুসো স্বাধীনতা বলিয়াছেন। মদ্যপ যখন

[১] Very metaphysical

পানাসক্তির দাস হইয়া পড়ে, তখন বলপ্রয়োগদ্বারাও তাহাকে সেই অভ্যাস হইতে মুক্ত করিলে, তাহাকে যে স্বাধীনতা-লাভে সাহায্য করা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর রুসোর শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকলের সম্পত্তির রাষ্ট্রই মালিক।

কিন্তু রাষ্ট্রের শাসনে এই "সাধারণ ইচ্ছা" বাধাপ্রাপ্ত হয় কেন, ইহার উত্তরে রুসো রাষ্ট্রের অধীনস্থ বহু সমবেত মণ্ডলীর অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত মণ্ডলীরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "সাধারণ ইচ্ছা" আছে, সেই ইচ্ছার সহিত সমগ্র সমাজের "সাধারণ ইচ্ছার" সংঘাত সম্ভবপর। এই সমস্ত নিম্নস্থ সাধারণ ইচ্ছার অস্তিত্ববশতঃ, যত লোক তত ভোট থাকে না, যত মণ্ডলী তত ভোট হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণ ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের শাসনে ব্যক্ত করিতে হইলে, রাষ্ট্রের মধ্যে অধীনস্থ মণ্ডলী-গঠন নিষিদ্ধ করিতে হয়, এবং প্রত্যেক নাগরিককে তাহার নিজের চিন্তাদ্বারাই চালিত হইতে হয়। লাইকারগাস প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রে তাহারই ব্যবস্থা ছিল। Machiavel এই মত পোষণ করিতেন বলিয়া রুসো লিখিয়াছেন।

এই মতের পরিণতি কোথায় বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, ইহাতে চার্চ্চ, রাজনীতি, ট্রেড ইউনিয়ন, অথবা আর্থিক স্বার্থসমতাপ্রসূত কোনও দলেরই স্থান নাই। "সামগ্রিক রাষ্ট্রে"[1] স্পষ্টতঃই ইহার পরিণতি। সে রাষ্ট্রে ব্যক্তির কোনও ক্ষমতাই নাই। সর্ব্ববিধ মণ্ডলী নিষিদ্ধ করা যে দুরূহ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রুসো লিখিয়াছেন, যে নিম্নস্থ মণ্ডলীগঠন নিষিদ্ধ করা যদি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই ভাল; বহুসংখ্যক মণ্ডলীর মধ্যে পরস্পরের বিরোধবশতঃ তাহাদের কার্য্যকারিতার নাশ হইয়া যাইবে।

শাসনের বিষয় আলোচনা করিবার সময়, দেশের শাসন-বিভাগ যে একটি স্বতন্ত্র স্বার্থ ও সাধারণ ইচ্ছাবিশিষ্ট মণ্ডলী, তাহা রুসো স্বীকার করিয়াছেন। বড় বড় রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু এই বিভাগকে Sovereignদ্বারা সংযত করিবার প্রয়োজনও অধিক। শাসন-বিভাগের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর তিনটি ইচ্ছা—নিজের ব্যক্তিগত, তাহার দলগত ও "সাধারণ" ইচ্ছা। ইহাদের মধ্যে বিরোধে রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছা সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হইতে পারে না।" যখন কোনও লোক শাসকের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাহার প্রজ্ঞা ও ধর্ম্মজ্ঞান-অপহরণের অনুকূল হয়।" সুতরাং দেখা যাইতেছে "সাধারণ ইচ্ছা" সর্ব্বসময়েই বিশুদ্ধ ও অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও, তাহাদ্বারা অত্যাচারের প্রতিবিধান হয় না, সে সমস্যা অমীমাংসিতই রহিয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, যে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে রুসোর Social Contract বিশেষ কিছুই সাহায্য করে নাই।

---

[1] Totalatarian state

ধর্ম্মমত

রুসোর ধর্ম্মমত তাঁহার Emile গ্রন্থে Confession of a Savoyard Vicar শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এই বিশ্বাস বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, হৃদয়ের অনুভূতি ছিল ইহার ভিত্তি। একবার কোনও মহিলাকে তিনি লিখিয়াছিলেন "কখনও কখনও নির্জ্জন অধ্যয়ন-কক্ষে অন্ধকারের মধ্যে, অথবা দিবালোকে হস্তদ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া, আমার মনে হইয়াছে, ঈশ্বর নাই; কিন্তু প্রভাতে যখন উদীয়মান সূর্য্য নয়নগোচর হইয়াছে, যখন তাহার আলোকে কুজ্ঝটিকার আবরণ উন্মোচিত হইয়া প্রকৃতির দীপ্যমান বিচিত্র মূর্ত্তি দৃষ্টিসমীপে আবির্ভূত হইয়াছে, তখনই আমার অন্তরের সমস্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে; আমার বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে, আমার ভগবানকে পুনঃ-প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি।" অন্য একজনকে লিখিয়াছিলেন "অন্য সত্যে যেমন, ঈশ্বরেও তেমনি আমার প্রবল বিশ্বাস আছে। কেননা, আমার বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস আমার নিজের উপর নির্ভর করে না।" এক সময়ে এক ভোজে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করায় রুসো বিরক্ত হইয়া ভোজগৃহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

দার্শনিকদিগের যুক্তিতর্কে সন্দেহ অপগত না হইয়া বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় দেখিয়া রুসো দার্শনিক আলোচনা বর্জন করিয়া অন্তরের আলোকের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'আমি বুঝিতে পারিলাম আমি আছি, আমার ইন্দ্রিয়গণও আছে, যাহাদ্বারা আমি জ্ঞানলাভ করি। বাহিরের যাহা কিছু আমার ইন্দ্রিয় আঘাত করে, তাহাকে আমি জড় বলি। দার্শনিকদের পরমার্থ ও প্রতিভাস সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কের কোনও মূল্য আমার নিকট নাই। আমি বিশ্বাস করি জ্ঞানবান শক্তিশালী কোনও ইচ্ছাশক্তিকর্ত্তৃক জগৎ শাসিত হয়। সেই শক্তিকে আমি দেখিতে পাই—"আমি অনুভব করি" বলিলেই ঠিক হয়। এই জগৎ কেহ সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা চিরকাল বর্ত্তমান আছে, একই অথবা বহু উৎস হইতে যাবতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানিনা, জানিবার কোনও প্রয়োজনও আমার নাই। জড় সনাতনই হউক অথবা সৃষ্ট পদার্থ হউক, আদৌ ইহা সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় থাকিয়া থাকুক, সমগ্র জগৎ যে এক এবং একই বুদ্ধিমান পুরুষের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, তাহা নিঃসন্দেহ। এই পুরুষকেই আমি ঈশ্বর বলি। তাঁহার ইচ্ছা আছে, তিনি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তাঁহাতে করুণা আছে বলিয়াও আমি বিশ্বাস করি। করুণা তাঁহার বুদ্ধিশক্তি ও ইচ্ছার অবশ্যম্ভাবী ফল। ইহা ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। আমার ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি উভয়ের নিকটই তিনি আপনাকে লুকায়িত রাখিয়াছেন। আমি বেশ জানি, তিনি আছেন। তিনি স্বয়ম্ভু, তাহাও জানি। আমার অস্তিত্ব তাঁহার উপর নির্ভর করে, আমার পরিজ্ঞাত প্রত্যেক দ্রব্যই তাঁহার উপর নির্ভরশীল। সর্ব্বত্র তাঁহার কার্য্যের মধ্যে আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি, আমার চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে দেখিতে

পাই। কিন্তু যদি তাঁহার বিষয় চিন্তা করি, তিনি কোথায় আছেন অথবা তাহার স্বরূপ কি, যদি জানিতে চেষ্টা করি, তিনি অন্তর্হিত হন। আমার অশান্ত চিত্ত তখন কিছুই দেখিতে পায় না।"

"প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য; কিন্তু মানব-জাতির মধ্যে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা। পৃথিবীর দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখনই "পাপ" দৃষ্টিগোচর হয়।

"মানুষ স্বাধীন-ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সক্ষম। নিজের ইচ্ছানুসারে মানুষ কর্ম্ম করে; স্বাধীন ইচ্ছার বশে যাহা করে, তাহা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত, এবং তাহা ঈশ্বরে আরোপ করা যায় না। স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া মানুষ অমঙ্গলের সৃষ্টি করে, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রসূত নহে। ঈশ্বর মানুষকে পাপ করিতে বাধাও দেন না। ইহার কারণ এই হইতে পারে, যে মানুষের মত ক্ষুদ্র জীবে যে অমঙ্গলের সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাঁহার দৃষ্টিতে তাহা অতি সামান্য। ইহাও অসম্ভব নয়, যে এই অমঙ্গল রোধ করিতে হইলে, ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অমঙ্গল-সৃষ্টি এবং মানুষের প্রকৃতি হীনতর করিতে হয়। পুণ্য ও পাপ, ভাল ও মন্দের মধ্যে মানুষ পুণ্যই বাছিয়া লইবে, পাপ বর্জন করিবে, এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর তাহাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। মানুষ যদি তাহার বৃত্তিসকলের উপযুক্ত ব্যবহার করে, তাহা হইলেই এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর মানুষের ক্ষমতা এতই সঙ্কীর্ণ ভাবে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, যে স্বাধীন''ার অপব্যবহার করিয়াও মানুষ প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। মানুষ যে পাপ করে, তাহার নিজের উপরই তাহার ফল উৎপন্ন হয়। জাগতিক শৃঙ্খলার উপর তাহার কোনও ক্রিয়া নাই।

আমাদের ক্ষমতার অপব্যবহারই আমাদের দুঃখের হেতু। প্রকৃতি হইতে যে সমস্ত অমঙ্গলের উদ্ভব হয়, আমাদের দোষেই আমাদিগকে তাহা ভোগ করিতে হয়। স্বকর্ম্মের ফল দুঃখকষ্ট হইতে মুক্ত হইবার উপায় মৃত্যু। প্রকৃতি কাহাকেও চিরকাল কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না।

অমঙ্গল-স্রষ্টা অন্য কাঁহারও আমি অনুসন্ধান করি না, মানুষ নিজেই অমঙ্গলের স্রষ্টা। জগতে সকলই মঙ্গলকর। অবিচার সেখানে নাই। সুবিচার ও মঙ্গল অবিচ্ছেদ্য সংসর্গে বদ্ধ। অসীম ক্ষমতা এবং যাবতীয় চেতন পদার্থের আত্মপ্রীতির অব্যভিচারী ফল "কল্যাণ।" সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার সৃষ্ট পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট। সৃষ্টি এবং পালন, শক্তির চিরন্তন কার্য্য। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার উপর শক্তির কোনও ক্রিয়া নাই। * * * আপনার ক্ষতি না করিয়া তিনি ধ্বংস অথবা ক্ষতি করিতে পারেন না। যাহা মঙ্গল, কেবল তাহা ইচ্ছা করাই তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর। সর্ব্বশক্তিমান বলিয়াই তিনি সর্ব্বমঙ্গলময় ও ন্যায়বান্। তাহা না হইলে, তাঁহার মধ্যে স্ব-বিরোধ উৎপন্ন হইত। যে শৃঙ্খলা-প্রীতি হইতে শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাহাই মঙ্গল, যে শৃঙ্খলা-প্রীতিদ্বারা শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, তাহাই ন্যায় বিচার।

আত্মা যদি জড়পদার্থ না হয়, তাহা হইলে দেহের বিনাশের পরেও তাহার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব নয়। অস্তিত্ব যে থাকে, তাহার প্রমাণ এই, যে পৃথিবীতে অধার্ম্মিকের জয় ও ধার্ম্মিকের প্রতি পীড়ন দৃষ্ট হয়। বিশ্বব্যাপী সামঞ্জস্যের মধ্যে এই বৈসাদৃশ্যের ব্যাখ্যা

কোথায়? আমি বলিব জীবনের সমাপ্তিতেই সকল শেষ হয় না, মৃত্যুতে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা সে প্রাপ্ত হয়।" তবুও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহের যখন বিনাশ হয়, তখন আত্মার কি হয়? যখন দেহ ও আত্মার সংযোগ বিনষ্ট হয়, তখন একটির ধ্বংস হইলেও অন্যের অস্তিত্ব-থাকা সম্ভবপর। দেহ ও আত্মা স্বরূপে এতই বিভিন্ন, যে তাহাদের সংযোগ স্বভাবতঃই অস্থির। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবার পরে আত্মার যে শক্তি নিষ্ক্রিয় দেহকে চালনা করিতে ব্যয়িত হইত, আত্মা তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পরে আত্মার প্রকৃত জীবন আরব্ধ হয়। কিন্তু সেই জীবন কি অবিনশ্বর? তাহা আমি জানি না। সীমাবদ্ধ অসীমের ধারণা করিতে আমি অক্ষম।....কিন্তু ইহা জানি যে দেহের অংশ ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়াই দেহের বিনাশ হয়। কিন্তু চৈতন্যের এতাদৃশ বিনাশ সম্ভবপর নহে। এই অনুমান শান্তিদায়ক। যখন ইহা অসঙ্গত নহে। তখন ইহা স্বীকার করায় ভয় কি।

পাপিগণের অনন্তকালস্থায়ী শাস্তিতে আমার বিশ্বাস নাই। ঈশ্বরই একমাত্র অ-সঙ্গ পদার্থ[1]; তিনিই একমাত্র চিন্তা-বেদনা-ইচ্ছাশক্তি-বিশিষ্ট সক্রিয় পুরুষ; আমাদের চিন্তা, বেদনা ও ইচ্ছা তাঁহার নিকট হইতেই আমরা প্রাপ্ত হই। যতই তাঁহার অসীমত্ব চিন্তা করি, ততই তাঁহাকে বুঝিবার অসামর্থ্য বোধ করি। যতই কম বুঝি, ততই বেশী ভক্তি করি। নতজানু হইয়া বলি, "হে সমস্ত সত্তার সত্তা, তুমি আছ, তাই আমি আছি। তোমাতে চিত্ত স্থির রাখিয়া আমার সত্তার উৎসে আমি উপনীত হই। তোমাতে বুদ্ধি সমর্পণ করাতেই বুদ্ধির সার্থকতা; তোমার অসীম সত্তায় নিমজ্জিত হইয়া আমার মনঃ আনন্দে পূর্ণ হয়, আমার অপূর্ণতা সুখ প্রাপ্ত হয়।"

আমাদের হৃদয়ের তলদেশে একটি বৃত্তি আছে, তাহাদ্বারাই কর্ম্মের দোষগুণ আমরা বিচার করি। এই বৃত্তির নাম ধর্ম্মবিবেক[2]। এই বিবেক প্রত্যেকের অন্তরেই বর্ত্তমান, কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকেই তাহার আদেশ পালন করে। প্রকৃতির ভাষায় তাহার আদেশ প্রদত্ত হয়। সংসারের মধ্যে সে ভাষা আমরা ক্রমশঃই ভুলিয়া যাই।

ঈশ্বরকে আমি ভক্তি করি, তাঁহার দয়ায় আমি অভিভূত, কিন্তু তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করি না। তাঁহার নিকট কি চাহিব? আমার জন্য তিনি জগতের নিয়ম ভঙ্গ করিবেন? আমার জন্য অপ্রাকৃত ব্যাপার সংঘটিত করিবেন? যে জগৎ-শৃঙ্খলার জন্য আমি তাঁহাকে ভক্তি করি, আমার জন্য সেই শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবার জন্য অনুরোধ করিব? সেরূপ প্রার্থনার জন্য শাস্তি হওয়া উচিত। আমি চাই, তিনি আমার ভুল সংশোধন করিয়া দিন, যদি সে ভুলে আমার বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ধর্ম্মের বাহ্যিক রূপ ও ধর্ম্ম এক পদার্থ নহে। ঈশ্বর চাহেন অন্তরের সেবা। অকপট অন্তরের সেবা সর্ব্বত্রই একরূপ।

বুদ্ধিদ্বারা বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সরল ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। অবোধ্য ও স্ববিরোধী অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম্মকে আচ্ছাদিত করিয়া প্রচার করিলে সন্দেহ উপস্থিত

---

[1] Absolute

[2] Conscience

হয়। ঈশ্বর অন্ধকার ভালবাসেন না; তিনি আমাকে যে বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহার ব্যবহার করিব না, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। আমার বুদ্ধি অন্যকে সমর্পণ করিতে বলার অর্থ, যিনি বুদ্ধি দিয়াছেন, তাঁহাকে অপমান করা।

আমি প্রত্যেক ধর্ম্মকেই মঙ্গলদায়ক বলিয়া মনে করি। মানবজাতির দুই তৃতীয়াংশ ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের বাহিরে। কোটি কোটি লোক মুসা, যীশু ও মহম্মদের নামও কখনও শোনে নাই। ঈশ্বরকে যখন অন্তরের সঙ্গে পূজা করা হয়, তখন সকল পূজাই সমান। হৃদয়ের পূজাই পূজা, যদি আন্তরিক হয়,...তাহা হইলে কাহারও পূজা ঈশ্বর অগ্রাহ্য করেন না। পুণ্যবান হৃদয়ই ঈশ্বরের মন্দির। নৈতিক কর্ত্তব্য-পালন হইতে কোনো ধর্ম্মেই অব্যাহতি দেয় না। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক ধর্ম্মেই সকলের উপরে ঈশ্বরকে ভালবাসা, এবং প্রতিবাসীদিগকেও আপনার মত ভালবাসাই সকল কর্ত্তব্যের সার।

যাহারা প্রকৃতির ব্যাখ্যাব্যপদেশে মানুষের অন্তরে ধ্বংসের বীজ বপন করে, তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিও। দম্ভভরে তাহারা মনে করে, যে একমাত্র তাহারাই জ্ঞানী, এবং তাহাদের কল্পনাসৃষ্ট দুর্ব্বোধ্য তন্ত্রকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলে। মানুষ যাহা যাহা শ্রদ্ধা করে, সকলই তাহারা উৎপাটিত করিয়া পদদলিত ও ধ্বংস করে; দুঃখার্ত্ত জনগণের শেষ সান্ত্বনা তাহারা অপহরণ করিয়া লয়; ধন-ও-ক্ষমতাশালী লোকদিগের রিপুর চরিতার্থতার পথে একমাত্র বাধা তাহারা অপসারিত করিয়া ফেলে; মানুষের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে পাপের জন্য অনুতাপ ও সাধুজীবনপ্রাপ্তির সমস্ত আশা উন্মূলিত করে, এবং মানবজাতির উপকারী বন্ধু বলিয়া গর্ব্ব করে। তাহারা বলে সত্য কখনও অনিষ্ট করে না। সে কথা আমিও বিশ্বাস করি। আমি ইহাও বিশ্বাস করি, যে তাহারা যাহা বলে, তাহা সত্য নহে।

উদ্ধত দর্শনের[1] পরিণাম নাস্তিকতা, অন্ধ ভক্তির পরিণাম ধর্ম্মোন্মত্ততা। এই উভয়ই বর্জ্জন কর। ধর্ম্মের পথে দৃঢ় হইয়া থাক, দার্শনিকদের নিকট নির্ভয়ে বল, যে তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর। যাহারা পরমতাসহিষ্ণু তাহাদিগকে সদয় ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেও। হয়তো তোমাকে একাই পথ চলিতে হইবে; কিন্তু তোমার অন্তর্য্যামী তোমার সাক্ষী থাকিবেন, তাঁহার নিকটে বাহিরের সাক্ষীর মূল্য কি?

বেইল প্রমাণ করিয়াছেন ধর্ম্মান্ধতা নাস্তিকতা হইতেও অনিষ্টকর। তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একথাও সত্য, যে নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু হইলেও ধর্ম্মান্ধতা হৃদয়-আলোড়নকারী একটি প্রবল বৃত্তি, যাহা মৃত্যুকে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দেয়, এবং মানুষকে বিপুল কর্ম্মশক্তি দান করে। ইহাকে যদি যথোচিত ভাবে চালনা করা যায়, তাহা হইলে মহত্তমগুণ ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মহীনতা কি করে? ধর্ম্মহীনতা ও তার্কিক দার্শনিক প্রবৃত্তি জীবনের শক্তি ক্ষয় করে, হীনতম স্বার্থবোধের মধ্যে হৃদয়ের

[1] Philosophy

প্রবল বৃত্তিদিগকে কেন্দ্রীভূত করিয়া হীনতার পঙ্কে মানবাত্মাকে নিমজ্জিত করে, এবং অলক্ষিতে সমাজের ভিত্তি দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। কেননা ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সাধারণ অংশ এতই কম, যে তাহা বিরোধী স্বার্থাংশ দমন করিয়া রাখিতে পারে না। নাস্তিকতা হইতে যে রক্তপাত হয় না, তাহার কারণ নাস্তিকদিগের শান্তি-প্রিয়তা নহে; যাহা মঙ্গলকর, তাহার প্রতি ঔদাসীন্যই এই কারণ। অধ্যয়নকক্ষে নিজে নিরাপদে থাকিতে পারিলে, অন্যের কি হইল না হইল, তাহা গ্রাহ্য করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই। তাহাদের মতদ্বারা নরহত্যা হয় না সত্য, কিন্তু জন্ম প্রতিরুদ্ধ হয়, কেন না, যে নীতিদ্বারা মানুষের বংশবৃদ্ধি হয়, তাহার ধ্বংস হয়। মানুষ হইতে মানুষকে তাহারা পৃথক করে, তাহাদের সমস্ত ভালবাসা গূঢ় স্বার্থপরতায় পরিণত হয়।

দার্শনিকদিগের ঔদাসীন্য যথেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের শান্তির সমতুল্য। এই শান্তি মৃত্যুর শান্তি। যুদ্ধ ইহা অপেক্ষা অধিক ধ্বংসকারী নহে।

যদিও ধর্ম্মান্ধতার অব্যবহিত ফল তথাকথিত "দার্শনিকতার" ফল অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর, ইহার পরবর্ত্তী ফলের অনিষ্টকারিতা তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

Profession de foi গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রুসো ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের[1] যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মানুষের বুদ্ধি প্রত্যাদেশের সত্যতা সম্বন্ধে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে অক্ষম। বাইবেলের সরলতা ও মহত্ত্বই প্রত্যাদেশের প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। খৃষ্ট যে কেবল মানুষমাত্র ছিলেন না, তাঁহার বিনয়নম্র আচরণ ও চরিত্রের বিশুদ্ধি, তাঁহার জ্ঞান-গম্ভীর বচনের মাধুর্য্য, তাঁহার ব্যক্তিত্বের মহিমা এবং তাঁহার উপদেশের মহত্ত্ব-দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হয়। সক্রেটিশ দার্শনিকের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, দার্শনিকের মতই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। যিশুর জীবন ও মৃত্যু উভয়ই ঐশ্বরিক-ভাবাপন্ন। যিশুর চরিত্রের মত মহৎ চরিত্র বাইবেল-লেখকগণ কোথায় পাইয়াছিলেন? এমন মহৎ চরিত্র-নীতির উৎস কোথায় বর্ত্তমান ছিল? এতাদৃশ চরিত্রের সৃষ্টি ও এতাদৃশ সত্যের আবিষ্কার যিশুর বাস্তব জীবন অপেক্ষাও অলৌকিক ব্যাপার। তাঁহার সম্বন্ধে যুক্তিতে যে সন্দেহের উদয় হয়, হৃদয়ের নিশ্চিতি দ্বারা তাহা বিদূরিত হয়।

Romanticism

রুসোর মত দুর্ব্বল-চরিত্র ও যৌন বিষয়ে শিথিল-নীতি ব্যক্তির মুখে এই সকল উক্তি বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রুসোর সমগ্র চরিত্রই তাঁহার ভাব-প্রবণতা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত এবং তাঁহার বুদ্ধি ও ইচ্ছা তাঁহার অনুভূতির[2] বশীভূত। এই অনুভূতি কত প্রবল ছিল, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত হিউমের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ, বন্ধুপ্রীতি, দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে আত্মবিস্মৃত নিমজ্জন প্রভৃতি যেমন তাঁহার ভাবালুতার ফল, আসঙ্গলিপ্সা প্রভৃতিও সেই উৎস হইতেই উদ্ভূত। তিনি

[1] Divine Revelation [2] Feelings

অনুভূতির উপাসক ছিলেন, এবং ভাবাবেগের আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। অনুভূতিদ্বারা উত্তেজিত কল্পনা তাঁহার যৌন লিপ্সার উদ্বোধন করিলেও হৃদয়ের মহত্তম প্রবৃত্তি-সমূহও তাহা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইত। তাঁহার ধর্ম্মমত ও রাজনৈতিক মতও এই অনুভূতি-প্রভাবিত এবং তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যও অনুভূতির রাগে রঞ্জিত। ইয়োরোপের Romantic movementএর তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রজ্ঞাবাদিগণ[1] সর্ব্ববিষয়ে যুক্তিকেই বিচারের মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু রুসো যুক্তি অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তিকে[2] প্রাধান্য দিতেন। পাস্কালের মতো তিনিও বলিতেন, "হৃদয়েরও যুক্তি আছে, যাহা মস্তকে বুঝিতে পারে না[3]।" ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ যে সমস্ত যুক্তির প্রয়োগ করিতেন, সে সকলই বুদ্ধির যুক্তি[4]। কিন্তু রুসো বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিদর্শন অন্বেষণ করিয়াছিলেন, এবং তথায় ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা-মিশ্র ভয়, উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ও সামাজিক ব্যাপারে অনুভূতিদ্বারা প্রভাবিত হওয়াই Romanticism। ভাবে বিগলিত হওয়া, দরিদ্রের দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন, বিলাস-বহুল কোলাহলপূর্ণ নাগরিক জীবনে বিতৃষ্ণা, পল্লীর শান্ত, সন্তুষ্ট, সরল জীবনে প্রীতি, সম্পদে বিরাগ, দারিদ্র্যের স্তুতি প্রভৃতি Romauticismএর বিশেষত্ব। রুসোর পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও রচনায় এই সকল লক্ষণ অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষিত হইলেও, তাঁহার হস্তে এই ভাব পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

তিরোধান

১৭৭৮ সালের ২০মে তারিখে Girardin নামে একজন ধনী ভদ্রলোক রুসোকে তাঁহার দরিদ্র আবাস হইতে লইয়া গিয়া প্যারিস হইতে নয় মাইল দূরে Ermenville নামক গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্বর্গতুল্য উদ্যান-গৃহে রুসো পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার স্বাস্থ্যেরও কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ২রা জুন তারিখে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্ব্বে রুসো যখন তাঁহার কেহই নাই বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন, তখন তিনি জানিতেন না, যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনি জয় করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার গ্রন্থাবলীর ছয় সংস্করণ এবং La Nouvelle Heloiseএর দশ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার বাণী বহুলপ্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৮২ সালে তাঁহার Confessionsএর প্রথম ভাগ এবং Reveries প্রকাশিত হয়, এবং তাহাদ্বারা পাঠকের মন বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়। ১৭৮০ সালে ফ্রান্সের রাণী ও রাজপুত্রগণ

---

[1] Rotionalist
[2] Feeling
[3] The heart has reasons, which the head cannot understand
[4] Intellectual arguments

সহ অর্দ্ধ ফ্রান্স Peupliers দ্বীপে যেখানে তাঁহার দেহ সমাহিত হইয়াছিল, তথায় গিয়া আপনাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করিয়াছিল এবং তদবধি এই উন্মাদ পণ্ডিতের সমাধিক্ষেত্র ফ্রান্সের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। "দার্শনিক"গণের বিষদিগ্ধ সমালোচনায় তাঁহারা যশঃ বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ফ্রান্সের যুবকগণ দেখিয়াছিল ভার্ণির অধিস্বামী ভলটেয়ার রুসোর মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু দুঃখকষ্টের মধ্যেও স্বীয় মত হইতে বিচ্যুত না হইয়া রুসো মৃত্যু পর্য্যন্ত সাধারণের একজন থাকিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। ভাবী ফরাসী বিপ্লবের নায়কগণ—যাঁহারা পরে পরস্পরের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন—বার্ণেস্, ডান্টন, কার্ণো, বিলড, ভ্যারেন্, ম্যানন রোলাণ্ড —সকলেই মিলিত হইয়া রুসোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রুসোর Discourse on Inequalityর ব্যাখ্যা করিয়া ব্রিসো কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। রোব্স্পিয়ার রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে রুসোর মত অনুসরণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং ১৭৯৪ সালে যখন তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতালাভ করিয়াছিলেন, তখন ৭ই মে তারিখের প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় তিনি রুসোর প্রতি Encyclopedistগণের শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিপ্লবের পক্ষ হইতে তিনি রুসোর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তাঁহাকে বিপ্লবের অগ্রদূত এবং মানব-জাতির শিক্ষাগুরু বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ বৈপ্লবিকগণ বিপুল সম্মানের সহিত তাঁহার দেহ নির্জন Peupliers দ্বীপ হইতে আনিয়া প্যারিসের Pantheonএ সমাহিত করিয়াছিল। Constituent Assembly গৃহে তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তি ফ্রাঙ্কলিন ও ওয়াসিংটনের মূর্ত্তির সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।*

রোমাঁরোলাঁর মত

রুসোর প্রভাব রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জার্ম্মাণ দর্শন ইহার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। Romain Roland লিখিয়াছেন Emile পাঠ করিয়া ক্যাণ্ট্ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এক সময় ছিল, যখন মনে করিতাম জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বস্তু। এইজন্য গর্ব্বভরে অজ্ঞ লোকদিগকে অবজ্ঞা করিতাম। রুসো আমার চক্ষু খুলিয়া দিয়া মিথ্যা শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটই মানুষকে সম্মান করিতে শিখিয়াছিলাম।" Social Contractএর প্রভাবও Kantএর উপর কম ছিল না। "যে স্বাধীনতা মানুষের বিশেষত্ব" তাহার ধারণা তিনি এই গ্রন্থ হইতেই পাইয়াছিলেন। * * * জার্ম্মাণির Sturm and Drang আন্দোলনের নায়কগণ - লেসিং ও হার্ডার হইতে আরম্ভ করিয়া গেটে ও সিলার পর্য্যন্ত সকলেই—রুসোর মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিলার রুসোর বন্দনাসূচক একটি গীতি কবিতাও লিখিয়াছিলেন।

রুসোর মধ্যে বিভিন্নমুখী প্রতিভার একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহার চিন্তাই যে কেবল বিপ্লবমুখী ছিল, তাহা নহে। তাঁহার রচনার রীতিধারা বেদনার প্রকৃতি ও

* Vide Romain Rolland's Rousseau (Living Thoughts Library) P. 24

বেদনা-প্রকাশের ভঙ্গীতেও বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভবিষ্যতের কলারীতি[1] তিনি রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্‌পটুতা অসাধারণ ছিল। এক বসুএ ব্যতীত ফ্রান্সে এ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান বাগ্মিতা তিনি পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কতিপয় রচনার বাক্যপটুতায় একান্তই অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। ডেমস্থিনিসের রচনার সুষমা, উচ্ছ্রিতি এবং আলাময় প্রবাহে তাঁহার রচনা সমৃদ্ধ। মনের নিভৃত চিন্তার রূপায়নেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার রচনা-কৌশলে তাঁহার চিন্তা বাঙ্ময় হইয়া পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত হয়। তাঁহার Confessions পাঠকের মর্ম্ম স্পর্শ করে। তাঁহার সমস্ত দোষ-গুণের মূল, তাঁহার মানসিক ও দেহাভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য, তাঁহার আত্মমগ্নতার[2] অবশ্যম্ভাবী ফল। সামাজিক প্রথা ও সাহিত্যিক রীতি অগ্রাহ্য করিয়া, তিনি কেবল নিজের কথাই কহিয়াছেন। তিনি সত্য "আমির" সন্ধান পাইয়াছিলেন। মনের অন্ধকার কক্ষে তিনি যে যে রেখা অঙ্কিত দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন।......"সহস্র সহস্র লোক যাহা দমন করিয়া রাখে, তিনি নির্লজ্জ ভাবে আপনাকে নগ্ন করিয়া তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। আধুনিক মানুষের মনকে তিনি মুক্তি দিয়াছেন, এবং শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া আপনাকে জানিতে ও প্রকাশ করিতে শিখাইয়াছেন।

"এই নূতন জগৎকে প্রকাশিত করিবার জন্য তাঁহাকে নূতন বন্ধনমুক্ত ও অধিকতর নমনীয় ভাষার সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন "আমার শৈলী আমি বাছিয়া লইয়াছিলাম। তাহার একরূপতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করি নাই। যাহা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা যেমন দেখিয়াছি, বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করিয়াছি, ফলের কথা ভাবি নাই। বিগত ঘটনার এবং তজ্জাত বেদনার স্মৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া আমি আমার মনের অবস্থার দ্বিবিধ চিত্র অঙ্কিত করিব, একটি ঘটনার সমকালীন অবস্থা, দ্বিতীয়টি বর্ণনকালের অবস্থা।***"

ছন্দ ও ভাবাবেগের এই প্রাচুর্য্য বিশৃঙ্খলায় পর্য্যবসিত হইতে পারিত। কিন্তু রুসোর সহজাত সুষমাবোধ তাহা হইতে দেয় নাই। ১৭৬০ সালে তাহার মুদ্রাকরকে তিনি লিখিয়াছেন "আমি প্রধানতঃ গায়ক, রচনাশৈলীতে সুষমার মূল্য আমার নিকট এত অধিক, যে সুগমতার অব্যবহিত পরেই, এমন কি সত্যানুগতির পূর্ব্বেও তাহার স্থান।" প্রয়োজন হইলে এই সুষমার জন্য আখ্যানের সত্যানুগতি বিসর্জ্জন দিতেও তাহার কুণ্ঠা ছিল না। সুষমারক্ষার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন। তাঁহার কাছে ছন্দের স্থান ভাবের পূর্ব্বে। তিনি বাক্য ও বাক্যাংশগুলি প্রথমে মনের মধ্যে গাহিয়া লইতেন, তাহার পরে তাহাদিগকে শব্দে গ্রথিত করিতেন। তিনি যে একজন বড় গদ্য কবি ও ফরাসী Romanticismএর অগ্রদূত ছিলেন, তাঁহার ছন্দ ও ছন্দরীতি, তাঁহার ভাবালুতা এবং তাঁহার প্রত্যয় সকলের[3] বিষয় বিবেচনা করিলে তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

---

[1] Art [2] Egotism [3] Ideas

Chateaubriand এবং La-Maitine রুসো হইতেই উদ্‌ভূত হইয়াছিলেন। Michelet ও George Sandএর মধ্যে তিনি অনুপ্রবিষ্ট।

"শিক্ষাসম্বন্ধীয় আধুনিক সকল মতই রুসোর Emile দ্বারা প্রভাবিত। জেনিভার প্রসিদ্ধতম নব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রুসোর নামে প্রতিষ্ঠিত। নিজের সম্বন্ধে দুর্ব্বল হইয়াও তিনি ধর্ম্মবিবেক-সম্বন্ধে দৃঢ় অথচ কঠোরতাবর্জিত, সুস্পষ্ট, শ্লাঘ্য চালক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। সত্য চরিত্রোৎকর্ষ-আবিষ্কারে তাঁহার একটি উদার সহজাত পটুতা ছিল। তাঁহার অনুমত চরিত্র-নীতিতে উগ্রতা অথবা অসহিষ্ণু দার্ঢ্য ছিল না। তাহা পরিবেশ-নিরপেক্ষ ছিল না, এবং কোনও বিশেষ তত্ত্ব অথবা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিতও ছিল না। তাহার মূলে ছিল গভীর সহানুভূতি এবং মানুষের দুর্বলতার প্রতি অনুকম্পা। তাহা মানুষের ন্যায়ানুগত প্রয়োজনের উপযোগী ও জীবন্ত ছিল।

"অবচেতন মনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া তিনি তাহার অবজ্ঞাত ও দমিত সম্পদ এবং Libidoর রহস্য সাহিত্যে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ফ্রয়েড তাঁহার নিকট অংশতঃ ঋণী।

"টলষ্টয় তাঁহার নিকট হইতেই যৌবনে "বজ্রাঘাত" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুবক টলষ্টয় রুসোর চিত্র-সমন্বিত একটি পদক পবিত্র মূর্ত্তির মত শ্রদ্ধাভরে গলদেশে ধারণ করিতেন। তাঁহার নৈতিক পুন-র্জন্ম এবং তাঁহার Isanaia Poliana বিদ্যালয় রুসোর উপদেশ ও দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিতেন। ধর্ম্ম ও কলা, উভয়ত্রই তুল্যরূপে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। টলষ্টয় লিখিয়াছেন "রুসোর রচনা আমার হৃদয় এতই স্পর্শ করে, যে আমার বিশ্বাস আমিও ঐরূপ লিখিতে পারিতাম।" সত্যই তিনি রুসোর লেখাই পুনরায় লিখিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান যুগের Jean Jacques। বর্ত্তমান যুগের চিন্তার উপর রুসোর প্রভাবের এখনও শেষ হয় নাই। যুবক জাপান এবং নব চীন তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে।"

ইহার পরে রোমাঁ রোলাঁ তাঁহার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন, "যে লেমান্ হ্রদের চতুর্দিকে তাঁহার অন্তর অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইত বলিয়া রুসো লিখিয়াছেন, তাহার তীরে ভ্রমণকালে আমি অনেকবার তাঁহার ছায়ার[১] সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ভিলনিউভের গৃহে বসিয়া যখন আমি এই পংক্তিগুলি লিখিতেছি, তখন বাতায়নের ভিতর দিয়া Clarens এর উপসাগর ও সানুদেশ আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাহার শীর্ষদেশে বৃক্ষরাজির মধ্যে জুলির গোলাপরাগরঞ্জিত স্বপ্নাতুর গৃহ দাঁড়াইয়া আছে।"

সপ্তম অধ্যায়

জার্মানিতে আলোক বিস্তার

(১)

লাইবনিট্জ্

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হইতে জ্ঞানালোক জার্মানিতে বিস্তৃত হয়। এই আন্দোলনের ফলে জার্মানিতেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বহুল প্রসার হয়। কিন্তু জার্মানিতে এই আন্দোলন প্রথমে দার্শনিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ হয় নাই। লেসিং ও হার্ডারের সাহিত্যিক প্রতিভার ফলে ইহা "লোকায়ত দর্শনের"[১] রূপ প্রাপ্ত হয়। জার্মানিতে এই সময়ে যে জাতীয় সাহিত্যের উদ্ভব হয়, তাহার সহিত সংযোগের ফলে এই আন্দোলন ইংলণ্ডের আন্দোলনের ন্যায় সন্দেহবাদে পরিণত হয় নাই, ফ্রান্সের আন্দোলনের ন্যায় রাজনৈতিক কোলাহলেও পর্য্যবসিত হয় নাই। ইংলণ্ডে বস্তুবাদের এবং জার্মানিতে অধ্যাত্মবাদের প্রসার হইতে ইংরেজ ও জার্মান জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ফরাসী মনের ঝোঁক সূক্ষ্ম চিন্তার দিকে, ইংরেজ মনের ঝোঁক চিন্তার স্পষ্টতার দিকে, জার্মান মনের ঝোঁক চিন্তার গভীরতার দিকে। সেইজন্য ফ্রান্স হইয়াছে গণিতের দেশ, ইংলণ্ড হইয়াছে প্রয়োগ কৌশলের দেশ, এবং জার্মানি হইয়াছে ঔপপত্তিক[২] চিন্তার দেশ। ফলে ফ্রান্সে সন্দেহবাদ, ইংলণ্ডে বস্তুবাদ, জার্মানিতে অধ্যাত্মবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

লাইবনিট্জ্ ও উল্ফ্ জার্মানিতে এই নবযুগের প্রবর্ত্তক। জার্মানিতে নব্যদর্শনের জনক বলিয়া লাইবনিট্জের নাম উল্লিখিত হয়। লাইবনিট্জের দর্শনে দ্বিবিধ দার্শনিক চিন্তার সমন্বয়ের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। দে-কার্ত্ত হইতে উদ্ভূত যে চিন্তা স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাহার সহিত বেকন এবং লকের প্রত্যক্ষবাদের সমন্বয়ের জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। উভয়বিধ মতের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস করিয়াছিলেন। তিনি অধ্যাত্মবাদী ও দেকার্ত্তের সহজাত প্রত্যয়ের সমর্থক, এবং লকের প্রত্যক্ষবাদের বিরোধী ছিলেন। আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাদী রূপে তিনি স্পিনোজার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। প্রথমে তিনি উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন। স্পিনোজার দর্শনের অনুশীলনের ফলে এই উগ্রতা বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার পরিবর্ত্তিত মত লকের দর্শনের অনুশীলনদ্বারা আবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

১৬৪৬ সালে লাইপজিগ নগরে লাইব্নিট্জের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা লাইপজিগ

---

[১] Popular Philosophy [২] Speculative

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মনীতির অধ্যাপক ছিলেন। লাইপজিক এবং জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইবনিট্‌জ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কুড়ি বৎসর বয়সে "ডাক্তার" উপাধি লাভ করিয়া কিছুদিন তিনি মেয়েন্স্‌এর ইলেক্‌টরের[1] কুট্‌ নৈতিক বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি প্যারিস ও লণ্ডনে গমন করিয়াছিলেন। হেগ নগরে তিনি স্পিনোজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি হ্যানোবারের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কালের অধিকাংশ হ্যানোবার নগরেই অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রাসিয়ার বিদুষী রাণী সোফিয়া সারলোট্‌এর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য হইয়াছিল; এবং তাঁহার প্ররোচনায় তিনি তাঁহার Theodicee নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭০০ সালে তাঁহারই চেষ্টায় বার্লিনের বৈজ্ঞানিক পরিষৎ[2] প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তিনি পরিষদের প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন। সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস ১৭১২ সালে তাঁহাকে তাঁহার কাউনসিলের সভ্য নিযুক্ত করেন, এবং ব্যারণ উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পরে অনেক দিন তিনি ভিয়েনাতে অবস্থান করেন। ভিয়েনাতেই তাঁহার Monadology রচিত হয়। পোপ তাঁহাকে তাঁহার গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ পদ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শোয়েগলার লিখিয়াছেন, আরিস্টটলের পরে যে সকল প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে, লাইবনিট্‌জ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার সর্ব্ব বিষয়ে প্রবেশক্ষম তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত অসাধারণ পাণ্ডিত্যের মিলনের ফলে যে প্রতিভার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা অতুলনীয়। জেকব বোহমের পরে লাইবনিট্‌জই প্রথম উল্লেখযোগ্য জার্মান দার্শনিক। তাঁহার আবির্ভাবের জন্য জার্মানি গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে। তিনিই জার্মানিতে দর্শনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বহু কার্য্যে লিপ্ত থাকার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত দর্শনের সু-সম্বদ্ধ বিবরণ দিয়া যাইতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার লিখিত পত্রাবলী এবং প্রবন্ধ সকলেই তাঁহার দার্শনিক মত বিবৃত হইয়াছিল।

লাইবনিট্‌জের দর্শনের মূল কথা দুইটি—তাঁহার মনাদবাদ এবং তাঁহার প্রাক্‌ প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবাদ[3]। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি-সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার এক বিশিষ্ট মতবাদও আছে। তাঁহার প্রাক প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবাদ প্রকৃত সমস্যা এড়াইয়া যাইবার প্রচেষ্টামাত্র; ইহাদ্বারা কোনও সমস্যার সমাধান হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মনাদ-বাদ স্থানে স্থানে স্ব-বিরোধদুষ্ট হইলেও, ইহাদ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রগতির প্রচুর সাহায্য হইয়াছে। জ্ঞান সম্বন্ধীয় তাঁহার মতে দে-কার্ত্তের সহজাত প্রত্যয়বাদ এবং লকের মতের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা আছে। তাঁহার মতে ক্যাণ্টের দর্শনের পূর্ব্বাভাসও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

[1] Elector of Mayence
[2] Academy of Science
[3] Theory of Pre-established harmony

মনাদ বিজ্ঞান

বিশ্বের মূলতত্ত্বকে লাইবনিট্জ মনাদ নাম দিয়াছেন। বিশ্বের মূল তত্ত্বকে স্পিনোজা বলিয়াছিলেন "দ্রব্য"[১] বা সৎ পদার্থ। লাইবনিট্জের মনাদও দ্রব্য। কিন্তু স্পিনোজার দ্রব্য এক ও অদ্বিতীয়; লাইবনিট্জের মনাদ অসংখ্য। ডিমোক্রিটাস হইতে আরম্ভ করিয়া হব্‌স্ পর্য্যন্ত সকল পরমাণুবাদিগণ পরমাণুদিগকে জগতের মূলতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। দে-কার্ত্ত দুইটি মূলতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং দুইটিকেই দ্রব্য বলিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে চৈতন্ত-রূপ দ্রব্য বহুসংখ্যক। স্পিনোজা জড় ও চৈতন্তকে একই দ্রব্যের বিভিন্ন গুণ বলিয়াছিলেন। লাইবনিট্জের মতে এক প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলেও দ্রব্যের সংখ্যা অনন্ত। স্পিনোজার দ্রব্য অসীম, তাহার ব্যক্তিত্ব নাই। তাহার বিকারসকল[২] সেই অসীম সমুদ্রে ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদ মাত্র। পরমাণুবাদিগণের পরমাণু জড় বস্তু, তাহারা অতি সূক্ষ্ম হইলেও স্থানব্যাপী এবং অন্ততঃ কল্পনাতে বিভাজ্য। বিভাজ্য পদার্থ কখনও মূলতত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। লাইবনিট্জের মতে জগতের মূলতত্ত্বের দুইটি ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক—অবিভাজ্যতা এবং বাস্তবতা। কোনও পদার্থ বস্তুত্বহীন হইলে, নিরাধার গুণমাত্র হইলে, তাহাকে বাস্তব পদার্থ বলা যায় না। অবিভাজ্যতা এবং বাস্তবতা যাহার নাই, তাহা মূলতত্ত্ব হইতে পারে না। গণিতের বিন্দু অবিভাজ্য বটে, কিন্তু তাহার বাস্তবতা নাই। তাহা কল্পনামাত্র। ব্যাপ্তিকেও মূলতত্ত্ব বলা যায় না, কেননা ইহার বাস্তবতা থাকিলেও, ইহা অসংখ্য অংশ বিভাজ্য। লাইবনিটজের মতে উপরোক্ত দুই গুণ কেবল শক্তিরই আছে। শক্তি জড়পদার্থ নহে, কিন্তু বাস্তব; অবিভাজ্য, কিন্তু সক্রিয়; অংশহীন, কিন্তু সর্ব্বগ্রাহী; অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য, কিন্তু যাবতীয় বস্তুর ভিত্তিভূমি ও সার। লাইবনিটজের মনাদ শক্তিস্বরূপ, বিশ্বের সারভূত আদি বস্তু। মনাদগণই বাস্তব জগৎ, সমগ্র জড় ও আত্মিক জগতের ভিত্তিমূলক উপাদান। ইহারা "বিশেষ", এবং সংখ্যায় অনন্ত। পরমাণুদিগের মতো তাহারা নির্জীব ও নিশ্চেষ্ট নহে। প্রাণ ও গতিদ্বারা তাহারা সঞ্জীবিত। পরমাণুদিগের গুণের ভেদ নাই, একটি হইতে অন্যটিকে চিনিবার উপায় নাই। কিন্তু মনাদগণ বিভিন্ন গুণান্বিত, কোনও দুইটি মনাদই একরূপ নহে। মনাদের প্রকৃতির ব্যাখ্যার জন্য লাইবনিটজ, গুণ-সংযোজিত ধনুর সহিত তাহার উপমা দিয়াছেন! ধনুর মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে, বাধা অপসারিত হইবামাত্র (গুণ কাটিয়া দিবামাত্র) সেই শক্তি সক্রিয় হইয়া পড়ে। ক্রিয়াবতী শক্তিই যে মনাদের স্বরূপ, বারংবার লাইবনিট্জ তাহা বলিয়াছেন। এই শক্তিবশতঃ, স্থিতি-স্থাপক দ্রব্যের মতো সক্রিয় বলিয়া মনাদ স্বরূপে বর্জনশীল। ইহারা পরস্পর বিপ্রকর্ষণ-ধর্ম্ম-যুক্ত। যাহা অন্যকে দূরে রাখে, আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না, তাহাই মনাদের ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ববশতঃই মনাদের বহুত্ব। অন্য মনাদের অস্তিত্ব না থাকিলে, কেবল একটিমাত্র মনাদের অস্তিত্ব সম্ভবপর হইত না। ব্যক্তিত্বের প্রত্যয় বহুত্বের প্রত্যয়ের সহিত সম্বদ্ধ। কিন্তু অসংখ্য মনাদের অস্তিত্ব থাকিলেও, কোনও মনাদেরই অন্য কোনও মনাদের উপরে কোনও প্রভাব

---

[১] Sub-stauce [২] Modes

নাই। তাহাদের এমন কোনও বাতায়ন নাই, যাহা দিয়া বাহির হইতে কিছু তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে; অথবা তাহাদের মধ্য হইতে কিছু বাহিরে যাইতে পারে। একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত কেহই মনাদের সৃষ্টি অথবা ধ্বংস করিতে পারে না। তাহারা স্বয়ং প্রতিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণভাবে স্ব-নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক মনাদ এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ, স্বীয় নিয়মানুসারে বিকাশশীল। অন্যান্য মনাদ তাহার পক্ষে যেন অস্তিত্বহীন। এই ভাবে পরস্পর সম্বন্ধহীন হইলেও, অন্যদিক হইতে দেখিলে মনাদগণ সর্ব্বগ্রাহী। প্রত্যেক মনাদে অন্যান্য মনাদ প্রতিবিম্বিত; প্রত্যেক মনাদের মধ্যে সমগ্র বিশ্বই প্রতিবিম্বিত। প্রত্যেক মনাদ এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ—সমগ্র জগতের ক্ষুদ্র রূপ। একটি মনাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান হয়। সুতরাং একটি মনাদের মধ্যে যাবতীয় মনাদ অবস্থিত এবং প্রত্যেক মনাদ জগতের ভূতভবিষ্যৎ ধারণ করিয়া আছে, বলা যায়

প্রত্যেক মনাদ এক একটি দর্পণ, যাহাতে সমগ্র বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হইতেছে। জগতের যেখানে যখন কিছু সংঘটিত হইতেছে, প্রত্যেক মনাদ-দর্পণে তখনই তাহা প্রতিফলিত হইতেছে। এই প্রতিফলনে বাহির হইতে মনাদের ভিতরে কিছুই প্রবেশ করে না। এই প্রতিফলন হয় মনাদের স্বকীয় স্বাভাবিক শক্তির বলে। এই শক্তি সমগ্র জগতের যাবতীয় পদার্থের বীজ ধারণ করিয়া আছে। প্রত্যেক মনাদ এক এক খানি জীবন্ত দর্পণ। তাহারই অভ্যন্তরীণ জীবন্ত ক্রিয়াদ্বারা এই বীজ হইতে জাগতিক সমস্ত ব্যাপারের উদ্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে লাইবনিট্‌জ্‌ মনাদের perception (প্রতীতি) অর্থাৎ প্রত্যেক মনাদের নিজ নিজ জগতের জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই জ্ঞান আত্মার কোনও সচেতন ক্রিয়া নহে। আত্মার সচেতন ক্রিয়া অর্থে লাইবনিটজ্‌ apperception (সুস্পষ্ট প্রতীতি) শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। উচ্চ শ্রেণীর জীবের সচেতন জ্ঞানই apperception। যে সমস্ত মনাদ সংবিদ পর্য্যন্ত পৌছায় নাই, তাহাদের নিম্নশ্রেণীর অচেতন অনুভূতিকে লাইবনিটজ্‌ pereeption নাম দিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানের অসংখ্য ক্রমভেদ আছে। জড়পদার্থকে তিনি যেমন প্রাণহীন বলিয়াছেন, তেমনি যাহাকে মনঃ বলে, তাহারও পরিধি প্রসারিত করিয়াছেন। প্রাণহীন জড়পদার্থের অস্তিত্ব নাই। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর বস্তু পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কেবল যে ক্রিয়াপরতা বর্ত্তমান, তাহা নহে, তাহাতে প্রাণ এবং তাহার সহিত চিন্তাও আছে। এই চিন্তা সর্ব্বত্রই সম্পূর্ণ পরিস্ফুট অবস্থায় নাই। সুস্পষ্ট সংবিদের তলদেশে এবং অন্যত্র জগতের সর্ব্বত্রই অস্পষ্ট ক্ষীণ জ্ঞানের অবস্থা আছে। লাইবনিট্‌জ্‌ এই অবস্থাকে petty perception (স্বল্প প্রতীতি), নামে অভিহিত করিয়াছেন। ক্ষুদ্র স্বল্প প্রতীতির অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সমুদ্রগর্জ্জনের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সমবায়ে উৎপন্ন হয়। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এত ক্ষীণ, যে তাহারা আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না। কিন্তু তাহারা প্রত্যেকেই যদি আমাদের মনে কিছু শব্দজ্ঞান উৎপাদন না করিত, তাহা হইলে তাহাদের সমবায়ে সমুদ্রগর্জ্জনের সৃষ্টি হইতে পারিত না। এই ক্ষীণ শব্দের প্রত্যেকটির apperception (সুস্পষ্ট প্রতীতি) হয় না, কিন্তু perception হয়। উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে মনাদদিগের প্রকৃতি-সম্বন্ধে বোঝা যায়,

যে প্রথমতঃ পরমাণুগণ যেমন সকলেই একইগুণবিশিষ্ট, তাহাদের গুণের বিভিন্নতা নাই, মনাদগণ সেরূপ নহে। তাহাদের গুণ-ভেদ আছে, কোন মনাদই অন্য কোনও মনাদের সদৃশ নহে। জগতে সম্পূর্ণ একরূপ দুইটি পদার্থের অস্তিত্ব নাই। দ্বিতীয়তঃ পরমাণুসকল স্থানব্যাপী বলিয়া অন্ততঃ কল্পনাতে বিভাজ্য, কিন্তু মনাদ অবিভাজ্য অতিপ্রাকৃতিক বিন্দু। কিন্তু মনাদ যদি অবিভাজ্য হয়, যদি কোনও স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান না করে, তাহা হইলে তাহাদের সমবায়ে স্থানব্যাপী দ্রব্যের উৎপত্তি হয় কিরূপে, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার উত্তর এই, যে লাইবনিট্‌জ দেশকে বাস্তব পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে দেশ মনের অস্পষ্ট সম্প্রত্যয় মাত্র। তৃতীয়তঃ প্রত্যেক মনাদ এক একটি জীবন্ত আত্মিক পদার্থ, এক একটি আত্মা। পরমাণুদিগের আত্মিক কোনও গুণ নাই। কিন্তু প্রাণবত্তা এবং আত্মত্বই মনাদদিগের ধর্ম্ম। জগতে সর্ব্বত্রই প্রাণ বর্ত্তমান। এই প্রাণ সার্ব্বিক প্রাণ নহে, ব্যক্তিগত বিশেষভাব-প্রাপ্ত প্রাণ। এই সকল ব্যক্তিত্বাপন্ন প্রাণ যদিও রুদ্ধবাতায়ন গৃহ সদৃশ, তথাপি তাহাদের মধ্যে জীবন্ত সম্বন্ধ বর্ত্তমান। মনাদগণ দেশে ব্যাপ্ত জড়পদার্থের মতো মৃত বস্তু নহে। তাহারা স্বয়ং পর্য্যাপ্ত। অন্য কিছুর প্রয়োজন তাহাদের নাই। তাহারা আপনার সহিত অভিন্ন, অনন্ত-নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ বাহ্য প্রভাবের অতীত।

প্রত্যেক মনাদের মধ্যে সর্ব্বদাই ক্রিয়া চলিতেছে। মনাদগণ প্রাণবান এবং প্রাণের ক্রিয়ার কেন্দ্র। মানবাত্মা উন্নত শ্রেণীর মনাদ। অচেতন অবস্থাতেও তাহার মধ্যে চিন্তার বিরাম নাই। যখন চৈতন্য না থাকে, তখনও অন্ততঃ অস্পষ্ট চিন্তা ও ইচ্ছার কার্য্য তাহার মধ্যে চলিতে থাকে। আবার যে সমবেদনা মানবাত্মা এবং প্রকৃতির মধ্যে বর্ত্তমান, তাহা অন্যান্য মনাদ ও প্রকৃতির মধ্যেও আছে। মানবাত্মার মধ্যে যেমন প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হয়, জাগতিক যাবতীয় ব্যাপার তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, যাবতীয় মনাদের মধ্যেই তেমনি তাহাদের প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হয়, তেমনি জগতের প্রতিফলন সংঘটিত হয়। প্রত্যেক মনাদই দর্পণস্বরূপ, প্রত্যেক মনাদই বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ, প্রত্যেকেই একটি ক্ষুদ্র জগৎ। প্রত্যেক ঘটনা যে মনাদের মধ্যেই ঘটুক না কেন, তাহা অন্যান্য মনাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বিশাল বিশ্বে অতীতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, যাহা কিছু বর্ত্তমানে ঘটিতেছে, অথবা ভবিষ্যতে ঘটিবে, যাহার দৃষ্টিশক্তি আছে, তিনি প্রত্যেক মনাদের মধ্যে তাহা দেখিতে পাইবেন। মনাদদিগের জীবনে অস্পষ্ট প্রতীতির প্রবাহ অনবরত চলিতেছে। এই জ্ঞান তাহাদের স্বকীয় অবস্থারও যেমন, তেমনি অন্যান্য মনাদের অবস্থারও বটে, কখনও অস্পষ্ট কখনও স্পষ্টতর। এক প্রতীতির পরেই অন্য প্রতীতির আবির্ভাব। এই ভাবেই মনাদের জীবন চলে। প্রত্যেক মনাদ এক একটি আত্মা।

প্রত্যেক মনাদের মধ্যে যদিও সমগ্র জগৎ প্রতিফলিত হয়, তথাপি এই প্রতিফলন সর্ব্বত্র একরূপ নহে, কাহারও মধ্যে সুস্পষ্ট, কাহারও মধ্যে অস্পষ্ট। সক্রিয়তা যাহার মধ্যে অধিকতর, প্রতিফলন তাহার মধ্যে স্পষ্টতর। একমাত্র ঈশ্বরের জ্ঞানই সম্পূর্ণ স্পষ্ট। তিনিই একমাত্র অবিমিশ্র ক্রিয়াপরতা। অন্যান্য মনাদ অংশতঃ সক্রিয়, অংশতঃ নিষ্ক্রিয়।

মনাদের নিষ্ক্রিয়তাই[1] তাহার জড়ীয় অংশ[2]। লাইবনিট্‌জ দ্বিবিধ জড়ের কথা বলিয়াছেন—প্রাথমিক[3] এবং মাধ্যমিক[4]। প্রাথমিক জড় একপ্রকার বস্তুবিচ্ছিন্ন গুণ[5], সর্ব্বত্র বিস্তৃত, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। মাধ্যমিক জড় বস্তুত্বসম্পন্ন[6] এবং সক্রিয়[7]। মনাদের মধ্যে নিষ্ক্রিয় জড়ের অস্তিত্বদ্বারা তাহার জ্ঞান বাধিত হয়। এই বাধার পরিমাণের উপর জ্ঞানের স্পষ্টতা নির্ভর করে। যে মনাদের মধ্যে জীবন্ত আত্মিক অংশ (সত্ত্বগুণ) নিশ্চেষ্ট জড়ীয় অংশ (তমোগুণ) অপেক্ষা যত অধিক, তাহার জ্ঞান তত স্পষ্ট।

সমগ্র জগৎ মনাদদিগের দ্বারা পূর্ণ। প্রত্যেক মনাদ স্বাধীন এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ হইলেও বিশ্বে কোথাও কোনও বিচ্ছেদ নাই। লাইবনিট্‌জ্‌ এক "অনবচ্ছেদ অথবা সাতত্যের নিয়মের"[8] উল্লেখ করিয়াছেন। কোনও মনাদ এবং তাহার পার্শ্বস্থ মনাদের মধ্যে কোনও ব্যবধান নাই। একটির যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানেই অন্যটির আরম্ভ। নিম্নতম মনাদ হইতে উচ্চতম মনাদ পর্য্যন্ত এক অনবচ্ছিন্ন পর্য্যায় চলিয়াছে, কোথাও এই পর্য্যায় ভগ্ন হয় নাই, কোথাও পুনরাবৃত্তি নাই, আকস্মিক বৈষম্য অথবা অতিপ্রমাণ বৈপরীত্য নাই। গতি ও স্থিতি, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, ভালো ও মন্দ, ইতর জন্তু ও মানুষ, সকলই এই পর্য্যায়ের মধ্যে বর্ত্তমান; কিন্তু একটি হইতে অন্যটিতে পরিবর্ত্তনের গতি এত মন্দ, যে উপলব্ধ হয় না।

লাইবনিট্‌জ মনাদদিগের মধ্যে তিন শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা প্রগতি এবং বিকাশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে আছে ধাতব পদার্থ ও উদ্ভিদ। অচেতন জ্ঞানশক্তি ভিন্ন তাহাদের আর কিছু নাই। নিদ্রিত অথবা মূর্চ্ছিত জীবের মতো তাহাদের জ্ঞান সংবিদে উত্তীর্ণ হয় নাই। ইতর জীবের স্থান ইহাদের উপরে। তাহাদের অনুভূতি এবং স্মৃতিশক্তি আছে, কিন্তু প্রজ্ঞা নাই। ইহাদিগকে লাইব্‌নিট্‌জ্‌ আত্মা বলিয়াছেন। ইহাদের মানসিক অবস্থা বিশৃঙ্খল স্বপ্ন-জগতের মতো। সর্ব্বোপরি প্রজ্ঞা ও স্বসংবিদ সম্পন্ন মানুষ। মানুষকে লাইব্‌নিট্‌জ্‌ "স্পিরিট" নাম দিয়াছেন। ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনাদ—মালিন্যবর্জ্জিত পরিপূর্ণ জ্ঞানের আধার। মানদদিগের আর এক ধর্ম্ম উৎকৃষ্টতর জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টাকে লাইবনিট্‌জ্‌ "ক্ষুধা"[9] নাম দিয়াছেন—জ্ঞানের ক্ষুধা। লাইবনিট্‌জ্‌ "শেষ কারণের নিয়ম"[10] নামে এক নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। এই নিয়ম-অনুসারে জগতের প্রত্যেক বস্তুই তাহার সত্তার সর্ব্বোত্তম পরিণাম-লাভের জন্য চেষ্টা করে। সর্ব্বোত্তম পরিণাম প্রত্যেক বস্তুর উদ্দেশ্য, তাহা লাভের জন্যই তাহার অস্তিত্ব এবং সেই উদ্দেশ্য-দ্বারাই তাহার ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত। মানুষের ইচ্ছা সর্ব্বদাই যেমন মঙ্গলের দিকে ধাবিত, নিম্নশ্রেণীর "ক্ষুধাও" তেমনি উন্নততর অবস্থা-প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট। জ্ঞাতসারেই হউক, অথাবা অজ্ঞাতসারেই হউক জগতের প্রত্যেক বস্তু তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

---

[1] তমোগুণ [2] Material element [3] Primary [4] Secondary
[5] Abstract quality [6] Concrete [7] রজোগুণান্বিত
[8] Law of Continuiy [9] Appetition [10] Law of final causes

যে-জগতে আমাদের বাস; তাহা চিন্তার জগৎ, তাহার সর্ব্বত্র প্রাণ বিস্তৃত, তাহা আত্মা-কর্তৃক সঞ্জীবিত। "সূক্ষ্মতম জড়-বিন্দুর মধ্যে এক একটি জগৎ অবস্থিত। তাহার মধ্যে জীবিত পদার্থ, প্রাণী, Entelechy ও আত্মা বর্ত্তমান।" এই প্রাণ বিরাম-হীন প্রতীতির আবির্ভাবে প্রকাশিত। প্রত্যেক মনাদের মধ্যে একটির পরে একটি প্রতীতির উদ্ভব হইতেছে। তাহার বিরাম নাই।

লাইবণিজ বৃক্ষে পরিপূর্ণ উদ্যান এবং মৎস্যপূর্ণ পুষ্করিণীর সহিত জড়ের প্রত্যেক অংশের উপমা দিয়াছেন। কিন্তু এই উদ্যানস্থ প্রত্যেক বৃক্ষের প্রত্যেক শাখা, এবং পুষ্করিণীর প্রত্যেক মৎস্যের প্রত্যেক অঙ্গও আবার ঐরূপ উদ্যান ও পুষ্করিণীর মত। প্রত্যেক শাখা ও অঙ্গ অসংখ্য মনাদের সমবায়ে গঠিত। জগতের মধ্যে কোনও জমিই পতিত পড়িয়া নাই, কিছুই মৃত নহে; জগতে কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নাই। প্রত্যেক প্রাণবান পদার্থের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি মনাদকর্তৃক তাহার দেহ চালিত হয় এবং দেহের প্রত্যেক অঙ্গও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবন্ত পদার্থকর্তৃক গঠিত, তাহাদের প্রত্যেকেরই নিজের আত্মা আছে।

প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত সংগতিবাদ

কিন্তু জগৎ যদি মনাদকর্তৃক গঠিত হয়, এবং জগতের উপাদান মনাদদিগের মধ্যে যদি কোনও সংযোগ-সূত্র না থাকে, প্রত্যেক মনাদ যদি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হয়, এবং কাহারও দ্বারা কাহারও যদি প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে জগতের শৃঙ্খলা ও সংগতির সম্ভব হয় কিরূপে? মনাদদিগের মধ্যে তাহা হইলে সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে লাইবনিট্‌জ্ বলেন, "প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত সংগতি" হইতেই এই শৃঙ্খলা ও সংগতি ও সুষমার উদ্ভব হয়। মনাদগণ এমন ভাবে গঠিত, যে প্রত্যেকের জীবন ও কার্য্য অন্যান্যের জীবন ও কার্য্যের সহিত সমান্তরাল ভাবে চলে। যদিও প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ভাবে বাস করে, এবং স্বকীয় সত্তার নিয়মানুসারেই বিকাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তথাপি এই "প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত সংগতি"-বশতঃ কাহারও কার্য্যের সহিত অন্য কাহারও কার্য্যের কোনও বিরোধ ঘটে না, সমস্ত কার্য্যই এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যে দেখিয়া মনে হয় প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। তাহারা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইলেও, তাহারা প্রত্যেকেই এক উচ্চতর ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন, এবং প্রত্যেকের কার্য্য এই নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্যই তাহাদের মধ্যে একতানতা বিদ্যমান এবং এই একতানতা হইতে বিশ্বের শৃঙ্খলার উদ্ভব। বিশ্বের শৃঙ্খলার সহিত লাইবনিটজ, বহুসংখ্যক বাদকের বাদন হইতে উদ্ভূত সংগতির উপমা দিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না, কাহারও কথাও কেহ শুনিতে পায় না, এমনি ভাবে অবস্থিত বিভিন্ন বাদকে যখন তাহাদের নির্দিষ্ট অংশ বাজাইয়া যায়, তখন সম্মিলিত বাদন হইতে যে একতানযুক্ত সঙ্গতির উদ্ভব হয়, জগতের সংগতিও তদ্রূপ।

এই প্রাক্‌-প্রতিষ্ঠিত সংগতিদ্বারা দেহ ও আত্মার মধ্যেও সংগতি সাধিত হয়। আত্মা তাহার স্বকীয় নিয়মানুসারে চলে। দেহও তাহার নিয়মানুসারে চলে। দেহ ও আত্মার পরস্পরের উপর কোনও প্রভাব নাই। তথাপি এই প্রাক্‌-প্রতিষ্ঠিত সংগতিবশতঃ উভয়ের ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। উভয়ের মধ্যে সংগতি এতই অধিক, যে তাহা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-জাত বলিয়া মনে হয়। দেহ ও মনের কার্য্যের একরূপতার ব্যাখ্যা তিন প্রকারে করা যাইতে পারে। একই সময়নির্দ্দেশকারী দুইটি ঘড়ির দৃষ্টান্তদ্বারা লাইবনিটজ্‌ এই বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঘড়ি দুইটির কাঁটাগুলি যদি একই যন্ত্রদ্বারা চালিত হয়, অথবা উভয় ঘড়ির কাঁটা ঠিকভাবে চালাইবার জন্য কোনও লোক যদি নিযুক্ত থাকে, অথবা ঘড়ি দুইটি যদি এমন নির্দ্দোষ ভাবে নির্ম্মিত হয়, যে তাহাদের মধ্যে সময়ের ভেদ হওয়া অসম্ভব হয়; তাহা হইলে সর্বদাই উভয় ঘড়িতে একই সময় প্রদর্শিত হইবে। দেহ ও মনের মধ্যে সংগতির ব্যাখ্যায় প্রথম কারণ অগ্রাহ্য। মালেব্রাঁ ও জিউলিঙ্ক্স দ্বিতীয় ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর সর্ব্বদা দেহ ও মনের মধ্যে সংগতি-রক্ষা করিতেছেন। লাইবনিট্‌জ্‌ তৃতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। মালেব্রাঁ এবং জিউলিন্‌ক্স যে অপ্রাকৃত ব্যাপার নিয়ত সংঘটিত হইতেছে, বলিয়াছিলেন, লাইবনিট্‌জের মতে তাহা পূর্ব্বকালে একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মাত্র প্রভেদ। তিনিও দেহ ও মনের কার্য্যের ব্যাখ্যার জন্য জগতের বহিঃস্থ ঈশ্বরের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকে Deux ex machina রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলা যায় না। ঈশ্বর বলিলেন, "আলো হউক", অমনি আলোকের আবির্ভাব হইল, বাইবেলের এই উক্তিদ্বারা যেমন সৃষ্টির ব্যাখ্যা করা হয়, তেমনি লাইবনিটজ্‌ প্রাক্‌-প্রতিষ্ঠিত সংগতিবাদদ্বারা জগতের মধ্যে সংগতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঈশ্বরের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিই এই সংগতির কারণ, কিন্তু কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়া এই শক্তি জগতের সংগতি বিধান করিয়াছে, লাইবনিট্‌জ্‌ তাহার বর্ণনা করেন নাই।

জগতের সকল যৌগিক দ্রব্যই মনাদের সমবায়ে গঠিত। লাইবনিট্‌জ্‌ মৎস্যে পরিপূর্ণ পুষ্করিণীর সহিত যৌগিক দ্রব্যের উপমা দিয়াছেন। পুষ্করিণীর মধ্যস্থ মৎস্যদিগের প্রাণ আছে; কিন্তু পুষ্করিণীর নাই। সেইরূপ প্রত্যেক যৌগিক দ্রব্য প্রাণহীন মনাদদ্বারা গঠিত; মনাদগণ জীবন্ত, কিন্তু তাহাদের সমষ্টির প্রাণ নাই। জীবদেহ, উদ্ভিদদেহ, ধাতুদ্রব্য সকলই মনাদের সমষ্টি। ধাতুদ্রব্যের সকল মনাদই এক শ্রেণীস্থ। প্রাণী-শরীরে একটি উচ্চশ্রেণীর মনাদকে কেন্দ্র করিয়া নিম্নশ্রেণীর বহু মনাদের সমাবেশ। শেষোক্ত মনাদগণদ্বারা প্রাণীদেহের শরীর গঠিত; কেন্দ্রীয় মনাদ সেই দেহের আত্মা। দেহ ও আত্মার মধ্যে যদিও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নাই, তথাপি প্রাক্‌-প্রতিষ্ঠিত সংগতিবশতঃ উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। দেহের অবস্থার সহিত আত্মার এবং আত্মার অবস্থার সহিত দেহের অবস্থা সমান্তরাল।

প্রত্যেক মনাদ অন্যান্য যাবতীয় মনাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, ইহার অর্থ প্রত্যেক মনাদের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার জ্ঞান অন্যান্য মনাদে সংক্রামিত হয়। কিন্তু আমাদের দেহের মধ্যে কি ঘটিতেছে, তাহার জ্ঞানই আমাদের যখন হয় না, তখন সমগ্র বিশ্বে কি ঘটিতেছে, তাহার

জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইবে? এই জ্ঞানের অস্তিত্বও তো আমরা অবগত নহি। এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। আমাদের প্রতীতি স্পষ্ট ও অস্পষ্ট এই দুই ভাগে বিভক্ত। যে সমস্ত প্রতীতি-সম্বন্ধে আমরা সচেতন, তাহারা স্পষ্ট। অন্যান্য প্রতীতি অস্পষ্ট, আমাদের চেতনার তলদেশে তাহাদের স্থান। তাহারা বর্ত্তমানে চেতনার নিম্ন সীমানার তলদেশে অবস্থিত হইলেও, সেই সীমানা অতিক্রম করিয়া সংবিদে উঠিবার শক্তি তাহাদের আছে। বিশ্বের অধিকাংশ প্রতীতিই এই শ্রেণীর। ঈশ্বরের মধ্যে সমস্ত প্রতীতিই সুস্পষ্ট, কিন্তু মানুষের মনে অনেকগুলি অস্পষ্ট। সমস্ত বিশ্ব মানবমনে প্রতিবিম্বিত হইলেও, সকল প্রতিবিম্ব সংবিদে উপনীত হয় না। কিন্তু বিশ্বের প্রতিফলনকার্য্যে যখন মনাদের বহিঃস্থ শক্তির কোনও ক্রিয়া নাই, মনাদের স্বীয় নিয়মানুসারে স্বকীয় শক্তিদ্বারা যখন তাহা সংঘটিত হয়, তখন এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপেই বস্তু-নিরপেক্ষ, ইহা আমাদের মনের মধ্যে যাহা সংঘটিত হয়, তাহারাই জ্ঞান। তাহা ভিন্ন অন্য কিছুর জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নহে। এই মত সলিপসিজ্‌ম নামে অভিহিত। ইহার পরিহারের জন্য লাইবনিট্‌জ্‌ বলেন, যে ইহা প্রকৃতপক্ষে বাহ্য জগতেরই জ্ঞান। ঈশ্বর স্বকীয় ক্ষমতাবলে এই অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভবপর করিয়াছেন। প্রত্যেক মনাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার জ্ঞান অন্য মনাদে সংক্রামিত হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনাদের নিজের পক্ষে এই জ্ঞানলাভ সম্ভবপর না হইলেও, ঈশ্বরকে রঙ্গাক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া লাইবনিট্‌জ এই জ্ঞানকে সম্ভবপর করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুতর আপত্তিও উত্থাপিত হইয়াছে। পরস্পরের প্রতিফলন ভিন্ন মনাদদিগের অন্য কোনও কার্য্য নাই। মনাদের সংখ্যা অসংখ্য হইলেও, এই অসংখ্য মনাদের প্রতিবিম্ব শূন্যেরই প্রতিবিম্ব। কেননা তাহাদের কাহারও মধ্যে এই প্রতিবিম্ব ব্যতীত অন্য কিছু নাই। লাইবনিট্‌জ্‌ বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠতম মনাদ ঈশ্বরে প্রতীতি ভিন্ন অন্য কিছু নাই। কিন্তু এই প্রতীতি কিসের? মনাদদিগের মধ্যে যখন কিছুই নাই, তাহারা যখন শূন্যগর্ভ, তখন তাহাদের প্রতিবিম্ব শূন্যেরই প্রতিবিম্ব। ঈশ্বরের মধ্যে তাহা হইলে শূন্য ভিন্ন কিছু থাকে না, ঈশ্বর শূন্যে বিলীন হইয়া যান। এই আপত্তির কোনও সন্তোষজনক উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।*

লাইবনিট্‌জের মতে আত্মা অমর। প্রকৃত পক্ষে মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই। যাহাকে মৃত্যু বলা হয়, তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্তি-মাত্র। আত্মার দেহ যে সকল মনাদদ্বারা গঠিত হইয়াছিল, তাহাদিগের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া আত্মা সংসারের রঙ্গ-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় তাহার প্রত্যাবর্তনই মৃত্যু।

লাইবনিট্‌জ্‌ ঈশ্বরকে পূর্ণতম মনাদ বলিয়াছেন। তিনি সর্ব্বাধার, অন্য মনাদের তিনি ভিত্তিভূমি। সমস্ত জগৎ তাঁহার মধ্যে জ্ঞানরূপে অধিষ্ঠিত। আলোকের আধার হইতে যেমন আলোক বিকীর্ণ হয়, তেমনি তাঁহা হইতে সকল বস্তু আবির্ভূত হয়। তাঁহাদ্বারাই সকলের একত্ব সাধিত হয়। তিনিই বিশ্বের সংগতি। কিন্তু আত্মা কিরূপে ঈশ্বরের জ্ঞান

* Vide History of Modern Philoscphy by A, W. Benn P. 54

লাভ করে, সে সম্বন্ধে লাইবনিট্‌জ্‌ সুসংগত উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই। ঈশ্বরে সকল মনাদই স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত। মনাদদিগের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের কোনও পন্থা যখন নাই, তখন কেবল ঈশ্বরের জ্ঞানের মাধ্যমেই আমরা অন্যান্য মনাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধের বিষয় অবগত হইতে পারি। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী লঙ্ঘন না করিয়া, জগতের অথবা ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইতে পারে না। লাইবনিট্‌জ্‌ জীবাত্মাদিগের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও ঈশ্বরের সহিত তাহাদের সম্বন্ধের আলোচনা-কালে প্রাক্‌-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতি-বাদ অতিক্রম করিয়া ভাবের আদান প্রদানের[1] কথা বলিয়াছেন। এই আদান-প্রদান ব্যক্তিগত গণ্ডীর বাহিরে না গিয়া সম্ভবপর হয় না। জীবাত্মার সহিত সাধারণ আত্মার পার্থক্য এই যে সাধারণ আত্মাগণ বিশ্বের প্রতিবিম্ব মাত্র, কিন্তু সচেতন প্রতিবিম্ব নহে। কিন্তু জীবাত্মাগণ ঈশ্বরের সংবিদ-সম্পন্ন প্রতিমূর্ত্তি, এবং তাঁহাকে জানিতে এবং তাঁহার অনুকরণ করিতে সমর্থ; তাঁহার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে জানিতেও সক্ষম। এই উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ জীবাত্মার সাধ্যায়ত্ত বলিয়াই তাহারা একপ্রকার ঈশ্বরের সামীপ্য-লাভে সমর্থ হয়। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ, তাহা যে কেবল যন্ত্র ও যন্ত্র-নির্ম্মাতার মধ্যে সম্বন্ধ, তাহা নহে, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধও বটে। সমস্ত জীবাত্মা লইয়া ঈশ্বরের পুরী[2] গঠিত। এই পুরী উৎকৃষ্টতম রাজার অধীনে যত প্রকার রাষ্ট্রের সম্ভব হইতে পারে, তাহাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্টতম রাষ্ট্র। ইহা হইতে প্রতীত হয়, যে ঈশ্বরের স্বরূপ এবং মানুষের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের আলোচনার সময় লাইবনিট্‌জ্‌ মনাদদিগের স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রকৃতির কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এবং স্পিনোজার মতো তিনিও ঈশ্বরকেই একমাত্র পরম পদার্থ এবং জীবাত্মাদিগকে তাঁহার উপলক্ষণ[3] অথবা বিকারমাত্র বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। লাইবনিট্‌জের মনাদবাদের সহিত তাঁহার সঙ্গতিবাদের প্রকৃত সামঞ্জস্য হয় নাই! মনাদগণের জ্ঞানলাভের সামর্থ্য আছে, স্বীকার করিয়া, তাহাদের জ্ঞানের ব্যাখ্যার জন্য প্রাক্‌-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবাদের অবতারণার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে লাইবনিট্‌জের মত

সত্তা-বিজ্ঞানে লাইবনিট্‌জের মত স্পিনোজার মতবাদের বিরোধী। জ্ঞানের উৎপত্তি-ও-প্রকৃতি-সম্বন্ধে তাঁহার মত লকের প্রত্যক্ষবাদের বিরোধী। লক সহজাত প্রত্যয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। লাইবনিট্‌জ ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লক যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সহজাত প্রত্যয়সকল যে স্পষ্ট ভাবে মনের মধ্যে বর্ত্তমান, অথবা তাহাদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে যে আমরা সচেতন, তাহা নহে। তাহারা আত্মার মধ্যে বীজরূপে[4], গূঢ়রূপে, বর্ত্তমান। তাহাদিগকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রকাশিত করিবার ক্ষমতা আত্মার আছে। আত্মার মধ্যে তাহারা

[1] Communion [2] City of God. [3] Modes. [4] Implicitly.

নিহিত, এবং সেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসে। বাহ্য পদার্থ হইতে তাহাদের জ্ঞান হয় না। প্রকৃত পক্ষে সকল চিন্তাই আত্মার অন্তর্বর্ত্তী—তাহারা বাহির হইতে আত্মার মধ্যে প্রবেশ করে না, আত্মার মধ্যেই উৎপন্ন হয়; আত্মাই তাহাদের উপাদান। আত্মার উপর কোনও বাহ্য প্রভাব প্রযুক্ত হওয়া অসম্ভব। এরূপ প্রভাবের কল্পনা করাও সম্ভবপর নহে। সংবেদনের উৎপত্তির জন্যও কোনও বাহ্য পদার্থের প্রয়োজন নাই। লক সাদা কাগজের সহিত আত্মার উপমা দিয়াছিলেন। লাইবনিট্‌জ্‌ মার্বল্‌খণ্ডের সহিত তাহার উপমা দিয়াছেন। মার্বল-প্রস্তরের শিরা অনুসরণ করিয়াই ভাস্কর তাহাদারা মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে সক্ষম হয়। মানুষের জ্ঞানও সহজাত প্রত্যয়ের বীজ অনুসরণ করিয়া উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান[১] ও যুক্তিমূলক জ্ঞানের[২] মধ্যে পার্থক্যও স্পষ্টতার পার্থক্যমাত্র। সহজাত প্রত্যয়দিগের মধ্যে লাইবনিট্‌জ্‌ বিরোধ-প্রতিজ্ঞা[৩] এবং পর্য্যাপ্ত কারণ প্রতিজ্ঞাকে[৪] প্রধান স্থান দিয়াছেন। ইহাদের সহিত তিনি আর একটি প্রতিজ্ঞা যোগ করিয়াছেন। তাহা এই—"প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ একরূপ দুই দ্রব্যের অস্তিত্ব নাই।"

লাইবনিট্‌জের মতে মানব-মনে এমন অনেক "প্রত্যয়" আছে, যাহাদিগের সম্বন্ধে মনঃ সচেতন নহে। যখন ইন্দ্রিয়-জগতের সহিত মনের সংযোগ সংঘটিত হয়, তখনই সেই সকল প্রত্যয় চেতনার ভূমিতে আবির্ভূত হয়। পূর্ব্বে যে স্বল্প প্রতীতির[৫] কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা অস্পষ্ট ভাবে মনের মধ্যে বর্ত্তমান। ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া, তাহারা চেতনায় প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশ অবিচ্ছেদে চলিতেছে। এই সকল প্রত্যয়ের চৈতন্যের আলোকে ক্রমশঃ প্রকাশের ইতিহাসই মনের জীবন-প্রবাহ।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও যুক্তিমূলক জ্ঞানের আলোচনায় লাইবনিট্‌জ্‌ দ্বিবিধ সত্যের উল্লেখ করিয়াছেন: (১) অ-বশ্যক অথবা নিয়ত সত্য,[৬] এবং (২) আপেক্ষিক অথবা আগন্তুক[৭] সত্য। অভিজ্ঞতার অপেক্ষা না করিয়া যে সকল সত্য স্ব-প্রকাশ রূপে প্রকাশিত হয়, তাহারা অ-বশ্যক সত্য। গণিত, ন্যায়, তত্ত্ব-বিদ্যা এবং কর্ম্মনীতির সত্য এই প্রকার। এই প্রকার সত্য অস্বীকার করিলে স্ব-বিরোধের উৎপত্তি হয়। যে সকল সত্য স্বতঃ-সিদ্ধ নহে, স্বতঃ-প্রমাণ্য নহে, কিন্তু যাহাদিগকে অস্বীকার করিলে কোনও বিরোধের উৎপত্তি হয় না, অথচ অভিজ্ঞতায় যাহারা বাস্তব বলিয়া প্রতীত হয়, তাহারা আপেক্ষিক অথবা আগন্তুক। বস্তুর স্বরূপের মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহার জন্য এই প্রকার সত্যের অন্যথা অসম্ভব বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই দুই প্রকার সত্য পূর্ব্বোক্ত "বিরোধের নিয়ম" এবং "পর্য্যাপ্ত কারণের নিয়মের" অনুযায়ী। যুক্তি-মূলক জ্ঞান "বিরোধের নিয়মানুযায়ী"। বাস্তব ঘটনার জ্ঞান "পর্য্যাপ্ত কারণের" নিয়মের অনুগত। বাস্তব ঘটনাবলী কেন এবং কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহা বুঝিতে পারিলেই, তাহাদিগকে বুঝিতে পারা যায়, এবং তাহারা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া

---

[১] Empirical knowledge. [২] Rational knowledge.
[৩] Proposition of Contradiction
[৪] Proposition of Sufficient Reason.
[৫] Petty perceptions. [৬] Necessary. [৭] Contingent.

প্রতীত হয়। যাহার বিরুদ্ধে যুক্তি কোনও আপত্তি উত্থাপিত করে না, বিরোধের নিয়ম যাহার বিরুদ্ধে যায় না, তাহা সম্ভাব্য।[1] ঈশ্বরের মনে এইরূপ অসংখ্য সম্ভাব্য পদার্থের অস্তিত্ব আছে বলিয়া কল্পনা করা যায়, কিন্তু এই সম্ভাব্য পদার্থদিগের সকলেই বাস্তবে পরিণত হয় না। ঈশ্বর যাহাদিগকে নির্ব্বাচিত করেন—সর্ব্বোত্তম অথবা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী বলিয়া নির্ব্বাচিত করেন—কেবল তাহারাই বাস্তবে পরিণত হয়। জগতে প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তু অনপেক্ষ ভাবে সর্ব্বোত্তম না হইতে পারে, কিন্তু যে পরিস্থিতির মধ্যে তাহার স্থিতি, সমগ্রের মধ্যে যেখানে তাহার স্থান, তাহা বিবেচনা করিলে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু হইতে পারে না। যে উদ্দেশ্যে সমগ্রের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহার অবস্থান, অন্য কিছু দ্বারাই সে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইতে পারিত না। বিশিষ্ট দ্রব্যসমূহের সমাবেশে যে সমগ্র ব্যবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে, মোটের উপর বিবেচনা করিলে তাহার ফলও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই জগৎ পূর্ণ ও অনবদ্য। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জগৎ হওয়া সম্ভবপর নহে। "পর্য্যাপ্ত কারণের" নিয়ম হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। সৃষ্ট প্রত্যেক দ্রব্যের ব্যাখ্যাই এই নিয়মদ্বারা করা যায়। "পর্য্যাপ্ত কারণের" নিয়মও "শেষ কারণে"র[2] নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জগৎ ঈশ্বর-কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার ইচ্ছাই অভিব্যক্ত, সুতরাং ইহাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জগৎ তাহাতে সন্দেহ নাই।

জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ

লাইবনিট্‌জের ধর্ম্মমত তাঁহার Theological Essays গ্রন্থে বিবৃত আছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে প্রাসিয়ার রাণীর অনুরোধে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে লাইবনিট্‌জ্ প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত তাঁহার দর্শনের সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জগৎ-সৃষ্টিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য[3] ছিল। "এই জগৎ সকল সম্ভাব্য জগতের মধ্যে উৎকৃষ্টতম"—এই মত এই গ্রন্থেই বিবৃত হইয়াছে। জগতের যে-রূপ আমরা দেখিতে পাই, কেন অন্য রূপ না হইয়া তাহার সেই রূপ হইল? অন্য রূপও তো হইতে পারিত! কেন পাপের অস্তিত্ব জগতে আছে? কেন জগতে এত পীড়ার প্রাদুর্ভাব? কেন মানুষে মানুষে এত রেষারেষি, কেন এত হিংসাদ্বেষ? এই সমস্ত না থাকিলে জগৎ তো আরও ভাল হইত! লাইবনিট্‌জ্ বলিয়াছেন, ঈশ্বরের স্বরূপ এবং প্রকৃতি বিবেচনা করিলে, বর্ত্তমান জগৎ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জগৎ হইতে পারিত না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও মঙ্গলময়। যদি বর্ত্তমান জগৎ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জগৎ নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে, তিনি জ্ঞানবলে তাহা জানিতে পারিতেন। তিনি মঙ্গলময় বলিয়া তদ্রূপ জগৎ-সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাও তাঁহার হইত, এবং নিজশক্তিবলে তিনি তাহার সৃষ্টিও করিতে পারিতেন। অনন্ত-জ্ঞান, অনন্ত-শক্তি, অনন্ত-কল্যাণ-রূপী ঈশ্বর যাহা সর্ব্বোত্তম, তাহা ভিন্ন অন্য কিছুই সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেরই সন্তোষজনক কারণ আছে। তাঁহার

[1] Possible. [2] Final causes. [3] Purpose.

বর্ত্তমান জগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে মঙ্গলময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে উদ্দেশ্যে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, বর্ত্তমান জগৎ যে সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই মতকে "উৎকৃষ্টতম জগৎবাদ"[১] বা মঙ্গলবাদ বলে। ভল্টেয়ার তাঁহার Candide গ্রন্থে এই মতের উপর প্রচুর শ্লেষ বর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার মতে বর্ত্তমান জগৎ সকল সম্ভাব্য জগতের মধ্যে নিকৃষ্টতম। হেগেল বলিয়াছেন, লাইবনিট্জ্ তাঁহার মত প্রমাণদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন নাই। বাজারে কোনও দ্রব্য কিনিতে গিয়া, ভাল দ্রব্য না পাইলে, যাহা পাওয়া যায়, তাহাই কিনিতে হয়, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হয়। তখন সন্তুষ্ট হইবার পর্য্যাপ্ত কারণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই দ্রব্যকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা যায় না। লাইবনিট্জ্ জগৎকে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন, কিন্তু জগতে পাপ আছে। অসঙ্গ হইতে কিরূপে এবং কেন সসীমের আবির্ভাব হয়, সে সম্বন্ধে লাইবনিট্জ কিছুই বলেন নাই। জগতে পাপের অস্তিত্ব আপাতদৃষ্টিতে যে তাঁহার মতের বিরোধী, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন, জগতে পাপ ও দুঃখ যদি না থাকিত, তাহা হইলে সেই পাপ-ও-দুঃখহীন জগৎকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা চলিত না। প্রত্যেক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর সম্বন্ধ আছে। অনেক সময় অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হয়। একটু তিক্ত বস্তু অনেক সময় চিনি অপেক্ষা অধিকতর মুখরোচক হয়। অমঙ্গলের অস্তিত্বের মূল কারণ প্রত্যেক বস্তুর সসীমত্ব। তাহার স্বভাবের নিষ্ক্রিয়তার (তমোগুণ) অভিভবের জন্যই তাহার মধ্যে "ক্ষুধা" অর্থাৎ উন্নততর অবস্থাপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা (রজোগুণ) আছে। মানুষের জড়জগতে অবস্থানের ফলই অমঙ্গল। জড় জগতের নিষ্ক্রিয়তা হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রত্যেক মনাদের মধ্যে ক্ষুধা নিহিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যাহাকে অমঙ্গল[২] বলা হয়, তাহা অভাব অথবা অসম্পূর্ণতা মাত্র। ইহার মধ্যে সক্রিয় শক্তি কিছু নাই, এবং ইহাকে যে জগতে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা মহত্তর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে।*

---

[1] Optimism [2] Evil.

Cf—* All are but parts of one stupendous whole,
Whose body Nature is, and God the soul;
All Nature is but Art, unknown to thee;
All chance, direction, which thou canst not see;
All discord harmony, not understood;
All partial evil, universal good;
And, spite of pride, in erring reason's spite,
One truth is clear: whatever is, is right.
Alexander Pope.

বিরাট সমগ্র "এক", সবই অংশ যার,
প্রকৃতি তাহার দেহ, ঈশ আত্মা তার।

লাইবনিটজ্‌ ত্রিবিধ অমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন—অতিপ্রাকৃতিক,[1] প্রাকৃতিক, ও নৈতিক। অতি-প্রাকৃতিক অমঙ্গল সসীম সত্তার অপরিহার্য্য সঙ্গী। প্রাকৃতিক অমঙ্গলের উদ্দেশ্য শাস্তি অথবা শিক্ষা। ইহা দ্বারা মানুষের সংশোধন ও শিক্ষাবিধান হয়। নৈতিক অমঙ্গল অথবা পাপ ঈশ্বরের অনুমত হইলেও, তাঁহার ঈপ্সিত নহে। পাপের সম্ভাবনা যদি না থাকিত, তাহা হইলে "স্বাধীনতা"ই থাকিত না, এবং স্বাধীনতা না থাকিলে পুণ্যও থাকিত না।

অমঙ্গল কোনও বাস্তব পদার্থ নহে। মঙ্গলের গৌরব ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য তাহার পার্শ্বে এই কুৎসিত পদার্থের অস্তিত্ব। চিত্রে ছায়া[2] এবং সঙ্গীতে অসংগতির[3] যে কার্য্য, অমঙ্গলের কার্য্যও তাহাই। বৈচিত্র্যহীন জগৎ বিরোধ ও ভেদের সমন্বয়-যুক্ত জগৎ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু বাস্তব,[4] ঈশ্বর তাহার কারণ। কিন্তু তাঁহাকে তাহাদের সসীমত্বের কারণ বলা যায় না। অমঙ্গলের আলোচনায় লাইবনিট্‌জ্‌ অনেক কথা বলিয়াছেন, উপমার ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু যুক্তির বেশী অবতারণা করেন নাই। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং তাঁহার রচিত প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সেই সকল নিয়ম যে সর্ব্বোত্তম, তাহা লাইবনিট্‌জ্‌ প্রমাণ করেন নাই। হেগেলের মতে "ঈশ্বর এই সমস্ত নিয়মের সৃষ্টিকর্ত্তা," এই যুক্তিতে ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা দার্শনিকের যুক্তি নহে।

কর্ম্ম-নীতি

লাইবনিট্‌জের কর্ম্ম-নীতি তাঁহার মঙ্গলবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জগৎ যাবতীয় সম্ভাব্য জগতের মধ্যে উৎকৃষ্টতম, সুতরাং মানবজীবনও সুখময়। জগতের সর্ব্বত্রই সুসংগতি। জাগতিক প্রত্যেক বস্তুই পরম সুখের সহায়ক। পরম সুখ ও পরম মঙ্গল অভিন্ন। সকল পদার্থদ্বারা যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে, তেমনি তাহাদের স্বকীয় উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইতেছে। স্পিনোজার ন্যায় লাইবনিট্‌জের মতেও পূর্ণতাই কর্ম্মনীতির চরম লক্ষ্য, এবং প্রজ্ঞাই (যুক্তি) পূর্ণতার মূল তত্ত্ব। কিন্তু লাইবনিট্‌জের নিয়তিবাদ স্পিনোজার

সমগ্র প্রকৃতি কলা, অজ্ঞাত তোমার;
দৈব যারে বল, তাহা নির্দ্দেশ তাঁহার।
সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত পাওনা দেখিতে,
অসঙ্গতি, সুসঙ্গতি, পার না বুঝিতে।
অংশের অশুভ হয়, সার্ব্বিক কল্যাণ;
মিথ্যা গর্ব্ব, ভ্রান্ত যুক্তি, বৃথা অভিমান!
একই সত্য সুপ্রকাশ, জেনো সুনিশ্চিত
যাহা আছে সবই ভালো, নিন্দার-অতীত।

[1] Metaphysical. [2] Shade. [3] Discord. [4] Positive.

নিয়তিবাদ হইতে ভিন্ন। স্পিনোজার মতে কর্ম্মের কারণ কর্ত্তার বাহিরে অবস্থিত, এবং কর্ত্তার ইচ্ছা বাহ্য পদার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। লাইবনিট্‌জের মতে কর্ত্তার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে তাহার জ্ঞানদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জ্ঞান সকল সময় সচেতন না হইতে পারে। অনেক সময় যে আভ্যন্তরীণ প্রেরণাদ্বারা আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তাহার সম্বন্ধে আমাদের চেতনা থাকে না। কিন্তু আমাদের অস্পষ্ট অনুভূতির মধ্যেও আমাদের মঙ্গলের প্রচেষ্টা নিহিত থাকে। ইচ্ছা কখনও নির্লিপ্ত অথবা উদাসীন থাকে না। প্রবলতম প্রবর্ত্তনাদ্বারা প্রভাবিত হইয়াই আমরা কর্ম্ম করি। উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্ম অসম্ভব। সকল মনাদের অন্তরে যে কর্ম্ম-প্রচেষ্টা (ক্ষুধা) আছে, তাহার বশে মানুষ যাহাকে সর্ব্বোত্তম গণ্য করে, সেই উদ্দেশ্যকেই নির্ব্বাচিত করে, এবং তাহার ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত কর্ম্ম তাহার ব্যক্তিত্ব ও তাহার স্বকীয় প্রকৃতির ফল।

লাইবনিট্‌জ ইচ্ছার ত্রিবিধ স্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম স্তরে ইচ্ছার প্রকাশ সংস্কাররূপে[1]। এই সংস্কার এক প্রকার অস্বস্তির অস্পষ্ট অনুভূতি। দ্বিতীয় স্তরে ইচ্ছা প্রভাবিত হয় প্রাপ্তব্য বিষয়[2] দ্বারা। এই বিষয় সুখ অথবা দুঃখের জনকরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। সর্ব্বোপরিস্থ স্তরে যুক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা। সুস্পষ্ট প্রতীতি-ও-যুক্তি-দ্বারা ইচ্ছা তখন পরিচালিত হয়। যে সমস্ত সনাতন সত্য আমাদের মনের মধ্যে নিহিত, তাহাদের জ্ঞানদ্বারাই আমাদের ইচ্ছা তখন পরিচালিত হয়। যুক্তি-পরিচালিত ইচ্ছাই স্বাধীন ইচ্ছা। সুতরাং নৈতিক মঙ্গল ও জ্ঞান-প্রচেষ্টা অভিন্ন। যুক্তির সাধনা অর্থাৎ অস্পষ্ট প্রতীতি হইতে সুস্পষ্ট প্রতীতিতে প্রগতিই নৈতিক মঙ্গল। পরিপূর্ণতা-লাভের চেষ্টাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহাতেই চরম সুখ। আমাদের সংস্কার-সকলের গতিও আমাদের নৈতিক মঙ্গলের দিকে। সংস্কার হইতে যুক্তিতে উত্তীর্ণ হওয়া অর্থাৎ অচেতন কর্ম্ম হইতে সচেতন কর্ম্মে উন্নীত হওয়াতেই জীবনের উন্নতি। যুক্তির ফলে আমাদের প্রকৃতি যেমন গভীরতর হয়, তেমনি বিস্তৃততরও হয়। যুক্তির অনুসরণ করিয়া আমরা অপরের সুখের অনুসন্ধান করিতে শিক্ষা করি। কিন্তু আমাদের কিসে মঙ্গল, যতই তাহা জানিতে পারি, ততই অপরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ-বিষয়ে আমরা সচেতন হই; যতই স্বকীয় সম্পূর্ণতা অভিমুখে অগ্রসর হই, ততই অপরের পরিপূর্ণতা-দর্শনেও সুখ প্রাপ্ত হই। মানবপ্রীতিতেই যাবতীয় নৈতিক নিয়মের পরিসমাপ্তি। সুবিচার, ন্যায়ানুগত্য ও ঈশ্বর-ভক্তি মানবপ্রীতির অন্তর্গত। ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের ধারণা এবং জ্ঞান-ও-মঙ্গল-মূলক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তিনি জগৎ শাসন করিতেছেন এই বিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অভিন্ন। ঈশ্বরের মনে সকল বস্তু যে ভাবে বর্ত্তমান, তাহাদিগকে সেই ভাবে দর্শন করা এবং আভ্যন্তরীণ জীবনের নিয়ম-পালনই মানুষের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য।

যে নৈতিক আগ্রহ লাইবনিট্‌জের রচনাবলীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকেই তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে দ্বৈতের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন,

---

[1] Instinct. [2] Object. [3] Universalism.

তাহার সমন্বয় তিনি করিতে পারেন নাই। স্পিনোজার সার্ব্বিকতার বিরুদ্ধে তিনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য[1] উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তিনি অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। স্পিনোজা এমন ভাবে জগতের বর্ণনা করিয়াছেন, যে তাহার মধ্যে বিশিষ্ট বস্তুর কোনও স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না। তেমনি লাবনিট্জের দর্শনে সার্ব্বিকদিগের স্থান আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না। স্পিনোজার দর্শনকে যদি চরম সার্ব্বিকতাবাদ বলা যায়, তাহা হইলে লাইবনিট্জের দর্শনকে বলিতে হয় চরম বিশেষবাদ। স্পিনোজা একের মধ্যে বহুকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন; লাইবনিট্জ্ বহুর গুরুত্ব খ্যাপন করিয়াছেন, কিন্তু এককে দেখিতে পান নাই। যে সকল স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার প্রাক্ প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবাদ তাহাদের সমবর্ত্তিতা ও পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যার জন্য উদ্ভাবিত একটি কৃত্রিম কৌশলমাত্র। তিনি পরস্পর বিরুদ্ধ মতের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সমন্বয়-সাধনে সক্ষম হন নাই। তিনি বহু সূক্ষ্ম ভেদের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু যে একত্বের মধ্যে যাবতীয় ভেদ বিলুপ্ত হয়, তাহার সন্ধান পান নাই। "বস্তু ও প্রত্যয়, সসীম ও অসীম, নিমিত্ত কারণ ও শেষ কারণ এবং অভেদ তত্ত্ব ও পর্যাপ্ত কারণ-তত্ত্বের একত্ব-সাধনে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম হন নাই।"

ইহা সত্ত্বেও লাইবনিট্জের দর্শনে এমন অনেক ইঙ্গিত আছে, যাহা পরবর্ত্তী দার্শনিক-দিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ক্যান্টের জ্ঞান-তত্ত্বে জ্ঞানের যে প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ব অংশের কথা আছে, লাইবনিট্জের দর্শনে তাহার পূর্ব্বাভাস প্রদত্ত হইয়াছিল। অভিজ্ঞতা হইতে যে অবশ্যকতার জ্ঞান লাভ করা যায় না, এবং জ্ঞানে মনের নিজেরও দান আছে, ক্যান্টের পূর্ব্বে লাইবনিট্জ তাহা বলিয়াছিলেন। প্রকৃতি প্রাণকর্ত্তৃক সঞ্জীবিত, এবং শক্তিই জড় ও গতির অবিনশ্বর তত্ত্ব, তাঁহার এই মত হইতে আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের "শক্তির অবিনশ্বরতা[2]" মতের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি যে "অনবচ্ছেদের নিয়মের" আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন, যে প্রকৃতির পরিণাম-পারম্পর্য্যের মধ্যে কোথাও আকস্মিক গুরুতর ভেদ নাই, পরিণাম ধীরগতিতে সংঘটিত হইতেছে, ক্রমে ক্রমে জীবনের নিম্নতর রূপ হইতে উচ্চতর রূপের আবির্ভাব হইতেছে। রামধনুর নানা বর্ণের প্রত্যেকটি যেমন প্রায় অলক্ষিত ভাবে অল্পে অল্পে তাহার পরবর্ত্তী বর্ণে পরিণত হয়, তেমনি প্রত্যেক জীবের আকারের অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তনের ফলে কালে নূতন জীবের উৎপত্তি হয়। লাইবনিট্জের এই মত ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই জগৎ যাহা, তাহা হইতে যে অন্যরূপ হওয়া অসম্ভব, লাইবনিট্জের এই মত পরে হেগেল গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু হেগেলের মতে জগৎ অনন্ত প্রজ্ঞার অবশ্যক প্রকাশ, ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত নহে; যুক্তির নিয়মে ইহার অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং ইহার অন্যথা হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

[1] Individualism. [2] Conservation of Energy.

(২)

লাইবনিট্জের শিষ্যগণ

টমাসিয়াস্

লাইবনিট্জ্ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দার্শনিক সমস্যাবলীর সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। বুদ্ধিকে তিনি যাবতীয় প্রগতির সাধন, এবং বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশকে তাহার লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি জগতে ঈশ্বর-সৃষ্ট শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্যে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। ক্যাণ্টের আবির্ভাব পর্য্যন্ত জার্মান দার্শনিক চিন্তা তাঁহার দর্শনদ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত ছিল। জার্মানির বিদ্বৎসমাজে তাঁহার মত প্রচারিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার ফলে জার্মান সাহিত্যে তাঁহার মত অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার পরে তিনজন দার্শনিক তাঁহার দর্শনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও তাহাতে শৃঙ্খলা-বিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম টমাসিয়াস্,[১] চির্ন্‌হউসেন[২] এবং উলফ্[৩]।

টমাসিয়াস্ (১৬৫৫-১৭২৮) অধ্যাপক ছিলেন। তিনিই প্রথমে তাঁহার ছাত্রদিগের নিকট জার্মান ভাষায় দর্শনের বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। পরে উলফ্ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। মধ্যযুগে প্রচলিত রীতি বর্জ্জন করিয়া তিনি নূতন প্রণালীতে দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ করেন। সাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের সহিত বিজ্ঞানের সংযোগ-সাধনের জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষের সুখ-বিধান, এবং সেই উদ্দেশ্যে সাংসারিক জ্ঞানের উৎকর্ষ-বিধান। যাঁহারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া এবং দুর্দ্দমনীয় রিপুদিগকে সংযত করিয়া নৈতিক গুণ-অর্জ্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তাঁহারাই শান্তিলাভ করিতে পারেন। সুনীতির সাধনাকে তিনি "প্রজ্ঞাসম্মত প্রেম"[৪] বলিয়াছেন। মঙ্গলই[৫] তাঁহার মতে দর্শনের উদ্দেশ্য, জ্ঞান মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা[৬] ইহা লাভ করা যায়। যাবতীয় সত্যের কষ্টিপাথর যুক্তি। তাঁহার কর্ম্মমূলক দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত :—(১) স্বাভাবিক অধিকার[৭] অথবা সুবিচার, (২) রাষ্ট্রনীতি, (ইহার বিষয় শিষ্টাচার) এবং (৩) কর্ম্মনীতি। (ইহার আলোচ্য বিষয় সাধুতা।) "স্বাভাবিক অধিকার" খণ্ডে টমাসিয়াস্ জগৎ এবং মানুষের আলোচনা করিয়াছেন। "জগতে দৃশ্য এবং অদৃশ্য উভয়বিধ বস্তু আছে। শক্তিই অদৃশ্য বস্তু। দৃশ্য বস্তুকে তিনি পিণ্ড[৮] নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই কোনও না কোনও প্রকারের শক্তি আছে। প্রকৃতির অন্তর্গত উচ্চশ্রেণীর বস্তুর মধ্যে যে শক্তি আছে, তাহা নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত বস্তুদিগের শক্তি অপেক্ষা উন্নত প্রকারের। মানুষের দেহ ও শক্তি উভয়ই আছে। মানুষের উন্নততর শক্তিদ্বারা একজনের সহিত অন্যের সংযোগ সংঘটিত হয়। সুবিচারের তত্ত্ব এই—কাহারও সহিত এমন ব্যবহার করিও না, যাহা তুমি তাহার নিকট পাইতে ইচ্ছা কর না। রাষ্ট্রনীতি

---

[1] Thomasius [2] Tschirnhausen [3] Wolf [4] Rational Love
[5] Well being [6] Common Sense [7] Natural right [8] Body

অথবা শিষ্টাচারের তত্ত্ব এই—অন্যের নিকট যে প্রকার ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, তাহার সহিত সেই প্রকার ব্যবহার কর। কর্ম্মনীতি অথবা সাধুতার তত্ত্ব এই: অন্যে যে কাজ করিলে তাহার প্রশংসা কর, নিজে সেইরূপ কাজ কর। বিধি-মূলক যাবতীয় অধিকার মানুষের সৃষ্ট নিয়ম হইতে উদ্ভূত। অভিজ্ঞতার ফলে তাহাদের প্রয়োজন অনুভূত হয়, এবং সেই প্রয়োজন-সাধনের জন্য সেই সকল অধিকারের সৃষ্টি করিয়া ব্যবস্থা প্রণীত হয়। এই সমস্ত অধিকারের ভিত্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা কিনা, তাহা ধর্ম্মতাত্ত্বিকদিগের আলোচ্য।

(২)

চির্ণ হউসেন

চির্ণ হউসেন (১৬৫১-১৭০৪) যুক্তিবাদ[1] এবং অভিজ্ঞতাবাদের[2] সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভের সময় তিনি স্পিনোজার সহিত পরিচিত হন। লাইবনিট্‌জের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল, এবং দর্শন-সম্বন্ধে তাঁহার সহিত তাঁহার পত্রালাপ হইয়াছিল। তাঁহার Medicina Mentis বিজ্ঞানের উপক্রমণিকা-স্বরূপে রচিত হইয়াছিল। জ্ঞানের যাবতীয় বিভাগে তিনি গণিতের প্রণালী-অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মতে যাবতীয় জ্ঞানই অভিজ্ঞতা হইতে উদ্‌ভূত, এবং গণিতের পদ্ধতিতে অনুমানের পূর্ব্বে তথ্যের সংগ্রহ এবং পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন। এই ভাবে গবেষণা আরম্ভ করিলে চারিটি মৌলিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়: (১) আমাদের নানাবিধ পদার্থের জ্ঞান আছে; (২) এই সমস্ত পদার্থের কতকগুলি সুখদায়ক, কতকগুলি দুঃখদায়ক; (৩) কতকগুলি পদার্থ বোধগম্য, কতকগুলি বোধগম্য নহে; (৪) আমাদের ইন্দ্রিয়, কল্পনা এবং অনুভূতি[3] হইতে আমরা বাহ্যদ্রব্যের প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হই। আমাদের যে নানাবিধ দ্রব্যের জ্ঞান আছে, ইহা হইতে "মনে"র ধারণা উৎপন্ন হয়। কতকগুলি পদার্থ যে সুখ উৎপাদন করে, এবং কতকগুলি দুঃখ উৎপাদন করে, ইহা হইতে দুঃখ-পরিহারের এবং সুখ-প্রাপ্তির যে চেষ্টার উদ্‌ভব হয়, তাহা হইতে "ইচ্ছার" জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কতকগুলি পদার্থ বোধগম্য ও কতকগুলি বোধগম্য নহে, ইহা হইতে "বুদ্ধি"র ধারণা উৎপন্ন হয়। চতুর্থ তথ্য হইতে কল্পনা ও দেহের ধারণা উৎপন্ন হয়। এই চতুর্বিধ জ্ঞান হইতে যথাক্রমে সাধারণ জ্ঞান, নৈতিক জ্ঞান, নৈয়ায়িক জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উদ্‌ভব হয়। অভিজ্ঞতার তথ্য হইতে সম্প্রত্যয়[4] উৎপন্ন হয়, এবং সম্প্রত্যয়ের সাহায্যে আমরা সার্ব্বিক হইতে "বিশেষের" অনুমান করিতে অগ্রসর হই। প্রতীতি ও সম্প্রতীতি[5] সকল জ্ঞানের জন্যই আবশ্যক। বুদ্ধিদ্বারাই সত্য আয়ত্ত করিতে পারা যায়। বুদ্ধি যদি কল্পনাপ্রসূত সম্প্রত্যয়দ্বারা বিপথে চালিত না হয়, তাহা হইলে তাহার ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। দে-কার্ত্ত এবং স্পিনোজা যে গাণিতিক প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই তর্কের একমাত্র পদ্ধতি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যাবতীয় বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

[1] Rationalism. [2] Empiricism. [3] Senses, imagination and feelings.
[4] Notions. [5] Perception and conception

জ্ঞানের অন্যান্য সকল বিভাগেই সত্যের আবরক কল্পনার প্রসার আছে। প্রাকৃতিক নিয়মের খাঁটি ধারণা করিতে পারিলেই, তাহা হইতে ঈশ্বর ও মানুষের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারা যাইবে।

অল্প বয়সে এই তীক্ষ্ণধী পণ্ডিতের মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ লিখিবার সময় পান নাই।

(৩)

উলফ্ (১৬৭৯—১৭৫৪)

ক্রিশ্চিয়ান উলফের জন্ম হইয়াছিল ব্রেসল নগরে। অল্প বয়সেই তাঁহার গাণিতিক ও ঔপপত্তিক প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষিত হইয়াছিল। ছাত্রাবস্থায় চিরন্‌হউসেনের Medicina Mentis গ্রন্থদ্বারা তিনি বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। লাইপজিক্ নগরে যখন তিনি কলেজ টিউটর ছিলেন, তখন তিনি লাইবনিট্‌জের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং তাঁহার চেষ্টায় Halle বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা-শক্তিতে ছাত্রেরা মুগ্ধ হইত, এবং বহু লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে তাঁহার ক্লাসে আসিত। কিন্তু প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার মত Pietist সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহার দুইজন সহকর্ম্মীর মনঃপূত না হওয়ায়, তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। ফলে উলফ রাজাদেশে অধ্যাপকপদ হইতে বিতাড়িত এবং Halle নগর হইতে বহিষ্কৃত হন। ফ্রেডারিক দি গ্রেট উলফের দর্শনের অনুরাগী ছিলেন। তিনি প্রাসিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব পদে পুনঃস্থাপিত এবং সাম্রাজ্যের ব্যারণ পদে উন্নীত করেন। ১৭৫৪ সালে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

উলফ্ লাইবনিট্‌জের অনেক মত গ্রহণ করিলেও সকলগুলি গ্রহণ করেন নাই। লাইবনিট্‌জের নিকট ঋণ স্বীকার করিলেও, তাঁহার দর্শন যে লাইবনিট্‌জের দর্শন হইতে অভিন্ন, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার কোনও শিষ্য তাঁহার দর্শনকে লাইবনিট্‌জ-উল্‌ফীয় দর্শন নামে অভিহিত করায় তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি স্বতন্ত্র কোনও দার্শনিক প্রস্থানের উদ্‌ভাবন করেন নাই। অন্যের চিন্তা সাধারণের বোধগম্য করিবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তাঁহার দর্শনের মৌলিকতার কোনও দাবি ছিল না। লাইবনিট্‌জের দর্শন তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় সুন্দর যুক্তিদ্বারা বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উচ্চতর তত্ত্বাবলী এবং ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনাপূর্ণ ইঙ্গিতসমূহ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার দর্শন কার্য্যতঃ কতকগুলি সংজ্ঞার তালিকায় পরিণত হইয়াছিল।

উল্‌ফের কৃতিত্ব ত্রিবিধ। বহু দিন পরে তিনিই প্রথমে আবার জ্ঞানের সমগ্র ক্ষেত্রকে দর্শনের বিষয় বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন। সামাগ্রক জ্ঞানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ-সংবলিত দার্শনিক মতের সুষমা-মণ্ডিত এক সৌধ তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সৌধের উপাদান-সমূহের মধ্যে তাঁহার দান অধিক না থাকিলেও, তিনি যেখানে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া সুকৌশলে দক্ষ স্থপতির মত তাহাদের বিন্যাস করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ

তিনিই পুনরায় দর্শন-আলোচনার পদ্ধতির আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি যে পদ্ধতির সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা গণিত ও সিলজিস্‌মের পদ্ধতি। তাহাতে আলোচ্য বিষয় অপেক্ষা আলোচনার রূপকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল, সত্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহাদ্বারা দার্শনিক বিষয় যে সহজবোধ্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার Elements of Architecture গ্রন্থের অষ্টম প্রতিজ্ঞায় গৃহ কি ভাবে নির্ম্মাণ করা উচিত, তাহার বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন, "যাহাতে দুইজন লোক বিনা অসুবিধায়, বাতায়নে দাঁড়াইতে পারে, এইরূপ প্রশস্ত করিয়া বাতায়ন নির্ম্মাণ করা উচিত।" এই প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে তিনি লিখিয়াছেন, "অন্যের সহিত বাতায়নে দাঁড়াইয়া বাহিরের বস্তু দেখা, একটা প্রচলিত সাধারণ প্রথা। গৃহস্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ করাই যখন স্থপতির কর্ত্তব্য, তখন যাহাতে দুই জন লোক বিনা অসুবিধায় বাতায়নে দাঁড়াইতে পারে, এইরূপ প্রশস্ত করিয়া বাতায়ন নির্ম্মাণ করাই তাহার কর্ত্তব্য। Q. E. D."। এই সহজবোধ্য কথা অতটা বিস্তৃত ভাবে প্রমাণ করিবার কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও, যুক্তির সমস্ত সোপান এই ভাবে বর্ণনা করিলে যে বোধসৌকর্য্য সাধিত হয়, তাহা নিশ্চিত। তৃতীয়তঃ উল্‌ফ্‌ জার্মান ভাষায় দর্শনের আলোচনা করিয়াছিলেন। জার্মান ভাষাকে দর্শনের বাহনে পরিণত করিবার কৃতিত্ব লাইবনিট্‌জের পরে তাঁহারই।

উল্‌ফের মতে দর্শন সম্ভাব্যের বিজ্ঞান,[1] এবং যাহার মধ্যে কোনও বিরোধ[2] নাই, তাহাই সম্ভাব্য। তিনি অথবা অন্য কোনও দার্শনিক যে যাহা সম্ভাব্য, তাহার সকলই অবগত আছেন, এরূপ দাবি তিনি করেন না, বলিয়াছেন। এই সংজ্ঞাদ্বারা তিনি জ্ঞানের সমগ্র ক্ষেত্রকে দর্শনের ক্ষেত্র বলিয়া দাবি করিতে চাহেন। যদিও বর্ত্তমানে দর্শনের রাজ্য ইহা অপেক্ষা অনেক সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি দর্শনের সংজ্ঞা-নিরূপণের সময় দর্শনের পূর্ণ পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন। কোনও বস্তুই উল্‌ফের মতে এত তুচ্ছ নহে, যে দর্শনে তাহার স্থান নাই। যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, দর্শনে তাহারই স্থান আছে। ঈশ্বরের গুণাবলীর সম্বন্ধে যেমন তিনি আলোচনা করিয়াছেন, তেমনি স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা ও গৃহ নির্ম্মাণ-সম্বন্ধীয় অতি সূক্ষ্ম বিষয়-সম্বন্ধে আলোচনা হইতেও বিরত হন নাই।

উল্‌ফের মতে মানুষের দুইটি বৃত্তি আছে—জ্ঞানবৃত্তি এবং ইচ্ছাবৃত্তি। এই দুই বৃত্তির কার্য্য বিবেচনা করিয়া তিনি দর্শনকে ঔপপত্তিক[3] এবং ব্যবহারিক,[4] এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দর্শনের সর্ব্ববিভাগের আলোচনা-সামর্থ্য-অর্জ্জনের জন্য তর্ক-শাস্ত্র সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় বলিয়াছেন। ঔপপত্তিক দর্শন অথবা তত্ত্ববিজ্ঞান উল্‌ফ্‌ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন:—(১) সত্তাবিজ্ঞান[5] (২) বিশ্ববিজ্ঞান[6] (৩) মনোবিজ্ঞান[7] এবং (৪) প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞান[8]। ব্যবহারিক দর্শনের তিন ভাগ:—(১) চরিত্রনীতি বা কর্ম্মনীতি (ইহার বিষয়

[1] Science of the Possible [2] Contradiction [3] Theoretical
[4] Practical [5] Ontology [6] Cosmology
[7] Psychology [8] Natural Theology

ব্যষ্টি মানব (২) অর্থনীতি (পরিবারের অঙ্গস্বরূপ মানুষ এই শাস্ত্রের বিষয়) (৩) রাষ্ট্রনীতি (রাষ্ট্রের অঙ্গস্বরূপ মানুষ ইহার বিষয়)।

সত্তাবিজ্ঞান

দর্শনের এই ভাগে সত্তার ভিত্তির আলোচনা আছে। চিন্তার মূলে অবস্থিত প্রকারগণ[1] এই ভিত্তি। আরিস্টটলই প্রথমে প্রকারদিগের এক তালিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত জ্ঞানের পরীক্ষা করিয়া তিনি এই গুলির আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ-আবিষ্কারের জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই। উল্‌ফ্‌ও সে সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান করেন নাই। তিনিও প্রকারদিগের তালিকামাত্র দিয়াছেন। এই তালিকায় প্রকারদিগের প্রথমেই বিরোধের প্রতিজ্ঞা স্থান পাইয়াছে। "কোনও পদার্থই একই সময়ে আছে ও নাই, ইহা হইতে পারে না," বিরোধের এই প্রতিজ্ঞা হইতে উল্‌ফ্‌ পর্য্যাপ্ত কারণের নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছেন। অভাব[2] এবং ভাবের[3] মধ্যে অনতিক্রম্য প্রভেদ বর্ত্তমান। গ্রীকদর্শনে ভাব ও অভাবের মধ্যে ছিল, ভবন[4]; কিন্তু উল্‌ফ্‌ তাহার উল্লেখ করেন নাই। বিরোধের নিয়মের পরে "সম্ভাব্যের" প্রত্যয়। যাহার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, তাহাই সম্ভাব্য। সম্ভাব্যের বিপরীত প্রত্যয় "নিয়তি" অথবা অবশ্যকতা[5]। যাহার বিপরীতের মধ্যে স্ববিরোধ বর্ত্তমান, তাহাই অবশ্যক অথবা নিয়ত। যাহার বিপরীত তুল্যরূপেই সম্ভাব্য, অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব নিয়ত নহে, যাহার অস্তিত্ব না থাকিলেও পারিত, তাহাই আগন্তুক বা আপেক্ষিক। যাহাই সম্ভাব্য, কাল্পনিক হইলেও তাহা ভাবাত্মক। আবার যাহার অস্তিত্ব নাই, এবং যাহা সম্ভবপরও নহে, তাহা অভাব, তাহা কিছুই না। যখন কোনও বস্তু বহু বস্তুদ্বারা গঠিত হয়, তখন সেই বস্তুকে "সমগ্র" বলে, এবং যে যে বস্তুদ্বারা তাহা গঠিত হয়, তাহাদিগকে বলে তাহার অংশ। কোনও দ্রব্যের পরিমাণ বলিতে তাহার অংশের সংখ্যা বুঝায়। যদি ক'র মধ্যে এমন কিছু থাকে, যাহাদ্বারা "খ"র অস্তিত্বের কারণ বোধগম্য হয়, তাহা হইলে ক'র মধ্যগত যাহাদ্বারা 'খ' বোধগম্য হয়, তাহা "খ"র ভিত্তি,[6] এবং সমগ্র 'ক', যাহার মধ্যে এই ভিত্তি অবস্থিত, তাহা একটি কারণ[7]। 'ক'র অন্যান্য গুণের ভিত্তি যাহার মধ্যে অবস্থিত, তাহা 'ক'র তত্ত্ব[8]। সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্যের প্রত্যয়দ্বারা উল্‌ফ্‌ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে যাহা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত[9], কেবল তাহাই সৎ, এবং যাহা সৎ, তাহা কেবল বিশেষ। উল্‌ফ্‌ বিভিন্ন-জাতীয় বিশেষের আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষ দ্বিবিধ—মৌলিক ও যৌগিক। ব্যাপ্তি, দেশ, কাল ও গতি প্রভৃতি কেবল যৌগিক বিশেষেরই আছে। মৌলিক বিশেষের মধ্যে ইহাদের কিছুই নাই। এই সকল মৌলিক বিশেষই অবিভাজ্য একক[10] অথবা মনাদ।

---

[1] Categories [2] Nothing [3] Something [4] Becoming
[5] Necessity [6] Ground [7] Cause
[8] Principle, nature [9] Determined [10] Unit

ইহাদের শক্তি আছে, কিন্তু জ্ঞান নাই। লাইবনিট্‌জ্‌ যাহাদিগকে আত্মা[1] বলিয়াছেন উল্‌ফের হস্তে তাহারা পরমাণুতে পরিণত হইয়াছে।

যে সকল বস্তু একত্র অবস্থিত, তাহাদের অবস্থানের ক্রমকে উল্‌ফ্‌ "দেশ"[2] বলিয়াছেন, এবং অন্যান্য বস্তুর সহিত যে বিশিষ্ট প্রকারে কোনও বস্তু এক সময়ে বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে "স্থান"[3] বলিয়াছেন। স্থানের পরিবর্ত্তনই গতি। যাহারা অনুবর্ত্তী, তাহাদের ক্রমই কাল।

বিশ্ব-বিজ্ঞান

ইহার বিষয় সমগ্র জগৎ। দেশ ও কালে অবস্থিত বস্তুসকলের সমষ্টিই জগৎ। গতিদ্বারাই সমস্ত পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয়, এই জন্য উল্‌ফ্‌ জগৎকে একটি যন্ত্র বলিয়াছেন। ঘড়ির সহিত জগতের উপমা দেওয়া যাইতে পারে। ঘড়ির প্রত্যেক অংশই ঘড়ি চালাইবার জন্য আবশ্যক। জগতেরও প্রত্যেক অংশ অপরিহার্য্য। জগতের উপাদানাবলীর বৃদ্ধি অথবা হ্রাস কিছুই সম্ভবপর নহে। জগতের উপাদান প্রত্যেক বস্তু পরিণামী। তাহারা পাশাপাশি অবস্থিত, এবং পরস্পরের অনুগামী, কিন্তু এমনভাবে পরস্পর সম্বদ্ধ, যে প্রত্যেকের মধ্যে অন্যের অস্তিত্বের ভিত্তি নিহিত আছে। বস্তু সকলের মধ্যে হয় দেশ, নতুবা কালের সম্বন্ধ বর্ত্তমান। উপাদানসকলের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধের অস্তিত্ববশতঃ জগৎ এক বলিয়া পরিগণিত। ইহা একটি যৌগিক পদার্থ। যে ভাবে এই সকল পদার্থের সমবায়ে জগৎ গঠিত হইয়াছে, তাহাই জগতের প্রকৃতি। এই ভাব[4] অপরিবর্ত্তনীয়। জগতের যাবতীয় পরিবর্ত্তনের হেতু জগতের প্রকৃতি। জাগতিক ঘটনাবলী তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলীর ফল বলিয়া আপেক্ষিক ভাবে অবশ্যক[5], কিন্তু জগৎ অন্যরূপে গঠিত হইতেও পারিত, সেই হিসাবে ইহারা আগন্তুক[6]। জগৎ কালে সৃষ্ট কিনা, এই বিষয়ে উল্‌ফ্‌ দ্বিধাহীন নহেন। ঈশ্বর যে অর্থে সনাতন, সে অর্থে জগৎ সনাতন নহে। কেননা, ঈশ্বর কালাতীত। তবুও কালে জগতের আরম্ভ হয় নাই। দেশ ও কাল বাস্তব পদার্থ নহে। যাহা জড়দ্বারা গঠিত এবং যাহাতে গতি-উৎপাদন-শক্তি বর্ত্তমান, তাহাকে উল্‌ফ্‌ বলিয়াছেন পিণ্ড[7]। পিণ্ডের মধ্যে যে সকল শক্তি আছে, সমবেত ভাবে তাহারা তাহার প্রকৃতি। আবার সমস্ত বস্তুর সমষ্টিও "প্রকৃতি"। জগতের প্রকৃতির মধ্যে যাহার ভিত্তি নিহিত, তাহাই প্রাকৃতিক; যাহার ভিত্তি তাহা নয়, তাহা অপ্রাকৃত, তাহা miracle। উল্‌ফ্‌ জগতের উদ্দেশ্যমূলক কারণের আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক বস্তুর আলোচনা করিবার সময় একদিকে যেমন তাহার উৎপাদক কারণাবলীর বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে, তেমনি অন্য দিকে তাহাদ্বারা কি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে, তাহার আলোচনাও আবশ্যক। সুতরাং কেবল তাহাদের যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নহে। জগতের উদ্দেশ্যের

---

[1] Soul [2] Space [3] Place [4] Mode.
[5] Hypothetically necessary [6] Contingent [7] Body

আলোচনাও আবশ্যক। এই জগৎ সকল প্রকার জগতের মধ্যে উৎকৃষ্টতম। ঈশ্বর ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন, কেবল সেই জন্য নহে; জগতের যত প্রকার উদ্দেশ্যের কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম উদ্দেশ্য জগৎদ্বারা সাধিত হইতেছে, সে জন্যও বটে। জগতের যাবতীয় দ্রব্যই—ভাল, মন্দ, সকলই মিলিত হইয়া একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে—সমগ্রের মঙ্গল সাধন করিতেছে। ইহাতেই জগতের পূর্ণতা।

মনোবিজ্ঞান

এই বিজ্ঞানে "আত্মা"র বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে যে পদার্থ আপনাকে জানে, তাহাই জীবাত্মা। জীবাত্মা যেমন আপনাকে জানে, তেমনি অন্য বস্তুও জানে। সংবিদ্ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয়বিধ। স্পষ্ট সংবিদ্‌ই চিন্তা। জীবাত্মা মৌলিক ও দেহহীন বস্তু। জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি জীবাত্মার আছে। এই অর্থে ইতর জন্তুরও আত্মা আছে. বলা যায়। যে জীবাত্মার বুদ্ধি এবং ইচ্ছা আছে, তাহাকে spirit বলে। মানুষ ভিন্ন অন্য কাহারও spirit নাই। দেহাধিষ্ঠিত spiritই জীবাত্মা। দেহাধিষ্ঠিততাই মানুষ এবং উচ্চতর জীবের মধ্যে পার্থক্য। প্রাক্ প্রতিষ্ঠিত সংগতির জন্যই দেহের ও জীবাত্মার কার্য্যের মধ্যে সমতা; দুইটি সম্ভাব্য বস্তুর মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্টতর, তাহা স্থির করিয়া উৎকৃষ্টতরটি নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতাই ইচ্ছার স্বাধীনতা। কিন্তু এই নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তনা ব্যতিরেকে হয় না, প্রবর্ত্তনা[1] ব্যতীত ইচ্ছা-শক্তি কিছুই বাছিয়া লয় না। যাহাকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে, তাহাই কেবল বাছিয়া লয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে "ইচ্ছা" তাহার স্বকীয় "প্রত্যয়" দ্বারাই—জ্ঞান দ্বারাই—কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু বুদ্ধির এরূপ কোনও বাধ্যতা নাই। কোনও কিছুই ভাল অথবা মন্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে বুদ্ধি বাধ্য নহে। সুতরাং বুদ্ধি-প্রণোদিত ইচ্ছাও কিছুর অধীন নহে, তাহা স্বাধীন। মৌলিক পদার্থ বলিয়া জীবাত্মা অবিভাজ্য, সুতরাং অমর। ইতর জীবের বুদ্ধি নাই, সেইজন্য মৃত্যুর পরে তাহারা গত জীবনের বিষয় চিন্তা করিতে পারে না। কেবল মানবাত্মাই এইরূপ চিন্তায় সমর্থ। সেই জন্য মানবাত্মাই কেবল অবিনশ্বর।

ধর্ম্মবিজ্ঞান

উল্‌ফ্‌ বিশ্ববৈজ্ঞানিক প্রমাণদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্বে উল্‌ফ্ লাইব্‌নিট্‌জের মতেরই কেবল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; জগৎকে তিনি অন্য যে কোনও রূপ দিতে পারিতেন। তাহা যখন তিনি দেন নাই, বর্ত্তমান জগৎই যখন তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাহাকেই সর্ব্বোত্তম জগৎ বলিতে হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতেই এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ণতা-প্রকাশই এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জগতে যে অমঙ্গল আছে, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত হয় নাই; মানুষের সীমাবদ্ধ

[1] Motive,

স্বরূপই অমঙ্গলের অস্তিত্বের কারণ। অমঙ্গলও মঙ্গলের সাধন বলিয়া ঈশ্বর অমঙ্গলের অস্তিত্ব অনুমোদন করিয়াছেন।

ব্যবহারিক দর্শন

ব্যবহারিক দর্শনে উল্‌ফের স্বকীয় মত অধিকতর ব্যক্ত হইয়াছে। যুক্তিই ইচ্ছার প্রয়োগের মূলতত্ত্ব। যুক্তিদ্বারাই ইচ্ছা চালিত হয়। যাহা কল্যাণকর, তাহা নিজের জন্যই কল্যাণকর, অন্য কিছু অথবা কাহারও জন্য নহে। ঈশ্বর যদি নাও থাকিতেন, তাহা হইলেও, যাহা কল্যাণকর, তাহা কল্যাণকরই হইত। সুখ নহে, পূর্ণতাই জীবনের লক্ষ্য।

মানুষ তাহার ব্যক্তিগত স্বরূপেই কর্ম্ম-নীতির বিষয়। মানুষের সৎগুণ[1], তাহার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য, এ সকলই কর্ম্ম-নীতির অন্তর্গত। পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়াই আমরা পূর্ণতা-লাভ করিতে সমর্থ হই। এই নীতিই অন্যের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যের ভিত্তি। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই আমাদের প্রতিবেশীর সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের পূর্ণতাসাধন[2] যে সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক, তাহারা ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মসকলের অন্তর্গত। আমাদের কর্ম্মদ্বারা যে ঈশ্বরের পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে, ইহা বলা উল্‌ফের অভিপ্রেত নহে। ঈশ্বর তো পূর্ণই। কিন্তু তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, যদি আমরা তাহা করি, প্রকৃতিতে এবং মানবজীবনে তাঁহার সৃষ্ট যে সকল নিয়ম প্রকাশিত, আমরা যদি তদনুসারে চলি, তাহা হইলে এক অর্থে আমরা তাঁহার পূর্ণতার সহায়ক হই। ইহা বলাই উল্‌ফের উদ্দেশ্য।

অর্থনীতিতে পারিবারিক জীবন, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, পিতামাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধ, প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধ-বিষয়ে সাধারণ ভাবে আলোচনা আছে। রাষ্ট্রনীতিতে রাষ্ট্রের অঙ্গস্বরূপে মানুষের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, চুক্তি প্রভৃতির আলোচনা এই খণ্ডে আছে। পরস্পরের সাহায্যের ও নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে চুক্তি হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। রাষ্ট্রের মঙ্গল ও শান্তিই রাষ্ট্রস্থ জনগণের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে লাইবনিট্‌জ ও উল্‌ফের দর্শনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উপলব্ধি হইবে। কিন্তু সাধারণের বোধসৌকর্য্যের জন্য উল্‌ফ্‌ দর্শনকে যে রূপ দিয়াছেন, তাহাতে লাইবনিট্‌জের দর্শনের গভীরতার অভাব উপলব্ধ হয়। লাইবনিট্‌জের মনাদ-বিজ্ঞানের বিশেষত্ব উল্‌ফের দর্শনে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৌলিক বস্তু লাইবনিট্‌জের মনাদের মত চৈতন্যবান পদার্থ নহে। তাহারা অচেতন পরমাণুর মত

[1] Virtue [2] Divine Perfection

বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। সেই জন্যই তাঁহার দর্শনে বহু অসংগতির উদ্ভব হইয়াছে। ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধের আলোচনা-কালে তিনি কোনও স্থানে ঈশ্বরকে মানুষের সদৃশ কিন্তু তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিরূপে, কোথাও বা মানুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কখনও বিশুদ্ধ পরমাণবিক জড়বাদের দিকে, কখনও সর্বেশ্বরবাদের দিকে তিনি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। দেহ ও দেহস্থ আত্মার মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি লাইবনিট্জের প্রাক-প্রতিষ্ঠিত-সংগতি-বাদের আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দর্শনের সহিত এই মতের কোনও আঙ্গিক সম্বন্ধ নাই।

উল্‌ফের সুস্পষ্ট ভাষা এবং তাঁহার বর্ণনার সৌন্দর্য্যে অনেকেই তাঁহার দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। জার্মান ভাষায় লিখিত বলিয়া ইহার আকর্ষণ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অচিরে জনসাধারণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার হইয়াছিল। ফলে জার্মানিতে এক লোকায়ত্ত দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল। বহুসংখ্যক লেখক আবির্ভূত হইয়া এই দর্শন জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ এই জন্য জার্মান জ্ঞানালোকবিস্তারের যুগ নামে অভিহিত হইয়াছে।

(৪)

লোকায়ত্ত দর্শন

লাইবনিট্জ-উল্‌ফ-দর্শনদ্বারা প্রভাবিত হইলেও, তাহার সহিত এই লোকায়ত্ত দর্শনের কোনও মৌলিক সংযোগ ছিল না। ইহার নিজেরও মৌলিকতার কোনও দাবি ছিল না। ইহা ছিল সমন্বয়মূলক দর্শন। বিভিন্ন দর্শন হইতে নানা মত ইহাতে গৃহীত হইয়াছিল। সাধারণ সংস্কৃতির সহিত ইহার যতটা সম্বন্ধ, দর্শনের ইতিহাসের সহিত ততটা ছিল না। জনসাধারণের মানসিক সংকীর্ণতা বিদূরিত করিয়া উদার মতের প্রচলনই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, স্বগত উক্তি, প্রভাত চিন্তা প্রভৃতি আকারে এই দার্শনিক সাহিত্য রূপায়িত হইয়াছিল। ফরাসী আলোকবিস্তারের যুগে বস্তুবাদ চরম জড়বাদে পরিণতি লাভ করিয়াছিল; বাহ্য জগতের আসন মানব-মনের উপরি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। জার্মান জ্ঞানালোকের আন্দোলন ইহার বিপরীতমুখী ছিল। ইহার গতি ছিল চরম বিষয়ীমুখিতা বা ভাব-বাদের দিকে, এবং বিষয়-প্রভাব-বর্জ্জিত অধ্যাত্মবাদদ্বারা এই যুগের দার্শনিক চিন্তা অভিভূত হইয়াছিল। এই মতাবলম্বী দার্শনিকদিগের নিকট জীবাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। তাহার স্বার্থ, তাহার উন্নতি এবং তাহার তৃপ্তিই সর্ব্বকামনার লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। জীবাত্মার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়ক রূপেই অন্যান্য পদার্থের মূল্য; তাহা ভিন্ন তাহাদের অন্য কোনও মূল্য স্বীকৃত হয় নাই। এই জন্যই জীবাত্মার অমরতা এই দর্শনে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয় নাই, কেননা ঈশ্বরের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে বুদ্ধিদ্বারা কিছুই জানা যায় না, ইহা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছিল।

ফ্রান্সের জড়বাদ জার্মানিতে গৃহীত না হইলেও, এই উদার লোকায়ত্ত দর্শনদ্বারা কুসংস্কার বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছিল। মানব-মঙ্গলই যে দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা এই দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছিল। রেইমেরাস্[1] ধর্ম্মের গৌরব-সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন, যে ধর্ম্মদ্বারা পার্থিব ভোগ-সুখের বিনাশ না হইয়া বৃদ্ধিই হয়। স্টেইনবার্ট[2] (১৭৩৮-১৮০৯) তাঁহার গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে আনন্দ ও শান্তিই জীবনের উদ্দেশ্য, এবং স্থায়ী সুখ-প্রাপ্তিতেই জ্ঞানের চরিতার্থতা। খৃষ্টধর্ম্ম এই সুখের কোনও বাধার সৃষ্টি করে না, তাহা চিরসুখ-প্রাপ্তিরই উপায়। ওয়াইল্যাণ্ড[3] লিখিয়াছিলেন, সকল প্রাণীর, বিশেষতঃ মানুষের, কামনার প্রধান বিষয়ই আনন্দ। এই আনন্দ-প্রাপ্তির নিশ্চিত উপায় হইতেছে জ্ঞানালোকে আত্মার উদ্‌ভাসন, ধর্ম্মে অনুরাগ, মৈত্রী এবং যাহা সুন্দর ও মহৎ, তাহার সহিত অনুভূতির যোগ। ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধার্ম্মিক জীবনের প্রধান রক্ষাকবচ।

স্পেনার[4], সাল্‌ট্‌জ[5] এবং আর্ণল্‌ড্ প্রভৃতি মনীষিগণ এই সময় ধর্ম্মবিশ্বাসকে প্রচলিত ধর্ম্মমত এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, জনসাধারণের আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নততর প্রকাশলাভে সহায়তা করিয়াছিলেন। ফরাসী দেশের জ্ঞানালোকের ফল হইয়াছিল নাস্তিকতা; জার্মানিতে তাহার ফল হইয়াছিল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা।

মেণ্ডেল্‌সন্ (১৭২৯-৮৬)

এই যুগের লেখকদিগের মধ্যে মোজেস্ মেণ্ডেলসন, ফ্রেডারিক নিকোলাই এবং লেসিং সুপ্রসিদ্ধ। মেণ্ডেলসন্ জাতিতে ইহুদী ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। অল্পবয়সেই তিনি পুরাতন বাইবেল কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিনি বার্লিন গমন করেন। তথায় জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অবশেষে বহু কষ্টে এক বণিকের হিসাবরক্ষকের পদলাভে সমর্থ হন। বণিকের মৃত্যুর পর তিনি তাহার ব্যবসায়ে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দর্শনের আলোচনাই তাঁহার জীবনের প্রধান কাজ ছিল। তাঁহার চরিত্র অতি সুন্দর ছিল। দর্শনের ইতিহাসে এরূপ মনোমুগ্ধকর চরিত্র অধিক দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তাঁহার চিন্তার গভীরতা অধিক ছিল না, মৌলিকতার দাবিও তাঁহার ছিল না। বহু স্থান হইতে রত্নরাজি সংগৃহীত করিয়া তিনি একত্রিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখনীর স্পর্শে তাহারা সমুজ্জ্বল ও মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিল। জগতে সংস্কৃতির প্রসারে এবং মানব-কল্যাণে তাহার নিয়োগের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, মেণ্ডেলসন তাঁহাদের মধ্যে মহত্তমদিগের অন্যতম। এই সকল লোক অন্যের চিন্তাবাহক হইলেও, অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী দার্শনিকদিগের অপেক্ষা জনসাধারণ ইহাদের দ্বারাই অধিক উপকৃত হয়।

[1] Reimarns [2] Steinbart [3] Wieland
[4] Spener [5] Schultz

ঈশ্বরে মেণ্ডেলসনের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার অনাড়ম্বর সরল জীবন, ঐহিক ভোগে অনাসক্তি এবং ঈশ্বরে অবিচলিত নির্ভরের জন্য অনেকে সক্রেটিস এবং স্পিনোজার সহিত তাঁহার উপমা দিয়াছেন। জ্ঞান-প্রচারেই তাঁহার লেখনী নিয়োজিত থাকিলেও পৈতৃক ধর্ম্মে তিনি বিশ্বাস হারান নাই। স্বধর্ম্মীদিগকে সংকীর্ণ সংস্কার হইতে মুক্ত করা তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রধান এইগুলি: (১) Letters on the Sensations (১৭৫৫) (২) Evidence in Metaphysics (১৭৬৩) (৩) Phaedon (১৭৬৭) (৪) Jerusalem (১৭৮৩) (৫) Morning Hours.

Phaedon গ্রন্থ কথোপকথন-ছলে লিখিত। এই গ্রন্থে মেণ্ডেলসন জীবাত্মার অমরতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। Jerusalem গ্রন্থে তিনি ইহুদীধর্ম্মের বিরুদ্ধে আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। Morning Hours গ্রন্থে তিনি সর্ব্বেশ্বরবাদের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দর্শনে মেণ্ডেলসন্ লাইবনিট্জ্ এবং উল্ফের অনুগামী ছিলেন। লক্ ও স্তাফ্ট্সবেরির প্রভাবও তাঁহার উপর ছিল। তত্ত্ববিদ্যাকে তিনি তাঁহার "রাণী" বলিয়াছেন, এবং মানুষের আধ্যাত্মিক সুখ ও শান্তিই তিনি তত্ত্ববিদ্যার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। এই আধ্যাত্মিক সুখ ও শান্তি কিসে পাওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য মানব-প্রকৃতির পরীক্ষা করিতে হয়। কামনা, অনুভূতি এবং প্রজ্ঞা, এই তিনটি আমাদের জ্ঞানের উৎস। কামনা এবং প্রজ্ঞার মধ্যে সংযোগ-সূত্র অনুভূতি অথবা সংবেদন। সুখ অথবা দুঃখ সংবেদনের অব্যবহিত বিষয়। মেণ্ডেলসন্ ত্রিবিধ সংবেদনের কথা বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়জাত সুখ, সৌন্দর্য্যবোধ এবং পূর্ণতার আনন্দ। প্রাক্ প্রতিষ্ঠিত সংগতিবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। দেহ ও আত্মার মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কারণ তিনি অজ্ঞাত বলিয়াছেন। মানব-চরিত্রের মানদণ্ডের আলোচনায় মেণ্ডেলসন বলিয়াছেন, আমাদের প্রকৃতির ভিত্তিভূমি যে সংস্কার[১], তাহাদ্বারাই আমাদের ইচ্ছা পরিচালিত এবং কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ হইতেই এই সংস্কার উদ্ভূত। সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া কেহই থাকিতে পারে না। সমাজ-প্রিয়তা হইতে উদ্ভূত সৎগুণ[২], ন্যায়-পরায়ণতা এবং মৈত্রীই এই জন্য অধ্যাত্মিক সুখ ও শান্তির উপকরণ। নৈতিক[৩] জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম এই, "তোমার নিজের এবং তোমার প্রতিবাসীর মানসিক অবস্থা এবং বাহ্যিক অবস্থা যথাসম্ভব নির্দ্দোষ[১] করিবার জন্য চেষ্টা কর।"

Evidence in Metaphysics গ্রন্থে মেণ্ডেলসন ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে সকল প্রমাণ আছে, তাহাদের আলোচনা করিয়াছেন, এবং সত্তামূলক প্রমাণকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "হয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসম্ভব, অথবা তিনি আছেন।" অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাহা কেবল সম্ভবপর নহে, তাহা নিশ্চিত। ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা হইতে তাঁহার অস্তিত্ব-প্রমাণই সত্তামূলক প্রমাণ।

---

[1] Instinct [2] Virtue [3] Perfect

Jerusalem গ্রন্থে মেণ্ডেলসন ইহুদীধর্ম্মের সমর্থন করিয়াছেন। ক্যাণ্ট এই গ্রন্থকে তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। Phaedon গ্রন্থে জীবাত্মার অমরতা আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সক্রেটিস্‌কে অষ্টাদশ শতাব্দীর বার্লিনের অধিবাসিরূপে উপস্থাপিত করিয়া মেণ্ডেলসন তাঁহাদ্বারা ধর্ম্মের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মৃত্যুর পরে সকলের অবস্থাই সুখকর হইবে। জীবাত্মা অবিনশ্বর। প্রকৃতির মধ্যে কোথাও আত্যন্তিক বিনাশ নাই। বস্তুর পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু তাহার "অভাব" হয় না। দেহ অপেক্ষা দেহী আত্মা কখনও অল্পতর স্থায়ী হইতে পারে না। (দেহ=দেহের উপাদান পদার্থ)। ঈশ্বর যে মানুষকে দুঃখের জন্য সৃষ্টি করিবেন, তাহা কল্পনা করা অসম্ভব। পূর্ণতা যাহার উদ্দেশ্য, তাদৃশ মানবের আকাঙ্ক্ষা যে ব্যর্থতা ও পরিহাসে পর্য্যবসিত হইবে, ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব। ধনী, দরিদ্র, সুখী, দুঃখী প্রভৃতির মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান। এই অসাম্যের সমীকরণের জন্যও জীবাত্মার অমরতার প্রয়োজন। এই সকল যুক্তিদ্বারা মেণ্ডেলসন জীবাত্মার অমরতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

নিকোলাই (১৭৩৩-১৮১১)

ফ্রেডারিক নিকোলাই মেণ্ডেলসন এবং লেসিংএর বন্ধু ছিলেন। গ্রন্থ-সম্পাদন ও প্রকাশন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তিনি জ্ঞান-প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কুড়ি বৎসর যাবত নানা বিষয়ের গ্রন্থ তিনি জার্মান ভাষায় প্রকাশিত করেন। তদানীন্তন সকল বিখ্যাত লোকই তাঁহাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য-প্রকাশদ্বারা জ্ঞান-প্রচারে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কতকগুলি প্রবন্ধ, সমালোচনা এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে লিখিত পত্রে তাঁহার দার্শনিক মত লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাহাতে কোনও বিশেষত্ব নাই। দার্শনিক পরিভাষা তিনি বেশী ব্যবহার করেন নাই; সাধারণবোধ্য ভাষায় তিনি দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। কুসংস্কার ও পরম্পরাগত বিশ্বাস ও আচারের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। ফ্রেডারিক দি গ্রেটএর উদার মতের জন্য তিনি তাহার অনুরাগী ছিলেন। "সাধারণের মঙ্গল" তাঁহার রচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মতে পরের মঙ্গলেই প্রত্যেকের মঙ্গল। মেণ্ডেলসনের আধ্যাত্মিকতা তাঁহার মধ্যে ছিল না; সাহিত্যিক প্রতিভাতেও তিনি লেসিংএর সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না।

লেসিং

উৎকৃষ্ট সমালোচক ও সাহিত্যিক বলিয়া লেসিংএর নাম জার্মান সাহিত্যে বিখ্যাত। দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও দর্শনে তাঁহার মৌলিক দান কিছু নাই। তিনি লাইবনিট্‌জের শিষ্য হইলেও, তাঁহার সকল মত গ্রহণ করেন নাই। ১৭৮০ সালে তিনি জেকোবিকে

বলিয়াছিলেন, যে তিনি স্পিনোজার মতাবলম্বী, এবং তাঁহার মতে দর্শন বলিতে একমাত্র স্পিনোজার দর্শনই আছে। তাঁহার Nathan der Weise গ্রন্থে তিনি যে ইহুদী চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, স্পিনোজার আদর্শেই তাহা অঙ্কিত হইয়াছিল।

লাইবনিট্জের মনাদ-বাদ লেসিং সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি প্রত্যেক জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবাত্মাকে তাহার অন্তর্নিহিত শক্যতা যে স্বকীয় চেষ্টাদ্বারা বিকাশিত করিতে হইবে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু জগতের ঐক্য তিনি অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে জগৎ অসংবদ্ধ বস্তুদিগের সমষ্টিমাত্র নহে। জগতে সত্তার অসংখ্য ক্রমভেদ থাকিলেও, যাবতীয় সত্তা মিলিত হইয়া একত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক জীবাত্মা পূর্ণতা-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে, এবং ক্রমশঃ উচ্চতর অবস্থা-প্রাপ্তির জন্য তাহার পৃথিবীতে একাধিক বার জন্মগ্রহণ অসম্ভব নহে। লাইবনিট্জের উদ্দেশ্যবাদ ও নিয়তিবাদ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বস্তুর সহিত অন্যান্য বস্তুর সম্বন্ধ আছে, এবং যাবতীয় বস্তুই যে এক মহত্তর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বর যে দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি করিতে পারেন না, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন না। তিনি অনন্তনরকবাদের সমর্থন করিয়া মেণ্ডেলসনের মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্বর্গ ও নরক তাঁহার মতে দেশ ও কালে অবস্থিত দুইটি স্থান নহে। মানুষ স্বকর্ম্মদ্বারা যে অবস্থার সৃষ্টি করে, তাহাই স্বর্গ অথবা নরক।

The Reality of things outside of God গ্রন্থে লেসিং যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পিনোজার দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। তিনি স্পিনোজা ও লাইবনিট্জের দর্শনের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। লাইবনিট্জের পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন মনাদ-দিগকে তিনি এক ঈশ্বরের মধ্যে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যাঁহার মধ্যে সকল বস্তু অবস্থিত, যিনি সকল বৈচিত্র্যের আধার এবং যাবতীয় পরিণাম যাঁহার অন্তর্গত, তিনিই ঈশ্বর; এবং যদিও তিনি যাবতীয় বস্তুর বাহিরে অবস্থিত, তথাপি তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই। এমন কোনও পদার্থই নাই, ঈশ্বরের মধ্যে যাহা নাই। যে কোনও বস্তুর ধারণা করা যায়, তাহার প্রত্যয় ঈশ্বরের প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। এবংবিধ ঈশ্বরের ধারণাদ্বারা লেসিং খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরই পিতা; তাঁহার চিন্তাতে পিতৃত্বের অভিব্যক্তি; জগতে সক্রিয় ঈশ্বর পুত্র, তিনি বিধাতা; যিনি আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, তিনি এবং তাঁহার প্রকাশিত রূপ, উভয়ের সম্মিলন পবিত্র আত্মা। তাঁহাতে জ্ঞান ও সক্রিয় শক্তি উভয়ই মিলিত হইয়াছে। জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর এবং জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা ঈশ্বর তাঁহারই দুইরূপ।

লেসিং ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীনচেতা এবং পরমত-সহিষ্ণুতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার Nathan der Weise গ্রন্থে তিনি একজন মুসলমান, একজন ইহুদী এবং একজন খৃষ্টানের চরিত্রবর্ণনদ্বারা পরমতসহিষ্ণুতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। গ্রন্থে বর্ণিত মূলকথা এই, যে কেহ যদি মানুষকে ভালবাসে এবং তাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাকে,

তাহা হইলে, তাহার ধর্ম্মমত যাহাই হউক, কিছুই আসে যায় না। আমরা যে মানুষ ইহাই বড় কথা, আমরা খৃষ্টান, ইহুদী অথবা মুসলমান কি না, তাহা নয়।

লেসিংএর বন্ধু রেইম্যারাস্ Wolffen buttel নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাবলীর সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছিল। গ্রন্থকারের নাম না দিয়া লেসিং এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ফলে লোকে লেসিংকে এই গ্রন্থের লেখক বলিয়া মনে করিয়াছিল, এবং ইহা লইয়া তিক্ত বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই গ্রন্থে বিবৃত মতের সহিত লেসিংএর মতের যে সম্পূর্ণ মিল ছিল, তাহা নহে। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে বাইবেলে বর্ণিত ধর্ম্মমতের সত্যতা তাহ'তে বর্ণিত ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে না।

Dramaturgy গ্রন্থে লেসিং সেক্স্‌পিয়ারকে আদর্শ নাট্যকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং প্রচলিত ফরাসী নাট্যরীতির সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার Laokoon গ্রন্থে "কলার দর্শন"[১] ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তিনি ভাস্কর্য্য, চিত্র-বিদ্যা এবং কবিতার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছেন, এবং তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এডমণ্ড বার্কের A philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas on the Sublime and Beautiful গ্রন্থ হইতে লেসিং তাঁহার গ্রন্থ-প্রণয়নে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়ছিলেন।* বার্কের গ্রন্থ পড়িয়া লেসিং এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে তিনি তাহার অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার Laokoon সৌন্দর্য্যের বিজ্ঞান-সম্বন্ধে তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

লেসিং সত্যের উপাসক ছিলেন। তিনি সত্যের অনুসন্ধান করিতেন সত্যের জন্য, তাহা হইতে যে আনন্দ ও শান্তিলাভ হয়, তাহার জন্য নহে। তাঁহার মতে দর্শনের প্রকৃত আলোচ্য বিষয় হইতেছে মানুষ, পূর্ণ আদর্শ মানুষ। মানবজাতির পূর্ণতা জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের পূর্ণতাদ্বারাই সাধিত হয়। সুতরাং ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অঙ্গ বলিয়া গণ্য না করিয়া, রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ব্যক্তির প্রয়োজন-সাধনের জন্য বলিয়া গণ্য করা উচিত। শাসনতন্ত্র, চার্চ্চ, এবং যাবতীয় রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান, সকলই অনিষ্টকর, কিন্তু অপরিহার্য্য। ইহারা সুনীতির রক্ষক এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার সহায়ক। লেসিং দেশ-প্রেমের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি চাহিতেন বিশ্বপ্রেম। সকলেই আপনাকে বিশ্ব-বাসী বলিয়া মনে করে, ইহাই তাঁহার কাম্য ছিল! জাতি, ধর্ম্ম ও পদমর্য্যাদার সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া কেবল মানুষ নামে পরিচিত হওয়াই, তাঁহার মতে, সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সত্য কোনও পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার বাহিরে সত্য নাই, ইহা লেসিং বিশ্বাস করিতেন-না। চার্চ্চের নৈষ্ঠিক গোড়ামি যেমন তিনি পছন্দ করিতেন না, তেমনি তৎকালীন স্বাধীনচিন্তার উপাসকদিগের স্থূল যুক্তিও তাঁহার প্রীতিকর ছিল

না। ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ও তাহার সারভাগের মধ্যে তিনি পার্থক্য করিতেন। তাঁহার মতে বিশ্বাসের বস্তু খৃষ্ট স্বয়ং, বাইবেল নহে। সত্য যে চিরকালের জন্ত একবার-মাত্র কাহারও মুখ হইতে অথবা কোনও গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নহে। সত্য ক্রমশঃই বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে। মানবের ইতিহাসে ঈশ্বর আপনাকে ক্রমশঃ প্রকাশিত করিতেছেন। মানবজীবনে তাঁহার চিন্তা রূপায়িত করিয়া তিনি মানবজাতির শিক্ষাবিধান করিতেছেন। পৃথিবীতে ধর্ম্ম ক্রমশঃ নিম্ন হইতে উন্নততর রূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহুদী ধর্ম্ম অপেক্ষা খৃষ্টধর্ম্ম উন্নততর। ইহুদী ধর্ম্ম তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাকৃতিক ধর্ম্মদিগের অপেক্ষা উন্নততর। ঈশ্বর ঐহিক সুখের আশাদ্বারা মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু এক সময় আসিবে, যখন পার্থিব সুখের আশা না করিয়াও মানুষ ন্যায়সঙ্গত পথে চলিবে, পুণ্যের জন্ত পুরস্কারের আশা না করিয়া, এবং পাপের জন্ত শাস্তির ভয়ে ভীত না হইয়া, ঈশ্বরের আদেশ পালন করিবে। তখন ধর্ম্মই ধর্ম্মের পুরস্কার বলিয়া বিবেচিত হইবে। লেসিং সুখকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করেন নাই। জীবাত্মার অমরতায় তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু পরলোকে সুখের আশায় ধর্ম্মাচরণ তিনি সমর্থন করেন নাই।

লেসিং কর্ম্মনীতিকে বিচারহীন মতের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানুষকেও তিনি অন্ধ বিশ্বাস হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ম্মনীতির যে আদর্শের তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন,—নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মের অনুসরণ—তাহা সহজে অধিগম্য নহে। লেসিংএর কয়েকটি উক্তি এই—

(১) মহৎ চিন্তা ব্যতীত মহৎ কর্ম্ম হয় না ! সৎ চিন্তা করার অর্থ সৎ হওয়া ;

(২) সর্ব্বাপেক্ষা মন্থরগতি ব্যক্তি যদি সর্ব্বক্ষণ তাহার উদ্দেশ্য চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া চলে, তাহা হইলে লক্ষ্যহীন কিন্তু দ্রুতগামী ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক দূর যাইতে পারে।

(৩) দানের মর্য্যাদা নির্ভর করে তাহার পরিমাণের উপর নহে, তাহার প্রবৃত্তির উপর।

(৪) ঈশ্বর যদি এক হস্তে পূর্ণ সত্য এবং অন্য হস্তে প্রমাণের মধ্য দিয়া সত্যের প্রতি চিরজাগ্রত তীব্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমাকে বলেন "কোনটি চাও," তা হ'লে আমি বিনীত ভাবে বলিব, "পিতা, পূর্ণ সত্যে একমাত্র তোমারই অধিকার, তোমার বাম হস্তের দান, অনন্ত প্রয়াসই, আমাকে দাও"।

অষ্টম অধ্যায়

জার্মান অধ্যাত্মবাদ

ক্যাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪)

রেনেসাঁর প্রারম্ভে ইয়োরোপে যে জ্ঞানালোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার পূর্ণতম বিকাশ হইয়াছিল জার্ম্মানিতে। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতায় জার্ম্মান জাতি অন্যান্য জাতির নিম্নে পড়িয়া থাকিলেও চিন্তার গভীরতায় তাহারা সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহুসংখ্যক চিন্তা-নায়কের আবির্ভাবের ফলে জার্ম্মান সাহিত্য ও দর্শন অতুলনীয় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইমানুয়েল ক্যাণ্ট দর্শনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দার্শনিক চিন্তা নূতন পথে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, এবং বাহ্যজগৎ এবং মানব-মনের মধ্যে সম্বন্ধের এক নূতন ধারণা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।



ক্যাণ্ট

জার্ম্মান অধ্যাত্মবাদের সূচনা করিয়াছিলেন লাইবনিট্জ। তাঁহার মতে জ্ঞানের উৎপত্তিস্থল মনঃ; জ্ঞানের উৎপাদনে বাহ্য পদার্থের কোনও ক্রিয়া নাই। জ্ঞান বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ। লাইবনিট্জ তাঁহার মতের সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারেন নাই। ক্যাণ্ট

জ্ঞানের বস্তু-নিরপেক্ষতা স্বীকার না করিয়াও, তাহার আকারকে মনের সৃষ্ট বলিয়াছেন, এবং জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়া তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জীবনী

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে প্রাসিয়ার অন্তর্গত কনিগ্‌স্‌বার্গ নগরে ইমানুয়েল ক্যাণ্ট জন্মগ্রহণ করেন। ক্যাণ্টের জন্মের একশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এক পূর্ব্বপুরুষ স্কটল্যাণ্ড হইতে আসিয়া জার্ম্মানিতে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। ক্যাণ্টের পিতা ঘোড়ার জিনের ব্যবসায় করিতেন। মাতা ছিলেন Pietist সম্প্রদায়ভুক্ত প্রটেষ্টাণ্ট। Pietistগণ নিষ্ঠার সহিত ধার্ম্মিক যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করিতেন। এই জন্যে ক্যাণ্টের বাল্যকাল ধার্ম্মিক পরিবেশের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। মাতার সঙ্গে তাঁহাকে প্রত্যহই রীতিমত উপাসনা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে হইত। এই অতিরিক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিক্রিয়ার ফলে তিনি যৌবনে গির্জ্জায় যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের যাহা সার, তাহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিল। সাধু চরিত্রের জন্য ক্যাণ্টের পিতামাতা দরিদ্র হইলেও সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ক্যাণ্টের চরিত্রও তাঁহাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ক্যাণ্টের সমগ্র জীবন কনিগ্‌স্‌বার্গ নগর ও তাহার সান্নিধ্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল। একবার মাত্র কেবল তিনি কনিগ্‌স্‌বার্গের বাহিরে গিয়াছিলেন, তাহাও এক নিকটবর্ত্তী গ্রামে।

১৭৪০ সালে ধর্ম্মবিজ্ঞানের ছাত্ররূপে ক্যাণ্ট কনিগ্‌স্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। পরে দর্শন, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে ১৭৪৭ সালে Thoughts on the True Estimate of Motive Force নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি তাঁহার সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতা-বশতঃ কয়েক বৎসর কনিগ্‌স্‌বার্গ নগরের সান্নিধ্যে কয়েক পরিবারে গৃহশিক্ষকের কার্য্য করিয়া ১৭৫৫ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে Private Lecturer নিযুক্ত হন। এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে তাঁহাকে তর্কবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত, কর্ম্মনীতি, নৃতত্ত্ব এবং প্রাকৃতিক ভূগোল শিক্ষা দিতে হইত। ১৫ বৎসর তাঁহাকে এই নিম্ন পদে থাকিতে হইয়াছিল; দুইবার অধ্যাপক-পদের জন্য তিনি আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু আবেদন মঞ্জুর হয় নাই। পরে ১৭৭০ সালে তিনি তর্কশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি শিক্ষাবিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে শিক্ষাদান-সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট উপদেশ ছিল। কিন্তু ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, যে তাহাদের একটিরও তিনি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন নাই। উত্তম শিক্ষক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল, এবং তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। তিনি বলিতেন, উত্তম, অধম ও মধ্যম, এই তিনশ্রেণীর ছাত্রের মধ্যে প্রতিভাবান উত্তম ছাত্রদিগের শিক্ষকের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, এবং বুদ্ধিহীন অধম ছাত্রদিগের জন্য পরিশ্রম নিষ্ফল হয়; মধ্যম শ্রেণীর ছাত্রদিগের প্রতি শিক্ষকের অধিক মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ক্যাণ্টের আড়ম্বরহীন বিনম্র ব্যবহার দেখিয়া কেহই তাঁহার নিকট হইতে অসাধারণ কিছু প্রত্যাশা করে নাই, এবং তিনি যে কোনও নূতন দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া সকলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া দিতে পারেন, ইহা কেহ কখনও ভাবিতে পারে নাই। নিজেও তিনি এমন কিছু করিবেন বলিয়া ক্যাণ্ট আশা করেন নাই। ৪২ বৎসর যখন তাঁহার বয়স, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে তত্ত্ববিদ্যার প্রতি আমার অনুরাগ আছে, কিন্তু আমার দয়িতা আমার প্রতি কোনও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই।" তত্ত্ববিদ্যাকে[১] তিনি অতলস্পর্শ গহ্বর ও বহু দর্শনের ধ্বংসাবশেষ-সমাকীর্ণ আলোকস্তম্ভবর্জ্জিত অন্ধকারময় মহাসাগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববিদ্যার উপাসকদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন "প্রায়শঃ-ঝটিকাক্রান্ত-কল্পনাশিখরাসীন।" তিনি নিজেই যে প্রবলতম দার্শনিক ঝটিকার সৃষ্টি করিবেন, তখন তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

বহু বিষয়ে ক্যাণ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। গ্রহ, ভূমিকম্প, অগ্নি, ঝটিকা, ইথার, আগ্নেয় গিরি, ভূগোল, জাতিতত্ত্ব—তত্ত্ববিদ্যার সহিত সম্পর্ক-বর্জ্জিত কত বিষয়েই না লিখিয়াছিলেন। তাঁহার Theory of Heavens গ্রন্থে নীহারিকা হইতে নক্ষত্র-জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মত তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সমস্ত গ্রহেই জীবের অস্তিত্ব আছে, অথবা কালক্রমে জীবের উৎপত্তি হইবে; এবং যে সমস্ত গ্রহ সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী, তাহাদের বয়স অন্যান্য গ্রহের বয়স অপেক্ষা অধিক বলিয়া, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যে সকল জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, তথায় তাহা অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান জীব আবির্ভূত হইয়াছে। তাঁহার Anthropology গ্রন্থে নিম্নতম জীব হইতে মানুষের উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমাবস্থায় মানুষ যখন বন্য পশুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ ছিল, তখন মানবশিশু যদি বর্ত্তমান কালের শিশুর মতই কাঁদিত, তাহা হইলে বন্য পশু তাহার সন্ধান পাইয়াই তাহাকে খাইয়া ফেলিত। ইহা হইতে অনুমিত হয়, যে আদিম মানুষের প্রকৃতি সভ্য মানুষের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ছিল। কিন্তু কি উপায়ে প্রকৃতি মানবপ্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন-সাধন করিল? ক্যাণ্ট বলেন, "তাহা জানি না। তবে ইহা হইতে মনে হয়, হয়তো ভবিষ্যতে কোনও প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে ওরাংওটাং ও শিম্পাঞ্জির প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানে তাহারা ভাল ভাবে হাঁটিতে পারে না। বাক্‌যন্ত্র তাহাদের অপরিণত, স্পর্শশক্তিও অতি সামান্য। এই সকল অঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইয়া মানুষের পদ, কণ্ঠ, ও ত্বকের মত হইতে পারে, এবং উন্নত স্নায়ুযন্ত্রের উদ্ভব ও তজ্জন্য বুদ্ধির ক্রম-বিকাশের ফলে সমাজসৃষ্টির দ্বারা তাহারা মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবে পরিণত হইতে পারে।" ভবিষ্যতের এই সম্ভাবনার বর্ণনাদ্বারা কি প্রকারে ইতর জীব হইতে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে, ক্যাণ্ট হয়তো সে সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

[১] Metaphysics

ক্যাণ্টের জীবন সম্পূর্ণভাবে নিয়মানুসারে পরিচালিত হইত। শয্যাত্যাগ, কফিপান, লেখা, বক্তৃতা, ভোজন ও ভ্রমণ সকলই নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পাদিত হইত। তাঁহার জীবনচরিত-লেখক লিখিয়াছেন, "ইমানুয়েল ক্যাণ্ট যখন তাঁহার ধূসর কোট পরিয়া যষ্টি-হস্তে গৃহদ্বারে আবির্ভূত হইয়া রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইতেন, তখন প্রতিবাসীরা বুঝিতে পারিত, যে ঘড়িতে ঠিক সাড়ে তিনটা বাজিয়াছে।" সর্ব্ব ঋতুতে তিনি একই রাস্তায় পাদচারণা করিতেন। আকাশে যখন মেঘ উঠিত, তখন বৃদ্ধ ভৃত্য ল্যাম্প একটা বড় ছাতি বগলে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিত। ক্যাণ্টের ভ্রমণের রাস্তা "দার্শনিকের রাস্তা" নামে পরিচিত হইয়াছিল।

১৭৮২ সালে যখন ক্যাণ্টের বয়স ৫৭ বৎসর তখন তাঁহার Critique of Pure Reason প্রকাশিত হয়। ১৭৮৮ সালে Critique of Practical Reason এবং ১৭৯০ সালে Critique of Judgment প্রকাশিত হয়। ১৭৯৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করিয়াছিলেন। তাহার পরে বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা-বশতঃ অধ্যাপনার কার্য্য করা অসম্ভব হওয়ায় তিনি কার্য্য-ত্যাগ করেন। গ্রন্থ-প্রকাশের পরে জার্ম্মানীর সর্ব্বস্থান হইতে দলে দলে পণ্ডিত ও ছাত্রগণ তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের জন্য আসিতে আরম্ভ করেন। সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ব্যক্তিরাও আসিতেন। জীবনের শেষ ১৭ বৎসর ক্যাণ্ট নগরের এক নিভৃত অংশে একটি ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতেন। তাঁহার জীবন-যাপন-প্রণালী অতি সরল ছিল। জীবনে স্বদেশের বাহিরে না গেলেও ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়া তিনি পৃথিবীর উপরিভাগের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক ভূগোল-সম্বন্ধে তিনি যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ভূপৃষ্ঠের জ্ঞান তাঁহার কত গভীর ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। রুসোর সমস্ত গ্রন্থের সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। Emile যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠে তিনি এতই নিবিষ্ট ছিলেন, যে কয়েকদিন বেড়াইতে বাহির হন নাই।

ক্যাণ্টের শরীর ছিল দুর্ব্বল। কিন্তু চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া তিনি নিজেই নিজের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার বয়স যখন ৭০ বৎসর, তখন "ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগদ্বারা শারীরিক অসুস্থতা-বোধ-দমনে মনের ক্ষমতা" (Power of the Mind to Master the Feeling of Illness by Force of Resolution) শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কেবল নাক দিয়াই নিঃশ্বাস লওয়া উচিত, বিশেষতঃ গৃহের বাহিরে। এই জন্যই হেমন্ত, শীত ও বসন্ত, সকল ঋতুতেই ভ্রমণের সময়ে তিনি কাহারও সহিত কথা বলিতেন না। সর্দি লাগা অপেক্ষা তিনি চুপ করিয়া থাকা ভাল মনে করিতেন। কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যাপারেই সমস্ত বিষয় তিনি ভাবিয়া দেখিতেন। এই জ ন্যই তিনি বিবাহ করেন নাই। দুইবার তাঁহার মনে বিবাহের ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেক বারই বিবাহের প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করিবার জন্য তিনি এত সময় লইয়াছিলেন, যে প্রথম মহিলাটি অপেক্ষা করিতে না পারিয়া অন্য একজনকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং দ্বিতীয় মহিলাটি তিনি মনঃস্থির করিবার পূর্ব্বেই কনিগ্‌স্‌বার্গ ত্যাগ

করিয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বিবাহ করিলে তাঁহার জ্ঞানালোচনায় ব্যাঘাত ঘটিবে, তাঁহার এই ভয় হইয়াছিল।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ৮০ বৎসর বয়সে ক্যাণ্টের মৃত্যু হয়। ক্যাণ্ট দেখিতে নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব ছিলেন; শরীরও ছিল তাঁহার নাতিস্থূল, নাতিকৃশ; চক্ষু ছিল নীলবর্ণ। সত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, ঐকান্তিক সাধুতা এবং বিনীত ব্যবহার তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল।

ক্যাণ্টের দর্শনের পটভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তা ক্যাণ্টের দর্শনদ্বারা যেরূপ গভীর ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, দর্শনের ইতিহাসে অন্য কাহারও দর্শন সেরূপ প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। ক্যাণ্টের দর্শন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার চিন্তা ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে এক সু-সম্বদ্ধ দর্শনে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ Critique of Pure Reason পাঠ করিয়া পণ্ডিত-সমাজ চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার দার্শনিক সিদ্ধান্ত দার্শনিকগণের চিন্তা উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। Will Durant লিখিয়াছেন "১৮৪৮ সালে রোমাণ্টিক আন্দোলন আরব্ধ হয়। তাহার প্রাদুর্ভাব-কালে সোপেনহরের দর্শন অল্প কালের জন্য প্রভাববিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮৫৯ সালে অভিব্যক্তিবাদ অন্য যাবতীয় মত পরাভূত করিয়া বিজয়-গৌরব লাভ করিয়াছিল, এবং শতাব্দীর শেষভাগে নিৎসের ধর্ম্ম-ধ্বংসী দর্শন দার্শনিক রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্র অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, সত্য। কিন্তু এ সকল আন্দোলনের কোনটিরই গভীরতা ছিল না। তাহারা ছিল অন্য দর্শনের গৌণ বিকাশমাত্র। তাহাদের তলদেশে ক্যাণ্টীয় আন্দোলন প্রবল স্রোতে অবিরাম বহিয়া যাইতেছিল, এবং ক্রমশঃ বিস্তৃততর ও গভীরতর হইতেছিল। ফলে বর্ত্তমানে ক্যাণ্টের দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি সর্ব্বপ্রকার পরিণত দর্শনেরই মূল সূত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে। নিৎসে ক্যাণ্টের-তত্ত্বগুলি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। সোপেনহর Critique of Pure Reasonকে জার্মান সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে যতদিন পর্য্যন্ত কেহ ক্যাণ্টের দর্শন আয়ত্ত করিতে না পারে, ততদিন সে শৈশব অতিক্রম করিয়াছে, বলা যায় না। স্পেন্সার ক্যাণ্টকে বুঝিতে পারেন নাই, এবং সম্ভবতঃ সেই জন্যই তিনি উৎকৃষ্ট দার্শনিক হইতে সক্ষম হন নাই। হেগেল বলিয়াছিলেন, 'দার্শনিক হইতে হইলে প্রথমে স্পিনোজার শিষ্য হইতে হইবে।' ক্যাণ্ট সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়।"

কিন্তু ক্যাণ্টকে বোঝা খুব সহজ ব্যাপার নহে। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তৎকালীন দার্শনিক প্রগতির সহিত প্রথমে পরিচিত হইতে হয়। তারপরে ক্যাণ্টের বক্তব্যও খুব স্পষ্ট নহে। Will Durant বলিয়াছেন, "ক্যাণ্টের সহিত জিহোবার সাদৃশ্য ও বৈ-সাদৃশ্য উভয়ই আছে। জিহোবা মেঘের অপর পার হইতে কথা বলিতেন, কিন্তু তাঁহার কথা বলিবার সময় বিদ্যুতের আলোকে আকাশ উদ্ভাসিত হইত। ক্যাণ্টও মেঘের আড়ালে

থাকিয়া কথা বলেন, কিন্তু বিদ্যুতের আলোক তাঁহার লেখার মধ্যে নাই। উদাহরণের ব্যবহার তাঁহার রচনায় বিরল। স্থূল[১] বিষয়ের ব্যবহারও তিনি করেন নাই। তাহা করিলে, তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের আয়তন বাড়িয়া যাইত। (তবুও তাঁহার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে ৮০০ পৃষ্ঠা আছে।) কেবলমাত্র দর্শন-ব্যবসায়ীদিগের জন্য এই গ্রন্থ[২] লিখিত। তাহাদের জন্য উদাহরণের প্রয়োজন নাই।" তবু ক্যাণ্টের বন্ধু Herz দার্শনিক কল্পনায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াও গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অর্দ্ধেক পাঠ করিয়া ফেরত দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, আরও পড়িতে হইলে তিনি পাগল হইয়া যাইবেন, বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হয়।"

রোমক সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এথেন্সের দার্শনিক চতুষ্পাঠীসকল বন্ধ করিয়া দিবার পরে সহস্র বৎসর যাবৎ ইয়োরোপীয় দর্শনে কোনও নূতন চিন্তার উদ্ভব হয় নাই। সম্রাটদিগের পক্ষপুটের মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া খৃষ্টীয় চার্চ্চ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সমগ্র ইয়োরোপের ধর্ম্মগুরু পোপ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক দর্শন পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদিগের বাহিরে জনগণের অনধিগম্য হইয়া পড়িয়াছিল পুরোহিত ও সন্ন্যাসিগণ গ্রীকদর্শনের আলোচনা করিতেন; তাঁহাদের মধ্যে দার্শনিক প্রতিভার যে অভাব ছিল, তাহাও নহে। মধ্য যুগে ওরিজেন, টমাস একুইনাস, সেইণ্ট অগাস্টিন প্রভৃতি দার্শনিক তাঁহাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাহা সত্য তাহাতো পয়গম্বরদিগের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে, পরিশেষে ঈশ্বর নিজেই মানব-জন্ম স্বীকার করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নূতন সত্য-আবিষ্কারের কিছুই নাই। তবে বুঝিবার সাহায্যের জন্য সেই সত্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বটে। তাই গ্রীক দর্শনের তাঁহাদের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কখনও প্লেটো ও নবপ্লেটনিক দর্শনের সমাদর হইয়াছিল, কখনও বা আরিস্টটলের দর্শনের। গ্রীক দর্শনের সাহায্যে তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মের একটা দার্শনিক ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলে যিশুর সহজ ও সরল ধর্ম্ম দার্শনিক কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

পুরোহিতগণের ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে স্বাধীন চিন্তার উৎস শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। শাস্ত্রে যাহা আছে, নির্ব্বিচারে তাহাই সকলকে স্বীকার করিয়া লইতে হইত, এবং তাহার বিরুদ্ধে কোনও মত প্রকাশ করিলে শাস্তিভোগ করিতে হইত। ইহার ফলে দর্শন-বিজ্ঞানের স্বাধীন আলোচনার পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মানবচিন্তার গতিপথ চিরকাল রুদ্ধ করিয়া রাখা অসম্ভব। কনস্টাণ্টিনোপল তুর্কদিগের কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অনেক গ্রীক পণ্ডিত তথা হইতে পলায়ন করিয়া ইয়োরোপের নানা দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা গ্রীক সাহিত্যও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার পরে আসিল মুদ্রাযন্ত্র। প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থসকল লাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়া জনগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। গ্রীক চিন্তার সহিত পরিচয়ের ফলে লোকের মনে নানা প্রশ্ন উদিত হইতে লাগিল।

[১] Concrete [২] Critique of Pure Reason

জার্মানির ধর্ম্ম-সংস্কার[১] আন্দোলনের ফলে ইয়োরোপের কতিপয় দেশে পোপের প্রভুত্বের অবসান হইল, এবং মানুষের বুদ্ধি বন্ধন-মুক্ত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ায় এক নূতন জগৎ লোকের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল। কোপার্‌নিকাস্‌, গ্যালিলিও, কেপলার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সৌর জগতের রহস্য প্রকাশ করিলেন। জিওরদানো ব্রুনোকে স্বাধীন মত-প্রকাশের জন্য অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে হইল বটে কিন্তু ইংলণ্ডে বেকন জ্ঞানালোচনার জন্য নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানরাজ্যের যে মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিলেন, তাহা দেখিয়া লোকের মন মুগ্ধ হইল, এবং ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা তাহাদের কল্পনা অভিভূত করিল। এই সময়ে হব্‌স্‌ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও যে মত প্রচার করিলেন, তাহা নিরবচ্ছিন্ন জড়বাদ। স্ব-সমাজ-চ্যুত ইহুদী স্পিনোজা যুক্তির উপর যে দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা স্বদেশে ও বিদেশে নাস্তিকতা বলিয়া অভিহিত হইল। এই সমস্ত মত-প্রচারের ফলে লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। ফ্রান্সে ভলটেয়ার, ডিডেরো প্রভৃতি যুক্তিবাদিগণ নানাভাবে যুক্তির মাহাত্ম্য-প্রচার এবং পুরোহিতদিগের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বুর্বনদিগের সিংহাসনের সঙ্গে "ঈশ্বরেরও সিংহাসন উঠেছিল কাঁপিয়া।" ধর্ম্মে অবিশ্বাস ফরাসী দেশে ফ্যাসানে পরিণত হইয়া পুরোহিতদিগের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছিল। পরিশেষে ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে পারিস-বাসিগণ এক সুন্দরী নারীকে প্রজ্ঞাদেবীর ভূষণে সজ্জিত করিয়া এবং নাটকীয়ভাবে তাহার পূজা করিয়া যুক্তির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছিল। এই অবস্থায় অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে প্রশ্ন উঠিল—বহুধাকীর্ত্তিত এই যুক্তির দাবির মূল্য কি? মানুষের যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ভক্তি সহস্র সহস্র মন্দির-চূড়া হইতে উচ্চরবে আপনাকে ঘোষণা করিতেছে, ভাস্কর্য্যে চিত্রে ও কবিতায় যাহার প্রকাশ মানবমনকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, যাহার জন্য শত শত লোক সাংসারিক ভোগসুখ উপেক্ষা করিয়া কৃচ্ছ্রব্রত-পালনে জীবন শেষ করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান "যুক্তি" কি মানবকে সত্যের পারে উত্তীর্ণ করিতে সমর্থ? তাহা কি সত্যের দ্বার-উন্মোচনে বাস্তবিক সক্ষম অথবা ধূর্ত্ত প্রতারকমাত্র। ধর্ম্মকে যে "যাচাই" করিতে চায়, তাহার আনুগত্য-স্বীকারের পূর্ব্বে তাহারই যাচাই প্রয়োজন। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের যে বিচারক হইতে চায়, বিচারক হইবার তাহার উপযোগিতা কতটুকু, তাহার বিচার আবশ্যক সর্ব্বাগ্রে। তর্কশাস্ত্রের অস্ত্রদ্বারা যে শত শত বৎসরের ও কোটি কোটি লোকের বিশ্বাসের বিনাশসাধনে উদ্যত, তাহার স্বরূপ কি? তাহা কি অভ্রান্ত? অথবা তাহার শক্তি ও কার্য্য নির্দ্দিষ্ট পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ? মানব-মনের গূঢ়তম আশা ও সান্ত্বনা যে বিনষ্ট করিতে অগ্রসর হইয়াছে, এবং সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, তাহার বশ্যতা-স্বীকারের পূর্ব্বে এই আলোচনা আবশ্যক। ক্যাণ্ট এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

[১] Reformation

ইংলণ্ডে লক, বার্কলে ও হিউম এই আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মীমাংসা ধর্ম্মের অনুকূল হয় নাই। লকই আধুনিক কালে প্রথমে মানবীয় বুদ্ধি-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার ব্যাখ্যায় লক বলিয়াছিলেন, মানুষের যাবতীয় জ্ঞানই বাহ্যদ্রব্যদ্বারা উৎপন্ন হয়। মানুষের মনঃ একখানা পরিষ্কার শ্লেটের মত। সেই শ্লেটে বাহ্য পদার্থকর্ত্তৃক যাহা লিখিত হয়, তাহাই জ্ঞান। কোনও জ্ঞানই জন্মের সময় আমরা সঙ্গে করিয়া আনি না,—কোনও সহজাত জ্ঞান আমাদের নাই। অনেকে মনে করেন ঈশ্বরের ধারণা, ন্যায়ান্যায়ের ধারণা আমাদের সহজাত, এই সকল ধারণা লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি, কোনও অভিজ্ঞতার অপেক্ষা ইহাদের নাই। লক ইহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়দ্বারাই আমাদের যাবতীয় জ্ঞানলাভ ঘটে। বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়ে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাই মনে বাহিত হইয়া জ্ঞানের সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয়ে যাহা ছিল না, এমন কিছুই মনে প্রবেশ করিতে পারে না। লকের এই মত হইতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভিন্ন অন্য কিছুরই জ্ঞান যখন অসম্ভব, আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল যখন বাহ্য 'জড়' দ্রব্য, তখন জড় ভিন্ন অন্য কিছুই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। আমাদের মনঃও জড় ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

কিন্তু বিশপ বার্কলে বলিলেন "তাহা কেন? লকের বিশ্লেষণদ্বারা বরং প্রমাণিত হয়, যে মনের অতিরিক্ত কিছু নাই। জড় দ্রব্য-সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহাতো মনেরই বিভিন্ন অবস্থামাত্র। যে বাহ্য দ্রব্যকে সেই অবস্থার কারণ বলিতেছে, সে বাহ্য দ্রব্যের অস্তিত্বের প্রমাণ তো কিছুই পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বাহ্য পদার্থ কিছু নাই, যাহাকে বাহ্য পদার্থ বলিতেছ, তথা বাহ্য নহে, মানসিক। লক দেখাইয়াছেন, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই সংবেদন হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং কোনও দ্রব্য-সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাহা সংবেদন ও তদুৎপন্ন প্রত্যয়পুঞ্জের[1] অতিরিক্ত কিছু নহে। যাহাকে দ্রব্য বলা হয়, তাহা কতকগুলি প্রতীতির সমবায়মাত্র—শ্রেণীবদ্ধ প্রতীতির সমবায়। একটা কমলা লেবুর বিষয় বিবেচনা করুন। ইহা যে সকল প্রতীতির সমবায়, তাহাদের একটি "হরিদ্রাবর্ণ"-শ্রেণীভুক্ত, একটি কোনও বিশিষ্ট গন্ধ-শ্রেণীভুক্ত, একটি "কোমল"-শ্রেণীভুক্ত, একটি "সুমিষ্ট"-শ্রেণীভুক্ত। এই সকল সমবেত প্রতীতিই কমলা লেবু। আমাদের যদি কোনও ইন্দ্রিয় না থাকিত, তাহা হইলে কমলা লেবুও থাকিত না। দ্রব্যের দ্রব্যত্ব সংবেদন হইতে উদ্‌ভূত, বাহ্য কোনও কিছু হইতে নহে। সকল জড় দ্রব্যই মনের অবস্থামাত্র। একমাত্র যে পদার্থের অব্যবহিত জ্ঞান আমাদের আছে, তাহা আমাদের মনঃ।

কিন্তু এইখানেই এই সমস্যার সমাধান হইল না। ডেভিড্‌ হিউম বলিলেন, "বার্কলের মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের মনেরও তো কোনও জ্ঞান আমাদের নাই। বাহ্য জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব নাই স্বীকার করিলাম। কিন্তু মনের অস্তিত্ব

---

[1] Bundle of perceptions

যে আছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? মনের অবস্থাসকলই আমরা জানিতে পারি, কিন্তু মনের নিজের দেখা তো কখনও পাই না। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রত্যয়, অনুভূতি, স্মৃতি প্রভৃতিই আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। মনঃ যদি ইহাদের আধাররূপ কোনও দ্রব্য হয়, তবে সে আধারের কোনও জ্ঞান আমাদের নাই। প্রত্যয়, অনুভূতি প্রভৃতির সমষ্টিই মনঃ। চিন্তার প্রবাহের তলদেশে এমন কোনও আত্মা নাই, যাহাকে আমরা দেখিতে অথবা জানিতে পারি। বার্কলে যেমন জড়ের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন এইরূপে হিউম তেমনি মনের-ও বিনাশ সাধন-করিলেন। জড় নাই, চৈতন্যও নাই—অদ্ভুত অবস্থা।

হিউম্ আপনাকে Deist বলিতেন। কিন্তু ইহাতে আন্তরিকতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। খৃষ্টধর্ম্মকে তিনি "আমাদের ধর্ম্ম" বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দর্শনে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কাহারো স্থান থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, হিউমের দর্শন তাহাদের সকলের ভিত্তিরই ধ্বংস-সাধন করিয়াছে। সন্নিবেশ-বিশিষ্টতার যুক্তি তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। জগতে উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, ইহা হইতে যদি বুদ্ধিমান কোনও স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়, তাহা হইলে, হিউমের মতে, স্রষ্টার মধ্যে বর্ত্তমান উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী বুদ্ধি হইতে তাহার জন্যও দ্বিতীয় এক জন স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়, এবং এই দ্বিতীয় স্রষ্টার জন্য তৃতীয় আর একজনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইত্যাদি।

"আত্মার" অস্তিত্ব-অস্বীকারদ্বারা প্রচলিত ধর্ম্মের ধ্বংসসাধন করিয়াই হিউম নিরস্ত হন নাই। প্রকৃতির মধ্যে যে কোনও শৃঙ্খলা অথবা নিয়তি আছে, তাহাও অস্বীকার করিয়া তিনি বিজ্ঞানের বিনাশ-সাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন। কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী; কার্য্যকারণশৃঙ্খলদ্বারা দৃশ্যমান জগৎ বিধৃত। স্পিনোজার দর্শন এই শৃঙ্খল ও নিয়তির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু হিউম বলিয়াছিলেন, "কোনও কারণের দেখা তো কখনও পাওয়া যায় না। যাহার দেখা পাওয়া যায়, তাহা কেবল ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য, একটি ঘটনার পরে আর একটির আবির্ভাব। এই পারম্পর্য্য দেখিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাকে পরবর্ত্তী ঘটনার কারণ বলিয়া আমরা উল্লেখ করি। কিন্তু এই কারণত্ব—পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাদ্বারা যে পরবর্ত্তী ঘটনার উৎপত্তি হয়, এই বিশ্বাস—কেবল অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা ও পরবর্ত্তী ঘটনার মধ্যে কোনও অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ত্তমানে যে পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা যে চিরকাল থাকিবে, ভবিষ্যতে যে তাহার অন্যথা হইবে না, তাহার নিশ্চিতি নাই। যাহাকে "নিয়ম" বলা হয়, তাহা এমন কোনও সনাতন ব্যবস্থা নহে, যে যাবতীয় ঘটনাকে তাহার অনুগামী হইয়া আবির্ভূত হইতে হইবে। এই তথাকথিত নিয়ম আমাদের অভিজ্ঞতার একটি মানসিক সংক্ষেপনমাত্র[1], ঘটনাবলীর পারম্পর্য্যের মধ্যে প্রত্যক্ষীভূত একটা প্রথামাত্র। কিন্তু এই প্রথা নিয়ত অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী নহে। নিয়তি যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে কেবল গণিতের মধ্যেই

[1] Summary

তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনকে তিন দিয়া গুণ করিলে সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব কালেই নয় হইবে; নয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহার অন্যথা অসম্ভব। কিন্তু জলের তাপ নির্দ্দিষ্ট সীমার নিম্নে নামিয়া গেলে, জল যে বরফে পরিণত হইবে, তাহার নিশ্চিতি নাই। ৩×৩ যে =৯, তাহাও এই জন্য যে ৩×৩ এবং ৯ একই পদার্থ, ভিন্ন রূপে প্রকাশিত। ৩×৩=৯, এই প্রতিজ্ঞায় বিধেয়[1] দ্বারা উদ্দেশ্যে[2] নূতন কিছুর আরোপ করা হয় না। ইহা বিশ্লেষ-মূলক[3] প্রতিজ্ঞামাত্র; উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ করিয়া বিশ্লিষ্ট গুণাবলীর একটিকে উদ্দেশ্যে আরোপ করা হইয়াছে।

দ্রব্যের[4] ধারণা-সম্বন্ধে হিউম বলিয়াছেন একখণ্ড প্রস্তরের শ্বেতবর্ণ, কাঠিন্য প্রভৃতি নানা গুণ আছে। এই সমস্ত গুণের আধার-রূপেই আমরা দ্রব্যের ধারণা করিয়া থাকি, কিন্তু প্রস্তরের গুণগুলি ভিন্ন অন্য কিছুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় না। প্রস্তরের গুণসকল বর্জ্জন করিয়া তাহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র কোনও আধারের কল্পনা আমরা করিতে পারি না। শ্বেতবর্ণ, কাঠিন্য প্রভৃতি প্রস্তরের গুণসকল পরস্পর সংহত করিয়া আমাদের কল্পনা তাহাদের আধারস্বরূপে একটি পদার্থের প্রত্যয় গঠন করে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় এইরূপ কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং কারণের ধারণার মত দ্রব্যের ধারণাও ভ্রান্তিমূলক।

প্রকৃতিতে যদি "নিয়ম" না থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞানের গবেষণা নিষ্ফল, কেবল মাত্র গণিত ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষার[5] মধ্যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। হিউম আরও বলিয়াছিলেন, "এই তত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া যদি কোনও গ্রন্থালয়ের গ্রন্থগুলি পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে বহু গ্রন্থই নষ্ট করিতে হয়।"

ধর্ম্ম-বিশ্বাসী লোকদিগের কর্ণে এই সকল কথা মধুবর্ষণ করে নাই। জ্ঞানের প্রকৃতি, উৎস ও সত্যতা-সম্বন্ধে গবেষণার ফল ধর্ম্মের সহায়ক না হইয়া, তাহার উৎসাদক হইয়া দাঁড়াইল। যে অস্ত্রদ্বারা বার্কলে জড়বাদরূপ রাক্ষসের ধ্বংস-সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই অস্ত্রই হিউম চিন্ময় অমর আত্মার বিরুদ্ধ প্রয়োগ করিয়া বিশ্বাসের মূল উৎপাটন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানও আঘাত প্রাপ্ত হইল। হিউমের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ক্যাণ্ট বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ধর্ম্মের যাহা সার ভাগ, এবং বিজ্ঞানের যাহা ভিত্তি, বিনা তর্কে এত দিন তিনি তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছিলেন, কিন্তু হিউমের গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।*

তাঁহার মনে হইল, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এতদিন তিনি যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা কি বর্জ্জন করিতে হইবে? তাহাদের রক্ষার কোনও উপায়ই কি নাই?

ফ্রান্সে রুসো এই জড়বাদ ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বার্কলে বলিয়াছিলেন, "জড়ের অস্তিত্ব নাই।" ইহার উত্তরে হিউম বলিয়াছিলেন, "তাহা

---

[1] Predicate [2] Subject [3] Analytical judgment
[4] Substance [5] Experiment
* He was roused from his dogmatic slumber.

হইলে মনেরও অস্তিত্ব নাই।" ইহার উত্তরে বলা যায়, যে যে যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া এই বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি, তাহা সত্য-মিথ্যার বিচারে নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নহে। যুক্তির কতকগুলি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মানুষের সমগ্র সত্তা বিদ্রোহ অবলম্বন করে। তোমার যুক্তি, তোমার তর্ক তো সেদিনকার সৃষ্টি। মানবমনের যে অংশ হইতে ভ্রান্তির উদ্ভব হয়, সেই অংশেই ইহার অধিষ্ঠান। অতি দুর্ব্বল সে অংশ। সেই দুর্ব্বল অংশ হইতে উদ্ভূত যুক্তির আদেশে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি যাহা কামনা করে, তাহা বিসর্জ্জন দেওয়া অসম্ভব। আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি ও হৃদয়ের অনুভূতি যুক্তির নির্দ্দেশ পরিহার করিয়া আপন পথে অগ্রসর হয়। স্থান ও সময়-বিশেষে যুক্তির আদেশ পালনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। নগরের কৃত্রিম ও জটিল জীবনে যুক্তি যে উৎকৃষ্টতর পথপ্রদর্শক, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু জীবনের সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমাদের বিশ্বাসে ও আচরণে আমরা হৃদয়ের অনুভূতিদ্বারাই চালিত হই। যুক্তি যদি ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে যুক্তি অবলম্বনীয় নহে। ইহাই ছিল রুসোর মত। বহু অবিশ্বাসীর মধ্যে তিনিই একাকী ধর্ম্মের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "যেখানেই দর্শনের উদ্ভব হয়, সেখানেই জাতির নৈতিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। দার্শনিকেরা নিজেরাই বলিয়াছেন, যে পণ্ডিতদিগের আবির্ভাবের পর হইতে সাধু লোকের দেখা পাওয়া যাইতেছে না। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, যে অতিরিক্ত চিন্তাপ্রবণতা প্রকৃতির বিরোধী। বুদ্ধিপ্রধান মানুষ একটি স্বভাবভ্রষ্ট জীব। বুদ্ধির অতিবিকাশ বর্জ্জন করিয়া হৃদয় এবং অনুভূতির সুশিক্ষার জন্য চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। শিক্ষাদ্বারা লোককে চতুর করা যায়, ভাল করা যায় না। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং অনুভূতি যুক্তি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। "যুক্তি যদি ঈশ্বর ও জীবাত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বলে, অনুভূতি প্রবল ভাবে এই বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেন তবে আমরা আশা ছাড়িয়া নিরাশা অবলম্বন করিব?" রুসো তাহার La Nouvelle Heloise উপন্যাসে বুদ্ধি অপেক্ষা অনুভূতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের ফলে ফ্রান্সে ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল; ভাবালুতা একটা ফ্যাসানে পরিণত হইয়াছিল। অন্যান্য দেশেও ইহার প্রভাব কম অনুভূত হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তির আন্দোলন ইহার ফলে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতি একটা আকর্ষণও পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। রুসোর গ্রন্থ ক্যাণ্টের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ক্যাণ্ট দেখিতে পাইলেন, তাঁহার মতো আরও একজন নাস্তিকতার অন্ধকার হইতে বাহির হইবার পথের অনুসন্ধান করিতেছেন, তিনি অতীন্দ্রিয় বিষয়ে যুক্তির উপর অনুভূতির প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছেন। ধর্ম্মহীনতার বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র ক্যাণ্ট প্রাপ্ত হইলেন। বার্কলে ও হিউমের যুক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, তাহার সহিত রুসোর অনুভূতির সমাবেশে যুক্তির আক্রমণ হইতে ধর্ম্মকে এবং সন্দেহবাদ হইতে বিজ্ঞানকে রক্ষার কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন, এবং ১৫ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে তাঁহার Critique of Pure Reason প্রকাশিত করিলেন।

বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা।

(Critique of Pure Reason)

Critique শব্দের অর্থ ঠিক সমালোচনা নয়; বিশ্লেষণ-মূলক সমালোচনা অর্থে ক্যাণ্ট এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। Pure শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র। Reason শব্দে বুঝায় প্রজ্ঞা, জ্ঞানের সাধন ধী-শক্তি। Pure Reason এর অর্থ ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞানের যে সকল উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে স্বতন্ত্র,—তাহাদের সহিত অমিশ্রিত,—প্রজ্ঞা। Critique of Pure Reason গ্রন্থে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা অথবা ধী-শক্তির বিশ্লেষণ করিয়া, জ্ঞানে তাহার দান কি, অভিজ্ঞতায় তাহার কার্য্য কি, ক্যাণ্ট তাহা নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "আমাদের জ্ঞান যে অভিজ্ঞতা হইতে আরব্ধ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাহ্য দ্রব্যদ্বারা উত্তেজিত না হইলে, আমাদের মানসিক শক্তি যে সক্রিয় হইতে পারে না, তাহাও সত্য। কিন্তু অভিজ্ঞতায় জ্ঞানের আরম্ভ হইলেও, সমস্ত জ্ঞান যে তাহাদ্বারাই উৎপন্ন হয়, তাহা বলা যায় না। ইহা অসম্ভব নয়, যে অভিজ্ঞতার দুইটি অংশ আছে, একটি সংবেদন হইতে প্রাপ্ত, অন্যটি ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগকালে ধী-শক্তির স্বকীয় ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত।" ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ব জ্ঞান অর্থাৎ সংবেদন-নিরপেক্ষ জ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব না হইতে পারে। প্রত্যক্ষোত্তর[1] জ্ঞান হইতে ব্যাবৃত্তির জন্য এই জ্ঞানকে ক্যাণ্ট্ প্রত্যক্ষপূর্ব্ব[2] জ্ঞান বলিয়াছেন। এই জ্ঞানের অস্তিত্ব যদি থাকে, তাহা হইলে আমাদের মনের প্রকৃতি ও গঠন হইতেই ইহার উদ্ভব হয়, বলিতে হইবে।"

লক্ বলিয়াছিলেন, সমস্ত জ্ঞানই "মাত্রা" অর্থাৎ (ইন্দ্রিয়ের সহিত) বাহ্য বিষয়ের "স্পর্শ" হইতে উৎপন্ন হয়। ক্যাণ্ট বলিলেন, তাহা নয়; জ্ঞানের একটা অংশ "মাত্রা-স্পর্শ"-জাত সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্য অংশ মনের নিজেরই দান। হিউম বলিয়াছিলেন, আত্মা বলিয়া কিছুই নাই, বিজ্ঞান অসম্ভব। আমাদের পরস্পর-সংহত প্রত্যয়-রাজির প্রবাহ ভিন্ন মনের অন্য কোনও রূপ নাই। প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও কোনও নিশ্চিতি নাই; যাহাকে আমরা নিশ্চিতি বলি, তাহা সম্ভাব্যতামাত্র, যে কোনও মুহূর্ত্তে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। ক্যাণ্ট লক ও হিউম উভয়ের মতকেই ভ্রান্ত বলিলেন। তিনি বলিলেন, "যাহাকে সত্য মনে করিয়া তোমরা তাহার উপর তোমাদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছ, তাহা সত্য নহে; তোমরা ধরিয়া লইয়াছ, ভিন্ন ভিন্ন সংবেদন হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে অবশ্য সংবেদনসকলের মধ্যে কোনও অবিচ্ছেদ্য পারম্পর্য্য-সম্বন্ধ পাওয়া সম্ভবপর হইত না, এবং বহির্জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে কোনও সম্বন্ধকেই নিয়ত বা অবশ্যক বলা যাইত না। কিন্তু তোমরা যাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছ, তাহা সত্য নহে। আমাদের মনঃ পরিষ্কার শ্লেটের মত নহে, এবং বাহ্য দ্রব্যে তাহাতে যে দাগ কাটে, কেবল তাহাই

[1] A posteriori [2] A priori

জ্ঞান নহে। বাহ্য-বিষয়-ও-ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ জ্ঞানও আমাদের আছে।" ইহা প্রমাণ করিবার জন্য Critique of Pure Reason লিখিত। এই গ্রন্থ জ্ঞানের বিজ্ঞান[1], মনের গঠনের বিশ্লেষণদ্বারা জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার স্বরূপ কি, তাহার উপাদান কি, প্রত্যয়ের উৎপত্তি কিরূপে হয়, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। ক্যাণ্টের মতে এই সকলই তত্ত্ব-বিদ্যার সমস্যা। তিনি লিখিয়াছেন, "এই গ্রন্থ আমি সম্পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিয়াছি। তত্ত্ববিদ্যার এমন কোন সমস্যা নাই, যাহার সমাধান অথবা সমাধানের পন্থার নির্দেশ এই গ্রন্থে আমি করি নাই।"

বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য বুঝিবার উপায় কি? কোন্‌টি বিশুদ্ধ জ্ঞান, কোন্‌টি অভিজ্ঞতার জ্ঞান, তাহা বুঝিব কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাণ্ট বলেন, অভিজ্ঞতা হইতে কোন্ দ্রব্য কিরূপ, তাহাই আমরা জানিতে পারি। কিন্তু সেই দ্রব্য যে সেইরূপ হইতে বাধ্য, তাহার সেই রূপ যে নিয়ত, তাহা যে অন্যরূপ হইতে পারে না, তাহা আমরা অভিজ্ঞতা হইতে পাই না। আবার যে সকল সত্য সার্ব্বিক অথবা সাধারণ, অভিজ্ঞতা হইতে তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং যদি এমন কোনও প্রতিজ্ঞা পাওয়া যায়, যাহার অন্যথা কল্পনা করাও অসম্ভব, যাহা সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব স্থানে সত্য বলিয়াই আমরা জানি, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যক্ষপূর্ব্ব বলা যায়। এবংবিধ প্রতিজ্ঞা যদি অভিজ্ঞতা-লব্ধ কোনও প্রতিজ্ঞা হইতে উদ্ভূত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে নির্ব্যূঢ় ভাবে প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ব বলিতে পারা যায়। অভিজ্ঞতা কোনও প্রতিজ্ঞাকে সার্ব্বিকতা দান করিতে পারে না। তাহা হইতে এই মাত্র জানা যায়, যে যতদূর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে এই নিয়মের অন্যথা দেখা যায় নাই। সুতরাং নিয়তি এবং সার্ব্বিকতা প্রত্যক্ষপূর্ব্ব জ্ঞানের নিশ্চিত লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

কিন্তু এইরূপ নিয়ত ও সার্ব্বিক কোনও প্রতিজ্ঞা আছে কি? ক্যাণ্ট বলেন আছে; গণিতের সকল প্রতিজ্ঞই সার্ব্বিক ও নিয়ত। দুই প্রকারের প্রতিজ্ঞা আছে—বিশ্লেষ-মূলক ও সংশ্লেষ-মূলক[2], ! যে সকল প্রতিজ্ঞায় বিধেয়[3] উদ্দেশ্যের[4] অন্তর্ভূত, তাহারা বিশ্লেষ-মূলক। উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণদ্বারা যাহা যাহা পাওয়া যায়, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় তাহাই তাহাতে আরোপ করা হয়। "সকল জড় দ্রব্যই দেশে বিস্তৃত," এই বাক্যে "দেশে বিস্তৃতি" জড় দ্রব্যের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ইহাদ্বারা নূতন কিছুই বলা হয় না। এতাদৃশ প্রতিজ্ঞাদ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় না।

সংশ্লেষ-মূলক প্রতিজ্ঞায় বিধেয় উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত। যখন তাহা উদ্দেশ্যে আরোপিত হয়, তখন উদ্দেশ্যসম্বন্ধে নূতন কিছু বলা হয়। "সকল দ্রব্যই প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন দ্বারা গঠিত", ইহা একটি সংশ্লেষ-মূলক প্রতিজ্ঞা। দ্বিবিধ প্রতিজ্ঞার মধ্যে বিশ্লেষ-মূলক প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষপূর্ব্ব। কিন্তু তাহাদের দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না বলিয়া

[1] Science of knowledge
[2] Analytic or Synthetic
[3] Predicate
[4] Subject

বর্ত্তমান আলোচনায় তাহারা অবান্তর। সংশ্লেষ-মূলক প্রতিজ্ঞা প্রত্যক্ষপূর্ব্ব ও প্রত্যক্ষোত্তর উভয়ই হইতে পারে। গণিতের প্রতিজ্ঞাসকল সংশ্লেষ-মূলক প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। গণিতের জ্ঞান নিয়ত ও নিশ্চিত; ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতায় ইহার অন্যথা কল্পনা করাও অসম্ভব। আগামী কল্য সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হইবে, ইহা বিশ্বাস করা সম্ভবপর, অগ্নি দাহ করিবে না, ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব নহে, কিন্তু দুইএর সহিত দুই যোগ করিলে যে চারি না হইয়া অন্য কিছু হইতে পারে, ইহা কল্পনা করা অসম্ভব। দুইএর সহিত দুই যোগ করিলে যে চারি হয়, এই সত্য অভিজ্ঞতার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা ঠিক হইয়াই আছে, ভূত, ভবিষ্যৎ অথবা বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতার উপর ইহার সত্যতা নির্ভর করে না। এইরূপ সত্য যে কখনও মিথ্যা হইতে পারে, তাহাও কল্পনার অতীত। কিন্তু এই নৈশ্চিত্য আসে কোথা হইতে? অভিজ্ঞতা হইতে নহে। অভিজ্ঞতা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ। তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন সংবেদন ও ঘটনাই পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে তাহাদের পারম্পর্য্য অতীত ও বর্ত্তমান পারম্পর্য্য হইতে ভিন্নরূপ হইতে পারে। গণিতের নিশ্চিতি আমরা প্রাপ্ত হই মনের গঠন হইতে। আমাদের মনঃ এমন ভাবে গঠিত, যে দুইএর সহিত দুই যোগ করিলে যে চারি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে, তাহা সে কল্পনা করিতে পারে না। মনঃ নিষ্ক্রিয় পদার্থ নহে; তাহার বহিঃস্থ দ্রব্য তাহার উপর লিখিয়া যাইবে, আর যাহা লিখিবে, তাহাই সে নিশ্চিষ্ট ভাবে গ্রহণ করিবে, ইহা তাহার স্বভাব নহে। যে সকল অবস্থাকে মানসিক অবস্থা বলা হয়, তাহাদের সমষ্টি-মাত্রও মনঃ নহে। মনঃ মানুষের একটি অঙ্গ; অসংবদ্ধ সংবেদনসকল ইহার নিকট আকার প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যয়ে পরিণত হয়, এবং ইহাদ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া শৃঙ্খলা-সমন্বিত চিন্তার সৃষ্টি করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে জ্ঞানের সমস্ত অংশ বাহ্য দ্রব্য হইতে আসে না। তাহার একটি অংশ মনের দান।

অসংবদ্ধ সংবেদনগুলিকে মনঃ কিরূপে জ্ঞানে পরিণত করে? এই প্রশ্নের সমাধানের প্রচেষ্টাকে—মনের বিশ্লেষণ করিয়া চিন্তার নিয়মসকলের আবিষ্কারের প্রচেষ্টাকে—ক্যাণ্ট "অতীন্দ্রিয় দর্শন"[1] নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহা প্রত্যক্ষের অতীত তাহাই Transcendental; প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত যে সমস্যা, তাহার সমাধান যে দর্শনের বিষয়, তাহাই "অতীন্দ্রিয় দর্শন।"

জ্ঞানের উৎপত্তির দুইটি ক্রম। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শে, (চক্ষুর সহিত আলোকের, কর্ণের সহিত বায়ু-তরঙ্গের, সংস্পর্শে) স্নায়ুযন্ত্রে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাহা মস্তিষ্কে বাহিত হইয়া মনের এক কক্ষে উপস্থিত হয়। মনঃ সক্রিয় হইয়া স্নায়ুবাহিত এই উপাদানকে একটা আকার দান করে। দ্বিতীয়তঃ, এই আকারিত উপাদান মনের দ্বিতীয় কক্ষে নীত হইলে, স্মৃতির সাহায্যে মনঃ তাহাকে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করে। প্রথম ক্রমের আলোচনাকে ক্যাণ্ট Transcendental Aesthetic (সংবেদনের অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব) নাম

[1] Transcendental Philosophy

দিয়াছেন। Transcendental শব্দের অর্থ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। Aesthetic শব্দের ধাতুগত অর্থ অনুভূতি বা সংবেদন। Critique of Pure Reason গ্রন্থের প্রথম ভাগই Transcendental Aesthetic। দ্বিতীয় ভাগের নাম—Transcendental Logic। Logic অর্থে চিন্তার বিজ্ঞান। যে ভাবে মানবের মনঃ চিন্তা করে, তাহার বিজ্ঞান। মানুষের চিন্তার মধ্যে যে অংশ ইন্দ্রিয়াতীত, তাহার বিজ্ঞানই Transcendental Logic বা অতীন্দ্রিয় চিন্তা বিজ্ঞান।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-বিজ্ঞান

Transcendental Aesthetic

সংবেদন বলিতে ইন্দ্রিয়ের সহিত কোনও দ্রব্যের সংস্পর্শজনিত উত্তেজনার[1] অস্তিত্ব-মাত্রের জ্ঞান বুঝায়। অক্ষিপটে এক ঝলক আলোকের পতন, নাসিকারন্ধ্রে কোনও একটা গন্ধের আবির্ভাব, ত্বকের সহিত বস্তুবিশেষের এবং রসনার সহিত খাদ্যের সংস্পর্শ, এবং কর্ণপটহে বায়ুস্পন্দনের আঘাত সংঘটিত হইবার পরেই যে অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তাহাই সংবেদন, তাহাই অভিজ্ঞতার উপাদান। জাতকের প্রথম অবস্থায় যে অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তাহাতে বস্তুর বিশেষ জ্ঞান থাকে না, কেবল "কোনও একটা কিছু" এইরূপ একটা জ্ঞান হয়।[2] ইহাই জ্ঞানের প্রথম অবস্থা। কিন্তু ইহাকে জ্ঞান বলা যায় না। এই সকল অনুভূতির সমবায়ে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের জ্ঞান জন্মে। একটা কমলা লেবুর জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, দেখা যাউক। শিশু যখন হাতে কমলা লেবু লইয়া খাইতে থাকে, তখন তাহার অক্ষিপটে পতিত আলোকের দ্বারা তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়ুর স্পন্দন মস্তিষ্কে উপনীত হইলে, তাহার অনুভূতি উৎপন্ন হয়। তাহার রসনার সহিত কমলা লেবুর রসের সংস্পর্শের ফলে রসনা-সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর স্পন্দন মস্তিষ্কে বাহিত হইলে, স্বাদের অনুভূতি জন্মে। এইরূপ নাসিকাস্থিত স্নায়ুর স্পন্দন এবং ত্বক্-সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর স্পন্দন মস্তিষ্কে উপনীত হইলে, গন্ধ এবং স্পর্শের অনুভূতি হয়। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন এবং পরস্পর হইতে পৃথক হইলেও, এই সকল অনুভূতির সমবায়ে একটি প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়, তাহাই কমলা লেবুর প্রত্যয়। তখন অস্পষ্ট অনুভূতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু সংবেদন কি আপনা হইতেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পরিণত হয়? লক ও হিউম বলিয়াছেন "হাঁ, তাহাই হয়।" ক্যাণ্ট বলিলেন, তাহা অসম্ভব। এই সকল সংবেদন বিভিন্ন ইন্দ্রিয় হইতে অসংখ্য স্নায়ুর দ্বারা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে নীত হয়। বাহ্য জগতের সংবাদবাহী এই সকল সংবেদন মস্তিষ্কের বিভিন্ন কক্ষে উপস্থিত হয়। এক এক কক্ষে বহু 'সংখ্যক' সংবেদন সমবেত হয়। উপরে যে কমলা লেবুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার গন্ধের সহিত একই কক্ষে আরও অনেক গন্ধ আছে। কিন্তু তাহার গন্ধ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া অন্য

[1] Stimulus [2] আলোচন (সাংখ্য)

কক্ষস্থিত তাহার স্বাদকে অন্যান্য স্বাদ হইতে পৃথক করিয়া আনিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল, এবং তাহারা উভয়ে আবার তাহার ত্বক-সংশ্লিষ্ট সংবেদনকে অন্যান্য ত্বক-সংশ্লিষ্ট সংবেদন হইতে পৃথক করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল, এবং পরে তাহার রূপানুভূতিকেও তাহার কক্ষ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া দলভুক্ত করিয়া লইল, এবং সকলে মিলিয়া কমলা লেবুর জ্ঞান উৎপাদন করিল, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। নিশ্চয়ই এই সকল সংবেদনকে মিলিত করিবার জন্য স্বতন্ত্র কর্ত্তার প্রয়োজন। ইহাদিগের মধ্যে কোনও শৃঙ্খলা নাই; বিশৃঙ্খল ভাবে যখন তাহারা মস্তিষ্কের মধ্যে দলে দলে প্রবেশ করে, তখন তাহারা থাকে বিশৃঙ্খল জনতার মত। তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য কোনও শক্তি যদি না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা শৃঙ্খলাবিহীন জনতার মতই থাকিয়া যাইত। তাহাদিগকে যথাভাবে সজ্জিত করিবার জন্য কর্ত্তার প্রয়োজন।

বাহির হইতে ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া যে সকল সংবাদ মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়, তাহার সকলগুলিই গৃহীত হয় না। যখন আমরা চক্ষু মেলিয়া থাকি, তখন কত দ্রব্য হইতেই আলোক আসিয়া আমাদের চক্ষুতে পতিত হয়, কিন্তু তাহাদের সকলগুলিই তো আমরা দেখি না। যে দ্রব্যের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, যেটি নির্ব্বাচিত হয়, সেইটিই বিশিষ্ট রূপ ধরিয়া জ্ঞানের বিষয় হয়। দেহের সর্ব্বত্র বিস্তৃত স্নায়ু-প্রান্তে প্রতিক্ষণে অগণিত উত্তেজনা আঘাত করে; তাহাদের উপস্থিতি-বার্ত্তাও স্নায়ুর দ্বারা মস্তিষ্কে বাহিত হয়, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অবজ্ঞাত ও বর্জ্জিত হয়। যাহারা মনের ঔৎসুক্য উৎপাদন করে, কেবল তাহারাই জ্ঞানের পদবীতে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়। ঘরের মধ্যে ঘড়িতে টিক টিক শব্দ হইতেছে, শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। কিন্তু যখনই সময় কত জানিবার ইচ্ছা হয়, তখনই সেই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। যে সকল উত্তেজন আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাদের প্রতিই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, এবং তাহারাই অন্যান্য উত্তেজন পশ্চাতে ফেলিয়া মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সংবেদন ও চিন্তা আমাদের ভৃত্যের মত, তাহারা আহ্বানের অপেক্ষা করে; তাহাদের প্রয়োজন না হইলে, তাহারা মনের সম্মুখে উপস্থিত হয় না। যে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করে, সে মনঃ। সুতরাং সংবেদন ও তদুৎপন্ন প্রত্যয় ব্যতীত মনের ক্রিয়াও স্বীকার করিতে হয়।

ক্যাণ্টের মতে জ্ঞানের প্রথম ক্রমে সংবেদনগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার জন্য মনঃ দুইটি সহজ উপায় অবলম্বন করে—তাহাদিগকে "দেশ"[1] ও "কালে"[2] স্থাপন করে। দেশ ও কাল দ্রব্য নহে, তাহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রকার[3] মাত্র। দেশ ও কাল মনের দেওয়া "ছাপ"—সম্মুখে উপস্থিত সংবেদনের উপর মনঃ প্রথমে এই দুইটি ছাপ লাগাইয়া দেয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ, যাহা দেহের বাহির হইতে আসিয়া মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়, মনঃ তাহাদের সকলগুলিকেই প্রথমে দেহের বাহিরে, তাহার পরে পরস্পর হইতে স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন স্থানে একটির পাশে একটি অবস্থিত বলিয়া গণ্য করে। কোনও দ্রব্যকে বাহ্য দ্রব্যরূপে

---

[1] Space [2] Time [3] Modes

জানিলাম, ইহার অর্থ আমার বাহিরে অবস্থিত বলিয়া বুঝিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এই সকল অনুভূতি পূর্ব্বাপরক্রমেও সজ্জিত হয়,—একটি পূর্ব্বে, অন্যটি তাহার পরে, এইরূপ কালিক-ক্রমে ব্যবস্থিত হয়। এইরূপে প্রত্যেক সংবেদন দেশ ও কালে অবস্থিতরূপে গণ্য হয়। এই দেশ ও কালের ধারণা সংবেদন হইতে উৎপন্ন হয় না, আমাদের কোনও ইন্দ্রিয়ই দেশ ও কালকে মনের সম্মুখে উপস্থিত করে না। তাহারা কোনও ইন্দ্রিয়েরই বিষয় নহে। আমাদের মনঃই সমস্ত সংবেদনকে দেশ ও কালের পরিচ্ছদে সজ্জিত করে। সেইজন্য দেশ ও কালের জ্ঞান প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ব[1], প্রত্যক্ষোত্তর[2] নহে। এই জ্ঞান না থাকিলে কোনও সংবেদনই প্রতীতিতে[3] পরিণত হইতে পারে না। কোনও দ্রব্যকেই দেশ ও কালে অবস্থিত ভিন্ন অন্য কোনও রূপেই ধারণা করিতে পারা যায় না। দ্রব্যের জ্ঞান নির্ভর করে দেশ ও কালের ধারণার উপর। কিন্তু যাবতীয় দ্রব্যের আধার এই দেশ ও কালের ধারণার জন্য তাহাদের মধ্যস্থিত কোনও দ্রব্যের ধারণার সাহায্য লইতে হয় না। শূন্য দেশ ও শূন্য কালের ধারণা করিতেও কষ্ট হয় না। যাবতীয় দ্রব্য অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেশ বর্ত্তমান আছে, কাল অবিরাম বহিয়া যাইতেছে, ইহা কল্পনা করা অসম্ভব নহে। কোনও দ্রব্যের অন্যান্য সকল লক্ষণের তিরোভাব কল্পনা করা যায়—কমলা লেবুর বর্ণ, গন্ধ, ভার প্রভৃতি নাই, ইহা কল্পনা করা যায়, কিন্তু যে স্থান ব্যাপিয়া সেই কমলা লেবু ছিল, সেই স্থানের অন্তর্ধান কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই ক্যাণ্ট দেশ ও কালকে আমাদের মনের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ব বলিয়াছেন। এই সহজাত প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ব দেশ ও কালের অব্যবহিত জ্ঞানকে ক্যাণ্ট "ইন্দ্রিয়ের উপজ্ঞা[4] নাম দিয়াছেন।

দেশ ও কাল যে প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ব, দ্বিবিধ প্রমাণের দ্বারা ক্যাণ্ট তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—(ক) তাত্ত্বিক[5] ও (খ) অতীন্দ্রিয়[6]। (ক) উপরি উক্ত প্রমাণ-সকল তাত্ত্বিক প্রমাণের অন্তর্গত। যাবতীয় পদার্থ দেশ ও কাল-কর্ত্তৃক বিধৃত হইলেও দেশ ও কাল "সম্প্রত্যয়" বা সামান্য[7] নহে। কেননা, "সামান্য" তাহার বাচ্য যাবতীয় বিশেষের সমষ্টি নহে; "মানুষ" বলিলে জগতের যাবতীয় মানুষের সমষ্টি বুঝায় না। যে যে গুণ মানুষের বিশেষত্ব, সেই সকল গুণ সমন্বিত-জীব বুঝায়। কিন্তু "দেশ" যাবতীয় খণ্ডদেশের ও "কাল" যাবতীয় খণ্ডকালের সমষ্টি। দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের রূপ বা আকার[8]।

(খ) "অতীন্দ্রিয়" প্রমাণ-সম্বন্ধে ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, দেশ ও কালকে প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ব বলিয়া স্বীকার না করিলে, কয়েকটি বিজ্ঞানের অস্তিত্বই অসম্ভব হইয়া পড়ে। দেশ ও কালই শুদ্ধ গণিতের[9] বিষয়। দেশ ও কালকে প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ব বলিয়া গণ্য করিলেই শুদ্ধ গণিতবিজ্ঞান সম্ভবপর হয়। গণিতের প্রতিজ্ঞা সকলকে সার্ব্বিক ও নিয়ত বলিয়াই গণ্য করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে কখনও নিয়ত ও সার্ব্বিক প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া

[1] A Priori [2] A Posteriori [3] Perception
[4] Intutions [5] Metaphysical [6] Transcendental
[7] General Notions [8] Forms [9] Pure Mathematics

যায় না। প্রত্যক্ষ-পূর্ব্ব ভিত্তি না থাকিলে গণিতের প্রতিজ্ঞা সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব কালে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এই জন্যই দেশ ও কালের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষোত্তর বলিতে পারা যায় না, তাহা প্রত্যক্ষপূর্ব্ব। গণিতের নিয়ম সকল দেশ ও কালেরই নিয়ম; সুতরাং তাহারাও প্রত্যক্ষপূর্ব্ব। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দেশ-ও-কাল-সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞা-সকল কিরূপে সার্ব্বিক ও নিয়ত হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। দেশ ও কাল আমাদের মনের প্রকার[1] যদি হয়, তাহা হইলে দেশ ও কাল সম্বন্ধীয় নিয়ম (যাহা গণিতেরই নিয়ম) আমাদের মনেরই নিয়ম, সুতরাং যতদিন আমাদের মনের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত না হয়, তত দিন দেশ ও কালের নিয়মেরও ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই।

এইরূপে হিউমের আক্রমণ হইতে ক্যাণ্ট গণিতবিজ্ঞানকে রক্ষা করিয়াছেন। এখন অন্যান্য বিজ্ঞানকে রক্ষা করা যায় কিনা, দেখিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে দেশ ও কালকে বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে স্থানান্তরিত করার ফল-সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

ক্যাণ্টের মতে দেশ ও কালের অস্তিত্ব বহির্জগতে নাই। আমাদের মনের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। তাহারা বাহ্য দ্রব্যের জ্ঞানের "প্রকার"[2] মাত্র। বহির্জগৎ হইতে যে সংবেদন উৎপন্ন হয়, মনঃ তাহাদিগকে দেশ ও কালে গ্রহণ করে। এই দেশ ও কালের ধারণা ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ ও মনের স্বরূপ হইতে উৎপন্ন। দেশ ও কালের সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া যে আমরা জন্মগ্রহণ করি, তাহা নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা যে রূপে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠে, মনোবৈজ্ঞানিকগণ তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। দেশ ও কালের ধারণা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিলেও, ইহা বাহিরে বর্ত্তমান কোনও দ্রব্যের ধারণা নহে। ইহা মনেরই সৃষ্টি। কোনও ইন্দ্রিয় হইতে ইহার জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাহ্য দ্রব্যের জ্ঞান ইন্দ্রিয়দ্বারা ভিন্ন পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেশ ও কালের জ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য নয়। সুতরাং তাহারা বাহ্য দ্রব্য নয়; তাহাদের বস্তুগত অস্তিত্ব[3] নাই বলিতে হইবে। ইহাদের অস্তিত্ব আমাদের মনে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে বাহ্য দ্রব্যের যে জ্ঞান আমাদের হয়, তাহা তাহার স্বরূপের জ্ঞান নহে। আমরা যাবতীয় দ্রব্য দেশ ও কালে অবস্থিত দেখিতে পাইলেও, তাহারা বাস্তব পক্ষে দেশ ও কালে অবস্থিত নহে। দেশ ও কালের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাহারা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাহারা যে আমাদের বাহিরে অবস্থিত, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশ ও কালের পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলে তাহাদের রূপ কি হয়, তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের জ্ঞানের বাহিরে দেশ ও কালবর্জ্জিত দ্রব্যের স্বরূপ কি—দ্রব্য স্বরূপতঃ[4] কি—তাহা আমরা জানি না।

বাহ্য জগতের যাবতীয় দ্রব্য যেমন দেশ ও কালের অন্তর্গত হইয়া আমাদের মনের নিকট প্রকাশিত হয়, তেমনি মনোজগতের সমস্ত ভাব কালের অন্তর্গত হইয়া প্রকাশিত

---

[1] Subjective forms
[2] Modes
[3] Objective reality
[4] Thing in itself

হয়। মানসিক অবস্থাসমূহ "কালের" পরিচ্ছদ-বর্জ্জিত অবস্থায় কিরূপ, তাহাদের স্বরূপ কি, তাহাও আমরা অবগত নহি। তাহারা যে আত্মার[1] অবস্থামাত্র, তাহার স্বরূপ জানিবার উপায় নাই। সুতরাং অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে যে দুই পদার্থ বর্ত্তমান—চিৎ ও জড়—তাহারা যেরূপে মনের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহাই মাত্র আমরা জানিতে পারি, তাহাদের স্বরূপ জানিবার কোনও উপায় নাই। Critique of Pure Reasonএর প্রথম সংস্করণে ক্যাণ্ট লিখিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে, যে একই মাত্র পদার্থ উভয় জগতে বর্ত্তমান; যে পদার্থ বাহ্যজগতে দেশ ও কালে প্রকাশিত, তাহাই অন্তর্জগতে কেবল কালেই প্রকাশিত। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এই উক্তি বর্জ্জিত হইলেও, ইহারই মধ্যে ক্যাণ্টের পরবর্ত্তী দার্শনিকদিগের দর্শনের মূল নিহিত।

অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বের বিশ্লেষণ

(Transcendental Analytic)

সংবেদনদিগকে দেশ ও কালের রূপ-দানদ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের ক্রম দুইটি: (১) প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা প্রতীতি[2] ও (২) সামান্য জ্ঞান বা সম্প্রতীতি[3]। প্রথম ক্রমে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শে যে অনুভূতি উৎপন্ন হয়, দেশ ও কালের রাগে রঞ্জিত হইয়া তাহা প্রতীত হয়। ক্যাণ্ট দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছেন—বাহ্য ও আন্তর। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্‌, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেহের বাহিরে অবস্থিত দ্রব্যের জ্ঞান হয়। অন্তরিন্দ্রিয়দ্বারা মানসিক অনুভূতির জ্ঞান হয়। উভয়বিধ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু শুধু দেশ ও কালে প্রকাশেই স্পষ্ট জ্ঞান হয় না। এই প্রকাশে জ্ঞানের আভাসমাত্র উৎপন্ন হয়। ইহা দেশ ও কালে অবস্থিত "কোনও একটা কিছু"র অস্তিত্বমাত্রের জ্ঞান। এই অস্পষ্ট জ্ঞানকে স্পষ্টজ্ঞানে পরিণত করিবার কার্য্য—অন্যান্য বস্তু হইতে স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান-উৎপাদন ও অন্যান্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ-কার্য্য বুদ্ধির। ইহাই জ্ঞানের দ্বিতীয় ক্রম। প্রথম ক্রম Transcendental Aesthetic এ বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় ক্রম বর্ণিত হইয়াছে Transcendental Logic অথবা অতীন্দ্রিয় তর্ক-বিজ্ঞানে। Logicএর অর্থ চিন্তার নিয়মের[4] বিজ্ঞান, যে যে নিয়মদ্বারা আমাদের চিন্তা পরিচালিত হয়, তাহার আবিষ্কার ও আলোচনাই Logic। চিন্তার এই সকল নিয়ম অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ, বাহ্য বস্তু হইতে তাহাদের জ্ঞানলাভ হয় না। চিন্তার নিয়মসমূহের বিজ্ঞানই Logic বা তর্কশাস্ত্র। সাধারণ Formal Logicএ জ্ঞানের উৎপত্তি-সম্বন্ধে আলোচনা নাই। জ্ঞানের উৎস কোথায়, তাহার আলোচনা ইহাতে নাই। ইহাতে প্রাপ্ত-জ্ঞানকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার "রূপ", এবং তর্কে সেই প্রাপ্ত

[1] Ego [2] Perception [3] Conception
[4] Science of the Laws of Thought

জ্ঞান কোন কোন নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার আলোচনা হয়। ক্যাণ্টের Transcendental Logicএ জ্ঞানের যে অংশ অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত নহে, তাহার উৎপত্তি-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। Transcendental Logic দুইভাগে বিভক্ত— Transcendental Analytic ও Transcendental Dialectic। মনের কার্য্য বিশ্লেষণদ্বারা চিন্তার নিয়ম আবিষ্কার Tranecendental Analyticএর ("অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব-বিশ্লেষণের) উদ্দেশ্য।

ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠাই বুদ্ধির কার্য্য। বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে সম্বন্ধের আবিষ্কারদ্বারা এই ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বিশুদ্ধ সংবেদন সংবিদের মধ্যে একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনামাত্র। মনের মধ্যে কোনও ঐক্যবিধায়ক শক্তি যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের মানসিক জীবন হইত এইরূপ বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর সমাবেশমাত্র। এই জন্যই ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, "সম্প্রতীতি বা সামান্য-জ্ঞান ব্যতীত প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অন্ধ"[1]। যে সূত্রে এই সকল বিক্ষিপ্ত ঘটনারাজি গ্রথিত হইয়া শৃঙ্খলা-বদ্ধ জ্ঞানে পরিণত হয়, তাহা বুদ্ধি। জ্ঞানের যাবতীয় বিষয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাহাদের সু-বিন্যাসের দ্বারা ঐক্যের উদ্ভাবন বুদ্ধির কার্য্য। কি ভাবে এই কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা Analyticএ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এমন কোনও সম্প্রত্যয় আমাদের আছে কি না, যাহা অভিজ্ঞতার পূর্ব্ববর্ত্তী, যাহা অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, ক্যাণ্ট প্রথমে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। লক ও হিউম এরূপ কোনও সম্প্রত্যয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। ক্যাণ্ট দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে এমন কতকগুলি সম্প্রত্যয়[2] আমাদের আছে, যাহারা আমাদের বুদ্ধির অন্তর্ব্বর্ত্তী—যাহারা ইন্দ্রিয়দ্বারা উৎপন্ন হয় না। যে সকল সংবেদন দেশ ও কালের রাগে রঞ্জিত হইয়া বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত হয়, বুদ্ধির কার্য্য তাহাদের ব্যাখ্যা করা। কোথা হইতে তাহারা আসিল, তাহারা কে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি, প্রভৃতি বিবিধ প্রশ্নের মীমাংসা বুদ্ধিকে করিতে হয়। দেশ ও কালে যখন তাহারা বুদ্ধির নিকটে আবির্ভূত হয়, তাহার পূর্ব্বেই তাহারা যে বাহ্য, তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। অবশিষ্ট যে সকল প্রশ্নের সমাধান বুদ্ধিকে করিতে হয়, তাহারা বুদ্ধির মধ্যেই উদ্ভূত হয়, এবং তাহাদের সমাধানের নিয়মও বুদ্ধির মধ্যে নিহিত। ইন্দ্রিয় যেমন সংবেদনদিগকে দেশ ও কালের মধ্যে গ্রহণ করে, বুদ্ধিও তেমনি দেশ ও কালের মুদ্রা-প্রাপ্ত এই সংবেদনদিগকে কতকগুলি আকারে[3] গ্রহণ করে। এই সকল আকার কি?

সত্তা-সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা যায়—সত্তায় যে সকল বিধেয়ের বা বিশেষণের আরোপ করা যায়—আরিস্টটল তাহাদিগকে দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে Category বা "শ্রেণী" নাম দিয়াছিলেন।* এই দশটি সত্তার সার্ব্বিকতম রূপ। সমস্ত

---

[1] Perceptions without Conceptions are blind

[2] Notions [3] Form * প্রথম খণ্ড—১২৪ পৃষ্ঠা দেখ।

বস্তুই এই দশ শ্রেণীর অন্তর্গত। আরিস্টটল কোনও সাধারণ তত্ত্ব হইতে তাঁহার Categoryদিগের উদ্ভাবন করেন নাই। পদার্থদিগের পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি তাহাদিগকে এই সকল শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে দেশ ও কাল ক্যাণ্টের মতে বুদ্ধির ক্রিয়ার প্রকার নহে। তাহারা সংবেদনের উপর ইন্দ্রিয়ের ছাপ। আমাদের জ্ঞানে বুদ্ধির কি দান, তাহার অনুসন্ধানে ক্যাণ্ট একটি সাধারণ তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, তর্কশাস্ত্রের "বিচার"কে[১] সেই তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিচারের যত রূপ আছে, তাহাদিগের পরীক্ষা করিলে, তাহা হইতে বুদ্ধির আদিম সম্প্রত্যয়দিগের[২] পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। প্রচলিত তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে ক্যাণ্ট বিচারের বিবিধ রূপগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং দ্বাদশটি বুদ্ধির আদিম সম্প্রত্যয়ের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

"বিচার" শব্দটি তর্কশাস্ত্রে কার্য্যতঃ "বাক্য" অর্থে ব্যবহৃত হয়। "বিচার" একটি মানসিক ক্রিয়া, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় বাক্যদ্বারা। কোনও বস্তু-সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, ব্যাকরণে যাহাকে "বাক্য" বলে, আমরা তাহারই ব্যবহার করি। মানসিক চিন্তার ধ্বন্যাত্মক রূপই বাক্য। তর্কশাস্ত্রে বাক্য চারিভাগে বিভক্ত: (১) পরিমাণ-বাচক,[৩] (২) গুণ-বাচক[৪], (৩) সম্বন্ধ-বাচক,[৫] (৪) বিধা-বাচক[৬]। ইহাদের প্রত্যেকটি আবার তিন ভাগে বিভক্ত: পরিমাণের অন্তর্গত সার্ব্বিক,[৭] বিশেষ,[৮] ও এক[৯]। গুণের অন্তর্গত অন্বয়ী,[১০] ব্যতিরেকী,[১১] এবং অসীমত্ব-সসীমত্ব ব্যঞ্জক[১২]। সম্বন্ধের অন্তর্গত নিরপেক্ষ,[১৩] সাপেক্ষ[১৪] এবং বৈকল্পিক[১৫]। বিধার তিনটি ভাগ হইতেছে, অনিশ্চিত,[১৬] বর্ণনাত্মক[১৭] ও নিশ্চয়াত্মক[১৮]। বিচারের এই সকল রূপ হইতে ক্যাণ্ট সমসংখ্যক নিম্ন লিখিত বিশুদ্ধ সম্প্রত্যয়ের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

পরিমাণ	গুণ	সম্বন্ধ	বিধা
সমগ্রতা	বাস্তবতা	দ্রব্য ও ধর্ম্ম	সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা
বহুত্ব	ব্যতিরেক	কার্য্য ও কারণ	অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব
একত্ব	সীমাবদ্ধতা	ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া	নিয়তি ও অনিশ্চিতি

এই দ্বাদশটি সামান্য অথবা সম্প্রত্যয়কে ক্যাণ্ট Categories নাম দিয়াছেন। মানুষের যাবতীয় চিন্তা এই দ্বাদশটি রূপে প্রকাশিত হয়। ইহারা সকলেই বিশুদ্ধ সম্প্রত্যয়,[১৯] জ্ঞানের উপাদান[২০] ইহাদের মধ্যে নাই। মনের বাহিরে কোনও স্থান

[1] Logical Judgment [2] Primitive notions of the Understanding
[3] Quantity [4] Quality [5] Relation [6] Modality
[7] Universal [8] Particular [9] Singular. [10] Affirmative
[11] Negative. [12] Infinite or Limitative
[13] Categorical [14] Hypothetical [15] Disjunctive
[16] Problematic [17] Assertoric [18] Apodictic.
[19] Pure notions [20] Matter

হইতেই ইহারা উদ্‌ভূত হয় না। জ্ঞানের উৎপাদনে ইহারা বুদ্ধির দান, বুদ্ধির স্বকীয় ভাণ্ডার হইতে ইহারা আহৃত। ইহারা সার্ব্বিক ও নিয়ত। রক্তবর্ণ কোনও দ্রব্যের রক্তবর্ণ নিয়ত নহে। তাহা অন্য বর্ণও হইতে পারিত। কিন্তু উক্ত দ্রব্যের দ্রব্যত্ব নিয়ত। উহা যে কোনও কারণ হইতে উদ্‌ভূত, তাহাও নিয়ত। তাই দ্রব্য এবং কারণত্বের প্রত্যয় ভিন্ন বুদ্ধি কোনও দ্রব্যই বুঝিতে সক্ষম হয় না। বুদ্ধির ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই ইহারা প্রযুক্ত হয়। ইহারা সার্ব্বিক ও নিয়ত। বর্ণ অথবা ভার-বিহীন জগতের কল্পনা করা অসম্ভব নহে, কিন্তু এমন কোনও জগতের কল্পনা করা সম্ভবপর নহে, যাহাতে "এক", "বহু" "কার্য্য-কারণ" প্রভৃতি থাকিবে না।

কিন্তু এই সকল বিশুদ্ধ "সামান্য" তো প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। তবে কিরূপে তাহারা প্রত্যক্ষ বিষয়ে প্রযুক্ত হয়? ইহারা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম্মী—বিজাতীয়। সজাতীয় পদার্থের মধ্যেই সম্বন্ধের কল্পনা করা যায়। বিজাতীয় পদার্থের পরস্পর সংযোগ সংঘটিত হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, কালের প্রত্যয়ের মাধ্যমে এই সংযোগ সাধিত হয়। সংবেদনসকল যদি বুদ্ধির নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে দেশ ও কালের মধ্যে ব্যবস্থিত না হইত, তাহা হইলে তাহাদিগের উপর উপরিউক্ত কোনও সম্প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইতে পারিত না। কালের ভাবে তাহারা ভাবিত বলিয়াই এই প্রয়োগের সম্ভব হয়। অব্যবহিত ভাবে প্রত্যয়ের উপর Categoryদিগের প্রয়োগ সম্ভবপর নহে।

কালের একটি ধর্ম্ম যৌগপদ্য[1]। এই যৌগপদ্যের জ্ঞান প্রত্যক্ষপূর্ব্ব। এই হিসাবে কাল Categoryদিগের সজাতীয়। অন্য দিকে কালে ভিন্ন কোনও দ্রব্যই জ্ঞানগোচর হয় না। এই জন্য কাল প্রত্যক্ষ বিষয়েরও সজাতীয় বটে। কালের ধর্ম্মকে ক্যাণ্ট Transcendental Schema নাম দিয়াছেন। Schema শব্দের ধাতুগত অর্থ আকার বা রূপ; যাহা শ্রেণীবিশেষের অন্তর্গত যাবতীয় পদার্থে সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান, তাহাই Schema। যাবতীয় প্রকারের মধ্যে কালের রূপ বর্ত্তমান বলিয়া, কালের ধর্ম্ম Schema নামে অভিহিত হইয়াছে। Schema কল্পনার সৃষ্টি হইলেও, Categoryর প্রতিরূপ নহে, কেননা প্রতিরূপ কেবল একটি মাত্র পদার্থেরই সম্ভব, শ্রেণীর প্রতিরূপ হয় না। কিন্তু Schema সমগ্র Categoryর কল্পনাসৃষ্ট রূপ, যাহার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত বিষয়ে সেই Categoryর প্রয়োগ সম্ভবপর হয়। সুতরাং Schema কখনও প্রত্যয়ের বিষয় হইতে পারে না। মনোমধ্যেই কেবল তাহার অস্তিত্ব সম্ভবপর। এখন কিরূপে Schemaর প্রয়োগ হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক্।

পরিমাণ প্রকারে Schemaর প্রয়োগ-কালে বুদ্ধি কালের মধ্যে একটি শ্রেঢ়ীর কল্পনা করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "ক্ষণ" পরপর সজ্জিত, এইরূপ একটি শ্রেঢ়ী—সজাতীয় এককের সহিত এককের যোগ। এই শ্রেঢ়ীর কল্পনাই "সংখ্যা।" এককসকলের[2] পারম্পর্য্য ভিন্ন অন্য কোনও ভাবেই পরিমাণের ধারণা করা সম্ভবপর নহে। একটি মাত্র এককের

[1] Simultaneity [2] Units

কল্পনা করিয়া যদি কল্পনা ক্ষান্ত হয়, তাহা হইলে পাওয়া যায় "এককের" ধারণা। একের পরেই ক্ষান্ত না হইয়া কল্পনা-প্রবাহ কিছুক্ষণ চলিবার পরে ক্ষান্ত হইলে উৎপন্ন হয় "বহুত্বে"র ধারণা; যদি কল্পনার ছেদ একেবারেই না হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন হয় সমগ্রের[1] ধারণা।

কালের আধেয়[2]—অর্থাৎ যাহাদ্বারা কাল পরিপূর্ণ, কালের মধ্যে যাহা অবস্থিত, তাহার কল্পনাই গুণ-প্রকারের Schema। কাল যাহাদ্বারা পূরিত হয়, কাল ব্যাপিয়া যাহার স্থিতি, তাহাই "বাস্তবতা"[3]। "বাস্তবতার" সম্প্রত্যয় প্রত্যক্ষ কোনও দ্রব্যে প্রয়োগ করিতে হইলে, কালের অংশবিশেষ পূর্ণ[4] বলিয়া কল্পনা করিতে হয়—ব্যাপ্ত কালের ব্যাপকের কল্পনা করিতে হয়। "ব্যতিরেকের" বিশুদ্ধ প্রত্যয়ের ধারণা করিতে হইলে শূন্য কালের কল্পনার প্রয়োজন।

"সম্বন্ধ"-প্রকারের Schema পাওয়া যায় কালিক ক্রম[5] হইতে। সম্বন্ধের তিনটি বিভাগের মধ্যে দ্রব্যত্বের ধারণা "বাস্তবতার স্থায়িত্ব" অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন কাল-ব্যাপিত্বের কল্পনা হইতে উদ্‌ভূত হয়। যাহা কালব্যাপী, তাহাই বাস্তব। এই কালব্যাপিত্ব যখন অন্তহীন রূপে কল্পিত হয়, তখন দ্রব্যত্বের ধারণার উদ্‌ভব হয়। অব্যভিচারী পারম্পর্য্যের কল্পনা হইতে কার্য্য-কারণের ধারণা উদ্‌ভূত হয়, এবং দুইটি দ্রব্যের অবস্থাসমূহের নিয়মিত ভাবে একত্রাবস্থিতির[6] কল্পনা হইতে ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ার-ধারণা উৎপন্ন হয়। কোনও দ্রব্যের বিশেষ কোনও অবস্থার সঙ্গে অন্য একটি দ্রব্যের বিশেষ কোনও অবস্থার একত্র অবস্থিতিই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। বিধা Categoryর Schema পাওয়া যায় সমগ্রকালের সহিত বস্তুবিশেষের সম্বন্ধের কল্পনা হইতে, অর্থাৎ কোনও বস্তু কালের সহিত যে ভাবে সম্বদ্ধ, তাহার কল্পনা হইতে। কালের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যই সম্ভাব্যতা; কোনও নির্দ্দিষ্টকালে স্থিতিই অস্তিত্ব, এবং সর্ব্ব কালে স্থিতিই নিয়তি। ইহা হইতে দেখা যায়, যে সকল "প্রকারে"র সহিতই কালের সম্বন্ধ আছে।

বাহ্য উত্তেজন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের উপর পতিত হইবার ফলে যে সকল অনুভূতির উৎপত্তি হয়, তাহারা অসম্বদ্ধ ও অর্থহীন। মনঃ তাহাদিগকে দেশ ও কালের মধ্যে স্থাপন করার ফলে তাহারা বাহ্য পদার্থ, এই মাত্র জ্ঞান হয়। বুদ্ধি তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করে। এই সম্বন্ধ বুদ্ধিকর্ত্তৃক সৃষ্ট, অথবা কেবল আবিষ্কৃত হয়, তাহা পরে আলোচিত হইবে। শ্রেণীভুক্তি ও সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠার জন্য বুদ্ধিকে যে সকল সম্প্রত্যয়ের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়, উপরে তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল সম্প্রত্যয় প্রত্যক্ষপূর্ব্ব হইয়া কিরূপে

---

[1] Totality [2] Contents of time [3] Reality
[4] Filled [5] Order of time
[6] Regular Co-existence of the states of one Substance with the states of the other

সংবেদনদিগের উপর প্রযুক্ত হয়, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। এই প্রসঙ্গে "কালের" প্রত্যয়ের মধ্যবর্ত্তিতার সহিতও আমরা পরিচিত হইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেক "প্রকার" ও তাহার Schema ইন্দ্রিয়ের বিষয়দিগকে প্রকারবিশেষে বুদ্ধির এক একটি সার্ব্বিক রূপের[1] অধীনে আনয়ন করে, এবং এই প্রকারে জ্ঞানের রাজ্যে একত্ব ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হয়। ইন্দ্রিয়বিষয়দিগকে সু-সম্বদ্ধ অভিজ্ঞতায় পরিণত করিবার জন্য প্রত্যেক "প্রকারে"রই কতকগুলি জ্ঞান-তত্ত্ব[2] অথবা প্রত্যক্ষপূর্ব্ব নিয়ম আছে। সেই নিয়মগুলি এই :—(১) ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বিষয় যখন দেশ ও কালের মধ্যে গৃহীত হয়, তখন তাহারা পরিমাণরূপে[3] প্রতীত হয়, অর্থাৎ তাহারা পরিমাণযুক্ত এই জ্ঞান হয়। তাহারা স্থানব্যাপী ও বিভিন্ন অংশের সমষ্টিরূপে গৃহীত হয়। এই ভাবে ভিন্ন কোনও জ্ঞানই হইতে পারে না। এই জন্য বিস্তারযুক্ত দ্রব্যের যে ধর্ম্ম, (জ্যামিতিক ধর্ম্ম), ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাবতীয় দ্রব্যই সেই ধর্ম্মযুক্তরূপে প্রতীত হয়। এই তত্ত্বগুলি অব্যবহিত জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ[4] ; সকল প্রত্যক্ষ জ্ঞানই ইহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সংবেদন দেশ অথবা কালে বিস্তৃত পদার্থ নহে। ইহার বিস্তার নাই, কিন্তু প্রাখর্য্যের পরিমাণ আছে, তীব্রতার ইতর বিশেষ আছে—কোনটির তীব্রতা বেশী, কোনটির কম। মনকে উত্তেজিত করিতে হইলে, যে পরিমাণ শক্তির সহিত তাহার উপর আঘাতের প্রয়োজন, আঘাত তাহা অপেক্ষা কম হইলে, কোনও দ্রব্যই জ্ঞানগোচর হয় না। প্রত্যক্ষ যাবতীয় দ্রব্যেরই যেমন পরিমাণ আছে, যেমন বিস্তার[5] আছে, তেমনি প্রখরতাও[6] আছে। বিস্তারের নিয়ম সকল যেমন তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, প্রাখর্য্যের নিয়মও তেমনি প্রযোজ্য। সুতরাং দ্রব্যের যাবতীয় শক্তি ও গুণের অসংখ্য পরিমাণভেদ আছে। তাহাদের হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে। যাহা প্রকৃত সত্তাবান্, কিছু না কিছু "পরিমাণ"[7] তাহার থাকিবেই, তাহা যতই কম হউক না কেন। এই তত্ত্ব-সকল—Anticipations of Sensation অর্থাৎ সংবেদনের পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়ম, সংবেদনের জ্ঞানের নিয়ম।

উপরি উক্ত তত্ত্বগুলি ব্যাপ্তি, পরিমাণ ও গুণ-সম্বন্ধী। প্রথম তত্ত্বটির সহিত গণিতের পরিমাণের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। দ্বিতীয় তত্ত্বটির সম্বন্ধ গুণের পরিমাণের সহিত। জ্ঞানের বিষয় প্রত্যেক বস্তুই সংখ্যা অথবা 'গুণ-পরিমাণ-যুক্ত রূপেই জ্ঞানে প্রবেশ করে। অন্য কোন ভাবেই তাহাদিগকে বুঝিতে পারা যায় না।

(৩) জ্ঞানের বিষয় পদার্থসকলের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ না থাকিলে জ্ঞান সম্ভবপর হয় না। নিয়ত সম্বন্ধ না থাকিলে প্রত্যক্ষের বিষয় বস্তুসকল কেবল বিক্ষিপ্ত ও অর্থহীন পদার্থের সমষ্টিমাত্র হইত। সম্বন্ধ-সম্বন্ধে প্রথম তত্ত্ব :—(ক) যাবতীয় পরিণামের মধ্যে পরিণামের আধার যে দ্রব্য,[8] তাহা অপরিবর্ত্তিত থাকে। যেখানে

[1] Universal form of the intellect [2] Principle of Cognition
[3] Magnitude [4] Axioms of Intuition [5] Extent
[6] Intensity [7] Degree [8] Substance

নিত্য কিছু নাই, সেখানে নির্দ্দিষ্ট কোনও কালিক সম্বন্ধও থাকিতে পারে না, কালের অল্পাধিক পরিমাণের নিরূপণও সম্ভবপর হয় না। কোনও বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পার্থক্যের নির্দ্দেশ করিতে হইলে, অথবা কোনও অবস্থা অন্য অবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইলে, সেই বস্তুকে তাহার বিভিন্ন অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ধারণা করিতে হয়, নানা পরিণামের মধ্যে তাহাকে স্থির ও অপরিণামী মনে করিতে হয়। এই অপরিণামী পদার্থের ধারণা, যদি বুদ্ধি হইতে পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে যৌগপদ্য অথবা পারম্পর্য্যের কোনও জ্ঞানই হইতে পারিত না। (খ) সম্বন্ধ-বিষয়ে দ্বিতীয় তত্ত্ব এই :— দ্রব্যের পরিণাম কার্য্য-কারণের নিয়মের অধীন। প্রত্যেক ঘটনা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনার সহিত সম্বদ্ধ। দ্রব্যের একটি অবস্থা হইতে তাহার পরবর্ত্তী অবস্থার উদ্‌ভব অবশ্যম্ভাবী। এই সম্বন্ধই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ আছে বলিয়াই কোনও ঘটনার সহিত তাহার পরবর্ত্তী ঘটনার সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট। ইহা না থাকিলে জ্ঞানই সম্ভবপর হইত না। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ না থাকিলে, অসম্বদ্ধ মানসিক অবস্থা ভিন্ন কিছুই আমরা জানিতে পারিতাম না। (গ) সম্বন্ধের তৃতীয় তত্ত্ব :—এক সঙ্গে বর্ত্তমান যাবতীয় বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বর্ত্তমান। পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনার মধ্যে যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। একসঙ্গে এক সময়ে বর্ত্তমান বস্তুসকলের মধ্যে যে কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহা নহে। তাহারা পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে, এবং সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াও উৎপন্ন হয়। দেশ ও কালের মধ্যে অবস্থিত বস্তুর মধ্যেই এই সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সম্বন্ধের এই তিন তত্ত্ব "অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য"[১] নামে অভিহিত হইয়াছে। আমাদের চিন্তার মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান, বাহ্য জগতে বস্তু-জগতের মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান, ইহাই এই সকল তত্ত্বের অর্থ, এইজন্যই ইহাদিগকে analogies বলা হইয়াছে।

(৪) বিধা[২] প্রকারের তিনটি স্বীকার্য্য বিষয় এই : (ক) অভিজ্ঞতার আকারগত প্রতিবন্ধের[৩] সহিত যাহার সামঞ্জস্য আছে, তাহাই সম্ভাব্য[৪]। (খ) অভিজ্ঞতার বস্তুগত প্রতিবন্ধের সহিত যাহার সামঞ্জস্য আছে, তাহা বাস্তব[৫]। (গ) অভিজ্ঞতার সার্ব্বিক প্রতিবন্ধের মাধ্যমে যাহা বাস্তব সত্যের সহিত সম্বদ্ধ, তাহাই নিয়ত। অভিজ্ঞতার আকার গত প্রতিবন্ধ কি? দেশ ও কালে এবং Categoryদিগের আকারে আকারিত না হইলে কোনও জ্ঞানই হয় না। সুতরাং যাহার উপর দেশ, কাল ও প্রকারদিগের প্রয়োগ সম্ভবপর তাহাই সম্ভাব্য। সংবেদনই অভিজ্ঞতার বস্তুগত প্রতিবন্ধ। যাহা অব্যবহিত অথবা ব্যবহিত ভাবে সংবেদনের সহিত সম্বদ্ধ, তাহাই বাস্তব। কার্য্য-কারণের নিয়ম অভিজ্ঞতার সার্ব্বিক প্রতিবন্ধ। প্রত্যেক ঘটনাই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সংঘটনের পরেই পরবর্ত্তী ঘটনার সংঘটন অনিবার্য্য, এই অর্থে কার্য্য ও

[1] Analogies of Experience [2] Modality
[3] Formal Condition [4] Possible [5] Actual

কারণকে নিয়ত অথবা অবশ্যম্ভব বলা হয়। এই তিন তত্ত্বকে ক্যাণ্ট "প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বীকার্য্য বিষয়"[1] নাম দিয়াছেন।

ক্যাণ্টের মতে কেবল উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাগুলিই সংশ্লেষ-মূলক প্রত্যক্ষপূর্ব্ব বিচার। জ্ঞান কি, কিরূপে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, জ্ঞানের সত্যতা কতটা প্রভৃতি নিরূপণই Critique of Pure Reasonএর উদ্দেশ্য। মানুষের মনঃই জ্ঞানের উৎপত্তি-স্থান। যে সকল শক্তি মানুষের উপর ক্রিয়া করে, তাহাদের ক্রিয়া বৃক্ষ, পর্ব্বত প্রভৃতির উপরও বর্ত্তমান, কিন্তু শেষোক্ত বস্তুদিগের মধ্যে জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার কারণ মানুষের মধ্যে সংবিদ আছে, উহাদের মধ্যে তাহা নাই। একমাত্র সংবিদই জ্ঞানের আধার। এই সংবিদে জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা জ্ঞানের দুইটি ক্রমের সহিত পরিচিত হইয়াছি, একটি ইন্দ্রিয়-সহায় মনের কার্য্য, দ্বিতীয়টি বুদ্ধি-সহায় মনের কার্য্য। ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে মনঃ প্রাপ্ত হয় কতকগুলি অস্পষ্ট অনুভূতি, যাহা ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে উৎপন্ন হয়। এই সকল অনুভূতি বুঝিতে গিয়া মনঃ তাহাদিগের সহিত মিশ্রিত করে দেশ ও কালের জ্ঞান—যাহা তাহার নিজের মধ্যেই সুপ্ত থাকে। পাকযন্ত্রের ভিতর হইতে যে রস নিঃসৃত হয়, তাহার সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য যেমন পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকলও মনঃ হইতে ক্ষরিত দেশ ও কালের জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত হইয়া অর্দ্ধ পরিপক্ক হয়। পাকস্থলীর অর্দ্ধ পরিপক্ক ভুক্ত দ্রব্য যেমন অন্ত্রে স্থানান্তরিত এবং তথায় সম্পূর্ণ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রক্ত, মাংস ও মেদে পরিণত হয়, তেমনি মনের নিম্ন কক্ষে অর্দ্ধ-জীর্ণ জ্ঞানোপাদান, দেশ ও কালের রাগে রঞ্জিত সংবেদন উপরিস্থিত বুদ্ধিকক্ষে নীত হয়, এবং তথায় সেই অর্দ্ধ-পক্ক জ্ঞানের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় বুদ্ধি হইতে ক্ষরিত নানাবিধ জ্যোতির্ম্ময় রস। সেই রসে পূর্ণ পরিপাক লাভ করিয়া জ্ঞানের উপাদান সকল জ্ঞানে পরিণত হয়, এবং আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই জ্যোতির্ম্ময় রসের সংখ্যা ক্যাণ্টের মতে বারোটি—তাহারাই ১২টি "প্রকার"। সেই প্রকারদিগের আলোকে দেশকালবর্ত্তী সংবেদনসকল প্রকাশিত হইয়া সু-সম্বদ্ধ জ্ঞানে পরিণত হয়, এবং বহির্জগতের যাবতীয় ঘটনা ইহাদের রূপে রূপান্বিত হইয়া জ্ঞান-গোচর হয়।

"প্রকার"গণ মানসিক প্রত্যয় হইলেও কিরূপে বিজাতীয় সংবেদনের উপর ইহাদের প্রয়োগ সম্ভবপর হয়, তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দেশ ও কালও মানসিক পদার্থ। কিন্তু মানসিক পদার্থ হইয়াও কিরূপে তাহারা বিজাতীয় সংবেদনের উপর প্রযুক্ত হয়, ক্যাণ্ট সে প্রশ্নের উত্থাপন করেন নাই, কিন্তু প্রকারদিগের বেলায় সে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এবং কালের ধর্ম্মদ্বারা তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ সংবেদনও মানসিক পদার্থ। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বিজাতীয় পদার্থের কথা উঠিবার সঙ্গত কারণ নাই। বাহ্য জড় পদার্থকর্ত্তৃক তাহারা উৎপন্ন হয়। ইহা ধরিয়া লইয়াই ক্যাণ্ট তাহাদিগকে বিজাতীয় বলিয়াছেন। এই বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ আছে, কিনা তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে।

---

[1] Postulates of Empirical Thought

বুদ্ধির উপরি উক্ত সম্প্রত্যয়দিগের (প্রকারদিগের) কেবল প্রত্যক্ষের উপরেই প্রয়োগ হইতে পারে, প্রত্যক্ষের বাহিরে তাহাদের উপযোগিতা নাই। যে সকল পদার্থ অভিজ্ঞতার বিষয় অথবা অভিজ্ঞতার বিষয় হইবার উপযুক্ত, তাহাদের উপর ভিন্ন অন্যত্র উক্ত প্রত্যয়সকলের ব্যবহার হইতে পারে না। বিষয়ের অভাবে এই সকল সামান্য প্রত্যয় যেমন শূন্য আকার[১] মাত্র, কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যেই যেমন ইহাদের বিষয় বর্ত্তমান, তেমনি দেশ ও কালের শূন্য আকারও কেবল সংবেদনদ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে। বিষয়ের সহিত সংযোগবিহীন এই সকল প্রত্যয় ও তত্ত্ব বুদ্ধি ও কল্পনার খেলা মাত্র।

অতীন্দ্রিয় আত্ম-জ্ঞান

ক্যাণ্ট জ্ঞানের উৎপত্তির ব্যাখ্যায় Transcendental Apperception অর্থাৎ অতীন্দ্রীয় প্রতীতির কথা বলিয়াছেন। এই অতীন্দ্রিয় প্রতীতি-সম্বন্ধে ক্যাণ্টের ভাষ্যকারগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। জ্ঞানের উৎপত্তিতে মনের যে দান আছে, পূর্ব্বে তাহা আলোচিত হইয়াছে। মনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুইটি রূপ। সুতরাং মনের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, মনের উভয় রূপেরই জ্ঞান প্রয়োজনীয়—মনের ক্রিয়া ও তাহার "অবস্থা",[২] উভয়ের জ্ঞানই আবশ্যক। মনের বিভিন্ন অবস্থা "কালে"র মধ্যে অবস্থিত, তাহারা একটির পরে একটি আবির্ভূত হয়, এবং অনবরত পরিবর্ত্তিত হয়। মনের এই কালিক অবস্থার জ্ঞান Empirical Apperception বা অভিজ্ঞতার আত্ম-জ্ঞান। কিন্তু মনের ক্রিয়ার—মনন বা চিন্তার—যে জ্ঞান, তাহা Transcendental Apperception বা অতীন্দ্রিয় আত্ম-জ্ঞান। এখন মনের এই ক্রিয়া কি? জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদানকে সংশ্লিষ্ট করিয়াই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। জ্ঞানে প্রকাশিত প্রত্যেক বস্তু বহুর সমবায়। ফুলের বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ ও রূপের সংবেদনদিগের সংশ্লেষণ হইতেই ফুলের জ্ঞান হয়। এই সমস্ত সংবেদন আপনা হইতে মিলিত হয় না। তাহাদিগকে মিলিত করা এবং মিলনের দ্বারা জ্ঞান-উৎপাদন মনের কাজ। এই সংশ্লেষণ যে কেবল প্রত্যেক বস্তুর উপাদান সংবেদনদিগেরই হয়, তাহা নহে। প্রত্যক্ষ যাবতীয় বস্তু পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় মনের ক্রিয়াদ্বারা ("প্রকার" ও ঐন্দ্রিয়িক উপজ্ঞা দুইটির প্রয়োগদ্বারা)। পারস্পরিক এই সম্বন্ধের ফলে আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি একত্বের উদ্ভব হয়। এই সম্বন্ধ ও একত্বের প্রতিষ্ঠার যে অতীন্দ্রিয় ভিত্তি, তাহাকেই ক্যাণ্ট Trancendental Unity of Apperception বলিয়াছেন। সংবেদন-সকল এই ভিত্তি হইতে উদ্ভূত হয় না, কিন্তু তাহাদেরই সংশ্লেষণদ্বারা একত্বের প্রতিষ্ঠা এই ভিত্তির কার্য্য। এই অতীন্দ্রিয় ভিত্তি যাবতীয় প্রত্যয়ের উৎস। এই ভিত্তিকে ক্যাণ্ট কোথাও শক্তি,[৩] কোথাও ক্রিয়া,[৪] বলিয়াছেন। আমাদের যাবতীয় প্রত্যয়ের সহিত "আমি-মনন (চিন্তা) করিতেছি" এই প্রত্যয় যুক্ত থাকে। প্রত্যেক প্রত্যয়ের সহিত এই "আমি"র প্রত্যয় স্বতঃই উদ্ভূত হয়। জ্ঞানের প্রত্যেক অংশের সহিত "ইহা আমার জ্ঞান", এই

[1] Form [2] States [3] Faculty or Power [4] Act

জ্ঞান মিশ্রিত থাকে। ইহাদ্বারাই সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই "আমি"র জ্ঞানই Apperception বা আত্ম-জ্ঞান। এই "আমির" প্রত্যয় এবং "আত্মস্মৃতি" বা "আত্মার অভিন্নতা জ্ঞান[1] ক্যাণ্ট অভিন্ন বলিয়াছেন।* এই আমি জ্ঞানের অতীন্দ্রিয় ভিত্তিই আত্ম-সংবিদ, ইহাই Transcendental Apperception, "বিশুদ্ধ, মৌলিক ও অপরিণামী সংবিদ", "অহমের অভিন্নতার মৌলিক ও অবশ্যক সংবিদ।" ইহা কেবল মননক্রিয়া নহে, মননের জ্ঞানও বটে, কেননা যাবতীয় মননের মধ্যে সেই মননের জ্ঞান ও মননক্রিয়ার একত্বের জ্ঞানও যুক্ত থাকে।

ক্যাণ্টের উপরোক্ত মতে চিন্তার একত্ব[2], প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই একত্ব "ক্রিয়ার" একত্ব, কোনও দ্রব্যের[3] একত্ব নহে। চিন্তার বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে যে অংশ সাধারণ, তাহা ও এই একত্ব এক নহে। এই সাধারণ অংশের আবিষ্কারের জন্য মনের বিভিন্ন ক্রিয়াকে একত্র ধারণ এবং তাহাদের তুলনার প্রয়োজন। এই "ধারণ" ও "তুলনা" একই ক্রিয়াদ্বারা সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। কালে আবির্ভূত প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গে যে "আমি" জ্ঞান যুক্ত থাকে, যাহাদ্বারা প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, কেবল তাহাই Transcendental Apperception নহে। চিন্তার প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে একত্বের প্রতিষ্ঠা যেমন ইহার কার্য্য, তেমনি এই সকল একত্ব-প্রতিষ্ঠা-কারী বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে একত্বও ইহা হইতেই উদ্ভূত হয়। এই একত্ব যাবতীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে বর্ত্তমান; সূত্রে মণিগণের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন যাবতীয় অভিজ্ঞতা এই একত্বের সূত্রে গ্রথিত। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অন্যান্য অভিজ্ঞতার সহিত সম্বন্ধ রূপেই আবির্ভূত হয়। কিন্তু এই সামগ্রিক অভিজ্ঞতা, যাহা সকল অভিজ্ঞতার ভিত্তি, তাহা কখনও সমগ্রভাবে মনের সম্মুখে উপস্থিত থাকে না। ইহারই অংশরূপে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তাহাদের বিভিন্ন অংশের সমবায়রূপে আবির্ভূত হয়, এবং যখন তাহারা আবির্ভূত হয়, তখন তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর একত্বে আমরা পৌছিতে পারি, এই বোধ আমাদের হয়। এই বোধশক্তি, চিন্তার এই ক্ষমতা, তাহার সম্মুখে উপস্থিত সমবেত প্রতিভাস-পুঞ্জকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়, এবং ভূমার সমগ্রতা ব্যতীত কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। ইহা প্রজ্ঞারই শক্তি।*

অতীন্দ্রিয় দ্বন্দ্বমূলক তর্কশাস্ত্র

(Transcendental Dialectic)

জ্ঞান কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, Transcendental Aesthetic এবং Transcendental Analyticএ তাহা বর্ণিত হইয়াছে। যে জগৎ আমাদের জ্ঞানের বিষয়

---

[1] Self-identity

* Vide H. J. Paton's Kant's Metaphysic. Vol I. P. 397 to 408.

[2] Unity of thought or thinking [3] Substance

* Vide Wallace's Kant—P. 181.

তাহা ইন্দ্রিয়ের উপজ্ঞা[1] এবং বুদ্ধির প্রকারদিগের[2] আকারে আকারিত জগৎ। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যাহা বুদ্ধির নিকট উপস্থিত হয়, কেবল তাহার উপরই বুদ্ধির প্রকারদিগের প্রয়োগ সম্ভবপর। ইন্দ্রিয়ের অতীত কোনও বিষয়ে তাহাদের প্রয়োগ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের যাহা বিষয় নহে, তাহার উপর তাহাদের প্রয়োগ করিলে ভ্রান্তির উদ্‌ভব অবশ্যম্ভাবী। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ প্রাক্-বর্ত্তিতা ও অনুবর্ত্তিতার সম্বন্ধ। সুতরাং যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, যাহার উপর কালের 'ছাপ' পড়ে নাই, তাহার উপর "কারণত্ব" প্রকারের প্রয়োগ হইবে কিরূপে? কিন্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অতিরিক্ত আর একটি বৃত্তি মনের আছে। তাহার নাম প্রজ্ঞা। ইহার অস্তিত্ববশতঃ মানবমনঃ প্রত্যক্ষের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে স্বীকৃত হয় না, তাহা প্রত্যক্ষের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইতে চায়। প্রত্যক্ষের বাহিরে যাহা অবস্থিত, তাহাই তত্ত্ববিদ্যার[3] বিষয়। ক্যাণ্টের মতানুসারে তত্ত্ববিদ্যা অসম্ভব হইলেও, মানব-চিন্তা প্রত্যক্ষের সীমা অতিক্রম করিতে চায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞানলাভের জন্য তাহাকে বুদ্ধির প্রকারদিগেরই ব্যবহার করিতে হয়, এবং ইহা হইতেই ভ্রান্তির উদ্‌ভব হয়।

ক্যাণ্ট প্রজ্ঞাকে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন এক বৃত্তি বলিয়াছেন। প্রাপ্ত[4] প্রত্যয়দিগের হইতে অন্য পদার্থের অনুমান প্রজ্ঞার কার্য্য। এই অনুমানদ্বারা সার্ব্বিকতম তত্ত্বের আবিষ্কারই প্রজ্ঞার লক্ষ্য। বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত থাকে অভিজ্ঞতায় লব্ধ পদার্থ, প্রজ্ঞার সম্মুখে আছে সংবিদ। সংবিদের পূর্ণতাসাধনই তাহার কার্য্য। সংবিদের পরিচিন্তনবৃত্তিই প্রজ্ঞা। এই পরিচিন্তন যে নিয়মে হয়, তাহা তর্ক বা ন্যায়ের নিয়ম। বুদ্ধির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয়, তাহার পূর্ণতা-সাধন এবং তাহার মধ্যে একত্বের প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা, তাহা প্রজ্ঞারই প্রচেষ্টা। সসীমের মধ্যে তাহা আবদ্ধ থাকিতে চায় না, তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট। কিন্তু তাহার জন্য বুদ্ধির প্রকারগণ ব্যতীত তাহার অন্য কোনও সাধন নাই। অভিজ্ঞতার বাহিরে প্রকারদিগের প্রয়োগ করিলে ভ্রান্তির উদ্‌ভব অনিবার্য্য।

বুদ্ধির প্রকারদিগের ব্যবহার হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা খণ্ড জ্ঞান। যাবতীয় খণ্ড জ্ঞানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় প্রজ্ঞা তিনটি প্রত্যয়ে উপনীত হয়। তাহাদের নাম :—(১) মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যয়,[5] (২) বিশ্বতাত্ত্বিক প্রত্যয়[6] এবং (৩) ধর্ম্মতাত্ত্বিক প্রত্যয়[7]। এই তিনটি প্রত্যয় প্রাক্ ক্যাণ্টীয় তত্ত্ববিদ্যার মৌলিক প্রত্যয়। ইহাদিগের বিষয় ইন্দ্রিয়াতীত। ইহাদিগের পরীক্ষাই Transcendental Dialecticএর উদ্দেশ্য।

[1] Intuitions of sense
[2] Categorios of the Understanding
[3] Metaphysics
[4] Given
[5] Psychological Idea
[6] Cosmological Idea
[7] Theological Idea

(১) প্রজ্ঞার সীমাতিক্রমণ*

মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যয়ের আলোচনার ফলে প্রাচীন মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন মতে আত্মা মনোধর্ম্মী, জড়ের বিপরীতধর্ম্মী, মৌলিক বস্তু, অবিনাশী, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, বুদ্ধিগুণান্বিত, সদা অভিন্ন, দ্রব্য, বিস্তৃতিবিহীন, মননশীল, অমর বস্তু। ক্যাণ্ট বলেন আত্মার বর্ণনাত্মক এই সকল বাক্যই হেত্বাভাসযুক্ত[1]—চক্রক-হেত্বাভাস দুষ্ট।[2] "আমি মনন করি" এই বাক্য হইতে এই সকল সিদ্ধান্তের উৎপত্তি, কিন্তু "আমি মনন করি" ইহা প্রত্যক্ষ প্রতীতিও নয়, সম্প্রত্যয়ও নয়। ইহা সংবিদের একটি বোধমাত্র, যাবতীয় প্রতীতি ও সম্প্রতীতির সহবর্ত্তী এবং তাহাদের ঐক্য-বিধায়ক মনের একটি ক্রিয়ামাত্র। মনের এই কার্য্যকে, একটি চিন্তাকে, বস্তুতে পরিণত করিয়া এই সকল বাক্য গঠিত হইয়াছে। বিষয়ী "আমি"র স্থলে বিষয়রূপে "আমি"কে স্থাপিত করা হইয়াছে, এবং যাহা বিষয়ী "আমি"র মধ্যগত, এবং যাহা তাহার সম্মুখে উপস্থিত বিষয়ের উপর প্রয়োজ্য, "আমি"কে বিষয়রূপে স্থাপিত করিয়া, তাহাতে তাহারই প্রয়োগ করা হইয়াছে। "আমি" কখনও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, সুতরাং তাহাকে "বিষয়"রূপে গণ্য করিয়া, তাহাতে দ্রব্য-প্রকারের প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং এই "আমি"র অমরতা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কল্পনায় চিন্তাকে দেহ হইতে বিযুক্ত করা সম্ভবপর হইলেও, যদি বস্তুতঃ দেহ হইতে বিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব অব্যাহত থাকিবে, ইহা যুক্তি সিদ্ধ হয় না।

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আত্মার ভ্রান্ত ধারণাকে ক্যাণ্ট "বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সীমাতিক্রমণ" বলিয়াছেন।

(২) বিশ্ববিজ্ঞানে বিষম প্রসক্তি*

বিশ্ববিজ্ঞানে প্রত্যক্ষের বাহিরে "প্রকার"দিগের প্রয়োগের ফলে যে সকল ভ্রান্তির উদ্ভব হয়, ক্যাণ্ট তাহাদিগকে Antinomy বলিয়াছেন। সমগ্র বিশ্ব আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু বিশ্ব সসীম কি অসীম, ইহার কোন সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে, অথবা ইহা অনাদি, বিশ্বের কারণ বা স্রষ্টা কেহ আছে কিনা, ইহার অস্তিত্ব অবশ্যক অথবা আগন্তুক, প্রভৃতি প্রশ্ন মনে উদিত হয়, এবং বুদ্ধির প্রকারদিগের প্রয়োগ করিয়া আমরা এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে চাই। ফলে পরস্পর বিরোধী কিন্তু তুল্যরূপেই সমর্থনযোগ্য মতের উদ্ভব হয়। এই সকল বিরোধী মতই antinomies.

---

* Paralogism of Pure Reason. (Para—beyond = অতিক্রমণ, Logos = Reason = প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাকর্ত্তৃক অতিক্রমণ।)

[1] Fallacious [2] Petitio Principii

* Antinomies of Cosmology.

বিশ্বে 'পরিমাণ' প্রকারের প্রয়োগের ফলে যে দুইটি বিরোধী সিদ্ধান্তের উদ্ভব হয়, তাহারা এই: (১) দেশ ও কালে বিশ্ব সীমাবদ্ধ, অতীতে এক সময়ে ইহার উদ্ভব হইয়াছে, এবং দেশেও ইহার সীমা আছে। (২) কালে বিশ্বের আরম্ভ হয় নাই; বিশ্ব অনাদি ও অসীম, দেশে ইহার সীমা নাই।

বস্তুর স্বরূপ অভিজ্ঞতার বিষয় নহে, তাহাতে গুণ "প্রকারের" প্রয়োগের ফলে যে সকল বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা এই: (১) প্রত্যেক যৌগিক পদার্থ মৌলিক পদার্থের সমষ্টি, এবং জগতে মৌলিক পদার্থ ও তাহাদের সমবায়ে গঠিত যৌগিক পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু নাই; (২) মৌলিক পদার্থের সমবায়ে গঠিত কোনও যৌগিক পদার্থ নাই, এবং জগতে মৌলিক কোনও পদার্থই নাই।

জগতে সংঘটিত যাবতীয় কার্য্যের জন্য সামগ্রিক কারণ-শ্রেণীর আবিষ্কারে "কারণত্ব" প্রকারের প্রয়োগের ফলে আমরা পাই: (১) প্রকৃতির মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের যে নিয়ম দেখা যায়, কেবল তাহাদ্বারা সামগ্রিক ব্যাপার-পুঞ্জের ব্যাখ্যা হয় না। তাহার জন্য ইচ্ছারূপ কারণেরও প্রয়োজন, (২) স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্বই নাই, জগতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই যাবতীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়।

জগতে আগন্তুক ব্যাপারের ব্যাখার জন্য "বিধা প্রকারের" প্রয়োগ হইতে যে দুইটি বিরোধী সিদ্ধান্ত উদ্‌ভূত হয়, তাহারা এই: (১) জগতের অংশরূপেই হউক অথবা জগতের কারণ-রূপেই হউক, জগতে এমন কিছু আছে, যাহা সম্পূর্ণভাবে অবশ্যক বা নিয়ত, (২) জগতের মধ্যে অথবা বাহিরে তাহার কারণ-স্বরূপ কোনও সম্পূর্ণ অবশ্যক সত্তা নাই।

(৩) ধর্ম্মতাত্ত্বিক প্রত্যয়

ঈশ্বরের অস্তিত্ব-প্রমাণের জন্য প্রাচীন ধর্ম্মতাত্ত্বিকগণ, যে সকল যুক্তির ব্যবহার করিয়াছিলেন, ক্যাণ্ট তাহাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমত: (ক) সত্তার প্রমাণ। যুক্তিদ্বারা কিরূপে পূর্ণতম সত্তার ধারণা করা যায়, ক্যাণ্ট প্রথমে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই পূর্ণতম বস্তুর ধারণা হইতে আন্‌সেলম্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন। পূর্ণতার মধ্যে যে সকল গুণের সমাবেশ, "অস্তিত্ব" তাহাদের মধ্যে একটি গুণ। পূর্ণতার পক্ষে "অস্তিত্ব" অপরিহার্য্য। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহাকে পূর্ণ বলা যায় না। পূর্ণ পদার্থ সম্ভবপর অর্থাৎ তাহাতে অসম্ভাব্যত্ব কিছু নাই। কিন্তু সেই সম্ভবপর পূর্ণ পদার্থের অস্তিত্বই যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ণ বলা যায় না। সুতরাং পূর্ণ পদার্থের যে অস্তিত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই সত্তামূলক যুক্তি[1] পূর্ণ পদার্থের প্রত্যয়ের অস্তিত্ব হইতে, তাহার বাস্তব অস্তিত্বের প্রামাণ।

এই যুক্তির সমালোচনায় ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, সত্তাকে বিধেয়রূপে কোনও প্রত্যয়ের সহিত যোগ করা যায় না। কোনও দ্রব্যের সমস্ত গুণযুক্ত অবস্থাই তাহার সত্তা; সত্তা

[1] Ontological Argument

একটি স্বতন্ত্র গুণ নহে। সত্তা না থাকিলে কোনও প্রত্যয়ের অর্থের বিন্দুমাত্র ইতরবিশেষ হয় না। সুতরাং কোনও প্রত্যয়ের সহিত সম্পৃক্ত ভাবের সমস্তই বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহাদ্বারা সেই প্রত্যয়ের বস্তুগত সত্তা প্রমাণিত হয় না। সত্তা ন্যায়-শাস্ত্রের Copula ("is"—এই ক্রিয়া) ব্যতীত আর কিছু নহে। ইহার প্রয়োগদ্বারা বাক্যের উদ্দেশ্যে নূতন কিছুই আরোপিত হয় না। সুতরাং কোন পদার্থকে পূর্ণতম বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে, কিন্তু সেই ধারণাদ্বারা সেই পদার্থের বস্তুগত অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। তাহাকে পূর্ণতম বলিয়া ধারণা করিলেও, তাহা সম্ভাব্যমাত্র হইতে পারে।

ইহার পরে ক্যাণ্ট বিশ্ববৈজ্ঞানিক[২] প্রমাণের আলোচনা করিয়াছেন। কোনও বস্তুর অস্তিত্ব থাকিলে, তাহার কারণ-স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে নিয়ত অথবা অবশ্যম্ভব অন্য এক বস্তুর অস্তিত্বের প্রয়োজন। আমি নিজে যে আছি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমার অস্তিত্বের কারণ-স্বরূপ সম্পূর্ণ নিয়ত অন্য কোনও বস্তুও নিশ্চয়ই আছে। সেই বস্তুই ঈশ্বর। ইহাই বিশ্ববৈজ্ঞানিক প্রমাণ। পূর্ব্বে বিশ্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে বিষম-প্রসক্তি সকলের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার চতুর্থটিতে জগতের অংশরূপে অথবা কারণরূপে এক নিয়ত পদার্থের কথা আছে। এই নিয়ত পদার্থের অনুমান করা হয় প্রাতিভাসিক জগতের কারণ-রূপে। প্রাতিভাসিক জগৎ আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়, কিন্তু যাহাকে তাহার কারণরূপে অনুমান করা হয়, তাহা প্রত্যক্ষের বাহিরে। প্রত্যক্ষের যাহা, অতীত, তাহাতে কার্য্য-কারণ-প্রকারের প্রয়োগ করা হইতেছে। এই জন্যই এ অনুমান অসঙ্গত। কিন্তু এ অনুমান যদি সঙ্গতও হইত, তাহা হইলেও এই যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইত না। এইজন্য এই যুক্তিতে আরও বলা হয়, যে যাবতীয় সৎবস্তুর সমষ্টি যে সত্তা, কেবল তাহার পক্ষেই সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভব হওয়া সম্ভবপর। এই বাক্যকে অন্তরাবর্ত্তিত[৩] করিলে দাঁড়ায়—"যে সত্তা যাবতীয় সৎবস্তুর সমষ্টি, তাহা সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভব।" ইহা পূর্ব্বোক্ত Ontological প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। নূতন পরিচ্ছদে সজ্জিত সেই পুরাতন প্রমাণমাত্র।

ইহার পরে ক্যাণ্ট Physico-Theologocal অথবা Teleoligical (সন্নিবেশ বিশিষ্টতা) প্রমাণের আলোচনা করিয়াছেন। জগতে সন্নিবেশ-বিশিষ্টতার[৩] পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়—উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাহার উপযোগী উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, ইহা দেখা যায়। জগতের উপাদানসকল সর্ব্বত্রই এমনভাবে বিন্যস্ত, যে কোনও উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই তাহারা ঐ ভাবে বিন্যস্ত বলিয়া প্রতীতি হয়। জগতের যে দিকে দৃষ্টি-পাত করা যায়, সর্ব্বত্রই বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়াস দৃষ্টিগোচর হয়। এই উদ্দেশ্য কাহার? সন্নিবেশ-কর্ত্তা নিশ্চয়ই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান সত্তা। এই নিশ্চিত কর্ত্তা যে সমস্ত সত্তার মধ্যে বাস্তবতম,[৪] তাহাও নিশ্চিত। ক্যাণ্ট বলেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের যত প্রমাণ আছে, তাহার মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু ইহাতেও নিশ্চয়তা পাওয়া

---

[1] Cosmological Argument
[2] Inverted
[3] Design
[4] Most real

যায় না। এই যুক্তিতে জগতের আকার দেখিয়া সেইরূপ আকার-সৃষ্টি করিতে সমর্থ কারণের অনুমান করা হইয়াছে। সেই কারণ জগতের উপাদানে আকারদানে সমর্থ হইলেও, তাহাদের স্রষ্টা না হইতে পারেন। যে সকল উপাদান বর্ত্তমান ছিল, তাহা দিয়াই তিনি জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন—এই যুক্তি হইতে ইহার অধিক কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি যে উপাদানেরও সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা প্রমাণিত হয় না। এই ত্রুটির সংশোধনের জন্য Cosmological Argumentএর সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। Cosmological প্রমাণদ্বারা তিনি যে বিশ্বের উপাদান-রাজির অস্তিত্বেরও কারণ, তাহা প্রমাণ করা হয়। এই যুক্তি স্বীকার করিলেও ঈশ্বর বলিতে যাহা বোঝা যায়, তাহা প্রমাণিত হয় না। বিশ্বের কারণরূপে যাহার অস্তিত্ব অনুমান করা হয়, তাহার পূর্ণতা[1] যে বিশ্বের পূর্ণতার অধিক, তাহা অনুমান করা যায় না। কিন্তু বিশ্বের মধ্যে অনপেক্ষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং এই যুক্তিদ্বারা বিশ্বের কোনও অনপেক্ষভাবে পূর্ণ[2] স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। তাঁহার পূর্ণতা যে অসীম, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আবার Ontological প্রমাণের সাহায্য লইতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সন্নিবেশ-যুক্তির সহিত বিশ্বতাত্ত্বিক এবং সত্তামূলক প্রমাণের যোগ করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হয়। কিন্তু এই দুই প্রমাণ যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু ইহাই যদি হয়—প্রজ্ঞার এই সকল প্রত্যয়ের যদি বিষয়গত সত্যতা না থাকে, তবে আমাদের মনে তাহাদের অস্তিত্বের কারণ কি? এই সকল প্রত্যয় যখন অবশ্যম্ভব, তখন তাহাদের অস্তিত্বের কারণ নিশ্চয়ই আছে। ইহার উত্তরে ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, যদিও এই সকল প্রত্যয়ের বস্তুগত সত্যতা নাই, তথাচ তাহাদের প্রয়োজন আছে। জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, আমাদের মানসিক বৃত্তিনিচয়ের যথোচিত বিন্যাস এবং মানসিক অবস্থাসকলের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হয়। জগতের একজন বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, ইহা অস্বীকার না করিয়াও জাগতিক কারণশ্রেণী যে অসীম, বিশ্ববৈজ্ঞানিক প্রত্যয় হইতে একরূপ একটি সংকেত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় সমগ্র জগৎকে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্বদ্ধ বলিয়া ধারণা করিতে সাহায্য করে। যদিও এই সকল প্রত্যয়ের বস্তুগত সত্যতা নাই, এবং ইহাদের দ্বারা কোনও নূতন সত্যজ্ঞানলাভ হয় না, তথাপি অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানকে উপরি উক্ত প্রকারে সজ্জিত এবং কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ও জটিলতা হইতে মুক্ত করিতে সাহায্য করে।

ইহা ভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রেও এই সকল প্রত্যয়ের উপকারিতা আছে। এক রকম নিশ্চিতি-জ্ঞান আছে, যাহা বাস্তবিক সত্য না হইলেও, ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন আছে। এইরূপ জ্ঞানকে "বিশ্বাস"[3] বলে। ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় না হইলেও, যখন এই বিশ্বাস প্রজ্ঞা আমাদের উপর চাপাইয়া

[1] Perfection [2] Absolutely perfect [3] Belief or Conviction

দেয়, তখন কর্ম্মনীতির ক্ষেত্রে • নিশ্চয়ই এই বিশ্বাসের মূল্য আছে। যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও, এই বিশ্বাসের সত্যতা-সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই। আমাদের মনে যে ন্যায়ান্যায় বোধ আছে, তাহাই এই বিশ্বাসের ভিত্তি। চরিত্রের উপর এই বিশ্বাসের ফল মঙ্গলজনক।

• এই খানেই Critique of Pure Reasonএর পরিসমাপ্তি। এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে Will Durant যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "হিউম ছিলেন জাতিতে স্কট্। ক্যাণ্টের দেহেও স্কটিশ রক্ত ছিল। কিন্তু ক্যাণ্টের দর্শনের পরিণাম দেখিয়া হিউমের মুখে কুটিল হাস্যের আবির্ভাব কল্পনা করা যায়। ৮০০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিশাল গ্রন্থ ভীষণ ভীষণ নামদ্বারা এতই কণ্টকিত, যে পড়িতে ধৈর্য্য রক্ষা করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। ইহার উদ্দেশ্য তত্ত্ববিদ্যার যাবতীয় সমস্যার সমাধান, এবং বিজ্ঞানের অনপেক্ষতা ও ধর্ম্মের যাহা সার, তাহা সন্দেহবাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই গ্রন্থের ফল কি হইয়াছে? ইহা সাধারণ লোকের সরল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক জগতের ধ্বংসসাধন করিয়াছে, জগতের পরিধি সংকুচিত করিয়া তাহার উপরিভাগের ইন্দ্রিয়গম্য রূপের মধ্যে তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছে, এবং সেই সীমা উল্লঙ্ঘন করিলে বিষম-প্রসক্তির উদ্ভব হয়, বলিয়াছে। ইহাই বিজ্ঞান-রক্ষার প্রচেষ্টার ফল! গ্রন্থের সুন্দরতম বচন-বিন্যাস-ও-পাণ্ডিত্য-পূর্ণ অংশে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, যে জীবাত্মার স্বাধীনতা ও অমরতার প্রমাণ নাই, এবং মঙ্গলময় সৃষ্টি-কর্ত্তার অস্তিত্বও যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হয় না। ইহাই ধর্ম্ম-রক্ষার প্রচেষ্টার ফল! জার্ম্মানীর পুরোহিতগণ এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছিল, এবং তাহাদের কুকুরদিগকে ইমানুয়েল ক্যাণ্ট নামে অভিহিত করিয়াছিল, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। হেইন যে এই খর্ব্ব অধ্যাপকের সঙ্গে ভীষণ রোব্স্পিয়ারের তুলনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিস্ময়ের কারণ নাই। রোব্সপিয়ার ফ্রান্সের রাজা ও কয়েক সহস্র ফরাসীকে মাত্র হত্যা করিয়াছিল। তাহা ক্ষমা করা ফরাসী-দিগের পক্ষে কঠিন ছিল না। হেইন বলিয়াছেন, ক্যাণ্ট ঈশ্বরকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান যুক্তিগুলির ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন। হেইন আরও বলিয়াছিলেন, "এই ব্যক্তির বাহ্য জীবন এবং তাঁহার ধ্বংসাত্মক জগৎ-আলোড়নকারী চিন্তার মধ্যে কি গুরুতর বিরোধ! কনিগ্স্বার্গের নাগরিকগণ তাঁহার চিন্তার সম্পূর্ণ অর্থ যদি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে ঘাতককে দেখিয়া লোকে যেরূপ ভীত হয়, তাঁহাকে দেখিয়াও সেইরূপ ভীত হইয়া পড়িত। ঘাতক তো কেবল মানুষই হত্যা করে!! কিন্তু কনিগ্সবার্গের সরল নাগরিকগণ ক্যাণ্টের মধ্যে একজন দর্শনের অধ্যাপক ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় নাই, এবং প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যখন তাঁহাকে তাহাদের গৃহের পার্শ্ব দিয়া যাইতে দেখিত, তখন তাহারা বন্ধুভাবে তাঁহাকে নমস্কার করিত, এবং তাহাদের ঘড়ির সময় ঠিক করিয়া রাখিত।" কিন্তু এই সমালোচনা সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে। প্রথমতঃ—ক্যাণ্ট সাধারণের সরল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক জগতের ধ্বংস-সাধন করিয়াছেন, ইহা সত্য নহে। সাধারণের সরল বিশ্বাস হইতে বিজ্ঞানই বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। যে

জগতের আলোচনা বিজ্ঞান করে, তাহা সাধারণের সরল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত জগৎ নহে। তাহা প্রাতিভাসিক জগৎ। সে জগৎ যে অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন, তাহা প্রমাণ করিয়া ক্যাণ্ট হিউমের আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। যে জগতের সহিত বিজ্ঞানের কারবার, তাহার অন্তর্গত বস্তুদিগের আচরণ যে নিয়মকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তাহার উৎস মানবের মনঃই হউক, অথবা তাহা মনঃ-নিরপেক্ষই হউক, তাহা যে অলঙ্ঘনীয় এবং জগতে যে "খেয়ালে"র স্থান নাই, তাহা ক্যাণ্ট বলিয়াছেন। সুতরাং হিউমের বিজ্ঞানবিধ্বংসী যুক্তি যে ক্যাণ্টকর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক Charles P. Steinmetzs বলিয়াছেন "আমাদের যাবতীয় অক্ষজ প্রতীতি দেশ ও কালের ধারণাদ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং তাহার সহিত সংযুক্ত। দার্শনিক শ্রেষ্ঠ ক্যাণ্ট দেশ ও কালকে অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, তাহারা "প্রকার"—সংবেদনদিগকে আমাদের মনঃ যে পরিচ্ছদে সজ্জিত করে, তাহাই। আপেক্ষিকতা-বাদে আধুনিক বিজ্ঞান সেই মীমাংসাতেই উপনীত হইয়াছে। এই মীমাংসায় অনপেক্ষ দেশ ও কালের অস্তিত্ব নাই, ঘটনা অথবা বস্তুদ্বারা যখন তাহারা পূরিত হয়, তখনই তাহাদের অস্তিত্ব—অর্থাৎ তাহারা অক্ষজ প্রতীতির আকারমাত্র।"* দ্বিতীয়তঃ—ক্যাণ্ট ঈশ্বরকে হত্যা করিয়াছেন, ইহাও সত্য নহে। বরং বলা যায়, যে তিনি ধর্ম্ম-বিশ্বাসের, দৃঢ়তর ভিত্তির ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, যে যুক্তির প্রয়োগক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, যুক্তি অপ্রতিষ্ঠ; যাহা ধর্ম্মবিশ্বাসের বিষয়, যুক্তি সেখানে পৌছিতে পারে না। কিন্তু যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত না হইলেও ঈশ্বর, জীবাত্মার অমরতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতার অন্য প্রমাণ আছে। সে প্রমাণ সন্তোষজনক কিনা, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তর্কদ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া না গেলেও তাঁহাকে পাইবার অন্য পন্থা আছে।

কর্ম্মাভিমুখী প্রজ্ঞার সমালোচনা

(Critique of Practical Reason)

জীবাত্মার অমরতা ও স্বাধীন ইচ্ছা এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসকে একেবারে ভ্রান্ত বলিবার ইচ্ছা ক্যাণ্টের ছিল না। উপপাদক প্রজ্ঞাদ্বারা[1] এই বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণিত হয় না, তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, তাহাদ্বারা এই বিশ্বাস অসিদ্ধ, ইহা বলাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। Critique of Pure Reason গ্রন্থে দ্বারপথে এই বিশ্বাস বহিষ্কৃত হইলেও, ঐ গ্রন্থেই নিয়ামক তত্ত্বরূপে[2] বাতায়ন-পথে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং Critique of Practical Reason এ নিঃসন্দিগ্ধ সত্যরূপে অভ্যর্থিত হইয়াছে। উপপত্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা যাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, কর্ম্মের ক্ষেত্রে তাহার সমস্তই পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে—জীবাত্মার অমরতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা ও ঈশ্বর, সকলই।

* Quoted in Will Durant's Story of Philosophy.

[1] Speculative Reason [2] Regulative Principles

Critique of Pure Reason গ্রন্থে প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ জ্ঞান বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা হইতে পাওয়া যায় কি না, এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে হইয়াছিল। Critique of Practical Reason এ বিষয়-নিরপেক্ষ ভাবে "ইচ্ছা" প্রজ্ঞা-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে কিনা, এবং "ইচ্ছা" যাহাদ্বারা চালিত হয়,[1] তাহা ও তদানুষঙ্গিক বিষয়সকল আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত হয় প্রত্যক্ষদ্বারা, কিন্তু ইচ্ছার নিয়ামক হইতেছে কয়েকটি সাধারণ তত্ত্ব। ইচ্ছা ও তৎপ্রসূত কর্ম্মের নিয়ামক এই সকল সাধারণ তত্ত্বের আলোচনা হইতে Critique of Practical Reason এর আরম্ভ। মনের যে অংশটাকে "ইচ্ছা" বলা হয়, তাহার সহিত প্রজ্ঞার সম্বন্ধই এই Critique এর আলোচ্য বিষয়। আলোচনার ফলে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যে প্রজ্ঞা আপনিই ইচ্ছাকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ, এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা, জীবাত্মা ও ঈশ্বরের প্রত্যয়—যাহারা প্রজ্ঞার অন্তর্নিহিত, এবং উপপাদক প্রজ্ঞা[2] যাহাদের নিশ্চিতি রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না—তাহারা আপনাদের নিশ্চিতি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মানুষের কর্ম্ম সুখ ও দুঃখদ্বারা, চিত্তাবেগ ও প্রবৃত্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া প্রতীতি হয়, ইহা সত্য। কিন্তু ইহারাই একমাত্র কর্ম্মের নিয়ামক নহে। সাধারণ কর্ম্মবৃত্তি হইতে উচ্চতর একটা মানসিক বৃত্তিও ইহার নিয়ামক। এই বৃত্তি প্রত্যক্ষদ্বারা চালিত হয় না। ইহার প্রেরণা আসে অব্যবহিত ভাবে প্রজ্ঞা হইতে। বাহ্য উদ্দেশ্য এই বৃত্তির পরিচালক নহে; এক উচ্চতর তত্ত্বকর্তৃক ইহা পরিচালিত। Critique of Practical Reason এর প্রথম ভাগ Analytic এ ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার আদেশের সহিত ইন্দ্রিয়ের প্রেরণার অসামঞ্জস্য হইতে যে সকল বিষম-প্রসক্তির উদ্ভব হয়, তাহার আলোচনা ও সমাধান দ্বিতীয় ভাগ—Dialectic—এর উদ্দেশ্য।

বিশ্লেষণ (Analytic)

আমাদের মনে সাধারণ কর্ম্মবৃত্তি অপেক্ষা মহত্তর একটা বৃত্তি যে আছে, তাহার প্রমাণ কি? ইহার প্রমাণ কর্ম্মের ন্যায়ান্যায়-সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক বোধ।[3] কোনও অন্যায় কর্ম্মে প্রলুব্ধ হইলেও, সে কর্ম্ম যে অন্যায়, এ বোধ যেমন আমাদের আপনা হইতেই হয়, তেমনি কেহ কষ্টে পড়িলে তাহাকে সাহায্য করা যে কর্ত্তব্য, এ বোধও হয়। এই ধর্ম্ম-বিবেক প্রজ্ঞাকর্তৃক "ইচ্ছা"র উপর স্বতঃ স্থাপিত নিয়ম ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নয়। সাধারণ কর্ম্মবৃত্তির উর্দ্ধে এই বৃত্তির স্থান। অন্তর্নিহিত অলঙ্ঘনীয় নিয়তিকর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় প্রেরণা উপেক্ষা করিয়া, এই বৃত্তি অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এবং কোনও প্রতিবন্ধের[4] অপেক্ষা না করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করে। কর্ম্মের অন্যান্য নিয়ম সুখের সহিত সম্বদ্ধ। তাহাদের উদ্দেশ্য সুখ-প্রাপ্তি। কিন্তু সুনীতির সহিত সুখের কোনও সম্বন্ধ নাই; সুখের কামনা করিয়া কোনও কর্ম্ম আমরা না করি, ইহাই

---

[1] Motives of the Will
[2] Theoretical Reason
[3] Moral Sense
[4] Condition

তাহার আদেশ। সাপেক্ষ ও অনপেক্ষ ভেদে আদেশ দ্বিবিধ।[১] ব্যবহারিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ও লাভের জন্য যে আদেশ, তাহা সাপেক্ষ। সুখ যদি চাও, তবে ইহা কর; দুঃখ যদি পরিহার করিতে চাও, তবে উহা কর—এইরূপ আদেশ। ধর্ম্মবিবেকের আদেশ এরূপ সাপেক্ষ নয়। তাহার আদেশ অনপেক্ষ; লাভ-ক্ষতির সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। কোনও উদ্দেশ্য তাহার নাই, সর্ব্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির তাহা পালনীয়। ইহাই Categorical Imperative—নিরপেক্ষ আদেশ। সুতরাং কেবল প্রজ্ঞা হইতেই ইহার উদ্ভব সম্ভবপর। "জান্তব ইচ্ছা",[২] অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থপর ইচ্ছা হইতে ইহার উদ্ভব সম্ভবপর নহে। অভিজ্ঞতা-প্রতিবদ্ধ প্রজ্ঞা হইতেও ইহার উদ্ভবের সম্ভব হয় না। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাই ইহার উৎপত্তিস্থল। যাবতীয় প্রজ্ঞাবান জীবই যখন এই আদেশের অধীন, পালন করুক, আর না করুক, সকলেই যখন ইহার আদেশ শুনিতে পায়, তখন সার্ব্বিক প্রজ্ঞা হইতেই ইহার উদ্ভব বলিতে হইবে। ইহার হস্ত হইতে কখনই আমরা নিষ্কৃতি পাই না। সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতার মধ্যে আমাদের নৈতিক বোধ সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। ইহা একান্ত ভাবেই সত্য পদার্থ। প্রবল প্রলোভনের মধ্যেও এ বোধ হইতে আমাদের নিস্তার নাই। প্রলোভন-দমনে অক্ষম হইলেও এ বোধের হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই। প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া সৎ পথে থাকিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া সন্ধ্যাকালে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারি, কিন্তু যাহার লোভে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করি, তাহা যে অন্যায়, তাহা জানি; তখন আবার নূতন প্রতিজ্ঞা করি। এই অনুতাপের দংশন বস্তুতঃ কি? ইহাই পূর্ব্বোক্ত অনপেক্ষ আদেশ—ধর্ম্ম-বিবেকের আদেশ। আমাদের প্রত্যেকেরই আচরণের একটা সাধারণ নীতি আছে। অর্থ যাহার লক্ষ্য, তাহার সমস্ত কার্য্য অর্থলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়; 'ক্ষমতা' যাহার লক্ষ্য, তাহার কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয় ক্ষমতা-লাভের উদ্দেশ্যদ্বারা। বিভিন্ন লোকের কর্ম্মের লক্ষ্য বিভিন্ন। প্রত্যেকের কর্ম্ম তাহার লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া একই নীতি অনুসরণ করে; সেই নীতি তাহার ইচ্ছার নীতি।[৩] যতক্ষণ কাহারও ইচ্ছা ব্যবহারিক উদ্দেশ্যদ্বারা চালিত হয়, ততক্ষণ তাহাকে স্বাধীন বলা যায় না। সুখের প্রতি সহজাত যে আকর্ষণ মানুষের আছে, তাহার জন্যই যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, তাহার দিকে মানুষের ইচ্ছা ধাবিত হয়। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন করিবার সামর্থ্য যদি মানুষের না থাকিত, তাহা হইলে ইচ্ছার স্বাধীনতার কথা উঠিতেই পারিত না। ধর্ম্মবিবেকের অনপেক্ষ আদেশই সেই সামর্থ্যের প্রমাণ। যখনই কোনও কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের মনে হয়, তখনই তাহা আমরা করিতে সমর্থ, একথাও মনে হয়। "করিতে পার, কেননা করা তোমার কর্ত্তব্য।" অন্তরের মধ্যেই ইহা আমরা শুনিতে পাই। এই অনপেক্ষ আদেশের সম্মুখে মানুষের সুখের প্রবৃত্তি সংকুচিত হইয়া পড়ে, সুখের আকর্ষণ দমন করিয়া এই আদেশ অনুসরণ করিবার ক্ষমতা যে তাহার আছে, তাহা মানুষ বুঝিতে পারে। ব্যবহারিক "ইচ্ছা" ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন পথে ধাবিত হয়। সকলের ইচ্ছা

[১] Hypothetical ও Categorical
[২] Animal Will
[৩] Maxim of Volition

এক নহে বলিয়া, এক কর্ম্মনীতি সকলে অনুসরণ করে না। কিন্তু Categorical Imperative এক—সকলের পক্ষেই সমান। "এমন ভাবে কর্ম্ম কর, যে তোমার ইচ্ছা যে নীতি অনুসরণ করে, তাহা সকলের পক্ষে অবলম্বনযোগ্য হয়, অথবা তোমার নীতি যদি সকলেই অবলম্বন করে, তাহা হইলে বিরোধের উৎপত্তি না হয়।" আমরা অন্তরে অনুভব করি, যে সকলেই যেরূপ আচরণ করিলে সামাজিক জীবন অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যুক্তিদ্বারা আমরা এই জ্ঞানলাভ করি না, অন্তরে অব্যবহিত ভাবে ইহা আমরা অনুভব করি। মিথ্যা কথা বলিয়া কোনও সংকট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রবৃত্তি যখন হয়, তখন মিথ্যা কথা বলিবার ইচ্ছা করিতে পারি; কিন্তু ইহা ইচ্ছা করিতে পারি না, যে মিথ্যা কথা বলাই সাধারণ নিয়ম হউক। ইহাই যদি সাধারণ নিয়ম হয়, তাহা হইলে প্রতিশ্রুতি বলিয়া কিছুই থাকে না। এই জন্যই আমরা বোধকরি, যে কিছুতেই মিথ্যা বলা উচিত নয়। মিথ্যা বলা লাভজনক হইলেও না। সাধুতা যখন লাভজনক তখনি অবলম্বনীয়, ইহা সাংসারিক নীতি, আপেক্ষিক নীতি, কিন্তু সুনীতির নিয়ম লাভ, ক্ষতি কিছুরই অপেক্ষা করে না। তাহা অনপেক্ষ; সর্ব্বকালে সর্ব্বক্ষেত্রে তাহার আদেশ পালনীয়। শুভ ফল উৎপাদন করে বলিয়া, কোনও কর্ম্ম ভাল নয়, অন্তরস্থ ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রসূত হইলেই তাহাকে ভাল বলা যায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ধর্ম্মবুদ্ধি উৎপন্ন হয় না, ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে আমাদের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আচরণ-সম্বন্ধে অনপেক্ষ 'অখণ্ডনীয় বিধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিধান পালন করিবার ইচ্ছা—লাভক্ষতি গণনা না করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির আদেশ পালন করিবার ইচ্ছাই—"উৎকৃষ্ট ইচ্ছা"[১]। সুখের কথা ভাবিও না, যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিয়া যাও। "যাহাতে সুখী হইতে পার, তাহাই কর"—ইহা সুনীতি নহে। "কিসে আমরা সুখ পাইবার উপযুক্ত হইতে পারি"—ইহাই সুনীতি। পরের জন্য চাহিব সুখ, আপনার জন্য চাহিব পূর্ণতা[২]—তাহাতে সুখ অথবা দুঃখ যাহাই আসুক না কেন; "আপনাতে পূর্ণতা-লাভ ও অপরের সুখ-বিধান, আপনার মধ্যেই হউক অথবা অপরের মধ্যেই হউক, মানবত্বকে[৩] সাধনরূপে[৪] গণ্য না করিয়া উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করা এবং তদনুসারে কর্ম্ম করা"—ইহাও অনপেক্ষ আদেশের একটা অংশ। এই নিয়মানুসারে জীবন গঠন করিতে পারিলেই আমরা প্রজ্ঞাবান জীবের সমাজ গঠনে সক্ষম হইব। এইরূপ সমাজ সৃষ্টি করিতে হইলে, আমরা এইরূপ সমাজের সভ্য বর্ত্তমানই আছি, ইহা মনে করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। সৌন্দর্য্যের উপর কর্ত্তব্যকে, সুখের উপরে ধর্ম্মকে স্থাপন করা কঠিন, সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল এই উপায়েই আমরা পশুত্ব হইতে দেবত্বে উত্তীর্ণ হইতে পারি।

কিন্তু কিসের লোভে "ইচ্ছা" প্রজ্ঞার এই নির্দ্দেশ পালন করিবে? ক্যাণ্ট বলেন, কেবল সুনীতির প্রতি শ্রদ্ধাই মানবীয় ইচ্ছার নিয়ামক হইবে। নিয়মানুযায়ী কর্ম্ম যদি সুখের লোভে অথবা ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির বশে কৃত হয়, তাহা হইলে তাহা

---

১ Good Will
২ Perfection
৩ Humanity
৪ Means

আইনানুগত কর্ম্ম, কিন্তু সুনীতি নহে। সমবেতভাবে বিবেচনা করিলে, সমস্ত ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি হয় আত্মপ্রীতি নতুবা আত্মাভিমান মাত্র। সুনীতির নিয়ম আত্ম-প্রীতিকে সংকুচিত করে, আত্মাভিমানের সম্পূর্ণ বিনাশসাধন করে। যাহা আমাদের আত্মাভিমান বিনষ্ট করিয়া আমাদিগকে বিনীত করে, নিঃসন্দেহে তাহা শ্রদ্ধার উপযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়। সুনীতির নিয়ম ইহাই করে বলিয়া, ইহার প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। এই শ্রদ্ধা মনের একটা অনুভূতিমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিমাত্র নহে; ইহা বুদ্ধির অনুভূতি—প্রজ্ঞার ব্যবহারিক নিয়মের জ্ঞান হইতে উদ্ভূত, এবং ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির বিরুদ্ধধর্ম্মী, (বুদ্ধি-গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়)। এই শ্রদ্ধা নিয়মের অধীনতারূপে যেমন একদিকে দুঃখস্বরূপ, তেমনি আমাদিগের স্বকীয় প্রজ্ঞারই অধীনতা বলিয়া সুখ-স্বরূপ। সুনীতির নিয়মের সম্মুখে শ্রদ্ধা—ভীতিমিশ্র ভক্তিই—মানুষের যথাযোগ্য অনুভূতি। মানুষ নানা প্রবৃত্তি-বেগের অধীন, এবং এই সমস্ত প্রবৃত্তি সুনীতির নিয়মের বিরোধী। এই জন্য সুনীতির নিয়মের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি মানুষের নিকট আশা করা যায় না। সুতরাং সুনীতির নিয়মের প্রতি প্রীতিকে আদর্শ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। কর্ম্মের প্রেরণাকে কামনার বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিবার আগ্রহের ফলে ক্যাণ্ট যে মতে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এই, যে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কেবল অনিচ্ছাপূর্ব্বকই পালিত হইতে পারে। ক্যাণ্টের এই মত যে অত্যুক্তি-পূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে শিলারের ব্যঙ্গোক্তি উল্লেখযোগ্য। এক ব্যক্তি বলিতেছেন, "ইচ্ছাপূর্ব্বক সকল বন্ধুর সেবা করি, কিন্তু হায়! আমার সেবার সহিত ভালবাসা মিশ্রিত। তাই এখনও আমি ধার্ম্মিক হইতে পারি নাই বলিয়া যখন মনে হয়, তখন মনঃপীড়া উৎপন্ন হয়।" উত্তরে শিলার বলিতেছেন, "তাহাদিগকে (বন্ধুদিগকে) অবজ্ঞা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর, এবং (নৈতিক) নিয়মের আদেশ ঘৃণার সহিত পালন কর। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।"

ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছাকৃত হউক, কোনও কিছুর অপেক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, এই আদেশদ্বারা ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রমাণিত হয়। আমরা যদি আমাদিগকে স্বাধীন এবং যে কোনও কর্ম্ম করিতে সক্ষম বলিয়া বোধ না করিতাম, তাহা হইলে "কর্ত্তব্য" বলিয়া কোন কিছুর ধারণাই আমাদের হইতে পারিত না। যুক্তিদ্বারা এই স্বাধীনতার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু ইহার বাস্তবতা অন্তরের মধ্যে আমরা অনুভব করি। নৈতিক সংকট যখন উপস্থিত হয়, যখন বিরুদ্ধ দুইটি কর্ম্মের মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হয়, তখন বুঝিতে পারি, স্বীয় প্রকৃতির অনুযায়ী সুনীতির নিয়ম-বিরুদ্ধ পথ বর্জন করিয়া সুনীতির নিয়ম-নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে। কার্য্য আরব্ধ হইবার পরে তাহা অবশ্য ব্যবহারিক জগতের বাঁধা নিয়মে চলে; তাহার কারণ আমাদের কার্য্যের ফল ইন্দ্রিয়দ্বারাই আমরা দেখিতে পাই, এবং সেই ফল আমাদের মনের সৃষ্ট কার্য্য-কারণ নিয়মের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্যবহারিক জগৎ বুঝিবার জন্য যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা আমরা নিজেরাই করিয়াছি, আমরা তাহার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সৃষ্টি-শক্তি

বর্তমান। প্রমাণ করিতে না পারিলেও এই শক্তির অস্তিত্ব আমরা অব্যবহিত ভাবে *অনুভব করি।*

কর্ম্মাভিমুখী প্রজ্ঞার দর্শন

(Dialectic)

এই ভাগে পরমার্থ[1]-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই পরমার্থ অথবা পরম মঙ্গল কি, এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, যাবতীয় মঙ্গলের ভিত্তি ধর্ম্মই (সদাচার,[2]) পরমার্থ। কিন্তু মানুষ কেবল প্রজ্ঞাবান জীব নহে, ইন্দ্রিয়বানও বটে। তাহার জন্য সুখের প্রয়োজন। সুতরাং পরমার্থের সহিত পরমসুখের মিলন হইলেই তাহার পূর্ণতা সাধিত হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ জগতে ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয় না। ধর্ম্ম (সদাচার) হইতে যেমন সর্ব্বদা সুখের উদ্ভব হয় না, তেমনি সুখ হইতেও (সদাচারের) ধর্ম্মের উদ্ভব সর্ব্বদা দেখা যায় না—সুখের লোভে কেহ ধার্ম্মিক (সদাচারী) হয় না, ধার্ম্মিক (সদাচারী) লোকও সর্ব্বদা সুখী হয় না। ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের উপায় তবে কি? আমাদের সত্তার অর্দ্ধভাগ যাহা কামনা করে, তাহার সহিত যদি ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ না থাকে, ধর্ম্ম (সদাচার) যদি সুখের হেতু না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মকে পরমার্থ অথবা পরম মঙ্গল বলিবার সার্থকতাই থাকে না। ক্যাণ্ট বলেন, ইন্দ্রিয়ের জগতে ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ যে নাই, তাহা সত্য। এ জগতে ধর্ম্ম সুখের সেতু নয়, ইহা সত্য, কিন্তু মানুষ এই দৃশ্যমান জগতের অতীত অন্য এক জগতেরও অধিবাসী। ইন্দ্রিয়াতীত সেই পারমার্থিক[3] জগতে ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে কোনও অসামঞ্জস্য নাই। সে জগতে ধর্ম্মের নিত্য সঙ্গী সুখ। সেই ইন্দ্রিয়াতীত জগতেই পরমার্থ-প্রাপ্তি সম্ভবপর।

পরমার্থের উপাদান দ্বিবিধ :—(১) পরম ধর্ম্ম[4] এবং (২) পরম সুখ[5]। পরমার্থ-প্রাপ্তি যদি সম্ভবপর হয়' (কর্ম্মাভিমুখী প্রজ্ঞার সম্মুখে ইহাই আদর্শ) তাহা হইলে পরম ধর্ম্ম ও পরম সুখও সম্ভবপর। পরমধর্ম্ম-সাধনের জন্য প্রয়োজন অনন্ত জীবনের ; পরম সুখ ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকিলে অসম্ভব।

(১) পরম ধর্ম্ম—অনবদ্য পূর্ণ ধর্ম্ম অথবা পবিত্রতা[6] পরমার্থের অঙ্গ, কিন্তু ইন্দ্রিয়বান্ জীবের পক্ষে পরম পবিত্র হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়, উভয়ের সমবায়ে গঠিত জীবের পক্ষে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপেই কেবল পবিত্রতার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর। সেই আদর্শ পবিত্রতা' হইতে মানুষের ব্যবধান অতিক্রম করিতে অসীমসংখ্যক সোপান অতিক্রম করিতে হয়, এবং সেই অসীম-সংখ্যক সোপান অতিক্রম করিতে অনন্ত কালের প্রয়োজন। সুতরাং পরমার্থ লাভ করিতে হইলে অনন্তকালস্থায়ী জীবনের আবশ্যক। জীবাত্মা অবিনশ্বর না হইলে পরমার্থ-লাভের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

---

[1] Summum Bonum [2] Virtue [3] Noumenal
[4] Supreme virtue [5] Supreme felicity [6] Holiness

(২) পরিপূর্ণ সুখ পরমার্থের দ্বিতীয় অঙ্গ। সুখ প্রজ্ঞাবান জীবের একটি অবস্থা, যাহার কামনা ও ইচ্ছা মত সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহার অবস্থা। সমগ্র প্রকৃতির সহিত এই ইচ্ছা ও কামনার ঐক্য থাকিলেই কেবল ইহার সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আমাদের জগৎ সেরূপ নয়। আমরা সক্রিয় হইলেও প্রকৃতির প্রভু আমরা নই। সুনীতির নিয়ম-দ্বারাও ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে সংযোগ সাধিত হয় না। তাহা না হইলেও পরমার্থসাধনের জন্য চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য, এবং তাহার জন্যই আমাদের অস্তিত্ব, ইহা আমরা জানি। সুতরাং পরমার্থ-সাধন সম্ভবপর। পরিপূর্ণ সুখ যদি পরমার্থের অঙ্গ হয়, এবং পরমার্থ-প্রাপ্তি যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম ও সুখের সংযোগ-বিধানের জন্য প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র এক বিধাতার প্রয়োজন—প্রাকৃতিক জগৎ ও নৈতিক জগৎ উভয়েরই প্রভু এমন এক পুরুষের প্রয়োজন, যিনি আমাদের মনঃ দেখিতে পান, যিনি বুদ্ধিস্বরূপ এবং স্বকীয়-বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্মের অনুরূপ সুখের বিধান করেন। এই পুরুষই ঈশ্বর।

পৃথিবীতে ধার্ম্মিককে কষ্টভোগ করিতে দেখা যায়। তাহা দেখিয়াও, ধর্ম্মের পরিণাম এ জগতে সুখ হয় না জানিয়াও, ধর্ম্ম-বিবেকের আদেশ অবশ্য পালনীয় বলিয়া আমরা জানি, দুঃখকর হইলেও ধর্ম্মের পথে চলা কর্ত্তব্য, ইহা আমরা অন্তরে বিশ্বাস করি। বিবেকের এই আদেশকে যে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাহার কারণ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আমরা অনুভব করি, যে আমরা অনন্ত-জীবনের অধিকারী, পার্থিব জীবন সেই জীবনের একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র, এক সম্পূর্ণ নূতন জীবনের ভূমিকামাত্র। সেই নূতন অপার্থিব জীবনে ধর্ম্ম ও সুখের বিরোধের মীমাংসা হইবে। নিঃস্বার্থ ভাবে এক গ্লাস জল দিয়া কাহারও তৃষ্ণা-নিবৃত্তির সহায়তা করিলে, সে জগতে তাহার শত গুণ প্রতিদান মিলিবে। ধর্ম্ম ও সুখের এই সংযোগ যিনি বিধান করেন, তিনিই ঈশ্বর।

এইরূপে আমাদের কর্ম্মাভিমুখী প্রজ্ঞা হইতে ঈশ্বর, জীবাত্মার অমরতা এবং স্বাধীন ইচ্ছার প্রত্যয় উদ্ভূত হয়। আমাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও তাহার ভিত্তি সুনীতির নিয়মের অস্তিত্ব হইতে স্বাধীন ইচ্ছার প্রত্যয়ের উদ্ভব। পরিপূর্ণ ধর্ম্ম-সাধন সম্ভবপর, এই নিশ্চিতি হইতে জীবাত্মার অমরতার প্রত্যয়ের উদ্ভব, এবং পরিপূর্ণ ধর্ম্মের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ সুখের বিধাতারূপে ঈশ্বরের প্রত্যয়ের উদ্ভব। উপপাদক প্রজ্ঞা এই তিন প্রত্যয়-সম্বন্ধে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে অক্ষম হইলেও, কর্ম্মাভিমুখী প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে ইহারা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্যাণ্ট এই তিন প্রত্যয়কে উপপাদ্য মতরূপে গ্রহণ করেন নাই। সুনীতিমূলক কর্ম্মের জন্য অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়াছেন। আমরা জানি, যে এই তিন প্রত্যয়ের বস্তুগত বিষয় আছে, কিন্তু সে বিষয়ের স্বরূপ-সম্বন্ধে কিছুই জানি না। ঈশ্বরের প্রত্যয় ভিন্ন তাঁহার স্বরূপ-সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞানই নাই। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার "প্রকার"দিগের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় বিষয়-সম্বন্ধে কিছু অনুমান করিতে চেষ্টা করিলে, সে অনুমান ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া পড়িবে। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা, অমরতা ও ঈশ্বর-সম্বন্ধে কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে অক্ষম হইলেও, তাহাদের অস্তিত্ব নাই, একথা উপপাদক প্রজ্ঞা বলে নাই এবং বাহ্য জগতের অন্তরালে অবস্থিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে কোন দুর্লঙ্ঘ্য

বাধার সৃষ্টিও করে নাই। আমাদের কর্ত্তব্য-বোধ তাহাতে বিশ্বাস করিতে আদেশ করে। রুসো বলিয়াছেন, মস্তিষ্কের স্থায়ের উপরে হৃদয়ের স্থান। পাস্কাল বলিয়াছেন, "হৃদয়েরও যুক্তি আছে, মস্তিষ্ক তাহা বুঝিতে অক্ষম।" ঈশ্বরে বিশ্বাস হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উদ্‌ভূত। ইহাই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

বিচারের সমালোচনা

(Critique of Judgment)

১৭৯০ সালে Critique of Judgment প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ক্যাণ্ট প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন—(১) রুচি, এবং (২) উদ্দেশ্য-মূলক সৃষ্টি। রুচি ও উদ্দেশ্য-মূলক সৃষ্টির সহিত "বিচারের" সম্বন্ধ কি?

তর্কশাস্ত্রে Judgment শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন অর্থে ক্যাণ্ট এখানে উক্ত শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। তর্কশাস্ত্রে Judgment অথবা বিচার-শব্দদ্বারা কোনও বস্তু কি, তাহা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাহাই বলা হয়। একটি বিধেয় উদ্দেশ্যে আরোপিত হয়। এইরূপ দুইটি বিচার হইতে অনুমানদ্বারা একটি সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়। ক্যাণ্ট "পরিচিন্তনমূলক বিচার" অর্থে Judgment শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তাহার অর্থ হইতে অন্যবিধ Judgment বর্জ্জন করিয়াছেন। কোনও বস্তু কি, অথবা তাহার কি কি গুণ আছে, তাহা এই "বিচারের" বিষয় নহে। সেই বস্তুর মানসিক রূপ বা প্রত্যয়ের সঙ্গে মানবমনের প্রকৃতির সম্বন্ধই ইহার বিষয়। গোলাপ ফুলের প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গে মানবমনের প্রকৃতিবশে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতে সুখের উদ্‌ভব হয়। এই সম্বন্ধই পরিচিন্তনমূলক বিচারের বিষয়। এই বিচারে উদ্দেশ্যে যে বিধেয় আরোপিত হয়, তাহাদ্বারা উদ্দেশ্যের বাচ্য বস্তুতে বর্ত্তমান কোনও গুণ ব্যক্ত হয় না। তাহাদ্বারা প্রকাশিত হয় সেই বস্তুর বোধের সহিত মানবমনের যে অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহার সম্বন্ধ। (যদিও যে বস্তুর বোধদ্বারা এই অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহাতে গৌণ ভাবে এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয়)। জ্ঞানবৃত্তির ব্যবহারদ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান হইতে সময়ে সময়ে যে সুখ ও দুঃখের অনুভূতি হয়, ক্যাণ্ট তাহার কারণের ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে করিয়াছেন।

মানুষের মনের বৃত্তি তিনটি:—জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা। প্রথম Critiqueএ প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে মনের স্বকীয় নিয়মানুসারে যে বাহ্য জগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে জগৎ প্রাকৃতিক নিয়মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহা নিয়তির অধীন। তাহার মধ্যে স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই। দ্বিতীয় Critiqueএ আমরা যে নৈতিক জগতের সন্ধান পাইয়াছি, সেখানে সকলই মনের স্বাধীন ইচ্ছার অধীন। প্রকৃতির রাজ্য এবং স্বাধীন ইচ্ছার রাজ্যের মধ্যে একটি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের এই ভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল। ক্যাণ্ট উভয় জগতের মধ্যে একটি সেতুর কথা চিন্তা করিয়াছিলেন।

ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, দুইটি বিষয় দেখিয়া তাঁহার মনে গভীর শ্রদ্ধার উদয় হয়—বাহিরে নক্ষত্র-খচিত আকাশ, অন্তরে সুনীতির নিয়ম। তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, উভয়ের মধ্যে কি কোনও যোগ-সূত্র নাই? এমন কোনও তত্ত্ব কি নাই, যাহাদ্বারা উভয় জগৎকে এক সূত্রে গ্রথিত করা সম্ভবপর হইতে পারে? তাঁহার মনে হইয়াছিল, মনের বিচারবৃত্তি (পরিচিন্তনমূলক) দ্বারা হয়তো ইহা সম্ভবপর হইতে পারে।

প্রথমে ক্যাণ্ট তাঁহার দর্শনের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, Critique of Judgment তাহার মধ্যে ছিল না। রুচি-সম্বন্ধে এক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিবার পরে তাঁহার মনে হয়, যে সুন্দর ও বিরাটের ধারণার মূলে "উদ্দেশ্য" আছে, এবং জগতের সামগ্রিক ব্যবস্থায় এই উদ্দেশ্যের প্রয়োগ হইতে পারে। তখন পূর্ব্বে লিখিত দুই Critqueএর মধ্যে সেতুস্বরূপ এই তৃতীয় Critique রচনা করেন। সংবিদের বিভিন্ন অংশকে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট একত্বে পরিণত করিবার কল্পনা ইহার মূল। ক্যাণ্টের মনে হইয়াছিল, জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যে সংযোগ-সেতু অনুভূতি বিচারের সহিত সংবদ্ধ বলিয়া বিচার-বৃত্তি-দ্বারা উপপাদক প্রজ্ঞা ও কর্ম্মাভিমুখী প্রজ্ঞার মধ্যে সেতু-নির্ম্মাণ সম্ভবপর। বিচারের কার্য্য হইতেছে বিশিষ্ট পদার্থদিগকে সামান্যের অন্তর্গতরূপে বোঝা। বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের বহু দ্রব্যকে একটি অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অন্তর্ভূত এবং এই তত্ত্বকে তাহাদের বহুত্বের ভিত্তি-রূপে গণ্য করা, ইহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ঐক্য-বিধায়ক অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব কি? রুচি-সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিবার সময় ক্যাণ্টের মনে হইল উদ্দেশ্যই সেই তত্ত্ব। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ফল তৃপ্তি, অসিদ্ধির ফল অতৃপ্তি। উদ্দেশ্যদ্বারা মানুষের কর্ম্ম চালিত হয়, ইহা আমরা জানি। প্রাকৃতিক কার্য্যও উদ্দেশ্যদ্বারা চালিত হয়, ইহা যদি মনে করা যায়, তাহা হইলে প্রাকৃতিক জগৎ ও নৈতিক জগতের মধ্যে মিলন-সূত্র পাওয়া যায়। তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, সুখ ও দুঃখ—উদ্দেশ্যের সফলতা ও বিফলতা-জাত এই দুই অনুভূতিকে জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে সেতুরূপে পাওয়া যায়। সুতরাং উদ্দেশ্যের মধ্যে, অথবা উদ্দেশ্যের আবিষ্কারক বিচার-শক্তির মধ্যে সুখ ও দুঃখের মূল পাওয়া যায়।

প্রকৃতির মধ্যে অভিসংযোজনা হইতে এই উদ্দেশ্যের উপলব্ধি হয়। অভিসংযোজনা দ্বিবিধ—আধ্যাত্মিক অথবা বিষয়িগত, এবং প্রাকৃতিক অথবা বিষয়গত। কোনও সুন্দর ফুল দেখিলে, আনন্দের উদ্ভব হয়। ইহার কারণ ফুলের রূপ ও সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি-কারক মানসিক বৃত্তির মধ্যে বর্ত্তমান সঙ্গতিপূর্ণ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের অস্তিত্ব আছে বলিয়া ক্যাণ্ট সৌন্দর্য্যবোধকে Aesthetic Judgment (সৌন্দর্য্যমূলক বিচার) বলিয়াছেন। এই অভিসংযোজনা আধ্যাত্মিক অথবা বিষয়িগত। ইহার জ্ঞানের জন্য ফুলের জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। অব্যবহিত ভাবেই সৌন্দর্য্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক অভিসংযোজনা বিষয়গত। ফুলের বিভিন্ন অংশের পরীক্ষাদ্বারা তাহার মধ্যে বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক অভিসংযোজনার (যাহাদ্বারা ফুলের মধ্যগত শিল্পকৌশল অবগত হওয়া যায়) অবগতিকে ক্যাণ্ট teleological Judgment অথবা উদ্দেশ্যমূলক বিচার বলিয়াছেন।

অনুভূতি-সম্বন্ধীয় বিচারের বিশ্লেষণ

(Analytic of Aesthetic Judgment)

কোনও সুন্দর বস্তু দৃষ্টিগোচর হইবামাত্রই আমাদের সুখের অনুভূতি হয়। সেই বস্তুর ধারণা হইবার পূর্ব্বেই এই অনুভূতি উৎপন্ন হয়। যে মানসিক বৃত্তিদ্বারা উক্ত বস্তুর রূপের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই বৃত্তি ও বস্তুর রূপের মধ্যে সুসঙ্গত সম্বন্ধের অস্তিত্বই এই অনুভূতির কারণ। গোলাপ ফুল দেখিবামাত্র মনে যে সুখের অনুভূতি হয়, "গোলাপ ফুল সুন্দর" এই বিচারদ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়। এই বিচারকে ক্যাণ্ট Aesthetic Judgment (অনুভূতিমূলক বিচার) আখ্যা দিয়াছেন।

যে মানসিক বৃত্তিদ্বারা সৌন্দর্য্যের অনুভূতি হয়, তাহার নাম রুচি। ক্যাণ্ট গুণ, পরিমাণ, সম্বন্ধ ও বিধা—এই চতুর্বিধ "প্রকার" রুচির উপর প্রয়োগ করিয়া তাহার ফলের আলোচনা করিয়াছেন। গুণ "প্রকারে"র প্রয়োগে দেখা যায়, যে সৌন্দর্য্য হইতে যে তৃপ্তির উদ্‌ভব হয়, তাহা স্বার্থলেশহীন। উপাদেয়[1] এবং মঙ্গল[2] হইতে যে তৃপ্তি উপজাত হয়, তাহা হইতে এই তৃপ্তি ভিন্ন প্রকারের। উপাদেয়ের প্রাপ্তিতে যে তৃপ্তি, তাহার সহিত কামনা মিশ্রিত থাকে। মঙ্গলের কল্পনা হইতে যে তৃপ্তি, তাহার সহিত তাহাকে বাস্তবে পরিণত করিবার ইচ্ছা জড়িত। কিন্তু সৌন্দর্য্যের অনুভূতির সহিত এইরূপ কোনও স্বার্থের সম্বন্ধ নাই।

পরিমাণ প্রকারের প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, যে "সুন্দর" হইতে উদ্‌ভূত তৃপ্তি সার্ব্বিক; সকলের মনেই এই তৃপ্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু "উপাদেয়"-প্রাপ্তিতে যে আনন্দ, তাহা ব্যক্তিগত; যাহা ব্যক্তিবিশেষের নিকট উপাদেয় বলিয়া তৃপ্তিজনক, অন্যে তাহা হইতে তৃপ্তি নাও পাইতে পারে। কিন্তু যখন কেহ বলে, "এই চিত্র সুন্দর", তখন সে আশা করে সকলেই তাহাকে সুন্দর দেখিবে। কিন্তু রুচির এই "বিচার" কোনও সম্প্রত্যয় হইতে উদ্‌ভূত হয় না, এবং ইহার ব্যাপকত্বও শ্রেণীমূলক নহে। কোনও শ্রেণীভুক্ত যাবতীয় দ্রব্যই সুন্দর, ইহা আমার বিচার নহে। সেই শ্রেণীভুক্ত কোনও একটি দ্রব্য সকলের নিকটেই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হইবে—ইহাই আমার বিচার। রুচির সকল বিচারই এক এক দ্রব্য-সম্বন্ধী।

"সম্বন্ধ"-প্রকারের প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়—অভিসংযোজনার রূপ[3] যাহাতে পাওয়া যায়, তাহাই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে অভিসংযোজনার কোনও উদ্দেশ্যের উপলব্ধি হয় না।

"বিধা"-"প্রকারের" প্রয়োগ করিলে পাওয়া যায়—সুন্দরের সহিত তৃপ্তির সম্বন্ধ নিয়ত। মনের প্রত্যেক ভাব হইতেই বস্তুতঃ সুখ হউক বা না হউক, তাহা যে সুখ-উৎপাদনে সমর্থ ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে। যাহা বস্তুতঃ সুখ উৎপাদন করে, তাহা 'উপাদেয়'; কিন্তু "সুন্দর" সুখ উৎপাদন করিতে বাধ্য—সুন্দরের সহিত এই অ-বশ্যতার ভাব মিশ্রিত। কিন্তু এই

[1] Agreeable [2] Good [3] Form of adaptation

অবশ্যতার কারণ কি? কেন সকলেই "সুন্দর"-সম্বন্ধে একমত, কেন সুন্দর হইতে সুখ উৎপন্ন হইতে বাধ্য? হয়তো কোনও এক সার্ব্বিক নিয়মের অস্তিত্বই ইহার কারণ, কিন্তু সেই নিয়ম কি, তাহা বলা অসম্ভব। যে মানসিক তত্ত্বের উপর রুচির বিচারসকল প্রতিষ্ঠিত, তাহা একটি সর্ব্বসাধারণ বোধশক্তি। এই বোধশক্তি কোন পদার্থ তৃপ্তিকর, কোনটি অতৃপ্তিকর, অনুভূতিদ্বারাই তাহার বিচার করে, সম্প্রত্যয়দ্বারা নয়।

যাহা সম্পূর্ণরূপে বৃহৎ, যাহার বৃহত্ত্বের তুলনা নাই, তাহাই বিরাট। বিরাটের সহিত তুলনায় অন্য যাবতীয় পদার্থই ক্ষুদ্র। প্রকৃতিতে এমন দ্রব্য নাই, যাহা অপেক্ষা বৃহত্তর নাই। অনন্তই একমাত্র সেইরূপ, কিন্তু অনন্তের দর্শন পাই আমরা কেবল মনের মধ্যে—প্রত্যয়রূপে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির মধ্যে বিরাটের অস্তিত্ব নাই; আমাদের মনঃই বিরাটের জন্মস্থান। মনঃ হইতে ইহা প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির মধ্যে যাহা দেখিয়া আমাদের মনে অনন্তের প্রত্যয় জাগরিত হয়, তাহাকেই আমরা বিরাট বলি। সুন্দরের প্রত্যয়ে প্রধানতঃ গুণেরই উপলব্ধি হয়; বিরাটের প্রত্যয়ে উপলব্ধি হয় প্রধানতঃ পরিমাণের। এই পরিমাণ বিস্তারের পরিমাণ (ইহাই গণিতের বিরাট), অথবা শক্তির পরিমাণও (বিরাট শক্তি) হইতে পারে। রূপ নয়, রূপ-বিবর্জ্জিত হইতেই, বিরাট-সম্বন্ধী তৃপ্তির উদ্ভব। বিরাট এক প্রবল মানসিক আবেগের সৃষ্টি করে, এবং বেদনার মাধ্যমে সুখদান করে। কল্পনা বিরাটের সম্পূর্ণ ধারণা করিতে অসমর্থ হওয়ায়, সেই অসামর্থ্য হইতে ক্ষণস্থায়ী বেদনা উদ্‌ভূত হয়। বিরাট হইতে উদ্‌ভূত তৃপ্তি যতটা অভাবাত্মক ততটা ভাবাত্মক নহে। ইহা বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা।

পরিমাণ "প্রকারের" প্রয়োগে দেখিতে পাওয়া যায়, বিরাট সর্ব্ববস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর। কিন্তু এই পরিমাণ সংখ্যার পরিমাণ নহে। বিরাটের জ্ঞানের মধ্যেই এই পরিমাণ নিহিত। প্রাকৃতিক কোনও বস্তুর ধারণা করিতে কল্পনাবৃত্তি তাহার সমগ্র শক্তির প্রয়োগ করিয়াও যখন অসমর্থ হয়, তখন তাহার তলদেশে অতীন্দ্রিয় অপরিমেয় এক পদার্থের অস্তিত্ব আমরা অনুমান করি। এই অপরিমেয় অতীন্দ্রিয় পদার্থের সহিত বিরাটের অনুভূতি জড়িত। ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-সংকুল সমুদ্র বিরাট নহে, তাহার দর্শকের মনে যে ভাবাবেগের উদ্‌ভব হয়, তাহাই বিরাট।

গুণ "প্রকারের" প্রয়োগে দেখা যায়, যে সুন্দরকে দেখিবামাত্রই চিত্তে যেমন সুখের উদ্‌ভব হয়, বিরাটকে দেখিয়া সেরূপ হয় না। প্রথমে বেদনা উদ্‌ভূত হয়, তাহার পরে সুখ। বিরাটের ধারণায় কল্পনার অক্ষমতা হইতে বেদনার উৎপত্তি হয়; পরে কল্পনা-শক্তির ঊর্দ্ধে অবস্থিত স্বতন্ত্র প্রজ্ঞার উৎকর্ষজ্ঞান হইতে সুখের আবির্ভাব হয়। বিরাটকর্ত্তৃক কল্পনা অভিভূত হইলেও, আমরা স্বাধীন প্রজ্ঞার অধিকারী, এবং প্রজ্ঞা কল্পনা-শক্তির ঊর্দ্ধে অবস্থিত, এই জ্ঞান হইতে সুখের উদ্‌ভব হয়। এই ভাবে বিবেচনা করিলে, যাহা ইন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া অব্যবহিত ভাবে আনন্দ দান করে, তাহাই বিরাট। সম্বন্ধ "প্রকারে"র প্রয়োগে বিরাটের অনুভূতিতে প্রকৃতি শক্তিরূপে প্রতীত হয়, এবং সেই শক্তি অপেক্ষা আমাদের উৎকর্ষ আমরা অনুভব করি। সেই শক্তি হইতে ভীত হই না। "বিধা" প্রকারের প্রয়োগে দেখা

যায়, বিরাট-সম্বন্ধীয় আমাদের বিচার সুন্দর-সম্বন্ধী বিচারের মতই নিয়ত ভাবে সত্য, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই, যে বিরাটের ধারণার জন্য সংস্কৃতি এবং নৈতিক প্রত্যয়ের প্রয়োজন। কেবল মহৎ মনেই বিরাটের অনুভূতি সম্ভবপর। যাহার বিচারশক্তি উৎপথগামী অথবা খর্ব্বতাপ্রাপ্ত হয় নাই, এরূপ প্রত্যেক লোকই বিরাটের বিরাটত্ব অনুভব করিতে সক্ষম।

অনুভূতিমূলক—বিচারের দ্বন্দ্বসমন্বয়—ত্রিভঙ্গী নয়

(Dialectic of Aesthetic Judgment)

অনুভূতি-সম্বন্ধী বিচার যদি সার্ব্বিক রূপে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। রুচি-সম্বন্ধে এইরূপ সার্ব্বিক বিচার হইতে দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হয়। যদি বলা যায়, রুচি-সম্বন্ধে কোনও মত-ভেদ হইতে পারে না, যাহা আমার নিকট সুন্দর, সকলের নিকটই তাহা সুন্দর, যাহা আমার নিকট বিরাট বলিয়া প্রতীত হয়, সকলের নিকটই তাহা সেইরূপে প্রতীত হয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, যাহা আমার নিকট সুন্দর অথবা বিরাট, অন্যের নিকট তাহা সুন্দর ও বিরাট না হইতেও পারে। এই দুই পরস্পর বিরোধী মত হইতে যে বিষম প্রসক্তির উদ্ভব হয়, তাহা এই:—(১) রুচিসম্বন্ধী বিচার সম্প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে রুচি-সম্বন্ধে মতভেদ সম্ভবপর হইত। বহু বস্তুর মধ্যে যে সাদৃশ্য, তাহার প্রত্যয়ই সম্প্রত্যয়। অভিজ্ঞতা হইতে ইহার উদ্ভব। বিভিন্ন লোকের অভিজ্ঞতাও বিভিন্ন। সুতরাং বিভিন্ন লোকের সম্প্রত্যয়ের মধ্যে বিভিন্নতা অসম্ভব নহে। (২) রুচির বিচার সম্প্রত্যয়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন লোকের একটি বস্তুর সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করা অসম্ভব হইত। ক্যাণ্ট এই দুই বিচারের এইভাবে সমন্বয় করিয়াছেন। প্রথম বাক্যটি সংশোধন করিয়া বলা যায়—কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রত্যয়ের উপর রুচির বিচার প্রতিষ্ঠিত নহে, অথবা রুচির বিচার যথাযথ ভাবে প্রমাণ করা যায় না। বিরুদ্ধ বাক্যটিকেও সংশোধন করিয়া বলা যায়, রুচির বিচার সম্প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, সে সম্প্রত্যয় অনির্দ্দিষ্ট—তাহা এই দৃশ্যমান জগতের তলদেশে বর্ত্তমান এক অতীন্দ্রিয় পদার্থের প্রত্যয়। এইভাবে উভয় বিচারের মধ্যে দ্বন্দ্ব দূরীভূত হয়।

সৌন্দর্য্য ও বিরাটত্ব বস্তুগত অথবা মনোগত, ইহার আলোচনায় ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, যাহারা বস্তুবাদী, তাহাদের মতে সৌন্দর্য্য ও বিরাটত্ব বস্তুগত। যিনি প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সুন্দর ও বিরাট বস্তুর এমন ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তাহারা মানবের নিকট সুন্দর ও বিরাট-রূপে অনুভূত হয়। তাহাদের এই বিশিষ্টতা তাহাদের মধ্যেই অবস্থিত। মানুষের ইন্দ্রিয় ও কল্পনার সহিত সুন্দর ও বিরাট বস্তুর অভিসংযোজনাই এই অনুভূতির হেতু। এই অভিসংযোজনা সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছাসম্ভূত। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধে এই ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু জীবদেহের বাহিরে যে সমস্ত বস্তু যান্ত্রিক নিয়মের অধীন, তাহাদের গঠনেও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার

নিদর্শন পাওয়া যায়। সুতরাং জীবদেহ সুন্দর হইলেও, তাহাও যে যান্ত্রিক নিয়মানুসারে গঠিত হইয়াছে, ইহাও বিশ্বাস করা যায়। যান্ত্রিক নিয়মানুসারেই যদি যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, প্রকৃতির মধ্যে অভিসংযোজনা নাই, তাহা মানবের মনের মধ্যেই বর্ত্তমান। মানব-মনঃই প্রকৃতির সহিত অভিসংযোজিত, প্রকৃতি মানব-মনের সহিত অভিসংযোজিত নহে। ইহাই অধ্যাত্মবাদিগণের মত। ক্যাণ্ট বলেন, সুনীতি অনুসারে যাহা শ্রেয়ঃ, সৌন্দর্য্যকে তাহারই প্রতীক বলিয়া মনে করাই সম্যক দৃষ্টি। এইরূপে ক্যাণ্ট রুচিকেও সুনীতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

কলা-সম্বন্ধে ক্যাণ্ট লিখিয়াছেন, প্রকৃতি যখন চিত্রের মত প্রতীত হইয়াছিল, তখনই তাহার সৌন্দর্য্য অনুভূত হইয়াছিল। কলাকে তখনই সুন্দর বলা যায়, যখন তাহা কলামাত্র, এই জ্ঞান জাগ্রত থাকা সত্বেও, তাহা প্রকৃতির সদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কলার প্রতি অনুরাগ নৈতিক উৎকর্ষের পরিচায়ক নহে, কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ চিত্তের সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাঁহা দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু মৌলিকতা ও অনুপ্রেরণা-সমন্বিত প্রতিভাই কলার সৃষ্টিশক্তি। বিশেষের মধ্যে সার্ব্বিকতার সৃষ্টিদ্বারা সৌন্দর্য্যবোধের তৃপ্তি-সাধন প্রতিভার সাধ্যায়ত্ত। সৌন্দর্য্যের কল্পনাকে রূপ দিয়া প্রতিভা লোক-লোচনের সম্মুখে প্রকাশিত করে, এবং যে সকল চিন্তা ও অনুভূতি রূপায়িত হইয়া সাধারণ লোকের নিকট সুন্দর ও বিরাটরূপে প্রতীত হয়, তাহাদিগকে রূপ দিয়া প্রকাশিত করাই কলা-শিল্পীর কার্য্য। নিতান্ত ঘৃকারজনক বস্তু ভিন্ন যাবতীয় বস্তুই কলাশিল্পীকর্ত্তৃক সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইতে পারে।

সাধারণ দ্রব্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত থাকে, তাহাই যে কেবল প্রতিভাকর্তৃক উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহা নহে। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যে আদর্শ ব্যক্ত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়াও সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয় না, বস্তুত্বের বন্ধন হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ অনন্তের রাগে রঞ্জিত করিয়া বিশেষকে প্রকাশিত করিবার ক্ষমতাও প্রতিভার আছে। একমাত্র পংক্তিদ্বারা প্রতিভাবান্ কবি, এবং তুলিকার একটি মাত্র স্পর্শদ্বারা প্রতিভাবান চিত্রকর পাঠক এবং দর্শকের কল্পনা-শক্তির প্রসার-সম্পাদন করিয়া, কাব্য ও চিত্রে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, পাঠক ও দর্শকের মনে তাহা অপেক্ষা গূঢ়তর অর্থের উদ্বোধন করিতে পারেন। এই শক্তিকে ক্যাণ্ট "সৌন্দর্য্য প্রকাশক শক্তি" বলিয়াছেন।

এই জন্য জ্ঞানবৃত্তি ও তাহার বিষয়ের মধ্যে যে সংগতি বর্ত্তমান, তাহার ব্যাখ্যার জন্য সুন্দর ও বিরাটের মধ্যে, এবং কলা ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে, এক অনির্দিষ্ট অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হই। কিন্তু সকল অবস্থায় সৌন্দর্য্য ও বিরাটত্বের অনুভূতি সম্ভবপর হয় না। ইহাদের প্রভাব অনুভবের জন্য মনের ও হৃদয়ের বিশিষ্ট অবস্থার প্রয়োজন। মনের মধ্যে শান্তি ও সামঞ্জস্য না থাকিলে, ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য শান্ত না হইলে, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অথবা সৌন্দর্য্যের উপভোগ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং রুচির বিশুদ্ধির জন্য নৈতিক বুদ্ধি ও অনুভূতির পরিপোষণ আবশ্যক। "প্রত্যক্ষ রূপের মধ্যে রূপায়িত" সুনীতির প্রত্যয়দিগকে দর্শন করিতে সমর্থ বিচারবৃত্তিই রুচি।"

উদ্দেশ্য-মূলক বিচারের সমালোচনা
(Critique of Teleological Judgment)

উপরে আমাদের মনের সহিত প্রাকৃতিক দ্রব্যের অভিসংযোজনার কথা বিবৃত হইয়াছে। প্রাকৃতিক জগতের দ্রব্যজাতের পরস্পরের মধ্যেও এইরূপ অভি-সংযোজনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই অভিসংযোজনা Critique of Teleological Judgment এ আলোচিত হইয়াছে। এই অভিসংযোজনা দ্বিবিধ—বাহ্য ও আন্তর। বাহ্য সংযোজনা আপেক্ষিক। কোনও দ্রব্যকে যখন দ্রব্যান্তরের প্রয়োজন-সাধনের উপযোগী দেখিতে পাওয়া যায়, তখন প্রথমোক্ত দ্রব্যকে দ্বিতীয়ের প্রতি অভিসংযোজিত বলা হয়। সমুদ্রোপকূলের বালুকা পাইন বৃক্ষের জন্ম ও বৃদ্ধির অনুকূল। পৃথিবীতে উৎপন্ন খাদ্য জীবজন্তুর প্রাণ-ধারণের জন্য আবশ্যক। এই জন্য পৃথিবী জীবজন্তুর প্রয়োজনের সহিত অভিসংযোজিত এবং উপকূল-বালুকা পাইন বৃক্ষের প্রয়োজনের সহিত অভিসংযোজিত বলা হয়। কিন্তু পৃথিবী ও উপকূল-বালুকার আপনার মধ্যে অভিসংযোজনা বলিয়া কিছু নাই। জীব-জন্তু ও পাইন বৃক্ষের সহিত তাহাদের অভিসংযোজনা হইতে কোনও উদ্দেশ্যের অনুমান করা যায় না। জীবজন্তু না থাকিলেও পৃথিবী যাহা, তাহাই থাকিত; পাইন বৃক্ষ না থাকিলেও বালুকার স্বরূপের কোনও পরিবর্তন হইত না। পাইন বৃক্ষের প্রয়োজন-সাধক বলিয়া আমরা বালুকার ধারণা করি না। পৃথিবী যে খাদ্য উৎপন্ন করে, তাহার কারণ এই নয়, যে মানুষের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। জীবজন্তু ও পাইন বৃক্ষের অস্তিত্ব না থাকিলেও পৃথিবী ও উপকূল-বালুকার অস্তিত্বের কোনও বাধা হইত না। প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে, এবং সেই নিয়মদ্বারাই ইহাদিগকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু আন্তর অভিসংযোজনা অন্য প্রকারের। জীব ও উদ্ভিদেই এই অভিসংযোজনা দেখিতে পাওয়া যায়। জীব ও উদ্ভিদদেহের গঠন এমন, যে তাহার প্রত্যেক অংশের সহিত অন্যান্য অংশের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বর্তমান। সমগ্র দেহের জন্য যেমন তাহার প্রত্যেক অঙ্গের প্রয়োজন, তেমনি প্রত্যেক অঙ্গের জন্যও অপরাপর অংশ অপরিহার্য্য। প্রত্যেক অংশ কার্য্য ও কারণ উভয়াত্মক। জীব ও উদ্ভিদদেহ যন্ত্রমাত্র নহে। তাহাদের সৃষ্টি-শক্তিও আছে। যান্ত্রিক নিয়মদ্বারা তাহাদের ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে। তাহাদের মধ্যে উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্যের প্রত্যয় ভিন্ন তাহাদের ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না।

বিরোধের সমন্বয় (ত্রিভঙ্গী নয়)*

যান্ত্রিকতাবাদ ও উদ্দেশ্যবাদের মধ্যে বিরোধের সমন্বয় Dialectic এর উদ্দেশ্য। যান্ত্রিকতাবাদিগণ বলেন, জাগতিক সমস্ত জড় বস্তুর উৎপত্তি কেবলমাত্র যান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে হওয়াই সম্ভবপর। অন্য পক্ষ বলেন, জড় জগতে এমন বস্তুও আছে, যাহার উৎপত্তি কেবল যান্ত্রিক নিয়মানুসারে সম্ভবপর বলিয়া গণ্য করা যায় না, তাহাদের ব্যাখ্যা করিতে

* Dialectic

হইলে উদ্দেশ্যরূপ কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই দুই "বিচার" যদি বিষয় জগতে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিরোধের সমন্বয় করা সম্ভবপর হয় না। এক পক্ষ বলেন প্রকৃতির মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য নাই। কোনও উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রকৃতির কোনও কার্য্য হয় না। প্রকৃতির যাহা স্বরূপ, তাহার নিয়মানুসারেই যাবতীয় প্রাকৃতিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, এবং যাবতীয় বস্তুই—জীব, উদ্ভিদ ও জড় সকলই—এই নিয়মানুসারেই উৎপন্ন হয়। কোথায়ও কোনও উদ্দেশ্য নাই। দ্বিতীয় মতে জীব-ও-উদ্ভিদ-জগতে উদ্দেশ্য বর্ত্তমান, প্রত্যেক জীবের মধ্যে, প্রত্যেক উদ্ভিদের মধ্যে, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য অনুস্যূত থাকিয়া, সেই সেই উদ্দেশ্য-সাধনের অনুকূল ভাবে কার্য্য করিতেছে। এই দুই মত পরস্পর বিরোধী, কিন্তু এই দুই মতকে যদি প্রাকৃতিক গবেষণার জন্য নিয়ামক তত্ত্ব বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে বিরোধের অবসান হইতে পারে। জগতে উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার অথবা অস্বীকার না করিয়াও বলা যায়, যে জগৎকে বুঝিতে হইলে আমাদের বুদ্ধির পক্ষে উদ্দেশ্য-স্বীকার প্রয়োজনীয়। আমাদের বুদ্ধি হইতে ভিন্ন অন্যবিধ বুদ্ধির অস্তিত্ব যদি থাকে, তাহা হইলে, তাহার পক্ষে প্রযোজনীয় না হইতেও পারে। আমাদের বুদ্ধি যুক্তি-মূলক—যুক্তির সাহায্যে বিচার করা তাহার স্বভাব। অব্যবহিত ভাবে সত্যকে দেখিবার ক্ষমতা তাহার নাই। প্রত্যেক বস্তুকে খণ্ডে খণ্ডে দেখা ও সমগ্রকে তাহার অংশ সকলের সমষ্টিরূপে দেখাই আমাদের বুদ্ধির স্বভাব। কিন্তু সমগ্রকে একেবারে সমগ্ররূপে দেখিতে সমর্থ ও যুক্তির সহায়তা গ্রহণ না করিয়া অব্যবহিত জ্ঞান লাভের শক্তি-সমন্বিত বুদ্ধির নিকট জগৎ একমাত্র তত্ত্বের অর্থাৎ একমাত্র যান্ত্রিক নিয়মের অধীন বলিয়া প্রতীত হওয়াও সম্ভবপর।

ক্যাণ্টের ধর্ম্মমত

জার্ম্মানির পুরোহিত সম্প্রদায় ক্যাণ্টের মতের প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছিল। এই প্রতিবাদে বিচলিত না হইয়া ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্ট Religion within the limits of Pure Reason নামক গ্রন্থে প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার ধর্ম্ম-মতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। ইহা ক্যাণ্টের বিশেষ সাহসের পরিচায়ক। ইহাতে তিনি সুনীতিকেই ধর্ম্মের সার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুনীতির নিশ্চিত ফল ধর্ম্ম; কেননা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য যে পরমার্থ, সুনীতিদ্বারাই তাহ' লভ্য।

ক্যাণ্টের এই গ্রন্থ চারি খণ্ডে বিভক্ত: (১) মানব-চরিত্রে পাপের মূল; (২) মানুষের মধ্যে পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্ব; (৩) পাপের উপর পুণ্যের জয়, এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা; (৪) ধর্ম্মে প্রকৃত এবং মিথ্যা সেবা এবং পুরোহিত-তন্ত্র।

ইচ্ছার স্বাধীনতাই সমস্ত ধর্ম্মের ভিত্তি, এবং ধর্ম্মের সারভাগই চরিত্রোৎকর্ষ। ধর্ম্মে প্রেমের কোনও স্থান নাই। ভয় অথবা আশাদ্বারা আমাদের চালিত হওয়া উচিত নহে। নৈতিক নিয়ম সকলের উপরে।

মানুষের অন্তরে চিরকাল পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। ইচ্ছার মাধ্যমেই পাপ

অনুষ্ঠিত হয়। হৃদয়ের প্রবঞ্চনাই পুণ্যের পথে প্রধান বাধা। যাহা অমঙ্গলকর, যাহা পাপ, প্রবঞ্চক হৃদয় তাহাকেই মঙ্গলের পরিচ্ছদে সজ্জিত করে। হৃদয়ের এই প্রবঞ্চনাই আদিম পাপ। এই আত্ম-প্রবঞ্চনাই মানব-জাতির কলঙ্ক, ইহাদ্বারাই ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান বাধিত হয়। মানুষ সৎ হইয়া জন্মে না; সৎ হইবার উদ্দেশ্যে তাহার জন্ম। আমাদের স্বভাবের আদিম প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তনই নবজন্ম। সুনীতির নিয়ম-পালনের সামর্থ্যের উপর মানুষের মূল্য নির্ভর করে। সুনীতির নিয়মের প্রতি মানুষের আগ্রহ উদ্বুদ্ধ করাই মানুষকে স্থায়ী ভাবে মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। যাহাকে সাধারণতঃ অপ্রাকৃত বলা হয়, ক্যাণ্টের ধর্ম্মে তাহার স্থান নাই। অপ্রাকৃত ঘটনাকে সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিতে বাধা নাই, কিন্তু ঈদৃশ ঘটনাদ্বারা কোনও ধর্ম্ম সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না, কেননা ইহাদের সত্যতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা সম্ভবপর নহে। অপ্রাকৃত ব্যাপারের উপর নির্ভর না করিয়া, সকলই আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এই বিশ্বাসে আমাদের কার্য্য করিতে হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত থাকিবার সামর্থ্যের জন্য প্রার্থনা ভিন্ন অন্য প্রার্থনা উচিত নয়।

খৃষ্টধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম, যাহাদ্বারা মানুষের নৈতিক সংশুদ্ধি সম্ভবপর। এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া যীশুকে সম্মান করিতে হইবে, তাঁহার জীবন ও উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধান্বু হইতে হইবে। এই ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকাশ বাইবেলে। প্রত্যাদেশ অসম্ভব নহে, কিন্তু যুক্তিদ্বারা যে সত্য জানিতে পারা যায়, তাহাই কেবল প্রত্যাদিষ্ট হইতে পারে। নৈতিক প্রমাণের উপরই শাস্ত্রে বর্ণিত সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নহে। যুক্তির অনুমত ধর্ম্মের উপদেশ করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

আদর্শ মানব-সৃষ্টিই জগৎ-সৃষ্টির লক্ষ্য। এই আদর্শ মানবই "ঈশ্বর-পুত্র", ইহাই ঈশ্বরের জ্যোতির প্রতিরূপ। এই আদর্শ-গ্রহণ এবং আদর্শ মানব-সংঘের অন্তর্ভূত হইবার প্রচেষ্টা-দ্বারাই আমরা "ঈশ্বরের পুত্র" হইতে পারি এই পরিপূর্ণ আদর্শে বিশ্বাসই পরিত্রাণ-কারী বিশ্বাস, খৃষ্টের জীবনের ঐতিহাসিকতায় বিশ্বাস নহে।

আমাদের যাবতীয় কর্ত্তব্যকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া স্বীকার করাই ধর্ম্ম। প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মে প্রথমে ঈশ্বরের আদেশ কি, তাহা অবগত হইয়া, পরে ঈশ্বরের আদেশকে কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করা হয়; প্রাকৃতিক ধর্ম্মে কর্ত্তব্য কি, তাহা অবগত হইয়া পরে সেই কর্ত্তব্যকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া গণ্য করা হয়।

বিশ্বাসী লোকদিগের সমাজই চার্চ্চ। ধর্ম্মসাধনে পরস্পরের সহায়তা করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই নৈতিক রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বন্ধন-সূত্র বাহ্যিক নহে, নৈতিক। নৈতিক ব্যবস্থা এই সমাজের ভিত্তি, এবং ইহার লক্ষ্য "ঈশ্বরের রাজ্য"। নিয়ম ও আচার-পালন প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সেবা না হইলেও, তাহার যে কোনও মূল্য নাই, তাহা নহে। তাহাদ্বারা শিক্ষাবিধান হয়। মত-বিশেষের মূল্য নির্ভর করে তাহার নৈতিক মূল্যের উপর। ব্যবহারিক জীবনে ত্রিত্ববাদের কোনও মূল্যই নাই। ঈশ্বরের মধ্যে তিন জন অথবা দশ জন পুরুষের অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কিছুই ইতরবিশেষ হয় না।

যুক্তিমূলক বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাই প্রত্যেক ধর্ম্মমতের উদ্দেশ্য। চরিত্রের উৎকর্ষই ধর্ম্মের সার—বিশ্বাস নয়।

নৈতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধালু লোকদিকের সমবায়ই প্রকৃত চার্চ্চ। এই প্রকার চার্চ্চের প্রতিষ্ঠার জন্যই খৃষ্ট আসিয়াছিলেন এবং জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। ফারিসিদিগের পুরোহিত-শাসিত চার্চ্চের স্থলে তিনি এই প্রকার চার্চ্চেরই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। খৃষ্ট ঈশ্বরের রাজ্য নিকটতর করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে লোকে বুঝিতে পারে নাই, এবং ঈশ্বরেব রাজত্বের স্থলে আমাদের মধ্যে পুরোহিতদিগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চার্চ্চের ইতিহাস যুক্তি ও কুসংস্কারের সংঘর্ষের ইতিহাস। যুক্তির উপর অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাহেতু পৌত্তলিকতা ও পুরোহিততন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। ফলে ধর্ম্মের দ্বারা মানুষ ঐক্যবদ্ধ না হইয়া শতশত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং চাটুবাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ-লাভের উপায়স্বরূপে নানাবিধ অর্থহীন অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। উন্নতির পরিপন্থী শাসকের হস্তে চার্চ্চ যখন যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়, যখন আর্ত্ত জনগণকে প্রেম, বিশ্বাস ও আশায় সঞ্জীবিত করিবার কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হইয়া চার্চ্চ ধর্ম্মসংস্কারের প্রতিরোধের ও রাজনৈতিক পীড়নের সহায়ক হয়, তখন উদ্দেশ্য-ভ্রংশের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়।"

চার্চের উপরিউক্ত সমালোচনা ক্যাণ্টের অসম সাহসের পরিচায়ক। ফ্রেডারিক দি গ্রেটের মৃত্যুর পরে, ফ্রেডারিক উইলিয়াম প্রাসিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরে, তাঁহার শিক্ষামন্ত্রী লুথারের মতবিরোধী শিক্ষা যাহাতে কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত না হয়, সেই জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। ক্যাণ্টের গ্রন্থে যদিও ধর্ম্মের জন্য আগ্রহের অভাব ছিল না, তথাপি ফরাসী স্বাধীন চিন্তা-প্রভাবিত বলিয়া রাজাদেশে ইহার প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আদেশ প্রচারিত হইবার পরে ক্যাণ্ট গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি জেনা নগরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং জেনার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রাযন্ত্র হইতে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাসিয়ারাজ রুষ্ট হইয়া ক্যাণ্টের কৈফিয়ত দাবী করেন, এবং ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেন। কৈফিয়তে ক্যাণ্ট লিখিয়াছিলেন, "যদিও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই স্বাধীন মত-পোষণের ও প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত, তথাপি বর্ত্তমান নরপতির শাসনকালে তিনি স্বকীয় মত-প্রকাশে বিরত থাকিবেন।" এই সময়ে ক্যাণ্টের বয়স হইয়াছিল সত্তর বৎসর, তাঁহার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না। রাজার সহিত কলহের সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহার যাহা বলিবার ছিল, ইতিপূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়া গিয়াছিল। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লব আরব্ধ হইলে যখন ইয়োরোপের রাজন্যবর্গের সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, যখন প্রাসিয়ার যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বিধিসম্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত[1] রাজতন্ত্রের সমর্থনে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তখন পঞ্চ-ষষ্টি বর্ষীয় বৃদ্ধ ক্যাণ্ট উৎসাহের আতিশয্যে বন্ধুদিগের সমক্ষে বলিয়াছিলেন, "সাইমিয়নের মতো আমি এখন বলিতে পারি, "প্রভু,

[1] Legitimate.

তোমার ভৃত্যকে এখন শান্তিতে '(পৃথিবী হইতে) প্রস্থানের অনুমতি দাও, কেননা আমার চক্ষু পরিত্রাণরূপী তোমাকে দেখিয়া লইয়াছে।"

ক্যাণ্টের রাষ্ট্রনীতি

১৭৮৪ সালে ক্যাণ্টের "The Natural Principle of the Political Order considered in connection with the idea of a Universal Cosmopolitical History" নামক রাজনৈতিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ক্যাণ্ট সংঘর্ষকে মানব-সমাজের উন্নতির জন্য অপরিহার্য্য বলিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষ যদি সম্পূর্ণ সামাজিক জীব হইত, অন্য সকলের অধিকারের প্রতি সম্মানের দ্বারা তাহার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে তাহার প্রগতি অসম্ভব হইত। মানবের চরিত্রে কিছু পরিমাণ খাদ মানবজাতির অস্তিত্ব ও বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক। অসামাজিক প্রবৃত্তিবর্জ্জিত মানব হয়তো মেষপালকদিগের জীবনের মত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিত, হয়তো পরস্পরের প্রতি প্রীতির ফলে তাহাদের জীবন অসন্তোষদ্বারা বিক্ষুব্ধ হইত না, কিন্তু তাহাদের শক্তির বিকাশ সম্ভবপর হইত না। মানুষ শান্তি চায়, কিন্তু তাহার কিসে মঙ্গল, তাহা প্রকৃতি তাহার অপেক্ষা ভাল জানে। এই জন্যই প্রকৃতি তাহার মধ্যে কলহের বীজ বপন করিয়াছে। এই জন্যই নূতন শক্তিলাভ তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে।

জীবন-সংগ্রাম সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক নহে, ইহা সত্য। কিন্তু এই সংগ্রাম নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া উচিত। এই বোধ হইতেই সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজে মানব-জাতি বিভক্ত হইবার পরে, সমাজগঠনের পূর্ব্বে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সম্বন্ধ ছিল, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সম্বন্ধে আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করিয়াছে। সুতরাং সমাজ-গঠনের পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে যে ব্যবহার আশা করিত, প্রত্যেক রাষ্ট্রও অন্য রাষ্ট্রের নিকট তাহা অপেক্ষা ভাল ব্যবহার আশা করিতে পারে না। সমাজের এই অবস্থা প্রাকৃতিক অবস্থা। এই অবস্থা অতিক্রম করিতে না পারিলে মানব-জাতির মঙ্গল নাই। পরস্পরের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিয়া শান্তি-রক্ষার ব্যবস্থার সময় এখন আসিয়াছে। কলহপ্রিয়তা ও বলপ্রয়োগের প্রবৃত্তি সংযত করিয়া শান্তির ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার দিকেই মানবের ইতিহাসের গতি। মানব-জাতির ইতিহাস সমগ্রভাবে পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয়, যে মানুষের মধ্যে নিহিত যাবতীয় শক্তির পূর্ণ বিকাশের উপযোগী পূর্ণতম একটি রাজনৈতিক সংস্থার অভিব্যক্তিই প্রকৃতির লক্ষ্য। এইরূপ পরিণতি যদি সাধিত না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে একাধিক্রমে যে সকল সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের কার্য্য নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হইবে, এবং গ্রীক পুরাণে বর্ণিত নরকবাসী সিসিফাস সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ঠেলিয়া পর্ব্বত-শিখর সমীপে পৌছিবামাত্রই যেমন তাহা পর্ব্বতের পাদদেশে গড়াইয়া পড়িত, এবং তাহাকে পুনরায় প্রস্তরখণ্ডকে পর্ব্বতশীর্ষে ঠেলিয়া লইবার চেষ্টা আরম্ভ করিতে হইত, বিভিন্ন মানবীয় সভ্যতারও তদ্রূপ পরিণাম হইবে।

ইতিহাস অন্তহীন আবর্ত্তমান মূঢ়তায় পরিণত হইবে, এবং হিন্দুদিগের মত বলিতে হইবে, যে পুরাকালে অনুষ্ঠিত বিস্মৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-ভূমিরূপে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে।

১৭৯৫ সালে ক্যাণ্টের Eternal Peace (চিরস্থায়ী শান্তি) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক দেশের স্থায়ী সৈন্যদল বিলুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও দেশই প্রকৃত পক্ষে সভ্য হইবে না। স্থায়ী সৈন্যদল থাকার ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যেক জাতি তাহার সৈন্য-সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। ফলে যে পরিমাণ ব্যয় হয়, তাহাতে স্বল্পকালস্থায়ী যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তি অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে। এই ভার হইতে মুক্ত হইবার জন্য অবশেষে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। স্থায়ী সৈন্যদল-রক্ষাই পরিণামে যুদ্ধের হেতু হইয়া পড়ে।

এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় ইয়োরোপীয়দিগের সাম্রাজ্য-স্থাপনের ফলে তাহাদিগের যুদ্ধোন্মুখতা উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার ফলে লুণ্ঠিত সম্পত্তি লইয়া দস্যুদিগের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হইয়াছে। অসভ্যজাতীয় লোকদিগের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরেই তাহাদিগের প্রতি সভ্যজাতীয় লোকদিগের, বিশেষতঃ বাণিজ্য-প্রধান রাষ্ট্রসকলের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা বিবেচনা করিলে অন্তঃকরণে ভীষণ ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাহাদের দেশে পদার্পণমাত্রই তাহাদের দেশ বিজিত হইয়াছে বলিয়া ইহারা গণ্য করে। আমেরিকা, মশলাদ্বীপ, উত্তমাশা অন্তরীপ ও নিগ্রোদিগের দেশ আবিষ্কার করা মাত্রই, তাহারা যেন কোন জাতির দেশ নহে, ইহাই তাহারা মনে করিয়াছিল, এবং তাহাদের আদিম অধিবাসীদিগের কথা বিবেচনার যোগ্য বলিয়া গণ্য করে নাই। যাহারা আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রাণতার গৌরব করিয়া বেড়ায়, তাহাদের দ্বারাই এই সকল পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ফরাসী বিপ্লবের আগুণ যখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, তখনি উপরোক্ত কথাগুলি লিখিত হইয়াছিল। প্রাসিয়ারাজের ভীতি-প্রদর্শন ক্যাণ্টকে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হয় নাই।

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির স্বল্পজনপ্রতিষ্ঠ শাসনতন্ত্রই[1] তাহাদের সাম্রাজ্য-লিপ্সার জন্য দায়ী। লুণ্ঠিত সম্পত্তি যাহারা ভাগ করিয়া লইত, তাহাদের সংখ্যা অধিক ছিল না। বিভাগের পরেও প্রত্যেকে প্রচুর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইত। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে পর-দেশ-লুণ্ঠন-লব্ধ ধন দেশের সকলের মধ্যে বিভক্ত হইলে প্রত্যেকের ভাগ এত কম হইবে, যে সেই স্বল্পপরিমাণ লাভের লোভ সংবরণ করা কঠিন হইবে না। সুতরাং চিরস্থায়ী শান্তির প্রথম উপায় এই: প্রত্যেক দেশে সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের জনগণের মত না লইয়া যুদ্ধ ঘোষিত হইতে পারিবে না। যাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে, যুদ্ধ ও শান্তি যদি তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে ইতিহাস আর রক্তদ্বারা লিখিত হইবে না। পরন্তু যেখানে প্রজাগণের ইচ্ছামত শাসন-যন্ত্র পরিচালিত হয় না, যেখানে প্রজাদিগের ভোটের অধিকার নাই, সেখানে যুদ্ধের পরিণাম-ফলের উপর কোনও গুরুত্ব আরোপ করা

[1] Oligarchy

হয় না। কেননা এইরূপ রাষ্ট্রের শাসনকর্তা সেই রাষ্ট্রের মালিক। যুদ্ধ হইতে তাহার নিজের কোনও অসুবিধা হয় না, এবং তাঁহার ভোজন-বিলাসে অথবা মৃগয়ামোদে ব্যাঘাতও ঘটে না। বিলাসপূর্ণ প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হয় না, রাজসভার উৎসবাদিও বন্ধ হয় না। সুতরাং যুদ্ধকে তিনি মৃগয়াযাত্রা সমতুল্য মনে করিয়া অতি সামান্য কারণেই যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে পারেন। তাহার পরে সেই যুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রমাণের ভার পড়ে রাজনৈতিক পণ্ডিতগণের উপর।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া ক্যাণ্ট আশা করিয়াছিলেন, ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশেই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাষ্ট্রের জনগণের উন্নতিতে সাহায্য করাই শাসন-তন্ত্রের কাজ, শাসকদিগের স্বকীয় উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাহাদিগকে ব্যবহার করা নহে। "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই একটি উদ্দেশ্য, তাহাকে তাহার বহিঃস্থ কোনও উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়স্বরূপে ব্যবহার করা মনুষ্যত্বের মর্য্যাদার বিরুদ্ধে অপরাধ"—ইহা Categorical Imperative এর অঙ্গীভূত তত্ত্ব। ইহা ব্যতীত ধর্ম্ম ভণ্ডামি ও পরিহাসে পরিণত হয়। ক্যাণ্ট সাম্যবাদ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাম্য শক্তির সাম্য নহে, শক্তির বিকাশ ও তাহার প্রয়োগের সুযোগের সাম্য। জন্ম ও শ্রেণীর বিশেষ অধিকার তিনি স্বীকার করেন নাই; বংশগত অধিকার অতীতের দস্যুতা হইতে উদ্ভূত বলিয়াছেন। ইয়োরোপের যাবতীয় রাজতন্ত্র যখন ফরাসী বিপ্লবকে ধ্বংস করিবার জন্য সজ্জিত হইতেছিল, তখন সপ্ততিবর্ষীয় ক্যাণ্ট সর্ব্বত্রই প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা সমর্থন করিয়াছিলেন।

সমালোচনা

ক্যাণ্টের দর্শন অত্যল্পকালের মধ্যেই জার্মানিতে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল এবং জার্মানির প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই অভ্যধিত হইয়াছিল। ইহার ফলে বিদ্বৎ-সমাজে দার্শনিক গবেষণার জন্য প্রবল ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যাবতীয় বিভাগে ইহার প্রভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। দুই বিষয়ে দার্শনিক জগতে ক্যাণ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই। আজি পর্য্যন্ত কেহই তাঁহা অপেক্ষা সুষ্ঠুতর ভাবে মানবমনের বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হন নাই, এবং মানুষের ধর্ম্ম-বিবেক-সম্বন্ধে তিনি যে আন্তরিকতা-পূর্ণ ও উৎসাহে উদ্দীপিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহারও তুলনা নাই। চিন্তা-জগতে তাঁহার Critique of Pure Reason যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেরূপ বিপ্লবও আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। ইয়োরোপে অধ্যাত্মবাদের জনক বলিয়া প্লেটোর নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে, কিন্তু অধ্যাত্মবাদের সুদৃঢ় ভিত্তি ক্যাণ্টই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার Critique of Practical Reason চরিত্রনৈতিক দর্শনে এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তার কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া ক্যাণ্টের দর্শন তাহার উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সিলার ও গেটে গভীর আগ্রহে তাঁহার দর্শন পাঠ করিয়াছিলেন। ফিক্‌টে, শেলিং ও হেগেল তাঁহার দর্শনের উপরেই আপনাদের দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বস্তুজগৎ চিন্তাজগতের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাঁহার এই মতের মধ্যেই

হেগেল তাঁহার দর্শনের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রজ্ঞার সমালোচনা ও অনুভূতির গুরুত্বখ্যাপন হইতে সোপেন্‌হর ও নিৎসের "ইচ্ছা"-বাদের উদ্ভব হইয়াছিল। বার্গসঁর উপজ্ঞাবাদ এবং হার্বার্ট স্পেন্‌সারের অজ্ঞেয়বাদের মূলেও ছিল ক্যাণ্টের দর্শন। "নানাভাবে সংস্কৃত ক্যাণ্টের অধ্যাত্মবাদ এবং আলোকবিস্তার যুগের জড়বাদের মধ্যে শতাব্দীব্যাপী সংঘর্ষের পরে, জয়-লক্ষ্মী ক্যাণ্টেরই অঙ্ক-লগ্ন বলিয়া প্রতীত হয়। প্রসিদ্ধ জড়বাদী হেলভেটিয়াস্‌ও লিখিয়াছিলেন, যদি বলিবার সাহস হয়, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি, জড়পদার্থ মানুষেরই সৃষ্টি! ক্যাণ্টের আবির্ভাবের ফলে দর্শন আর কখনও সরলবিশ্বাসী হইবে না। ভবিষ্যতের দর্শন বর্ত্তমান দর্শন হইতে ভিন্ন ও গভীরতর হইবে।"*

ক্যাণ্টীয় দার্শনিক সৌধের উপর দিয়া বহু ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে। সেই ঝটিকার আঘাতে ইহার কোন কোনও অংশ কম্পমান হইলেও, অনেক অংশই এখন পর্য্যন্ত অক্ষত আছে। দেশ-ও-কাল-সম্বন্ধে ক্যাণ্টের মত সমগ্রভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। ইহা সত্য, যে শূন্যকাল ও শূন্যদেশের ধারণা একটি শূন্যগর্ভ প্রত্যয়মাত্র। আধেয়হীন দেশের ধারণার উপযোগী কোনও ইন্দ্রিয়ই আমাদের নাই, এবং তাহার কোনও জ্ঞানই নাই। দেশের যে জ্ঞান আমাদের আছে, তাহা বস্তুর সহিত জড়িত, তাহা দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরের দূরত্ব-সূচক সম্বন্ধের জ্ঞান। বাহ্য বস্তু এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত ভাবেই আমাদের মনের গোচর হয়, এবং সে সম্বন্ধকে মনের সৃষ্ট বলিয়া গণ্য করিবারও কারণ আছে। আবার ইহাও সত্য, যে পৃথিবীর সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ যদিও মনেরই নিকট প্রকাশিত, তথাপি কোনও জ্ঞাতার অস্তিত্ব না থাকিলেও, পৃথিবী যে ঐ ভাবে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে, এবং যখন পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও যে পৃথিবী এই ভাবেই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিত, তাহাতেও অবিশ্বাস করা কঠিন। যে অনন্ত বিস্তৃত অসংখ্য-নক্ষত্র-খচিত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, তাহার দেশব্যাপী অস্তিত্ব যে আমাদের জন্মের পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, মৃত্যুর পরেও তেমনি থাকিবে, তাহাতেও আমাদের সংশয় হয় না। এই জন্য দেশ-সংস্পর্শ-বর্জ্জিত অনুভূতি-পুঞ্জের উপর মনের মধ্যবর্ত্তী দেশের ধারণা প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং দেশের বাহ্য অস্তিত্ব নাই, ইহা মনে করা কঠিন। বিভিন্ন দ্রব্যের এবং বিভিন্ন বিন্দুর যুগপৎ উপলব্ধি হইতে দেশের জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। কোনও নিশ্চল তলের উপর যখন কোনও কীট চলিতে থাকে, এক বিন্দু হইতে অন্য বিন্দুতে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন দেশের উপলব্ধি হয়। ইহা বিবেচনা করিলে, দেশের জ্ঞানকে একেবারে বিষয়-নিরপেক্ষ বলিয়া গণ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই রূপ যদিও পূর্ব্ব ও পর, অথবা "গতির পরিমাণ" হিসাবে, কালও যে মানসিক এবং আপেক্ষিক, তাহা বিশ্বাস করা যায়, তথাপি যখন কোনও অথবা উদ্ভিদের বিষয় বিবেচনা করা যায়, তখন তাহাদের বৃদ্ধি ও মৃত্যু যে স্বতন্ত্র

* Will Durant

জ্ঞাতার অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ, কেহ, দেখুক অথবা না দেখুক, তাহারা যতদিন বাঁচিবে, কেহ তাহার পরিমাপ করুক অথবা না করুক, ততদিন তাহারা যে বাড়িতে বাড়িতে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইবে, এবং পরে মরিয়া যাইবে, তাহাতেও সন্দেহ থাকে না। সমুদ্রগর্ভে যে সকল জীব ও উদ্ভিদের জন্ম হয়, তাহারা কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিয়া পরে মরিয়া যায়। কেহ তাহাদের দেখিতে পায় না, তবুও তাহাদের জন্ম ও মৃত্যু-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হয় না। এই জন্য কালকেও মনের সৃষ্ট বলিয়া মনে করা কঠিন।

কিন্তু দেশ-কালের "ধারণা" মনের সৃষ্টি হইলেও, তাহাদের মনঃ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অসম্ভব কেন? ট্রেন্‌ডেলেন্‌বার্গ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দেশ ও কালের অব্যবহিত ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ যে ধারণা আমাদের আছে, তাহার অস্তিত্বদ্বারা তাহাদের মনঃ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয় কিরূপে? ক্যাণ্ট এই প্রশ্নের সোজা উত্তর দেন নাই। তবে একস্থানে বলিয়াছেন, যে দৈশিক ও কালিক সম্বন্ধই গণিতের বিষয়। গণিতের জ্ঞানকে যদি সন্দেহের অতীত হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার বিষয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্তাধীন হইতে হইবে। তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে সম্পূর্ণ হইতে হইবে। কিন্তু স্ব-গত বস্তুর ধর্ম্মরূপে মানসিক দেশ ও কাল হইতে স্বতন্ত্র দেশ ও কালের অস্তিত্ব যদি থাকে, আমাদের পরিজ্ঞাত দেশ ও কাল হইতে ভিন্ন দেশ ও কালের অস্তিত্ব যদি থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সহিত আমাদের পরিজ্ঞাত দেশ ও কালের পরিপূর্ণ সাদৃশ্য না থাকিতেও পারে। সে দেশ সসীম হইতে পারে, তাহার চারি পরিমাপ[1] হইতে পারে; আর সেই কালের গতি অগ্রগামী না হইয়া বৃত্তাকার হইতে পারে। এই যুক্তিতে গণিতের নিশ্চিতি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য—ইউক্লিডের জ্যামিতি ও নিউটনের Principia-কেই বা অনিশ্চিত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমরা আমাদের দেশ ও কালের বাহ্য অস্তিত্বের বিশ্বাস বিসর্জন করিব কেন? এই প্রশ্ন কেহ কেহ উত্থাপন করিয়াছেন।*

বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ সত্যতা প্রমাণের জন্য ক্যাণ্ট উৎসুক ছিলেন। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও তাহা স্বীকারে কুণ্ঠিত। Pearson, Mach, Henry Poincare প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের গবেষণার ফলের সহিত Humeএর মতের সাদৃশ্য যতটা, Kantএর মতের ততটা নাই। তাঁহাদের মতে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্যই আপেক্ষিক—গাণিতিক সত্যও তাহাই। অধিক-পরিমাণ সম্ভাব্যতা পাইলেই বিজ্ঞানের কাজ চলিয়া যায়। নিরপেক্ষতার প্রয়োজন নাই।

ক্যাণ্টের ত্রিধা-বিভক্ত দ্বাদশ সংখ্যক "প্রকারে"র প্রতি সোপেন্‌হর শ্লেষবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। "প্রকারগণ" সহজাত কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, ব্যক্তিতে তাহারা সহজাত এবং অভিজ্ঞতার পূর্ব্ববর্ত্তী, কিন্তু

[1] Dimensions

* Vide—Benn's History of Modern Philosophy. P. 78

অভিব্যক্তির ইতিহাসে তাহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষকর্ত্তৃক এক সময় অর্জিত হইয়াছিল, এখন সহজাত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিতেও তাহারা যে অভিজ্ঞতাদ্বারা অর্জিত নহে, তাহা বলাও দুঃসাধ্য। স্মৃতি-শক্তিদ্বারা সংবেদনসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রথম প্রতীতিতে পরিণত হয়, পরে প্রতীতি প্রত্যয়ে পরিণত হয়। কিন্তু স্মৃতি ক্রমশঃ জন্মে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সংবেদনসকল শিশুর চিত্তক্ষেত্রে প্রথমে হয়তো বিশৃঙ্খলভাবে সমবেত হয়, ক্রমশঃ স্মৃতিশক্তির উদ্বোধনের সঙ্গে তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একপ্রকার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে, পরস্পর সম্বদ্ধ ও জ্ঞানোৎপাদনের উপযোগীভাবে বিন্যস্ত হইয়া প্রতীত হয়। এইভাবে প্রকারদিগের উদ্ভব অসম্ভব না হইতে পারে। মনের যে একত্ববোধকে ক্যাণ্ট সহজাত বলিয়াছেন, এবং Transcendental Unity of Apperception নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহাও সহজাত না হইতে পারে। সকলের যে এই একত্ববোধ আছে, তাহা নয়। তাহা যেমন অর্জিত হইতে পারে, তেমনি তাহার বিনাশের সম্ভাবনাও আছে। স্মৃতিভ্রংশ এবং একই ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ে আপনাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করার দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়।

ক্যাণ্টের কর্ম্মনৈতিক মতের কঠোর সমালোচনা হইয়াছে। অভিব্যক্তিবাদিগণ ধর্ম্ম-বিবেক বলিয়া কোনও সহজাত বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাহারা বলেন, সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই ধর্ম্ম-বিবেকের উৎপত্তি, এবং কর্ম্ম-নীতি অনপেক্ষ নহে। সমাজের স্থিতি ও শান্তির জন্য তাহার উদ্ভব। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন কর্ম্মনীতির উদ্ভব হইয়াছে। চতুর্দিকে শত্রুপরিবেষ্টিত দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে যে বীরত্ব সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে, যে দেশের শত্রু হইতে ভয়ের কারণ নাই, তথায় তাহার মূল্য অধিক নহে। ক্যাণ্টের নিষ্কাম কর্ম্মনীতি ইয়োরোপে সমাদৃত হয় নাই। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সম্পাদন সন্ন্যাস-ধর্ম্মের সমতুল্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তির জীবনেই হউক অথবা জাতির জীবনেই হউক স্বার্থত্যাগ ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম তাহার নৈতিক উন্নতির জন্য যে প্রয়োজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্যাণ্টের সমকালে হেলভেটিয়াস ও হলব্যাক যে সুখবাদের প্রচার করিয়াছিলেন, ক্যাণ্টের কঠোর নৈতিক মত তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণ মনের প্রতিক্রিয়া। তাঁহার মৃত্যুর সার্দ্ধশতাব্দী পরে আজি জগৎ তাঁহার সমসাময়িক ভোগপরতন্ত্রতার মধ্যে আবার নিমজ্জিত হইয়াছে, এবং সভ্যতা একটি সংকটজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এই সংকট হইতে উদ্ধারের উপায় হয়তো ক্যাণ্টের কর্ম্মনীতির মধ্যেই আবিষ্কৃত হইবে।

Crtique of Pure Reason এ ঈশ্বর, জীবাত্মার অমরতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতার ধারণা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া Critique of Practical Reason এ ক্যাণ্ট তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলিয়াছেন, যে যাদুকর যেমন তাহার শূন্য টুপীর মধ্য হইতে নানা দ্রব্য বাহির করে, ক্যাণ্টও কর্ত্তব্যের প্রত্যয় হইতে ঈশ্বর, অমরতা ও স্বাধীনতা তেমনি টানিয়া বাহির করিয়া পাঠকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মের পুরস্কার-স্বরূপে সুখের প্রয়োজন-দ্বারা ক্যাণ্ট জীবাত্মার

অমরতা প্রমাণ করিয়াছেন বলিয়া সোপেনহর তাঁহাকে উপহাস করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন ক্যাণ্টের ধর্ম্ম প্রথমে সুখকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল, কিন্তু পরে স্বাধীনতা হারাইয়া বকশীসের জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। সোপেনহরের মতে ক্যাণ্ট প্রকৃতপক্ষে সন্দেহবাদী ছিলেন। কিন্তু নিজে বিশ্বাস বর্জন করিলেও সাধারণের নৈতিক চরিত্রের উপর বিশ্বাসহীনতার অনিষ্টকর ফলের আশঙ্কায় তাহাদের বিশ্বাস ধ্বংস করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন। হে-ইন পরিহাসচ্ছলে লিখিয়াছেন, যে ধর্ম্মের ধ্বংস সাধন করিয়া একদিন ভৃত্য ল্যাম্পের সহিত ক্যাণ্ট বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। হঠাৎ ল্যাম্পের চক্ষু অশ্রু-সিক্ত দেখিয়া তাঁহার মনে অনুকম্পার উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল "ঈশ্বরকে না পাইলে তো বৃদ্ধ ল্যাম্পের মনে শান্তি হইবে না। Practical Reason তাহাই বলে। তবে Practical Reason ঈশ্বরের জন্য জামীন হোক। তাহাতে আমার আপত্তি নাই।" ইহা যে সত্য নহে ক্যাণ্টের "Religion within the limits of Pure Reason"ই তাহার প্রমাণ।

নবম অধ্যায়

ক্যাণ্টের দর্শনের প্রতিক্রিয়া—অনুভূতির দর্শন

ক্যাণ্টের আবির্ভাব দর্শনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। দর্শনে তিনি যে বিপ্লব সংঘটিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে দার্শনিক চিন্তা বহু ধারায় বহুদিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যাবতীয় বিভাগ ইহাদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। ধর্ম্মবিজ্ঞান এবং কর্ম্মনীতির উপর ইহা অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার মতাবলম্বী দার্শনিক লেখকদিগের অনেকে তাঁহার দর্শনের ভাষ্যরচনাদ্বারা তাহা বোধগম্য করিবার চেষ্টায় আপনাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। রেইনহোল্ড, (১৭৫৮-১৮১৩), বার্ডিলি (১৭৬১-১৮০১), সাল্‌ষ্ট, বেক্‌, ফ্রিজ্‌, বুটারবেক প্রভৃতি লেখকগণ এই দর্শনের ত্রুটীগুলি সংশোধন করিতে এবং ইহার ভিত্তি দৃঢ়তর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফিক্‌টে ও হারবার্ট এই দর্শনের বিকাশ-সাধন করিয়া নূতন দার্শনিক প্রস্থানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কিন্তু ক্যাণ্টের দর্শন যে সকলেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মনীতি-সংক্রান্ত মত অনেকের প্রীতিকর হয় নাই। ক্যাণ্ট ধর্ম্মকে জ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে ইচ্ছার ক্ষেত্রে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, এবং বিবেকের আদেশকেই মুখ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়ায় "অনুভূতি বা বিশ্বাসের দর্শন" নামে এক দর্শন আবির্ভূত হইয়াছিল।

ক্যাণ্ট তাঁহার Critique of Pure Reasonএ বলিয়াছেন, যে উপপাদক প্রজ্ঞাদ্বারা ঈশ্বর, জীবত্মার অমরতা এবং স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কিন্তু Critique of Practical Reasonএ বলিয়াছিলেন, যে যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত না হইলেও ঈশ্বর, জীবাত্মার অমরতা ও স্বাধীন ইচ্ছা কর্ম্মমুখী প্রজ্ঞার স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব। এই মত ধর্ম্মবিশ্বাসী অনেকে গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। যুক্তিকে তাঁহারা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা "অনুভূতি"কে উৎকৃষ্টতর সাধন বলিয়াছিলেন। যুক্তিদ্বারা জ্ঞানলাভ করা যায় ব্যবহিত ভাবে, কিন্তু অনুভূতি হইতে অব্যবহিত ভাবে জ্ঞানলাভ করা যায়। অনুভূতিতে আমরা সত্যের স্পর্শ-লাভ করি, তাহাতে সত্যের অনুমান করিতে হয় না। ফ্রান্সে রুসো এই মত ইহার পূর্ব্বেই প্রচার করিয়াছিলেন। জার্ম্মানিতে যাঁহারা এই মতের প্রচার করেন, হ্যামান, হার্ডার ও জেকোবি তাহাদের মধ্যে প্রধান।

(১)

হ্যামান (১৭৩০-১৭৮৮)

জোহন জর্জ হ্যামান কনিগ্‌স্‌বার্গ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আত্মাভিমানী হইলেও তাঁহার গভীর ধর্ম্মানুভূতি ছিল। তাঁহার মৌলিকতা ও মিষ্টিক ভাবের জন্য লোকে

তাঁহাকে "উত্তর প্রদেশের যাদুকর" বলিত। তাঁহার আত্মচরিত, বিবিধ প্রবন্ধ এবং পত্রাবলী তৎকালে অনেকের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গেটে, জেকোবি, হার্ডার ও রিকটার তাঁহার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

হ্যামান্ "জ্ঞানালোক বিস্তার"-আন্দোলনের প্রবল শত্রু ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এই আন্দোলনদ্বারা মানুষ ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সের জড়বাদ এবং জার্ম্মানির যুক্তিবাদ উভয়েরই তিনি বিরোধী ছিলেন। ক্যাণ্ট যে জ্ঞানবৃত্তিকে উপপাদক এবং কর্ম্মমুখী, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার মনোমত ছিল না। তাঁহার মতে এই বিভাগদ্বারাও ঈশ্বর হইতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। তাঁহার মতে বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে "ভাষা"ই সংযোগসাধক সেতু। এই ভাষা ঈশ্বরের দান। কিন্তু ভাষাদ্বারা এই সংযোগ কিরূপে সাধিত হয়, তাহা তিনি বলেন নাই। অনুভূতির গুরুত্ব-খ্যাপন করিয়া তিনি বলিয়াছেন, বুদ্ধির নিকট সত্যকে প্রমাণ করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু বুদ্ধির নিকট প্রমাণিত না হইলেও মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক অংশের দ্বারে যখন ইহা আঘাত করে, তখন ইহাকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায়। জ্ঞানদান প্রজ্ঞার কার্য্য নহে। তাহার কার্য্য আমাদিগকে ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করা। প্রকৃতির মধ্যে যেমন, তেমনি শাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। সত্য শিক্ষার বিষয় নহে; অনুভূতির বিষয়, প্রত্যেককে তাহা অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে হয়। খৃষ্টধর্ম্মের রহস্যের ভিতর দিয়া না গিয়া, ইহাতে বিশ্বাস লাভ করা যায় না। খৃষ্ট নরদেহধারী ঈশ্বর। নরদেহ ধারণ করিয়া ঈশ্বর যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন। ত্রিমূর্ত্তি ঈশ্বর যাবতীয় ঐশ্বরিক সত্যের ভিত্তি। ইহা অনুভবের বিষয়—প্রমাণ করা যায় না।

আর্ডম্যান হ্যামানকে মিষ্টিক বলিয়াছেন। জিন্ পল্ বিরাট নক্ষত্রখচিত আকাশের সহিত হ্যামানের উপমা দিয়াছেন। কিন্তু সে আকাশে বহু মেঘের অস্তিত্ব আছে, বলিয়াছেন।

(২)

হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩)

জোহন গট্‌ফ্রিড হার্ডার এই যুগের সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তাশীল এবং প্রভাবশালী লেখকদিগের অন্যতম। তিনি একাধারে কবি, ধর্ম্মবক্তা ও দার্শনিক ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন ঐতিহ্য এবং প্রাচীন কাব্যের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল। জার্মানির সংস্কৃতি ও চিন্তার উপর তিনি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

হার্ডার তাঁহার Spirit of Hebrew Poetry গ্রন্থে বাইবেলের সৌন্দর্য্য এবং মহত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Ideas towards a Philosophy of the History cf Mankind (মানব-জাতির ইতিহাসের দর্শনের অভিমুখী চিন্তা) গ্রন্থে তিনি প্রকৃতিকে ক্রমবিকাশশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং প্রকৃতি উন্নত হইতে উন্নততর রূপে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে, বলিয়াছেন। লেসিং ধর্ম্মের বিকাশসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন,

হার্ডার প্রকৃতির অভিব্যক্তি-সম্বন্ধে তাঁহাই বলিয়াছেন। আধুনিক অভিব্যক্তি-বাদের সূচনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। হার্ডারের মতে মানুষের প্রজ্ঞা ঈশ্বরকে পরম প্রজ্ঞা এবং যাবতীয় পদার্থের আদি কারণ এবং তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র বলিয়া অব্যবহিত ভাবে জানিতে পারে। পৃথিবীতে মানুষের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না,—ইহাদ্বারা, মানবাত্মার অমরত্ব প্রমাণিত হয়। মানবাত্মার স্বরূপের পূর্ণতম প্রকাশই ধর্ম্ম। মানব-জীবনের গভীরতম অংশই ধর্ম্মীয় অনুভূতির উৎস।

হার্ডার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মানুষের নিবাস-ভূমি পৃথিবীর যে স্থানে অবস্থিতি, তাহাদ্বারা মানুষের জীবন ও চিন্তা সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রিত। মানুষের ক্রমবিকাশ একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। প্রকৃতির মধ্যে যে ক্রমবিকাশের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, মানব-জীবনেও তাহাই দেখা যায়। হার্ডারের উপর ক্যাণ্টের প্রভাব যে ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু হামানের প্রভাব ছিল অধিক, এবং হামানের মত তিনিও বিশ্বাস করিতেন, যে বিশ্বাস এবং অন্তরের অনুভূতি ভিন্ন নিশ্চিতির অন্য কোনও ভিত্তি নাই।

তাঁহার "God" গ্রন্থে, হার্ডার স্পিনোজার মত কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরকে জগতের আত্মা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে খৃষ্ট ঐশ্বরিক সংবিদ এবং মানবীয় সংবিদ, উভয়ের আধার বলিয়া, তিনিই আদর্শ মানব। মানুষ বিশ্বের অভিব্যক্তির শীর্ষস্থানে যেমন অবস্থিত, তেমনি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জগতের প্রারম্ভও মানুষ। সুতরাং মানুষের যে অংশের সহিত এই উচ্চতর জগৎ সম্বদ্ধ, তাহার উন্নতিই মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

(৩)

জেকোবি (১৭৪৩-১৮১৯)

১৭৪৩ সালে ডাসেলডর্ফ নগরে জেকোবি জন্মগ্রহণ করেন। জেনিভায় শিক্ষাসমাপন করিয়া তিনি প্রথমে পিতার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন, কিন্তু কিছুদিন পরে তাহা পরিত্যাগ করিয়া সরকারী কার্য্য গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ডাসেলডর্ফে এবং তাহার সন্নিকটে তাঁহার যে পল্লী-আবাস ছিল, তাহাতে অতিবাহিত হয়। ১৮০৭ সালে তিনি মিউনিকের একাডেমির সভাপতি নির্বাচিত হন। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহার স্বভাব ছিল অমায়িক; কর্ম্মেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইলেও, তিনি কোনও সুব্যবস্থিত দার্শনিক প্রস্থানের উদ্ভাবন করেন নাই। মধ্যে মধ্যে তিনি যে সকল প্রবন্ধ রচনা করিতেন, তাহা হইতে এবং তাঁহার পত্রাবলী হইতে তাঁহার দার্শনিক মত সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার রচিত উপন্যাসেও তাঁহার দার্শনিক মতের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জেকোবির "On the system of Spinoza in letters to Moses Mendelssohn" ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি স্পিনোজার প্রতি সকলের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথম পত্রে তিনি মেণ্ডেলসনকে লেখেন, যে তিনি জানিতে পারিয়াছেন, যে লেসিং স্পিনোজার মতাবলম্বী। উত্তরে মেণ্ডেলসন লেখেন, যে তিনি ইহা বিশ্বাস করেন না। তাহার পরে স্পিনোজার দর্শন-সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হয়, গ্রন্থে তাহা স্থান পাইয়াছে। জেকোবির মতে (১) স্পিনোজার দর্শন নিরীশ্বর এবং অদৃষ্টবাদী; (২) প্রত্যেক দার্শনিক প্রমাণ-প্রণালীই নাস্তিকতা ও অদৃষ্টবাদে পর্য্যবসিত হয়; (৩) নাস্তিকতা ও অদৃষ্টবাদ এড়াইতে হইলে প্রমাণের সীমা-নির্দ্ধারণ করিতে হয়, এবং (৪) বিশ্বাসকে যাবতীয় মানবীয় জ্ঞানের উপায় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

স্পিনোজা জগতের কারণকে পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে জগতের কারণের মধ্যে প্রজ্ঞাও নাই, ইচ্ছাও নাই, এবং তাঁহার কর্ম্মও উদ্দেশ্যমূলক নহে। এই জন্যই স্পিনোজার মতে যিনি জগৎকারণ, তিনি ঈশ্বর নহেন। স্পিনোজার মতে মানবীয় ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই; আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন বলিয়া যে ধারণা আমাদের আছে, তাহা ভ্রান্ত। সুতরাং স্পিনোজার দর্শনকে অদৃষ্টবাদী বলিতে হয়। কিন্তু এই নাস্তিকতা ও অদৃষ্টবাদ যাবতীয় দার্শনিক উপপত্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কোনও বস্তুকে বুঝিতে হইলে, তাহার অব্যবহিত কারণসকলের আবিষ্কার করিতে হয়। অন্য কিছুদ্বারা যাহার ব্যাখ্যা করিতে পারি, কেবল তাহাই আমরা বুঝিতে পারি। কোনও বিষয় বুঝিতে অথবা প্রমাণ করিতে হইলে প্রথমে তাহার অব্যবহিত কারণের, পরে সেই কারণ হইতে তাহার কারণের আবিষ্কার করিতে হয়; শেষোক্ত কারণ আবিষ্কৃত হইলে তাহার কারণেরও অন্বেষণ করিতে হয়। এইরূপে উর্দ্ধগামী কারণশ্রেণীর আবিষ্কার যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেখানে প্রমাণও বাধিত হয়। আমাদের বুদ্ধির সম্মুখেও বিঘ্ন উপস্থিত হয়। কিন্তু এই কারণ-শৃঙ্খলের শেষ নাই। সেই শৃঙ্খল বর্জ্জন না করিলে কোনও অসীমকে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। দর্শন যদি সীমাবদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে অসীমকে ধরিতে চায়, তাহা হইলে অসীমকে নিম্নে টানিয়া সসীমে পরিণত করিতে হইবে। প্রত্যেক দর্শনই বর্ত্তমানে এইরূপ সংকটের মধ্যে পতিত। কিন্তু যাহার কারণ নাই, তাহার কারণের অনুসন্ধানে ফল নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে আর ঈশ্বর বলা চলিত না। কেননা প্রমাণের যাহা ভিত্তি, তাহা প্রমাণ্য বিষয় হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত। প্রমাণ্য বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণের অধীন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের উর্দ্ধতন এবং পূর্ব্বতন কোনও পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইতে তাঁহাকে সম্মত করিতে হইবে। কোনও ঈশ্বর থাকিবে না, অপ্রাকৃত কিছুই থাকিবে না, অপার্থিব কিছু থাকিবে না—ইহাই বিজ্ঞানের স্বার্থ। প্রকৃতি ভিন্ন কিছু নাই, একমাত্র প্রকৃতিই স্বয়ম্ভু, ইহা ধরিয়া লইয়াই বিজ্ঞানের পক্ষে পূর্ণতালাভ অথবা পূর্ণতালাভের আশা করা সম্ভবপর হয়। দর্শনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া জেকোবি এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, যে স্পিনোজার দর্শনই একমাত্র দর্শন (অর্থাৎ যাবতীয় দর্শনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ)। তাহা ভিন্ন দর্শনই নাই। কিন্তু মানুষের সকল কার্য্য ও কার্য্যপ্রণালী প্রাকৃতিক যান্ত্রিক নিয়মের ফল, বুদ্ধির কোনও কিছু করণীয় নাই, তাহার একমাত্র কার্য্য সাক্ষীরূপে অবস্থান করা, ইহা

যিনি বিশ্বাস করিতে পারেন, তাহাকে বাধা দিবার প্রয়োজন নাই ; কেননা তাহাকে সাহায্য করা আমাদের সাধ্যাতীত। তিনি তাঁহার নিজের পথে চলুন ; তিনি যাহা অস্বীকার করেন, তাহা প্রমাণ করা অসম্ভব। তিনি যাহা বিশ্বাস করেন, তাহাও অপ্রমাণ করা যায় না। তাহা হইলে উপায় কি ? বুদ্ধিকে যদি মনের অন্যান্য বৃত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহা হইলে বুদ্ধি জড়বাদী ও যুক্তিহীন হইয়া পড়ে। তখন তাহা জীবাত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। প্রজ্ঞাকে যদি এই ভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহা হইলে প্রজ্ঞা অধ্যাত্মবাদী ও অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। প্রজ্ঞা তখন প্রকৃতিকে অস্বীকার করে, এবং আপনাকে ঈশ্বরের পদবীতে উন্নীত করে। এই অবস্থায় অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞানের জন্য উপায়ান্তরের অনুসন্ধান করিতে হয়। বিশ্বাসই সেই উপায়। কোনও বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে হইলে, দ্বিতীয় একটি নিঃসন্দিগ্ধ বিষয়ের প্রয়োজন, তাহার জন্য আবার অন্য একটি সন্দেহাতীত বিষয় আবশ্যক। অবশেষে এমন এক বিষয়ের প্রয়োজন হয়, যাহার সম্বন্ধে নিশ্চিতি-বোধ অব্যবহিত—অর্থাৎ অব্যবহিত ভাবে যাহাকে নিশ্চিত সত্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, এবং অন্য কোনও কারণ অথবা যুক্তির প্রয়োজন হয় না। যাহা বুদ্ধির যুক্তির উপর নির্ভর করে না, এতাদৃশ নিশ্চিতির অনুভূতিই "বিশ্বাস"। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত প্রত্যেকবিধ বস্তুই বিশ্বাসের সাহায্যে জানিতে পারা যায়। মানুষের সমস্ত জ্ঞানের মূলে আছে মনের সম্মুখে বস্তুর অব্যবহিত প্রকাশ, এবং বিশ্বাস।

উপরোক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে চারিদিক হইতে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল। জেকোবিকে যুক্তির শত্রু, অন্ধ বিশ্বাসের প্রচারক, দর্শন-বিজ্ঞানের অবজ্ঞাতা এবং পোপের শিষ্য, ধর্মান্ধ প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করা হইয়াছিল। এই সকল অপবাদ ক্ষালনের জন্য ১৭৮৭ সালে জেকোবি David Hume on faith, or Idealism and Realism নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থ কথোপকথনের আকারে লিখিত। ইহাতে জেকোবি "বিশ্বাস" অথবা "উপজ্ঞার" অব্যবহিত জ্ঞানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আপ্ত বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের সহিত জেকোবি তাঁহার নিজের "বিশ্বাসের" পার্থক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য লোকের কথার উপর যে বিশ্বাস স্থাপিত, যুক্তির উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহাই অন্ধ বিশ্বাস। জেকোবির বিশ্বাস এইরূপ নহে। অন্তরের দৃঢ় প্রতীতিই তাঁহার বিশ্বাসের ভিত্তি। তাহা খেয়ালী কল্পনাও নহে। কত প্রকারের বস্তুই তো কল্পনা করা যায় ; কিন্তু কোনও বস্তুকে সত্য বলিয়া ধারণা করিতে হইলে, প্রয়োজন হয় এক প্রকার নৈশ্চিত্যের অনুভূতির। সে অনুভূতির ব্যাখ্যা করা যায় না। এই অনুভূতিকেই বিশ্বাস বলা যায়। জ্ঞানের যে বিবিধ রূপ আছে, তাহাদের সহিত বিশ্বাসের সম্বন্ধ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে জেকোবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা দ্বিধা-গ্রস্ত। প্রথমে বিশ্বাসকে (ইহাকে তিনি বিশ্বাস-বৃত্তিও বলিয়াছেন), ইন্দ্রিয়ের মতই এক বৃত্তি বলিয়াছিলেন, ইন্দ্রিয়ের মতই বস্তুর জ্ঞানগ্রহণ-সমর্থ[1] বৃত্তি বলিয়া ইহাকে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার

[1] Receptive

পার্শে স্বতন্ত্র বৃত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে তিনি তখন অভিন্ন বলিয়াছিলেন। পরে ক্যাণ্টের মতের অনুকরণ করিয়া তিনি যখন বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে স্বতন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তখন পূর্ব্বে যাহাকে বিশ্বাস বলিয়াছিলেন, তাহাকেই প্রজ্ঞা বলিয়া বর্ণনা করেন। প্রজ্ঞার বিশ্বাস[1] অথবা প্রজ্ঞার উপজ্ঞাকে[2] তখন অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞানলাভের করণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, যে বুদ্ধির কার্য্য ইন্দ্রিয়জগতে, বিশ্বাসের কার্য্য ইন্দ্রিয়াতীত জগতে, এবং বিশ্বাস বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। ইন্দ্রিয়ের প্রতিভাসের মধ্যে এবং তাহার বাহিরেও যাহা সত্য, তাহার জ্ঞানের জন্য আমাদের মনের একটা উচ্চতর বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কি প্রকারে যে এই বৃত্তির দ্বারা এই জ্ঞান লাভ হয়, তাহা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা জানিতে পারা যায় না। বুদ্ধির দ্বারা বস্তুর ব্যাখ্যা করা যায়। "প্রজ্ঞার বিশ্বাসে" বস্তু প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অন্য কিছুর অপেক্ষা সে জ্ঞানের নাই। যুক্তি ও তর্কের স্থানও তাহার মধ্যে নাই। ইন্দ্রিয়দ্বারা যেমন অব্যবহিত জ্ঞান হয়, তেমনি প্রজ্ঞারও অব্যবহিত জ্ঞান আছে।[3] জেকোবি বলিয়াছেন ভাষাতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শব্দের অস্তিত্ব না থাকার জন্যই তিনি বিশ্বাসের ব্যাখ্যা করিতে "Perception" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কেহ যদি বলে, কোন বিষয়ের জ্ঞান তাহার আছে, এবং তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এই জ্ঞান কোথা হইতে আসিল, তাহা হইলে তাহাকে বলিতে হইবে, যে ইন্দ্রিয় হইতে তাহার এই জ্ঞান হইয়াছে, অথবা তাহার মনের অনুভূতি হইতে এই জ্ঞান উদ্ভূত হইয়াছে। পশু হইতে মানুষ যতটা শ্রেষ্ঠ, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান হইতে শেষোক্ত জ্ঞান ততটা উৎকৃষ্টতর। জেকোবি বলিয়াছেন, "দ্বিধা না করিয়া আমি স্বীকার করিতেছি, যে আমার দর্শন বিষয়গত অনুভূতির[4] উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ আর কিছু নাই। মানুষের যত বৃত্তি আছে, তাহাদের মধ্যে অনুভূতি উচ্চতম। এই বৃত্তি আছে বলিয়াই পশুর সহিত মানুষের পার্থক্য। প্রজ্ঞা ও এই অনুভূতি অভিন্ন। কেবল মাত্র অনুভূতি-বৃত্তি হইতে প্রজ্ঞার উদ্ভব হয়। আরিষ্টটলের সময় হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এবং বুদ্ধিজাত জ্ঞা কে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অব্যবহিত, বুদ্ধি-জাত জ্ঞান, বিচারপূর্ব্বক জ্ঞান, ব্যবহিত জ্ঞান। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানই যাবতীয় জ্ঞানের ভিত্তি। ইহা সত্ত্বেও বুদ্ধির যুক্তিতর্ককে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর স্থান দেওয়া হয়। আধার-বিচ্যুত গুণ[5] শব্দের সাহায্য ভিন্ন বুদ্ধি চিন্তা করিতে পারে না। প্রত্যক্ষ অব্যবহিত জ্ঞানকে তাহার নিকট হীনতা স্বীকার করিতে হয়। কেবল বুদ্ধিজাত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শনের পরিণাম জ্ঞানের বিনাশ।

Devid Hume on Faith গ্রন্থে এবং The Attempt of Criticism to

---

[1] Belief of Reason [2] Intuition of Reason
[3] Perception of Reason [4] Objective feeling [5] Abstraction

bring Reason to Understanding (1801) গ্রন্থে জেকোবি ক্যাণ্টের দর্শনের সঙ্গে স্বীয় মতের পার্থক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১) ক্যাণ্টের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানসম্বন্ধীয় মতের সহিত জেকোবির মতের মিল নাই। ক্যাণ্ট বলিয়াছিলেন, আমাদের জ্ঞান প্রতিভাসে সীমাবদ্ধ; প্রতিভাসের তলদেশে বর্ত্তমান স্বগত বস্তুর জ্ঞান—বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান—আমাদের নাই। জেকোবি ইহা স্বীকার করেন নাই। প্রতিভাসের মধ্যে যে বস্তুর স্বরূপের কিছুই নাই, ইহা অসম্ভব। স্বগত বস্তুর জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার ফলে ক্যাণ্টের দর্শন অধ্যাত্মবাদে পরিণত হইয়াছে। অধ্যাত্মবাদ এবং শূন্যবাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। দেশ ও কালের প্রত্যক্ষপূর্ব্বত্ব জেকোবি স্বীকার করেন নাই। ক্যাণ্ট প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে বিষয় ও তাহাদের মধ্যগত সম্বন্ধ আমাদের মানসিক অবস্থাবিশেষ, এবং মনের বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। যদিও বাহ্য বস্তুকে ক্যাণ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি এই বাহ্য বস্তুর কোনও জ্ঞান আমাদের নাই, বলিয়াছেন। ক্যাণ্টের মতে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও চিন্তা যে সকল নিয়মের অধীন, মনোবাহ্যবিষয়ে তাহারা প্রযোজ্য নহে, এবং আমাদের জ্ঞানের মধ্যেও মনের বাহিরে অবস্থিত কোনও বস্তুর জ্ঞান নাই। কিন্তু প্রতিভাস তাহার অন্তরালে অবস্থিত স্বগত বস্তুর কোনও জ্ঞান বহন করে না, ইহা না বলিয়া স্বগত বস্তুর অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিয়া তাঁহার মতকে তাহার যুক্তি-সম্মত পরিণতিতে বহন করাই ক্যাণ্টের উচিত ছিল। (২) ক্যাণ্ট বুদ্ধির যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত জেকোবির মতভেদ নাই। ক্যাণ্টের মতো জেকোবি বলিয়াছেন, যে অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞানলাভ বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং কেবল "বিশ্বাস"-দ্বারাই প্রজ্ঞার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যয়-সমূহের[1] জ্ঞানলাভ সম্ভবপর। নিম্নতম সম্প্রত্যয় হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি ক্রমশঃ উচ্চতর সম্প্রত্যয় গঠন করিতে করিতে উচ্চতম প্রত্যয়ে উপনীত হইয়া মনে করে, যে ইন্দ্রিয়ের জগৎ উত্তীর্ণ হইয়া অতীন্দ্রিয় জগতে এবং প্রত্যক্ষজ্ঞান-নিরপেক্ষ অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানে[2] উপস্থিত হইয়াছে। ক্যাণ্ট এই ভ্রান্তি এবং আত্মপ্রতারণার মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব। ইহাই তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। ক্যাণ্ট ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে ঈশ্বর, জীবাত্মা ও স্বাধীনতার প্রত্যয়ের বহিষ্কারের ফলে তাহাদের পরিত্যক্ত স্থান গভীর গহ্বরে পরিণত হইয়া যাবতীয় সত্যের জ্ঞান অসম্ভব করিয়া ফেলিতে পারে। সেই জন্যই তিনি কর্ম্মাভিমুখী প্রজ্ঞাদ্বারা তাহাদিগের পুনরাবিষ্কার করিয়া স্বস্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। (৩) কিন্তু প্রজ্ঞার ক্ষেত্র প্রাতিভাসিক জগতে সীমাবদ্ধ করিয়া ক্যাণ্ট ভুল করিয়াছেন। প্রজ্ঞার প্রত্যয়দিগকে যে প্রজ্ঞা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে সক্ষম হয় না, তাহার কারণ ক্যাণ্টের মতে মানবীয় প্রজ্ঞার অসম্পূর্ণতা, কিন্তু প্রকৃত কারণ ঐ সকল প্রত্যয়ের স্বরূপের মধ্যেই নিহিত আছে। তাহারা প্রমাণের অতীত। প্রমাণের যাহা অতীত, বুদ্ধি যতই শক্তিমতী হউক, কখনই তাহা প্রমাণ করিতে পারিবে না। সেই জন্যই ক্যাণ্টকে এই সকল প্রত্যয়ের বৈজ্ঞানিক প্রমাণের

[1] Ideas of Reason [2] Science of the Supersensuous

জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। প্রমাণের জন্য যে বক্র পথ তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের নিকট অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হয়। সে রূপ প্রমাণের কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

ক্যাণ্টের পরবর্ত্তী দর্শনের সর্বেশ্বরবাদ-প্রবণতা জেকোবির মনঃপূত ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন "ঈশ্বর, স্বাধীন ইচ্ছা, অমরতা ও ধর্ম্ম, এই শব্দগুলি চিরকাল যে অর্থ বহন করিয়া আসিতেছে, অকপট দার্শনিক ক্যাণ্টের নিকটও তাহাদের সেই অর্থই ছিল। ক্যাণ্ট তাহাদের সম্বন্ধে কোন চতুরতা অবলম্বন করেন নাই। দার্শনিক প্রমাণদ্বারা এই সকল প্রত্যয়ের সত্যতা প্রমাণ করা যায় না, তিনি এই কথা বলায় অনেকে বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কর্ম্মাভিমুখী প্রজ্ঞার এই সকল প্রত্যয় স্বতঃ-সিদ্ধ বলিয়া, তিনি যুক্তির প্রমাণের ক্ষমতা-অস্বীকারের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।....কিন্তু এখন সমালোচক দর্শনের স্বকীয় কন্যা (ফিক্‌টের দর্শন) বিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থাকেই ঈশ্বর নামে অভিহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্পষ্টতঃ এই ঈশ্বরের কোনও সংবিদ নাই, ব্যক্তিত্বও নাই। এই সমস্ত দুঃসাহসিক কথা প্রকাশ্যে এবং দ্বিধাহীন ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার ফলে কিছু শঙ্কার উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। ইহার পরে সমালোচক দর্শনের দ্বিতীয়া কন্যা (শেলিংএর দর্শন) যখন প্রাকৃতিক দর্শন ও কর্ম্মনৈতিক দর্শনের ভেদ—স্বাধীনতা ও নিয়তির মধ্যে ভেদ—অস্বীকার করিলেন, সমালোচক দর্শনের প্রথমা কন্যা যে ভেদকে পবিত্র মনে করিয়া তাহার উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই, দ্বিতীয়া কন্যা যখন তাহাই অস্বীকার করিলেন, কোনও প্রকারের মুখবন্ধ না করিয়াই প্রকৃতিকেই সমগ্র সত্তা এবং প্রকৃতির বাহিরে কিছু নাই বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন কোনও বিস্ময়েরই সৃষ্টি হয় নাই। এই দ্বিতীয়া কন্যা বিপর্য্যস্ত[1] অথবা আশীষপ্রাপ্ত[2] (অনুমোদিত) স্পিনোজার দর্শন—আদর্শ জড়বাদ।" শেলিং তাঁহার On Divine things গ্রন্থে এই সমালোচনার উত্তর দিয়াছিলেন।

জেকোবির দর্শনের প্রতিপাদ্য তিনটি :—(১) বাহ্য বস্তুর জ্ঞান-লাভের জন্য যেমন ইন্দ্রিয় আছে, অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান-লাভের জন্য তেমনি স্বতন্ত্র এক করণ আছে। তাহার নাম "বিশ্বাস।" এই করণকে জেকোবি প্রজ্ঞা অথবা প্রজ্ঞার বিশ্বাস নামেও অভিহিত করিয়াছেন। অতীন্দ্রিয় পদার্থের অব্যবহিত জ্ঞান এই করণদ্বারাই লাভ করা যায়। এই বিশ্বাস অথবা "প্রজ্ঞা" বুদ্ধি হইতে ভিন্ন। ইহা কোন প্রত্যয় উৎপাদন করে না। এই দ্বারপথে সত্য অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহার স্বকীয় কর্ত্তৃত্ব নাই। বাহ্যেন্দ্রিয়-দ্বারা যেমন বাহ্য জগতের জ্ঞান অন্তরে প্রবেশ করে, তেমনি এই ইন্দ্রিয়দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান অন্তরে প্রবেশ করে।

(২) বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায় না; তাহাদ্বারা লব্ধ জ্ঞানের ব্যাখ্যা করা যায়। জ্ঞানলাভ করা যায় ইন্দ্রিয়দ্বারা এবং বিশ্বাসদ্বারা।

---

[1] Inverted [2] Beatified

(৩) ইন্দ্রিয়দ্বারা যে বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা যায় না, ক্যাণ্টের এই কথা ঠিক নহে। বস্তু স্বরূপতঃ যাহা, ইন্দ্রিয়গণ তাহার জ্ঞানই বহন করিয়া আনে।

(৪) ঈশ্বর, জীবাত্মা অমরতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতার জ্ঞান বুদ্ধি হইতে পাওয়া যায় না—ক্যাণ্টের এই কথা সত্য। ইহাদের জ্ঞান অব্যবহিত ভাবে বিশ্বাসে প্রকাশিত হয়।

সমালোচনা

প্রত্যেক জ্ঞানের মধ্যে যে কিছু সত্য আছে, মনের ধারণার অনুরূপ বাহ্য কিছুর অস্তিত্ব আছে, এই কথা জেকোবি নানাভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হন নাই। অনুভূতিকে তিনি বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের পুনর্মিলনসাধন করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "অন্তরে আমার আলোক জ্বলিতেছে, যখনই সেই আলোক বুদ্ধিতে আনিবার চেষ্টা করি, তখনি তাহা নিবিয়া যায়। এই দুইটির মধ্যে কোনটি সত্য? বুদ্ধি নির্দ্দিষ্ট স্পষ্টরূপে জ্ঞানকে প্রকাশিত করে, কিন্তু সেই সকল রূপের পশ্চাতে অতলস্পর্শ গহ্বর। অন্তঃকরণ ঊর্দ্ধমুখী আলোকে উদ্ভাসিত, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও তাহার মধ্যে বর্ত্তমান। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্পষ্ট জ্ঞান দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত। এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি সত্য? বুদ্ধি ও অন্তঃকরণ উভয়ে মিলিত হইয়া যদি এক আলোকে পরিণত না হয়, তাহা হইলে মানুষের পক্ষে সত্যলাভের কোনও উপায় আছে কি? অপ্রাকৃত ঘটনা সংঘটিত না হইলে, এরূপ মিলনের সম্ভাবনা আছে কি?" বুদ্ধি ও হৃদয়ের মিলন-সাধনের জন্য জেকোবি ব্যবহিত জ্ঞানের স্থলে অব্যবহিত উপলব্ধি কে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়া কেবল আপনাকেই প্রতারিত করিয়াছিলেন। কেননা যে অব্যবহিত জ্ঞানকে তিনি অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের করণ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, তাহাও ব্যবহিত জ্ঞান। সে জ্ঞান উদ্ভূত হইবার পূর্ব্বে মনের মধ্যে বিবিধ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। সেই সকল অবস্থার পরিণতিই ঐ তথাকথিত অব্যবহিত জ্ঞান। স্বকীয় সংবিদদ্বারা জেকোবি মানব-জাতির বুদ্ধির পরিমাপ করিতে চাহিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার প্রকাণ্ড ভ্রম হইয়াছিল। যে বিশ্বাস, যে দৃঢ় প্রতীতি, তিনি আপনার মনের মধ্যে অনুভব করিতেন, সকল মানুষের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্বাস অন্যের দ্বারা মনের মধ্যে সংক্রামিত হয়। সুতরাং অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞানের জন্য প্রত্যেকের মনে সহজাত কোনও করণের অস্তিত্ব আছে, বলা যায় না। ঈশ্বর, অমরতা ও স্বাধীনতা-সম্বন্ধে জেকোবি কোনও যুক্তির অবতারণা না করিয়া তাহাদিগকে উপলব্ধিমূলক জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্তরের মধ্যে তাহাদের অস্তিত্বের অনুভূতিই তাহাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে তাঁহার এক মাত্র যুক্তি। হেগেল বলিয়াছেন, "ইহা তো দর্শন নহে। ইহাকে দর্শনের হতাশা বলা যায়।"

(৪)

সিলার

সিলার ও হাম্‌বোলড্‌ ক্যাণ্টের কর্ম্ম-নৈতিক দর্শনের আলোচনা করিয়াছিলেন। অনুভূতির দর্শনের মতাবলম্বী না হইলেও সাহিত্যে হার্ডার ও হ্যামানের সহিত তাঁহাদের বহুল সাদৃশ্য ছিল।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্যাণ্ট সংবেদন ও চিন্তাকে বিভিন্ন উৎস হইতে উদ্‌ভূত বলিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগের মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। কর্ম্মের ক্ষেত্রেও তিনি নৈতিক নিয়ম এবং ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে, কর্ত্তব্য ও কামনার মধ্যে, সামঞ্জস্য-স্থাপনে সক্ষম হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, মানুষের মনে কামনার অস্তিত্ব-বশতঃ কর্ত্তব্যের প্রতি অনুরাগ মানুষের নিকট হইতে আশা করা যায় না। কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ইহার প্রতিবাদে সিলার যে ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। মানুষের জীবনে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরও যে একটা প্রাপ্য স্থান আছে, সিলার তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রবৃত্তি ও কর্ত্তব্যের মধ্যে যে বিরোধের সমন্বয়সাধনে ক্যাণ্ট সক্ষম হন নাই, সিলার তাহার সমাধানের এবং ক্যাণ্টের নৈতিক মতের কঠোরতার লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন বিরক্তির সহিত কর্ত্তব্য পালিত হয়, তখনই আমরা যথাযথ ভাবে কর্ত্তব্যপালন করি, সিলার বলেন, ইহা সত্য নহে। কর্ত্তব্যের দিকে মানুষের মনের যে প্রবণতা, তাহাই সৎগুণ[1]। প্রজ্ঞার বাণী আনন্দের সহিতই পালনীয়। প্রজ্ঞাকে ইন্দ্রিয়বোধ-বৃত্তি হইতে স্বতন্ত্র করা উচিত নহে। উভয়েই আমাদের স্বভাবের মধ্যে একত্রিত হইয়া আছে। ভোগ ও যুক্তি উভয় লইয়াই মানুষ। ইহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদের প্রকৃতির যে অংশের সহিত ভোগের সম্বন্ধ, তাহার দমন না করিয়া, সমগ্র জীবনের সহিত তাহার সামঞ্জস্যবিধান কর্ত্তব্য।

সিলার দ্বিবিধ নৈতিক চরিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন—একটি কঠোর, অন্যটি মধুর। প্রথম চরিত্রে ভোগবাসনা নির্জিত। তাহার মাথা তুলিবার সামর্থ্য নাই। দ্বিতীয়টিতে ভোগবাসনা সংযত, কিন্তু নির্য্যাতিত নহে। প্রথমটিতে মহতী ইচ্ছাশক্তির অভিব্যক্তি, দ্বিতীয়টিতে অভিব্যক্ত সুষমা; উভয়ক্ষেত্রেই ঐন্দ্রিয়িক প্রকৃতি আত্মাকর্ত্তৃক শাসিত। প্রথমটির নাম মর্য্যাদা[2], দ্বিতীয়টির নাম মাধুর্য্য[3]। মর্য্যাদা গৌরবব্যঞ্জক, মাধুর্য্য চিত্তাকর্ষক। মর্য্যাদায় আত্মা বিজেতার মত ঐন্দ্রিয়িক প্রকৃতিকে শাসন করে; মাধুর্য্যে আত্মা শাসন করে বিনা বলপ্রয়োগে। মর্য্যাদা ও মাধুর্য্যের মিলনে এক প্রকার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়। জীবনের আদর্শ যদি কেবল মর্য্যাদা হইত, তাহা হইলে তাহা হইত বিশাল ও মহিমামণ্ডিত, কিন্তু কঠোর ও নীরস। প্রজ্ঞার সহিত ইন্দ্রিয়ের যে মিলন, তাহাই মাধুর্য্য। তাহাতে কর্ত্তব্য

---

[1] Virtue [2] Dignity [3] Grace

সানন্দে পালিত হয়। নৈতিক মাধুর্য্য স্বতঃ প্রবৃত্ত সদ্গুণ, তাহা কর্ত্তব্যের প্রতি অনুরাগের ফল। কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে কর্ত্তব্য-পালন সুন্দর ও মহৎ বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যের প্রতি প্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ত্তব্যপালন সুন্দরতর ও মহত্তর। কর্ত্তব্যের জন্য কর্ত্তব্যপালন-দ্বারা নৈতিক নিয়ম পালিত হয়, কিন্তু কর্ত্তব্য-প্রীতিবশতঃ কর্ত্তব্যপালনদ্বারা আমাদের স্বভাবের পূর্ণতা সাধিত হয়। কর্ত্তব্য বলিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ত্তব্যপালন না করিয়া যখন আমরা পারি না, যখন কর্ত্তব্যপালন আমাদের স্বভাবে পরিণত হওয়ার ফলে, অন্য কিছু করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, তখন তাহা সুন্দর। যখন প্রবৃত্তি মৌন থাকে, এবং তাহাকে দমন করিবার প্রয়োজন হয় না, এবং নিরতিশয় কষ্টকর কর্ত্তব্যও সংস্কার-জাত কর্ম্মের ন্যায় অনায়াসে অবলীলাক্রমে অনুষ্ঠিত হয়, তখনই চরিত্রের সর্ব্বোত্তম অবস্থা—সুন্দর আত্মার অবস্থা—অধিগত হয়। প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠাই সংস্কৃতির কার্য্য। এই সামঞ্জস্য হইতেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্ভব হয়। কর্ত্তব্য ও প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া মানুষের সমগ্র প্রকৃতির পরিবর্ত্তন-সাধনই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এইরূপে সিলার সুনীতি ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন।

(৫)

হামবোলড্ (১৭৬৭-১৮৩৫)

হাম্বোল্ডের মত অনেকটা সিলারের মতের অনুরূপ। তিনিও ক্যাণ্টের নৈতিক মতের কঠোরতা হ্রাস করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মানুষের যাবতীয় বৃত্তি এবং প্রবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া তাহার চরিত্রের পূর্ণতাসাধন করাই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁহার কল্পিত আদর্শকে তিনি Aesthetic Humanity (সৌন্দর্য্যের আদর্শানুরূপ মানবতা) নাম দিয়াছেন। মানুষের যাবতীয় প্রবৃত্তি ও তাহার সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জস্য-পূর্ণ বিকাশই তাঁহার আদর্শ। জগৎকে তিনি প্রকৃতি ও মানবাত্মার সামঞ্জস্য-যুক্ত মিলন বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে মানুষের মধ্যে সুপ্ত কতকগুলি শক্তির বিকাশই ইতিহাস। নিয়তি ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, উভয়ের মিলনদ্বারা এই বিকাশ সাধিত হয়।

হাম্বোল্ড আরও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে যাবতীয় ভাষা একই উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; কতকগুলি মৌলিক প্রকাশভঙ্গী তাহাদের সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান, এবং সমস্ত ভাষাই মানবের একই প্রয়োজন সিদ্ধ করে।

রাষ্ট্রসম্বন্ধে হাম্বোল্ডের মত তাঁহার আদর্শ মানবের ধারণার অনুরূপ। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল লোকের শক্তির ও বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ব্যক্তির পূর্ণতা-লাভে বিঘ্ন উৎপাদন না করিয়া, সহায়তা করাই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য।

হাম্বোল্ডের উপর গেটে ও সিলারের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসের প্রভাবও তাঁহার উপর ছিল।

দশম অধ্যায়

অধ্যাত্মবাদের বিকাশ—বিষয়িনিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদ

ফিক্‌টে

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ক্যাণ্টের পরে তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার দর্শনের ত্রুটীগুলি সংশোধন করিয়া তাহার পুনর্গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রেইন্‌হোল্‌ড, বেক্‌, ক্রুগ, ফ্রিজ ও মাইমন।

ক্যাণ্ট প্রভিভাস ও স্বগত বস্তুর দ্বৈতের সমাধান করেন নাই। জ্ঞানের ব্যাখ্যার জন্য স্ব-গত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার অনেকের নিকট অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। রেইন্‌হোল্‌ড ক্যাণ্টের দর্শন হইতে এই অজ্ঞেয় স্বগত বস্তুকে বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফলে বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে ভেদ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। মাইমন্‌ এই স্বগত বস্তুকে মনের "স্বল্প প্রতীতিতে"[1] পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সংবিদের মধ্যে ইহাকে পাওয়া যায়, কিন্তু অসম্পূর্ণ ভাবে। বিষয়ী ও বিষয়ের দ্বৈত দূর করিতে হইলে সংবিদ এবং তাহার বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধের ধারণার পরিবর্তনের প্রয়োজন বলিয়া তখন অনেকের মনে হইয়াছিল। এই নূতন ধারণা দিয়াছিলেন ফিক্‌টে। তিনি এক নূতন দার্শনিক প্রস্থানের উদ্‌ভাবন করিয়াছিলেন। তাহাতে বাহ্য জগতের জ্ঞান যে সম্পূর্ণ রূপেই 'অহং' হইতে উদ্‌ভূত, ইহাই তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বহির্জগতে স্বগত বস্তুর অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন।

ফিক্‌টের দর্শন সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—তাঁহার প্রথম দর্শন ও পরবর্ত্তী দর্শন। উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে বলিয়া ফিক্‌টে স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী দর্শনে ঈশ্বর একটা প্রধান স্থান জুড়িয়া আছেন। তাঁহার প্রথম দর্শনে, ঈশ্বর "জগতের নৈতিক ব্যবস্থা" মাত্র।

জোহন গট্‌লিব ফিক্‌টে ১৭৬২ সালে জার্ম্মাণীর অন্তর্গত সাইলেশিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা দরিদ্র ছিলেন। সম্ভ্রান্তবংশীয় এক ভদ্রলোক তাঁহার বাল্যশিক্ষার ব্যয়-ভার বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে স্বকীয় পরিশ্রম-দ্বারা শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। জেনা এবং লাইব্‌জিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। কিন্তু যাজককার্য্যের জন্য সনদ প্রাপ্ত হইয়াও তিনি কোনও যাজকের পদ-লাভে সক্ষম হন নাই। অর্থাভাবে অবশেষে এক গৃহশিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া তিনি জুরিচে গমন করেন। এইস্থানে তাঁহার ভাবী পত্নীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালেই ফিক্‌টে স্পিনোজার দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭৯০

[1] Petit Perceptions of Leibnitz

সালে যখন তিনি লাইবজিগে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ক্যাণ্টের দর্শনের সহিত পরিচিত হন। ১৭৯১ সালে ক্যাণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে ফিক্‌টে কনিগ্‌স্‌বার্গে গমন করেন। ইহার পূর্ব্বে চারি সপ্তাহ কালের মধ্যে তিনি তাঁহার Critique of all Revelation নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ ক্যাণ্টকে উপহার দিয়া তিনি তাঁহার সহিত পরিচয়স্থাপন করেন। গ্রন্থে ফিক্‌টে ব্যবহারিক প্রজ্ঞার অস্তিত্ব হইতে প্রত্যাদেশের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্যবহারিক প্রজ্ঞার আদেশ মানুষের ইচ্ছার উপর যখন কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে অক্ষম হয়, মানুষের নৈতিক চরিত্র যখন অবনতির শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়, (অর্থাৎ যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়), তখন বিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থার ধারক ঈশ্বরের পক্ষে মানুষের নৈতিক চরিত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন করা অযৌক্তিক হয় না। তখন তিনি সাধারণ লোকের বুদ্ধিগ্রাহ্য উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগের নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, ইহা আশা করা অসঙ্গত নহে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার মানবরূপ-ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আবির্ভাবও অসম্ভব নহে। ঈশ্বর যদি নররূপে জগতে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষার বিষয় কি হইতে পারে, ফিক্‌টে তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। কেবলমাত্র তিনটি বিষয়ের জ্ঞানই আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে আশা করিতে পারি :—(১) তাঁহার নিজের সম্বন্ধে, (২) জীবাত্মার অমরতা-সম্বন্ধে, এবং (৩) ইচ্ছার স্বাধীনতা-সম্বন্ধে। ইহার অধিক কিছুই আশা করা যায়না। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বলিয়া সকলেই ইহা ক্যাণ্টের লিখিত মনে করিয়াছিল। এই সময়ে ফিক্‌টে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের অনতিকাল পরে উপরি উক্ত গ্রন্থ যখন ফিক্‌টের রচিত বলিয়া সকলে জানিতে পারিল, তখন ফিক্‌টে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। এই সময়ে ফিক্‌টের Contributions in correction of the Judgments of the Public on the French Revolution প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ছিল না।

১৭৯৪ সালে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্য্যে ফিক্‌টে যোগদান করেন। এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে তাঁহার (১) Wissenschaftslehre (জ্ঞানের বিজ্ঞান—১৭৯৪), (২) Naturrecht (১৭৯৬) এবং (৩) Sittenlehre (১৭৯৮) প্রকাশিত হয়। এই সময়ে গেটে, শিলার, শ্লেগেল, হাম্‌বোল্ড্‌ এবং হুফেল্যাণ্ডের সহিত ফিক্‌টের বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়। এই বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় নাই। ১৭৯৮ সালে ফিক্‌টের সম্পাদিত এক দার্শনিক পত্রিকায় এক লেখকের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকার লিখিয়াছিলেন, ঈশ্বর আছেন কিনা, তাহা অনিশ্চিত। বহুদেববাদিগণ যে সকল দেবতার উপাসনা করেন, তাহাদের নৈতিক চরিত্র যদি মন্দ না হয়, তাহা হইলে, একেশ্বরবাদদ্বারা লোকের ধর্ম্ম-পিপাসা যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়, বহুদেববাদ-দ্বারাও তাহা হইতে পারে। বরং কলার দিক হইতে দেখিলে বহুদেববাদই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। দুইটি মাত্র বিশ্বাস ধর্ম্মে প্রয়োজনীয়, এবং তাহাদের মধ্যেই ধর্ম্মের গণ্ডী সীমাবদ্ধ করা উচিত।

প্রথমতঃ (১) পুণ্যের অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস, অর্থাৎ পৃথিবীতে চিরকালই পুণ্য ছিল, চিরকালই থাকিবে, পুণ্যের বিনাশ নাই, এই বিশ্বাস। (২) দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যে বিশ্বাস, অর্থাৎ যত দিন পৃথিবীতে ধর্ম্মের (পুণ্যের) প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া স্পষ্ট প্রমাণিত না হয় অন্ততঃ ততদিন তাহার জন্য চেষ্টার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস। ধর্ম্মের প্রাচীন ব্যাখ্যা বর্জ্জন করিয়া উপরি উক্ত অর্থ গ্রহণ করা ভাল, অথবা এই নূতন অর্থ প্রাচীন অর্থের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া ভাল, তাহা লেখক পাঠকদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলেন। প্রাচীন ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিলে, নূতন ব্যাখ্যার প্রচলন অসম্ভব হইতে পারে সত্য, কিন্তু প্রাচীন ব্যাখ্যার সহিত ইহা যোগ করিয়া দিলে নূতন ব্যাখ্যা চাপা পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এই প্রবন্ধ যে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরোধী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। (লেখক ইহার পরে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "আমি কোনও অবস্থাতেই বিশ্বাসের প্রয়োজন অনুভব করি নাই, এবং শেষ পর্য্যন্ত আমি অবিশ্বাসীই থাকিতে পারিব বলিয়া আশা করি।") ফিক্‌টে প্রথমে এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া পরে স্বীকৃত হন। ইহার সহিত "জগতের ঐশ্বরিক শাসনে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি" নামক এক উপক্রমিকা সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহাতে ফিক্‌টে নিজের মতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে জগতের নৈতিক ব্যবস্থাকেই তিনি ঈশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, যে এই নৈতিক ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোনও রূপ ঈশ্বরের আমাদের প্রয়োজন নাই; এবং এই নৈতিক ব্যবস্থার বাহিরে তাহার কারণস্বরূপ কোনও পুরুষের অস্তিত্ব অনুমান করিবার কোনও ভিত্তি যুক্তিতে পাওয়া যায় না। "জগতে যে নৈতিক ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তাহার পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে; প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকৃত কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়। তাহা ভিন্ন অন্য যাহা তাহার জীবনে সংঘটিত হয়, তাহ এই নৈতিক ব্যবস্থারই ফল। এই নৈতিক ব্যবস্থার নিয়মানুসারে ব্যতীত কাহারও মস্তক হইতে একটি কেশও স্খলিত হয় না, একটি চাতক পক্ষীরও মৃত্যু হয় না। প্রত্যেক কল্যাণ কর্ম্ম (যদি সত্যই কল্যাণকর্ম্ম হয়) সফল হয়, প্রত্যেক মন্দ কর্ম্ম বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। যাহারা অন্তরের সহিত মঙ্গলকে ভালবাসে, জাগতিক ব্যবস্থায় পরিণামে তাহাদের পরম মঙ্গল হওয়া সুনিশ্চিত। অপরন্তু যদি কেহ ভালভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, যে কোনও এক ব্যক্তিরূপে ঈশ্বরের ধারণা করা অসম্ভব ও স্ববিরোধী। পুণ্য কর্ম্ম করাই প্রকৃত ধর্ম্ম; এই সত্য ধর্ম্ম যাহাতে লোকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করে, তাহার জন্য স্পষ্টভাবে এই কথা বলার প্রয়োজন।" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে ভীষণ প্রতিবাদ উত্থিত হইল, এবং নাস্তিকতা প্রচার করিতেছেন বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ফিক্‌টের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইল। স্যাক্সনি রাজ্যে ফিক্‌টের পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হইল। এই আদেশের প্রতিবাদে ফিক্‌টে "Appeal to the public: a work which petitions to be read before it is confiscated" লিখিয়া প্রকাশিত করিলেন। স্বকীয় রাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষের জন্য তিনি লিখিলেন "Formal Defence of the Editors of the Philosophical Journal

against the accusation of atheism (নাস্তিকতা অপবাদের খণ্ডন)। তারপর প্রবল মনোভাবের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষগণ হঠাৎ কোনও ব্যবস্থাগ্রহণে অনিচ্ছুক হওয়ায়, তাহাদের মীমাংসা প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ফিক্‌টে গুপ্ত সূত্রে জানিতে পারিলেন, যে গভর্ণমেণ্ট বেশী কিছু না করিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। ইহা তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায়, তিনি এক অসমীচীন কাজ করিয়া বসিলেন। গভর্ণমেণ্টের এক মন্ত্রীকে তিনি লিখিলেন, যে যদি তাঁহাকে তিরস্কার করা হয়, তাহা হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন, এবং তাঁহার সঙ্গে আরও অনেক অধ্যাপক পদত্যাগ করিবেন। গেটে তখন একজন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার সহিত ফিক্‌টের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই পত্র দেখিয়া তিনি বলিলেন, ভয়-প্রদর্শনে বিচলিত হওয়া গভর্ণমেণ্টের অনুচিত। ফলে ফিক্‌টের পত্র তাঁহার পদত্যাগ-পত্র বলিয়া গৃহীত হইল। (১৭৯৯)। ইহার পরে ফিক্‌টে বার্লিনে গমন করেন। পরে প্রাসিয়া ফরাসীদিগের কর্তৃক বিজিত হইবার পরে বার্লিনে যখন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি তথায় একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি নেপোলিয়নের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। জার্ম্মানদিগের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ জাগরিত করিবার জন্য ১৮০৭-৮ সালে তিনি Addresses to the German Nation প্রকাশিত করেন। দৃশ্যতঃ শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-বিধানই এই সকল প্রবন্ধের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জার্ম্মান জাতিকে সংঘবদ্ধ করা। গেটে, হেগেল এবং সোপেনহর নেপোলিয়নকে সমর্থন করিয়াছিলেন। ফিক্‌টে মনেপ্রাণে বিরুদ্ধ দলে যোগদান করিলেন। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে তিনি যাজকরূপে সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাপ্ত হন নাই। ১৮১৩ সালে আহত সৈন্যদের সেবা করিতে গিয়া তাঁহার স্ত্রী এক সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হন। পত্নীর শুশ্রূষাকালে ফিক্‌টেও ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হন। পত্নী আরোগ্যলাভ করেন, কিন্তু ১৮১৪ সালে ২৮শে জানুয়ারী তারিখে ফিক্‌টের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে Blucher রাইন নদী অতিক্রম করিয়াছেন, এ সংবাদ তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।

ফিক্‌টের সম্বন্ধে টমাস কার্লাইল লিখিয়াছেন, "ফিক্‌টের চরিত্র অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধাকর্ষক চরিত্র খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দার্শনিক মত সত্য হইতে পারে, ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু যাহারা তাঁহার চিন্তার প্রকৃতির সহিত ভাল পরিচিত নহে, কেবল তাহাদের পক্ষেই তাহা অবজ্ঞা করা সম্ভবপর। জীবনে ও মৃত্যুতে স্বীয় কর্ম্ম ও কষ্টভোগদ্বারা তিনি তাঁহার মহত্ব প্রমাণিত করিয়াছিলেন ; আমাদের যুগ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর যুগেই কেবল তাঁহার মত লোক সুলভ ছিল।"

ফিক্‌টের প্রথম দর্শন—জ্ঞানের বিজ্ঞান

(Science of Knowledge)

ক্যাণ্ট দর্শনে প্রত্যক্ষের অতীত বিষয়ের গবেষণার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ফিক্‌টের মতে ইহাই তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ পদার্থের জ্ঞান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

প্রাকৃতিক পদার্থের জ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী-সমূহের জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, মনের জ্ঞান, কিন্তু দর্শন সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের জ্ঞান। "দর্শনে"র সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের ভেদ-প্রদর্শনের নিমিত্ত ফিক্‌টে ইহাকে "জ্ঞানের বিজ্ঞান" নাম দিয়াছেন। জ্ঞাত বিষয়ের সহিত যেমন দর্শনের কারবার নহে, তেমনি জ্ঞাতা বিষয়ীর সহিতও নহে। "জ্ঞানের বিজ্ঞানে"র আলোচ্য "জ্ঞান"—জ্ঞাতা নহে ; ক্রিয়াপর মনঃ নহে, মনের কার্য্যই তাহাতে আলোচ্য। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে "জ্ঞানে"র গবেষণাই "জ্ঞানের বিজ্ঞানের" উদ্দেশ্য। সুতরাং একটি মাত্র প্রাথমিক তত্ত্ব হইতে এই বিজ্ঞানের উদ্‌ভাবন করিতে ফিক্‌টে চেষ্টা করিয়াছেন। এক আদিম প্রাথমিক ক্রিয়া[1] হইতে জ্ঞানের অন্য যাবতীয় ক্রিয়ার আবিষ্কার করিতে পারা যায়। যদি সেই আদিম ক্রিয়া হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে "জ্ঞানের বিজ্ঞানের" উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। "সংবিদ" নিজে একটি ক্রিয়া, যে সমস্ত ক্রিয়ার আবিষ্কার "জ্ঞানের বিজ্ঞানের" উদ্দেশ্য, "সংবিদ" তাহাদের মধ্যে একটি। এই সমস্ত ক্রিয়া সংবিদের বিষয় নহে। সংবিদের মধ্যে তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই জন্য এই সমস্ত ক্রিয়া যে "জ্ঞানের বিজ্ঞানে" কেবল কল্পিত হইয়াছে, তাহা নহে। "সংবিদ" যে কৌশলে প্রকাশিত হয়, তাহার আবিষ্কার অর্থাৎ সংবিদের মধ্যে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অজ্ঞানের অন্ধকার হইতে জ্ঞানের আলোকে তাহা প্রকাশিত করা, সংবিদের মধ্যে তাহা আনয়ন করা, "জ্ঞানের বিজ্ঞানের" লক্ষ্য। "সংবিদে"র প্রকাশিত হওয়ার সেই প্রণালী সংবিদের পূর্ব্বগামী বলিয়াই তাহা সংবিদের মধ্যে পড়ে না।

"আপনার দিকে দৃষ্টিপাত কর। চতুষ্পার্শ্বস্থ যাবতীয় বস্তু হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া অন্তরের গভীরে নিক্ষেপ কর। দর্শন তাহার ভক্তদিগের নিকট প্রথমে ইহাই দাবী করে। তোমার মধ্যে নাই, এমন কোন বস্তু-সম্বন্ধেই দর্শন কিছু বলে না। দর্শনের আলোচ্য সকল বস্তুই তোমার মধ্যে অবস্থিত।" "আমাদের মনের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মাত্রই বিবিধ মানসিক অবস্থা আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। তাহাদের কতকগুলি আমাদের নিজের অধীন, কতকগুলি আমাদের কর্ত্তৃত্বের বাহিরে বর্ত্তমান। আমাদের ইচ্ছা ও কল্পনা প্রথম শ্রেণীর, যাহা বাহ্য বস্তুরূপে প্রতীত হয়, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর। এইরূপে ফিক্‌টে তাঁহার "জ্ঞানের বিজ্ঞান" আরম্ভ করিয়াছেন।

ফিক্‌টের দর্শন বিষয়িনিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদ। তাঁহার মতে আত্মার বাহিরে কিছুই নাই, যাহা কিছু আছে, সকলই আত্মার মধ্যে, আত্মা-কর্ত্তৃক সৃষ্ট। যাহা আমরা অবগত হই, যাহা জ্ঞানের বিষয়রূপে আবির্ভূত হয়, সকলই আত্মার মধ্যে সংঘটিত হয়। অভিজ্ঞতার বাহিরে কোনও সত্য বস্তু নাই। জীবন ও ক্রিয়া লইয়া ফিক্‌টের দর্শন। আত্মার স্বরূপ বিশুদ্ধ ক্রিয়া। কিন্তু ফিক্‌টের "আত্মা" সার্ব্বিক আত্মা। সকল ব্যক্তির মধ্যে বর্ত্তমান হইলেও, তিনি ব্যক্তিত্বাপন্ন নহেন।

ফিক্‌টে প্রথমে স্পিনোজা-পন্থী ছিলেন। ক্যাণ্টের দর্শনের সহিত পরিচিত হইয়া পরে

---

[1] Act

তিনি তাহাদ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন। ক্যাণ্টের দেশ, কাল ও প্রকার হইতে তিনি স্বকীয় দর্শনের মূল সূত্র প্রাপ্ত হন। ক্যাণ্টের মতে প্রাতিভাসিক জগতের বাহিরে প্রকারদিগের প্রয়োগ হইতে পারে না। ইহা সত্ত্বেও তিনি সংবেদনের কারণ-স্বরূপ স্বগত বস্তুর কল্পনা করিয়াছিলেন। ফিক্‌টে মনের বাহিরে অবস্থিত প্রতিভাসের কারণস্বরূপ কোনও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। মনে যাহা প্রকাশিত হয়, তাঁহার মতে সে সকলই মনের ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত, মনেরই অবস্থা-মাত্র। দেশ, কাল ও "প্রকার" দিগকে ক্যাণ্ট প্রত্যক্ষপূর্ব্ব বলিয়াছিলেন, অক্ষজ জ্ঞান উৎপন্ন হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাহারা মনে বর্ত্তমান, বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে তাহারা জ্ঞানের রূপ। কিন্তু যাহা জ্ঞানের বিষয়, সেই সংবেদনদিগকে তিনি "প্রাপ্ত"[১] বলিয়াছিলেন। ফিক্‌টের মতে অভিজ্ঞতার মধ্যে "প্রাপ্ত" বলিয়া কিছুই নাই, সকলই মনের এক প্রকার সৃজনবৃত্তির কার্য্য। একমাত্র আত্মা অথবা "অহং"এরই অস্তিত্ব আছে। বাহ্য বস্তুর দ্বারা তাহার যে ব্যবচ্ছেদ প্রতীত হয়, তাহা তাহারই স্বকৃত ব্যবচ্ছেদ। কিরূপে এই ব্যবচ্ছেদের উৎপত্তি হয়, ফিক্‌টে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু যে জগৎকে আমরা বাহিরে অবস্থিত বলিয়া মনে করি, তাহা কি বাস্তবিকই বাহিরে অবস্থিত? দেশ ও কালে অবস্থিত বলিয়াই প্রধানতঃ জগৎ বাহিরে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ক্যাণ্ট দেখাইয়াছেন, দেশ ও কাল বাহ্য বস্তু নহে, তাহারা মনেরই সৃষ্টি অথবা মনেরই অন্তর্নিহিত প্রত্যয়, যাহারা সংবেদনের উপর প্রযুক্ত হইয়া বাহ্য বস্তুর ধারণা উৎপাদন করে। দেশ ও কালে অবস্থিতি ব্যতীত আরও একটি কারণে বাহ্যত্বের ধারণা উৎপন্ন হয়। সংবেদনসকল মনের বাহির হইতে প্রাপ্ত এবং মনঃ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু সংবেদন প্রতিভাস। কার্য্য হইতে কারণের অনুমান প্রতিভাসের জগতের মধ্যে সংগত, প্রাতিভাসিক জগতের বাহিরে প্রকারদিগের প্রয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং সংবেদনের কারণরূপে মনের বহিঃস্থ কোনও স্বগত বস্তুর কল্পনা ক্যাণ্টের নিজের মত অনুসারে নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত সংবেদনসকল আমাদের অভিজ্ঞতার উপাদান। তাহারা জ্ঞানের অংশ, এবং সংবিদের মধ্যে অবস্থিত; দেশ ও কাল এবং প্রকারদিগকে যদি মানসিক পদার্থ বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহাদের ব্যাখ্যার জন্য যদি মনের বাহিরে কোনও উৎসের অনুসন্ধানের প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে, কেবল সংবেদনের সহিত যে 'প্রাপ্তি'-জ্ঞান ("প্রাপ্ত" এই জ্ঞান) মিশ্রিত আছে, তাহার ব্যাখ্যার জন্য সংবিদের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন কি? সে জ্ঞানও মনের-স্বরূপ হইতে উৎসারিত হয়, ইহা মনে করিবার বাধা কি? বস্তুতঃ সংবিদের বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুই জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে, এবং তাহাদের সমন্বয়ও সাধিত হইয়াছে। যাহাকে বাহ্য জগৎ বলা হয়, তাহা প্রকৃত পক্ষে বাহ্য নহে, তাহা অন্তর্জগতেরই একটা অংশ, সংবিদের মধ্যে অবস্থিত। যাহাকে জানি, তাহার ব্যাখ্যার জন্য যাহা জানিনা, এমন বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা অসংগত। আমাদের জ্ঞানের সমস্ত আধেয়ই আমাদের মনের অবস্থা। তাহাদিগকে প্রতিরূপ বলিতে পার, কিন্তু

---

[1] Given

বাহ্যি কোনও বস্তুর প্রতিরূপ তাহারা নহে। স্ব-গত বস্তু কি, তাহা যখন জানা নাই, তখন তাহার প্রতিরূপ ইহারা হইতে পারে না। ইহাই ফিক্‌টের মত।

উপপাদক দর্শন

আমাদের জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে প্রত্যেক প্রত্যক্ষ জ্ঞানে দুইটি পদার্থ বর্ত্তমান—অহং (আমি) এবং অন্য একটি বস্তু। এই দুইটি বস্তুকে বুদ্ধি ও তাহার বিষয়ও বলা যায়। বিষয়ী হইতে স্বতন্ত্রভাবে তাহার বিষয়ের যখন চিন্তা করা যায়, তখন সেই বিষয়ের কারণরূপে এক স্বগত বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। আবার বিষয় হইতে স্বতন্ত্রভাবে বিষয়ীকে দেখিলে, স্ব-গত অহংকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বগত বাহ্য বস্তু এবং স্বগত অহং এই দুইএর মধ্যে সমন্বয় অসম্ভব। সুতরাং দুইটির একটীকে বর্জ্জন না করিলে সংবিদের একত্ব-সাধন অসম্ভব। সে কোনটি? প্রথমে লক্ষ্য করিতে হইবে, অহং সংবিদের মধ্যে বর্ত্তমান, কিন্তু স্বগত বস্তু সংবিদের মধ্যে নাই। তাহা একটি কল্পনামাত্র। সংবিদের মধ্যে আছে সংবেদন ও প্রত্যয়। বস্তুবাদিগণ বস্তুদ্বারা তাহার প্রত্যয়ের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সংবিদের মধ্যে বস্তুর অস্তিত্ব নাই। কেবল তাহার প্রত্যয়ই আছে। জড় হইতে জড়েরই উৎপত্তি হইতে পারে, সংবেদন অথবা প্রত্যয়ের উৎপত্তি জড় হইতে হওয়া অসম্ভব। জ্ঞানের মধ্যে যাহা আছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই অনুসন্ধান করিতে হয়। এই জন্য বুদ্ধি হইতেই অনুসন্ধান আরম্ভ করা উচিত। অধ্যাত্মবাদিগণ তাহাই করিয়া থাকেন। তাঁহারা সত্তা (জড় সত্তা) হইতে আরম্ভ না করিয়া বুদ্ধি হইতেই আরম্ভ করেন। বুদ্ধি সক্রিয় পদার্থ। তাহাতে নিষ্ক্রিয়তা নাই। ইহার প্রকৃতি অ-পরতন্ত্র ও আদিম। এই জন্যই বুদ্ধির স্বরূপ সত্তা (জড়ীয়) নহে। ক্রিয়াপরত্বই ইহার একমাত্র স্বরূপ। কিন্তু বুদ্ধির ক্রিয়ার রূপ কি, তাহা বুদ্ধির স্বরূপ হইতেই অনুমান করিতে হইবে। ক্যাণ্ট অভিজ্ঞতা হইতে "প্রকার"দিগের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহা করিলে দ্বিবিধ ভ্রান্তির উদ্ভব হইতে পারে। প্রথমতঃ অভিজ্ঞতার মধ্যে বুদ্ধির কার্য্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা যে কেন অন্যরূপ হইতে পারে না, তাহার কারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে পাওয়া যায় না। অভিজ্ঞতার মধ্যে বুদ্ধির যে সকল নিয়ম পাওয়া যায়, তাহা যে বুদ্ধির মধ্যে অনুস্যূত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ অভিজ্ঞতার মধ্যে বিষয়ের কিরূপে আবির্ভাব হয়, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। এই জন্যই ফিক্‌টে বুদ্ধির তত্ত্ব এবং বিষয়, উভয়ই অহংএর বিশ্লেষণদ্বারা নির্দ্ধারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত ফিক্‌টে ক্যাণ্টের মত অনুসারেই চলিতেছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মতের বিরোধী কিছু বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই। ১৭৯৭ সালে তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের উপক্রমণিকায় তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন, যে Critique of Pure Reason গ্রন্থে এমন কতকগুলি অনুচ্ছেদ আছে, যাহাতে ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, যে

সংবেদন বাহির হইতে মনের মধ্যে না আসিলে, বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব-বোধ উৎপন্ন হয় না ; কিন্তু তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন, যে উক্ত গ্রন্থের মধ্যে বহু স্থলে ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, যে আমাদের বহিঃস্থ ইন্দ্রিয়াতীত কোনও বস্তুর আমাদের উপর প্রযুক্ত কোনও ক্রিয়ার কথা উঠিতেই পারে না। ইহার পরে ফিক্‌টে বলিয়াছিলেন, যে যতদিন ক্যাণ্ট নিজে স্পষ্টভাবে না বলিবেন, যে স্বগত বস্তুর ক্রিয়া হইতে সংবেদনের উৎপত্তি হয়, অথবা ক্যাণ্টেরই নিজের ভাষায়) আমাদের বাহিরে স্বাধীন ভাবে অবস্থিত কোনও ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর দ্বারাই সংবেদনের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তত দিন তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, যে ক্যাণ্টের ভাষ্যকারগণ যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য। ক্যাণ্ট যদি এই কথা বলেন, তাহা হইলে, বিশ্বাস করিতে হইবে, যে Critique of Pure Reason একটা যদৃচ্ছা-সম্ভূত ব্যাপার, ইহা বুদ্ধি-প্রসূত নহে। ক্যাণ্টের নিকট হইতে উত্তর আসিতে বিলম্ব হয় নাই। ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি ফিক্‌টেকর্ত্তৃক তাঁহার দর্শনের ব্যাখ্যা অস্বীকার করিয়া ঘোষণা করিলেন, যে Critique of Pure Reason গ্রন্থে তিনি যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, আক্ষরিক অর্থে তাহাই তাঁহার প্রকৃত মত। তিনি সকলকে সেই অর্থে তাহা গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন।

রেইনহোল্ড এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "ফিক্‌টের দর্শন-সম্বন্ধে ক্যাণ্টের প্রকাশ্য ঘোষণার পরে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই, যে ফিক্‌টে ক্যাণ্টের দর্শনের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার সহিত ক্যাণ্টের মতের মিল নাই। কিন্তু ইহা হইতে বড় জোর ইহাই অনুমান করা যায়, যে তাঁহার দর্শনে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ক্যাণ্ট কোনও অসংগতি দেখিতে পান নাই। কিন্তু ঠিক এই কারণেই ফিক্‌টে যদি ক্যাণ্টের দর্শন অসংগতিপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকেও ভ্রান্ত বলিবার কোনও কারণ নাই।" এই অসংগতি দূর করিবার জন্য ক্যাণ্ট Critique of Pure Reasonএর দ্বিতীয় সংস্করণে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ফিক্‌টের যুক্তিপ্রণালী

ফিক্‌টে অহংকে মূলতত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছিলেন। এই অহং জীবাত্মা নহে ; ইহা সার্ব্বিক। সার্ব্বিক প্রজ্ঞাই এই মূল তত্ত্ব। সার্ব্বিক অহং (পরমাত্মা), এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাপ্ত "অহং" বিভিন্ন। এইরূপ কোনও মূলতত্ত্বের অস্তিত্ব না থাকিলে, আমাদের জ্ঞান কতকগুলি অসংবদ্ধ অংশের সমষ্টি-মাত্র হইত। সুতরাং এইরূপ তত্ত্ব যে একটি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা প্রমাণযোগ্য নহে। পরীক্ষাদ্বারা ভিন্ন তাহার আবিষ্কারের অন্য কোনও পথ নাই। এমন কোনও প্রতিজ্ঞা যদি পাওয়া যায়, যাহাতে অন্য যাবতীয় প্রতিজ্ঞা পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাই এই মূল তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। যদি এইরূপ কোনও প্রতিজ্ঞা পাওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট আরও দুইটি প্রতিজ্ঞার

কল্পনা করা যাইতে পারে। শেষোক্ত প্রতিজ্ঞাদ্বয়ের একটির বিষয়বস্তু হইবে অপ্রতিবদ্ধ বা অনপেক্ষ, কিন্তু তাহার রূপ প্রথম প্রতিজ্ঞাদ্বারা প্রতিবদ্ধ এবং তাহার উপর নির্ভরশীল। অপরটি হইবে ঠিক ইহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহার রূপ অপ্রতিবদ্ধ, কিন্তু বিষয়বস্তু প্রথম প্রতিজ্ঞা-দ্বারা প্রতিবদ্ধ এবং তাহার উপর নির্ভরশীল। এই তিন স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির ঠিক বিপরীত, এবং তৃতীয়টি প্রথম ও দ্বিতীয়ের ফল। যেমন (১) আকাশ নীল, এই বাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বাক্য (২) আকাশ নীল নয়। এই দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত বাক্য এক সঙ্গে গ্রথিত করিলে দাঁড়ায়, (৩) আকাশ নীল এবং নীল নয়। কিন্তু ইহা মূলতঃ স্ববিরোধী। এই বিরোধের মীমাংসা হয়, এই বলিয়া, যে আকাশ কখনও নীল, কখনও নীল নয়। এই অর্থে তৃতীয় বাক্যটি সত্য। প্রথম স্বতঃ-সিদ্ধটি যদি "অহং" (আত্মা)-বিষয়ক হয়, দ্বিতীয়টি হইবে "অনহং" (অনাত্মা) বিষয়ক, এবং তৃতীয়টিতে থাকিবে অনহংএর উপর অহংএর প্রতিক্রিয়া। ফিক্‌টের এই প্রণালী বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সমবায়ে কল্পিত। "নয়" (বচন—Thesis), "প্রতিনয়" (প্রতিবচন—Antithesis) এবং সমন্বয় (Synthesis) দ্বারা এক তত্ত্ব হইতে জ্ঞানের যাবতীয় মৌলিক প্রত্যয়ের আবিষ্কার এবং তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা (দ্বন্দ্ব-মূলক ত্রিভঙ্গী নয়) ফিক্‌টেই প্রথম করিয়াছিলেন। ক্যাণ্ট প্রকারদিগের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ-আবিষ্কারের চেষ্টা না করিয়া কেবল তাহাদিগকে পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিক্‌টে একটি হইতে ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট প্রত্যয়দিগের আবিষ্কার করিয়া, তাহাদিগকে পারস্পরিক সম্বন্ধের সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন। একটি মৌলিক সমন্বয় হইতে[১] আরম্ভ করিয়া, তাহার বিশ্লেষণদ্বারা দুইটি পরস্পর বিরোধী বচন বাহির করিয়াছিলেন (নয় ও প্রতিনয়), এবং পরে এই বিরুদ্ধ বচনদ্বয়ের সমন্বয় করিয়া নূতন সমন্বয়ের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রথম সমন্বয় অপেক্ষা দ্বিতীয় সমন্বয়ের বাস্তবতা অধিক[২]। দ্বিতীয় সমন্বয়ের বিশ্লেষণ করিয়া আবার দুইটি বিরুদ্ধ বচন বাহির হইতে পারে, এবং তাহারা নূতন সমন্বয়ে মিলিত হইতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পর বিরুদ্ধ বচন পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ এইরূপ চলিতে থাকিবে।

ফিক্‌টের "জ্ঞানের বিজ্ঞান" তিন ভাগে বিভক্ত ;

(১) জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম তত্ত্বাবলী

(২) ঔপপত্তিক জ্ঞানের[৩] ভিত্তি, এবং

(৩) কর্ম্মনীতি বিজ্ঞানের ভিত্তি।

(১) জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম তত্ত্বাবলী

জ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব তিনটি। প্রথমটি সম্পূর্ণ অপ্রতিবদ্ধ, অন্য দুইটি অপেক্ষাকৃত অপ্রতিবদ্ধ। সম্পূর্ণ অপ্রতিবদ্ধ মূলতত্ত্বই আমাদের সংবিদের ভিত্তি। সেই মূলতত্ত্বের প্রথম কার্য্য হইতেই সংবিদের আবির্ভাব হইয়াছে। এই প্রথম কার্য্যকে ফিক্‌টে Deed-act

[১] Fundamental Synthesis [২] Concreter [৩] Theoretic Knowledge

বলিয়াছেন। Deed অর্থে সমাপ্ত কার্য্য, Act অর্থে অসমাপ্ত কার্য্য। যে কার্য্যের মধ্যে কার্য্য ও তাহার ফল উভয়ই আছে, তাহাই Deed-act। মূলতত্ত্বের এই Deed-act, এই প্রথম কার্য্য, আমাদের জ্ঞানের মধ্যে পড়ে না, কেননা ইহা হইতেই সংবিদের উৎপত্তি; ইহা সংবিদের পূর্ব্ববর্ত্তী। আমাদের সংবিদ বিশ্লেষণ করিয়া, তাহার মধ্যে যাহা যাহা পাওয়া যায়, সমস্ত হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া সংবিদের চিন্তা করিলেও, তাহার মধ্যে এই Deed-actএর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না। তবুও এই Deed-actই যে সংবিদের ভিত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মূলতত্ত্বের এই Deed actএর আবিষ্কারের জন্য যে কোনও সর্ব্বসম্মত প্রতিজ্ঞা লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করা যাইতে পারে। সেই প্রতিজ্ঞার মধ্যে বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক যাহা কিছু আছে, (সকল বিশেষণ) তাহা অপসারিত করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা গ্রহণ করিয়া, তাহা হইতে কি পাওয়া যায়, দেখিতে হইবে। এতাদৃশ সর্ব্ববিশেষণ-বর্জিত একটি প্রতিজ্ঞা "ক হয় ক"। এ প্রতিজ্ঞা যে সত্য, সে সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত, এবং স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। (ইহাই তর্কশাস্ত্রের তাদাত্ম্য নিয়ম—Law of Identity)। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, এই প্রতিজ্ঞা যে সত্য তাহার প্রমাণ কি? তাহার উত্তরে বলিব, এই প্রতিজ্ঞা স্বয়ংসিদ্ধ, প্রমাণের অপেক্ষা করে না। যদি জিজ্ঞাসা কর, এই প্রতিজ্ঞার ভিত্তি কি, তাহা হইলে বলিব, ইহা স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ, ইহার কোনও ভিত্তির প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই প্রমাণ দিতে অস্বীকৃত হইবার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই, যে এইরূপ স্বয়ংসিদ্ধ অনপেক্ষ প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিবার ক্ষমতা আমার আছে, ইহাই আমি ঘোষণা করি। কোনও বিষয় যদি এরূপ স্বতঃ প্রমাণ্য হয়, যে তাহার কোনও প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, তাহা হইলে স্বতঃ প্রমাণ্যরূপে সেই বিষয় উপস্থিত করিবার অধিকার সকলেরই আছে।

কিন্তু "ক হয় ক" বলা আর "ক হয়" (অর্থাৎ আছে) বলা এক কথা নহে। সত্তার সহিত যখন কোনও বিধেয় যুক্ত থাকে, তখন তাহা বিধেয়হীন সত্তার সহিত সমার্থক নহে। মনে কর, "দুই সরল রেখাদ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র" বুঝাইতে 'ক' চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। দুই সরল রেখাদ্বারা কোনও ক্ষেত্র বেষ্টিত হইতে পারে না। সুতরাং ইহা একটি মিথ্যা কল্পনা। মিথ্যা হইলেও "ক হয় ক" এই প্রতিজ্ঞা আকারে সত্য। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা হইতে তাহার বিধেয় বর্জ্জন করিয়া থাকে "ক হয়" (অর্থাৎ ক আছে), ইহা সত্য নহে। কেন না দুই সরল রেখাদ্বারা বেষ্টিত কোনও ক্ষেত্র নাই।

"ক হয় ক", এই প্রতিজ্ঞার অর্থ যদি ক থাকে, তবে ক আছে। ক আছে কিনা, সে সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞায় কিছুই বলা হয় নাই। প্রতিজ্ঞার আধেয়-সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। প্রতিজ্ঞার আকার-সম্বন্ধে ঐ উক্তি করা হইয়াছে। এই দুই "ক" এর মধ্যে যে সম্বন্ধ অবশ্যক বা নিয়ত, সেই সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে। মনে কর এই সম্বন্ধ X। এই Xএর অবস্থিতি কোথায়? নিশ্চয়ই "অহং"এর মধ্যে, কেন না ক যে ক, তাহা অহংই বলিতেছে। কিন্তু অহং তাহা বলিতেছে কেন? ইহা তো তাহার খেয়াল নহে। ইহা

একটা নির্ব্যূঢ় সত্য, একটা অব্যভিচারী নিয়ম, সেই জন্যই বলিতেছে। সুতরাং পাওয়া যাইতেছে, X একটা নিয়ম, এবং অহংএর মধ্যে তাহা বর্ত্তমান। এই নিয়মের অন্য কোনও ভিত্তি নাই। X যে সম্বন্ধের নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা 'ক'র সম্বন্ধেই সত্য। X যখন অহংএর মধ্যেই স্থাপিত হইতেছে, তখন 'ক' ও যে অহংএর মধ্যে ব্যক্ত হইতেছে, তাহা বলিতে হইবে।

"ক হয় ক" এই প্রতিজ্ঞার অর্থ, "যদি ক থাকে, তবে ক আছে।" উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তদনুসারে প্রতিজ্ঞাটি এই ভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে—"যদি অহং এর মধ্যে 'ক' স্থাপিত হয়, তাহা হইলে 'ক' স্থাপিত হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে 'ক' আছে।" ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, যে অহংএর মধ্যে স্থাপিত বলিয়াই 'ক'র অস্তিত্ব। সুতরাং ইহা বলা যায়, যে অহং এর মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা সর্ব্বদা একরূপ থাকে, এবং সেইজন্য পদার্থ-সকলের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝিতে সক্ষম হয়। সুতরাং ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয়, যে অহং=অহং, অথবা আমি হই আমি।

অহং=অহং, এই প্রতিজ্ঞা কেবল আকারে সত্য নহে, বস্তুতঃও সত্য। এই বাক্যের যাহা আধেয়, তাহাও সত্য। ইহার সত্যতা স্বতঃসিদ্ধ। ইহার অন্য কোনও কারণ নাই। যখন ক=ক বলিয়াছিলাম, তখন 'ক'র অস্তিত্ব আছে কিনা, তাহা বলা সম্ভবপর হয় নাই; কিন্তু অহং=অহং সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, যে অহংএর অস্তিত্ব আছে, আমার অস্তিত্ব আছে, অহং অস্মি। এই আত্ম-ঘোষণাই অহংএর প্রথম কার্য্য, ইহাই Deed act, যাহার অনুসন্ধান চলিতেছিল। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে যত ব্যাপার হয়, তাহার ভিত্তি এই স্বপ্রতিবন্ধ স্বয়ংসিদ্ধ অহং। এই অহং বিশুদ্ধ স্বাধীন ক্রিয়াপরতা[1]। অহং স্বকীয় অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই স্বীকৃতিতেই তাহার অস্তিত্ব। আবার বিপরীত ভাবে অহংএর যে অস্তিত্ব আছে, ইহারই বলে অহং স্বীয় অস্তিত্ব স্বীকার করে। অহংএর এই কার্য্যের কর্ত্তাও[2] অহং, তাহার ফলও[3] অহং। আপনার কার্য্য হইতে আপনি উদ্ভূত। একমাত্র যে কার্য্য প্রথমে সম্ভবপর ছিল, "অহমস্মি" এই বচনই সেই কার্য্য। অর্থাৎ অহমের অস্তিত্ব-প্রতিষ্ঠাই সেই কার্য্য, যাহা সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অন্য কোনও কার্য্য তখন সম্ভবপর ছিল না। তর্কশাস্ত্রে এই প্রথম তত্ত্ব (ক=ক) তাদাত্ম্যের নিয়ম বলিয়া অভিহিত। ক=ক হইতে পাওয়া যায় অহং=অহং। কিন্তু অহং=অহং, ইহার সত্যতা ক=ক হইতে প্রাপ্ত নয়। ক=ক, ইহার সত্যতাই "অহং=অহং" হইতে প্রাপ্ত। অহং যাবতীয় বিষয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার ভিত্তিও অহং। তর্কশাস্ত্রের তাদাত্ম্যের নিয়ম "অহং=অহং" হইতে উদ্ভূত। বাস্তবতার "প্রকার" ইহা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। "অহং অস্মি" এই বাক্যের অন্য কোনও দিক চিন্তা না করিয়া, কেবল "অহম্" এর কার্য্যপ্রণালী চিন্তা করিলে এই "প্রকার" প্রাপ্ত হওয়া যায়। অহংরূপী অপ্রতিবন্ধ বিষয়ী হইতে সমস্ত "প্রকারে"র উদ্ভব হয়।

[1] Pure Activity [2] Agent [3] Product

দ্বিতীয় মৌলিকতত্ত্ব: এই তত্ত্ব আকারে অপ্রতিবদ্ধ, কিন্তু বিষয়-বস্তুতে প্রতিবদ্ধ। প্রথম তত্ত্বের মত ইহাও অপ্রমাণ্য। এই তত্ত্বও অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অ-ক (যাহা ক নহে) = ক নহে, এই প্রতিজ্ঞাই এই তত্ত্ব। ইহা স্বতঃসিদ্ধ, মৌলিক, প্রথম তত্ত্বের মতই অপ্রতিবদ্ধ। প্রথম তত্ত্ব হইতে এই তত্ত্ব উদ্ধার করা যায় না। কিন্তু আকারে অপ্রতিবদ্ধ হইলেও, বিষয়-বস্তুতে ইহা প্রতিবদ্ধ। কেননা "অ-ক"কে প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বে 'ক'কে প্রথমে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে যখন বলা হয় ক = ক, তখন সেই কার্য্যের (বলা একটি কার্য্য) আকারকে "নয়" (অথবা স্থাপন) বলা যায়। "ক 'ক'র সমান" এই কথা বলিতেছি বলিয়াই এই বাক্য একটি "স্থাপন"। "অ-ক = 'ক' নহে" যখন বলি, তখন ইহার প্রতিযোগী বাক্য বলি। এই জন্য এই শেষোক্ত বাক্য "প্রতিনয়"। যখন এই প্রতিযোগী বাক্য বলি, তখন এইরূপ বাক্য বলিবার ক্ষমতা (ইহাকে সত্য বলিয়া বুঝিবার এবং ঘোষণা করিবার ক্ষমতা) আমার আছে, ইহা স্বীকার করা হয়। আকারে এই "প্রতিনয়" অনপেক্ষ, এবং ইহার কোনও ভিত্তিরপ্রয়োজন নাই। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক হইতে ইহা "নয়ে"র অপেক্ষা করে, কেন না "যাহা 'ক' নহে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার পূর্ব্বে 'ক' এর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। "প্রতিনয়" হইতে 'অ-ক' সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান লাভ করা যায় না। কেবল এই মাত্র জানা যায় যে, "অ-ক" ক'র বিপরীত। 'ক' কি, তাহা জানিতে পারিলেই 'অ-ক' জানিতে পারা যায়। কিন্তু একমাত্র 'অহং' ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর স্থিতিই অনপেক্ষ নহে। একমাত্র "অহং"এর স্থিতির জন্য অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই। সুতরাং কেবল "অহং" এরই অনপেক্ষ "প্রতিনয়" সম্ভবপর। "অহং" এর প্রতিযোগী "অনহং' (ন + অহং = অনাত্মা)। ইহাই সংবিদের দ্বিতীয় অংশ। সংবিদের মধ্যে অহংএর প্রতিযোগিরূপে অনহংকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অহংএর মধ্যে যাহা আছে, অনহংএর মধ্যে আছে তাহার বিপরীত। অহং (আত্মা) অনহং (অনাত্মা) নহে, এই প্রতিজ্ঞা হইতেই বিরোধের নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে ব্যতিরেক "প্রকার"[1] প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৩) তৃতীয় মৌলিক তত্ত্ব কেবল আকারে প্রতিবদ্ধ বা সাপেক্ষ, কিন্তু বিষয়বস্তুতে অপ্রতিবদ্ধ বা নিরপেক্ষ। দুইটি প্রতিজ্ঞা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত বলিয়া ইহা প্রায় সম্পূর্ণ প্রমাণ যোগ্য। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বিরোধী তত্ত্বের মধ্যে যে বিরোধ ছিল, এই তত্ত্বে তাহার মীমাংসা হইয়াছে। প্রজ্ঞা অন্য কোনও প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া আপনিই এই মীমাংসা করিয়াছে। এক দিকে অহং দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাকে স্থানচ্যুত না করিয়া অন্য কিছুই সেখানে থাকিতে পারে না। অন্য দিকে "অনহং"কেও অস্বীকার করা যায় না। "অনহং" থাকিলে অহংএর স্থান হয় কিরূপে? এই অবস্থায় দেখা যায়, অহংএর মধ্যেই অনহং এর স্থান হইতে পারে—অন্য স্থান আর কোথায়? "অহং" "অনহং" কর্ত্তৃক স্থানচ্যুত

---

[1] Category of Negation

হয়ত্রাই, আপনার মধ্যেই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু পরস্পর বিরোধী দুই পদার্থের একত্রাবস্থানের সম্ভব হয় কিরূপে? এই সমস্তার সমাধান না হইলে সংবিদের একত্ব বিনষ্ট হয়। তৃতীয় তত্ত্বদ্বারা এই সমস্তার সমাধান হইয়াছে। "অহং" এবং "অনহং" কাহারও সত্তা অস্বীকার না করিয়া সংবিদের মধ্যে উভয়কে মিলিত করা হইয়াছে। অহং এবং অনহং পরস্পরকর্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন মনে করিলেই এই সমস্তার সমাধান হয়। অহং এবং অনহংএর মধ্যে যে ব্যবচ্ছেদ, তাহা অহংএরই কার্য্য। এই ক্রিয়াদ্বারা সীমাবদ্ধতা[1] "প্রকারে"র উদ্ভব হয়। সীমাবদ্ধতার মধ্যে 'পরিমাণ' প্রকার নিহিত আছে। পরিমাণের বিভাজ্যতা আছে। সীমাবদ্ধতা প্রকারদ্বারা, অহং এবং অনহং উভয়ই বিভাজ্য বলিয়া গৃহীত হয়। এই সমন্বয় হইতে একটি ন্যায়ের নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা এই—অংশতঃ ক = অ-ক, "অংশতঃ অ-ক = ক। অর্থাৎ দুইটি বিরোধী পদার্থের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য উভয়ই আছে। পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ের নিয়ম যেমন অহং এবং অনহংহের মধ্যে ঐক্যের কারণ, তেমনি অনৈক্যেরও কারণ। উপরি উক্ত তিন তত্ত্ব ব্যতীত অনপেক্ষ এবং নির্ব্যূঢ় ভাবে সত্য আর কিছুই নাই। "অহমের মধ্যে বিভাজ্য অহমের বিরুদ্ধে বিভাজ্য অনহংকে আমি উপস্থিত করি"—এই সূত্রের মধ্যে তিন তত্ত্বই সন্নিবিষ্ট আছে। সকল দর্শনকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহাকে কোনও দর্শন শাস্ত্রই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা হইতেই যে যাবতীয় জ্ঞান উদ্ভূত, তাহা দেখাইতে হইবে।

অহং এবং অনহং পরস্পর কর্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন—এই বাক্যের মধ্যে দুইটি অংশ আছে। (১) অহং অনহং কর্তৃক আপনাকে ব্যবচ্ছিন্ন রূপে প্রকাশিত করে। (ইহার অর্থ অহং জ্ঞাতা) (২) অহং অনহংকে অহংকর্তৃক ব্যবচ্ছিন্নরূপে প্রকাশিত করে। (ইহার অর্থ—অহং ক্রিয়াপর) প্রথম প্রতিজ্ঞা "জ্ঞানের বিজ্ঞানে"র ঔপপত্তিক অংশের ভিত্তি। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা তাঁহার ব্যবহারিক অংশের ভিত্তি।

ঔপপত্তিক জ্ঞানের মূল উপাদান

জ্ঞানের মূল উপাদানের মধ্যে প্রতিনয় এবং সমন্বয়ের একটা অনবচ্ছিন্ন শ্রেণী প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম সমন্বয় হইতেছে "অহং-অনহং কর্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন।" এই বাক্য বিশ্লেষণ করিলে দুইটি পরস্পর বিরোধী বাক্য পাওয়া যায়: (১) ক্রিয়াশীল-অনহং তৎকালে নিষ্ক্রিয় "অহং" এর ব্যবচ্ছেদ করে। (২) কিন্তু অহংএর মধ্যে ভিন্ন কোনও ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতে পারে না, সুতরাং অহং নিজেই অনপেক্ষ ভাবে (অন্য কাহারও সাহায্য না লইয়া) আপনাকে ব্যবচ্ছিন্ন করে। এখনে "অহং"এর যুগপৎ ক্রিয়াপরতা এবং নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। এই বিরোধের সমন্বয় না হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞার সত্যতা বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহার ফলে সংবিদের একত্বও নষ্ট হয়; এইজন্য এমন এক সমন্বয়ের অন্বেষণ

[1] Limitation

করিতে হয়, যাহার মধ্যে উল্লিখিত বিরোধের মীমাংসা সম্ভবপর হয়। "বিভাজ্যতা"র প্রত্যয়-দ্বারা এই সমন্বয় সাধিত হইতে পারে। "ক্রিয়াপরতা" এবং "নিষ্ক্রিয়তা" উভয়ের স্থানই "বিভাজ্যতা" প্রত্যয়দ্বারা সম্ভাবিত হয়। "ক্রিয়াপরতা" প্রত্যয় "বাস্তবতার" অন্তর্গত। নিষ্ক্রিয়তার প্রত্যয় "ব্যতিরেকে"র অন্তর্গত। কোনও পদার্থকে বিভক্ত করিলে তাহার মধ্যে এইরূপ বিরোধী দুই পদার্থের স্থান হইতে পারে। "অহং অংশতঃ আপনাকে ব্যবচ্ছিন্ন করে, এবং অংশতঃ ব্যবচ্ছিন্ন হয়" (ন-অহং কর্তৃক) এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে উপরি উক্ত দুই প্রতিজ্ঞাই সংযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু কেবল ইহাই যথেষ্ট নয়। উভয় প্রতিজ্ঞা এক বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং আরও শুদ্ধ ভাবে সমন্বয়-সাধক প্রতিজ্ঞাটি হইবে এইরূপ : অহং বাস্তবতার যতসংখ্যক অংশ আপনার মধ্যে ব্যবচ্ছিন্ন করে, ব্যতিরেকের ততসংখ্যক অংশ অনহমের মধ্যে ব্যবচ্ছিন্ন করে।" আবর্ত্তিত হইয়া এই বাক্য দাঁড়াইবে এইরূপ : অহং অনহমের মধ্যে বাস্তবতার যতসংখ্যক অংশ ব্যবচ্ছিন্ন করে, ব্যতিরেকের ততসংখ্যক অংশ আপনার মধ্যে ব্যবচ্ছিন্ন করে।" এই ব্যবচ্ছেদের কার্য্য পারস্পরিক। এইরূপে ফিকটে ক্যাণ্টের "সম্বন্ধের" তিন "প্রকারের" মধ্যে সর্ব্বশেষ "প্রকারের" (ব্যতিহার[1]) আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রকারেই তিনি "সম্বন্ধে"র অন্তর্গত অন্য দুই "প্রকারের"ও আবিষ্কার করিয়াছেন। যখন অহং নিষ্ক্রিয় বলিয়া পরিগণিত, অনহং তখন সক্রিয় এবং বাস্তব। কিন্তু ইহাই "কারণত্ব"। যাহা সক্রিয়, তাহাই কারণ; যাহাকে নিষ্ক্রিয় মনে করা হয়, তাহা "ফল[2]"। কারণ ও তাহার উৎপন্ন ফলের সমবায়ই কার্য্য[3]। আবার দেখ, "অহং আপনাকে ব্যবচ্ছিন্ন করে," ইহার মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে। (১) প্রথমতঃ ব্যবচ্ছিন্ন করে এই ক্রিয়ার কর্ত্তা অহং। সুতরাং অহং সক্রিয়। (২) দ্বিতীয়তঃ অহং অহংকে ব্যবচ্ছিন্ন করে বলিয়া অহং ক্রিয়ার কর্ম্মও বটে, এবং নিষ্ক্রিয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উক্ত বাক্যে সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা, বাস্তবতা ও ব্যতিরেক, যুগপৎ অহমে আরোপিত হইতেছে। এই বিরোধের মীমাংসা হইতে পারে কেবল সেইরূপ ক্রিয়াদ্বারা, যাহা এক সঙ্গে সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা। অহং যে কার্য্যদ্বারা তাহার নিষ্ক্রিয়তার ব্যবচ্ছেদ এবং নিষ্ক্রিয়তাদ্বারা সক্রিয়তার ব্যবচ্ছেদ করিতে পারে, এইরূপ কোন্ ক্রিয়া আছে? এই সমস্যার মীমাংসার জন্য "পরিমাণের" ধারণার প্রয়োজন। অহমের মধ্যে প্রথমে সমস্ত বাস্তবতাই অনবচ্ছিন্ন-পরিমাণ,[4] বা নিরংশক সমগ্রতা-রূপে থাকে। তখন একটি বৃহৎ বৃত্তের সঙ্গে অহমের উপমা দেওয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ কর্ম্মের (কর্ম্মরূপ বৃহৎ বৃত্তের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশের) যে বাস্তবতা আছে, তাহা সত্য। কিন্তু কর্ম্মের সমগ্রতার তুলনায়, নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ কর্ম্ম সমগ্র কর্ম্মের ব্যতিরেক, এবং সেই অর্থে নিষ্ক্রিয়তা। এই খানেই যে সমাধান আমরা অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্রব্যত্বের[5] প্রত্যয়-দ্বারাই ইহার সমাধান হয়। অহংকে সমগ্র বৃত্তরূপে, (যাবতীয় সত্তার সমষ্টিরূপে)

[1] Reciprocity [2] Effect [3] Action
[4] Absolute quantum [5] Substantiality

ধারণা করিলে, তাহা দ্রব্য-রূপে প্রতীত হয়। এই বৃত্তের—এই সমগ্রের—নির্দিষ্ট অংশরূপে ইহা সমগ্রের উপলক্ষণরূপে[1] প্রতীত হয়। দ্রব্য হইতে বিচ্ছিন্ন কোনও উপলক্ষণের ধারণা করা যায় না। কোনও বস্তুকে নির্দিষ্ট পরিমাণ-যুক্ত বস্তুরূপে ধারণা করিতে হইলে, তাহাকে দ্রব্যের সম্প্রত্যয়ের অন্তর্গত রূপেই ধারণা করিতে হয়। আদিতে একই মাত্র দ্রব্য ছিল, তাহা অহং। এই দ্রব্যের মধ্যে যাবতীয় সম্ভবপর উপলক্ষণ অবস্থিত। সুতরাং যত বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর, সকলই তাহার মধ্যে অবস্থিত। অহংই একমাত্র অনবছিন্ন অসীম। যখন "আমি চিন্তা করি", "আমি কার্য্য করি", তখনি অহমের মধ্যে ব্যবচ্ছেদ আসিয়া পড়ে। এই দিক হইতে দেখিলে, ফিক্‌টের দর্শনের সঙ্গে স্পিনোজার দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জেকোবি বলিয়াছিলেন, ইহা আধ্যাত্মিক স্পিনোজীয় দর্শন[2]। অহং এবং অনহমের মধ্যে সম্বন্ধ-বিষয়ে দুই প্রকার মতের উদ্ভব হইতে পারে। এক প্রকার মত কারণত্ব ক্যাটেগরির প্রয়োগের ফল, দ্বিতীয় মত Substance ক্যাটেগরির প্রয়োগের ফল। কারণত্বের দিক হইতে দেখিলে অহংকে যখন অনহং-কর্ত্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন করা যায়, তখন অহং নিষ্ক্রিয়, অনহং সক্রিয়। অনহমের সক্রিয়তাই অহমের নিষ্ক্রিয়তার কারণ। অহং কিন্তু কেবল ক্রিয়ারূপ। সুতরাং তাহার মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা আসিবে কোথা হইতে। এই নিষ্ক্রিয়তার কারণ, তাহা হইলে অনহং। এখানে সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে যে ভেদ, তাহা গুণের ভেদ, পরিমাণের ভেদ নহে। নিষ্ক্রিয়তা হ্রাসপ্রাপ্ত ক্রিয়া নহে, তাহা সক্রিয়তা হইতে ভিন্ন জাতীয় পদার্থ। সুতরাং অনহমের ক্রিয়াই অহংএর নিষ্ক্রিয়তার কারণ। এই মত বস্তুবাদ। কিন্তু অহংকে দ্রব্যরূপে দেখিলে, তাহার মধ্যস্থ নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তার মধ্যে গুণ-গত কোনও ভেদ নাই। হ্রাসপ্রাপ্ত সক্রিয়তাই তখন নিষ্ক্রিয়তা। অহমের নিষ্ক্রিয়তা তখন তাহারই সক্রিয়তার হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থা। তখন নিষ্ক্রিয়তার কারণের জন্য অহমের বাহিরে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। অহমের বস্তুত্বই তখন অনহমে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু অনহমের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে অহমের বস্তুত্ব কিসে স্থানান্তরিত হইবে? স্বতন্ত্র বস্তুর অভাবে স্থানান্তরের কথা উঠিতে পারে না। এই বিরোধের মীমাংসার জন্য নূতন একটি সমন্বয়ের প্রয়োজন। অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য ফিক্‌টে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাকে তিনি Critical Idealism বলিয়াছেন (সমালোচনামূলক অধ্যাত্মবাদ)। তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে বস্তুবাদিগণ যে বাহ্য কারণদ্বারা অহংকে ব্যবচ্ছিন্ন মনে করেন,—অহমের উপর ক্রিয়ার এবং তাহার নিষ্ক্রিয়তার কারণ তাঁহারা যে বাহ্য জগতে অনুসন্ধান করেন,—অন্তর্জগতে অহমের ক্রিয়া হইতেই তাহার উৎপত্তি। অহমের প্রতিযোগিরূপে যে বাহ্য জগতের প্রতীতি হয়, যে বাহ্য জগৎ অহমের সম্মুখে বাধা-স্বরূপে দাঁড়াইয়া তাহার ক্রিয়া প্রতিহত করে, তাহাও অহমের ক্রিয়ারই ফল। অহমের ক্রিয়ার ফলে অহমের বিপরীত এক তত্ত্বের উদ্ভব হয়, তাহার ধর্ম্ম বিপ্রকর্ষণ। এই তত্ত্বকে ফিক্‌টে "Anstoss" নামে অভিহিত

[1] Accident

[2] Idealistic Spinozism

করিয়াছেন। এই Anstoss শব্দের অর্থ "আক্রমণের তল।" এই Anstossএর সংস্পর্শে আসিবামাত্রই অহমের ক্রিয়া প্রতিহত হয়, এবং অহমের দিকেই ফিরিয়া যায়। অর্দ্ধচ্ছ বস্তুতে প্রতিহত হইয়া আলোক যেমন দিক্‌ভ্রষ্ট হয়, অহমের অনন্তে প্রসারণোন্মুখ ক্রিয়াও এই Anstossএ প্রতিহত হইয়া তেমনি ফিরিয়া যায়। অহমের মধ্যে তাহার ক্রিয়ার ফিরিয়া যাওয়ার ফল হয়, অহমের ব্যবচ্ছেদ। অনহং হইতে অহং ব্যবচ্ছিন্ন হয়। ক্যাণ্ট জ্ঞানের মধ্যে যে "প্রাপ্ত উপাদানের" অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এই Anstoss-দ্বারা ফিক্‌টে তাহার নিরসন করিয়াছেন। এই প্রাপ্ত উপাদানের জন্য অহমের বাহিরে কোনও অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় স্ব-গত বস্তুর কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। সংবেদন এই Anstossএর ক্রিয়ারই ফল। সুতরাং মনের বাহিরে তাহার কোনও কারণ নাই। দেশকালের প্রত্যয়ের কোনও কারণ ক্যাণ্ট বাহিরে অনুসন্ধান করেন নাই। মানুষের মনের মধ্যেই তাহার উৎপত্তি। Anstoss যে মনের ক্রিয়ার প্রতিরোধ করে, ইহাও মনের কার্য্যের অবশ্যক ফল। সেই প্রতিরোধের ফলে বাহ্য জগতের প্রতীতি। অহমের ক্রিয়া Anstossএ প্রতিহত হইয়া বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং অহমে ফিরিয়া আসিয়া বাহ্য বস্তুরূপে প্রতীত হয়। তখন তাহাদিগকে আমরা দেশব্যাপী বস্তুরূপে গণ্য করি। ক্যাণ্টের স্ব-গত বস্তু, এবং ফিক্‌টের এই Anstoss বস্তুতঃ একই। Anstossএর উৎপত্তি মনের মধ্যে, আর স্বগত বস্তু বাহিরে অবস্থিত, এই প্রভেদ। Anstossএর উৎপত্তির ক্রিয়াকে ফিকটে "সৃজনকারী কল্পনা" নাম দিয়াছেন। যে শক্তিদ্বারা মনের মধ্যে "বিষয়ের" উৎপত্তি হয়, এবং তাহারা সংবিদের বিষয় বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাই এই শক্তি।

ফিকটে ইহার পর অহমের বিবিধ বৃত্তি, (যাহারা অহং এবং অনহমের যোগ-সম্পাদন করে,) তাহাদের উৎপত্তির বর্ণনা করিয়াছেন: কল্পনা, সম্প্রত্যয়, সংবেদন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অনুভূতি, বুদ্ধি, বিচার, প্রজ্ঞা প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং এই প্রসঙ্গে কিরূপে দেশ ও কালের ধারণার উৎপত্তি হয়, তাহাও দেখাইয়াছেন।

অহমের বুদ্ধিরূপে অভিব্যক্তি অহমের স্বকীয় শক্তিদ্বারা সংঘটিত হয় না। অহমের বহিঃস্থ বস্তুদ্বারা হয়। অহমের ক্রিয়ায় বাধা উৎপন্ন হওয়ার ফলে অহং প্রত্যাবর্ত্তিত না হইলে, বুদ্ধির উৎপত্তি হইত না; সেই বাধা উপস্থিত না হইলে, অহমের ক্রিয়া অনন্তে প্রধাবিত হইয়া অনির্দ্দিষ্ট সত্তায় পর্য্যবসিত হইয়া যাইত। বুদ্ধিরূপে অহমের আবির্ভাব নির্ভর করে এক অনির্দ্দিষ্ট, অনির্দ্দেশ্য অনহমের উপর। এই অনহমের প্রযুক্ত বাধার জন্যই অহং বুদ্ধি-রূপ ধারণ করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই বাধা অহংকর্ত্তৃক সৃষ্ট, এবং এই বাধা-সমন্বিত সমগ্র অহং অন্য কোনও পদার্থ কর্ত্তৃক অনবচ্ছিন্ন; অহং স্বয়ংসিদ্ধ এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু বুদ্ধিরূপে অহং সসীম ও পরতন্ত্র। সুতরাং অনপেক্ষ, অব্যবচ্ছিন্ন অহং, এবং বুদ্ধিরূপ অহং যদিও স্বরূপতঃ অভিন্ন, তথাপি প্রকাশ্যে পরস্পরের বিরোধী। এই বিরোধের সমাধান করিতে হইলে, মনে করিতে হইবে, যে অহমের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তার স্থান একেবারেই নাই, আছে কেবল সক্রিয়তা, এবং যে অজ্ঞাত বাধাদ্বারা অহমের কার্য্য প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, তাহাও অহং-কর্ত্তৃক স্বতঃই ব্যবচ্ছিন্ন। কিন্তু এই বাধা, এই ব্যবচ্ছেদ যাহা

অহমেরই সৃষ্টি, তাহা অহংকেই বিদূরিত করিতে হইবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে অহমের সম্মুখে সৃষ্ট বাধা, কর্ম্মদ্বারা অহংকেই দূর করিতে হইবে। যে অনহং অহমের নিজের সৃষ্ট, তাহাকে আপনার মধ্যেই ফিরাইয়া আনিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ অহং এবং অনহমের এই ভেদকে বস্তুগত গণ্য না করিয়া, স্বকৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অহং যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে,[1] তেমনি ব্যবচ্ছিন্নও করিতেছে। এই জন্য অহমের সক্রিয়তার মধ্যে ফিকটে দুইটি বিভিন্নমুখী উপাদানের অস্তিত্ব আছে বলিয়াছেন; একটি কেন্দ্রানুগ,[2] অন্যটি কেন্দ্রাতিগ[3]। অহং যখন অসীমে আপনাকে বিস্তারিত করিবার জন্য উদ্যত, তখন কেন্দ্রাতিগ; যখন বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আপনাতে ফিরিয়া আসে তখন কেন্দ্রানুগ। অহমের বহির্গামী ক্রিয়া যখন বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আপনাতে ফিরিয়া আসে, তখনি, যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহাই বিভিন্ন বস্তুরূপে প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশ সৃজনশীল কল্পনার কার্য্য। অহংএর আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মব্যবচ্ছেদরূপ পরস্পর বিরোধী দুই ক্রিয়ার ফলস্বরূপ এই সকল মূর্ত্তি সৃষ্ট হয়। অহং আদিতে সংবিদহীন, অসীম, অনির্দ্দিষ্ট, অনির্দ্দেশ্য, শুদ্ধ ক্রিয়াময়, অনন্তে আপনাকে বিস্তৃত করিতে উন্মুখ। এই প্রচেষ্টার বাধা অহমের মধ্য হইতেই উদ্‌ভূত হইল; তাহার আত্মপ্রসার-চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার মধ্যে ফিরিয়া আসিল; সেই বাধা অহং হইতে ভিন্ন রূপে প্রতীত হইয়া অহমে সংবিদের সৃষ্টি করিল। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুরূপ অহমের নিজের ক্রিয়াই অহমের সমীপে উপস্থিত হইয়া নির্ব্বিশেষ অহংকে বিশিষ্ট সসীম সংবিদে পরিণত করিয়াছে।

অভিজ্ঞতার মধ্যে ক্যাণ্ট দ্বিবিধ উপাদান দেখিতে পাইয়াছিলেন: একটি মনের স্বরূপ হইতে উদ্‌ভূত, অপরটি প্রাপ্ত। দেশ ও কাল এবং "প্রকার"দিগের ধারণা মনের স্বরূপ হইতে উদ্‌ভূত। আর যে সকল সংবেদনের উপর এই সকল ধারণা প্রযুক্ত হইয়া তাহাদিগের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিয়া জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহারা প্রাপ্ত। প্রাপ্ত উপাদান কোথা হইতে মনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাণ্ট স্বগত বস্তুরূপ বাহ্য জগতের কল্পনা করিয়াছিলেন। মনোমধ্যস্থ সংবেদনের কারণরূপে তিনি বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ফিকটে দেখিতে পাইলেন, কারণ "প্রকার" কেবল প্রতিভাস-দিগের উপরই প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু স্ব-গত বস্তু যখন প্রাতিভাসিক জগতের বাহিরে অবস্থিত, তখন তাহাকে কারণরূপে গণ্য করা যায় না। বিশেষতঃ স্বগত বস্তু-সম্বন্ধে যখন কিছুই জানা নাই, তখন সেই অজ্ঞাত পদার্থদ্বারা পরিজ্ঞাত সংবেদনের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। এই জন্য তিনি স্বগত বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেন, এবং সংবেদন-দিগকেও বাহ্য কারণ-নিরপেক্ষ মনোজাত পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সংবেদন ও মনঃ বিভিন্নজাতীয় পদার্থ—পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী। মনের মধ্যে তাহাদের উৎপত্তি হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া ফিকটে দেখিতে পাইলেন, মনের মধ্যে তাহা হইতে ভিন্নধর্ম্মী পদার্থের আবির্ভাব হইতেই সংবিদের আবির্ভাব হয়। এই ভিন্নধর্ম্মী

[1] Posit [2] Centripetal [3] Centrifugal

পদার্থের আবির্ভাব না হইলে মনঃ নিজের অস্তিত্বই অবগত হইতে পারে না। নিজের অস্তিত্বের জ্ঞানের জন্য একটা আঘাতের প্রয়োজন; সেই আঘাত-প্রাপ্তির জন্য তথাকথিত "প্রাপ্ত" উপাদান মনের মধ্যে সৃষ্ট হয়। এই উপাদান-সৃষ্টির পূর্ব্বে "অহং" সংবিদ-হীন ছিল। তখন "অহং" ছিল অসীম অনবচ্ছিন্ন, অনির্দ্দিষ্ট ও অনির্দ্দেশ্য। কিন্তু তাহার মধ্যে সংবিদের সম্ভাবনা সুপ্ত ছিল। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্যই সেই অসীম অব্যক্ত বিশুদ্ধ ক্রিয়ারূপী অহং আপনার ক্রিয়ার বাধা নিজেই সৃষ্টি করিয়াছে। সেই বাধা না থাকিলে অহমের ক্রিয়া কোনও ফল প্রসব করিতে সক্ষম হইত না। তাই অহং নিজেই নিজের বাধা সৃষ্টি করিয়া সংবিদরূপে আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর করিয়াছে। এই বাধাদ্বারা প্রতিহত অসীম অহমের ক্রিয়া অহং হইতে স্বতন্ত্র অনহং রূপে অনবরত আবির্ভূত হইতেছে, এবং অসংখ্য অংশে বিভক্ত হইয়া অহমে ফিরিয়া আসিয়া আঘাতদ্বারা সংবিদের সৃষ্টি করিয়া সেই সংবিদের বিষয়-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রথম আঘাত আসিবার পূর্ব্বে অহমের মধ্যে কোনও বোধই ছিল না। প্রথম আঘাতের ফলে উৎপন্ন হয় একটা অস্পষ্ট বেদনার অনুভূতি, তাহার সহিত কোনও জ্ঞানই নাই। ইহাই শুদ্ধ সংবেদন। পরের আঘাতে অহং স্বকীয় অস্তিত্বের জ্ঞানলাভ করিয়া সংবেদনকে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া অনুভব করে। ইহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞানে সংবেদন দেশ ও কালে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেশ ও কালে ব্যবস্থিত হইবার পরে বুদ্ধির আবির্ভাব হইলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে সম্প্রত্যয়ের উদ্ভব হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞান ও সম্প্রত্যয়ের পরে আবির্ভূত হয় "বিচার"। এই বিচার-দ্বারা সংবিদের বিষয়সকল নির্দিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বশেষে আবির্ভূত হয় প্রজ্ঞা, যাহার ফলে অহং পরিপূর্ণ আত্ম-সংবিদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সসীম ব্যবচ্ছিন্ন আত্মসংবিদের উৎপাদনদ্বারাই অসীম অহমের আত্ম-বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। আত্ম-সংবিদের আবির্ভাবের জন্য যে অনহমের সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই অনহমের বাধা অতিক্রম করিয়া এক আদর্শের প্রতিষ্ঠাতেই এই বিকাশের চরম পরিণতি। অনহমের আবির্ভাবের ফলে অহমের মধ্যে বহু-সংখ্যক ব্যক্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল ব্যক্তির সমবায়ে সমাজ গঠিত হইয়াছে। সমাজের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণতা দান করিয়া আপনার পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধন করাই অসীম অহমের লক্ষ্য। অসীম অহমের ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত না হইলে মানবীয় চিন্তা অথবা তাহার বিষয়ের অস্তিত্বই থাকিতে পারিত না। জগৎ-সৃষ্টির জন্য জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। জগৎকে জয় করিয়া আপনার বিকাশ-লাভের জন্যই অহং জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। অনহমের বাধা জয় করিয়া স্বরাজ্য-লাভই সৃষ্টির লক্ষ্য। এই বাধা বিদূরিত করিবার জন্যই প্রজ্ঞার আবির্ভাব। প্রজ্ঞা দ্বিবিধ—উপপাদক এবং ব্যবহারিক। ব্যবহারিক প্রজ্ঞার সহায়তা করাই উপপাদক প্রজ্ঞার কার্য্য। অসীম অহমের স্বরূপ ক্রিয়া; ক্রিয়াদ্বারাই অহমের আত্মবিকাশ সাধিত হয়। এই আত্মবিকাশে সহায়তা করাই উপপাদক প্রজ্ঞার লক্ষ্য। আত্মবিকাশের জন্য সংবিদের প্রয়োজন হইয়াছিল; সংবিদের উদ্ভবের জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল অনহমের; কিন্তু অহমের সহিত অনহমের বিরোধ দূর করা যখন অসম্ভব হইল, তখন প্রজ্ঞা বলিল "যখন অনহং অহমের সহিত কিছুতেই মিলিত হইবে না, তখন অনহমের

ধ্বংস কর।" এই উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টাই ব্যবহারিক প্রজ্ঞার কার্য্য। কিন্তু অসীম অহং এবং সসীম ব্যবচ্ছিন্ন অহমের মধ্যে অসামঞ্জস্য সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই। অনহমের বাধা দূর করিবার জন্য এই প্রচেষ্টা অনন্ত কাল ধরিয়া চলিবে। সসীম অহমের সসীমত্ব দূরী করণের চেষ্টা চিরকাল চলিতে থাকিবে। ব্যবহারিক প্রজ্ঞা যে আদর্শ জগতের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, সে চেষ্টা অনহং-দ্বারা পদে পদে প্রতিহত হয়। কেননা যে বুদ্ধিদ্বারা অনহংকে ধ্বংস করিতে হইবে, তাহারই বিষয়রূপে অনহং অবস্থিত; অনহং-কর্ত্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন সেই বুদ্ধির অস্তিত্বই অনহমের উপর নির্ভরশীল। আমাদের সসীমত্বের বিস্তার-সাধন করা আমাদের কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহা চিরকাল আদর্শই থাকিবে, কখনও তাহা সম্পূর্ণ হইবে না। ইহাই সসীমের নিয়তি।

জ্ঞানের বিজ্ঞানে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, কর্ম্মনীতিতে ফিক্‌টে তাহাদের প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রমাণ না করিয়া তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। জগতে যে বহুসংখ্যক ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে, ইহাও তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মানুষের দেহের অস্তিত্বও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সসীম প্রজ্ঞাবান জীবের কর্ম্মের স্বাধীনতা না থাকিলে, তাহার আত্মবিকাশ কখন সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেই কর্ম্ম করা সম্ভবপর। জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে কোথায়? আবার একটি মাত্র প্রজ্ঞাবান্ জীবের কর্ম্মের স্বাধীনতারও কোনও অর্থ হয় না। কেননা অন্যান্য প্রজ্ঞাবান জীব না থাকিলে, যাহার কর্ম্মের স্বাধীনতা আছে, তিনি সে স্বাধীনতার অস্তিত্বই জানিতে পারিবেন না। বহুসংখ্যক স্বাধীন প্রজ্ঞাবান জীবের একত্র বাস করিতে হইলে, প্রত্যেকেরই তাহার স্বাধীনতার এমন ভাবে ব্যবহার করা উচিত, যে তদ্দারা অন্যের স্বাধীনতার খর্ব্বতা সাধিত না হয়। স্বাধীনতার ব্যবহার-সম্বন্ধে এই পারস্পরিক সম্বন্ধ অধিকারবিষয়ক সম্বন্ধ। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়মের প্রথম কথা—অন্য যে সকল মানুষের সহিত তোমার সংসর্গ আছে, তাহাদেরও তোমারই মত স্বাধীনতা আছে, ইহা মনে রাখিয়া তোমার স্বাধীনতা সংযত কর। প্রত্যেক "অহং"এর জন্য তাহার কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। এই কর্ম্মক্ষেত্রের সীমাদ্বারা প্রত্যেকের অধিকার ও দায়িত্ব নির্দ্ধারিত হয়। জগতের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নির্দ্ধারিত কর্ম্মক্ষেত্রের আরম্ভ তাহার দেহ হইতে। (এই দেহ হইতেই প্রত্যেক্যের কর্ম্ম সুরু হয়)। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সকলের পক্ষে সাধারণ। ইহা-দ্বারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান সম্ভাবিত হয়। কিন্তু এই জগতে কর্ম্ম করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, যে এই কর্ম্মক্ষেত্র সকলেরই, সকলেরই উদ্দেশ্য এক, এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতার ব্যবহার আবশ্যক। এই স্বাধীনতার ব্যবহার-কালে মনে করিতে হইবে, সকল মানুষই সমান স্বাধীন, এবং প্রত্যেকের স্বাধীনতা যাহাতে অন্য কাহারও স্বাধীনতার বাধাস্বরূপ না হয়, তাহা দেখিতে হইবে, এবং এই জন্য তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে।

ব্যবহার বিজ্ঞান*

"অধিকারকে" ফিক্‌টে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: প্রথমতঃ আদিম অধিকার—প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ববশতঃ যে অধিকার তাহার প্রাপ্য। এই অধিকার মানুষের আছে বলিয়াই প্রত্যেক মানুষ কাহারও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায়মাত্র নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিবার অধিকারই এই আদিম অধিকার। ইহা হইতে উদ্ভূত হয় (ক) ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও (খ) সম্পত্তির অধিকার। দ্বিতীয়তঃ—দমনমূলক অধিকার[১]। ব্যক্তি-স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য বাহ্য শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক। আমার আদিম অধিকার যে মানিবে না, তাহাকে বল-প্রয়োগে তাহা মানিতে বাধ্য করিবার জন্য শাস্তিমূলক আইনের প্রয়োজন। এই প্রকার আইন-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি আবশ্যক। কিন্তু এই প্রকার চুক্তি কেবল সকলের মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট রাষ্ট্র-গঠন-দ্বারাই সম্ভবপর হয়। সুতরাং মানুষে মানুষের মধ্যে সুবিচারের জন্য (৩) রাষ্ট্রীয় অধিকারের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় অধিকার বলিতে বুঝায় (ক) রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল নাগরিকের মধ্যে পরস্পরের অধিকার-রক্ষা করিবার জন্য স্বাধীন চুক্তি, (খ) আইন-প্রণয়নের জন্য ব্যবস্থাপক সভা, যাহাদ্বারা জনগণের সাধারণ ইচ্ছা আইনে বিধিবদ্ধ হয়, এবং (গ) ব্যবস্থাপক সভায় ব্যক্ত সাধারণের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসন-শক্তি। এক দিকে যুক্তিসম্মত রাষ্ট্রের আদর্শ; অন্যদিকে বাস্তব ত্রুটীপূর্ণ রাষ্ট্র; ফিক্‌টের মতে বাস্তব রাষ্ট্রকে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে আদর্শ রাষ্ট্র-সৃষ্টি সম্ভবপর নহে। ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রকে আদর্শের নিকটবর্ত্তী করাই রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য। রাষ্ট্রের গঠন যেরূপই হউক না কেন, যদি তাহা উন্নততর সংবিধানের পরিপন্থী না হয়, তাহা হইলে তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। যে গঠনতন্ত্রে পরিবর্ত্তন অসম্ভব, যাহা বর্ত্তমান গঠনকেই চিরস্থায়ী করিতে সচেষ্ট, তাহাই অযৌক্তিক।

ফিক্‌টের মতে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই এমন ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় পরিশ্রমদ্বারা জীবিকাউপার্জ্জনে সক্ষম হয়। প্রত্যেকের কর্ম্ম করিবার (জীবিকার জন্য) অধিকার সাম্যবাদের মূলমন্ত্র। ফিক্‌টের সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্রের কল্পনায় প্রত্যেক নাগরিকের জন্য কর্ম্মসংস্থান ও তাহার মজুরীব্যবস্থা করিবার জন্য উৎপাদন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ভার রাষ্ট্র নিজের হাতে গ্রহণ করিবে। পরিশ্রমের বিভাগ এবং সংগঠনদ্বারা রাষ্ট্রের সকলেই সম্পত্তির অধিকারী হইবে, এবং শ্রমিকেরা মিলিত হইয়া যতদূর সম্ভব কম পরিশ্রমে যতদূর সম্ভব অধিক অর্থ উৎপাদন করিবে।

* Jurisprudence

[১] Coercive Rights

কর্ম্মনীতি

"জ্ঞানের বিজ্ঞানের" অনপেক্ষ অহং অসংখ্য অংশে বিভক্ত হওয়ার ফলে মানব-সমাজের উদ্ভব হইয়াছে। অধিকার-তত্ত্বে ফিক্‌টে মানবসমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের অধিকারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাদের একত্ব-বিধান করাই সমস্যা। Sittenlehre গ্রন্থে ফিক্‌টে কর্ত্তব্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অধিকার এবং সুনীতি মূলতঃ বিভিন্ন। অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ পরিহার করিবার জন্য কোনও কর্ম্ম করিবার অথবা কোনও কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিবার যে বাহ্য আবশ্যকতা, তাহাই অধিকার। আর বাহ্য প্রবর্ত্তনার বশীভূত না হইয়া, কোনও কর্ম্ম করিবার অথবা কোনও কর্ম্ম হইতে বিরত হইবার যে আভ্যন্তরীণ আবশ্যকতা তাহাই সুনীতি। একজনের স্বাধীনতার প্রবৃত্তির সহিত অন্যের স্বাধীনতার প্রবৃত্তির বিরোধ হইতে অধিকারের উৎপত্তি। তেমনি একটি মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রবৃত্তির বিরোধ হইতে সুনীতির উৎপত্তি। প্রত্যেক প্রজ্ঞাবান জীবের মধ্যে স্বাধীনতা-লাভের প্রচেষ্টা আছে। এই স্বাধীনতা অন্য কিছুর প্রাপ্তির উপায় নহে। ইহাই চরম লক্ষ্য। ইহাই মানুষের কর্ম্মের মৌলিক বিশুদ্ধ উৎস। বাহ্য বস্তুর অধীনতা হইতে মুক্তিই ইহার লক্ষ্য। কিন্তু প্রজ্ঞাবান হইলেও প্রত্যেক মানুষই আপনাকে দেহবিশিষ্ট বলিয়া জানে। তাহার শুদ্ধ সত্তা ব্যতিরিক্ত তাহার মধ্যে একটি কর্ম্মের উৎসও আছে; সে উৎস তাহার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। এই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির লক্ষ্য স্বাধীনতা নহে, সুখভোগ। সুখের জন্যই সুখের সন্ধান। কর্ম্মের এই দুই উৎস পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রতীত হইলেও, তাহা অসীম অহমের ক্রিয়াপরতারই বিভিন্ন রূপ। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির ধ্বংসও সম্ভবপর নহে। ইহার ধ্বংস হইলে সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় সচেতন কর্ম্মই বিনষ্ট হয়। সুতরাং উভয় প্রবৃত্তিকে এমন ভাবে মিলিত করিতে হইবে, যে দৈহিক প্রবৃত্তি বিশুদ্ধ স্বাধীনতার প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হয়। উভয় তত্ত্বের এই মিলন ইন্দ্রিয়জগতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মেই সম্ভবপর। কিন্তু সেই কর্ম্ম ইন্দ্রিয়-জগতে অনুষ্ঠিত হইলেও, তাহার উদ্দেশ্য হইবে ইন্দ্রিয় জগতের বন্ধন হইতে মুক্তি। কেবল বাহ্য জগৎ বর্জ্জন করিয়া এ মুক্তি আসিবে না। কেবল সুখলাভের চেষ্টাদ্বারাও সমস্যার সমাধান হইবে না। বাহ্য জগতেই এমন ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, যে অহং ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করে, অনহমের উপর তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং প্রকৃতির উপর প্রজ্ঞার প্রভুত্ব ক্রমশঃ অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ অধিকতর স্বাধীনতা-লাভের উদ্দেশ্যে স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার প্রচেষ্টার মধ্যে উভয় তত্ত্ব মিশ্রিত আছে; এবং ইহাই নৈতিক প্রবর্ত্তনা। কিন্তু নৈতিক কর্ম্মের শেষ (লব্ধব্য ফল) অসীমে অবস্থিত। তাহা কখনও অধিগত হইতে পারিবে না, কেন না যতদিন "অহং" স্ব-সংবিদ সমন্বিত বুদ্ধিরূপে অভিব্যক্ত থাকিবে, ততদিন কখনই অবচ্ছেদ-মুক্ত হইতে পারিবে না। নৈতিক কর্ম্মের প্রকৃতি এই ভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে:—শ্রেণীবদ্ধ কর্ম্মরাজি, কর্ম্মরাজির একটির পর একটি এমন ভাবে ব্যবস্থিত, যে এক একটি সম্পন্ন করিয়া "অহং" সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকতর

নিকটবর্ত্তী হয়। এই কর্ম্ম শ্রেণীর কোনটিই অনাবশ্যক নহে। এই কর্ম্মশ্রেণীর অন্তর্গত কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকাই আমাদের নৈতিক কর্ত্তব্য। সুতরাং নৈতিক তত্ত্ব এই: অবিরত তোমার কর্ত্তব্য পালন কর। যাহাই কর, স্বাধীন ভাবে কর, যাহাতে স্বাধীন হইতে পার, সেই ভাবে কর, অন্ধ ভাবে না বুঝিয়া কোনও কর্ম্ম করিও না। কর্ত্তব্য বলিয়া কোনও কর্ম্ম যখন বুঝিবে, তখন তাহা করিবে। ফল আশা না করিয়া কর্ত্তব্যবোধেই কর্ত্তব্য করিবে। সমবেদনা, অনুকম্পা, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি স্বভাবতঃ পরার্থপর প্রবৃত্তির কোনও নৈতিক মূল্য নাই। কর্ত্তব্য-বোধে কৃত কর্ম্মের সহিত তাহাদের বিরোধ নাই, সত্য, কিন্তু তাহাদের সহিত ফল-কামনার সম্বন্ধ আছে। নৈতিক কর্ম্মের কোনও উদ্দেশ্য নাই। কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতেই নৈতিক কর্ম্ম কৃত হয়। নৈতিক প্রবর্ত্তনারও ফলোৎপদিকা শক্তি আছে; কিন্তু সেই উৎপাদ্য ফল কর্ম্মের লক্ষ্য নহে। তাহার একমাত্র কাম্য বন্ধনমুক্তি। স্বাধীন কর্ম্মদ্বারাই মানুষ সম্পূর্ণ স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে। কর্ত্তব্য-বোধে কৃত কর্ম্মেই প্রজ্ঞাবান জীব স্বাধীন সত্তারূপে প্রকাশিত হয়। "তোমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অনুসারে কর্ম্ম কর, অথবা তোমার ধর্ম্ম-বিবেকের আদেশ পালন কর"—ইহাই নৈতিক কর্ম্মের ভিত্তি। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি যে ঠিক তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ আমাদের অন্তরের অনুভূতি। এই সহজাত অনুভূতিদ্বারা প্রতারিত হইবার ভয় নাই। কেননা যেখানে বিশুদ্ধ অহমের সহিত আমাদের ব্যক্তিত্বের অহমের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, সেখানে ভিন্ন এই অনুভূতি কখনও হয় না।

ফিক্‌টের ধর্ম্মমত

"জগতের ঐশ্বরিক শাসনে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি", "সাধারণের নিকট আবেদন" এবং "মানুষের গন্তব্য স্থান", এই তিন প্রবন্ধে ফিক্‌টের ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যা আছে। প্রথম প্রবন্ধের মর্ম্ম পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে জগতের নৈতিক ব্যবস্থাকে ফিক্‌টে ঈশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন। কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সম্পাদন-দ্বারা জগতের এই ঐশ্বরিক অংশ আমাদের মনে জীবন্ত হইয়া উঠে।

যে ব্যবস্থায় জগৎ পরিচালিত হইতেছে, তাহাই এই নৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অর্থহীন নহে। ইন্দ্রিয়-জগতের দৃশ্যমান ব্যবস্থার উপরে আর এক ব্যবস্থা আছে, যাহার জন্য ইন্দ্রিয়-জগতেই আমাদের নৈতিক উদ্দেশ্য সফলতা-লাভে সক্ষম হয়। ইন্দ্রিয়-জগৎ আমাদের স্বাধীনতার পথে বাধা হইলেও, সেই বাধা অতিক্রম করিয়া তাহা-দ্বারাই আমাদের নৈতিক লক্ষ্যের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর। এই ব্যবস্থার প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে ধর্ম্মবিবেকের উদ্‌ভব হইয়াছে, এবং তাহাদ্বারা মানুষের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইতেছে। এই ব্যবস্থায় মতের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমশঃ আনন্দলাভ সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়াই, ইহা নৈতিক ব্যবস্থা নামে অভিহিত। ইহাকেই ফিক্‌টে ঈশ্বর বলিয়াছেন, এবং ইহা ব্যতীত অন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। ফিক্‌টে ঈশ্বরকে 'সত্তা' বলিতে অনিচ্ছুক। সত্তা বলিতে জ্ঞানের বিষয় বুঝায়; সে বিষয় জ্ঞাতা হইতে স্বতন্ত্র।

যে অসঙ্গকে সত্তা-রূপে গণ্য করে, সে আপনাকে অসঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র মনে করে। কিন্তু আপনার বাহিরে অনুসন্ধান করিলে অসঙ্গকে পাওয়া যায় না। তাহাকে নিজের মধ্যে নিজের জীবনে পাইতে হয়। ঈশ্বরকে যেমন সত্তারূপে ধারণা করা যায় না, দ্রব্য-রূপেও তেমনি তাঁহার ধারণা করা সম্ভবপর হয় না; কেন না দ্রব্যরূপে ধারণা করিতে হইলে, তাঁহাকে দেশে বিস্তৃত বলিতে হয়। সে হয় পৌত্তলিকতা। ঈশ্বরে ব্যক্তিত্বের আরোপ করিলে, তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। সেই জন্য জগতের নৈতিক ব্যবস্থাই ঈশ্বর। শৈত্যের অনুভূতিকে 'শীত' নাম দিয়া যেমন তাহাকে একটি স্বতন্ত্রবস্তুরূপে আমরা কল্পনা করি, তেমনি এই জাগতিক ব্যবস্থাকেও আমাদের সসীম বুদ্ধি একটি সত্তাবান পদার্থ বলিয়া কল্পনা করে। অস্তিত্বের প্রত্যয়ের সহিত সংবেদনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কোন পদার্থের অস্তিত্ব আছে, বলিলে তাহার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপের আমরা কল্পনা করি। ঈশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গেও আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপের কল্পনা করি। সেই জন্যই দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে না। ধর্ম্মীয় সংবেদন কিরূপে উদ্ভূত হয়, তাহাই দর্শনের আলোচ্য। জগতে যে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে "প্রজ্ঞা-সম্মত ইচ্ছা" বলা যায়। সেই ইচ্ছার সহিত ব্যক্তির ইচ্ছার সমন্বয়-সাধন ব্যক্তির লক্ষ্য। এই জাগতিক নিয়ম অথবা "প্রজ্ঞা-সম্মত ইচ্ছা" আমাদিগকে জানাইয়া দেয়, যে আমাদের কর্ত্তব্য-সম্পাদনের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রয়োজন। সেই জন্যই এই ইচ্ছা আমাদের মধ্যেই এই জগতের সৃষ্টি করে। এই অর্থে ইহাকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায়। জগৎ নৈতিক জগতেরই দৃশ্যমান রূপ। আমাদের জীবন এই নৈতিক ব্যবস্থারই জীবন। সেই জন্য ইহা চিরস্থায়ী। প্রজ্ঞার নিয়মানুসারে জীবন পরিচালিত করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত না হইতে পারে। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাই আমাদিকে অমরতা দান করে।

ফিক্‌টের Destination of Man (মানবের গন্তব্য) তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম "সংশয়", দ্বিতীয় খণ্ডের নাম "জ্ঞান", তৃতীয় খণ্ডের নাম "বিশ্বাস"। সাধারণ সংবিদ জগতের একটা অংশরূপে কার্য্য-কারণের নিয়মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই সংবিদে যেমন স্বাধীনতার অনুভূতি আছে, তেমনি তাহা আপনাকে বিষয়-কর্ত্তৃক প্রতিবদ্ধও দেখিতে পায়। প্রথম খণ্ডে এই দ্বন্দ্বের বর্ণনা আছে। "জ্ঞান" খণ্ডে ফিক্‌টে দেখাইয়াছেন, যে বিষয়রূপে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহা অহমেরই সৃষ্ট, তাহা প্রতিভাসমাত্র, তাহা স্বপ্ন-জগৎ; সেই জগতে সত্য পদার্থের আমরা সাক্ষাৎ পাই না; যাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহা সত্য পদার্থের নকলমাত্র। "বিশ্বাস" খণ্ডে ফিক্‌টে দেখাইয়াছেন, যে বিশ্বাসদ্বারা আমরা সত্য পদার্থে উপনীত হই। এই খণ্ডে ফিক্‌টে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই:

আমি দুই জগতের অধিবাসী, একটি আত্মিক জগৎ, অন্যটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। প্রথম জগৎ আমার "ইচ্ছা"র ক্রিয়া-ক্ষেত্র, দ্বিতীয় জগৎ আমার কর্ম্মভূমি। "ইচ্ছা"ই প্রজ্ঞার জীবন্ত তত্ত্ব, ইচ্ছাই প্রজ্ঞা, ক্রিয়াপরতাই প্রজ্ঞার ধর্ম্ম। অসীম প্রজ্ঞা কেবল এই আত্মিক জগতেই অধিষ্ঠিত। সসীম প্রজ্ঞা আত্মিক জগতের বহু অধিবাসীদের মধ্যে

একটি মাত্র। আত্মিক জগৎ এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ, উভয় জগতেই তাহার বাস। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতে তাহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে কার্য্য করিতে হয়।

আমি যখন প্রজ্ঞার নিয়ম পালন করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করি, তখন আমি অমর ও অবিনশ্বর হই। আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সত্তা ভবিষ্যতে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে, কিন্তু সে সকল রূপ আমার সত্য জীবন নহে। আমার ইচ্ছাই আমার সত্য জীবন এবং অমরতার উৎস। এই ইচ্ছাই আমার নৈতিক উৎকর্ষের আধার।

নৈতিক নিয়ম-অনুসারে আমাকে ইচ্ছা করিতে হইবে। ইচ্ছারূপ ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোনও ফল সেই ইচ্ছা হইতে উদ্‌ভূত হইবে কি না, তাহা চিন্তা না করিয়াই আমাকে নৈতিক নিয়মানুসারে ইচ্ছা করিতে হইবে। আমার ইচ্ছাদ্বারা আমার রসনা, আমার হস্ত এবং পদ কিরূপে চালিত হইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। দৈহিক অঙ্গের উপর বুদ্ধির প্রভাব কিরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা কল্পনা করা অসম্ভব। জড়দ্বারাই জড়ের গতির ব্যাখ্যা করা যায়; বুদ্ধিদ্বারা নহে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতে কোনও ফল উৎপন্ন করা আমার ইচ্ছার উদ্দেশ্য হইবে না। নৈতিক নিয়মানুসারে ইচ্ছা করাই আমার ইচ্ছার উদ্দেশ্য। Categorical Imperativeএর আদেশ-অনুযায়ী আমি ইচ্ছা করিব, সেই ইচ্ছার ফল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে কি হইবে না হইবে, তাহা দেখিব না। যাহা ইচ্ছা করিব, যাহা চাহিব, তাহা ফলবতী করিবার জন্য আমার কোনও বাহ্য যন্ত্র, কোনও সাধনের প্রয়োজন নাই। আমি কেবল ইচ্ছা করিব। এই ইচ্ছা সেই আত্মিক জগতে ফল প্রসব করিবে।

আমার সংবিদের মধ্যে দেখিতে পাই, নৈতিক নিয়মানুসারে ইচ্ছা করা আমার ঋণ, আমার নিকট এই দাবি আমি সংবিদের মধ্যে প্রাপ্ত হই। অন্য কোন উপায়ে এই সত্য অবগত হইবার উপায় নাই। আমার সংবিদের মধ্যেই এই সত্যের সাক্ষাৎ পাই, যে নৈতিক নিয়ম যাহা বলে, আমাকে তাহাই ইচ্ছা করিতে হইবে। এই ইচ্ছায় কোনও ফলের অভিসন্ধি থাকিবে না। নৈতিক নিয়মে ইহা বলে বলিয়াই, ইহা ইচ্ছা করিতে হইবে। এই সত্য আমরা প্রথমে উপলব্ধি করি; পরে বুঝিতে পারি, যে আমার এই ঋণ, আমার উপর এই দাবি, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং অন্য যাহা কিছু যুক্তি-সঙ্গত, এই সত্য তাহার ভিত্তি। আমার অন্তরের অনুভূতিই এই বিবেকের ভিত্তি। এই দুই ধারণা হইতে আমি এক অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রাপ্ত হই। অনেকে বলেন, যে মানুষের পক্ষে যাহা ধর্ম্ম (সুকৃতি,) তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কোনও বিশিষ্ট বাহ্য বিষয়। এই উদ্দেশ্য যদি সাধ্য হয়, যদি তাহা সিদ্ধ করিবার সম্ভাবনা-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ না থাকে, তবেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা হইতে পারে, এবং তাহা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং প্রজ্ঞার মধ্যে তাহার ক্রিয়ার তত্ত্ব এবং "কষ্টি" বর্ত্তমান নাই। এই কষ্টি বাহিরে অবস্থিত। ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য এই জগতেই সিদ্ধ হইতে পারিত, আমাদের পার্থিব জীবনেই আমাদের স্বভাবের পূর্ণ বিকাশলাভ সম্ভবপর হইত। তাহা হইলে

বর্ত্তমান জীবনের পরে কোনও কিছু আশা করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিত না।

"যে বৃত্তি[1] আমাদিগকে অনন্ত জীবনের সন্ধান দেয়, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সকল বিষয় বর্জ্জনদ্বারা—যে নিয়ম কেবল আমাদের ইচ্ছাকে স্বীকার করে, আমাদের কর্ম্মকে স্বীকার করে না, তাহার অনুযায়ী হইয়া সকল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয়-বর্জ্জন-দ্বারা। ইহাই আমাদের পক্ষে একমাত্র প্রজ্ঞা-সম্মত কার্য্য, এই বিশ্বাসে পার্থিব বিষয়ের এই রূপ বিসর্জ্জন-দ্বারাই অবিনশ্বর চিরস্থায়ী পদার্থে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে আমাদিগকে সংসারের নিকট মরণ অবলম্বন করিয়া পুনর্জীবন লাভ করিতে হইবে।

"আমার নৈতিক নিয়ম-চালিত ইচ্ছা স্বতঃই যে ফল প্রসব করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ত্তব্য-প্রণোদিত ইচ্ছার প্রত্যেক ব্যবচ্ছেদই (প্রত্যেক ইচ্ছা করাই) অন্য এক জগতে ফল উৎপাদন করিবে। সেই জগতের সহিত আমার পরিচয় নাই, তাহার ব্যাপার বুঝিতে আমি অক্ষম। কিন্তু সেখানে আমার এই ইচ্ছা যে কার্য্যকরী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিরূপে এই ইচ্ছা ফল উৎপাদন করে, তাহা জানি না, কিন্তু ইহা জানি, যে ফল উৎপন্ন হইবেই। ইহা আত্মিক জগতের নিয়ম। এই নিয়ম কোনও নিশ্চেষ্ট জীবনহীন পদার্থ নহে। আত্মিক জগতের নিয়ম নিজেই একটি "ইচ্ছা"—স্বয়ংক্রিয় প্রজ্ঞা[2]। এই ইচ্ছার ক্রিয়ার জন্য কোনও যন্ত্র, কোনও সাধনের প্রয়োজন নাই। এই "ইচ্ছা" কর্ম্ম ও তাহার ফল উভয়ই। তাহার পক্ষে ইচ্ছা করা ও ইচ্ছা সম্পাদন করা, আদেশ করা ও আদেশ পালন করা, একই; ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ, কিছুরই অপেক্ষা ইহার নাই। এই ইচ্ছা নিজেই নিজের নিয়ম[3]। ইহা অপরিসীম ও সনাতন। জড় জগতের নিয়মের উপর যেমন নির্ভয়ে নির্ভর করা যায়, এই ইচ্ছার উপরও তেমনি নির্ভর করা যায়। সসীম জীবের নৈতিক ইচ্ছা[4] এই অসীম ইচ্ছার উপর ক্রিয়া করিতে পারে, অন্য কিছুই পারে না। যাবতীয় সসীম প্রজ্ঞাবান জীবের সহিত তাহার আত্মিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তিনি নিজে আত্মিক জগতের সংযোগসূত্র। যখন বিশুদ্ধ ভাবে এক মনে যাহা আমার কর্ত্তব্য, তাহাই আমি ইচ্ছা করি, তখন এই অসীম ইচ্ছা ইচ্ছা করেন, যে আত্মিক জগতে আমার ইচ্ছা সফল হউক। প্রত্যেক জীবের নৈতিক সংকল্প তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, এবং তাঁহাকে বিচলিত করে—তাঁহার স্বরূপের নিয়মানুসারেই তাঁহাকে বিচলিত করে[5]। আমার ইচ্ছা যে ফলপ্রসূ হয়, তাহার কারণ, আমার ইচ্ছা সেই অসীম ইচ্ছা জানিতে পারেন; আমার ইচ্ছার ফল প্রথমে তাঁহার উপর উৎপন্ন হয়, পরে তাঁহার মধ্যেমেই আত্মিক সমগ্র জগৎ আমার ইচ্ছা-কর্তৃক প্রভাবিত হয়।

"জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় আমার বিবেক আমার কর্ত্তব্য উপদেশ করে। আমার বিবেকের ভিতর দিয়াই সেই অসীম ইচ্ছার প্রভাব আমার উপর পতিত হয়। সেই অসীম ইচ্ছা নিশ্চয়ই সেই আত্মিক জগৎ। আমি সেই জগতের একটি অংশমাত্র। আমি

---

[1] Faculty [2] Self Active Reason [3] Law
[4] Moral Will [5] Moves him

তাঁহার সত্তার অন্তর্গত। আমার বিবেকের বাণী এবং আমা-কর্ত্তৃক সেই বাণীর অনুসরণ—এই দুইটি ভিন্ন। আমার মধ্যে অবিনশ্বর আর কিছুই নাই। বিবেকের বাণীদ্বারা আত্মিক জগৎ আমাতে অবতীর্ণ হয়, এবং আমাকে তাহার অধিবাসী বলিয়া আলিঙ্গন করে। সেই বাণীর অনুসরণ করিয়া আমি আপনাকে সেই জগতে উন্নীত করি। সেই অসীম ইচ্ছা এই আত্মিক জগৎ এবং আমার মধ্যস্থ সেতু। তাঁহা হইতে আমি ও আত্মিক জগৎ উভয়ই উদ্ভূত। তিনিই তাঁহার সহিত আমার সংযোগ-বিধান করেন; অন্যান্য সসীম জীবের সহিত আমার সংযোগ-বিধাতাও তিনি। এই অদৃশ্য জগৎ ব্যক্তিত্ব-প্রাপ্ত বহু ইচ্ছার জগৎ। এই জগতে বহু স্বাধীন ইচ্ছা সম্মিলিত আছে; এই জগতে বহু ইচ্ছার পরস্পরের উপর ক্রিয়া সম্ভবপর! কিন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতে এই পারস্পরিক ক্রিয়া সম্ভবপর নহে। আধ্যাত্মিক জগতে অসীম ইচ্ছার মধ্যে আমরা সম্মিলিত বলিয়াই পরস্পরের অস্তিত্ব আমরা অবগত হই; তাহা না হইলে কেহই অন্য কাহারও অস্তিত্বের বিষয় অবগত হইতে পারিত না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইলেও, অসীম ইচ্ছার মধ্যে আমরা মিলিত হই। সেই জন্যই আমরা পরস্পরকে জানিতে পারি।

"যে বাহ্য জগতের সহিত আমরা পরিচিত, তাহা সেই অসীম সনাতন ইচ্ছা-কর্ত্তৃক সৃষ্ট। সনাতন জড়ীয় উপাদানদ্বারা তিনি এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা শূন্য হইতে তিনি এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা এই বিষয়ে তর্ক করেন, তাঁহারা জগতের স্বরূপ কি, তাহা জানেন না। সেই অসীম ইচ্ছার স্বরূপ-সম্বন্ধেও কিছু জানেন না। প্রজ্ঞাই একমাত্র সত্য পদার্থ। অসীম প্রজ্ঞা আপনাতেই বর্ত্তমান, সসীম প্রজ্ঞা অসীম প্রজ্ঞার মধ্যে অবস্থিত। যে জগৎ সেই অসীম প্রজ্ঞা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমাদের মনের মধ্যেই অবস্থিত। আমাদের মনের মধ্যে তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার ফলে আমরা জগৎকে প্রকাশিত করি। যে শক্তিদ্বারা আমরা জগৎকে প্রকাশিত করি, তাহাও তাঁহারই সৃষ্ট। সে শক্তি আমাদের বিবেকের বাণী, চিন্তার নিয়ম, এবং ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি[১]। তিনিই আমাদের মনে এই জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, এবং কর্ত্তব্যের আহ্বানদ্বারা আমাদের ইচ্ছার মাধ্যমেই তিনি জগতের উপর ক্রিয়া করিতেছেন। তিনিই আমাদের মনের মধ্যে এই জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়া তদ্বারা আমাদের সসীম সত্তাকেও ধারণ করিয়া আছেন। তিনি আমাদের প্রত্যেক অবস্থা হইতে তাহার পরবর্ত্তী অবস্থা বিকাশিত করিতেছেন। এই জীবনের পরবর্ত্তী কার্য্যের জন্য যখন তিনি আমাদিগকে উপযুক্ত করিয়া তুলিবেন, তখন যাহাকে "মৃত্যু" নামে অভিহিত করা হয়, তাহাদ্বারা তিনি আমাদের বর্ত্তমান জীবনের বিনাশ-সাধন করিবেন, এবং আমাদের পুণ্য কর্ম্মের ফল-স্বরূপ এক নূতন জীবনে তিনি আমাদিগকে উন্নীত করিবেন। আমাদের সমগ্র জীবন তাঁহারই জীবন, আমরা তাঁহার হস্তের মধ্যে বাস করি; কেহই আমাদিগকে সেস্থান হইতে বিদূরিত করিতে পারে না। তিনি সনাতন, সেইজন্য আমরাও সনাতন।"

---

[১] Sensible Intuition

ফিক্‌টে বলিতেছেন, "হে, বিরাট জীবন্ত ইচ্ছা, তোমার কোনও নাম নাই। চিন্তা তোমার ধারণা করিতে পারে না। আমার আত্মা আমি তোমার নিকট উন্নীত করিতে পারি, কেন না, আমি তোমা হইতে বিভক্ত নহি। তোমার কণ্ঠস্বর আমার মধ্যে ধ্বনিত হয়, আমার কণ্ঠস্বর তোমার মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমার সমস্ত চিন্তা,—যদি তাহা সত্য এবং কল্যাণকর হয়—তোমার মধ্যেও অবস্থিত। হে দুর্বোধ্য, যে জগতে আমার বাস, সেই জগৎ ও আমি উভয়ই তোমার মধ্যে আমার বোধগম্য হয়। তখন আমার অস্তিত্বের সকল রহস্য আমার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং আমার অন্তরে পরিপূর্ণ শান্তি আবির্ভূত হয়।

"যাহারা শিশুর মত সরল ও ভক্তিমান, তাহারাই তোমাকে জানিতে পারে। তুমি অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশ দেখিতে পাও। তুমি সমস্ত চিন্তার সদা বর্ত্তমান সাক্ষী। তুমি পিতা, মঙ্গলের জন্য তুমি সকল নিয়ন্ত্রিত কর। তুমি সকলের মঙ্গল ইচ্ছা কর। তোমার নিকট জীব অসংকোচে আত্মসমর্পণ করে, এবং বলে "আমাকে লইয়া তোমার যাহা ইচ্ছা, কর। আমি জানি, তুমি যাহা করিবে, তাহা মঙ্গলকর।" কৌতূহলী বুদ্ধি তোমার বিষয় শুনিয়াছে, কিন্তু তোমাকে দেখিতে পায় নাই। সে প্রকৃতি হইতে তোমার জ্ঞান লাভ করিতে চায়। তোমার যে মূর্ত্তি সে আমাদের নিকট উপস্থিত করে, তাহা কুৎসিৎ ও সঙ্গতিহীন। বুদ্ধিমান লোকে তাহা দেখিয়া হাস্য করে, এবং জ্ঞানী ও সৎ লোক তাহা ঘৃণা করে। আমি তোমার সম্মুখে আমার মুখ আচ্ছাদিত করি। তোমার স্বরূপ কি, তুমি কেমন, তোমার নিজের নিকট তুমি কিরূপ প্রতিভাত হও, তাহা আমি জানি না। সহস্র সহস্র আত্মিক জীবন যাপন করিবার পরেও, বর্ত্তমান পার্থিব জীবনে তোমাকে যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহা হইতে অধিক বুঝিতে পারিব না। মানুষের সহিত তোমার প্রভেদ পরিমাণ-গত নহে, প্রকৃতি-গত। মানুষ উন্নতি-পথে যতই অগ্রসর হয়, ততই তোমাকে মহৎ হইতে মহত্তর মানুষ-রূপে ধারণা করে, কিন্তু কখনও অনন্ত ঈশ্বররূপে ধারণা করিতে পারে না। আমার ধারণাও এইরূপ ক্রমোন্নতিশীল কিন্তু তোমাতে এই ধারণার আরোপ করি কিরূপে? ব্যক্তিত্বের প্রত্যয়ের সহিত সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতার ধারণা মিশ্রিত। সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা আমি কিরূপে তোমাতে আরোপ করিব?

"আমার সসীম প্রকৃতির অসম্পূর্ণতার জন্য যাহা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাহা করিতে আমি চেষ্টা করিব না। তাহা করা বৃথা। তুমি কেমন, তাহা আমি জানিতে না পারিলেও, আমার যেরূপ হওয়া উচিত, আমি যেন তাহা হইতে পারি। মরণধর্ম্মী আমি ও অন্যান্য মরণধর্ম্মীদিগের সহিত তোমার যে সম্বন্ধ, তাহা আমার দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত। আমার নিজের অস্তিত্বের জ্ঞান হইতেও সে জ্ঞান স্পষ্টতর। তুমি আমার মধ্যে আমার কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উদ্বোধন করিতেছে, প্রজ্ঞাবান জীবের জগতে আমার করণীয় কার্য্যের জ্ঞান দান করিতেছ। কিরূপে তুমি আমাকে এই জ্ঞান দিতেছ, আমি জানি না। জানিবার প্রয়োজনও নাই। আমি কি চিন্তা করি এবং কি ইচ্ছা করি, তাহা তুমি জান। কিরূপে

তুমি জানিতে পার, কোন্ ক্রিয়াদ্বারা তুমি উক্ত জ্ঞান উৎপাদন কর, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তুমি ইচ্ছা কর, যে আমার বশ্যতা অনন্তকালস্থায়ী ফল উৎপাদন করুক, কিন্তু তোমার ইচ্ছার কার্য্য আমি বুঝিতে পারি না। এইমাত্র জানি, যে সে কার্য্য আমার কার্য্যের মত নহে। তোমার ইচ্ছাই তোমার কর্ম্ম। কিন্তু তোমার কর্ম্মপ্রণালী আমার কর্ম্মপ্রণালীর মত নহে। কিরূপ তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তুমি আছ, তুমি জীবন্ত, তুমি জান, তুমি ইচ্ছা কর, তুমি কর্ম্ম কর, সসীম প্রজ্ঞার নিকট তুমি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। কিন্তু সত্তা-সম্বন্ধে আমার যে ধারণা বর্ত্তমানে আছে এবং চিরকাল থাকিবে, তুমি তাহা নহ।

"সসীম আমার সঙ্গে তোমার এই সম্বন্ধের চিন্তায় আমি শান্ত নির্বৃতিতে অবস্থান করি। আমার কর্ত্তব্য কি, ইহাই মাত্র আমি অব্যবহিত ভাবে জানি। স্বাধীন ভাবে আনন্দের সহিত আমি আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব; কেন না ইহা তোমারই আদেশ। আত্মিক জগতের ব্যবস্থার মধ্যে ইহাই আমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। যে শক্তির বলে আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব, তাহা তোমারই। জগতের সকল ঘটনার মধ্যে আমি শান্ত থাকি, কেননা সে সকল ঘটনা তোমারই জগতের। যখন তুমি আছ, এবং তোমার জীবনের দিকে আমি চাহিতে পারি, তখন কিছুতেই আমাকে হতবুদ্ধি, বিস্মিত এবং নিরাশ করিতে পারে না! হে অনন্ত, তোমার মধ্যে এবং তোমার মাধ্যমে আমার বর্ত্তমান জগৎ নূতন আলোকে আমার নিকট প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি অন্তর্হিত হয়; তুমি—কেবল তুমি—থাক। মানব-সমাজে সর্ব্বব্যাপী শান্তি এবং প্রকৃতির উপর অপরিসীম প্রভুত্ব মানুষ স্বকীয় চেষ্টায় উৎপাদন করিবে, ইহাই বর্ত্তমান জগতের উদ্দেশ্য। শান্তি ও প্রভুত্ব তাহাদের নিজের জন্য কাম্য নহে—তাহাদের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মানবীয় প্রচেষ্টাই কাম্য। প্রত্যেককে এই জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, সকলের সমবেত চেষ্টায় এই শান্তি ও প্রভুত্ব উৎপন্ন করিতে হইবে, ইহাই উদ্দেশ্য। স্বকীয় ইচ্ছা ব্যতীত ব্যক্তির পক্ষে নূতন ও উৎকৃষ্টতর কিছু প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর হয় না। কর্ত্তব্য-পালনদ্বারা সকলের মঙ্গল-সাধন ব্যতীত সমাজের পক্ষেও নূতন ও উৎকৃষ্টতর কিছু সম্ভবপর নহে। অধিকাংশের ইচ্ছার সহিত সংগতি না থাকায় ব্যক্তির সদিচ্ছা অনেক সময় বৃথা হইয়া যায়। যখন এইরূপ হয়, তখন ব্যক্তির সদিচ্ছার ফল কেবল ভবিষ্যৎ জগতেই প্রাপ্তব্য। মানুষের অন্তরস্থ রিপু ও পাপের ফলেও অনেক সময় মঙ্গল উৎপন্ন হয়। অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হয় না, ইহা সত্য, কিন্তু পাপের সহিত পাপের সংঘর্ষে তাহার কার্য্যকারিতার হ্রাস হয়, এবং অবশেষে পাপের অত্যধিক প্রাবল্য হইলে, তাহারা পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কাপুরুষতা, নীচতা এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস অত্যাচারের পথ সুগম করিয়া দেয়; তাহা না হইলে অত্যাচারী কখনও জগতে প্রভুত্ব-লাভ করিতে পারিত না। যতদিন পর্য্যন্ত কাপুরুষতা ও দাসসুলভ মনোভাব অত্যাচারকর্ত্তৃক বিনষ্ট না হয়, ততদিন অত্যাচার বাড়িতেই থাকিবে। হতাশা হইতে যখন অবশেষে সাহসের উদ্ভব হইবে, তখনই অত্যাচার বিদূরিত হইবে।

তখন পরস্পর বিরোধী দুই পাপ পরস্পরকে বিনাশ করিবে, এবং তাহাদের বিরোধ হইতে চিরস্থায়ী স্বাধীনতা জন্মলাভ করিবে।

"যাহাকে আমরা অমঙ্গল বলি, তাহা স্বাধীনতার অপব্যবহারেরই ফল। অসীম ইচ্ছার সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহার ফলেই অমঙ্গলের উৎপত্তি। এই অমঙ্গলের প্রতি-বিধানের জন্যই আমাদের উপর অসীম ইচ্ছা-কর্তৃক কর্তব্য স্থাপিত হয়। এই কর্তব্যের ধারণা হইতেই অমঙ্গলের অনুভূতি। সমগ্র মানব-জাতির নৈতিক উন্নতির জন্য যে সনাতন ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থা-অনুসারে আমাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে। সেই ব্যবস্থার মধ্যে যদি এই কর্তব্যের স্থান না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের উপর কর্তব্যভার ন্যস্ত হইত না। অমঙ্গলের প্রতিবিধান করাই কর্তব্যের লক্ষ্য। সুতরাং আমাদের উপর কর্তব্য ন্যস্ত না হইলে, অমঙ্গলও থাকিত না। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাই যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর। একমাত্র জগৎই কেবল সম্ভবপর, সে জগৎ সম্পূর্ণ কল্যাণময়। জগতে যাহাই সংঘটিত হয়, তাহা মানুষের উন্নতির জন্য কল্পিত। যখন আমরা বলি "প্রকৃতি অভাবের ভিতর দিয়া মানুষকে পরিশ্রমী করিয়া তোলে, অশান্তির ভিতর দিয়া ন্যায়সংগত শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব করায়, বিরামহীন যুদ্ধের ভিতর দিয়া পৃথিবীতে অনবচ্ছিন্ন শান্তি আনয়ন করে," তখন আমরা জগতের এই উন্নততর ব্যবস্থাকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করি। হে অনন্ত এক, তোমার ইচ্ছাই এই উন্নততর প্রকৃতি। এই জীবন পরীক্ষাক্ষেত্র-মাত্র, ইহা শিক্ষা-ক্ষেত্র।

"মৃত্যু প্রাণের ক্রমমাত্র। মৃত্যুতে প্রাণের উন্নততর অবস্থা আবির্ভূত হয়। প্রকৃতির মধ্যে ধ্বংসকর কোনও তত্ত্ব নাই। বিশুদ্ধ অনাবৃত প্রাণই প্রকৃতি। মৃত্যু ধ্বংস করে না। অধিকতর জীবন্ত প্রাণ, যাহা পূর্ববর্ত্তী প্রাণের নিম্নে লুকায়িত থাকে, তাহাই অধিকতর বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হয়। মহত্তর ও উপযুক্ততর রূপ-ধারণের জন্য প্রাণের নিজের সহিত যে সংঘর্ষ, তাহাই মৃত্যু ও জন্ম। প্রকৃতি হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং প্রকৃতিকর্তৃক প্রাণের ধ্বংস হয়, ইহা কল্পনা করা অসম্ভব। আমার জন্যই প্রকৃতি, প্রকৃতির জন্য আমি নাই।

"আমার প্রাকৃতিক জীবন—অদৃশ্য জীবনের এই বাহ্য প্রকাশকে—প্রকৃতি আপনাকে বিনাশ না করিয়া বিনাশ করিতে পারে না। কেননা আমার অস্তিত্ব হইতেই প্রকৃতির অস্তিত্ব; আমার অস্তিত্ব না থাকিলে তাহারও অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং আমার ধ্বংস করিয়া আমাকে তাহার পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। আমার উন্নততর জীবনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বর্তমান জীবন অন্তর্হিত হইতে পারে। মরণশীল জীব যাহাকে মৃত্যু বলে, তাহা এই দ্বিতীয় জীবনের আবির্ভাব মাত্র। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ যদি না মরিত, তাহা হইলে নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবীর জন্য আশা করিবার কোনও কারণই পাওয়া যাইত না। প্রজ্ঞাকে প্রকাশিত ও রক্ষা করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা হইলে এই পার্থিব জীবনেই পূর্ণ হইত। নূতন পরিবেশের মধ্যে নূতন জীবন-প্রাপ্তির উপায়ই মৃত্যু।"

ফিক্‌টের উপরোক্ত মতকে কেহ কেহ "নৈতিক সর্বেশ্বরবাদ" বলিয়াছেন। এই

মতের সহিত স্পিনোজা ও মালেব্র াঁর মতের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু স্পিনোজার ঈশ্বরে ইচ্ছা নাই। তাঁহাতে স্বাধীনতা এবং উদ্দেশ্যের কোনও স্থানই নাই। কিন্তু Destination of Man গ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বর "অনন্ত ইচ্ছা"। তিনি কেবল উদ্দেশ্যের জগৎ, কেবল স্বাধীনতার ক্রিয়া। কালে তাহা ক্রমে বর্দ্ধমান, এবং ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর। এইখানে স্পিনোজার সহিত তাঁহার প্রভেদ।

ফিকটের "নৈতিক ব্যবস্থা"র পরিণাম কি? আদিতে ইহার অস্তিত্ব ছিল না, ছিল এক অনন্ত ইচ্ছা। সে ইচ্ছার সহিত চৈতন্য ছিল না, জ্ঞান ছিল না। তাহাতে কেবল ছিল "ক্রিয়া-পরতা"। ক্রিয়াপরতামাত্রই সেই ইচ্ছা। কাহার ক্রিয়া জিজ্ঞাসা করিও না। ক্রিয়াপর কিছু ছিল না, কেবল ছিল ক্রিয়া। কর্ত্তা নাই, অথচ ক্রিয়া আছে, সে ক্রিয়ার স্বরূপ বুদ্ধি-গ্রাহ্য নহে। না হউক, কিন্তু তাহার মধ্যে এই জগতের সকল পদার্থের বীজই নিহিত ছিল। সেই ক্রিয়ার কোনও কর্ত্তা ছিল না—কোনও নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিবার কিছু ছিল না, তবু স্বীয় প্রকৃতি-বশে এক নির্দ্দিষ্ট পথেই তাহা চালিত হইয়াছে। তাহার প্রথম ক্রিয়া আপনাকে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া, "অহম্ অস্মি" বলিয়া ঘোষণা করা। সঙ্গে সঙ্গে বহু "অহং" এবং প্রকৃতি-রূপ Anstoss এবং "নৈতিক ব্যবস্থার" আবির্ভাব। এই বহুধা বিভক্ত আদিম ইচ্ছাকে পুনরায় একত্বে পরিণত করাই এই "নৈতিক ব্যবস্থার" লক্ষ্য। স্বয়ং-সৃষ্ট Anstossকে আপনার মধ্যে পুনরায় গ্রহণ করিয়া আপনার মধ্যে তাহাকে বিলীন করিয়াই এই একত্ব সম্ভবপর হইতে পারে। প্রত্যেক অহমের মধ্যে নৈতিক বোধের উদ্বোধন এবং রাষ্ট্র ও চার্চ্চের সৃষ্টিদ্বারা এই একত্বসাধন সম্ভাবিত হয়। কবে এই একত্ব সাধিত হইবে? সকলে যখন নৈতিক আদেশদ্বারা সম্পূর্ণরূপে চালিত হইবে। কখনও সেদিন আসিবে কি? হয়তো অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টি-প্রবাহ চলিবে। যদি সেদিন কখনও আসে, তখন এই সৃষ্টির লোপ হইয়া নূতন সৃষ্টির আরম্ভ হইবে। সৃষ্টি-প্রবাহ চলিতে থাকিবে।

ফিকটের মতের রূপান্তর

জেনা বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের পর হইতে ফিকটের দর্শন ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। শেলিংএর দর্শনের প্রভাব ইহার উপর সুস্পষ্ট, কিন্তু ফিকটে তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার এই নূতন মতে তাঁহার বিষয়ি-নিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদ বিষয়-নিষ্ঠ সর্ব্বেশ্বর-বাদে এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দর্শনের "অহং" ঈশ্বরে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী দর্শনে "বিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থা"-রূপে তিনি ঈশ্বরকে তাঁহার দর্শনের শেষে স্থাপিত করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তী দর্শনের একমাত্র বিষয় ঈশ্বর এবং ঈশ্বর হইতেই তাহার আরম্ভ। এই দর্শনে ধর্ম্মের কোমলতা নৈতিক কঠোরতার এবং মিষ্টিক ভাব ও রূপক-বহুল বর্ণনা যুক্তি-তর্কের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, এবং "অহং" ও "কর্ত্তব্যের" স্থলে জীবন ও প্রেম প্রধান কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার Guidance to a Blessed Life (আনন্দ-পূর্ণ জীবন-লাভের উপায়) গ্রন্থে ধর্ম্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ লক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে ফিকটে তাঁহার নূতন

মতকে "সত্য খৃষ্ট-ধর্ম্মের মত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং সেইণ্ট জনের "মঙ্গল সমাচারে"র সহিত তাঁহার মতের ঐক্য-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সেইণ্ট জনের গ্রন্থই খৃষ্ট ধর্ম্মের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ, কেননা অন্যান্য সুসমাচারের লেখকগণ অর্দ্ধ ইহুদী ছিলেন, এবং ইহুদী ধর্ম্মের সৃষ্টিবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইণ্ট জনের গ্রন্থে "কালে সৃষ্টি"-বাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রকাশ[1] যে তাঁহার মতই সনাতন, এবং সেই প্রকাশ যে তাঁহার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই সদা বর্ত্তমান, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। Logos এর নরদেহে অবতার-গ্রহণ ফিক্‌টের মতে একটা ঐতিহাসিক ঘটনামাত্র। যিনিই ঈশ্বরের সহিত তাহার একত্ব অনুভব করিয়া মনে ও কর্ম্মে সমগ্র জীবন তাহার মধ্যস্থ ঐশ্বরিক জীবনের নিকট সমর্পণ করেন, তাহার মধ্যেই ঈশ্বরের সনাতন বাণী নরদেহ ধারণ করে। যত দিন মানুষ আপনি কিছু হইতে চেষ্টা করে, তত দিন তাহার নিকট ঈশ্বর আসেন না, কেননা কেহই ঈশ্বর হইতে পারে না। কিন্তু যখন কেহ আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে, সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, তখন কেবল ঈশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন; তিনিই তখন সব। ফিক্‌টে কবিতায় তাঁহার এই মত এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"সেই মৃত্যুহীন "এক" তোমার জীবনের মধ্যে জীবন ধারণ করেন, তুমি যাহা দেখ, তিনি তাহা দেখেন। ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নাই। যবনিকা তোল, দেখিবে তিনিই বর্ত্তমান। এই যবনিকাকে মরিতে দাও। তাহার পরে তোমার যাবতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে তিনিই বাঁচিয়া থাকিবেন। তোমার প্রচেষ্টার নিম্নে কি আছে, ভাবিয়া দেখ। তখন যবনিকা যবনিকা-রূপেই দৃষ্টিগোচর হইবে। সকলই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, এবং তুমি স্বর্গীয় জীবনের দর্শন পাইবে।"*

[1] Revelation

* Quoted in Schwegler's History of Philosophy, p. 277.

একাদশ অধ্যায়

জোহন ফ্রেডারিক হারবার্ট

১৭৭৬ সালে ওলডেনবার্গ নগরে জোহন ফ্রেডারিক হারবার্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিক্‌টের নিকট দর্শন-শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১৮০৫ সালে তিনি গটেনজেনে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং ১৮০৮ সালে কনিগসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যান্টের স্থলাভিষিক্ত হন। ১৮৩৩ সালে তিনি গটেনজেনে ফিরিয়া যান, এবং সেইখানেই ১৮৪১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ফিক্‌টে ক্যান্ট হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। হারবার্ট ক্যান্টের দর্শনের উপরই স্বীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যান্টের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। Aesthetic এবং Analytic, ক্যান্টের দর্শনের এই দুইভাগ। ফিক্‌টে Analytic হইতেই তাঁহার দর্শন আরম্ভ করেন; সংবিদ হইতে তাঁহার দর্শনের আরম্ভ। হারবার্ট ও সোপেনহর উভয়েই সংবিদ ও বুদ্ধিকে বর্জন করিয়া ক্যান্টের Aeshetic হইতে তাঁহাদের দর্শনের আরম্ভ করিয়াছিলেন। হারবার্ট, সোপেনহুর এবং শেলিং সকলেই হেগেলের দর্শনের বিরোধী ছিলেন।

হারবার্ট আপনাকে ক্যান্টের অনুগামী বলিতেন, কিন্তু দেশ, কাল ও ক্যাটেগরি-সম্বন্ধে তিনি ক্যান্টের মত স্বীকার করেন নাই। ক্যান্টের Critique of Judgment ও তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ক্যান্টের মতো অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ হইতেই তিনি তাঁহার দর্শনের আরম্ভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ক্যান্টের শিষ্যগণ ক্যান্টের মত হইতে যে সকল অধ্যাত্ম-মূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

ক্যান্ট প্রতিভাস এবং স্ব-গত বস্তুর মধ্যে যে ভাবে পার্থক্য করিয়াছেন, হারবার্ট তাহা গ্রহণ করেন নাই। আমাদের সংবিদের মধ্যে যে কেবল প্রতিভাসই থাকে, স্ব-গত বস্তু থাকে না, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই সকল প্রতিভাসদ্বারাই প্রমাণিত হয়, যে তাহাদের নিম্নে স্ব-গত-বস্তু আছে। হারবার্ট এই স্ব-গত-বস্তুর বর্ণনা করিয়াছেন।

হারবার্ট দর্শনশাস্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: তর্ক, তত্ত্ববিদ্যা এবং সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব। তর্ক-বিজ্ঞানের বিষয় চিন্তার রূপ বা নিয়মাবলী। প্রত্যয়সকলের স্পষ্টতাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। প্রত্যয়সকল যদি সুস্পষ্ট হয়, তাহা হইলে বিচার নির্ভুল হয়। তর্কবিজ্ঞান হইতে তিনটি তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়: (১) অভেদ-তত্ত্ব, (২) বিরোধ-তত্ত্ব এবং (৩) মধ্যাভাব নিয়ম।[১]

চিন্তার যেমন রূপ আছে, তেমনি তাহার আধেয়ও আছে। রূপ তর্ক-বিজ্ঞানের

---

[1] Principle of Excluded Middle

বিষয়, আবার তত্ত্ববিদ্যার বিষয়ও বটে। প্রত্যয়সকল দুই ভাগে বিভক্ত: যে সকল প্রত্যয়-দ্বারা 'প্রাপ্ত' জগতের ধারণা করা যায়, তাহারা এক শ্রেণীর। ইহারাই খাঁটি তত্ত্ব-বিদ্যার আলোচ্য বিষয়। আর এক শ্রেণীর প্রত্যয় আছে, যাহারা কোনও বাস্তব দ্রব্যের প্রত্যয় নহে, তাহারা কাল্পনিক তথ্যে প্রযোজ্য। যাহার বর্ত্তমানে অস্তিত্ব নাই, অথচ যাহা কাম্য—এইরূপ প্রত্যয়। ইহারা সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান এবং চরিত্র-বিজ্ঞানের আলোচ্য।

যে সমস্ত প্রত্যয় আমাদের কর্ত্তৃত্বের অধীন নহে, অথবা যাহাদের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে, এবং যাহাদের সহিত অনুমোদন অথবা অননুমোদনের ভাব জড়িত আছে, তাহারাই সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের বিষয়। চরিত্র-বিজ্ঞান সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের এক অংশ। ইচ্ছা এবং স্বাধীনতা, সম্পূর্ণতা, পরোপকার, ন্যায়-বিচার প্রভৃতি কতিপয় মৌলিক নৈতিক আদর্শের মধ্যে সম্বন্ধই ইহার বিষয়। তত্ত্ববিদ্যা এবং ব্যবহারিক দর্শনের মধ্যে হারবার্ট পার্থক্য করিয়াছেন।

হারবার্টের মতে অভিজ্ঞতাই দর্শনের ভিত্তি। দর্শনে প্রত্যেক প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে 'প্রাপ্ত' তথ্যদ্বারা; অন্ততঃ সেই সকল তথ্যের মধ্যেই মীমাংসার সূত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। অভিজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন প্রত্যয়দ্বারাই চিন্তাকে চালিত হইতে হইবে। অভিজ্ঞতার সীমার বাহিরে কোনও বিষয়ের জ্ঞান-লাভ সম্ভবপর নহে। কিন্তু অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্য-সকল দর্শনের ভিত্তি হইলেও অভিজ্ঞতার সংশোধন না করিয়া তাহার উপর নির্ভর করা যায় না। চিন্তাকে অভিজ্ঞতার ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার মধ্যে ভ্রান্তি আছে কি না। সুতরাং সন্দেহ হইতেই দর্শনের আরম্ভ। যাহা অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সত্যতায় সন্দেহ হইতেই দর্শনের আরম্ভ। সন্দেহ দ্বিবিধ। বস্তুসকল যে রূপে প্রকাশিত হয়, তাহারা যে প্রকৃত পক্ষে সেইরূপ, ইহাতে সন্দেহ নিম্নশ্রেণীর সন্দেহ। উচ্চ শ্রেণীর সন্দেহ বস্তুর প্রকাশমান রূপের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেই সন্দেহ। যেখানে কিছু দেখিতেছি, অথবা শুনিতেছি বলিয়া প্রতীতি হয়, সেখানে বাস্তবিক দেখিবার ও শুনিবার কিছু আছে কিনা, এই সম্বন্ধেই সন্দেহ। কালের পারম্পর্য্য, ও প্রাকৃতিক দ্রব্যের মধ্যে যেখানে পরিকল্পনার[১] পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে পরিকল্পনা সেই দ্রব্যের মধ্যে আছে, অথবা সেখানে না থাকিলেও আমরা মনের মধ্যে তাহার কল্পনা করি—প্রভৃতি-বিষয়ক সন্দেহ এই শ্রেণীর। এইরূপ সন্দেহদ্বারা আমরা দার্শনিক সমস্যা সকলের সম্মুখীন হই। এই সন্দেহের পরিণাম এই অর্থে অভাবাত্মক নহে, ভাবাত্মক। অভিজ্ঞতার প্রত্যয়সকলের আলোচনাই "সন্দেহ" পদবাচ্য। এই সকল প্রত্যয়ের আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে তাহাদিগের মধ্যে নৈয়ায়িক অসঙ্গতি ও বিরোধ আছে।

এপর্য্যন্ত আমরা দুইটি সত্যের সন্ধান পাইয়াছি। অভিজ্ঞতাই দর্শনের একমাত্র ভিত্তি—ইহা একটি। দ্বিতীয়টি হইতেছে এই, যে অভিজ্ঞতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। অভিজ্ঞতার বিশ্বাসযোগ্যতায় এই সন্দেহ হইতে দার্শনিক সমস্যাসকলের উদ্ভাবন

---

[১] Design

করিতে হইবে। অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা এমন সকল প্রত্যয় প্রাপ্ত হই, যাহার স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। এই সকল প্রত্যয় অস্পষ্ট। চিন্তা করিলে অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত কাল, দেশ, উৎপত্তি, গতি প্রভৃতি প্রত্যয়ের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রত্যয় অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাপ্ত, সুতরাং তাহাদিগকে বর্জ্জন করা চলে না। কেননা অভিজ্ঞতায় যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ব্যতীত অন্য সম্বল আমাদের নাই। আবার তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অস্তিত্ব-বশতঃ তাহাদিগকে গ্রহণ করাও অসম্ভব। এ অবস্থায় তাহাদিগকে সংশোধন করিয়া গ্রহণ করা ভিন্ন অন্য কোনও পন্থা নাই। অভিজ্ঞতার প্রত্যয়দিগের সংশোধন, এবং তাহাদের মধ্যস্থ বিরোধের দূরীকরণদ্বারা তাহাদের রূপান্তর,[1] ইহাই দর্শনের কার্য্য। সন্দেহ হইতে এই সকল সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সকল সমস্যার সমাধান তত্ত্ব-বিদ্যার কার্য্য। এই সকল সমস্যার মধ্যে প্রধান তিনটি—(১) দ্রব্যের মধ্যে গুণের অবস্থান[2], (২) পরিবর্ত্তন[3] এবং (৩) অহং[4]। অভিজ্ঞতা হইতে জাত প্রত্যয় এবং ক্যাটেগরিদিগের মধ্যে স্ব-বিরোধের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে হেগেল ও হারবার্ট একমত। কিন্তু হেগেলের মতে এই স্ব-বিরোধ যেমন এই সকল প্রত্যয়, তেমনি যাবতীয় দ্রব্যেরই প্রকৃতি-গত। যেমন "ভবন" প্রত্যয়ের মধ্যে সত্তা এবং অসত্তা উভয়ই আছে। উভয়ের সমন্বয়ই "ভবন"। কিন্তু হারবার্ট বলেন, যতক্ষণ ন্যায়ের "বিরোধের নিয়মের" সত্যতা থাকিবে, ততক্ষণ ইহা অসম্ভব। অভিজ্ঞতার প্রত্যয়সকলের মধ্যে যে স্ব-বিরোধ আছে, তাহা বিষয়-জগতের ত্রুটী নহে। তাহা আমাদের মনের দোষ। এই দোষ-সংশোধনের জন্য প্রত্যয়সকলের অন্তর্গত বিরোধের বহিষ্কার করিয়া প্রত্যয়দিগকে রূপান্তরিত করিতে হইবে। হারবার্ট হেগেলের সমালোচনায় বলিয়াছেন, যে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যয়সকলের মধ্যে স্ব-বিরোধ লক্ষ্য করিয়াও হেগেল তাহাদিগকে অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে তাহা বর্ত্তমান বলিয়া তাহাদিগকে ন্যায়সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য তিনি তর্কশাস্ত্রেরই পরিবর্ত্তন-সাধন করিয়াছেন। হারবার্ট এই জন্য হেগেলকে অভিজ্ঞতা-বাদী[5] বলিয়াছেন।

ইহার পরে হারবার্ট তাঁহার "সৎ পদার্থ"[6] সকলের আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের যাবতীয় অভিজ্ঞতা-লব্ধ প্রত্যয়ের মধ্যে স্ব-বিরোধ বর্ত্তমান থাকায় ফলে নিরবচ্ছিন্ন সংশয়-বাদ এবং সত্যের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে হতাশার উৎপত্তি হইতে পারিত। কিন্তু ইহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, যে সৎ-পদার্থ অস্বীকার করিলে তাহার "প্রকাশের"[7] অস্তিত্বও (সংবেদন প্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রভৃতি) থাকে না। তাহা যখন স্বীকার করা যায় না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, যে যতটা "সত্যে"র প্রকাশ, ততটা তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ। প্রকাশ হইতে প্রমাণিত হয়, যে তাহা সৎ-পদার্থের প্রকাশ, তাহার তলদেশে সৎ-পদার্থের অস্তিত্ব আছে। অভিজ্ঞতা যে অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই অবস্থায় তাহাতে অনপেক্ষ অস্তিত্ব ও সত্যতার আরোপ

[1] Transformation [2] Inherence [3] Mutation
[4] Ego [5] Empiricist [6] Reals [7] Appearance

করা যায় না, ইহা সত্য। এই অভিজ্ঞতা স্বতঃ[1] স্ব-তন্ত্র নহে, অন্যের মধ্যে, অন্যের মাধ্যমে অথবা অন্যের উপলক্ষেই ইহার অস্তিত্ব। কিন্তু সত্য সত্তা[2] নিরপেক্ষ, কাহারও অপেক্ষা তাহার নাই, কাহারও উপর তাহার নির্ভর নাই; ইহা নিরপেক্ষ স্থিতি। এই স্থিতির কারণ আমরা নহি, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। এই স্থিতি হইতে স্থিতি-মান বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। যাহার সত্য সত্তাই অস্তিত্ব আছে, তাহাই বিশিষ্ট বস্তু; তাহাই সৎ বস্তু বলিয়া গণ্য হয়। (১) এই সৎ বস্তু সম্পূর্ণ ভাবাত্মক, ইহার ব্যতিরেক অথবা অবচ্ছেদ নাই—তাহা থাকিলে ইহার অনপেক্ষতা থাকিতে পারিত না। (২) ইহা মৌলিক একত্ব-বিশিষ্ট। ইহার মধ্যে কোনও রূপ বহুত্ব নাই। ইহার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। (৩) ইহা পরিমাণ- বিশিষ্ট নহে। ইহা বিভাজ্য নহে—দেশ ও কালে বিস্তৃত নহে। ইহা অবিচ্ছেদ বিস্তারও[3] নহে। এই সৎ-পদার্থ স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, অন্য কিছুর উপর ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না, ইহা চিন্তার সৃষ্ট নহে। এই সৎ-পদার্থের প্রত্যয় হারবার্টের তত্ত্ব-বিদ্যার ভিত্তি।

হারবার্ট দ্রব্য ও তাহার গুণের মধ্যে সম্বন্ধের আলোচনায় বলিয়াছেন, যে প্রত্যক্ষের বিষয় প্রত্যেক বস্তুই ইন্দ্রিয়ের নিকট কতিপয় গুণের সমষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই সকল গুণই আপেক্ষিক, অর্থাৎ অস্তিত্বের জন্য ইহারা অন্যের অপেক্ষা রাখে। শব্দ দ্রব্য-বিশেষের গুণ—যে দ্রব্য শব্দ করে, তাহার গুণ। কিন্তু শব্দের জন্য বাতাসের প্রয়োজন। বায়ুহীন স্থানে সেই দ্রব্যকে রক্ষা করিলে, তাহা হইতে শব্দ উত্থিত হয় না। দ্রব্যের ভার পৃথিবীর উপর নির্ভর করে। দ্রব্যের বর্ণ আলোকের উপর নির্ভর করে। তাহার পরে দ্রব্য-বিশেষকে একটি দ্রব্য বলিয়াই আমরা ধারণা করি। তাহার একত্বের সহিত গুণের বহুত্বের সামঞ্জস্য হয় না। কোনও দ্রব্য কি, যখন জিজ্ঞাসা করি, তখন উত্তর পাওয়া যায়, তাহার গুণসকলের সমষ্টিই সেই দ্রব্য। তাহার কোমলতা, বর্ণ, শব্দ, ভার প্রভৃতিই তাহার দ্রব্যত্ব। কিন্তু দ্রব্যটি কি, যখন জিজ্ঞাসা করি, তখন তাহার স্বরূপের কথা, তাহার "কিংত্বের" কথা—বহুর নয়, একের কথাই জিজ্ঞাসা করি। যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহাতে দ্রব্য কি, তাহা পাওয়া যায় না, দ্রব্যের মধ্যে কি কি আছে, তাহাই পাওয়া যায়। আর গুণের তালিকাও কখনও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। সুতরাং দ্রব্যবিশেষের "কিংত্ব"—তাহার গুণের মধ্যেও নাই। এই দ্রব্য অজ্ঞাত, কিন্তু তাহার বিভিন্ন গুণের অবস্থান যেখানে প্রতীত হয়, সেই স্থানেই ইহার স্থিতি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই দ্রব্য—Substance। কোনও দ্রব্য স্বরূপতঃ কি, তাহা জানিবার জন্য যদি তাহার গুণাবলী হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে তাহার চিন্তা করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে কিছুই অবশিষ্ট দেখিতে পাই না। তখন বুঝিতে পারি, যে যাহাকে একটি দ্রব্য মনে করিয়াছিলাম, তাহা তাহার গুণাবলীর সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রত্যেক "প্রকাশ" এক একটি সৎ পদার্থেরই নির্দেশ করে, তাহা সৎ পদার্থেরই প্রকাশ। সুতরাং বিভিন্ন গুণের আধার দ্রব্যের মধ্যে যত-সংখ্যক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ততসংখ্যক

[1] Per se [2] True Being [3] Continuum

সৎ পদার্থ আছে, মনে করিতে হইবে। সুতরাং প্রত্যেক দ্রব্য ও তাহার গুণাবলীর তলদেশে যে সত্য বর্তমান, সৎপদার্থসমূহের সমষ্টিই তাহার ভিত্তি। এই সকল সৎপদার্থ মৌলিক, ইহারা মনাদ (লাইবনিট্জের), এবং এই সকল মনাদের গুণ বিভিন্ন। যে সকল মনাদ আমাদের অভিজ্ঞতায় মিলিত হয়, তাহারা একটি দ্রব্যরূপে প্রতীত হয়। এই সকল মনাদ স্ব-প্রতিষ্ঠ, স্বাধীন, স্বতন্ত্র। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া অসম্ভব।

উপরি উক্ত সিদ্ধান্তদ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতার প্রত্যয়সকলের বিচার করিলে দেখা যায়, যে তাহাদের রূপান্তর আবশ্যক। তাহাদের বর্তমান রূপ রক্ষা করা অসম্ভব। প্রথমেই কারণের প্রত্যয়ের আলোচনা করা যাউক। কারণ ও কার্য্যের মধ্যে অনুবর্তিতা ভিন্ন অন্য কিছুই আমরা দেখিতে পাই না। তাহাদের মধ্যে অন্য কোনও সম্বন্ধ-সূত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। যে উপায়ে কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা আমাদের অজ্ঞাতই রহিয়া যায়। কারণ কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না, কেন না তাহা হইলে মনে করিতে হইবে, যে একটি সৎপদার্থ অন্য সৎ পদার্থের উপর ক্রিয়া করিতে সক্ষম। তদ্রূপ কার্য্য স্বীকার করিলে উহার সৎপদার্থত্বই থাকে না। আবার কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া তাহাকে কার্য্যের মধ্যে অনুস্যূত এবং তাহার সহিত এক বলিয়া গণ্য করাও চলে না। সৎপদার্থে পরিবর্তন অসম্ভব, সুতরাং কারণের কার্য্যে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং কারণত্বের প্রত্যয়ের সংশোধন আবশ্যক। হারবার্ট নিম্নে বর্ণিতভাবে ইহার সংশোধন করিয়াছেন।

যাহাকে কারণ বলা হয়, তাহা সৎ পদার্থসমূহের সমষ্টি। এই সকল সৎ পদার্থ অপরিণামী, অপরিবর্তনীয়। তাহাদের অভ্যন্তরে কোনও পরিবর্তনেরই সম্ভাবনা নাই। তাহাদের স্বরূপের ব্যতিক্রম হয় না, তাহারা পরস্পর হইতে চিরকালই ভিন্ন। তাহারা প্রত্যেক্যেই আপনার স্বরূপ অপরিবর্ত্তিত ভাবে রক্ষা করে, অথচ আমরা দেখিতে পাই পরিবর্তন হয়, কারণ কার্য্যে রূপান্তরিত হয়। ইহার ব্যাখ্যার জন্য হারবার্ট "আত্মরক্ষা ও বিক্ষোভের" একটা মত উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিভিন্ন মনাদ যখন একত্র সমবেত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে এক প্রকার বিক্ষোভের আবির্ভাব হয়। যখন বিভিন্ন সৎ পদার্থের সাক্ষাতের ফলে বিক্ষোভ উৎপন্ন হয়, তখন তাহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপে প্রত্যেকের মধ্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা উদ্ভূত হয়। ইহার ফলে প্রাতিভাসিক জগতে এক প্রকার "অনিয়ত রূপের"[1] আবির্ভাব হয়। এই "অনিয়ত রূপের ধারণা" গণিত হইতে গৃহীত। ইহার অর্থ এই, যে একই বস্তু অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে। একই সরলরেখা যেমন কোনও বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ হইতে পারে, তেমনি অন্য বৃত্তের tangent ও হইতে পারে। কৃষ্ণ বর্ণের পার্শ্বে ধূসরবর্ণ শ্বেত বলিয়া, কিন্তু শ্বেতবর্ণের পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু তাহার বর্ণের বাস্তবিক কোনও পরিবর্তন হয় না। তেমনি সৎপদার্থের মধ্যে বস্তুতঃ কোনও পরিবর্তন না হইলেও, পরস্পরের

[1] Contingent Aspects

সংসর্গে তাহার এই সকল অনিয়ত রূপের আবির্ভাব হয়। এইরূপে হারবার্ট পরিবর্ত্তন ও কারণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাদ্বারা ভৌতিক বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের সমস্ত প্রতিভাসের ব্যাখ্যা করা যায়। হারবার্টের মনোবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত।

হারবার্ট তাঁহার তত্ত্ববিজ্ঞানের তৃতীয় খণ্ডের নাম দিয়াছেন Synechology। এই খণ্ডে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সহিত দেশ, কাল, গতি ও জড় পদার্থের আলোচনা করিয়াছেন। দেশকে তিনি প্রতিভাসমাত্র বলিয়াছেন, তাহার বাস্তবতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু দেশের প্রতিভাস বিষয়গত, বিষয়িগত নহে। প্রত্যেক বস্তু দেশের রূপ গ্রহণ করিয়া আমাদের জ্ঞান-গোচর হয়। যেখানেই বহুর অস্তিত্ব,—যাহারা মিলিত নহে, কিন্তু যাহাদিগকে মিলিত করা সম্ভবপর—সেখানেই, কেবল মানুষের বুদ্ধির নিকট নহে, সকল বুদ্ধির নিকটই, তাহারা বাহ্যরূপে প্রতীত হইতে বাধ্য। সেই জন্যই প্রত্যেক বুদ্ধিতেই দেশ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই দেশ অবচ্ছেদ-বিহীন সন্তত বিস্তার নহে। ইহাকে বিস্তৃতি-সম্পন্নরূপে ধারণা না করিয়া প্রাখর্য্য-যুক্ত[1] রূপে ধারণা করিতে হইবে। কালও এইরূপ। পরবর্ত্তী বিন্দু-সমূহের সমষ্টিমাত্রই কাল। যদি কেবল একজন মাত্র দ্রষ্টা থাকিত, অথবা কোনও দ্রষ্টা না থাকিত, তাহা হইলে "কাল"ও থাকিত না। কালের স্রোতঃ যে অবিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ পরবর্ত্তিতার এক শ্রেঢ়ীর অবসানের পরেই অন্য শ্রেঢ়ীর উদ্ভব হয়। সুতরাং দেশ ও কাল সৎ পদার্থের ধর্ম্ম নহে; তাহারা আগন্তুক মাত্র। সুতরাং সৎ পদার্থদিগের মধ্যে দেশসম্বন্ধ নাই বলিতে হইবে। এই জন্য গতিকেও দ্রব্যের ধর্ম্ম বলা যায় না। দ্রষ্টা না থাকিলে যেমন দেশ ও কালের অস্তিত্ব থাকেনা, তেমনি গতিরও অস্তিত্ব থাকে না।

'জড়' ও 'আত্মার' প্রত্যয়ের মধ্যে যেমন বিরোধ বর্ত্তমান, তেমনই সৎ পদার্থের স্বরূপের সহিতও তাহারা সামঞ্জস্যবিহীন। সৎ পদার্থ বিস্তার-বিহীন, সুতরাং তাহাদিগের হইতে জড়ের বিস্তৃতি উৎপন্ন হইতে পারে না। "অহমের" প্রত্যয়ের সহিত ইহার বিবিধ গুণ অথবা অবস্থা বা বৃত্তিরও সামঞ্জস্য হয় না। সেইজন্য এই সকল প্রত্যয়ের সংশোধন প্রয়োজন। হারবার্ট এই সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন।

হারবার্টের সৎ পদার্থের সহিত ডেমক্রাইটাসের পরমাণু, পারমেনিদিসের "এক" এবং লাইব্‌নিটজের "মনাদের" সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ডেমক্রাইটাসের পরমাণু স্থানব্যাপী, কোনও পরমাণুকে স্থানচ্যুত না করিয়া অন্য পরমাণু তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে না। কিন্তু হারবার্টের বহু সৎপদার্থের অস্তিত্ব একই স্থানে থাকিতে পারে। গণিতের বহু বিন্দু যেমন পরিমাণ-বিহীন বলিয়া এক স্থানে থাকিতে পারে, তেমনি। এই বিষয়ে পারমেনিদিসের "একের" সহিত তাহাদের অধিকতর সাদৃশ্য আছে। পারমেনিদিসের "এক" ও হারবার্টের সৎপদার্থ উভয়ই মৌলিক, এবং উভয়েই যে "দেশে" অবস্থিত তাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য[2]

---

[1] Intense [2] Intellectual Space

কিন্তু পারমেনিদিসের "এক" অদ্বিতীয়! হারবার্টের সৎ পদার্থ বহু, এবং প্রত্যেক সৎ পদার্থ অন্য হইতে ভিন্ন, এমন কি বিরুদ্ধ-ধর্ম্মীও বটে। লাইবনিট্‌জের মনাদের সহিত তাহাদের অধিকতর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু লাইবনিট্‌জের মনাদ স্বরূপতঃ বুদ্ধিমান, তাহাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সামান্য-জ্ঞান ও প্রত্যয়ের জ্ঞান বর্ত্তমান, কিন্তু হারবার্টের সৎ পদার্থে এই সকলের কিছুই নাই।

হারবার্টের মনোবিজ্ঞান তাঁহার তত্ত্ববিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বদ্ধ। "অহং" যেমন তত্ত্ববিজ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি মনোবিজ্ঞানেরও তত্ত্ব। তত্ত্ববিজ্ঞানের তত্ত্বরূপে ইহা একটি বহু গুণ-বিশিষ্ট সৎ-পদার্থ। ইহার বিভিন্ন অবস্থা ও শক্তি, বৃত্তি এবং ক্রিয়া আছে। সুতরাং "অহং"-প্রত্যয়ের মধ্যে স্ব-বিরোধ আছে। মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বস্বরূপে অহমের মধ্যে আর একটি বিরোধ দৃষ্ট হয়। মনোবিজ্ঞানে অহমের মধ্যে বিষয় ও বিষয়ী উভয়কেই পাওয়া যায়। অহং যখন আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করে, তখন আপনার নিকট বিষয়ে পরিণত হয়। কিন্তু এই বিষয় তাহার বিষয়ীর সহিত অভিন্ন। ফিক্‌টের মতে অহং "বিষয়-বিষয়ী[1]"; কিন্তু বিষয় ও বিষয়ীকে এক বলিয়া বর্ণনা করিলে স্ব-বিরোধ উৎপন্ন হয়। কিন্তু "অহংকে" অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং তাহার প্রত্যয়ের মধ্যে যে স্ববিরোধ আছে, তাহা কিরূপে বিদূরিত করিতে পারা যায়, তাহাই সমস্যা। "অহংকে" বুদ্ধিরূপে এবং সংবেদন, চিন্তা, প্রত্যয় প্রভৃতি তাহার বিভিন্ন অবস্থাকে তাহার বিভিন্ন "প্রকাশ"-রূপে ধারণা করিলে, এই সমস্যার সমাধান হয়। দ্রব্য ও তাহার গুণের সম্বন্ধ যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সেই ব্যাখ্যা উপযোগী। দ্রব্যের যত-সংখ্যক গুণ আছে, দ্রব্যকে তত-সংখ্যক সৎ পদার্থের সমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সেইরূপ যাহাকে "অহং" বলা হইয়াছে, তাহা "আত্মা" (জীবাত্মা=Soul) ব্যতীত আর কিছু নহে। এই আত্মা অনপেক্ষ সৎ পদার্থ মৌলিক, সনাতন, অবিভাজ্য, অবিনশ্বর এবং মৃত্যুহীন। সাধারণ মনোবিজ্ঞানে আত্মার কতকগুলি শক্তি ও বৃত্তির আরোপ করা হইয়া থাকে। হারবার্ট এই আরোপের বিরোধী। তিনি বলেন, "আত্মরক্ষা" ভিন্ন আত্মার মধ্যে অন্য কিছুই সংঘটিত হয় না। বিভিন্ন সৎ পদার্থের সহিত সংঘর্ষে আত্মার "আত্মরক্ষা"-ক্রিয়ারও বিভিন্নতা হয়। এই সকল সৎ পদার্থের আত্মারূপী মনাদের সহিত সংঘর্ষের ফলে আত্মার বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি। এই আত্মরক্ষার মতবাদই হারবার্টের মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি। সাধারণ মনোবিজ্ঞানে যাহা অনুভূতি, মনন, প্রত্যক্ষ প্রতীতি বলিয়া কথিত হয়, তাহা আত্মার এই আত্মরক্ষার বিভিন্ন রূপ। তাহারা আত্মারূপ সৎ পদার্থের কোনও বিশেষ অবস্থা প্রকাশিত করে না; সৎ পদার্থ-সমূহের মধ্যে সম্বন্ধই তাহাদের দ্বারা ব্যক্ত হয়। বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন সম্বন্ধ আবির্ভূত হওয়ার ফলে, অনেকগুলি সম্বন্ধ "কাটাকাটি"[2] হইয়া যায়; কতকগুলি বলবত্তর এবং কতকগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। আত্মার সহিত অন্যান্য মনাদের এইরূপ যে সকল সম্বন্ধ, তাহাদের সমষ্টিই সংবিদ। কিন্তু এই সকল সম্বন্ধ এবং তাহাদের প্রত্যয় সমান ভাবে সুনির্দ্দিষ্ট নহে। বিভিন্ন সম্বন্ধের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল স্থিতি-বিজ্ঞানের[3]

[1] Subject-Object [2] Neutralised [3] Statics

নিয়ম-দ্বারা গণনা-যোগ্য। যে সকল প্রত্যয়ের মধ্যে বিরোধের ফলে কাটাকাটি হয়, তাহারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় না; তাহারা সংবিদের বাহিরে, তাহার দ্বারদেশে, অবস্থান করে; পরে তাহাদের সদৃশ অন্য প্রত্যয়ের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা যথেষ্ট প্রাখর্য্য[১] লাভ করিয়া সংবিদের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। যে সমস্ত দমিত প্রত্যয় সংবিদের দ্বারদেশে অবস্থান করে, তাহাদের আস্তত্ব সম্পূর্ণ অনুভূত হয় না। আংশিক অনুভূত সেই সকল প্রত্যয়ই অনুভূতি। এই সকল অনুভূতিই তাহাদের শক্তির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন "কামনা"[২] রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যখন চরিতার্থতার আশায় কামনার শক্তি-বৃদ্ধি হয়, তখন তাহা ইচ্ছায় পরিণত হয়। "ইচ্ছা" আত্মার কোনও বিশিষ্ট বৃত্তি নহে। যে সকল প্রত্যয় মনে কর্তৃত্ব লাভ করে, তাহাদের সহিত অবশিষ্ট প্রত্যয়ের সম্বন্ধের উপর ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে। চরিত্রের দৃঢ়তা উদ্‌ভূত হয় কতকগুলি প্রত্যয়ের মনো-মধ্যে স্থায়িত্ব ও স্থায়িত্বের ফলে অন্যান্য প্রত্যয়ের দুর্ব্বলীকরণ অথবা সংবিদের প্রান্তভাগে বহিষ্কার হইতে।

হারবার্ট আত্মার যাবতীয় পরিবর্ত্তন গণিতের নিয়মদ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং মনোবিজ্ঞানকে তিনি "মনের যন্ত্রবিদ্যা"[৩] নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেহ যেমন তন্তুদ্বারা[৪] গঠিত, মনঃও তেমনি প্রত্যয়সকলের দ্বারা গঠিত। যান্ত্রিক নিয়মানুসারেই আমাদের প্রত্যয়সকল পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। এই ক্রিয়াদ্বারাই তাহাদের ভার-সাম্য স্থাপিত হয়। প্রত্যয়সকলের মধ্যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার গাণিতিক নিয়ম-উদ্‌ভাবনই মনোবিজ্ঞানের কার্য্য।

সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান দর্শনের ব্যবহারিক অংশের সহিত সম্বদ্ধ। সুন্দরের প্রত্যয়ই ইহার মুখ্য আলোচনার বিষয়। বাঞ্ছনীয় ও সুখকর পদার্থ এবং সুন্দরের মধ্যে পার্থক্য এই, যে সুন্দরের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা হইতে আনন্দের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু অবস্থা-বিশেষে যাহা বাঞ্ছনীয় ও সুখকর, তাহা অবস্থান্তরে তাহা না হইতেও পারে। সুতরাং দেখা যায়, যাহাদ্বারা মনে অননুমোদন অথবা অনুমোদনের অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তাহাই সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের বিষয়। এই জন্যই হারবার্ট চরিত্র-বিজ্ঞান সৌন্দর্য্য-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নৈতিক সৌন্দর্য্যের আলোচনা হইতেই চরিত্র-বিজ্ঞানের উদ্‌ভব, এবং চরিত্র-বিজ্ঞান এই জন্যই সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের একটি শাখা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। স্বাধীনতা, অনবদ্যতা,[৫] উপচিকীর্ষা,[৬] সুবিচার[৭] এবং ন্যায়ানুগত্য[৮]—এই পাঁচটি মৌলিক প্রত্যয়ের সহিত ইচ্ছার ক্রিয়ার যে সামঞ্জস্য, অথবা অসামঞ্জস্য, তাহা নির্ণয় করাই চরিত্র-বিজ্ঞানের কার্য্য। কর্ত্তব্য তিন ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি আপনার প্রতি অনুষ্ঠেয়, কতকগুলি সমাজের প্রতি, কতকগুলি ভবিষ্যতে অনুষ্ঠেয়।

---

[1] Intensity [2] Desire [3] Mechanics of the mind
[4] Fibres [5] Perfection [6] Benevolence
[7] Justice [8] Equity

সমাজের প্রয়োজন হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব। সমাজ-রক্ষার জন্য একটি বাহ্য বন্ধন-সূত্র অথবা শক্তির প্রয়োজন, যাহাদ্বারা সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ইহার সহিত অন্যের সম্বন্ধ সকল বিধৃত ও রক্ষিত হইতে পারে।

হারবার্ট শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের উপর তাঁহার মতের প্রভাব পতিত হইয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য নৈতিক চরিত্র-গঠন। স্বাধীন ইচ্ছা এবং চরিত্র-সম্বন্ধে অদৃষ্টবাদ, উভয়ই তাঁহার মতে বর্জ্জনীয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া শিক্ষার প্রকৃতি নির্দ্ধারিত করিতে হইবে সত্য, কিন্তু শিক্ষাদ্বারা ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তিকে বিকাশিত এবং বলবান্ করা যাইতে পারে। মানুষের নৈতিক প্রয়োজনের উপর হারবার্ট ধর্ম্মের দাবি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দুঃখার্ত্তকে সান্ত্বনা-দান, পথভ্রষ্টকে সুপথে চালিত করা, এবং অপরাধীকে শাস্তিদান ধর্ম্মের কার্য্য। মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার জন্য সকলের পক্ষেই ধর্ম্মের প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রের পক্ষেও ধর্ম্মের প্রয়োজন আছে, কেননা মানুষের সাংসারিক স্বার্থের মধ্যে যখন বিরোধ আবির্ভূত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে আত্মিক বন্ধনের দ্বারা সে বিরোধের মীমাংসা করা যায়।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে হারবার্ট কোনও মত-প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু বলিয়াছেন, যে প্রাকৃতিক জগতে ও জীবনে যে বিস্ময়কর জ্ঞান ও উদ্দেশ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার ব্যাখ্যার জন্য এক সর্ব্বশক্তিমান বুদ্ধির প্রয়োজন।

হারবার্টের দর্শনকে লাইব্‌নিট্‌জের মনাদমূলক দর্শনের বিকাশ বলা যাইতে পারে। ইহা এক প্রকার বস্তু-বাদ। ক্যাণ্টের অনুবর্ত্তীদিগের এক দেশদর্শী অধ্যাত্মবাদের ইহা প্রতিবাদ। বহু মৌলিক পদার্থের ধারণার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত।



দ্বাদশ অধ্যায়

বিষয়-নিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদ

শেলিং

ফিকৃটের দর্শনের প্রতি প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল; দলে দলে লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে সমাগত হইত। কিন্তু বহু লোকে তাঁহার মত গ্রহণ করে নাই। তাঁহার দর্শনের একদেশদর্শিতাই তাহার কারণ। তাঁহার দর্শন বিষয়ি-নিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদ হইলেও, তাহা সলিপসিজম্ নহে। তাঁহার "অহং" অসীম 'অহং', এবং এই জগৎ সসীম অহমের সৃষ্টি নহে। সুতরাং তিনি জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু তাঁহার মতে ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি-সাধনের জন্যই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং ইহা ব্যতীত তাহার অস্তিত্বের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। মানবজীবনের সম্মুখে যে সকল বাধা মানবকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, মানবের স্বীয় চেষ্টায় সেই সকল বাধা দূরীভূত হইলেই সৃষ্টির বিলোপ হইবে। হেগেল বলিয়াছেন, যদি "অনহমের" বাস্তব অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে সসীম অহমেরও বাস্তব অস্তিত্ব নাই, কেন না অনহং কর্তৃক প্রতিবদ্ধ না হইয়া সসীম অহমের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। এই জন্য জেকোবি বলিয়াছেন, শূন্যবাদেই ফিকৃটের অধ্যাত্মবাদের শেষ পরিণতি। প্রকৃতিকে চিন্তার স্বয়ং-সৃষ্ট বিষয়ে পরিণত এবং আত্মাকে একমাত্র সত্যপদার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টার ফলে আত্মার জীবন ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ফিকৃটের দর্শনের এই ত্রুটীর সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। শেলিং এরদর্শনকর্তৃক সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে।

ফিকৃটের অসঙ্গের আধেয় কিছুই নাই, তাহা শুধু ক্রিয়ামাত্র, তাহার কর্ত্তা নাই, তাহা শুধুই ক্রিয়া। প্রকৃতির স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নাই, তাহা অসঙ্গের অন্তর্ভূত নহে। শেলিং প্রকৃতিকে অসঙ্গ-প্রজ্ঞার অন্তর্ভূত বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফিকৃটে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, "অহমই প্রত্যেক বস্তু"। শেলিং বলিয়াছিলেন, "প্রত্যেক বস্তুই অহং"। তাঁহার মতে যে তত্ত্ব অন্তর্জগতে মানব মনের মধ্যে প্রকাশিত, তাহাই বহির্জগতে প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশিত। "দৃশ্যমান বুদ্ধিই প্রকৃতি, এবং অদৃশ্য প্রকৃতিই বুদ্ধি"। পরিশেষে শেলিং প্রকৃতি ও আত্মার মধ্যে ভেদ নিরাকৃত করিয়া অসঙ্গকে উভয়ের অতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

১৭৭৫ সালে লিওন্বার্গ নগরে শেলিংএর জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বুদ্ধির পরিপক্কতা লক্ষিত হইয়াছিল। পনের বৎসর বয়সে তিনি টুবিন্‌জেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। সেখানে হেগেল তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। কলেজ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ১৭৯২

সালে তিনি Mosaic Account of the Fall নামে এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ১৭৯৪-৯৫ সালে তাঁহার "On the Possibility of a form of Philosophy in general এবং Of the Ego as a Principle of Philosophy প্রকাশিত হয়। উভয় গ্রন্থই ফিকটের দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া শেলিং প্রথমে এক ব্যারণের গৃহশিক্ষক এবং পরে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকটের স্থলে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৭৯৮)। জেনায় অবস্থানকালে হেগেলের সহযোগিতায় তিনি Critical Journal of Philosophy নামে এক পত্রিকা সম্পাদন করেন। পরে ক্রমে ক্রমে ফিকটের মত বর্জ্জন করিয়া স্বতন্ত্র দর্শনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে থাকেন। ১৮০৩ সালে তিনি Wurzburgএ দর্শনের অধ্যাপক হন, এবং কয়েক বৎসর পরে ১৮০৭ সালে মিউনিকের New Academyর সভ্য নির্ব্বাচিত হন, এবং জেকোবির মৃত্যুর পরে তাহার সভাপতি হন। ১৮৪২ সালে তিনি বার্লিনে গমন করিয়া Philosophy of Mythology এবং Revelation এবং অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ইহার পরে অনেক দিন উল্লেখযোগ্য কিছুই তিনি প্রকাশিত করেন নাই। ১৪ খণ্ডে বিভক্ত তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে ১০ খণ্ড তাঁহার জীবিতকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৪ সালে সুইজার্লাণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হয়। উপরি উক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত System of Natural Philosophy (১৭৯৯) এবং System of Transcendental Idealism তাহার প্রধান গ্রন্থগুলির অন্তর্গত।

শেলিংএর দর্শনের পরিচয় দেওয়া সহজসাধ্য নহে। তাঁহার দর্শন স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই সমষ্টি। এই সকল মতের মধ্যে সামঞ্জস্যও নাই। প্লেটোর দর্শনের মতো শেলিংএর দর্শনও তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাস। তাঁহার মানসিক বিকাশের সহিত তাঁহার দার্শনিক মত যে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে যে মত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে আরম্ভ না করিয়া প্রত্যেক গ্রন্থেই তিনি আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া নূতন মত স্থাপন করিতে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকদিগের মত আপনার দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার দর্শনকে সাধারণতঃ চারি কিংবা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম ভাগ ফিকটের মতদ্বারা প্রভাবিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে স্পিনোজা এবং জেকব বোহমের প্রভাব সুস্পষ্ট। চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে মিষ্টিকভাব পরিস্ফুট।

শেলিংএর দর্শনের প্রথম যুগ

ফিকটের শিষ্যরূপে শেলিং তাঁহার দার্শনিক জীবনের আরম্ভ করেন। এই যুগে লিখিত তাঁহার "On the Possibility of a form of Philosophy" (২) On the Ego; (৩) The Letters on Dogmatism and Criticism, (৪) Ideas towards a Philosophy of Nature এবং (৫) On the World Soul গ্রন্থে তিনি যে মত

প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা মুখ্যতঃ ফিক্‌টের দর্শনানুযায়ী। প্রথম গ্রন্থে তিনি একটি চরম তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন, যে আমাদের জ্ঞানের চরম ভিত্তি অহমের মধ্যেই বর্ত্তমান; সুতরাং প্রত্যেক সত্য দর্শনই অধ্যাত্মবাদী হইতে বাধ্য। আমাদের জ্ঞানের মধ্যে যদি কোনও সত্য থাকে, তাহা হইলে এমন এক স্থান নিশ্চয়ই আছে, যেখানে চিন্তা ও সত্তা, প্রত্যয় ও বাস্তবতা এক ও অভিন্ন হইয়া যায়। উচ্চতর কোনও তত্ত্বদ্বারা জ্ঞান যদি প্রতিবদ্ধ হইত, এবং জ্ঞান যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব না হইত, তাহা হইলে তাহা অসঙ্গ বা অনপেক্ষ হইতে পারিত না। এই গ্রন্থ ফিক্‌টে তাঁহার দর্শনের ভাষ্য বলিয়াই গণ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যেই শেলিংএর পরবর্ত্তী মতের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গ্রন্থে জ্ঞানের একত্ব এবং যাবতীয় বিজ্ঞানের পরিশেষে এক বিজ্ঞানে পরিণতির আবশ্যকতার উপর তিনি যে গুরুত্বের আরোপ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই ইঙ্গিত নিহিত।

Letters on Dogmatisn and Criticism গ্রন্থ ক্যাণ্টের যে সকল শিষ্য তাঁহার সমালোচনামূলক অধ্যাত্মবাদ সম্পূর্ণ অনুসরণ না করিয়া, যুক্তির উপর অপ্রতিষ্ঠিত প্রাক্-ক্যাণ্টির মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে লিখিত। ফিক্‌টেকর্ত্তৃক সম্পাদিত এক দার্শনিক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে শেলিং তৎকালিক দার্শনিক সাহিত্যের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধে তিনি ফিক্‌টের মত অনুসরণ করিলেও, অহমের স্বরূপ হইতেই যে প্রকৃতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। Ideas towards a Philosophy of Nature এবং On the World Soul গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার এই মত আরও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "মনের প্রকৃতি এবং কার্য্য হইতেই জড়ের প্রত্যয়ের উৎপত্তি। মনের মধ্যে দুইটি শক্তি বর্ত্তমান—একটি অবচ্ছেদক,[1] অন্যটি অনবচ্ছিন্ন[2]। এই দুই শক্তির একত্বই মনঃ। কেবল অনবচ্ছিন্নতা থাকিলে সংবিদের আবির্ভাব অসম্ভব হইত। অনপেক্ষ ব্যবচ্ছিন্নতা হইতেও তাহার উদ্ভব তুল্যরূপেই অসম্ভব। যে শক্তি অনন্তে প্রসারিত হইতে উন্মুখ, তাহা যদি কোনও বিরোধী শক্তিকর্ত্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন হয়, এবং শেষোক্ত শক্তির সীমা অপসারিত হয়, তাহা হইলেই কেবল অনুভূতি, প্রতীতি এবং জ্ঞানের উদ্ভব কল্পনা করা সম্ভবপর হয়। এই দুই শক্তির বিরোধ অথবা তাহাদের বিরামহীন অপেক্ষিক একত্ব-বিধানরূপ ক্রিয়াই মনঃ। প্রকৃতির অবস্থাও এইরূপ। জড় কোনও মৌলিক বস্তু নহে। আকর্ষণ-ও-বিকর্ষণ-রূপ দুইটি আদিম শক্তি-কর্ত্তৃক ইহা অবিরত উৎপাদিত হইতেছে। ইহা নিষ্ক্রিয় পিণ্ডমাত্র নহে। জড়ের মধ্যে যাহা জড়ত্ব-বর্জ্জিত (অজড়ের মতো), তাহাই শক্তি। এই শক্তির সহিতই মনের সাদৃশ্য আছে। জড় ও মনঃ (চিৎ) উভয়ের মধ্যেই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উভয়কে এক উচ্চতর অভেদের মধ্যে একীভূত করা যায়। প্রকৃতির জ্ঞানের জন্য মনের যে বৃত্তি আছে, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান-বৃত্তির মধ্যে

[1] Limiting [2] Unlimited

দেশ অবস্থিত। এই দেশ আকর্ষণ-ও-বিকর্ষণ-রূপ দুইটি শক্তিদ্বারা পূর্ণ ও ব্যবচ্ছিন্ন, এবং এই রূপে পূর্ণ ও ব্যবচ্ছিন্ন দেশই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ইহা হইতে শেলিং অনুমান করিয়াছেন, যে প্রকৃতি ও মনের মধ্যে একই অসঙ্গ বর্ত্তমান, এবং প্রকৃতি ও মনের মধ্যে যে সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, তাহা কেবল চিন্তার সৃষ্টি নহে—প্রকৃতির মধ্যে চিন্তার প্রতিফলনমাত্র নহে। জড় অথবা প্রকৃতি যেমন আকর্ষণ-ও-বিকর্ষণ-রূপী দুই শক্তির মিলন, মনঃও তেমনি ব্যবচ্ছেদক এবং অনবচ্ছিন্ন শক্তির মিলন। জড়ের বিকর্ষণ-শক্তিই মনের অনবচ্ছিন্ন শক্তি, এবং তাহার আকর্ষণ-শক্তি মনের ব্যবচ্ছেদক শক্তি। শেলিংএর এই সময়ের যাবতীয় রচনার মধ্যে এই মত—অন্তরস্থ আত্মা ও বাহ্য জগতের অভেদবাদ—পরিস্ফুট। তাঁহার মতে মনের মধ্যস্থ নিয়মগুলির প্রকাশ এবং বাস্তবতা-সম্পাদনের জন্য প্রকৃতির প্রয়োজন; এবং এই প্রকাশ ও বাস্তবতা-সাধন প্রকৃতি-দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়াই ইহা প্রকৃতি (মনের স্বভাব) বলিয়া কথিত হয়। আমাদের অন্তরস্থ আত্মা ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ রূপেই অভিন্ন। দৃশ্যমান আত্মাই প্রকৃতি, অদৃশ্য প্রকৃতিই আত্মা। এই সকল রচনায় প্রকৃতি মনের প্রতিলিপি[1] এবং মনের সৃষ্টিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে আত্ম-সংবিদে উত্তীর্ণ হওয়াই প্রকৃতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আত্মসংবিদে পৌঁছিবার পথে মনকে যে যে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহারা প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে নিশ্চল অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। স্বকীয় অভিব্যক্তির পথে বুদ্ধি যাহা যাহা সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে, দেহীর জগতে[2] উপনীত হইয়া বুদ্ধি তাহারই চিন্তা করে। প্রত্যেক দেহবৎ বস্তুর মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা প্রতীক-স্বরূপ। প্রত্যেক উদ্ভিদ আত্মার স্পন্দনের জড়ীয় রূপ। জীব-ও-উদ্ভিদ-দেহের বুদ্ধির বিশেষত্ব হইতেছে দেহের গঠন, উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী উপায়াবলম্বন, এবং উপাদানের মধ্যে বিবিধ রূপের এবং রূপের মধ্যে উপাদানের অনুপ্রবেশ। এই সকল বিশেষত্ব মনেরও বিশেষত্ব। আপনাকে সুসংবদ্ধ করিবার জন্য যে চেষ্টা মনের মধ্যে বর্ত্তমান, প্রাকৃতিক জগতেও তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে। সমগ্র বিশ্ব এক প্রকার অঙ্গী, কেন্দ্র হইতে উদ্ভূত, বহির্দ্দেশে বিস্তৃত, ক্রমশঃ নিম্ন হইতে উচ্চতর স্তরের অভিমুখে অগ্রসর। সুতরাং প্রাকৃতিক দর্শনের চেষ্টা হওয়া উচিত প্রকৃতির জীবনে একত্ব-বিধান করা। প্রাকৃতিক দর্শনে প্রকৃতিকে অসংখ্য প্রকারের শক্তিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে লাভ কি? অগ্নি ও বিদ্যুতের ক্রিয়া যে বিভিন্ন, তাহা তো সকলেই জানে। আমাদের অন্তরতম প্রদেশে আমরা জ্ঞানের মধ্যে একত্ব-বিধানের জন্য চেষ্টিত। প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যার জন্য এক একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব আমরা চাই না। জটিলতম প্রাকৃতিক ব্যাপারের সমাবেশের মধ্যে, যেখানে সরলতম নিয়ম, এবং বহুতম কার্য্যের মধ্যে অল্পতম সাধন দেখিতে পাই, সেখানেই আমরা সত্য "প্রকৃতির" দর্শন পাই বলিয়া বিশ্বাস করি। সুতরাং তত্ত্বনকলের মধ্যে সরলতা-সম্পাদক প্রত্যেক মতই, অপরিপক্ক ও অপরিণত হইলেও সযত্নে আলোচনার যোগ্য।

[1] Counterpart [2] Organised World

এই সময়ে প্রকৃতির মধ্যে বিবিধ শক্তির কল্পনার দিকে বৈজ্ঞানিকদিগের একটা প্রবণতা লক্ষিত হইত। যন্ত্রবিদ্যায় ক্যাণ্ট আকর্ষণ ও বিকর্ষণমূলক শক্তির কথা বলিয়াছিলেন। ভৌতিক বিজ্ঞানে তাড়িতের মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তির কল্পনা করা হইয়াছিল, এবং চৌম্বক শক্তির সহিত তাহার অভিন্নতা-প্রদর্শনের চেষ্টা হইয়াছিল। শারীর বিজ্ঞানে উত্তেজনীয়তা[1] এবং অনুভব-বৃত্তির মধ্যে বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছিল। শেলিং এই দ্বন্দ্বের সমাধানের চেষ্টায় সকল বিরোধ, সকল দ্বৈতের মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সহযোগিতায় জগতের মধ্যে সংগতির উদ্ভব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক তত্ত্বের ঐক্যই এই জগৎ। এই দুই বিরোধী তত্ত্বের বিরোধ হইতেই হউক, অথবা তাহাদের সহযোগিতা হইতেই হউক, জগৎ-সংগঠক ও জগৎ-ব্যবস্থাপক বিশ্বাত্মার প্রত্যয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধিগ্রাহ্য এই বিশ্বাত্মা বিশ্বে অনুস্যূত—তাঁহাকে লইয়া জগৎ স্বতন্ত্র, স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ। প্রকৃতির এই স্বাধীন সত্তার সহিত ফিক্‌টের আত্মনিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদের সামঞ্জস্য নাই। শেলিং এই মতের পরিপুষ্টি-সাধনে অগ্রসর হইয়া দর্শনশাস্ত্রকে প্রাকৃতিক দর্শন এবং অতীন্দ্রিয় দর্শন, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত শেলিং বিশ্বাস করিয়াছিলেন, যে ফিক্‌টের দর্শনের সহিত তাহার বিরোধ নাই। এইখানেই তাঁহার দর্শনের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ।

শেলিংএর প্রথম যুগের দর্শনের সার মর্ম এই :—অহং আত্ম-প্রতিষ্ঠাকালে আপনা-কর্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন হয়। এই ব্যবচ্ছেদের ফলে অহং যেমন আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তেমনি বাহ্য জগতের জ্ঞানও লাভ করে। অহমের একই ক্রিয়ায় বিষয় ও বিষয়ী উভয়কেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং বিষয় ও বিষয়ী উভয়েরই অস্তিত্ব তুল্যরূপে বিশ্বাস-যোগ্য। আমরা বহিঃস্থ-দ্রব্য সম্বন্ধে সচেতন না হইয়া, আপনাদের জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। বাহ্য কোনও বস্তুর জ্ঞানও আত্ম-জ্ঞানের সঙ্গে ভিন্ন লাভ করা সম্ভবপর হয়না। ইহা হইতে অনুমিত হয়, যে উভয়েরই অস্তিত্ব আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবে নাই। উভয়ে ঊর্দ্ধতর কোনও শক্তির মধ্যে একীভূত। এই শক্তিই অসঙ্গ অহং।

শেলিংএর দর্শনের দ্বিতীয় পর্য্যায়—প্রকৃতির দর্শন এবং অতীন্দ্রিয় দর্শন

১৭৯৯ সালে শেলিংএর First Sketch of a System of Nature Philosophy প্রকাশিত হয়। ১৮০০ সালে System of Transcendental Idealism এবং ১৮৮১ সালে Journal of Speculative Physics পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সকল গ্রন্থ এবং প্রবন্ধে শেলিং যে মত স্থাপন করেন, তাহা ফিক্‌টের মত হইতে স্বতন্ত্র।

[1] Irritability

প্রাকৃতিক দর্শন

সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে দুইটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়—একটি জ্ঞানের বিষয়, এবং অন্যটি জ্ঞাতা অথবা বিষয়ী। জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহার সমষ্টিকে আমরা প্রকৃতি বলি। অহম্ অথবা বুদ্ধিই জ্ঞাতা অথবা বিষয়ী। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, বিষয় ও বিষয়ীর সংযোগ হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয়। দুইটির কোনওটিকে বর্জ্জন করিয়া জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যদি বিষয়কে বিষয়ীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গণ্য করা যায়, অর্থাৎ যদি মনে করা যায়, যে প্রথমে বিষয় অথবা প্রকৃতি ছিল, পরে তাহার সহিত বিষয়ী যুক্ত হইয়া জ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে কিরূপে বুদ্ধি অথবা বিষয়ী আসিয়া বিষয়ের সহিত যুক্ত হইল, তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। ইহাই "প্রকৃতির দর্শন"। আবার বিষয়ী অথবা বুদ্ধিকে যদি বিষয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে কিরূপে বিষয়ী হইতে বিষয়ের উৎপত্তি হইল, তাহা প্রদর্শন করিতে হয়। ইহাই অতীন্দ্রিয় দর্শন—যাহা অভিজ্ঞতা অতিক্রম করিয়া যায়, সেই দর্শন। যাবতীয় দর্শনেই এই দুইটি পন্থার একটি অবলম্বন করিতে হইবে। উভয়বিধ দর্শনই কিন্তু জ্ঞানের দুই প্রান্ত—চুম্বকের দুই মেরুর মত দুই মেরু—এবং উভয়ের একতর অন্যতরের পরিপূরক।

প্রকৃতি আমাদের নিকট জীবনহীন রূপে প্রকাশিত। ইহাকে প্রাণে সঞ্জীবিত করা, ইহার মধ্যে স্বাধীনতার সন্ধান করা, এবং স্বীয় শক্তির বলে কিরূপে ইহার বিকাশ সাধিত হয়, তাহা প্রদর্শন করাই প্রকৃতির দর্শনের কার্য্য। বস্তুতঃ প্রকৃতি "নির্ব্বাপিত আত্মা"[১] ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহা "অসঙ্গ অহমের" অভিব্যক্তি। যাহা "প্রজ্ঞা ও নিয়ম" অনুযায়ী, তাহা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রকৃতি উৎপন্ন করিতে সক্ষম নহে। কিন্তু বাহ্য কোনও বুদ্ধি জড় প্রকৃতির উপর কার্য্য করিয়া প্রকৃতির কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে, ইহা ধরিয়া লইলে প্রকৃতিকে বুঝিতে পারা যাইবে না। প্রকৃতির মধ্যে যে "উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অভিযোজনা"[২] দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃতির বহিঃস্থ কোনও বুদ্ধির ক্রিয়া নহে। প্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে বর্ত্তমান "নিয়ম এবং রূপের"[৩] আবিষ্কার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে বুদ্ধিদ্বারাই তাহারা গ্রাহ্য, তাহারা বুদ্ধিরই নিয়ম ও রূপ। সুতরাং প্রাকৃতিক জগৎ এবং চিন্তার জগৎ অভিন্ন। উভয়ের মধ্যে এই ঐক্য প্রমাণ করাই "প্রকৃতির দর্শনের" কার্য্য। আমাদের অভিজ্ঞতাই আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র। অভিজ্ঞতার মধ্যে যাহা পড়ে না, তাহার জ্ঞান আমাদের নাই। অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ কোনও বিশেষ জ্ঞানের—কোনও বিশেষ প্রতিজ্ঞার—মধ্যে যখন অবশ্যম্ভাবিতা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সেই আভ্যন্তরীণ অবশ্যম্ভাবিতা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে উক্ত প্রতিজ্ঞা প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের উপর তাহার সত্যতা নির্ভর করে না। অভিজ্ঞতাকে অনপেক্ষ বা অসঙ্গ জ্ঞানে পরিণত করাই প্রকৃতির দর্শন।

---

[1] Extinguished Spirit [2] Adaptation of means to an end
[3] Laws and forms

সৃজনশীলতা[১] ও সৃষ্টি[২] এই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতি অবিরাম চলিতেছে, অনবরত নির্দিষ্ট রূপ ও বস্তুর উৎপাদন করিতেছে, আবার সেই সৃষ্ট রূপ ও বস্তু অতিক্রম করিয়া নূতন সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ হইতেছে। এই দোলনই প্রকৃতি। ইহা হইতে প্রকৃতির মধ্যে বর্ত্তমান দ্বিবিধ তত্ত্বের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়: (১) যাহাদ্বারা প্রকৃতির বিরামহীন ক্রিয়া চলিতে থাকে, এবং (২) যাহার অস্তিত্ববশতঃ কোনও বস্তুর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতির ক্রিয়ার সমাপ্তি হয় না। প্রকৃতির সর্ব্বত্রই এই দুই তত্ত্বের অস্তিত্ব আছে, এবং এই দ্বৈতদ্বারা প্রকৃতির ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই এই দ্বৈতের সন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু এই দ্বৈত-আবিষ্কারই দর্শনের শেষ কথা নহে। কোথায় এই দ্বৈতের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, কোথায় দুই তত্ত্ব মিলিত হইয়া একে পরিণত-হইয়াছে, তাহারও অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের সমবায়ে যে একত্ব উদ্‌ভূত হইয়াছে, সেই সামগ্রিক একত্বই উপলব্ধি করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতির এই একত্ব পরম একত্বের এক দিকমাত্র। অসঙ্গ অনবচ্ছিন্ন মনের মধ্যে যাহা পূর্ব্বেই কল্পিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বাস্তবে পরিণত করিবার প্রচেষ্টাই প্রকৃতি। সত্যের জগতে যাহা চিরদিন বর্ত্তমান, তাহাই বাহ্য জগৎ একটির পর একটি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে রূপায়িত করে। শেলিং প্রকৃতির দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) জৈব প্রকৃতি, (২) অজৈব প্রকৃতি এবং (৩) জৈব ও অজৈব প্রকৃতির মধ্যে ব্যতিহার।

(১) জৈব প্রকৃতি:—অন্তহীন ক্রিয়া—অন্তহীন সৃষ্টিই প্রকৃতি। প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্যে কোনও রূপ বাধা যদি না থাকিত, তাহা হইলে এক সঙ্গেই যাহা সৃষ্টি করিবার, তাহা সৃষ্টি করিয়া ফেলিত। অসীম গতিতে এই সৃষ্টিকার্য্য হইত বলিয়া যাহা সৃষ্ট হইত, তাহা হইত অসীম। আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ—সসীম জগৎ—সৃষ্ট হইতে পারিত না। সসীম বস্তুর সৃষ্টিদ্বারা প্রমাণিত হয়, যে প্রকৃতির কার্য্য অন্য এক বিরোধী শক্তি-কর্ত্তৃক বাধিত হয়, এবং সে শক্তিও প্রকৃতির অন্তর্গত। যে সমস্ত সসীম পদার্থ সৃষ্ট হয়, তাহাদের সৃষ্টি প্রকৃতির লক্ষ্য নহে। তাহাদের সৃষ্টিমাত্রই প্রকৃতি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয়—অসীম-সংখ্যক সসীম বস্তুর সৃষ্টিদ্বারা অন্তরস্থ সৃষ্টিশক্তির দাবি পূর্ণ করিতে অগ্রসর হয়। এই বিরামহীন সৃষ্টি-কার্য্যে প্রকৃতি দুইটি বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত হয়; একটি তাহার কার্য্যের সহায়ক, দ্বিতীয়টি তাহার প্রতিবন্ধক। প্রত্যেক দেহধারী জৈব বস্তুতেই এই বিরোধ বর্ত্তমান। প্রত্যেকের মধ্যে এই বিরোধের অস্তিত্বের জন্যই কোনও জৈব বস্তুই অনপেক্ষ কিছুর সৃষ্টি করিতে পারে না, কেবল আপনার সদৃশ জীবই উৎপাদন করে। সৃষ্টিকার্য্যে প্রকৃতি ব্যক্তিকে অবহেলা করে। প্রকৃতির সৃষ্ট সসীম বস্তু অসীম-উৎপাদনে প্রকৃতির ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র। প্রকৃতির লক্ষ্য জাতি, ব্যক্তি লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়মাত্র। জাতির অস্তিত্ব রক্ষিত হইলেই প্রকৃতি সন্তুষ্ট। ব্যক্তিদিগকে রক্ষার জন্য তাহার কোনও প্রয়াস নাই; বরং তাহার কার্য্য ব্যক্তির বিনাশের অনুকূল।

[১] Productivity [২] Product

জৈব প্রকৃতির[1] তিনটি মৌলিক ধর্ম: (ক) সংজনন শক্তি, (খ) উত্তেজনশীলতা এবং (গ) ইন্দ্রিয়বৃত্তি। এই তিন ধর্মের ন্যূনাধিক্য-অনুসারে জৈব প্রকৃতিও তিন ভাগে বিভক্ত। যে সকল জীবে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহারাই সর্ব্বোচ্চ। উত্তেজনশীলতা যাহাদের প্রবল, তাহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীর। যাহাদের মধ্যে উত্তেজনশীলতা ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিতান্তই কম, যাহাদের সংজনন শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহারা সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর। উদ্ভিদ হইতে মানুষ পর্যন্ত সকলই একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ।

(২) নির্জীব প্রকৃতি[2] :—ইহা জৈব প্রকৃতির বিপরীত; সজীব জগতের প্রকৃতি-কর্তৃক নির্জীব জগতের প্রকৃতি প্রতিবদ্ধ। সজীব প্রকৃতি সৃষ্টিশীল; নির্জীব প্রকৃতি সৃষ্টি-কার্য্যে অশক্ত। নির্জীব জগৎ বহুসংখ্যক উপাদানের সমষ্টিমাত্র। তাহারা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র; কেবল পরস্পরের পার্শ্বে অবস্থিত, এই মাত্র তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ। নির্জীব প্রকৃতি একটা পিণ্ড[3] মাত্র; যে শক্তিদ্বারা তাহারা একত্র ধৃত, তাহা তাহাদের বাহিরে অবস্থিত, তাহা পৃথিবীর আকর্ষণ। সজীব প্রকৃতির মতো নির্জীব প্রকৃতির মধ্যেও বিভিন্ন স্তর আছে। সজীব জগতে যাহা প্রজনন ক্রিয়া, নির্জীব জগতে তাহাই রাসায়নিক ক্রিয়া (যেমন—দহন-ক্রিয়া)। সজীব জগতে যাহা উত্তেজনশীলতা, তাহাই নির্জীব জগতে তড়িৎ; যাহা সজীব জগতে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, তাহাই নির্জীব জগতে চৌম্বক শক্তি—নির্জীব জগতের সর্ব্বোচ্চ স্তর।

(৩) উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাদ্বারা জৈব ও নির্জীব প্রকৃতির মধ্যে ব্যতিহার বা পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিপন্ন হয়। নির্জীব জগতের অস্তিত্ব ব্যতীত জৈব জগতের কার্য্যের সম্ভব হয় না। প্রকৃতি উভয় জগৎ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয়। ইহা হইতে জৈব ও নির্জীব উভয় জগৎই এক উৎস হইতে উদ্ভূত বলিয়া অনুমিত হয়। নির্জীব জগতের অস্তিত্ব হইতে এক উচ্চতর শক্তি-মূলক ব্যবস্থার[4] অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। সজীব ও নির্জীব জগতের সংযোগ-বিধানের জন্য এবং উভয়কে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য একটি তৃতীয় বস্তুর প্রয়োজন। যাহাদ্বারা সমগ্র জগৎ—জৈব এবং নির্জীব উভয় জগৎ—বিধৃত, এইরূপ এক অভিন্ন আদি কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই জীবদেহ যেমন জীবাত্মা কর্তৃক সঞ্জীবিত, সেই রূপ এই কারণ জৈব ও নির্জীব উভয় জগতের আত্মাস্বরূপ—জগদাত্মাস্বরূপ[5]। এই তত্ত্ব সজীব ও নির্জীব উভয় জগতের মধ্যে দোলায়মান থাকিয়া উভয় জগতের অস্তিত্ব রক্ষা করে। ইহাই এই জগতের পরিবর্ত্তন-রাজির প্রথম কারণ, এবং অন্য জগতের মধ্যস্থ সক্রিয়তার চরম ভিত্তি। শেলিং এইরূপ এক বিশ্বব্যাপী অজীর প্রত্যয়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন। জৈব ও নির্জীব উভয় জগতে বিভিন্ন স্তরের সমান্তরাল ভাবে অবস্থিতিদ্বারা এই অজীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। নির্জীব জগতে যাহা চৌম্বক শক্তির কারণ, তাহাই জৈব-জগতে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির কারণ। চৌম্বকশক্তি ইন্দ্রিয় বৃত্তির উচ্চতর অবস্থামাত্র। আদি কারণ হইতে যাহা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি রূপে জৈব জগতে আবির্ভূত হয়, তাহাই নির্জীব জগতে চুম্বক

---

[1] Organic Nature [2] Inorganic Nature [3] Mass
[4] Dynamic Order [5] World Soul

শক্তিরূপে প্রকাশিত। জৈব জগৎ নির্জীব জগতের উচ্চতর স্তর। চৌম্বক শক্তি, তড়িৎ এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার মধ্যে যাহা ক্রমে নিম্ন হইতে উচ্চতর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা জৈব জগতেও আবির্ভূত হইয়াছে।

(খ) অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম দর্শন

গ্রন্থের প্রারম্ভে শেলিং লিখিয়াছেন :—

"বিষয়ের সহিত বিষয়ীর সংগতির উপর সমস্ত জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। কেননা "জ্ঞান" শব্দের অর্থ, যাহা সত্য, তাহার জ্ঞান, এবং বিষয়ের সহিত তাহার প্রত্যয়ের সংগতিই সর্ব্বত্র সত্য বলিয়া গৃহীত হয়।

"আমাদের জ্ঞানে যাহা সম্পূর্ণ বিষয়গত, তাহার সমষ্টিকে "প্রকৃতি" বলে; যাহা বিষয়িগত, তাহার সমষ্টিকে বুদ্ধি অথবা অহম্ বলে। প্রকৃতি ও বুদ্ধির প্রত্যয় পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। যাহার কার্য্য কেবল বস্তুর প্রতিরূপ (প্রত্যয়) ধারণ করা, তাহাই প্রথমতঃ বুদ্ধি বলিয়া, এবং যাহার প্রতিরূপ-গঠন সম্ভবপর, তাহাই প্রকৃতি বলিয়া গৃহীত হয়—বুদ্ধি চেতনরূপে এবং প্রকৃতি জড়রূপে। কিন্তু জ্ঞানের প্রত্যক কার্য্যেই এই দুইএর মধ্যে—চেতন ও অচেতনের—মধ্যে সংগতি বর্ত্তমান। এই সংগতির ব্যাখ্যাই সমস্যা।

জ্ঞানের মধ্যে বিষয় ও বিষয়ী এমন ভাবে সম্মিলিত থাকে, যে উহাদের মধ্যে কোনটি পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। উভয়েই একই সময়ে বর্ত্তমান, এবং উভয়ে মিলিত হইয়া একই বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে, একতরকে পূর্ব্ববর্ত্তী ধরিয়া আরম্ভ করিতে হয়। যদি বিষয়কে পূর্ব্ববর্ত্তী ধরা যায়, তাহা হইলে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহার সহিত সংগত বিষয়ী কিরূপে তাহার সহিত যুক্ত হয়। আর যদি বিষয়ীকে পূর্ব্ববর্ত্তী ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার সহিত সংগত বিষয় কিরূপে তাহার সহিত যুক্ত হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে হয়।

"বিষয়ের প্রত্যয়ের মধ্যে বিষয়ীর প্রত্যয় নিহিত নাই; পরন্তু বিষয় ও বিষয়ীর প্রত্যয় পরস্পর বিরোধী। প্রকৃতির প্রত্যয়ের মধ্যে এমন কিছু নাই, যে তাহার প্রতিরূপ-ধারণের জন্য অন্য একটি বস্তুকে থাকিতে হইবে। যদি প্রকৃতির জ্ঞানের জন্য অন্য কিছুই না থাকিত, তাহা হইলেও তাহার নিজের অস্তিত্বের কোনও বাধা হইত না, ইহাই মনে হয়। সুতরাং প্রশ্নটি এই ভাবে গঠন করা যাইতে পারে—বুদ্ধি কিরূপে প্রকৃতির উপর প্রযুক্ত হয়; অথবা প্রকৃতি কিরূপে বুদ্ধির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়?

"প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রকৃতিকে জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী ধরিয়া লয়। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরই কাজ।

"প্রত্যেক জ্ঞানের দুইটি মেরু[1] আছে; তাহারা পরস্পরের অপেক্ষা করে। প্রত্যেক বিজ্ঞানেই জ্ঞানের মেরুদ্বয় পরস্পরের সাপেক্ষ। সুতরাং দুইটি মৌলিক বিজ্ঞানের অস্তিত্ব

[1] Poles

স্বীকার করিতে হইবে—একটি প্রকৃতির বিজ্ঞান, অন্যটি বুদ্ধির বিজ্ঞান। জ্ঞানের এক মেরু হইতে আলোচনা আরম্ভ করিলেও অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেই হইবে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধিতে গিয়া উপনীত হয়। প্রাকৃতিক কার্য্যের ব্যাখ্যার জন্য উপপাদ্যের সাহায্য লইতে হয়। বুদ্ধি-কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত "নিয়ম"দ্বারা প্রকৃতির সমস্ত প্রতিভাসের ব্যাখ্যা করিতে হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যখন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তখন সমগ্র প্রকৃতিও তাহার সমস্ত নিয়ম বুদ্ধির ক্রিয়ায় পরিণত হইবে—অর্থাৎ তাহারা জ্ঞান ও চিন্তার নিয়মের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইবে। দেখা যাইবে, যে নিয়ম বুদ্ধিতে বর্ত্তমান, যে নিয়মানুসারে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃতির মধ্যেও বর্ত্তমান। তখন প্রকৃতির উপাদান বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এবং বিজ্ঞানের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে, কেবল "নিয়ম" (আধুনিক বিজ্ঞানে গণিতের এবং গণিতের তত্ত্ব-প্রকাশক সূত্রাবলীর প্রাদুর্ভাব শেলিংএর এই কথার প্রমাণ)। দৃষ্টি-বিজ্ঞান[1] এক প্রকার জ্যামিতি; আলোক-রশ্মি এই বিজ্ঞানে জ্যামিতিক রেখারূপে গণ্য হয়। আলোকও জড় পদার্থ কিনা, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের গভীর সন্দেহ আছে। চুম্বকের দৃশ্যমান রূপ হইতে জড়ীয় উপাদান সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হইয়াছে, এবং পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যে "নিয়ম" ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই "নিয়ম"দ্বারাই জ্যোতিষ্কমণ্ডল-সকল চালিত হয়। প্রকৃতির পূর্ণ ব্যাখ্যা তখনই হইবে, যখন সমগ্র প্রকৃতি বুদ্ধিতে পরিণত[2] হইবে। প্রকৃতির মধ্যে যাহা অচেতন ও মৃত, তাহা আপনাকে প্রতিবিম্বিত করিবার জন্য (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য) প্রকৃতির নিষ্ফল চেষ্টামাত্র। যে প্রকৃতিকে আমরা অচেতন বলিয়া মনে করি, তাহা অপক বুদ্ধি[3] ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রকৃতি অচেতন হইলেও, তাহার কার্য্যের মধ্যে বুদ্ধির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির লক্ষ্য সম্পূর্ণ আত্মসংবিদে উত্তরণ; মানুষে ভিন্ন অন্য সৃষ্টিতে প্রকৃতি আত্ম-সংবিদে উত্তীর্ণ হয় নাই। এই আত্মসংবিদ অথবা প্রজ্ঞায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃতি আপনার দিকে ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করে, এবং আপনাকে দেখিতে পায়। ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয়, যে আমাদের মধ্যে যাহা বুদ্ধিযুক্ত ও চেতন বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা ও প্রকৃতি আদিতে অভিন্ন।

"এখন যদি বিষয়ীকে বিষয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কিরূপে জ্ঞানে বিষয়ের আবির্ভাব হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে হয়। সেই ব্যাখ্যার জন্য প্রথমেই জ্ঞানের মধ্য হইতে বিষয়-সংক্রান্ত সমস্তই বহিষ্কৃত করিতে হইবে। বিষয়ের সত্যতা-সম্বন্ধ "সন্দেহ"র আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক প্রাকৃত বস্তু পর্য্যবেক্ষণ-কালে, তাহার জ্ঞান হইতে যাবতীয় বিষয়িগত অংশ বর্জ্জন করিতে উৎসুক। তাহার পর্য্যবেক্ষণের ফলের সহিত তাঁহার কোনও কল্পনা ও ধারণা মিশ্রিত হইয়া যাহাতে তাহাকে দূষিত না করে, সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তেমনি দার্শনিকও মনের কার্য্যাবলী-পরীক্ষায় সময় যাবতীয় বিষয়গত পদার্থ মন হইতে নিষ্কাশিত করিতে চেষ্টা

[1] Optics [2] Intellectualised [3] Unripe inteelligence

করেন। এই কার্য্যের সাধন "সন্দেহ"। এই "সন্দেহ" কেবল ব্যক্তিগত সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় না, যে সংস্কার সর্ব্ব মানব-সাধারণ, তাহার বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হয়। আমাদের বাহিরে অবস্থিত বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস-রূপ সংস্কার সর্ব্ব-মানব-সাধারণ এবং যাবতীয় সংস্কারের মূল। এই সংস্কার কোনও প্রমাণ-দ্বারা প্রমাণিত করা যায় না। কিন্তু উহার বিরোধী প্রমাণদ্বারা এই সংস্কার নষ্ট করাও যায় না। আমরা বিনা প্রমাণেই অব্যবহিত ভাবে বাহ্য জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করি। কিন্তু বাহ্য পদার্থ আমাদিগের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী, এবং তাহা কিরূপে আমাদের সংবিদের মধ্যে প্রবেশ করে, সে সম্বন্ধে কোনও প্রমাণও নাই। সুতরাং বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে একটি সংস্কারমাত্র বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

"যাহা স্বতঃ-প্রমাণ্য নহে, যাহার অন্য প্রমাণও নাই, তাহাতে অন্ধ ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাকে সত্য বলিয়া আমরা যে গ্রহণ করি, ইহা সম্ভবপর হয় কিরূপে? ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে, যে আমাদের অজ্ঞাতে এই বিশ্বাস অন্য এমন একটি বিশ্বাসের সহিত একীভূত, যাহার সম্বন্ধে আমাদের অব্যবহিত নিশ্চিত জ্ঞান আছে। সেই বিশ্বাসের উপর যে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত তাহা নহে, তাহার সহিত ইহা অভিন্ন। এই অভিন্নতা প্রমাণ করাই অতীন্দ্রিয় দর্শনের কার্য্য।

"প্রত্যেক সংবিদের মধ্যেই "অহম্ অস্মি"—আমি আছি—ইহা ভিন্ন অন্য কোনও নিশ্চিত অব্যবহিত জ্ঞান নাই। "আমাদের বাহিরে বস্তু আছে"—ইহাকে যদি "অহম্ অস্মি"র সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা হইলে উভয় প্রতিজ্ঞা তুল্যরূপে নিশ্চিত বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

"অতীন্দ্রিয় জ্ঞান" এবং সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে দুইটি বিষয়ে প্রভেদ: (১) অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস একটি সংস্কারমাত্র। এই সংস্কার অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ইহার কারণের অনুসন্ধান করে। (বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে, এই সংস্কার যে সাংসিদ্ধিক এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে উৎপন্ন হয়, ইহা প্রমাণ করাই ইহার উদ্দেশ্য)। (২) দ্বিতীয়তঃ "অহম অস্মি" এবং "আমার বাহিরে বস্তু আছে"—এই দুই বাক্য সাধারণ সংবিদে একত্র মিশ্রিত থাকে। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ইহদিগকে বিভক্ত করিয়া লইয়া একটির পরে অন্যটিকে স্থাপিত করিয়া তাহাদিগের একত্ব-প্রতিপাদনের জন্য চেষ্টা করে। সাধারণ জ্ঞানে এই নিয়ত সম্বন্ধ অনুভূত হয় মাত্র। উভয় প্রতিজ্ঞা এইরূপে পৃথক করিয়া অভিজ্ঞতার ঊর্দ্ধে উপবিষ্ট হইয়া দার্শনিক চিন্তা করেন। সাধারণ জ্ঞানে "জ্ঞান" অর্থাৎ জ্ঞানরূপ কার্য্য জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু অভিজ্ঞতার ঊর্দ্ধবর্ত্তী অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান-ক্রিয়ার মধ্যে বিলীন হয়। জ্ঞান-ক্রিয়ার জ্ঞানই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান—সম্পূর্ণ বিষয়-বর্জ্জিত জ্ঞান। অব্যবহিত জ্ঞানে বিষয়ই সংবিদে উপনীত হয়, কিন্তু জ্ঞান-ক্রিয়াটি, যাহা জ্ঞাত হয়, তাহার মধ্যে হারাইয়া যায়; অর্থাৎ তাহার জ্ঞান হয় না। কিরূপে সেই ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহা সংবিদের গোচর হয় না। কিন্তু অতীন্দ্রিয় পর্য্যবেক্ষণে জ্ঞানের বিষয় চকিতে সংবিদের

মধ্যে আবির্ভূত হইয়া অন্তর্হিত হয়, জ্ঞানের ক্রিয়াটি জ্ঞানের গোচরীভূত হয়। সাধারণ চিন্তা প্রত্যয়বহুল হইলেও, তাহাতে প্রত্যয়গুলি প্রত্যয়রূপে জ্ঞাত হয় না। কিন্তু অতীন্দ্রিয় চিন্তা-কার্য্যে চিন্তার স্বাভাবিক গতি প্রতিহত হয়, প্রত্যয় কার্য্যরূপে প্রতীত হয়, এবং চিন্তা তখন প্রত্যয়ের প্রত্যয়ে উন্নীত হয়। দার্শনিক চিন্তা এক প্রকার কার্য্য—মনের কার্য্য,—কিন্তু কার্য্যমাত্র নহে; এই কার্য্যের মধ্যে উক্ত কার্য্যের বিরামহীন জ্ঞান মিশ্রিত থাকে।

"চিন্তার অতীন্দ্রিয় প্রণালীর বিশেষত্ব এই, যে অন্যবিধ চিন্তায় জ্ঞান ও ক্রিয়ার মধ্যে যাহা সংবিদকে এড়াইয়া যায়, এবং জ্ঞানের বিষয় হয় না, এই প্রণালীতে তাহা সংবিদের মধ্যে আনীত হইয়া জ্ঞানের বিষয় হয়। বিষয়ীর কার্য্য ও অবস্থা তখন অবিরাম বিষয়ে পরিণত হইতে থাকে।" আপনাকে অবিরাম কর্ম্ম এবং চিন্তা উভয়ের মধ্যে মগ্ন রাখার সামার্থ্যকে শেলিং Transcendental Art বা অতীন্দ্রিয় কৌশল (কলা) বলিয়াছেন।

ক্যাণ্টের অনুসরণ করিয়া শেলিং অতীন্দ্রিয় দর্শনকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই বিভাগের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের তিনি এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জ্ঞানের মধ্যে বিষয়ীকে প্রধান অংশ বলিয়া গণ্য করিলে, জ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহাই অতীন্দ্রিয় দর্শনের ব্যাখ্যার বিষয় হয়। সমস্ত জ্ঞানকেই কতকগুলি আদিম মৌলিক বিশ্বাস অথবা সংস্কারে পরিণত করা যায়। এই সকল সংস্কার এক মাত্র আদিম সংস্কার হইতে উদ্‌ভূত। তাহাই এই দর্শনের মূল তত্ত্ব। এই তত্ত্বের নিশ্চিতি অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না। ইহা হইতে যাবতীয় অন্য নিশ্চিতি উদ্‌ভূত। এই সকল আদিম সংস্কারের উপর অতীন্দ্রিয় দর্শনের বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ বুদ্ধির মধ্যেই এই সকল সংস্কারের অনুসন্ধান করিতে হইবে। মানুষের বুদ্ধিতে এই সকল সংস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায়: (১) আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত এক বস্তু-জগতের যে কেবল অস্তিত্ব আছে, তাহা নহে; আমাদের মনের মধ্যে বস্তু-জগতের যে সকল প্রত্যয় আছে, তাহাদিগের সহিত এই সকল বস্তুর এমন মিল আছে, যে এই সকল প্রত্যয়ের মধ্যে তাহাদের যে রূপ প্রতিফলিত হয়, তাহার অতিরিক্ত কিছুই তাহাদের মধ্যে নাই। বস্তুর স্বরূপ অপরিবর্ত্তনীয় এবং আমাদের প্রত্যয়ও তাহাদের অবিকল প্রতিবিম্ব। ইহাই আমাদের প্রথম এবং মৌলিক সংস্কার। ইহা হইতেই দর্শনের প্রথম সমস্যার উৎপত্তি। জ্ঞানের বিষয়ের সহিত তাহার প্রত্যয়ের সংগতি—যাহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যয় হইতে স্বতন্ত্র, তাহার সহিত প্রত্যয়ের সম্পূর্ণ মিল কিরূপে সম্ভবপর হয়—ইহাই দর্শনের প্রথম সমস্যা। প্রত্যেক বস্তুর সহিত আমাদের মনে তাহার যে প্রত্যয় আছে, তাহার সম্পূর্ণ সংগতি আছে, অর্থাৎ বস্তুসকল প্রকৃত পক্ষে যাহা, তাহা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, এই বিশ্বাসের উপরই অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত। বস্তু ও তাহার প্রকাশমান রূপের অভিন্নতায় বিশ্বাস না থাকিলে অভিজ্ঞতাও সম্ভবপর হইত না; প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরও সম্ভব হইত না। এই প্রশ্নের সমাধান এবং উপপাদক[1] দর্শন অভিন্ন। ইহাই অতীন্দ্রিয় দর্শনের প্রথম ভাগ।

[1] Theoretical Philosophy

(২) দ্বিতীয় ভাগ—ব্যবহারিক[1] দর্শন। যে সকল প্রত্যয় আমাদের মনে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হয়, যাহাদের উদ্ভব নিয়ত নহে, তাহারা যে চিন্তা-জগৎ হইতে বস্তুজগতে গিয়া তথায় বাস্তবরূপ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ—এই সংস্কার উপরি উক্ত সংস্কারের মতোই আদিম, কিন্তু উহার বিপরীত। প্রথমোক্ত সংস্কার-অনুসারে বস্তুসকল অপরিবর্ত্তনীয়, এবং আমাদের প্রত্যয়সকল তাহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্কার অনুসারে আমাদের প্রত্যয়দ্বারা বস্তুজগতে পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয়। বিষয়-জগৎ স্বাধীনভাবে উৎপন্ন প্রত্যয়দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সংস্কার হইতে যে প্রশ্নের উদ্ভব হয়, তাহা এই: চিন্তাদ্বারা কিরূপে বিষয়ে এমন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, যে পরিবর্ত্তিত বিষয় আমার চিন্তার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-যুক্ত হয়।

(৩) উপরে মনের মধ্যে স্বাধীন ভাবে উৎপন্ন যে সকল প্রত্যয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা "ইচ্ছা"র ক্রিয়া। যে দুইটি সংস্কারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধ। দ্বিতীয় সংস্কার-অনুসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উপর চিন্তার প্রাধান্য স্বীকৃত। কিন্তু প্রথম সংস্কার অনুসারে চিন্তা বিষয়ের দাস, বিষয়-কর্ত্তৃকই চিন্তা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের উপায় কি? "প্রত্যয় বিষয়ের অনুগামী", আবার "বিষয় প্রত্যয়ের অনুগামী," এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপন অতীন্দ্রিয় দর্শনের প্রধান কার্য্য। চিন্তা ও বাহ্য জগতের মধ্যে প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত-সংগতি ভিন্ন এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব। কিন্তু যে ক্রিয়াদ্বারা বাহ্য জগতের উৎপত্তি হয়, তাহা এবং আমাদের "ইচ্ছা"র মধ্যে যে ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, উভয়ের অভিন্নতা স্বীকার না করিলে, এই প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত-সংগতিরও কোনও ধারণা সম্ভবপর হয় না। ইচ্ছার ক্রিয়ার মধ্যে যে সক্রিয়তা প্রকাশিত হয়, তাহা যে সৃজনশীল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা সচেতন সক্রিয়তা। প্রকৃতির মধ্যে যে সক্রিয়তা দৃষ্ট হয়, তাহা অচেতন। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে ইচ্ছার সৃজনশীল ক্রিয়ার মধ্যে যে সচেতন ক্রিয়া বর্ত্তমান, তাহাই প্রকৃতির মধ্যে চেতনাহীন ক্রিয়া, তাহা হইলে এই বিরোধের মীমাংসা হয়, এবং এই প্রাক্-প্রতিষ্ঠিত-সংগতি সত্য হয়। কিন্তু এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যে সক্রিয়তা জগৎ-সৃষ্টিতে নিযুক্ত এবং যাহা ইচ্ছার ক্রিয়ার মধ্যেও প্রকাশিত, উভয়ের অভিন্নতা জগতের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেও পরিদৃষ্ট হইবে, এবং এই সকল বস্তু যুগপৎ সচেতন ও অচেতন সক্রিয়তার সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হইবে। সমগ্র প্রকৃতিও যেমন, তাহার বিভিন্ন সৃষ্ট পদার্থও তেমনি, যেমন চৈতন্য সহযোগে সৃষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তেমনি অন্ধ যান্ত্রিক নিয়মের ক্রিয়ারূপেও প্রতীত হইবে। জগৎ "উদ্দেশ্যের" ফল হইলেও, উদ্দেশ্যদ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রকৃতির উদ্দেশ্যের দর্শন অথবা Teleology উপপাদক ও ব্যবহারিক দর্শনের সংযোগ-সূত্র।

কিন্তু সচেতন ও অচেতন সক্রিয়তার এই একত্ব কোথায় অবস্থিত? মূল তত্ত্ব-অহমের

---

[1] Practical Philosophy

মধ্যে যখন অতীন্দ্রিয় দর্শন এই একত্বের অবস্থিতি প্রতিপন্ন করিতে পারিবে, তখনই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তৃতীয় ভাগের ইহাই আলোচ্য বিষয়। সংবিদের মধ্যে সচেতন ও অচেতন ক্রিয়ার অস্তিত্ব ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যানুভূতিমূলক ক্রিয়াই এই ক্রিয়া। (কলা-সৃষ্টি ইহা হইতেই উদ্ভূত হয়।) কলার আদর্শ-সৃষ্টি এবং প্রকৃতির সৃষ্টি উভয়ই একই সক্রিয়তার ফল। বিষয়-জগৎ চৈতন্যাভিমুখী আত্মার চৈতন্যবিহীন কবিতা[1]। কলার জ্ঞান দর্শনের সার্ব্বিক সাধন। শেলিংএর দর্শনের এই তিন ভাগ ক্যান্টের উপপাদক দর্শন, ব্যবহারিক দর্শন ও কলার দর্শনেরই অনুরূপ।

অতীন্দ্রিয় দর্শনের সাধন

এবংবিধ দার্শনিক আলোচনার একমাত্র সাধন অন্তরিন্দ্রিয়[2]। এই অন্তরিন্দ্রিয়ের যাহা বিষয়, তাহার প্রকৃতি এরূপ, যে তাহা কখনও বাহ্য জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞানের উৎপত্তিপ্রক্রিয়াই মাত্র এই দর্শনের আলোচ্য বিষয়। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এই দর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য বুদ্ধির ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা। এই ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সংসাধিত হয়। এই ক্রিয়ার জ্ঞান-লাভের জন্য এক প্রকার অব্যবহিত বিশেষ আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের প্রয়োজন। দার্শনিক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে বুদ্ধির ক্রিয়ার পর্য্যবেক্ষণের জন্য অনবরত দার্শনিককে প্রথমে বুদ্ধির ক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত সেই সৃষ্টি-কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়। একই সময়ে তাহাকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই হইতে হয়। বুদ্ধির ক্রিয়ার এবংবিধ জ্ঞানে প্রতিফলন কেবলমাত্র কল্পনার সৌন্দর্য্যবোধমূলক[3] ক্রিয়াদ্বারাই সম্ভাবিত হয়। যাবতীয় দার্শনিক গবেষণাই এক প্রকার সৃষ্টিকার্য্য। সুতরাং দর্শন ও আর্ট (কলা) উভয়ই সৃষ্টি-শক্তির[4] উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই সৃষ্টি-শক্তির গতি বিভিন্ন দিকে। কলার-সৃষ্টি বহির্মুখী, দার্শনিক সৃষ্টি অন্তর্মুখী। কলার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অচেতনকে বাহিরে প্রকাশ করা। দার্শনিক সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাহাকে "বুদ্ধির অব্যবহিত জ্ঞানে"[5] প্রতিফলিত করা। এই প্রকার দার্শনিক জ্ঞানের জন্য একটি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। সেই ইন্দ্রিয়কে শেলিং "সৌন্দর্য্য-বোধের ইন্দ্রিয়" নাম দিয়াছেন। এই জন্যই কলার দর্শনকে তিনি দর্শনের প্রকৃত সাধন বলিয়াছেন।

যাহাকে সকলে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার সত্যতা প্রমাণ করা অতীন্দ্রিয় দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। এই বিশ্বাস যে অপরিহার্য্য, তাহা প্রদর্শনই ইহার লক্ষ্য। এই জন্য আমাদের মনের কার্য্যের নিয়ম—যে প্রণালীতে মানসিক কার্য্য সংঘটিত হয় এবং অবশ্যক প্রত্যয় সকল উৎপন্ন হয়, তাহার উদ্‌ঘাটন যেমন আবশ্যক, তেমনি আমাদের

[1] Unconscious poetry
[2] Inner Sense
[3] Aesthetic Act
[4] Productive Faculty
[5] Intellectual Intuition

জ্ঞানেই কেবল যাহার অস্তিত্ব, তাহা বাহ্য বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় আমাদের প্রকৃতির কোন্ বিশেষত্বের জন্য, তাহার আবিষ্কারও আবশ্যক।

উপপাদক দর্শন, ব্যবহারিক দর্শন এবং কলার দর্শনের আলোচনায় পূর্ব্বে সংবিদ-সম্বন্ধে শেলিং যাহা বলিয়াছেন, তাহার বর্ণনা আবশ্যক।

আত্মসংবিদকে শেলিং "প্রথম জ্ঞান"[1] বলিয়াছেন। ইহা হইতেই যাবতীয় জ্ঞানের আরম্ভ। এই আত্মজ্ঞান ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কোনও পদার্থ হইতে (কোনও উচ্চতর সংবিদ হইতে) উদ্‌ভূত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তাহা পড়ে না। আত্ম-সংবিদ কোনও বস্তু নহে, ইহা এক প্রকার জ্ঞান; আমাদের পক্ষে সম্ভবপর জ্ঞানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই জ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে হয়, ইহা হইতে স্বতন্ত্র কোনও বস্তুর উপর ইহা নির্ভর করে কি না, এবং জ্ঞান এইরূপ কোনও বস্তুর অবস্থাবিশেষ কিনা, তাহা অনিশ্চিত। আমরা জানি আত্ম-সংবিদ একটি ক্রিয়া। প্রত্যেক চিন্তাই ক্রিয়া। মনের প্রত্যেক ক্রিয়া-কর্তৃক এক একটি প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়। প্রত্যয় মনন-ক্রিয়ার অতিরিক্ত কিছু নহে, এবং এই ক্রিয়া হইতে বিযুক্ত ভাবেও ইহার অস্তিত্ব নাই। আত্ম-সংবিদরূপ ক্রিয়াদ্বারা একটি প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়। "অহং" প্রত্যয়ই এই প্রত্যয়। আত্ম-সংবিদ-রূপ ক্রিয়ার ফলই "অহং"। এই ক্রিয়ার বাহিরে ইহার অস্তিত্ব নাই। (বাহ্য বস্তুও এই প্রকার মনন-ক্রিয়ার অতিরিক্ত কিছু কি না, তাহাও বিবেচ্য)। যে সকল ক্রিয়া হইতে "অহং"এর উৎপত্তি, যে ক্রিয়াতে "অহং" জ্ঞানের বিষয়-রূপে পরিজ্ঞাত হয়, তাহার পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব নাই। সুতরাং স্বকীয় বিষয়ে পরিণত 'চিন্তাই "অহং"; চিন্তার বাহিরে ইহার অস্তিত্ব নাই। চিন্তায় ইহার ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই "অহমের" উৎপত্তি। এইখানেই চিন্তা ও তাহার বিষয়ের অভিন্নতা প্রথম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভাবে উৎপন্ন আত্ম-সংবিদকে শেলিং বিশুদ্ধ আত্ম-সংবিদ বলিয়াছেন। ইহা ব্যতিরিক্ত আর এক প্রকার আত্ম-সংবিদ আছে। মনের মধ্যে অনবরত ক্রিয়া চলিতেছে, প্রত্যয়ের পরে প্রত্যয় আবির্ভূত হইতেছে। এই সকল প্রত্যয়ের দ্রষ্টারূপে এক অভিন্ন আত্ম-সংবিদ বর্ত্তমান। কিন্তু সমস্ত প্রত্যয় হইতে বিযুক্ত যে আত্মজ্ঞান, যে জ্ঞানে অন্য কোনও প্রত্যয়ের অস্তিত্ব নাই, তাহাই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞান আত্মার[2] জ্ঞান। আত্মা এই জ্ঞানের বিষয়। আবার জ্ঞাতাও আত্মা। সুতরাং এই জ্ঞানে বিষয় ও বিষয়ী অভিন্ন। "যে ক্রিয়াদ্বারা মনন-ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ মননের বিষয়ে পরিণত হয়, এবং বিপরীত ভাবে বিষয় মনন-ক্রিয়ায় পরিণত হয়, তাহাই আত্ম-সংবিদ।" আত্মসংবিদই অহমের একমাত্র ধর্ম্ম। তাহার অন্য ধর্ম্ম নাই। "অহম্" সমস্ত জ্ঞানের তত্ত্ব; ইহা বিশুদ্ধ ক্রিয়া; জ্ঞানে ইহা সম্পূর্ণরূপে বিষয়ত্বহীন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাহার জ্ঞান কিরূপে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরেই শেলিং তাঁহার "বৌদ্ধিক অব্যবহিত জ্ঞানে"র[3] বর্ণনা করিয়াছেন। (১) এই জ্ঞান সম্পূর্ণ স্বাধীন; প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত-দ্বারা এই জ্ঞান হয় না; কোনও সামান্য-প্রত্যয়-দ্বারাও হয় না। এই জ্ঞান অব্যবহিত। (২) যে জ্ঞানের বিষয়

---

[1] First Knowledge [2] Ego [3] Intellectual Perception

সেই জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নয়, যে জ্ঞান তাহার বিষয়ের সৃষ্টি করে, ইহা সেই জ্ঞান। ইহা স্বাধীন ভাবে সৃষ্টিশীল অব্যবহিত জ্ঞান; ইহাতে 'সৃষ্টি' এবং 'সৃষ্ট' অভিন্ন। অক্ষজ জ্ঞানও অব্যবহিত, কিন্তু তাহা সৃষ্টিশীল নহে। তাহাতে প্রতীতি-ক্রিয়া প্রতীত বস্তু হইতে ভিন্ন। এই বৌদ্ধিক অব্যবহিত জ্ঞানকে শেলিং সকল অতীন্দ্রিয় চিন্তার "করণ"[১] বলিয়াছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্ট "অহম্" যে অভিন্ন, তাহা এই করণদ্বারাই জানা যায়। অহম=অহম দ্বারা এই অভেদ প্রমাণিত হয়। এই বাক্য অভেদ-বাচক হইলেও সংশ্লেষমূলক। ইহাই সমগ্র জ্ঞানের মূল তত্ত্ব।

উপপাদক দর্শন

(১) উপপাদক দর্শনে জ্ঞানের প্রথম তত্ত্ব সংবিদ হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার ক্রমিক বিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে। সংবেদন, প্রত্যক্ষ প্রতীতি, পরিচিন্তন প্রভৃতি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দেশ ও কাল, এবং ক্যাণ্টের "প্রকার"গণ কিরূপে প্রত্যক্ষ প্রতীতি হইতে উদ্ভূত হয়, কিরূপে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে "জড়ে"র উদ্ভব হয়, কিরূপে বুদ্ধির ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র রূপে বুদ্ধির জ্ঞান হয়, এবং অসঙ্গ ইচ্ছা আবির্ভূত হয়, শেলিং এই খণ্ডে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যবহারিক দর্শন

(২) ব্যবহারিক দর্শনে সৃষ্টিশীল ইচ্ছার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। "অহং" এই খণ্ডে কেবল জ্ঞাতা নহে, জ্ঞানপূর্ব্বক সৃষ্টিশীল। স্বয়ং-সংবিদ-রূপ অহমের প্রথম কার্য্য হইতে যেরূপ সমগ্র প্রকৃতির উদ্ভব হইয়াছে, তেমনি ইচ্ছার ক্রিয়া হইতে দ্বিতীয় প্রকৃতির উদ্ভব হয়। এই দ্বিতীয় প্রকৃতি, নৈতিক জগৎ, ব্যবহারিক দর্শনের আলোচ্য বিষয়। নৈতিক জগতে ব্যক্তিতে, রাষ্ট্রে এবং ইতিহাসে অভিব্যক্ত হইয়া "ইচ্ছা" কিরূপে নূতন সৃষ্টি করে, তাহা এবং ইতিহাসের গতি ইহাতে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিরূপে অসীম স্বাধীন ইচ্ছা বহু ব্যক্তিগত ইচ্ছার সৃষ্টি করিয়া প্রথমে ধ্বংস-কার্য্যে লিপ্ত হয়, কিরূপে ক্রমে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উচ্ছৃঙ্খলতা দমিত হয়, এবং সার্ব্বিক সংস্কৃতি এবং সার্ব্বিক রাষ্ট্রের অভিমুখে মানব-সমাজ চালিত হয়, এবং পরিণামে ইহা হইতে কিরূপে "মঙ্গল বিধানের"[২] আবির্ভাব হইবে, সুন্দর ভাবে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। শেলিং ইচ্ছার এই অভিব্যক্তিকে তিন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম যুগকে তিনি "নিয়তির" যুগ, দ্বিতীয়টিকে "প্রকৃতির যুগ", এবং তৃতীয়টিকে "মঙ্গল বিধানের" যুগ নাম দিয়াছেন। রোমক সাম্রাজ্যের আবির্ভাব পর্য্যন্ত যুগই নিয়তির যুগ। এই যুগ ধ্বংসের যুগ। দ্বিতীয় যুগ এখনও চলিতেছে। এই যুগের গতি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র এবং সার্ব্বিক সভ্যতা-প্রতিষ্ঠার দিকে। তৃতীয় যুগের আরম্ভ কবে হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। যখন হইবে তখন "ঈশ্বরের" আবির্ভাব হইবে।

[১] Organ [২] Providence

(৩) কলার (আর্টের) দর্শন

বিষয়ী এবং বিষয়ের মধ্যে সংগতি-প্রদর্শনই অতীন্দ্রিয় দর্শনের লক্ষ্য। এই সংগতি—বিষয়ী ও বিষয়ের অভেদই—অহমের স্বরূপ। যাবতীয় সচেতন কর্ম্ম উদ্দেশ্যমূলক। প্রকৃতির মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্ম ও উদ্দেশ্যহীন অচেতন কর্ম্মের মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে উদ্দেশ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতি অচেতন, তাহার সৃষ্টি হয় বিনা উদ্দেশ্যে—অন্ধ-যান্ত্রিক নিয়মে। তাহা হইলেও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে প্রাকৃতিক কার্য্যের গতি, এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার উপযোগী উপায়ও প্রকৃতি-কর্ত্তৃক অবলম্বিত হয়। প্রকৃতির মধ্যে চেতন ও অচেতন কার্য্যের অভেদ দৃষ্ট হয়। চেতন ও অচেতনের এই অভেদ অহমের জ্ঞানের বিষয় এবং বাহ্য জগতে বর্ত্তমান। কিন্তু ইহা অহমের অন্তরেও বর্ত্তমান, এবং তাহা অনুভব-যোগ্য। আর্টিষ্টের দৃষ্টিতে[1] অভেদ প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির সৃষ্টি অজ্ঞানে উৎপন্ন হইলেও সজ্ঞান সৃষ্টিসদৃশ। আর্টের সৃষ্টি সজ্ঞান সৃষ্টি হইলেও অজ্ঞান সৃষ্টি-সদৃশ। আর্টের কার্য্যে বুদ্ধি আপনার স্বরূপের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়। এই সাক্ষাতের ফল অনন্ত তৃপ্তি। তাহার মধ্যে যাবতীয় বিরোধের সমন্বয় হয়। যে অপরিণামী অদ্বৈত সমস্ত সত্তা ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাদ্বারাই এই সমন্বয় সাধিত হয়। আর্টিস্টের দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহার আবরণ উন্মোচিত হয়, এবং আর্টিষ্ট অনিচ্ছা-সত্ত্বে সৃষ্টিকার্য্যে প্রণোদিত হয়। আর্টের মধ্যেই পরম তত্ত্বের প্রকাশ হয়। যে পরম তত্ত্ব যাবতীয় বিষয়ের কারণ, কিন্তু যিনি স্বয়ং কখনও বিষয়ে পরিণত হন না, আর্টদ্বারা তাঁহার বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। প্রকৃতি ও ইতিহাসের মধ্যে যাহা দ্বিধা-ভিন্ন, এবং জীবনে, কর্ম্মে ও চিন্তায় যাহা চির বিভক্ত, তাহার একীভূত আলোক-বর্ত্তিকা বিশ্বমন্দিরের যে গর্ভগুহায় অনন্ত কাল ধরিয়া প্রজ্জলিত আছে, তাহার দ্বার আর্ট দার্শনিকের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

শেলিংএর দর্শনের তৃতীয় যুগ—স্পিনোজার প্রভাব

"Transcendental Idealism" ফিক্‌টের প্রণালীতে লিখিত হইলেও, এই গ্রন্থে শেলিং ফিক্‌টের মত অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। ফিক্‌টের নিকট "অহমের" ব্যবচ্ছেদ কিরূপে হয়, তাহা দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু শেলিং দ্বৈতকে অহমের প্রকৃতিগত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফিকটের মতে বিষয়ী ও বিষয়ের ঐক্য-সাধন অনন্তকাল সাপেক্ষ; গণিতে কোনও বক্র রেখার asymptote যেমন ক্রমশঃ তাহার নিকটবর্ত্তী হয়, কিন্তু কখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনি বিষয়ী ও বিষয়ের ঐক্য ক্রমশঃ নিকটতর হইলেও সসীম কালের মধ্যে কখনও সম্পূর্ণ হইবে না। কিন্তু শেলিং আর্টের সৃষ্টির মধ্যে উভয়ের মিলন দেখিতে পাইয়াছেন। ঈশ্বরকে ফিক্‌টে নৈতিক বিশ্বাসের বিষয়মাত্র বলিয়া বিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থা মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু শেলিং তাঁহাকে আর্টে অব্যবহিত জ্ঞানের

[1] Artistic Perception

বিষয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই পার্থক্য সম্পূর্ণ যখন উপলব্ধ হইল, তখন শেলিং স্বীয় দর্শনকে "বিষয়ি-নিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদ" বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার দর্শন বিষয়নিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদে পরিণত হইয়াছে। স্পিনোজার দিকে আকৃষ্ট হইয়া, এবং তাঁহার গণিতমূলক প্রণালী অবলম্বন করিয়া শেলিং চিন্তা ও সত্তার অভিন্নতা প্রদর্শনে অগ্রসর হইলেন। ইহাই তাঁহার অভিন্নতার দর্শন।

এই যুগের গ্রন্থ সমূহের নাম (১) An Exposition of my system of Philosophy (২) Ideas towards a Philosophy of Nature (৩) The Dialogue of Bruno on the Divine and Natural Principle of things (১৮০২), (৪) Lectures on the method of Academic Study (১৮০৩) এবং (৫) New Journal of Speculative Physics। তাঁহার দার্শনিক জীবনের এই নূতন অধ্যায়ে, শেলিং নূতন পথের পথিক। এই অধ্যায় তিনি আরম্ভ করিয়াছেন "প্রজ্ঞা"র সংজ্ঞা হইতে। "আমি প্রজ্ঞাকে অসঙ্গপ্রজ্ঞা[1] বলি, অথবা যখন ইহা চিন্তার বিষয় হয়, তখন বলি বিষয়-জগৎ ও বিষয়ী-জগৎ মধ্যে নিরপেক্ষতা (বা মাধ্যস্থ্য বা ঔদাসীন্য)[2]। প্রত্যেকেই প্রজ্ঞার ধারণা করিতে সক্ষম; কিন্তু অসঙ্গরূপে ইহার চিন্তা করিতে হইলে মননশীল বিষয়ীকে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হয়। যিনি ইহাকে স্বতন্ত্র করিয়া চিন্তা করিতে সক্ষম, তাহার নিকট প্রজ্ঞা বিষয়িরূপে প্রতীত হয় না, বিষয়রূপেও প্রতীত হয় না, কেন না বিষয়ীর সম্বন্ধেই কেবল বিষয়ের অস্তিত্ব সম্ভবপর। সুতরাং প্রজ্ঞাকে এইভাবে স্বতন্ত্র করিলে প্রজ্ঞা স্বয়ং-সৎ[3] অর্থাৎ মাধ্যস্থ্যে পরিণত হয়। এই মাধ্যস্থ্য বিষয় ও বিষয়ীর নিরপেক্ষ বিন্দু।" বস্তুর স্বরূপের জ্ঞানই দার্শনিক জ্ঞান। প্রজ্ঞায় অবস্থানই বস্তুর স্বরূপে অবস্থান। দেশ ও কালের ব্যবধান, এবং কল্পনা-সৃষ্ট যাবতীয় পার্থক্যের অপনয়ন করিয়া বস্তুর মধ্যে অসঙ্গ প্রজ্ঞাকে দর্শন করাই দর্শনের কার্য্য। কিন্তু যে চিন্তা যান্ত্রিক নিয়ম অনুসরণ করে, তাহাদ্বারা ইহা সম্ভবপর হয় না। সকল বস্তুই প্রজ্ঞায় অবস্থিত, প্রজ্ঞার অতিরিক্ত কোনও কিছুর অস্তিত্ব নাই। প্রজ্ঞাই অসঙ্গ। বস্তুসকল যে রূপে প্রকাশিত হয়, সেই রূপ দেখিতে আমরা অভ্যস্ত। এইজন্য আমরা প্রজ্ঞার মধ্যে তাহাদের যে রূপ, তাহা দেখিতে পাই না। প্রত্যেক বস্তুই স্বরূপে প্রজ্ঞার সহিত অভিন্ন। প্রজ্ঞা সম্পূর্ণভাবেই এক এবং আপনার সহিত অভিন্ন। প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ নিয়ম হইতেছে অভেদের নিয়ম, এবং যখন প্রজ্ঞা ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই, তখন যাবতীয় সত্তাই এই অভেদের নিয়ম-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে একই পদার্থ বর্তমান; সুতরাং উভয়ের মধ্যে গুণগত ভেদ অসম্ভব, পরিমাণ-গত ভেদই তাহাদের মধ্যে আছে। সুতরাং কোনও বস্তুই কেবল বিষয় অথবা কেবল বিষয়ী নহে। প্রত্যেক বস্তুতেই বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই মিলিত

[1] Absolute Reason
[2] Indifference
[3] True-in-itself

আছে, যদিও তাহাদের পরিমাণ বিভিন্ন। কোনটিতে বিষয়ীর পরিমাণ বিষয়ের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক, কোনটিতে তাহার বিপরীত। অসীমের মধ্যে এই পরিমাণ-গত ভেদ নাই। ক=ক, ইহাই অসীমের রূপ। সসীমের রূপ ক=খ। এখানে ক এবং খ বিষয় ও বিষয়ীর বিভিন্ন পরিমাণে সংযোগ। কিন্তু স্বরূপতঃ কোনও বস্তুই সসীম নহে, কেননা অভিন্নতাই বস্তুর স্ব-রূপ। যাবতীয় দ্রব্য যদি এক সঙ্গে দেখিতে আমরা সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বিষয় ও বিষয়ীর পরিমাণের সাম্য অর্থাৎ বিশুদ্ধ অভেদ দেখিতে পাইতাম। সমগ্রের মধ্যে এই পরিমাণগত ভেদ নাই। সমগ্র বিশ্বে অভেদ বর্তমান। কোনও বিশিষ্ট বস্তুর স্বরূপগত অস্তিত্ব নাই। সমগ্রের বাহিরে কোনও স্বরূপতঃ সসীম বস্তু নাই। স্বরূপতঃ বিশ্বের প্রত্যেক অংশেই একই অভিন্নতা বর্তমান। শেলিং চুম্বক লৌহখণ্ডের সহিত অসীমের উপমা দিয়াছেন। চুম্বকের দুই প্রান্তে বিভিন্ন আকর্ষণ। তাহার মধ্য বিন্দুতে দ্বিবিধ আকর্ষণের কোনটাই নাই। অসীম ও তেমনি বিষয়ী ও বিষয়রূপে আপনাকে বিভক্ত করিয়াও নিজে চুম্বকের মধ্য-বিন্দুর মতই উদাসীন।

বিভিন্ন বস্তুতে বিষয়ী ও বিষয়ের পরিমাণগত আধিক্যকে শেলিং Potence (ক্ষমতা)* নাম দিয়াছেন এবং বস্তু-জগতে তিনটি এবং মনোজগতে তিনটি potenceএর উল্লেখ করিয়াছেন। ভার ও আলোক, এবং ভার ও আলোক হইতে উৎপন্ন জীব ও উদ্ভিদ-দেহ বাহ্য জগতের Potence। সমগ্র প্রকৃতি একটি দেহ বলিয়া, তাহা হইতে অন্যান্য দেহের উদ্‌ভব হয়। যে সমস্ত বস্তু প্রাণহীন বলিয়া প্রতীত হয়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে সুষুপ্ত উদ্ভিদ্ অথবা প্রাণী। এক দিন সুপ্তিভঙ্গে তাহারা জীবন্তরূপে প্রকাশিত হইবে। জ্ঞান, কর্ম ও প্রজ্ঞা মনোজগতের তিন Potence জ্ঞান ও কর্মের মিলনই প্রজ্ঞা। এই তিন Potence সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতীক।

অসঙ্গের জ্ঞান—বৌদ্ধিক প্রতীতি

বিষয়ী ও বিষয়ের উর্দ্ধে যে অসঙ্গ অবস্থিত, তাহার জ্ঞানলাভ কি সম্ভবপর? সাধারণ সংবিদে এই জ্ঞানের কোনও পথ খোলা নাই। বিশ্লেষণমূলক ও সংশ্লেষণমূলক

* সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, উভয়ের একত্ব-বিধানের কথা তাহাতে নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির মধ্যে বিক্ষোভ উৎপন্ন হয়, এই বিক্ষোভের ফলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে এবং প্রকৃতি বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। বিভক্তির ফলে যে সকল বস্তুর উদ্ভব হয়, তাহাদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিভিন্ন পরিমাণে বর্তমান থাকে। কোনও বস্তুতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে অভিভূত করিয়া এবং কোনও বস্তুতে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃকে অভিভূত করিয়া বর্তমান। আবার কোনও বস্তুতে তমোগুণের আধিক্য। এই আধিক্যের সহিত শেলিংএর Potenceএর কল্পনার সাদৃশ্য তুলনা করা যাইতে পারে। প্রকৃতির সাম্যাবস্থার সহিত Absoluteএর Indifference ও তুলনীয়।

পদ্ধতিদ্বারা সে জ্ঞান লাভ করা যায় না। এই পদ্ধতিতে সসীম জ্ঞানমাত্রই লাভ করা সম্ভবপর। গণিতের পদ্ধতিতেও এই জ্ঞান অলভ্য। সাধারণ তর্ক প্রণালী, এমন কি তাত্ত্বিক "প্রকার"দিগের ব্যবহার করিয়াও এই জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। শেলিং "বৌদ্ধিক প্রতীতি"কে[১] এই জ্ঞানলাভের প্রথম সোপান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধিক প্রতীতি কি?

যখন কোনও বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, তখন তাহার সত্তা প্রত্যক্ষকারীর চিন্তার সঙ্গে এক হইয়া যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে চিন্তা ও বস্তুর সত্তার একত্ব প্রতীত হয়। কিন্তু সাধারণ প্রত্যক্ষজ্ঞানে চিন্তা এবং কোনও বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর সত্তার একত্বই প্রতীত হয়। কিন্তু প্রজ্ঞা (অথবা বুদ্ধির) প্রতীতিতে অসঙ্গ বিষয়ী-বিষয়ের জ্ঞান হয়—সমগ্র সত্তার অভেদের জ্ঞান হয়। "বৌদ্ধিক প্রতীতি" অসঙ্গ জ্ঞান[২]। ইহার মধ্যে চিন্তা ও সত্তার বিরোধ নাই। বহির্জগতে দেশ ও কালের মধ্যে, চিন্তা ও সত্তার মধ্যে যে অভেদ দৃষ্ট হয়, অন্তরের মধ্যে বুদ্ধির সাহায্যে অব্যবহিত ভাবে তাহা প্রত্যক্ষ করা "বৌদ্ধিক প্রতীতি"। এই অসঙ্গ জ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে অসঙ্গেরই অন্তর্গত। ইহা শিক্ষার বিষয় নহে। ইহার মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নাই। ইহাকে অন্যের নিকট প্রমাণ করাও যায় না। শেলিং এই "বৌদ্ধিক প্রতীতি"কে একটি প্রণালীতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এই প্রণালীকে তিনি "ব্যাখ্যা"[৩] বলিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিশিষ্ট সম্বন্ধ বা বিষয়ের মধ্যে অসীম প্রকাশিত হন, ইহা প্রমাণ করাই এই "ব্যাখ্যা"। শেলিং অসঙ্গের এই জ্ঞানকে বৌদ্ধিক প্রতীতি নামে অভিহিত করিলেও বুদ্ধির সাধারণ ক্রিয়া-প্রণালীতে এই জ্ঞান লব্ধ হয় না, ইহা বুদ্ধির জ্ঞান হইলেও, অব্যবহিত জ্ঞান। প্লেটো, স্পিনোজা ও ক্যাণ্ট যাহাকে Reason বলিয়াছেন, সেই বুদ্ধিদ্বারাই এই জ্ঞান হয়। জেকোবির Faithএর (বিশ্বাসের) সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে।

খৃষ্টধর্ম্মের ব্যাখ্যা

"Lectures on the Method of Academical Study" শীর্ষক বক্তৃতাবলীতে শেলিং যাবতীয় দার্শনিক মত নিজের অভেদবাদ-অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতায় তাঁহার নিজের দার্শনিক মত সুশৃঙ্খল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তিনি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে খৃষ্টধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। ঈশ্বরের দেহ-ধারণ সনাতন। ঈশ্বরের সনাতন জ্ঞানে সসীমের যে জ্ঞান বর্ত্তমান, তাহাই সনাতন ঈশ্বর-পুত্র। ইতিহাসে আবির্ভূত এই জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম রূপই খৃষ্ট। তাঁহার আবির্ভাব-কালের পরিবেশ হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত আবির্ভাব বোধগম্য হয়। কিন্তু ঈশ্বর কালাতীত; কোনও নির্দ্দিষ্ট কালে তিনি মানব-প্রকৃতি গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইবেন, ইহা মনে করা যায় না। খৃষ্টধর্ম্মের

---

[১] Intellectual Perception [২] Absolute Cognition
[৩] Construction

বাহ্যরূপ কালে প্রকাশিত; তাহার অন্তর্নিহিত ভাবের সহিত তাহার সংগতি নাই; এই সংগতি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। কিন্তু এই সংগতির পথে প্রধান বাধা বাইবেল। কুসংস্কার এবং পৌরাণিক কাহিনীর ভাণ্ডাররূপে এই গ্রন্থ অজ্ঞতা চিরস্থায়ী করিয়া প্রজ্ঞার আলোক আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্মের সার-সম্বন্ধেও ইহা অন্য কতকগুলি গ্রন্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। গুহ্যমূলক খৃষ্ট-ধর্ম্মের নব জন্ম, অথবা দর্শন,—ধর্ম্ম ও কবিত্বের সংমিশ্রণোদ্ভূত উচ্চতর নবধর্ম্ম—ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

শেলিং ইতিহাসের প্রারম্ভে এক সত্য যুগের কল্পনা করিয়াছেন। মানুষ যে নিজের চেষ্টায় সহজাত সংস্কার হইতে সংবিদে, পশুত্ব হইতে প্রজ্ঞাতে, আপনাকে উন্নীত করিয়াছে, ইহা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং নিশ্চয়ই বর্ত্তমান মানবজাতির পূর্ব্বে পৌরাণিক কাহিনীতে দেবতা এবং বীর নামে বর্ণিত জাতি-বিশেষের অস্তিত্ব ছিল। উৎকৃষ্টতর জীবের দৃষ্টান্ত হইতেই ধর্ম্ম এবং সভ্যতার উৎপত্তি বোধগম্য হইতে পারে। শেলিংএর মতে সভ্যতাই মানুষের আদিম অবস্থা ছিল, এবং রাষ্ট্র, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম এবং কলার উদ্ভব একই সময়ে হইয়াছিল। এই সকল বিষয় তখন বিভিন্ন ছিল না; ইহারা পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ছিল। ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে শেলিং পরিপূর্ণ বিজ্ঞানের প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

গুহ্য-প্রবণতা ও মত-পরিবর্ত্তন

শেলিংএর উপরি উক্ত মতের মধ্যে যে "মিষ্টিক" অংশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার দার্শনিক চিন্তা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত প্রণালীর আবিষ্কারের জন্য নিষ্ফল চেষ্টা হইতেই এই গুহ্য-প্রবণতা উদ্ভূত হইয়াছিল। অসীমকে তর্কশাস্ত্রানুমোদিত আকারে প্রকাশিত করিবার অসামর্থ্য হইতেই উচ্চতর শ্রেণীর মিষ্টিক ভাবের উদ্ভব হয়। আপনার চিন্তা প্রকাশ করিবার জন্য অস্থির ভাবে সমস্ত পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া শেলিং অবশেষে তাঁহার "ব্যাখ্যা"[1] পদ্ধতি-সম্বন্ধেও হতাশ হইয়া তাঁহার কল্পনার সীমাহীন স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার দার্শনিক মতও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। উপপাদক প্রাকৃতিক দর্শন বর্জ্জন করিয়া, তিনি মনের দর্শনের দিকে ক্রমশঃ অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছিলেন; তাঁহার অসঙ্গের সংজ্ঞাও তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত চিন্তা এবং বাস্তবতার মধ্যস্থলে তাঁহার "অসঙ্গ" অবস্থিত ছিল। এখন হইতে তাহা চিন্তার দিকে সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং চিন্তাই অসঙ্গের মৌলিক গুণ বলিয়া পরিগণিত হইল। চিৎ এবং জড়ের মধ্যস্থ সংগতি ভগ্ন হইয়া গেল, এবং জড় চিতের "ব্যতিরেক" বলিয়া গণ্য হইল। বিশ্বকে এইরূপে অসঙ্গের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী কল্পনা করিয়া শেলিং স্পিনোজার দর্শন বর্জ্জন করিয়া অন্য দিকে ধাবিত হইলেন।

[1] Method

চতুর্থ যুগ—শেলিংএর দর্শনের নব-প্লেটনিক রূপ

ইহার পরে (১) Philosophy and Religion (১৮০৪), (২) Exposition of the True Relation of Nature Philosophy to the amended Fictean Views (১৮০৬), এবং (৩) Annals of Medicine (১৮০৫-১৮৯৮) গ্রন্থে শেলিং-এর দর্শন নূতন পথ অবলম্বন করিয়ছিল। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে "মাধ্যস্থ্য" মত বিবৃত হইয়াছে, তদনুসারে অসীম এবং বিশ্বের মধ্যে ভেদ নাই, প্রকৃতি এবং ইতিহাসে অসীম প্রকাশিত। কিন্তু উপরি উক্ত গ্রন্থ-সমূহে শেলিং অসীম ও জগতের মধ্যে পার্থক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। নব প্লেটনিক মত অবলম্বন করিয়া তিনি জগৎকে অসীম হইতে বিচ্যুত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অসীম হইতে জগতের উৎপত্তি কোনও অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ক্রমে সংঘটিত হয় নাই। জগৎ সম্পূর্ণভাবে অসীম হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। অসীমই একমাত্র সৎ পদার্থ, সসীম বস্তুর মধ্যে কোনও সত্তা নাই। অসীম যে সসীমকে ধারণ করিয়া তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন, তাহা নহে। অসীম হইতে সসীম বহুদূরে অবস্থিত, অসীম হইতে নিম্নে পতিত বলিয়াই তাহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। এই পতন হইতে জগৎকে উদ্ধার করিয়া অসীমের মধ্যে তাহাকে পুনঃ স্থাপনের অভিমুখেই ইতিহাসের গতি। শেলিং Psycheর (আত্মা) পতনের এক পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করিয়া অহং-জ্ঞানের শাস্তিস্বরূপ বুদ্ধি-জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়জগতে তাহার পতনের বর্ণনা করিয়াছেন। জীবাত্মার পুনর্জন্মের কথাও বলিয়াছেন। যে সকল আত্মা সংসারে স্বার্থের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আপনাদিগকে পাপ-মুক্ত করিয়া অসীমের সহিত একত্বানুভব করিতে পারে, তাহারা উন্নততর নক্ষত্রে আবার জন্মলাভ করে; যাহারা পারে না, তাহাদের অধোগতি হয়। প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্মের mysteriesএর আলোচনা শেলিং বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত করিয়াছেন। ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা যে mysteries (গুহ্য ক্রিয়া) ব্যতীত রক্ষিত হইতে পারে না, তাহাও বলিয়াছেন। ধর্ম্মের সহিত দর্শনের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপরি উক্ত সকল গ্রন্থেই বিবৃত হইয়াছে। ধর্ম্ম অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরের অস্তিত্বও অনুভূতির বিষয়। আমাদের সমস্ত অনুভূতির ভিত্তিই ঈশ্বর। ধর্ম্ম ও দর্শন এক না হইলেও, যে দর্শনে বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের পবিত্র মিলন সাধিত হয় না, তাহা দর্শনই নহে। শেলিং বলিয়াছেন, "বিজ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর কিছু আমি জানি। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ব্যতীত বিজ্ঞানের অন্য কোনও প্রণালী যদি না থাকে, তাহা হইলে অসীমের বিজ্ঞান হইতে পারে না ****কিন্তু এক সময় আসিবে, যখন কোন বিজ্ঞানই থাকিবে না, অব্যবহিত জ্ঞান তাহার স্থান গ্রহণ করিবে। যে বিজ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে মানুষের মর্ত্ত্য দৃষ্টির লোপ হয় এবং এক সনাতন আলোক তাহার স্থানে আবির্ভূত হয়। কিন্তু তখন যে দেখে, সে আর মরণশীল মানুষ থাকে না।"

প্রাচীন মিষ্টিকদিগের গ্রন্থ শেলিং শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন দার্শনিকগণ মিষ্টিকদিগের রচনার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু

এই সকল রচনায় অন্তরের সম্পদ্ এত আছে, যে অনেক দার্শনিক আপনাদের দর্শনের সহিত সানন্দে তাহার বিনিময় করিতে প্রস্তুত হইবেন।'

পঞ্চম যুগ

জেকব বোহম-প্রভাবিত দর্শন

"ঐশ্বরিক সত্তা অসীম, নির্ব্বিশেষ, রূপহীন ও অচিন্ত্য। এই অসীম নির্গুণ সত্তা সঙ্কুচিত হইয়া সসীমত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির কেন্দ্রে বা ভিত্তিতে পরিণত হইলেন। তাহার মধ্যে যে গুণরাশি মিলিত অবস্থায় অবিভাজ্য ছিল, তখন তাহারা বিভক্ত হইয়া পড়িল; অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের বিকাশ হইল। সেই বিদ্যুৎ চিৎরূপে বিবদমান গুণরাশি আলোকিত করিল। তখন সেই চিদালোকে ঈশ্বর আবির্ভূত হইয়া অবিনাশী আনন্দরাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।" ঈশ্বরের উৎপত্তি-সম্বন্ধে বোহমের এই মতের সহিত শেলিংএর শেষ মতের বিশেষ মিল আছে। শেলিংএর অসঙ্গ রূপহীন, স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ ও নির্গুণ। তিনি আপনাকে বাহিরে প্রকাশিত করিয়া পরিশেষে এই বাহ্য রূপের সহিত উচ্চতর একত্বে পুনর্মিলিত হন। Nature of Human Freedom গ্রন্থে প্রথম অবস্থায় ঈশ্বর নির্গুণ, ভেদহীন, ভিত্তিহীন, কারণহীন, শূন্যমাত্র; (২) দ্বিতীয় অবস্থায় ঈশ্বর দ্বিধা বিভক্ত সত্তা; তাঁহার ভিত্তি আত্মিক এবং বাস্তব, এই দুইভাগে বিভক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (৩) তৃতীয় অবস্থায়—এই দুই ভাগের পুনর্মিলন এবং আদিম মাধ্যস্থ্যের অভেদে রূপান্তর বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় ঈশ্বরের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, কোনও গুণ নাই। সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী এই অবস্থাকে আদি ভিত্তি[1] অথবা ভিত্তিহীনতা বলা যায়। ইহার মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নাই। বিপরীত-ধর্ম্মী তত্ত্বের সমবায় হইতে ইহার উদ্ভব হয় নাই। ইহার কোনও গুণই নাই—কিছুই ইহার সম্বন্ধে বলা যায় না, ইহা অনির্ব্বাচ্য। ইহাকে বাস্তব অথবা আত্মিক, অন্ধকার অথবা আলোক, কোনও অভিধানে অভিহিত করা যায় না। কেবল "নেতি, নেতি" বলিয়াই ইহার বর্ণনা করা যায়। এই নির্গুণ অবস্থা হইতে দ্বৈতের আবির্ভাব হয়। আদি কারণ দুই অবিনাশী ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই বিভক্তির উদ্দেশ্য প্রেমে তাহাদের পুনর্মিলন, অনির্দ্দেশ্য নির্গুণের প্রাণবান্ নির্দ্দিষ্ট অভেদে প্রকাশ।

ঈশ্বরের পূর্ব্বেও কেহ ছিল না, তাঁহার অতিরিক্তও কিছু ছিল না। তাঁহার অস্তিত্বের কারণ তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। এই কারণ যুক্তিরূপ কারণমাত্র নহে, ইহা বাস্তব পদার্থ। এই কারণই প্রকৃতি—যাহা ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যেই বর্ত্তমান ছিল। ইহা ঈশ্বর হইতে অবিভাজ্য ছিল। ইহার মধ্যে বুদ্ধি ছিল না, ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বুদ্ধি ও ইচ্ছা-প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা ছিল: আপনাকে প্রকাশিত করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। যখন জন্মগ্রহণের আগ্রহে এই প্রকৃতি আন্দোলিত হইতেছিল,

---

[1] Primal Ground

বাত্যাতাড়িত সমুদ্র-বক্ষের মত বিক্ষুব্ধ হইতেছিল, তখন কোনও নিগূঢ় নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের নিজের মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ পরিচিন্তনমূলক জ্ঞানের আবির্ভাব হইল—ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন। ঈশ্বর ভিন্ন তখন জ্ঞানের অন্য কোনও বিষয় ছিল না। তিনি নিজেই নিজের জ্ঞানের বিষয় হইলেন। এই জ্ঞানই ঈশ্বর—ঈশ্বরের নিজের মধ্যে জাত ঈশ্বর। ইহাই সেইণ্ট জন-বর্ণিত ঈশ্বরের—আদি কারণের—মধ্যগত সনাতন বাণী। অন্ধকারের মধ্যে আলোকের মত এই বাণীর আবির্ভাব। জ্ঞান-বিহীন আকাঙ্ক্ষার সহিত ইহা হইতেই বুদ্ধির সংযোগ। বুদ্ধি এই রূপে তমোভূত আদি কারণের সহিত সংযুক্ত হইয়া স্বাধীন সৃজনশীল ইচ্ছায় পরিণত হয়। যে নিয়মবিহীন প্রকৃতি আদি কারণের মধ্যে বিলীন ছিল, তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা-স্থাপনই এই বুদ্ধির কার্য্য, এবং বুদ্ধি-কর্ত্তৃক আদি কারণের এই রূপান্তর হইতেই জগতের সৃষ্টির উদ্ভব। জগতের অভিব্যক্তির দুই যুগ: (১) প্রথমতঃ আলোকের জন্ম—প্রকৃতির ক্রমিক বিকাশের ফলে পরিণামে মানুষের আবির্ভাব; এবং (২) আত্মার জন্ম—ইতিহাসে মানুষের বিকাশ।

প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলা-বিধানকার্য্যে বুদ্ধিকে আদি কারণের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। আদিকারণ আপনা হইতেই সমস্ত সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল, বুদ্ধির সাহায্য চাহে নাই। কিন্তু তাহার সৃষ্ট বস্তু স্থায়িত্বলাভে সমর্থ হয় নাই। প্রাক্‌ঐতিহাসিক যুগের উদ্ভিদ্ এবং জন্তুর দেহাবশেষের মধ্যে এই চেষ্টার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রমে ক্রমে আদি কারণ বুদ্ধির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, এবং ক্রমে নূতন নূতন জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাকৃতিক প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে দুইটি তত্ত্ব বর্ত্তমান: (১) জ্ঞানহীন তত্ত্ব, যাহাদ্বারা ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, এবং জীবের মধ্যে স্বতন্ত্র ইচ্ছার উদ্ভব হয়; (২) বুদ্ধিরূপ ঐশ্বরিক তত্ত্ব—অথবা সার্ব্বিক ইচ্ছা। প্রজ্ঞাবিহীন ইতর জীবের মধ্যে এই দুই তত্ত্বের মিলন হয় নাই। ক্রোধ এবং লোভরূপে ব্যক্তিগত ইচ্ছা তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান। সার্ব্বিক ইচ্ছা বাহ্য প্রাকৃতিক শক্তিরূপে তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে শাসন করে। মানুষের মধ্যেই সার্ব্বিক ইচ্ছার সহিত ব্যক্তিগত ইচ্ছা মিলিত হয়—অসঙ্গ ঈশ্বরের মধ্যে তাহারা যেরূপ মিলিত, সেই রূপ মিলিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে তাহারা অবিভাজ্য, মানুষের মধ্যে তাহারা বিভাজ্য। ঈশ্বর হইতে মানুষের পার্থক্য-বিধানের জন্য এই বিভাগের যেমন প্রয়োজন, তেমনি স্বকীয় স্বরূপে—খণ্ডিত ইচ্ছা এবং সার্ব্বিক ইচ্ছার মিলনরূপে এবং উভয়ের মধ্যগত বিভেদের অতীত প্রেম-স্বরূপ আত্মারূপে ঈশ্বরের প্রকাশিত হইবার জন্যও মানুষের মধ্যে এই বিভাগের তেমনি প্রয়োজন। সার্ব্বিক ইচ্ছা এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছার এই বিভাজ্যতাই মঙ্গল ও অমঙ্গলের উদ্ভবের মূলে বর্ত্তমান। ব্যক্তিগত ইচ্ছার সার্ব্বিক ইচ্ছার অধীনতাই মঙ্গল, উভয়ের বিরোধই অমঙ্গল। মঙ্গল ও অমঙ্গলের অস্তিত্বের সম্ভাবনাই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার মূল। মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও সার্ব্বিক ইচ্ছার সংঘর্ষ বর্ত্তমান, পরিণামে উভয়ের মধ্যে মিলন-সাধনের জন্যই তাহার আবির্ভাব। ব্যক্তিগত ও সার্ব্বিক ইচ্ছার বিরোধ কর্ত্তৃক মানুষের বর্ত্তমান অবস্থা নিয়ন্ত্রিত; তাহার কার্য্যও নিয়ন্ত্রিত। এই অর্থে মানুষ

স্বাধীন নহে। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে স্বাধীনভাবে কৃত কর্ম্মদ্বারাই মানুষের বর্ত্তমান অবস্থা নিয়ন্ত্রিত। কর্ম্ম করিবার সময় মানুষ স্বাধীন, যদিও সার্ব্বিক ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার মধ্যে বিরোধের জন্য মানুষ স্বার্থপর ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার অধীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতেই অমঙ্গলের উদ্ভব। কিন্তু প্রত্যেকের স্বাধীন কর্ম্মদ্বারাই অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়।

প্রকৃতির ইতিহাস আদিকারণ এবং বুদ্ধির মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। মানুষের ইতিহাস ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত সার্ব্বিক ইচ্ছার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। প্রেমের সহিত অমঙ্গলের সংগ্রামের বিভিন্ন ক্রম ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে প্রকাশিত। খৃষ্টধর্ম্ম এই ইতিহাসের মধ্য-বিন্দু। সৃষ্টির মধ্যে প্রেম অমঙ্গলের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। অমঙ্গল হইতে মানুষের উদ্ধার এবং ঈশ্বরের সহিত তাহার পুনর্মিলনের জন্যই খৃষ্ট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্বার্থ-চালিত ইচ্ছা ও প্রেমের মধ্যে মিলন এবং সার্ব্বিক ইচ্ছার রাজত্ব-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জগতেরও শেষ হইবে। তখন সকলের মধ্যেই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত হইবেন। সকলই তাঁহাতে পর্য্যবসিত হইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা উদাসীন ছিল, তাহা অভেদে পরিণত হইবে।

১৮১২ সালে জেকোবি যখন শেলিং-এর দর্শনকে প্রকৃতিবাদ বলিয়া অভিহিত করেন, তখন শেলিং বলিয়াছিলেন, প্রকৃতিবাদ এবং ঈশ্বরবাদের মিলনেই ঈশ্বরের প্রকৃত ধারণা পাওয়া যায়। প্রকৃতিবাদ ঈশ্বরকে জগতের ভিত্তি (ground—জগতে অনুস্যূত immanent) রূপে কল্পনা করে, ঈশ্বরবাদে ঈশ্বর জগতের কারণ (জগদতীত—transcendent)। উভয়ের মিলনেই ঈশ্বরের সত্যরূপ প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর জগতের ভিত্তি ও কারণ উভয়ই। জগতে ঈশ্বর আপনাকে অপূর্ণ হইতে ক্রমশঃ পূর্ণতর রূপে প্রকাশিত করিবেন, ইহাতে ঈশ্বরের স্বরূপের বিরোধী কিছু নাই। পূর্ণতাভিমুখী অপূর্ণতাই পূর্ণতা। পূর্ণতার পূর্ণরূপ-প্রদর্শনের জন্য এই গতির বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজন। ঈশ্বরের মধ্যে একটি অন্ধকার পট-ভূমিকা, এবং ব্যতিরেক তত্ত্বরূপ প্রকৃতির অস্তিত্ব না থাকিলে, ঈশ্বরানুভূতি অর্থহীন হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের মধ্যে যদি কোনও বিভেদ না থাকে, ঈশ্বরের স্বরূপই যদি একমাত্র মৌলিক বস্তু হয়, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে কোনও বাস্তবতা নাই বলিতে হয়। ঈশ্বরের বিস্তারোন্মুখ বাস্তবশক্তির বিরোধী কোনও ব্যবচ্ছেদক ব্যতিরেকী শক্তি যদি তাহার মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাতে ব্যক্তিত্বের আরোপ করা যায় না। যত দিন ঈশ্বরবাদের ঈশ্বরের মধ্যে দ্বৈত অস্বীকৃত হইবে, ততদিন সেই ঈশ্বরকে পুরুষ বলিয়া স্বীকার করা অসম্ভব হইবে।

Mythology and Revelation সম্বন্ধীয় বক্তৃতা-মালায় শেলিং একত্ব-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই সকল বক্তৃতায় তিনি দ্বিবিধ দর্শনের—অন্বয়মুখী এবং ব্যতিরেকমুখী দর্শনের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ করিয়াছেন। যুক্তি হইতে সত্যের রূপমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়; উপপাদক দর্শনদ্বারা সত্যের মধ্যে শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে; কিন্তু বাস্তব সত্তার সাক্ষাৎ কেবল "ইচ্ছার" মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাস্তবের সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য চিন্তার নাই। ইচ্ছাদ্বারাই বাস্তব সৃষ্টি সম্ভবপর। মানবের ইচ্ছা বাস্তব ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লয়। মানবের মনে বাস্তব ঈশ্বরের জন্ম যে ব্যাকুলতা, তাহা হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি—তাহাই ধর্ম্ম[1]। দর্শন হইতে বিশ্বাসের[2] উৎপত্তি হয়, এবং বিশ্বাসদ্বারা দর্শনের পূর্ণতা সাধিত হয়। দর্শনের উন্নতি ব্যক্ত হয় প্রথমে পুরাণে, তাহার পরে প্রত্যাদেশে। ইতিহাসে ঈশ্বরের ধারণা কিরূপে ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, শেলিং তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বেশ্বরবাদ হইতে একেশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ হইতে বহুদেববাদ, এবং বহুদেববাদ হইতে প্রত্যাদেশের ত্রি-মূর্ত্তি ঈশ্বরবাদের উদ্ভব হইয়াছে।

শেলিং খৃষ্টধর্মের ইতিহাসে তিন যুগের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রধান তিন ধর্ম্ম-প্রবক্তা পিটার, পল এবং জনের নামে তিনি এই তিন যুগের নামকরণ করিয়াছেন। পিটারের যুগ ক্যাথলিক যুগ, পলের যুগ প্রটেষ্টাণ্ট যুগ, জনের যুগ ভবিষ্যতের গর্ভে—ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের ধ্বংসের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা হইবে।

সমালোচনা

প্রকৃতির দর্শনে শেলিং আত্মসংবিদের সামগ্রিক বিকাশে প্রকৃতি এবং চিৎ উভয়েরই তুল্য প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব অরোপ করিয়াছিলেন। প্রকৃতি চিন্তারই প্রকাশিত অবস্থা, ইহা কেবলমাত্র চিৎশক্তির বাস্তবতা-প্রাপ্তির সাধন-স্বরূপ অবচ্ছেদমাত্র নহে। ইহা কেবল অভাবাত্মক নহে, ইহা স্বকীয় গঠন এবং বিশেষত্ব-বিশিষ্ট বস্তু। চিৎ ও প্রকৃতি পৃথক হইলেও, চিন্তাই উভয়ের বিকাশের তত্ত্ব। প্রকৃতির মধ্যে চিন্তা সংবিদে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সক্রিয়, চিতের মধ্যে চিন্তা সংবেদন হইতে পরিচিন্তন অভিমুখে অগ্রসর। প্রকৃতির দর্শন এবং চিতের দর্শন সমান্তরাল এবং পরস্পরের পরিপূরক। ইহা হইতে উভয়ের একটা সাধারণ ভিত্তির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এই সাধারণ ভিত্তির অনুসন্ধান হইতেই শেলিং এর অভেদ-দর্শনের উদ্ভব। ইহা হইতেই তাঁহার উদাসীন্ নির্গুণের কল্পনা। ইহার প্রতিবাদে হেগেল রাত্রির অন্ধকারের সহিত শেলিংএর নির্গুণের উপমা দিয়াছিলেন। অন্ধকারের মধ্যে সকল বস্তুই কৃষ্ণবর্ণ, সকলই একরূপ হইয়া যায়। বিশিষ্টতা শেলিং ন্যূনাধিক্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; দুই বিষয়ের মধ্যে এক বিষয়ের আধিক্য বলিয়াছিলেন। যে চিত্রকরের নিকট সবুজ ও লাল ভিন্ন অন্য কোন রং নাই, তাহার চিত্র ও কার্য্যের সহিত হেগেল শেলিংএর এই ব্যাখ্যার উপমা দিয়াছিলেন। এই চিত্রকর চিত্রে কোথাও সবুজ রং, কোথাও লাল রং অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। অভেদ-দর্শনে শেলিং অধ্যাত্মবাদ বর্জ্জন করিয়াছিলেন বলা যায়, কেননা এই মতে অসঙ্গ নির্গুণ, চিৎ নহে।

ফিক্‌টের দর্শন হইতে শেলিংএর দর্শন যে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। প্রকৃতি এবং আর্ট-সম্বন্ধে ফিক্‌টের আলোচনা বিশেষ বিস্তারিত হয় নাই।

---

[1] Religion [2] Faith

কিন্তু শেলিং এই দুই বিষয়ের খুব বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার মধ্যে এমন অনেক ইঙ্গিত ছিল, যাহা সোপেনহর এবং হেগেলের হস্তে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফিকটের দর্শন আরব্ধ হইয়াছিল ক্যাণ্টের Critique of Pure Reason হইতে; শেলিং Critique of Judgment হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বলা যায়। বিরাট এবং সুন্দর-সম্বন্ধে ক্যাণ্টের মত অনেক স্থলে শেলিংএর হস্তে উৎকৃষ্টতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। ক্যাণ্ট ও শেলিং উভয়ের মতেই প্রকৃতি এবং আর্টের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সজ্ঞান সৃষ্টি ও অজ্ঞান সৃষ্টির পার্থক্য। প্রকৃতির মধ্যে উদ্দেশ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু প্রকৃতি কোনও সজ্ঞান উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয় নাই। আর্টের উৎপত্তি অনুপ্রেরণা হইতে; তাহার সৃষ্টি সজ্ঞান। মানুষ নৈতিক জ্ঞানে যে আদর্শে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়া সম্পূর্ণ সফলতা-লাভে সক্ষম হয় না, সেই আদর্শই আর্টে রূপায়িত। ফিকটের দর্শনে নৈতিক প্রবৃত্তির[1] যে স্থান, শেলিংএর দর্শনে আর্টের বৃত্তির[2] স্থান তদনুরূপ। ব্যবহারিক দর্শনে ফিকটের মতের সহিত শেলিংএর বিশেষ প্রভেদ নাই। নিম্নতর প্রবৃত্তির বাধা অতিক্রম করিয়াই যে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হয়, এবিষয়ে উভয়েই একমত। ফিকটে ও শেলিং উভয়েই ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং উভয়েই খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে যুক্তির অনুসন্ধান করিয়াছেন।

ফিকটের শিষ্যরূপে শেলিং তাঁহার দার্শনিক জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে স্পিনোজা এবং ব্রুনোর প্রভাবের বশীভূত হইয়া তিনি স্বতন্ত্র দর্শনের উদ্ভাবন করেন। এই প্রভাবের ফলে ফিকটের দর্শনের মধ্যে যে অদ্বৈতবাদ অপরিস্ফুট ছিল, তাহা পরিস্ফুট হয়। ফিকটে প্রকৃতির গবেষণা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। প্রকৃতিকে মানুষের নৈতিক উন্নতির উপায় বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। তৎকালে যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ফিকটে তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেলিং আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও প্রথমে জড়জগৎকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সহকারী বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। যে নয়, প্রতিনয় এবং সমন্বয়-প্রক্রিয়া-দ্বারা প্রজ্ঞা আত্মসংবিদে বিকাশিত হইয়াছিল, সেই প্রক্রিয়া চেতন ও অচেতন প্রকৃতির মধ্যেও বর্ত্তমান এবং তাহার সাহায্যেই প্রকৃতি সংবিদের উদভাবন করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তিনি প্রকৃতির মধ্যে এই প্রক্রিয়ার প্রমাণ অন্বেষণ করিয়াছিলেন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব এই, যে বিরোধী শক্তির পরস্পর মিলনের ফলে সাম্যাবস্থার উৎপত্তি হয়, এবং পরে শক্তিদ্বয় পৃথক হইয়া উচ্চতর বিকাশে পুনর্মিলিত হয়। এই দুই শক্তির—আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মিলন হইতে জড়ের উদভব। চুম্বক ও বিদ্যুৎ শক্তি হইতে রাসায়নিক আকর্ষণের উৎপত্তি। তিনটি অজৈব শক্তি হইতে জীবনের উদভব হয়; প্রাণী-শরীরে উৎপাদন-শীলতা এবং উত্তেজনশীলতা হইতে অনুভব শক্তির আবির্ভাব হয়। শেলিং এর অভেদদর্শন এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মত-প্রকাশের

[1] Moral Impulse [2] Artistic Faculty

বহুদিন পরে বৈদ্যুতিক প্রবাহদ্বারা লৌহে চুম্বক শক্তি উৎপন্ন হওয়ায় শেলিংএর মত সমর্থিত হইয়াছিল।

শেলিং ইতিহাসকে ঈশ্বরের ক্রমিক আত্মপ্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ঈশ্বর অথবা অদ্বৈতে জড় ও চিৎ মিলিয়া এক হইয়া যায়। ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ বর্ত্তমানে অসম্পূর্ণ হইলেও, ক্রমশঃই পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই আত্মপ্রকাশ কথনও সম্পূর্ণ হইবে না—অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে। সুতরাং দেশ ও কালের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। ঈশ্বরের এই আত্ম-প্রকাশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ফিক্‌টের মতে প্রকৃতির উপর প্রভুত্বলাভ। কিন্তু শেলিংএর মতে আর্টের মধ্যে উভয়ের বিরোধের সমন্বয়ই সেই আদর্শ। আর্টের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টির মধ্যে সজ্ঞান ও অজ্ঞান সৃষ্টির মিলন সাধিত হইয়াছে, যেমন প্রকৃতির মধ্যে তাহাদের মিলন সাধিত হইয়াছে। শেলিংএর এই মত রোমান্টিক সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছিল।

ফিক্‌টে প্রকৃতিকে নিশ্চল,[১] শেলিং সৃষ্টিশীল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফিক্‌টে প্রকৃতিকে সনাতন গতিহীন তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; শেলিংএর মতে অন্তহীন পরিবর্ত্তনের সমষ্টিই প্রকৃতি। ফিক্‌টে কেবল সংবিদের আধেয় বিশ্লেষণ করিয়াছেন, শেলিং সেই সকল আধেয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। যে সনাতন তথ্য ফিক্‌টে বিশ্বের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, শেলিংএর মতে তাহা অন্তরে এবং বাহিরে, সংবিদে ও প্রকৃতিতে উভয়ত্রই ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। বুদ্ধির সম্পদ—তাহার চিন্তা, আদর্শ প্রভৃতি—কিরূপে ইতিহাসে এবং প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশিত হয়, তাহা প্রদর্শন করাই শেলিংএর মতে দর্শনের কার্য্য।

শেলিংএর অসঙ্গ অভেদ ও ফিক্‌টের সার্ব্বিক অহমের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে বিশেষ পার্থক্য নাই। শেলিংএর অসঙ্গ প্রজ্ঞা বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে সাম্য; বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যেও আত্যন্তিক বিরোধ নাই। বিষয় ও বিষয়ীর এই অভেদের সহিত স্পিনোজার অভেদের প্রকৃত পক্ষে কোনও পার্থক্য নাই। শেলিং এই অভেদকে প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এই প্রজ্ঞা গুণহীন, তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলা সম্ভবপর নহে। একত্বের মধ্যে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে—বিষয় ও বিষয়ী পরস্পরের বিনাশসাধন করিয়াছে। প্রজ্ঞা উভয়ের মধ্যে তুল্যভাবে প্রকাশিত বলা, আর উহাদের কোনটীর মধ্যেই প্রকাশিত নহে বলা, একই কথা। শেলিংএর উদাসীন বিন্দু প্রকৃত পক্ষে বস্তুত্বহীন পদার্থমাত্র, শূন্য-গর্ভ নামমাত্র।

---

[১] Stationary

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রোমাণ্টিক দর্শন

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়োরোপের সাহিত্য ও আর্টে এক নূতন চিন্তা-প্রণালীর আবির্ভাব হয়। এই চিন্তাপ্রণালী "রোমাণ্টিক" নাম পরিচিত। দর্শনের সহিত ইহার প্রথমে বিশেষ সম্পর্ক না থাকিলেও, পরে দর্শন ইহাদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। ভাব-প্রবণতা ইহার বিশেষত্ব ছিল।

রুসো হইতে এই চিন্তা-প্রণালীর সূত্রপাত হয়॥ রুসোর নিজের জীবনে ইহা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সমগ্র জীবন ভাবাবেগদ্বারা পরিচালিত ছিল। ভাবাবেগের প্রাবল্য-বশতঃ তিনি প্রচলিত সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন, সভ্যতাকে মানবতার শত্রু বলিযাছিলেন, এবং সভ্যতা হইতে দূরে অরণ্যের মধ্যে গিয়া কিছু দিন বাসও করিয়াছিলেন। রুসোর পূর্ব্বেও কাহারও কাহারও চিন্তা এই খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। রুসো এই চিন্তাকে বিশিষ্ট রূপ দান করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী যুক্তির যুগ। যুক্তিই এই যুগে সত্যের একমাত্র "কষ্টি" "বলিয় গৃহীত হইয়াছিল। রুসো অনুভূতিকে যুক্তির উর্দ্ধে স্থান দিয়াছিলেন, এবং মানবের জীবনে অনুভূতির একটা বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

পরের দুঃখে সহানুভূতি এই চিন্তা-প্রণালীর প্রধান বিশেষত্ব। এই ভাবের যাঁহারা ভাবুক ছিলেন, তাঁহারা দারিদ্র্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই.তন। রাজসভার দূষিত পরিবেশ ও নগরের কোলাহল হইতে দূরে পল্লীগ্রামের শান্ত সন্তুষ্ট জীবন তাহাদের নিকট লোভনীয় ছিল। প্রচলিত সমাজ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-নীতির বন্ধন তাহাদিগের নিকট অসহ্য বোধ হইত। "জীবনের পূর্ণতা"-লাভের জন্য তাঁহারা লালায়িত ছিলেন। "জীবনের পূর্ণতার" অর্থ জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ, এবং যত প্রকারের অভিজ্ঞতা সম্ভবপর, তাহা লাভ করা। এই জন্য সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রকাশ্য ভাবে লঙ্ঘন করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে ঈদৃশ সামাজিক বিদ্রোহ চিত্তাকর্ষক রূপে চিত্রিত হইত।

রোমান্টিকদিগের যে নৈতিক বোধ ছিল না, তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের ভালমন্দ বিচারের "কষ্টি" ভিন্ন ছিল"। পূর্ব্বে লোকে সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে ভয় করিত, এবং প্রবল ভাবাবেগের সমাজবিরোধী পরিণাম-সম্বন্ধে তাহারা সচেতন ছিল। সামাজিক শান্তির নিরাপত্তার জন্য স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতা তাহারা উপলব্ধি করিত। বিমৃশ্যকারিতা তখন বিশিষ্ট গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত ; এবং শিষ্টাচার সভ্য সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য্য এবং ভাবাবেগ-দমন শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও ভদ্রলোকের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে লোকের মনোভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। রুসোর

সময়ে অনেকে শান্তি ও শৃঙ্খলাকে ভার বলিয়া মনে করিতেছিল, এবং উত্তেজনার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবে উত্তেজনা প্রচুর পরিমাণেই সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবের পরে যে শান্তি আসিল, তাহাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্ভাবনা রহিল না। রোমাণ্টিক আন্দোলন ইহার বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য আন্দোলন।

ভালোমন্দর বিচারে সৌন্দর্য্যই রোমাণ্টিকদিগের একমাত্র কষ্টি ছিল। তাহাদের রুচি সাধারণের রুচি হইতে ভিন্ন ছিল। এক দিকে যেমন প্রচুর গোচারণ ভূমি, গবাদি পশু ও উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র-সমন্বিত পল্লীগ্রাম তাহাদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিত, অন্যদিকে দুরারোহ পর্ব্বতমালা, উন্মাদিনী স্রোতস্বতী, পথবিহীন নির্মানব অরণ্যানী, বজ্রনাদসঙ্কুল ঝটিকা, বাত্যা-বিক্ষুব্ধ মহাসাগর প্রভৃতির সমাবেশ তাহাদের রচনায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যাইত। তাহাদিগের উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা স্থাপিত হইত সাধারণতঃ মধ্যযুগে, ইয়োরোপ হইতে বহু দূরে। ভূত, প্রেত, প্রাচীন ধ্বংসোন্মুখ দুর্গ, প্রাচীন বংশের দারিদ্র্যগ্রস্ত উত্তরাধিকারী, জলদস্যু, মেস্‌মেরিস্‌মে পারদর্শী লোক প্রভৃতি তাহাদের উপন্যাসে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় তাহাদের বর্ণিত ঘটনার সহিত বাস্তবের কোনও সাদৃশ্যই পাওয়া যায় না। কোলরিজের Ancient Mariner এবং Kubla Rhan এই শ্রেণীর রচনা।

রোমাণ্টিকগণ বলবান চিত্তাবেগ ভালবাসিত; সে চিত্তাবেগের পরিণাম যাহাই হউক, তাহা গ্রাহ্য করিত না। সেই জন্যই পরিণাম-চিন্তাবিহীন ভাবাবেগচালিত সমাজ-ও-রাষ্ট্র-বিদ্রোহী চরিত্র তাহাদের রচনায় প্রচুর দৃষ্ট হয়। বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যাপারের প্রতি তাহাদের অপরিসীম অবজ্ঞা ছিল। ব্যক্তিকে প্রচলিত সমাজ ও নীতির বন্ধন হইতে মুক্ত করা ইহার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য স্পিনোজার কর্ম্মনীতি জার্মান রোমাণ্টিকদিগের নিকট সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিল।

রোমাণ্টিক আন্দোলন ফ্রান্সে উদ্‌ভূত হইলেও জার্মানিতেই ইহা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কোলরিজ ও শেলিং জার্মান রোমাণ্টিকগণ কর্তৃকই প্রভাবিত হইয়াছিলেন। জার্মানীতে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন গেটে। মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ তাঁহার আদর্শ ছিল। জীবনকে তিনি আর্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার Wilhelm meister গ্রন্থে তাঁহার মত সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। "সংস্কৃতিকে" তিনি জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গণ্য করিতেন। সংস্কৃতিদ্বারাই সংসারের মধ্যে সংগতির প্রতিষ্ঠা হয়, আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং প্রকৃতি ও কলার মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়। গেটের মতে জগৎ একটি বিরাট কলা-সৃষ্টি। তিনি ঠিক দার্শনিক না হইলেও, স্পিনোজার মত অবলম্বন করিয়া সর্ব্বেশ্বরবাদী হইয়াছিলেন, এবং জগৎ-কারণ চিৎরূপী আত্মা ক্রমে ক্রমে আপনাকে অচেতন ও চেতন জগতে ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শেলিংএর অভেদবাদ হইতে এই চিন্তাধারা সমর্থন লাভ করিয়াছিল। মানুষ এক দিকে যেমন প্রকৃতির সৃষ্টি, তেমনি প্রকৃতির জ্ঞাতা ও ব্যাখ্যাতা, শেলিংএর এই মত জার্মানির যুবক সাহিত্যিকগণের শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিল। প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের এক একটি স্বতন্ত্র "প্রত্যয়", প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য আছে, প্রত্যেক প্রত্যয়ের পূর্ণ বিকাশই সেই উদ্দেশ্য—এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বাদ

জার্মান যুবকগণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। এই যুগের লেখকগণ যে আত্মাকে যাবতীয় পদার্থের উৎস এবং মানদণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে আত্মা সার্ব্বিক আত্মা নহে, তাহা ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত আত্মা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির আধার অহম্।

জার্ম্মানির রোমান্টিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে গেটে, হার্ডার এবং শিলারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জার্মানির রোমান্টিক দর্শনের সহিত ফিকটে, জেকোবি অথবা শেলিংএর দর্শনের কাহারও সম্পূর্ণ মিল নাই। যদিও ইহাতে ফিকটের দর্শনে বিবৃত আত্মাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তথাপি কর্ম্মনীতির উপর সেরূপ গুরুত্ব আরোপিত হয় নাই। ফিকটের নৈতিক আগ্রহ ও চারিত্রিক ওজস্বিতাও ইহাতে লক্ষিত হয় না। যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর ইহাতে গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহাও স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে, তাহার মধ্যে অসীমত্ব এবং সার্ব্বিকতার ভাব অনুপ্রবিষ্ট। ইহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের অনন্ত সংবিদে আত্মবিলোপের জন্য উন্মুখ। এই খানে এই দর্শনের উপর শেলিংএর প্রভাব অনুভূত হয়। নোভালিস্ ও শ্লেগেলের মধ্যে শেলিংএর মিষ্টিক ভাব বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

নোভালিস্

নোভালিসের প্রকৃত নাম Frederick Leopold von Hardenberg। ১৭৭২ সালে তাঁহার জন্ম হয়, এবং ২৯ বৎসর বয়সে ১৮০১ সালে তিনি অকালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব এবং কবিত্বমণ্ডিত চরিত্র সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি সিলারের প্রভাবাধীন হন। ফিকটে শেলিং এবং শ্লায়ারমেকারের তিনি বন্ধু ছিলেন। প্রথমে ক্যাণ্টের মতাবলম্বী হইলেও তিনি স্পিনোজা এবং শেলিংএর দর্শনদ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনিই স্পিনোজাকে "ঈশ্বরোন্মাদ" আখ্যা দিয়াছিলেন। মিষ্টিক ভাবপূর্ণ তাঁহার রচনার মধ্যে শৃঙ্খলার একান্ত অভাব ছিল। ইচ্ছার স্বাধীনতাই তাঁহার মতে আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি। দার্শনিক জ্ঞান ব্যতীত যেমন নৈতিক বোধ অসম্ভব, তেমনি নৈতিক বোধ ব্যতীতও দার্শনিক জ্ঞান অসম্ভব। ঈশ্বরের ভয় হইতেই নৈতিক বোধের উদ্ভব; ঈশ্বরের ইচ্ছা-সম্পাদন করিবার ইচ্ছাই আমাদের সত্য ইচ্ছা। সমস্ত বস্তুই তমসাচ্ছন্ন; যুক্তিদ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নহে। সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত, ঈশ্বরও সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে অবস্থিত। জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিতে হইলে, বিশ্বাসের প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা কবি প্রকৃতির রহস্য বুঝিতে অধিকতর সমর্থ। জীবন কবিতারই প্রকাশ। যাবতীয় বস্তুতেই কবিত্বের প্রকাশ। সমগ্র বিশ্ব আত্মাকর্তৃক পরিব্যাপ্ত। সাধারণ কর্ম্মও কবির দৃষ্টিতে সুন্দর দেখায়। "যুক্তির ক্ষত"[১] কবিতা-দ্বারা বিদূরিত হয়। যুক্তির উপাদান হইতে কবিতার উপাদান সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহান্ সত্য এবং সুখদায়ক ভ্রান্তি

১ Wounds of reason

উভয়ই কবিতার উপাদান। অন্যত্র নোভালিস্ বলিয়াছেন—"কবিত্ব নির্ব্যূঢ় সত্য।" "যাহা যতই কবিত্ব পূর্ণ, তাহা ততই সত্য।" "জীবন একটা কলা। কলার অবস্থান বুদ্ধিতে। বুদ্ধি আপনার স্বাভাবিক বোধশক্তি অনুসারে সৃষ্টি করে। সৃষ্টিকার্য্যে কল্পনা, বোধশক্তি এবং বিচার তাহার সহযোগী। প্রকৃত কলাকৌশলী আপনাকে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়া তুলিতে পারে।" মানুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। চিন্তা এক প্রকার কর্ম্ম। দৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা অদৃষ্ট বস্তুর সহিত আমরা ঘনিষ্ঠতর বন্ধনে আবদ্ধ। দর্শন এক প্রকার (প্রবাসীর) গৃহ-পিপাসা—গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য ব্যাকুলতা। জীবন একপ্রকার তৃষ্ণা। কর্ম্ম দুঃখভোগ। বিশ্রাম আত্মার নিবাস। মানুষ প্রকৃতির উদ্ধার-কর্ত্তা। যখন কেহ কোনও মানুষকে স্পর্শ করে, তখন সে স্বর্গ স্পর্শ করে। স্বার্থত্যাগ প্রকৃত দর্শন-সম্মত কর্ম্ম। মৃত্যু ও জীবন অভিন্ন। প্রত্যেকের অন্তরে মহাকালের বাস। পীড়া এবং মৃত্যুর ভিতর দিয়াই অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইত্যাদি মনোহারী বচনাবলী-দ্বারা নোভালিসের রচনা সু-সমৃদ্ধ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব।

ফ্রেডারিক শ্লেগেল (১৭৭২—১৮২৯)

ফ্রেডারিক শ্লেগেল এবং তাঁহার ভ্রাতা অগাষ্ট জার্মানির রোমাণ্টিকদিগের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। রোমাণ্টিক দর্শনের প্রচারের জন্য দুই ভ্রাতা The Athenaeum নামক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। শ্লেগেলের Philoscphy of History এবং History of Literature এবং Language and Wisdom of the Indians বিখ্যাত গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থের ফলে ইয়োরোপে সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষার জন্য আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্লেগেলই সোপেনহয়রের দৃষ্টি উপনিষদের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁহার Lucinde নামক উপন্যাসে স্বাধীন প্রেমের সমর্থন করিলেও, শেষ জীবনে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দর্শনে অধ্যাত্মবাদী হইলেও, তিনি স্পিনোজার সর্ব্বেশ্বরবাদ গ্রহণ করেন নাই।

শ্লেগেলের মধ্যে বিষয়িনিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদ এবং সর্ব্বেশ্বরবাদের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনায় ইহা পরিপূর্ণ। তাঁহার মতে আমাদের প্রত্যেকের মনে অসীমের প্রত্যয় সহজাত। এই অসীমের মধ্যে একত্ব এবং বহুত্ব উভয়ই বর্ত্তমান। ঈশ্বরের প্রত্যয় যুক্তি হইতেও পাওয়া যায় না, ইন্দ্রিয় হইতেও পাওয়া যায় না। প্রত্যাদেশ হইতেই ইহা পাওয়া যায়। ঈশ্বর ও জগৎ উভয়ই অনবরতই পরিবর্ত্তনশীল। বিশ্বের আত্মার সহিত শ্লেগেল ঈশ্বরের পুত্রকে অভিন্ন বলিয়াছেন। বিশ্বের আত্মার ক্রমবিকাশই ইতিহাস; ইহাই ঈশ্বরের চিন্তার ব্যক্ত অবস্থা। Reformationকে শ্লেগেল "মানুষের দ্বিতীয় বার পতন" আখ্যা দিয়াছিলেন।

দর্শনের উপর শ্লেগেলের প্রভাব অতি সামান্য।

ফ্রান্‌জ্‌ বাডার (১৭৬৫-১৮৪১)

ফ্রান্‌জ্‌ বাডারও রোমান ক্যাথলিক ছিলেন। তিনি খৃষ্ট-ধর্ম্মের মত হইতে তাঁহার দর্শনের আরম্ভ করিয়াছিলেন। টমাস্‌ একুইনাস্‌, একহার্ট, প্যারাসেলসাস এবং জেকব বোহ্‌ম্‌ তাঁহার আদর্শ ছিলেন। ধর্ম্ম হইতে দর্শনকে পৃথক করা তিনি অসঙ্গত মনে করিতেন। যুক্তিবাদকে তিনি ভীষণ ঘৃণা করিতেন। তাঁহার মতে সসীম জীবাত্মার মধ্যে অসীম পরমাত্মার অবস্থিতির জন্যই জীবাত্মা আত্ম-সংবিদ-লাভে সমর্থ হয়। ঈশ্বর অখণ্ড জীবন, তিনি সত্তা এবং ভবন উভয়ই; তাঁহা হইতে "ভবনের" অবিচ্ছেদ ধারা অনন্ত কাল বাহির হইয়া আসিতেছে; তিনি নিজেই এই ভবনধারা। ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে ইচ্ছা, জ্ঞান এবং প্রকৃতি এই তিন পদার্থ বর্ত্তমান। ইচ্ছা হইতে ঈশ্বরপুত্রের জন্ম। জ্ঞান হইতে পবিত্রাত্মার উদ্‌ভব, এবং প্রকৃতি হইতে সৃষ্টির আবির্ভাব। পাপের আবির্ভাব এবং তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ঐতিহাসিক ঘটনা। খৃষ্টের রক্তদ্বারা মানুষের মুক্তি সাধিত হয়। বাডার রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের সহিত তাঁহার দার্শনিক মতের সামঞ্জস্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কার্ল ক্রজ্‌ (১৭৮১-১৮৩২)

ক্রজ ঈশ্বরবাদের সহিত সর্ব্বেশ্বর-বাদের মিলন-সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং শেলিং হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দর্শনের নাম দিয়াছিলেন Theosophy অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান। তাঁহার মতে আত্মসংবিদই যাবতীয় জ্ঞানের উৎস। অহংরূপী আত্মার মধ্যে যে সমস্ত শক্তি ও প্রবৃত্তি আছে, তাহাদের মধ্যে আছে তিনটি বৃত্তি—চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা। এই সকল বৃত্তির ব্যবহারের সময় আমরা আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব অবগত হই, এবং আত্মজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে জীবনের অসীম তত্ত্ব ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করি। তাহা হইতেই সমস্ত সসীম দ্রব্যের উদ্‌ভব। এই অসীম তত্ত্বকে ক্রজ Essence (সার) বলিয়াছেন। ঈশ্বরই একমাত্র Essence—একমাত্র সত্তা—যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহার সমষ্টি। ক্রজ ঈশ্বরকে ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট পুরুষ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে এই ঐশ্বরিক সত্তা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বরের মনের মধ্যস্থ আদর্শ অনুসারে এই বিকাশ সাধিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সত্তা বস্তুহীন প্রজ্ঞামাত্র নহে, ইহা জগতের জীবন্ত পুরুষরূপী কারণ। ক্রজ আপনার দর্শনের নাম দিয়াছেন Panentheism। শেলিংএর মত তিনি বিশ্বকে "ঐশ্বরিক দেহ"[1] বলিয়াছেন। দেহের জীবনী-শক্তির ক্রিয়ার ফলে মানুষের ও পরে সমাজের উদ্‌ভব হইয়াছে। মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সংঘের উৎপাদনের দিকেই ইতিহাসের গতি।

জগতের সর্ব্বত্রই প্রকৃতির সহিত প্রজ্ঞার মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাণী-জগতেও এই মিলন আছে, কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ মিলন মানুষের মধ্যেই সাধিত হইয়াছে। বিশ্বমানবের

[1] Divine Organism

মাত্র একাংশের সহিতই আমরা পরিচিত—যে অংশ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু মানুষের সর্ব্বোত্তম নিয়তি কেবল নিজের মধ্যে বদ্ধ থাকা নহে, অন্যের সহিত মিলিত হইয়া অবশেষে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়াই সেই নিয়তি। মানুষ কিরূপে স্বীয় জীবনে ঈশ্বরকে প্রকাশিত করে, এবং ঈশ্বর মানুষের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন, ধর্ম্মের দর্শনে তাহাই প্রদর্শিত হয়।

মূলতত্ত্ব "সারের" আলোচনা হইতে নানা বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমেই পরিমাণের[1] বিজ্ঞান। ক্রজ ইহাকে ম্যাথেসিস্[2] নামে অভিহিত করিয়াছেন। দেশ, কাল, গতি, শক্তি, প্রভৃতি এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তাহার পরে লজিক—চিন্তার রূপ ও নিয়মই ইহার আলোচ্য। লজিকের পরে সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান। ক্রজ বলেন, ঈশ্বরের সাদৃশ্যই সৌন্দর্য্য। কর্ম্মনীতি-সম্বন্ধে ক্রজ বলিয়াছেন, পরম মঙ্গলের যতটা মানব-জীবনে আয়ত্ত করা সম্ভবপর, তাহা জীবনে রূপায়িত করাই কর্ম্মনীতির সার। "মঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়াই ইচ্ছা কর, এবং মঙ্গল বলিয়াই মঙ্গল কর্ম্ম কর"—ইহাই ক্রজের নৈতিক সূত্র। পাপ এবং দুর্ভাগ্যের আকর অমঙ্গলের[3] স্বাধীনতা নাই। তাই ইহা ক্ষণস্থায়ী।

ইতিহাসের দর্শনের আলোচনায় ক্রজ ইতিহাসকে তিন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন:—শৈশব-যুগ, যৌবনের যুগ এবং প্রৌঢ় যুগ। মানুষের আদিম অবস্থাই প্রথম যুগ। সত্যযুগ-সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে মানবের শৈশব-যুগের স্মৃতি রক্ষিত আছে। যীশুর আবির্ভাবের সহিত বহু দেবে বিশ্বাসী এই যুগের অবসান হয়। দ্বিতীয় যুগ একেশ্বর-বাদের এবং পুরোহিতদিগের আধিপত্যের যুগ। সংসার এই যুগে অবজ্ঞাত। তৃতীয় যুগ ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের যুগ। মানবের চেষ্টায় এই যুগে ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার পরে ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর এক যুগের আবির্ভাব হইবে—তাহাই মানবজাতির লক্ষ্য, তাহাই তাহার নিয়তি। মঙ্গল এই যুগে পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবে পরিণত হইবে। এই যুগের বর্ণনায় ক্রজ কল্পনার নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন—যুক্তির সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন।

শ্লায়ারমেকার (১৭৬৮-১৮৩৪)

চিন্তার প্রত্যেক বিভাগে শূন্যগর্ভ প্রত্যয় এবং নীরস যুক্তিবাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই রোমাণ্টিকতা। যুক্তিবাদের সহিত বাস্তবজীবনের সম্পর্ক নাই, এবং ব্যক্তির সুখ, দুঃখ, আশা ও আকাঙ্ক্ষার কোনও মূল্যই তাহাতে নাই। কিন্তু সমগ্র জগতের যুক্তিসংগত ধারণার মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের স্থান নির্দ্দেশ করাই রোমাণ্টিকতার প্রধান লক্ষ্য। রোমাণ্টিক দর্শন বাস্তব জীবনের দর্শন। শেলিং এই দর্শনের প্রধান বক্তা এবং শ্লায়ার-মেকার ইহার ধর্ম্মবিজ্ঞানের প্রধান ব্যাখ্যাতা।

১৭৬৮ সালে শ্লায়ারমেকার ব্রেস্‌ল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ফিক্‌টে, শেলিং এবং

---

[1] Magnitude [2] Mathesis [3] Evil

হেগেল তাঁহার সমসাময়িক। জার্মানির শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদিগের তিনি অন্যতম। শিক্ষা-সমাপনান্তে তিনি ধর্ম্মযাজকের পদ গ্রহণ করেন। ১৭৯৬ সালে তিনি বার্লিনের এক হাসপাতালে চ্যাপ্‌লেন পদে (পুরোহিতের) নিযুক্ত হন। এই সময়ে শ্লেগেলের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। শ্লেগেলের প্ররোচনায় তিনি প্লেটোর গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করেন। ১৭৯৯ সালে তাহার Discourse on Religion এবং ১৮০০ সালে Monologues প্রকাশিত হয়। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের নাম—System of Ethics, Christian Faith এবং Addresses on Religion to its cultured Critics,

শ্লায়ারমেকার বলেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে দুইটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। অনেকের মতে জ্ঞানই ধর্ম্মের সারভাগ। আবার অনেকে মনে করেন, নৈতিক চরিত্রের সহায়ক রূপেই ধর্ম্মের মূল্য—ইহার নিজের কোনও মূল্য নাই। উভয় মতই ভ্রান্ত। তিনি বলেন, জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে ধর্ম্মের মধ্যে। ধর্ম্ম কেবল ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ প্রভৃতি বিষয়-সম্বন্ধে বিশিষ্ট মতমাত্র নহে। ধর্ম্ম জীবনের বিশিষ্ট রূপ, জীবনে রূপায়িত করিবার বস্তু। ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট জীবন। ধর্ম্ম অনুভব করিবার বস্তু; কেবল ব্যাখ্যার বিষয় নহে। ব্যক্তির জীবনে তাহা রূপায়িত হয়। ধর্ম্মই মানুষের প্রধান বিশেষত্ব। ইহার প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহার সংস্কৃতি যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, অবজ্ঞাদ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। যাবতীয় ভ্রান্তি-বিবর্জ্জিত চিন্তা ও কর্ম্মের মূলে ধর্ম্ম। সকল মানবে যাহা সাধারণ, যাহা মানবের সার্ব্বিক অংশ, তাহার সহিতই যদিও ধর্ম্মের সম্পর্ক, তথাপি প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশিত না হইলে, তাহার মধ্যে সার্ব্বিকের প্রকাশ হইতে পারে না। সুতরাং আপনার মধ্যে সার্ব্বিকের প্রকাশের জন্য প্রত্যেকের প্রথম কর্ত্তব্য আপনার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করা। সেই কর্ত্তব্য হইতেছে আপনার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ বিকাশিত করা—তাহার যে 'প্রত্যয়' ঈশ্বরের মনে বর্ত্তমান, স্বকীয় জীবনে তাহাকে বাস্তবতা দান করা। ঈশ্বরের বহুমুখী প্রত্যয় এই উপায়েই ব্যক্তির মাধ্যমে জগতে বাস্তবে পরিণত হইতে পারে।

শ্লায়ারমেকারের মতে ধর্ম্মবোধ প্রত্যেক মানুষের সহজাত। ধর্ম্ম ধর্ম্মের জন্যই প্রয়োজনীয়। ধর্ম্ম হইতে উদ্‌ভূত কোনও উপকারের উপর ধর্ম্মের প্রয়োজন নির্ভর করে না।

জ্ঞান-সম্বন্ধে শ্লায়ারমেকার বলেন, যদিও অদ্বৈত জ্ঞান—যে জ্ঞানে চিন্তা ও সত্তা, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য থাকে না, যাহার মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়—যদিও এবংবিধ জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তথাপি ইহা মানুষের অধিগম্য নহে; এতাদৃশ জ্ঞান কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা সসীম জীব বলিয়া দ্বন্দ্বের হস্ত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যে দ্বন্দ্ব আমাদের স্বভাবের অন্তর্গত বলিয়া এই দ্বন্দ্বই আমাদের প্রধান অন্তরায়। শ্লায়ারমেকার এই দ্বন্দ্বকে মানুষের দৈহিক ও বৌদ্ধিক অংশের দ্বন্দ্ব নামে অভিহিত করিয়াছেন। ক্যাণ্টের মত তিনিও জ্ঞানের উপাদান এবং রূপের কথা বলিয়াছেন। —উপাদান ইন্দ্রিয় হইতে প্রাপ্ত, রূপ বুদ্ধি হইতে, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান এই উপায়ে লভ্য নহে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ সে জ্ঞানের মধ্যে নাই। সে জ্ঞানে চিন্তা এবং সত্তা—জ্ঞের

ও জ্ঞাতা—এক হইয়া যায়। তর্ক অথবা বিজ্ঞানদ্বারা সে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করা যায় না। ক্যাণ্টের কর্ম্মাভিমুখী প্রজ্ঞাদ্বারাও তাহা অধিগম্য নহে। এই জ্ঞান লাভ করা যায় অব্যবহিত ভাবে—তখন চিন্তা ও সত্তা এক হইয়া যায়। ঈশ্বরের স্বরূপ কি, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। কোনও গুণের আরোপ তাঁহাতে করা যায় না। তিনি আদি কারণ; সত্তা ও চিন্তার ব্যবচ্ছেদ-বিহীন একত্ব, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অভেদ। পার্থিব দ্বন্দ্বের মধ্যে—আমাদের আপেক্ষিক ও দ্বন্দ্বমূলক জ্ঞানের মধ্যে—তাঁহাকে নামাইয়া আনিয়া আমরা তাঁহাতে ব্যক্তিত্বের আরোপ করি। এই বিশ্ব তাঁহার প্রতিবিম্ব; তিনি জীবের অন্তরে বর্ত্তমান। তাঁহাকে পাইতে হইলে অন্তরের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হয়। আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি অনুপ্রবিষ্ট। ব্যক্তিত্বাপন্ন আত্মাই একমাত্র সৎবস্তু—বিশ্ব তাহারই প্রতিবিম্ব। আপনাকে ধ্যান[1] করিবার সময় জ্ঞানের সমস্ত দ্বন্দ্ব অন্তর্হিত হয়, এবং জীবাত্মা ধ্যানকালে চিরন্তনের রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়। এই আত্মার ধ্যানই ধর্ম্মনিষ্ঠা[2]। যিনি এই অবস্থায় উপনীত হন, তিনি সমস্ত বেষ্টনী[3] অতিক্রম করেন। বাহ্য জীবনের যৌবন, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি তাহার শান্তির ব্যাঘাত করিতে পারে না। এই অবস্থা—ঈশ্বরের সাযুজ্য—বুদ্ধি অথবা ইচ্ছাদ্বারা লভ্য নহে। ইহা অনুভূতিগম্য। অব্যবহিত জ্ঞানেই আমরা অসঙ্গের সাক্ষাৎ পাই। অনুভূতির মধ্যে মানুষ ও ঈশ্বর এক হইয়া যায়।

অসীমের ঈদৃশ জ্ঞানই ধর্ম্ম। অনুভূতিই ধর্ম্মনিষ্ঠার ভিত্তি। ঈদৃশ অনুভূতির স্বরূপ কি? শ্লায়ারমেকার বলেন, ঈশ্বরের উপর অনন্যাপেক্ষ নির্ভরের অনুভূতিই এই অনুভূতি। জাগতিক দ্রব্যের উপরও আমরা নির্ভর করিয়া থাকি। কিন্তু সে নির্ভর আপেক্ষিক। আপেক্ষিক নির্ভরের অনুভূতির সহিত ঈশ্বরের উপর অনপেক্ষ নির্ভরের অনুভূতি একসঙ্গে বর্ত্তমান থাকে। সসীম অসীমের মধ্যে বর্ত্তমান; অসীমের সত্তাতেই সসীমের সত্তা; এই পরিণামী কালিক জগৎ সনাতনেরই প্রকাশমাত্র; ঈশ্বরের মধ্যে এবং ঈশ্বরের মাধ্যমে যাপিত জীবনই প্রকৃত জীবন—ইহার অনুভূতিই ধর্ম্ম।

ঈশ্বর জগতের বাহিরে এবং তাহার পশ্চাৎ ভাগে অবস্থিত এক অদ্বিতীয় পুরুষ—ঈশ্বর-সম্বন্ধে এই ধারণা ধর্ম্মের আদিও নহে, অন্তও নহে। ইহা ঈশ্বরকে প্রকাশ করিবার একটি রীতি হইলেও, এই রীতি বিশুদ্ধও নহে, ইহাদ্বারা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিতও করা যায় না। দুঃখকষ্টের মধ্যে সান্ত্বনা দিবার জন্য ও দুঃখকষ্ট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ঈদৃশ এক পুরুষের প্রয়োজন মানুষ উপলব্ধি করিয়া থাকে। এই প্রয়োজন-সাধনের জন্য এইরূপ এক পুরুষের কল্পনা করা যাইতে পারে, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা না থাকিলেও এইরূপ পুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস হইতে পারে? কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস ইহা নহে। ঈশ্বর জগতে এবং আমাদের অন্তরে যে ভাবে বর্ত্তমান, তাহার অব্যবহিত অনুভূতিই ধর্ম্ম।

আবার যেরূপ অমরতায় অনেকে বিশ্বাস করেন, অথবা বিশ্বাসের ভাণ করেন, ধার্ম্মিক জীবনের লক্ষ্য যে অমরতা, তাহা হইতে তাহা ভিন্ন। সে অমরতা ভাবী অমরতা নহে,

---

[1] Self Contemplation [2] Piety [3] Limits

"কালের বাহিরে, অথবা পশ্চাৎ ভাগের, অথবা তাহার পরবর্ত্তী অমরতা" নহে। এই মর জীবনে বর্ত্তমানেই আমরা সে অমরতা প্রাপ্ত হইতে পারি। সেই অমরতার সন্ধানে চিরকাল আমাদের থাকিতে হইবে। সসীমতার মধ্যে অসীমের সহিত এক হইয়া যাওয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে সনাতন বলিয়া আপনাকে বোধ করা, ইহাই সেই অমরতা। "যখন ব্যক্তিত্বের কোনও অনুভূতিই থাকে না, যখন ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহার অনুভূতি ভিন্ন অন্য কোনও অনুভূতিই থাকে না, যাহা ব্যক্তিগত এবং বিনশ্বর, তাহার অনুভূতি যখন সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যায়, তখন যাহা অবিনশ্বর এবং সনাতন, তাহা ভিন্ন সেই অনুভূতির মধ্যে অন্য কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। যাহা কিছু বিনশ্বর, তাহা বর্জ্জন করিয়া বাস্তবপক্ষে যে জীবনে আমরা অমরতা উপভোগ করি, সেই জীবনই ধার্ম্মিক জীবন। কিন্তু যে ভাবে অধিকাংশ লোক অমরতা এবং তাহার জন্য ব্যাকুলতার ব্যাখ্যা করেন, আমার নিকট তাহা ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত তাহার স্পষ্ট বিরোধ। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের যাহা লক্ষ্য, তাহার প্রতি বিতৃষ্ণাই অমরতার জন্য ব্যাকুলতার কারণ। আমাদের ব্যক্তিত্বের সুনির্দ্দিষ্ট বেষ্টনীর প্রসারদ্বারা ক্রমশঃ অসীমের মধ্যে তাহার বিলোপ-সাধন, এবং "সর্ব্বের" অনুভূতির মধ্যে যতদূর সম্ভব তাঁহার সহিত এক হইয়া যাওয়াই যাবতীয় ধর্ম্মপিপাসার লক্ষ্য। কিন্তু ইহাই তাহারা চায় না। তাহারা অভ্যস্ত বেষ্টনীর বাহিরে যাইতে অনিচ্ছুক। সংসারের (সুপরিচিত) অবস্থার সদৃশ অবস্থাই তাহাদের কাম্য। তাহাদের ব্যক্তিত্বের রক্ষার জন্য তাহারা ব্যাকুল। ফলে ব্যক্তিত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইবার যে সুযোগ মৃত্যু হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া, তাহারা ব্যক্তিত্বকে সঙ্গে লইয়া এই জীবনের পর পারে যাইতে চায়, এবং মৃত্যুর পারে যাহা পাইবার কামনা করে, তাহা বিস্তৃততর দৃষ্টি-শক্তি এবং উৎকৃষ্টতর দেহ ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। কিন্তু (শাস্ত্রে যেমন আছে)—ঈশ্বর তাহাদিগকে বলেন, "আমার জন্য যে তাহার জীবন হারাইবে, সে তাহা প্রাপ্ত হইবে, এবং যে তাহা প্রাপ্ত হইবে, সে তাহা হারাইবে।" যে জীবন তাহারা রক্ষা করিতে চায়, তাহা রক্ষা করা অসম্ভব। যদি তাহাদের ব্যক্তিত্বের চিরস্থায়িত্বই তাহাদের কামনার বিষয় হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিত্বের বিগত অংশের জন্য তাহাদের ভাবনা নাই কেন? কেবল তাহার ভবিষ্যতের জন্যই তাহারা চিন্তিত কেন? অতীত অংশ যদি হাতের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ অংশের মূল্য কি? যতই তাহারা (তাহাদের মনোমত) অমরতার জন্য ব্যাকুল হয়, ততই তাহারা যে অমরতা সর্ব্ব সময়েই লাভ করা যায়, তাহা হইতেও বঞ্চিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্লেশ-ও-বিরক্তি-জনক চিন্তা তাহাদিগকে মর জীবনের সুখ শান্তি হইতেও বঞ্চিত করে। ঈশ্বরে প্রীতির বশে তাহারা ঈশ্বরে তাহাদের জীবন সমর্পণ করুক। যতদিন পৃথিবীতে আছে, তত দিন অদ্বিতীয় "সর্ব্বে" তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, তাঁহার মধ্যে জীবনধারণ করুক। আপনা অপেক্ষা বড় হইতে যিনি শিখিয়াছেন, তিনি জানেন, আপনাকে হারানোর ক্ষতি কত সামান্য।" উপরি উদ্ধৃত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে স্লায়ারমেকার ব্যক্তিগত অমরতায় বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার প্রকাশিত পত্রাবলীতেও

ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।* স্বামী শোকাতুরা হেনরিএটা শ্লায়ারমেকারকে লিখিয়াছিলেন, "আমার দুঃখের মধ্যেও আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে ভালবাসা ছিল, তাঁহা স্পষ্ট স্মরণ করিয়া, এবং ঈদৃশ ভালবাসা অনন্তকাল-স্থায়ী এবং ঈশ্বর-কর্তৃক ইহার ধ্বংস অসম্ভব, কেননা ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ, ইহা মনে করিয়া, আমি শান্তি পাই। এই জীবন আমি রক্ষা করিতেছি, কেননা শিশুদিগের জন্য—তাঁহার ও আমার শিশুদিগের জন্য—আমার করণীয় কার্য্য এখনও অবশিষ্ট আছে! কিন্তু হা ঈশ্বর! কি গভীর ব্যাকুলতার সহিত—কি অবর্ণনীয় সুখের প্রত্যাশায়—তিনি যে জগতে বর্ত্তমান, আমি তাহার দিকে চাহিয়া আছি। মৃত্যু আমার নিকট আনন্দ-স্বরূপ। আবার কি আমি তাঁহার দেখা পাইব না? হা ভগবান! শ্লায়ার, যাহা কিছু ঈশ্বরের প্রিয় এবং পবিত্র, তাহার নামে আমি তোমাকে একান্ত অনুরোধ করিতেছি, পারো যদি, আমাকে নিশ্চিত আশা দেও, যে আমি আবার তাঁহার দেখা পাইব, তাঁহাকে চিনিতে পারিব। এ বিশ্বাস যদি তোমার না থাকে, তাহা হইলে আমার কি হইবে? ইহার জন্যই আমি বাঁচিয়া আছি, ইহার জন্য শান্ত ভাবে আমি সকলই সহ্য করিতেছি। ইহাই আমার অন্ধকারময় জীবনপথে একমাত্র আলোক-রশ্মি—আবার তাঁহাকে পাইব, আবার তাঁহার জন্য জীবন ধারণ করিব। তুমি জানো, কখন শোক আমার তীব্রতম হইয়া ওঠে? যখন মনে হয়, সেই ভবিষ্যতে অতীতের কোনও মূল্য থাকিবে না, যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, সেই হবে তাঁহার নিকটতম; আর তাঁহাকে যাহারা ভালবাসে, তাহাদের অনেকেই আমা অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। আবার যখন ভাবি, তাঁহার আত্মা সর্ব্বের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, অতীত চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর কখনও ফিরিবে না, তখন এই চিন্তা আমি সহ্য করিতে পারি না। বন্ধু, আমাকে বল, কোন্‌টি সত্য?" এই ব্যাকুল প্রার্থনার উত্তরে শ্লায়ারমেকার লিখিয়াছিলেন, "তুমি চাও, তোমার কল্পনার প্রসব-বেদনা হইতে উদ্‌ভূত (রঙ্গীন) চিত্রাবলী আমি সত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করি। আমি কি বলি? এই জীবনের পরে কি আছে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান আমাদের নাই। আমাকে ভুল বুঝিও না। আমি যে নিশ্চিতির কথা বলিতেছি; তাহা আমাদের কল্পনার সৃষ্টি-সম্বন্ধে নিশ্চিতি। কল্পনা চায়, প্রত্যেক বস্তু নির্দ্দিষ্ট আকার-যুক্ত ভাবে দেখিতে। কল্পনাসৃষ্ট সেই রূপ-সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিতি নাই, ইহাই আমি বলিতেছি। নতুবা, মৃত্যু নাই, আত্মার বিনাশ নাই, ইহা একান্ত ভাবে নিশ্চিত। ইহা যদি নিশ্চিত না হইত, তাহা হইলে কোনও বিষয়েই নিশ্চিতি থাকিত না। ইহা সত্য, যে ব্যক্তিগত জীবনে আত্মা তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, কেবল সেই স্বরূপের ছায়া উহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়। পরে তাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা আমরা জানি না। তাহা আমাদের জ্ঞানের অতীত। আমরা কল্পনাই মাত্র করিতে পারি।"

ইহার উত্তরে বিধবা লিখিলেন, "হায়, সে ছায়া তবে চিরকালের জন্যই অন্তর্হিত হইয়াছে। যে ব্যক্তিগত জীবনমাত্রই আমি জানিতাম, তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে, তিনি

* Vide Martineau's Study of Religion vol II-P .P-336-39

আর Ehrenfried নহেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট গিয়াছেন নিরাপদ ভাবে রক্ষিত হইবার জন্ম নয়, তাঁহার মধ্যে চিরকালের জন্ম বিলীন হইবার জন্ম!!" এই বিলাপের শ্লায়ারমেকার যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা এই: "সেই বিরাট সর্ব্বের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবার কথা যখন তুমি কল্পনা কর, তখন তোমার উপর শোকের প্রলেপ যেন না পড়ে। ইহাকে মৃত্যুতে বিলয় মনে করিও না, জীবনের সহিত মিলন বলিয়া গণ্য করিও—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনের সহিত মিলন বলিয়া ভাবিও। এ জীবনে ইহার জন্মই সকলে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কখনও ইহা প্রাপ্ত হই না। আমরা সর্ব্বরূপ ঈশ্বরের অংশ। আমরা স্বাধীন, এই ধারণা বর্জ্জন করিয়া, সেই সর্ব্বের মধ্যে জীবন ধারণ করাই আমাদের লক্ষ্য। তোমার স্বামী যদি ঈশ্বরের মধ্যে জীবিত থাকেন, আর তুমি তাঁহার মধ্যেই যেমন ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতে, এবং তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে, তেমনি যদি অনন্ত কাল তুমি ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাকে ভালবাস, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা মহত্তর কিছু কল্পনা করিতে পার কি? ইহাই কি প্রেমের সর্ব্বোত্তম পরিণতি নয়?" ঈশ্বরের মধ্যে Ehrenfried যে স্বতন্ত্র ভাবে বর্ত্তমান থাকিবেন, তাহাকে হেনরিয়েটা Ehrenfried বলিয়া চিনিতে পারিবে, একথা শ্লায়ারমেকার বলেন নাই। অনন্ত কাল ধরিয়া ভালবাসার কি অর্থ, তাহাও বোধগম্য হয় না। অনন্ত কাল ভালবাসিবার জন্ম হেনরিএটাকে স্বকীয় ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিতে হইবে। তাহার পক্ষে ব্যক্তিত্ব-রক্ষা যদি সম্ভবপর হয়, তবে Ehrenfriedএর পক্ষে তাহা অসম্ভব কেন?

Christian Taith গ্রন্থে শ্লায়ারমেকার খৃষ্টীয় ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং খৃষ্টের সহিত এই ধর্ম্মনিষ্ঠার সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মানুভূতির মধ্যে তিন বিষয়ের অনুভূতি মিশ্রিত আছে:—(১) ঈশ্বরানুভূতি, (২) পাপের অনুভূতি, এবং (৩) খৃষ্টকর্ত্তৃক পাপ হইতে পরিত্রাণের অনুভূতি। ঈশ্বরের অনুভূতির মধ্যে ঈশ্বর-কর্ত্তৃক আমাদের সৃষ্টির অনুভূতি নাই; তিনি আমাদের পালন করিতেছেন এবং আমরা তাঁহার উপর নির্ভরশীল, এই অনুভূতি আছে। ঈশ্বর সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু তাঁহার গুণ-সম্বন্ধে কিছু বলা অসম্ভব। আত্মার উপর দেহের জয়লাভ এবং আমাদের নিম্নতর স্বভাবের পরাধীনতাই পাপ। ইহাই সকল মানুষের প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া নিম্নতর স্বভাবের পরাধীনতাই "আদিম পাপ"। খৃষ্টের ধর্ম্মানুভূতি সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল। ঈশ্বরের অনুভূতি পরিপূর্ণ রূপে তাঁহাতে সদাই বর্ত্তমান ছিল—এইখানে অন্ম মানুষের সহিত তাঁহার পার্থক্য। কিন্তু তাঁহার চরিত্রেরও ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছিল, এবং মানব-সাধারণ অপূর্ণতাও যে তাঁহার মধ্যে ছিল, ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে। তাঁহার চরিত্রের ধর্ম্মীয় অংশেই তিনি পূর্ণ ছিলেন। তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন। এই জন্মে খৃষ্ট নূতন আধ্যাত্মিক জীবন এবং ঈশ্বরের সহিত সংযোগ-বিধানের উপায়। মানুষের মধ্যে স্বকীয় ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি সংক্রামিত করিয়াই তিনি পাপ হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহার সহিত মিলনদ্বারা পাপের বিনাশ এবং মার্জ্জনা-বোধ জন্মে।

উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে শ্লায়ারমেকারের মতে ধর্ম্ম যে বিষয়িগত, ইহা যে সম্পূর্ণ

অন্তরের বস্তু, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। পাপ মানুষের আত্ম-বিকাশের নিম্নতর অবস্থা-মাত্র, ইহার কোনও বাস্তব সত্তা নাই। খৃষ্ট যে কোনও বাহ্য অমঙ্গল হইতে মানুষের পরিত্রাণ করেন, তাহা নহে, তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি-বিধান করেন।

মঙ্গল, সৎগুণ এবং কর্ত্তব্য, এই তিন ভাগে শ্লায়ারমেকারের কর্ম্মনীতি আলোচিত হইয়াছে। আদর্শ ও বাস্তবের, প্রজ্ঞা এবং মানবপ্রকৃতির চরম মিলনই পরম মঙ্গল। নৈতিক কর্ম্মে প্রবৃত্তিই সৎ গুণ, এবং নৈতিক নিয়মানুযায়ী কর্ম্মই কর্ত্তব্য। বিমৃশ্যকারিতা,[1] নিষ্ঠা,[2] ভূয়োজ্ঞান এবং প্রেমই মৌলিকগুণ।[3] নৈতিক আচরণের ক্ষেত্র চারিটী:—(১) মানুষে মানুষে সম্বন্ধ, (২) সম্পত্তি, (৩) চিন্তা ও (৪) অনুভূতি। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ হইতে অধিকারের, বস্তুতে স্বামিত্ববোধ হইতে "স্বত্বে"র, চিন্তা হইতে "বিশ্বাসের" এবং অনুভূতি হইতে প্রত্যাদেশের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র, সমাজ, সম্প্রদায় এবং ধর্ম্মসংঘ-রূপ প্রতিষ্ঠানে এই সকল ভাব বাস্তবতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্লায়ারমেকার "ঈশ্বরের মধ্যে স্বাধীনতা"-লাভের কথা বলিয়াছিলেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব আছে, তাহার বিকাশ-সাধনের জন্য প্রবৃত্তি, এবং বিশ্বরূপ ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার মধ্যে মিশিয়া যাইবার প্রবৃত্তি—মানবজীবনে এই দুইটি বিভিন্ন প্রবৃত্তি বর্ত্তমান। এই বিরোধী প্রবৃত্তিদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয়ই "ঈশ্বরের মধ্যে স্বাধীনতা"। ঈশ্বরের মধ্যেই কেবল ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর, এবং ঈশ্বরের মধ্যে এই পূর্ণ বিকাশ-দ্বারাই তাহার স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে। পাপকে শ্লায়ারমেকার ব্যতিরেক মাত্র বলিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক জীবন তাঁহার মতে মানুষের প্রাকৃতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অবিচ্ছেদ প্রগতিশীল জীবন। ঈশ্বরের মধ্যে এবং তাঁহার মাধ্যমেই জীবনের পরিপূর্ণতা সম্ভাবিত। শ্লায়ারমেকারের দর্শনে রোমান্টিকবাদ তাহার মহত্তম পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তিনিই প্রথমে ধর্ম্মের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাসের মধ্যে, এবং ব্যক্তির ধর্ম্মবিবেক ও তাহার সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিবেকের মধ্যে, বিরোধের সমন্বয়-সাধনের জন্য তাঁহা অপেক্ষা সুষ্ঠুতর ভাবে আধুনিক যুগে আর কেহই আলোচনা করেন নাই।

সংশোধন

৩৪০ পৃষ্ঠার পঞ্চম পংক্তির "যেমন (১) আকাশ নীল" হইতে আরম্ভ করিয়া নবম পংক্তির "তৃতীয় বাক্যটি সত্য" পর্য্যন্ত কয়েক পংক্তি বাদ দিয়া পড়িতে হইবে। যে উদাহরণটি তথায় দেওয়া হইয়াছে, তাহা অন্যত্র প্রযোজ্য। অনবধানে তথায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

---

[1] Prudence [2] Constancy [3] Cardinal Virtues

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

হেগেল

(১৭৭০-১৮৩১) জীবনী

১৭৭০ সালে স্টাটগার্ট নগরে হেগেলের জন্ম হয়। হেগেলের বাল্যজীবন-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই; তাঁহার পিতা প্রাদেশিক অর্থবিভাগের একজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। হেগেল টিউবেনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি কোনও কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার ডিগ্রীর সনন্দে লেখা ছিল, তিনি উৎকৃষ্ট মেধা ও চরিত্রের অধিকারী; ধর্ম্মতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার আছে; কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রে দক্ষতা নাই। কয়েক



হেগেল

বৎসর গৃহশিক্ষকের কাজ করিয়া তাঁহাকে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পরে প্রায় ১৫০০ ডলার উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া তিনি গৃহ-শিক্ষকতা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বন্ধু শেলিংকে এই সময়ে লিখিত এক পত্রে তিনি কোথায় বাস করিবেন, সে সম্বন্ধে পরামর্শ চাহিয়াছিলেন, এবং যেখানে সাধারণ খাদ্য এবং গ্রন্থের প্রাচুর্য্য আছে, এইরূপ এক স্থান নির্দ্দেশ করিতে বলিয়াছিলেন। শেলিংএর পরামর্শানুসারে ১৮০১ সালে হেগেল জেনা নগরে গমন করেন, এবং ১৮০৫ সালে

জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন শিলার সেখানে ইতিহাসের অধ্যাপক, এবং ফিক্‌টে এবং শেলিং দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। নোভালিস ও শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়ও তখন তথায় বাস করিতেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া হেগেল যে কয়েক বৎসর গৃহশিক্ষকতা করিয়াছিলেন, তখন গ্রীক ইতিহাস ও দর্শন অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। ফলে এথেন্‌সের সংস্কৃতির উপর তাঁহার যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এক সময়ে খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষ প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্মকে তিনি অধিক শ্রদ্ধা করিতেন। এই সময়ে তিনি যীশুর এক জীবনীও লিখিয়াছিলেন। তাহাতে যীশুর অপ্রাকৃত জন্মের কাহিনী বর্জ্জন করিয়া জোসেফ ও মেরীর পুত্ররূপে তাঁহার জীবন ও চরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন। পরে তিনি এই গ্রন্থ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ন প্রাসিয়াকে যুদ্ধে পরাস্ত করিবার পরে জেনা নগরে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। একদিন ফরাসী সৈন্য হেগেলের গৃহ আক্রমণ করিলে, হেগেল পলায়ন করেন। পলায়নের সময় তাঁহার Phencmenology of Spirit গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে লইয়া যাইতে বিস্মৃত হন নাই। ইহার পরে কয়েক বৎসর তাঁহাকে অর্থকষ্টে কালাতিপাত করিতে হয়। নারন্‌বার্গের জিমনেসিয়ামের অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময় তিনি তাঁহার Logic রচনা করেন (১৮১২—১৬)। এই গ্রন্থের ফলে তিনি Heidelberg বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে হেগেলের প্রথম গ্রন্থ On the Difference between the Systems of Fichte and Schelling প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে হেগেল শেলিংএর দর্শনের সমর্থন করিয়াছিলেন। জেনাতে শেলিংএর সহযোগিতায় হেগেল Critical Journal নামে এক পত্রিকা সম্পাদন করেন। এই পত্রিকাতেও শেলিং এবং হেগেলের মতের ঐক্য লক্ষিত হইয়াছিল। উভয়েই লাইবনিট্‌জের প্রাক প্রতিষ্ঠিত সংগতিবাদ পরিহার করিয়া জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য বিষয় ও বিষয়ীর সংযোগ আবশ্যক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে উভয়ের মতের মধ্যে ব্যবধানের আবির্ভাব হয়। শেলিং আত্মা ও প্রকৃতির একত্ব-সাধনের জন্য যে উদাসীন বিন্দুর—আত্মা ও প্রকৃতি উভয়ের ধর্ম্ম-বর্জ্জিত নিরপেক্ষ অবস্থার—কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বর্জ্জন করেন নাই। কিন্তু হেগেল এই একত্বকে আত্মার নিজের সহিত একত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, অর্থাৎ প্রকৃতিকে "মনঃ" হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র বস্তুরূপে গণ্য না করিয়া, তাহাকে মনঃ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিলেন। তাঁহার Phenomenology গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি শেলিংকে পরিহাসও করিয়াছিলেন। ইহার পরে উভয়ের বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটে।

হেইডেলবার্গে ১৮১৭ সালে হেগেল Encyclopedia of the Philosophical Sciences নামে বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত করেন, এবং ইহার ফলেই ১৮১৮ সালে বার্লিন

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি দার্শনিক জগতের সম্রাট বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। তখন গেটে ছিলেন সাহিত্য-জগতের সম্রাট, এবং বিটোভেন সঙ্গীত-রাজ্যের সম্রাট। জার্মানিতে তাঁহার জন্মদিন মহোৎসাহে পালিত হইয়াছিল।

বার্লিনে হেগেল দর্শনশাস্ত্রের সর্ব্ব বিভাগেই বক্তৃতা করিতেন; দর্শনের ইতিহাস, ইতিহাসের দর্শন, অধিকারের দর্শন, কলার দর্শন, ধর্ম্মের দর্শন কোনও বিভাগই তিনি অবহেলা করেন নাই। তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহার বক্তৃতার যে সকল "নোট" করিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহা সংগৃহীত হইয়া, বক্তৃতার আকারে প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ খণ্ডে হেগেলের সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ফিকটে এবং শেলিংএর বক্তৃতা-প্রণালী মনোরম ছিল। হেগেল বাগ্মী ছিলেন না। তাঁহার ভাষাও ছিল জটিল ও ভারাক্রান্ত। যে Logic লিখিয়া তিনি Heiblberg এর দর্শনাধ্যাপকের পদলাভ করেন, অধিকাংশ লোকেই তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। ইহা সত্বেও তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে সময়ে ক্লাসে শিক্ষা দিতেন, সোপেনহর ঠিক সেই সময়ই স্বীয় বক্তৃতার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই হেগেলের ক্লাস ত্যাগ করিয়া যায় নাই।

যৌবনে হেগেল বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "বিপ্লবের রক্তে স্নান করিয়া ফরাসী জাতি, পক্ষীর অঙ্গে মৃত পালকের মত স্বীয় অঙ্গের ভারস্বরূপ অনেক প্রতিষ্ঠান হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছে। মানবাত্মা এই সকল প্রতিষ্ঠান শৈশবের পাদুকার মত পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ইহারা এখনও অনেক জাতির অঙ্গে বর্ত্তমান আছে।" এই সময়ে সাম্যবাদেরও তিনি সমর্থক ছিলেন, এবং সমগ্র ইয়োরোপব্যাপী রোমান্টিক মতবাদের স্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

হেগেলের দর্শনও বিপ্লবের সমর্থক। যে দ্বন্দ্বমূলক ত্রিভঙ্গী-নয় পদ্ধতিকে[1] তিনি চিন্তা ও বস্তুজগতের অভিব্যক্তির মূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ ব্যতীত উন্নতি অসম্ভব। বিপ্লবকেই তাহা হইলে সকল উন্নতির জনক বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয়। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ১৮৩০ সালের বিপ্লবের পরে তিনি লিখিয়াছিলেন, "চল্লিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার পরে ইহার পরিসমাপ্তি এবং শান্তির যুগের প্রারম্ভ দেখিয়া বৃদ্ধের অন্তর আনন্দ-লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে।" তখন তাঁহার বয়স ষষ্টি বৎসর। তখন তিনি তাঁহার পুরাতন প্রবন্ধগুলির প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, প্রাসিয়ার রাজতান্ত্রিক গবর্মেণ্টকে সমর্থন করিয়াছিলেন, এবং শত্রুগণ কর্ত্তৃক "রাজকীয় দার্শনিক" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। হেগেল তাঁহার দার্শনিক প্রস্থানকে জগতের প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্গীভূত এবং জগতের অভিব্যক্তির এক অংশ বলিয়া গণ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহারই দর্শন

---

[1] Dialectic Method.

অনুসারে তাঁহার দর্শনের বিরোধী দর্শনের আবির্ভাব, এবং তাঁহার দর্শনের অস্থায়িত্ব এবং তিরোভাবও নির্দ্ধারিত। প্রভূত রাজসম্মানের মধ্যে জরার আক্রমণে হেগেল ক্রমশঃই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এক দিন এক পায়ে জুতা পরিয়া তিনি ক্লাসে উপস্থিত হইলেন, অন্য পায়ের জুতা যে পদ হইতে স্খলিত হইয়া কর্দ্দম-মধ্যে পড়িয়াছিল, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। ১৮৩১ সালে বার্লিনে কলেরার ভীষণ প্রকোপ হয়। হেগেল আত্মরক্ষার জন্য নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কলেরার প্রকোপ সম্যক প্রশমিত হইবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসেন। আসিয়াই কলেরায় আক্রান্ত হন, এবং একদিন রোগের কষ্ট ভোগ করিয়া পরলোক গমন করেন। ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে গেটের মৃত্যু হইয়াছিল। বিটোভেন এক বৎসর পরে পরলোক গমন করেন।

হেগেলের দর্শনের ভূমিকা

হেগেল বলিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল দর্শনের সারভাগই তাঁহার দর্শনের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। এই জন্য তাঁহার দর্শনকে সার্ব্বিক দর্শন বলে। ওয়ালেস্ বলেন, "হেগেল তাঁহার দর্শনে যাহা দিতে চাহিয়াছেন, তাহা কোনও নূতন অথবা বিশেষ মত নহে। যে সার্ব্বিক দর্শন যুগযুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে, কখনও সংকীর্ণ, কখনও বিস্তীর্ণ হইয়া মূলে একই রহিয়াছে, তাহাই হেগেলের দর্শন। ইহার সাতত্য এবং প্লেটো ও আরিস্টটলের মতের সহিত অভিন্নতা-সম্বন্ধে ইহা সচেতন।" বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানে এই সার্ব্বিক দর্শন বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইলেও, ইহার সারভাগ এক ও অভিন্ন। আমরা প্রাচীন দার্শনিকদিগের প্রস্থানে প্রথমে এই সারভাগ আবিষ্কারের চেষ্টা করিব। তাহার পরে বিস্তারিত-ভাবে হেগেলীয় দর্শনের বর্ণনা করিব।

এলিয়াটিক দর্শন ও হেগেল

এলিয়াটিক দর্শনে "ভবন" অথবা পরিবর্ত্তনের সত্যতা স্বীকৃত হয় নাই। তাহাদের মতে "সত্তা"ই একমাত্র সত্য পদার্থ। প্রত্যেক বস্তু হইতে তাহার যাবতীয় গুণ নিষ্কাশিত করিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই "সত্তা"। এই সত্তা সর্ব্ববস্তু-সাধারণ : ইহা অপরিণামী ও স্থাণু। "ভবন" অর্থাৎ পরিবর্ত্তন যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সত্য নহে, তাহা মায়া। সত্তা এক, অবিভাজ্য। বহুর অস্তিত্ব নাই; বহুত্বের ধারণা ভ্রান্তি-প্রসূত; তাহাও মায়া। এই ভবন এবং বহুর জগৎ, এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ—মায়া জগৎ—প্রপঞ্চ মাত্র। প্রকৃত সত্তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা প্রজ্ঞা-গ্রাহ্য; তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, স্পর্শ করিতে পারা যায় না, কোনও বিশেষ স্থানে অথবা সময়ে তাহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু চিন্তায় তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রজ্ঞাদ্বারা তাহার ধারণা করা যায়। ঈদৃশ পদার্থকে পারমেনিদিস্ যে গোলাকার বলিয়াছিলেন, ইহা হইতে প্রতীত হয়, বিশুদ্ধ সত্তার পরিপূর্ণ ধারণা সেই প্রাচীন কালে সম্ভবপর হয় নাই। সত্তা যে দেশ ও কালে অবস্থিত নহে, এবং ইহা প্রজ্ঞা-গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, ইহাই এলিয়াটিক দর্শনের সার কথা।

ইহাই সকল গ্রীক আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রধান কথা. হেগেলের দর্শনেরও ইহা একটি অংশ। কিন্তু হেগেল ইন্দ্রিয়-জগতেরও একপ্রকার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন—তাহাকে একেবারে মিথ্যা বলেন নাই। পরিবর্ত্তিত আকারে হেগেল এলিয়াটিক দর্শনের সারভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা আমরা পরে করিব।

'কিন্তু ইন্দ্রিয়-দ্বারা আমরা যে বহুত্ব, গতি ও পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করি, তাহার সত্যতা নাই, এ কথার অর্থ কি? যে উদ্যানে একশত বৃক্ষ আছে, তথায় কি বাস্তবিক একটি বৃক্ষের বেশী নাই? যে অশ্বকে দ্রুতবেগে ধাবমান দেখিতে পাই, তাহা কি বাস্তবিক স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে? ইহা বলা তো প্রলাপমাত্র! বহুত্ব ও গতি সত্য নহে—ইহার অর্থ বহুত্ব ও গতির পারমার্থিক সত্তা নাই; তাহাদের যে ব্যবহারিক সত্তা আছে, আমরা তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহাই তাহার প্রমাণ। ব্যবহারিক সত্তা ও পারমার্থিক সত্তা এক নহে। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাহার—সূর্য্য, চন্দ্র, বৃক্ষ, সমুদ্র, গৃহ প্রভৃতির—ব্যবহারিক সত্তা আছে। কিন্তু তাহারা প্রতিভাস-মাত্র, পারমার্থিক সত্তা তাহাদের নাই। একমাত্র বিশুদ্ধ সত্তাই পারমার্থিক ভাবে সত্য। কিন্তু পারমার্থিক সত্য হইলেও বিশুদ্ধ সত্তার ব্যবহারিক অস্তিত্ব নাই—তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। যদিও এই ভাবে এই সত্য এলিয়াটিক দর্শনে ব্যক্ত হয় নাই, তথাপি ইহাই সেই দর্শনের মূল কথা। ভারতীয় দর্শনেরও ইহাই প্রধান কথা। প্লেটো ও আরিস্টটলকে বুঝিতে হইলে, এই সত্য মনে রাখা প্রয়োজন। ইহা বুঝিতে না পারিলে হেগেলকেও বুঝিতে পারা যাইবে না।

প্লেটো ও হেগেল

কিন্তু সোফিষ্টগণ এই সত্য স্বীকার করে নাই। প্রোটাগোরাসের মতে যাহা আমার নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা আমার পক্ষে সত্য, তোমার নিকট যাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তোমার পক্ষে তাহা সত্য। ইহার অর্থ, যাহা প্রতীত হয়, তাহা ব্যতীত অন্য কোনও সত্য নাই। প্রতিভাস এবং পরমার্থ অভিন্ন। ইন্দ্রিয়-দ্বারপথে যাহা আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তাহাই প্রতিভাস। প্রতিভাসই সত্য, তাহাই পরমার্থ। ইন্দ্রিয়ে যাহা প্রতীত হয়, তাহাও সত্য। প্রজ্ঞায় যাহা প্রতীত হয়, তাহাও সত্য। একই বস্তু ইন্দ্রিয়-পথে একরূপ এবং প্রজ্ঞায় অন্যরূপ প্রতীত হইলে, উভয় প্রতীতিই সত্য। সুতরাং প্রজ্ঞাদ্বারা পরমার্থের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। সংবেদন হইতেই পরমার্থের জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই জ্ঞান। প্রতিভাস এবং পরমার্থের মধ্যে ভেদ নাই॥

প্লেটো স্বকীয় সামান্য-বাদ-দ্বারা এই মতের খণ্ডন করিয়াছিলেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন, যে কেবল মাত্র সংবেদন হইতে কোনও জ্ঞানেরই উৎপত্তি হইতে পারে না, এবং সংবেদনের জ্ঞানের জন্যও ইন্দ্রিয়বৃত্তির অতিরিক্ত অন্য এক বৃত্তির প্রয়োজন। আমাদের যাবতীয় জ্ঞানই বাক্যের আকারে উৎপন্ন হয়। বাহিরে প্রকাশিত না হইলেও মনেও বাক্যের আকারেই জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। যখন দেহে তাপ অনুভব করি, তখন "আমার শরীর গরম হইয়াছে" এই আকারেই আমার অনুভূতি প্রকাশ করিতে পারি। কিন্তু যাহা গরম হইয়াছে,

তাহা যে একটা দেহ, তাহা কিরূপে জানিলাম? আর ইহাই বা জানিলাম কিরূপে, যে দেহে যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা "গরম"? অন্য অনেক দেহ আমি দেখিয়াছি। তাহাদের সহিত আমার দেহের তুলনা করিয়াছি, এবং তাহাদের সহিত আমার দেহের সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াই, আমার ঘর, বাড়ী প্রভৃতি হইতে তাহা যে ভিন্ন, তাহাও অনুভব করিয়াছি। আবার দেহে যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা যে তাপ, তাহাও বুঝিয়াছি পূর্ব্বের ঐরূপ অনুভূতি এবং শৈত্য, কাঠিন্য প্রভৃতি অনুভূতির সহিত ঐ অনুভূতির পার্থক্য হইতে। ইহার অর্থই শ্রেণী-বিভাগ। "দেহ" শব্দ এক শ্রেণীর দ্রব্যের, এবং "গরম" শব্দ এক শ্রেণীর অনুভূতির সাধারণ নাম। যাবতীয় অক্ষজ জ্ঞানের মধ্যে "শ্রেণীর" প্রত্যয় নিহিত থাকে। শ্রেণীর প্রত্যয়ের নাম সম্প্রত্যয়। কেবল দ্রব্যেরই যে সম্প্রত্যয় আছে, তাহা নহে। গুণ, কর্ম্ম, সম্বন্ধ সকলেরই তাহা আছে। "দেওয়া" এক শ্রেণীর ক্রিয়ার সাধারণ নাম। "এই" শব্দটিও একটি সম্প্রত্যয়ের বাঙ্ময় রূপ। কেননা "নিকটবর্ত্তিত্ব"-সম্বন্ধই ইহা দ্বারা ব্যক্ত হয়। "হয়"-ও একটি সম্প্রত্যয়, কেননা সকল বস্তুই "হয়।" "মধ্যে" শব্দদ্বারাও এক শ্রেণীর সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়। ভাষায় এমন কোনও শব্দ নাই, যাহা সামান্যের নাম নহে। সুতরাং যাবতীয় জ্ঞানই সম্প্রত্যয়মূলক। বিশুদ্ধ সংবেদন হইতে কোনও জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় হইতে সামান্যের জ্ঞান হয় না, সামান্য মনের কার্য্য। মন বিভিন্ন সংবেদনের তুলনা এবং শ্রেণী-বিভাগ করিয়া সম্প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে।

প্রত্যেক দ্রব্যের জ্ঞানের মধ্যে বিভিন্ন সামান্যের জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছুই নাই। কোনও দ্রব্য-সম্বন্ধে যাহাই বলা যায়, তাহা সম্প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কেননা যাহা বলা যায়, তাহা শব্দ, এবং প্রত্যেক শব্দই সম্প্রত্যয়ের বাঙ্ময় রূপ। যখন বলি "প্রস্তর কঠিন, ভারী, ও কৃষ্ণবর্ণ", তখন এই বাক্যের প্রত্যেক শব্দই এক একটি সামান্যবাচক। প্রস্তর-সম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক, তাহাই সামান্য-বাচক। সামান্য কোনও বিশিষ্ট বস্তু নহে, ইহা "জাতি" বা শ্রেণী, ইহাকে সার্ব্বিকও বলা হয়। প্রস্তর-সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান, তাহা এই, যে "কঠিন", "ভারী" "কৃষ্ণবর্ণ" প্রভৃতি সম্প্রত্যয় ইহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু এই সমস্ত সম্প্রত্যয় হইতে বিযুক্ত ভাবে প্রস্তর কি, যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ইহার অতিরিক্ত কিছু যদি প্রস্তর হয়, তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত "কিছু" যে কি, তাহা আমরা জানি না। কখনো জানিতে পারিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু যাহা আমরা জানি না, তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করিবার কারণও নাই। সুতরাং প্রত্যেক দ্রব্য যদি সামান্যের সমষ্টিমাত্র হয়, এবং তাহাদের যদি আমাদের মনের বাহিরে—মনঃ-নিরপেক্ষ—অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে সামান্য অথবা সার্ব্বিকদিগেরও আমাদের মনের বাহিরে, মনঃ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। এই বিষয়গত, মনঃ-নিরপেক্ষ সার্ব্বিক-দিগকেই প্লেটো Ideas নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সার্ব্বিক ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। প্লেটো কিন্তু এত দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন নাই। তিনি বস্তুর অন্তরস্থ এক রূপবর্জ্জিত অনির্দ্দিষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি এই পদার্থকে Matter (উপাদান) নাম দিয়াছিলেন।

কিন্তু Matter নিজেই যে একটা সার্ব্বিক, তাহা তাঁহার মনে হয় নাই। ইন্দ্রিয় হইতে সার্ব্বিকের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না! প্রজ্ঞা হইতেই ইহাদের জ্ঞান-লাভ হয়। সুতরাং প্রজ্ঞাই জ্ঞানের উৎস—সংবেদন ভ্রান্তির জনক। সংবেদন হইতে আমরা প্রাতিভাসিক জগৎ প্রাপ্ত হই, প্রজ্ঞা হইতে প্রাপ্ত হই পারমার্থিক জগৎ। পরমার্থ কোনও বিশেষ নহে, তাহা সার্ব্বিক"। ইহাই প্লেটো, আরিস্টটল এবং হেগেলের অধ্যাত্মবাদের প্রধান কথা।

পরমার্থ সার্ব্বিক, কিন্তু সকল সার্ব্বিকই দেশ ও কালের অতীত। গুণযুক্ত পদার্থ আছে, কিন্তু পদার্থ হইতে স্বতন্ত্রভাবে কোনও গুণের অস্তিত্ব নাই। শ্বেতবর্ণ অশ্ব আছে, কিন্তু শুধু শ্বেতবর্ণ কোনও দেশে অথবা কালে পাওয়া যাইবে না। অশ্ব বহু আছে, কোনটি বড়, কোনটি ছোট, কোনটি সাদা, কোনটি কালো, কোনটি দ্রুতগামী, কোনটি মন্থরগামী। কিন্তু এই সমস্ত বিশেষত্ব-বর্জ্জিত সার্ব্বিক অশ্ব পৃথিবীতে নাই, আকাশে নাই, কোথায়ও নাই, বর্ত্তমানে নাই, অতীতে ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। সার্ব্বিকের অস্তিত্ব কোনও কালে নাই, সার্ব্বিক দেশ-কালাতীত, তাহাদের ব্যবহারিক অস্তিত্ব নাই।

প্রতিভাস ও নিত্য

সার্ব্বিক দর্শনের মতে সার্ব্বিকই নিত্য পদার্থ। কিন্তু নিত্য পদার্থের ব্যবহারিক অস্তিত্ব নাই। প্রাতিভাসিক পদার্থেরই ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে। এখন, প্রতিভাস এবং নিত্যত্বের মধ্যে পার্থক্য কি দেখিতে হইবে। প্রতিভাসের অস্তিত্ব আছে, নিত্য পদার্থেরও অস্তিত্ব আছে। আমরা সাধারণ ভাষাতেও প্রতিভাস এবং বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য করিয়া থাকি। স্বপ্নকে আমরা অলীক বলি, বাস্তব বলি না। বাস্তব পর্ব্বত এবং স্বপ্ন-দৃষ্ট পর্ব্বতকে এক বলি না। বাস্তব পর্ব্বত আমার অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ, কিন্তু স্বপ্নের পর্ব্বতের অস্তিত্ব আমার উপর নির্ভর করে। কেননা আমার মনের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। ছায়ার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে অন্য বস্তুর উপর। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যাহার অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তাহা নিত্য নহে, তাহা প্রতিভাস; আর যাহার অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভর করে না, তাহা নিত্য। যাহা অন্যের উপর নির্ভরশীল, যাহা দেশ ও কালে প্রকাশিত, যাহা বিশিষ্টভাব-প্রাপ্ত, তাহাই প্রতিভাস, তাহা ব্যবহারিক। ইংরেজী দর্শনে ইহার অস্তিত্ব অন্যবিধ অস্তিত্ব হইতে পৃথক করিয়া বুঝাইবার জন্য Existence শব্দের ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা অন্যের অপেক্ষা করে না, যাহা স্বয়ংসিদ্ধ, যাহার বিশিষ্ট কোনও রূপ নাই, যাহা দেশ ও কালে প্রকাশিত হয় না, তাহা নিত্য অথবা পারমার্থিক। ইংরেজীতে তাহাকে Reality নাম দেওয়া হইয়াছে। এই Realityর অস্তিত্বকে বলা হয় Being। সুতরাং বলা যায়, যাহা Reality, তাহার Being আছে, কিন্তু Existence নাই; আর যাহা প্রতিভাস, তাহার Existence আছে, কিন্তু Reality নাই।

সার্ব্বিক দর্শনের মতে নিত্য পদার্থ সার্ব্বিক; সুতরাং যে পদার্থ সকল বস্তুর ভিত্তি, যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, তাহাই সার্ব্বিক। সার্ব্বিক বুদ্ধি-গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য

নহে। ইহা হইতে যাবতীয় বিশেষের উৎপত্তি হইলেও, ইহা বিশেষ নহে। কোনও দেশে অথবা কোনও কালে ইহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু প্রতিভাস বিশিষ্ট বস্তু, দেশ ও কালে ইহার অবস্থিতি। ইহা অব্যবহিত ভাবে বোধগম্য হয়, ইহার বোধের জন্য যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক বাহ্য পদার্থ এবং প্রত্যেক মানসিক পদার্থ বিশিষ্ট পদার্থ; তাহারা অব্যবহিত জ্ঞানের বিষয়। তাহারা প্রতিভাস।

সার্ব্বিক দর্শনের মতে এই জগৎ প্রতিভাস। ইহা দেশ-কালে অবস্থিত, অব্যবহিত-জ্ঞানগম্য বিশিষ্ট বস্তু। অস্তিত্বের জন্য ইহা অন্য পদার্থের উপর নির্ভরশীল। সেই পদার্থ সার্ব্বিক ও নির্ব্বিশেষ। জগৎ যদি সার্ব্বিক নির্ব্বিশেষের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহা হইলে, সেই সার্ব্বিক হইতে কিরূপে ইহার উৎপত্তি হয়, তাহা দেখানো আবশ্যক। প্লেটো তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, জাগতিক প্রত্যেক বস্তু Idea দিগের প্রতিরূপ। ঈশ্বর Ideaদিগের "ছাপ" matterএর উপর অঙ্কিত করিয়া দেন। প্লেটোর matter রূপহীন, বিশেষত্ব-বর্জ্জিত, অনির্দ্দেশ্য বস্তু—বলিতে গেলে শূন্যমাত্র, যদিও তাহা বিশিষ্ট বস্তুর মূলাধার। ইহার স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। প্লেটো এই শূন্যগর্ভ অজ্ঞেয় matterএর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহাকে "অসৎ"[1] বলিয়াছিলেন। এই অসতের উপর Ideaদিগের "ছাপ" অঙ্কিত হইয়া বিশিষ্ট বস্তুর উৎপত্তি হয়। কিন্তু Idea হইতে এই অসতের উৎপত্তি হয় নাই; ইহাও Ideaদিগের মতই আদি হইতে বর্ত্তমান ও স্বতন্ত্র; অন্য কিছু হইতেই ইহার উদ্ভব হয় নাই। সুতরাং ইহাকে সম্পূর্ণ অসৎ বলা যায় না। ইহাকে সৎই বলিতে হয়। ইহা হইতে প্লেটোর মতের মধ্যে স্ব-বিরোধ পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

আবার প্লেটো Ideaদিগকে স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী বলিয়াছিলেন। সে জগৎ দেশ ও কালের বাহিরে অবস্থিত। ধার্ম্মিকদিগের আত্মা মৃত্যুর পর এই লোকে গমন করে, এবং Ideaদিগকে দেখিতে পায়, বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই বর্ণনায় প্লেটো রূপক ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সার্ব্বিক Ideaদিগের ব্যবহারিক অস্তিত্ব নাই। দেশকালাতীত জগতে Ideaদিগের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আছে বলিয়াও প্লেটো বিশ্বাস করিতেন। এখানেও স্ববিরোধ দৃষ্ট হয়। কেননা যাহা সার্ব্বিক, তাহা বিশিষ্ট ভাবে থাকিতে পারে না।

আরিস্টটল ও হেগেল

প্লেটো যাহাকে Idea বলিয়াছিলেন, আরিস্টটল তাহাকে রূপ নাম দিয়াছিলেন। আরিস্টটলের মতে প্রত্যেক বস্তু উপাদান এবং রূপের সমবায়ে গঠিত। কিন্তু উপাদানের বাহিরে রূপের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই। রূপ সার্ব্বিক, তাহা বিশিষ্ট বস্তুতে বর্ত্তমান, বস্তুর বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। এইখানে প্লেটোর সহিত তাঁহার মতভেদ।

---

1 Non-being

রূপের অস্তিত্ব উপাদানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু উপাদানেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, রূপ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে উপাদানও থাকিতে পারে না। স্বর্ণের পীত বর্ণের যেমন স্বর্ণ হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তেমনি পীত বর্ণ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে স্বর্ণেরও অস্তিত্ব নাই। স্বর্ণ হইতে তাহার গুণদিগকে স্বতন্ত্র করিলে স্বর্ণের অস্তিত্ব থাকে না। ইহা সত্ত্বেও আরিস্টটল সার্ব্বিক-কেই নিত্য পদার্থ বলিয়াছিলেন। কিন্তু দেশও কালে সার্ব্বিকের অস্তিত্ব নাই।

কিন্তু সার্ব্বিকের এই নিত্যত্বের স্বরূপ কি? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যাহার অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তাহা প্রতিভাস, নিত্য নহে। এখন দেখা যাইতেছে, সার্ব্বিকের অস্তিত্ব উপাদানের উপর নির্ভর করে। তাহা হইলে সার্ব্বিক কিরূপে নিত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে? আবার বস্তুর অস্তিত্ব সার্ব্বিকের উপর নির্ভর করে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। সার্ব্বিকের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে, বস্তুরও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং জগৎ শূন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। উপরে বলিয়াছি সার্ব্বিকের দেশ ও কালে অস্তিত্ব নাই। দেশ ও কালের বাহিরে তাহার যে অস্তিত্ব, তাহার স্বরূপ কি?

আরিস্টটলের মতে কোনও বস্তুর রূপ ও তাহার উদ্দেশ্য অভিন্ন। বস্তুর উদ্দেশ্যের অর্থ তাহার অস্তিত্বের কারণ—যে জন্য সেই বস্তু আছে, সেই কারণ। বস্তুর রূপ ও উদ্দেশ্য যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে রূপ যখন সার্ব্বিক, তখন সার্ব্বিক সেই বস্তুর কারণ, যাহার জন্য সেই বস্তু আছে, সেই কারণ। কোনও বস্তুর কারণ সেই বস্তুর পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ হইতেই বস্তুর উদ্‌ভব হয়। সুতরাং বস্তু কারণের পরবর্ত্তী। কিন্তু উৎপত্তির পরেই বস্তু রূপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে রূপ বস্তুর সৃষ্টির পরবর্ত্তী, এই যুক্তিতে দাঁড়াইল তাহা বস্তুর সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী।

উপরি উক্ত যুক্তি একটু জটিল। উহা বুঝিবার জন্য ভাস্কর যখন কোনও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, তখন কি হয়, তাহা বিবেচনা করা যাউক। ভাস্কর প্রথমে মূর্ত্তির রূপ কল্পনা করে। সেই রূপ পরে প্রস্তর-খণ্ডে অর্পিত হয়। সেই রূপের বাহ্য প্রকাশ মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের আরম্ভের পরবর্ত্তী। কিন্তু ভাস্করের মনে তাহার আবির্ভাব মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের পূর্ব্ববর্ত্তী। তেমনি প্রত্যেক বস্তুর প্রাপ্ত রূপ তাহার সৃষ্টির পরবর্ত্তী, কিন্তু সেইরূপ যদি বস্তুর কারণ হয়, তাহা হইলে তাহা সেই বস্তুর সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু বিশ্ব-সৃষ্টিতে ভাস্করের মূর্ত্তি-কল্পনার মতো বস্তু-সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও কল্পনার প্রমাণ নাই। সুতরাং এই পূর্ব্ববর্ত্তিতাকে কালিক বলিবার কারণ নাই। ইহা নৈয়ায়িক পূর্ব্ববর্ত্তিতা। এখানে "কারণ" শব্দের অর্থ "যুক্তি" বা "উপপত্তি", উৎপাদক শক্তি নহে।

তর্কের রূপ হইতে উপরি উক্ত যুক্তি স্পষ্টতর হইতে পারে। Syllogismএর তিনটি অবয়ব; তাহার মধ্যে শেষ অবয়বটি সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি অবয়ব। সেই দুই অবয়ব হইতে সিদ্ধান্তের উদ্‌ভব হয়। সিদ্ধান্তের কারণ এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, এই পূর্ব্ববর্ত্তিতা কালিক নহে, ইহা নৈয়ায়িক পূর্ব্ববর্ত্তিতা। এই অর্থেই আরিস্টটল জগতের উদ্দেশ্যকে জগৎ-ব্যাপারের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন। জগৎ-ব্যাপার এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু একটা লক্ষ্যের অভিমুখে তাহা অগ্রসর হইতেছে। এই লক্ষ্যই

জগতের উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার শেষ পরিণতি; কিন্তু তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। জগতের সেই শেষ অবস্থা, সৃষ্টির প্রারম্ভের পরবর্ত্তী হইলেও, সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই যখন জগৎ-ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তখন তাহাকে সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হইবে। মানুষের বেলায় উদ্দেশ্যের পূর্ব্ববর্ত্তিতা যেমন নৈয়ায়িক, তেমনি কালিক। মানুষের মনে উদ্দেশ্য কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বেই আবির্ভূত হয়; সেই জন্য কালে তাহা কর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী। আবার সেই উদ্দেশ্য কর্ম্মের নৈয়ায়িক কারণ বলিয়াও, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু আরিস্টটলের মতে কোনও বুদ্ধিমান পুরুষ প্রথমে জগতের রূপ কল্পনা করিয়া তদনুসারে জগৎ সৃষ্টি করেন নাই। জগতের উদ্দেশ্য জগতের মধ্যেই অনুস্যূত। এই উদ্দেশ্য কোনও মনে সংঘটিত কোনও ঘটনা নহে। ইহা নৈয়ায়িক কারণ। আরিস্টটল যাহাকে "রূপ" বলিয়াছেন, তাহাই এই নৈয়ায়িক কারণ। জগৎ সেই কারণ হইতে উদ্‌ভূত। রূপ সার্ব্বিক। এই সার্ব্বিক পদার্থ সমস্ত বস্তুর উৎস। ইহা হইতে জগৎ উদ্‌ভূত। কিন্তু ইহা যে জগতের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহা নহে। কেননা ইহা কালাতীত—অ-কাল। সেই সার্ব্বিক পদার্থ জগতের উৎপাদক কোনও শক্তি নহে, তাহা নৈয়ায়িক কারণ। জগৎ সার্ব্বিক পদার্থ হইতে উদ্‌ভূত, কিন্তু এই উদ্‌ভব কারণ হইতে কার্য্যের উদ্‌ভব নহে, syllogism এর সিদ্ধান্ত যেমন তাহার premises হইতে উদ্‌ভূত হয়, সেই-রূপ উদ্‌ভব। এই সার্ব্বিক সকল বস্তুর আদি। ইহার অন্য কোনও নৈয়ায়িক কারণ নাই। বস্তু হইতে কার্য্যতঃ ইহাকে পৃথক করিতে পারা যায় না; কিন্তু চিন্তায় (ন্যায়ের বিধি অনুসারে) পারা যায়। ইহার সত্তা নৈয়ায়িক। এই সত্তা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। কিন্তু যখন ইহাকে বস্তুজগতে অবতরণ করিতে হয়, তখন বিশেষের সহিত মিলিত হইতে হয়। বিশেষ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বস্তুজগতে ইহার অস্তিত্ব নাই।

আরিস্টটলের উপরোক্ত মত হেগেলের দর্শনে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। এতদ্ব্যতীত আরিস্টটলের আরও কয়েকটি মত হেগেল গ্রহণ করিয়াছেন। আরিস্টটল উপাদানকে শক্যতা এবং রূপকে বাস্তবতা বলিয়াছেন। উপাদানের কোনও রূপ নাই, কিন্তু ইহা যে কোনও রূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ। ইহার উপর যে সার্ব্বিক অথবা রূপের ছাপ পাড়ে, ইহা তাহাই হইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে স্বরূপে উপাদান কিছুই নহে, কিন্তু সমস্ত বস্তু হইবার শক্যতা তাহার আছে। এই বস্তুত্ব উপাদান প্রাপ্ত হয় রূপের নিকট হইতে। এই জন্যই রূপ বাস্তবতা। উপাদান ও রূপের মিলন হইতেই জগতের উদ্‌ভব হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুতে উপাদান ও রূপ সমান পরিমাণে বর্ত্তমান নহে। কোনও বস্তুতে উপাদানের পরিমাণ অধিক, কোনটিতে রূপের। ইহা হইতেই জগতের বিভিন্ন-জাতীয় বস্তুর—রূপহীন উপাদান হইতে আরম্ভ করিয়া, উপাদানহীন রূপ পর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুর—উৎপত্তি। কিন্তু রূপহীন উপাদান এবং উপাদানহীন রূপের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত বস্তুর সমবায়ই জগৎ। অচেতন জড় বস্তু ইহার এক প্রান্তে অবস্থিত; তাহার মধ্যে উপাদানের পরিমাণ অত্যধিক; তাহার পরে উদ্ভিদ; উদ্ভিদের পরে জন্তু, সর্ব্বশেষে মানুষ। মানুষের মধ্যে রূপের পরিমাণ অনেক বেশী। প্রত্যেক বস্তুই

উন্নততর রূপ-লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহার ফলেই জগতের পরিবর্ত্তন। তাহাই জাগতিক ব্যাপার। এই জাগতিক ব্যাপারের গতিশক্তি হইতেছে—রূপ। প্রত্যেক বস্তুই উন্নততর-রূপ-লাভ-রূপ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য চেষ্টিত। সুতরাং রূপই সেই শক্তি, যাহাদ্বারা সকল বস্তু চালিত হয়। রূপ উপাদানকে ক্রমশঃ উন্নততর অবস্থার দিকে চালিত করে। সুতরাং প্রথম হইতেই উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল। উদ্দেশ্য প্রথমেই বর্ত্তমান ছিল, না হইলে জাগতিক কার্য্যে তাহার শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিত না। কিন্তু কিরূপে বর্ত্তমান ছিল? সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার প্রথমে তো সে উদ্দেশ্য বাস্তব রূপ গ্রহণ করে নাই। তাহা শক্যরূপে বর্ত্তমান ছিল। বটবীজের মধ্যে বটবৃক্ষ যেমন শক্যরূপে বর্ত্তমান থাকে, সেই-রূপ বর্ত্তমান ছিল। মানুষ শক্যরূপে বানরের মধ্যে ছিল, মানুষ হইয়া বাস্তবতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা গূঢ়, তাহার প্রকাশই বিকাশ। কোনও বস্তুর অভ্যন্তরে যাহা গূঢ় থাকে, তাহাই বাহির হইয়া আসে। ইহাই বিকাশ, ইহাই অভিব্যক্তি। বটবীজ শক্যরূপে বটবৃক্ষ, বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বাস্তব বৃক্ষে পরিণত হয়। হেগেল বস্তুর শক্য ও বাস্তব রূপ বুঝাইতে "In itself" এবং "For Itself" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। বটবীজ In Itself (আপনার অভ্যন্তরে) বটবৃক্ষ; কিন্তু বীজ হইতে যখন বটবৃক্ষ বাহির হইয়াছে, তখন বটবীজ For Itself (আপনার নিকট) বটবৃক্ষ হইয়াছে। যাহা শক্য, বাস্তবে পরিণত হয় নাই, Potential, হেগেল তাহাকে "In Itself" এবং যাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, তাহাকে For Itself বলিয়াছেন। এই দুই শব্দ অব্যক্ত ও ব্যক্ত শব্দ দ্বারা অনুবাদ করা যাইতে পারে।

প্লেটো ও আরিস্টটল উপাদানকে অসৎ বলিলেও, উভয়েই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এবং দ্বৈতবাদ পরিহার করিতে পারেন নাই। হেগেল উপাদানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অসঙ্গ অথবা ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় মত আরিস্টটলের মতদ্বারা প্রভাবিত। উপাদানের সংস্পর্শ-বর্জ্জিত রূপকে আরিস্টটল "ঈশ্বর" নাম দিয়াছিলেন। সমস্ত বস্তুর উৎস বলিয়া এই রূপ অসঙ্গ ঈশ্বর। এই রূপের মধ্যে কোনও উপাদান নাই। কেবল রূপই আছে। ইহা কিসের রূপ? ইহা রূপের রূপ। রূপ ও চিন্তা অভিন্ন বলিয়া আরিস্টটল ঈশ্বরকে Thought of thought—অর্থাৎ "চিন্তার চিন্তা" বলিয়াছেন। ঈশ্বর উপাদানের চিন্তা করেন না, তিনি যাহা চিন্তা করেন, তাহাও চিন্তা। তিনি আপনাকেই চিন্তা করেন (আত্মানং আত্মনা বেত্তি)। ইহার অর্থ ঈশ্বর—স্ব-সংবিদ[1]; হেগেলের অসঙ্গ ও স্ব-সংবিদ।

কিন্তু "রূপের রূপ" এবং "চিন্তার চিন্তা" কি অভিন্ন? রূপ ও চিন্তা কি এক? আরিস্টটল যাহাকে "রূপ" বলিয়াছিলেন, তাহা প্লেটোর Idea। প্লেটোর Ideas সার্ব্বিক পদার্থ। বাস্তব জগতে সার্ব্বিক কিছু নাই, সকলই "বিশেষ"। বস্তু হইতে তাহার গুণ নিষ্কাশন করিয়া না লইলে, সার্ব্বিক কিছুই পাওয়া যায় না। এই নিষ্কাশন মানসিক

---

[1] Self Consciousness

ক্রিয়া। সুতরাং যাহা কিছু সার্ব্বিক, সকলই মানসিক পদার্থ। কিন্তু প্লেটোর Ideas মনের বাহিরে অবস্থিত। বাহিরে অবস্থিত হইলেও, তাহাদের সার্ব্বিকতা তাহাদের মানসিক প্রকৃতির পরিচায়ক। তাহারা মানসিক পদার্থ; তাহারা চিন্তা, কিন্তু বিষয়ত্ব-প্রাপ্ত চিন্তা, অর্থাৎ কোনও ব্যক্তিবিশেষের, এমন কি ঈশ্বরের চিন্তাও তাহারা নহে। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের চিন্তার স্বরূপ ও তাহাদের স্বরূপ অভিন্ন। উভয়ের উপাদান এক। রূপ=চিন্তা, রূপের রূপ=চিন্তার চিন্তা। সুতরাং ঈশ্বর চিন্তার চিন্তা অর্থাৎ তিনি মনোরূপ, তিনি চৈতন্যরূপী, স্ব-সংবেদ্য। এই জগৎ বিষয়ত্ব-প্রাপ্ত চিন্তা। ইহাই হেগেলের মত।

কিন্তু ঈশ্বর ব্যক্তিত্বপ্রাপ্ত মনঃ নহেন—সার্ব্বিক মনঃ—সার্ব্বিক চিন্তা-রাজির সমাবেশ। যে আদিম মনঃ হইতে এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে, ঈশ্বর সেই মনঃ। তাঁহার অস্তিত্ব দেশ ও কালের অতীত, তাঁহার ব্যবহারিক সত্তা নাই, কিন্তু তিনিই পরমার্থ বা সৎ বস্তু। সমগ্র জগতে এই মনঃ সক্রিয়। জগতের বাহিরে তিনি নহেন। এই মনঃবস্তুর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা, বস্তুর বহিঃস্থ নহে। কিন্তু ইহা কোনও ব্যক্তি নহে; এই প্রজ্ঞার অধিকারী কোনও ব্যক্তি নাই। মানুষের মধ্যেও প্রজ্ঞা আছে; মানুষ তাহার ব্যবহার করে। ঈশ্বর সেরূপ কোনও পুরুষ নহেন; তিনি প্রজ্ঞ মাত্র। এই প্রজ্ঞা জগৎ "সৃষ্টি" করে নাই। syllogismএর সিদ্ধান্ত যেমন তাহার অবয়ব হইতে উদ্ভূত, জগৎ তেমনি ন্যায়ের নিয়মে তাহা হইতে উদ্ভূত।

হেগেলের দর্শন দুর্বোধ্য, কিন্তু অবোধ্য নহে। সোপেনহর ইহাকে অর্থহীন বাক্জাল এবং উন্মাদের সৃষ্টি বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই দর্শন হেগেলের সৃষ্টি নহে। ইহার মূল অতীতে নিহিত। ইহার মধ্যে যুগযুগ সঞ্চিত মানবজ্ঞান বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে যে গভীর সত্য আছে, তাহার সম্যক্ জ্ঞানের জন্য প্রাচীন চিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন।

নব্যদর্শন ও হেগেল

আরিস্টটলের মৃত্যুর পরে গ্রীক দর্শন হইতে অধ্যাত্মবাদ তিরোহিত হইয়াছিল বলা যায়। প্লোটিনাস ও তাঁহার শিষ্যগণ অধ্যাত্মবাদী ছিলেন; কিন্তু নব প্লেটনিক দর্শন গুহ্য-মূলক দর্শন, হেগেলের উপর তাহার কোনও প্রভাব ছিল না। মধ্য যুগের দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্লেটোপন্থী, কেহ কেহ অরিস্টটলের মতাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু দর্শনে তাহাদের কাহারও বিশেষ দান ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ জার্ম্মান মিষ্টিক একহার্ট বলিয়াছিলেন, "সত্তা ও বোধ অভিন্ন। জগতে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহারা বস্তুতঃ জ্ঞানের ক্রিয়ামাত্র। জগৎ ঈশ্বর হইতে বাহির্গত হইয়াছে; এই বহিরাগমন ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ, ইহাও জ্ঞান-ক্রিয়া; সমস্ত বস্তু পরিণামে ঈশ্বরেই ফিরিয়া যায়, ইহাও জ্ঞান-ক্রিয়া।" সত্তা ও জ্ঞানের অভেদবাদ হেগেলের দর্শনের একটা মূলতত্ত্ব।

লক্ জড় বস্তুতে গৌণ গুণের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া অধ্যাত্মবাদের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। বিশপ বার্কলে গৌণ ও মুখ্য উভয়বিধ গুণেরই বাহ্য অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া জগৎকে প্রত্যয়রাজিতে পরিণত করিয়াছিলেন। নব্য দর্শনে তিনিই বিষয়িগত

অধ্যাত্মবাদের উদ্ভাবক; কিন্তু হেগেলের উপর তাঁহার দর্শনের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয় না। ক্যাণ্টের উপর গ্রীক অধ্যাত্মবাদের বিশেষ প্রভাব ছিল না, যদিও তাঁহার ক্যাটেগরিদিগকে তিনি আরিস্টটলের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হেগেলের উপর ক্যাণ্টের দর্শনের বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

আর একজন দার্শনিক-কর্ত্তৃক হেগেল বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন; তিনি স্পিনোজা। হেগেল ব্যতিরেক অথবা নেতিবচনের আশ্চর্য্যজনক শক্তির কথা বলিয়াছেন। স্পিনোজা বলিয়াছিলেন, "সকল বিশেষীকরণই অভাবাত্মক"। স্পিনোজার দর্শনের আলোচনায় এই মতের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। হেগেলের দর্শনে এই মত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। কোনও বস্তুকে "বিশিষ্ট" করার অর্থ, তাহাতে বিশেষণের প্রয়োগ করা। বিশেষণের প্রয়োগদ্বারা বস্তুর অর্থ সঙ্কুচিত হয়, এবং প্রযুক্ত বিশেষণের বিপরীত গুণের অভাব তাহাতে সূচিত হয়। "ফুল"কে নীল বিশেষণদ্বারা বিশেষিত করিলে, তাহা লাল নয়, সবুজ নয়, পীত নয়, প্রভৃতি বলা হয়। সুতরাং বিশেষীকরণদ্বারা যেমন একটা গুণের সদ্‌ভাব সূচিত হয়, তেমনি অন্য অনেক গুণের অভাবও সূচিত হয়। স্পিনোজার "সকল বিশেষীকরণই ব্যতিরেক", এই বাক্যের আবর্ত্তিত রূপ গ্রহণ করিয়া হেগেল বলিয়াছেন, "সকল ব্যতিরেকই বিশেষীকরণ"। ন্যায় শাস্ত্রের নিয়মানুসারে "সকল বিশেষীকরণ হয় ব্যতিরেক"—ইহার আবর্ত্তন করিয়া "সকল ব্যতিরেক হয় বিশেষীকরণ", ইহা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু বিশেষীকরণ ও ব্যতিরেক অবিনাভাব-সম্বন্ধে আবদ্ধ। যেখানে বিশেষীকরণ, সেখানেই ব্যতিরেক, যেখানে ব্যতিরেক, সেখানেই বিশেষীকরণ। অস্তিবাচক বাক্যের মধ্যে নেতিবচন উহ্য থাকে, নেতিবচনের মধ্যে অস্তিবচন উহ্য থাকে। কোনো বস্তু কোনো এক শ্রেণীর অন্তর্গত নহে বলিলে, তাহা অন্য এক শ্রেণীর অন্তর্গত বলা হয়, যদিও কোন শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহা আমরা না জানিতে পারি। অস্তির সহিত "নাস্তি" অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। জগতে নেতিবচনের প্রভাব সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। নেতিবচনদ্বারা সঙ্কুচিত গণ প্রজাতিতে পরিণত হয়। প্রজাতির বিশেষ গুণ গণভুক্ত অন্যান্য বস্তুতে নাই বলিয়া, অন্যান্য বস্তু বর্জ্জিত হয়। প্রজাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিই এই নেতিবচনদ্বারা স্বতন্ত্র হয়।

অসীম-সম্বন্ধে হেগেলের মত স্পিনোজার মতদ্বারা প্রভাবিত। অসীম অর্থ সীমাহীন। বিশেষীকরণ অর্থ অবচ্ছেদ, সীমাবদ্ধ-করণ। সুতরাং অসীম অবিশিষ্ট; তাহার কোনও গুণ নাই। যাহার কোনও গুণ নাই, যাহার সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, তাহা শূন্যমাত্র। কিন্তু স্পিনোজা বলিয়াছেন, যে Substance তাহার নিজের কারণ। সুতরাং তাহা অনিয়ন্ত্রিত নহে, স্ব-নিয়ন্ত্রিত। অসীম কেবল অন্তহীন, সীমাহীন, অবিশিষ্ট বস্তু নহে, অসীম আপনা-কর্ত্তৃক বিশেষিত ও নিয়ন্ত্রিত। ইহাই হেগেলের মত।

ক্যাণ্ট জগৎকে প্রত্যয়ে পরিণত করিয়াও, তাহার কারণ-স্বরূপ স্ব-গত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এই স্বগত বস্তুর স্বরূপ কি, ক্যাণ্টের মতে তাহা জানিবার উপায় নাই, তাহা অজ্ঞেয়। ক্যাণ্টের এই মত স্ববিরোধ দোষে দুষ্ট। আমাদের মনে বাহ্যজগতের যে জ্ঞান হয়, তাহার কারণ-রূপেই তিনি স্বগত বস্তুর কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্যাণ্টের মতে

কারণ একটা "প্রকার", অস্তিত্বও একটা প্রকার, এবং প্রতিভাসের বাহিরে প্রকারদিগের প্রয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং যাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে, তাহাকে কারণও বলা যায় না, তাহার অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। বিশেষতঃ এই কল্পনাদ্বারা লাভও কিছু হয় না। স্বগত বস্তু কি, তাহাই যখন আমরা জানি না, তখন তাহা হইতে কিরূপে প্রতিভাসের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা বলিতে পারা যায় না। সুতরাং তাহাকে প্রতিভাসের কারণ বলা যায় না, তাহাকে প্রতিভাসের কারণ বলিবার কোনও সার্থকতা নাই। আবার বস্তুর জ্ঞান কতকগুলি সম্প্রত্যয়ের সমষ্টিমাত্র। যে কোনও বস্তুর বিষয়ই বিবেচনা করা যাউক না কেন, তাহার সম্বন্ধে যাহাই বলিতে পারা যায়, তাহাই সম্প্রত্যয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভাষার প্রত্যেক শব্দই সম্প্রত্যয়। কোনও বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাহার বর্ণ, ভার, আকার প্রভৃতি যাহা কিছু ধর্ম্ম আমরা জানি, তাহারা সকলই সম্প্রত্যয়। এই সকল ধর্ম্ম তাহা হইতে নিষ্কাশন করিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং স্ব-গত বস্তুর কল্পনা নিরর্থক হইয়া পড়ে। বস্তুর ধর্ম্মের কারণও তাহাকে বলিতে পারি না। কেন না, কিরূপে তাহা হইতে ঐ সকল ধর্ম্মের উদ্‌ভব হয়, তাহা আমরা জানি না। সুতরাং স্ব-গত বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। হেগেল তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।

ফিক্‌টে প্রকৃতির মধ্যে কোনও স্ব-গত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি নির্ব্বিশেষ অহং বা আত্মা হইতে সমস্ত জগৎ উদ্‌ভূত হইয়াছে, বলিয়াছেন। এই নির্ব্বিশেষ অসীম আত্মা সক্রিয়। কিন্তু আত্মার মধ্যে তিনি Anstoss নামে এক বিরোধী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আত্মার মধ্যে এই বিরোধ হইতে স্ব-সংবিদের উদ্‌ভব হয়। এই বিরোধ ভাব ও অভাবের বিরোধ, এবং ইহা হইতেই নয়, প্রতি নয় এবং সমন্বয়-রূপ ত্রিভঙ্গী নয় পদ্ধতির উদ্‌ভব। হেগেল ফিক্‌টের এই ত্রিভঙ্গী নয় পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহার পরিপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। শেলিংএর অভেদ-দর্শন এবং নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত হইতে চিৎ ও প্রকৃতির উৎপত্তির মত তিনি গ্রহণ করেন নাই; পরমার্থকে তিনি মনঃ সংবিদ[১]) বলিয়াছেন।[১]

হেগেলের দর্শন

হেগেলকে বুঝিতে হইলে প্রথমেই জানিয়া রাখা ভাল, যে হেগেলের মতে এই জগৎ নৈয়ায়িক সম্বন্ধে আবদ্ধ যুক্তিযুক্ত চিন্তারাজির সমাবেশ—সমাবিষ্ট যুক্তিযুক্ত চিন্তারাজির স্থূল রূপ। চিন্তার স্থূল রূপ—কথাটি দুর্বোধ্য হইলেও অবোধ্য নহে। Differential Calculus কতকগুলি গণিতের চিহ্নের সমাবেশ। কিন্তু যে চিন্তা প্রকাশ করিবার জন্য সেই চিহ্নগুলি সমাবিষ্ট, তাহারই স্থূল রূপ তাহারা। বৈজ্ঞানিকের নিকট প্রকৃতি কতকগুলি গণিতের সূত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে; প্রকৃতি সেই সূত্রাবলী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত চিন্তা-রাজির স্থূল রূপ। হেগেলের মতে চিন্তা ব্যতীত অন্য কিছু জগতের মধ্যে নাই।

.[১] Mind

ব্যাখ্যা কাহাকে বলে

দর্শনের উদ্দেশ্য জগতের ব্যাখ্যা করা। দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যা বহু মনোবিজ্ঞান, তত্ত্ববিজ্ঞান, কর্ম্মনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞান, সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান—সকলই দর্শনের আলোচ্য। কিন্তু জগতের ব্যাখ্যার সঙ্গে এসমস্ত বিষয়েরই ব্যাখ্যা হইয়া যায়। কোনও কোনও দার্শনিক জড় বস্তুকে জগতের কারণ বলিয়াছেন, এবং জড়ের দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ চৈতন্যকেই জগতের মূল বলিয়া তাহাদ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। আবার কেহ কেহ জগতের ব্যাখ্যার জন্য তাহার আদি কারণের সন্ধান করিয়াছেন। কেহ বা জগতের স্রষ্টা এক অসীম জ্ঞান-ও-বুদ্ধিমান পুরুষের কল্পনা করিয়াছেন। এই সকল উপায়ে জগতের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হইয়াছে কি না, তাহা বুঝিতে হইলে ব্যাখ্যা কাহাকে বলে, প্রথমে তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

কোনও বিশেষ ঘটনার কারণ যতক্ষণ আবিষ্কৃত না হয়, ততক্ষণ তাহার ব্যাখ্যা হইয়াছে, বলা যায় না। কিন্তু এই ভাবে জগতের ব্যাখ্যা করা যায় না। এক আদি কারণ-দ্বারা যদি জগতের ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা হইলে সেই কারণ কিরূপে উদ্ভূত হইল, তাহা অব্যাখ্যাত থাকিয়া যায়। আর কোনও কারণকে যদি প্রথম বলিয়া স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ, পরে এই কারণের কারণ, পরে তাহারও কারণের অনুসন্ধান করিতে হয়। এইরূপে অনবস্থা উপস্থিত হয়। সুতরাং কারণের নির্দ্দেশদ্বারা জগতের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা অসম্ভব বলিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ ঘটনার ব্যাখ্যা তাহাদ্বারা সম্ভবপর হইলেও, সমগ্র বিশ্বের ব্যাখ্যা তাহাদ্বারা হয় না। আবার কারণদ্বারা বিশেষ বিশেষ ঘটনারই কি বাস্তবিক সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয়? কঠিন পদার্থ উত্তাপে গলিয়া যায়, তরল পদার্থ শৈত্যে জমিয়া যায়। উত্তাপ বা শৈত্যকে গলিয়া যাওয়া ও জমিয়া যাওয়ার কারণ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কেন তাপে কঠিন পদার্থ গলে, এবং শৈত্যে তরল পদার্থ জমে? এইরূপ ঘটে, আমরা দেখিয়া থাকি, কিন্তু না ঘটিলেও পারিত। সুতরাং জগতের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে হইলে, তাহার কারণের অনুসন্ধান না করিয়া অন্য উপায়ের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। দেখাইতে হইবে, যে যাহাকে আমরা জগৎ বলিয়া জানি, তাহা যুক্তিযুক্ত, তাহাতে অযৌক্তিক কিছু নাই। যাঁহারা এক মঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ-কর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব কেন রহিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। মঙ্গলময়ত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্তার সহিত অমঙ্গলের সামঞ্জস্য কোথায়? সুতরাং দেখা যাইতেছে, জগতের ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন প্রজ্ঞার। জগতের প্রথম তত্ত্ব শক্তিমূলক কারণ নহে প্রজ্ঞা বা যুক্তি-মূলক কারণ, ইহা দেখাইতে হইবে। প্রজ্ঞা হইতে জগতের উদ্ভব এবং প্রজ্ঞার নিয়মানুসারে ইহার অভিব্যক্তি হইয়াছে, এবং ইহার মধ্যে প্রজ্ঞা-বিরোধী, যুক্তি-বিরুদ্ধ কিছু নাই, ইহা দেখাইতে হইবে। শক্তিমূলক কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি কেন হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যুক্তিদ্বারা মীমাংসা কিরূপে হয়, তাহা

স্পষ্ট বুঝিতে পারি। উত্তাপরূপ কারণদ্বারা স্বর্ণ কেন বিগলিত হয়, তাহা বুঝি না। কিন্তু সমবাহু ত্রিভুজের তিন কোণ কেন সমান হয়, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। শক্তিমূলক কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তিতে কোনও অবশ্যতা অথবা নিয়ুতি নাই; কিন্তু যুক্তি অথবা উপপত্তি এবং উপপন্ন বিষয়ের মধ্যে অবশ্যতা বর্ত্তমান। উপপত্তি এবং উপপন্নের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা অবশ্যক। তাহার অন্যথা সম্ভবপর নহে। আমরা যদি জগতের এমন একটি প্রথম তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারি, যাহা হইতে জগতের আবির্ভাব তর্কশাস্ত্রের নিয়মে অবশ্যম্ভাবী—যে জগৎ আমরা জানি, তাহার আবির্ভাব নিয়ত, এবং সে জগৎ ভিন্ন অন্য প্রকারের জগতের তাহা হইতে আবির্ভাব অসম্ভব, তাহা হইলেই জগতের ব্যাখ্যা হয়। প্রথম তত্ত্ব হইতে তর্কের নিয়মানুসারে জগতের অস্তিত্ব উপপন্ন করিতে হইবে। হেগেল তাহাই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আরিস্টটল যখন বলিয়াছিলেন, যে জগতের প্রথম তত্ত্ব কালে জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, কিন্তু তর্কের নিয়মে পূর্ব্ববর্ত্তী, তখন তিনিও তর্কের নিয়মেই জগতের ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রজ্ঞা কি?

কিন্তু এই প্রজ্ঞা, এই যুক্তি কি? প্রথমতঃ ইহা কোনও বস্তু নহে। জগতে বস্তু অনেক আছে; তাহাদের অনেকগুলি জড় বস্তু, অনেকগুলি মানসিক বস্তু। তাহারা সকলেই বিশিষ্ট বস্তু। কিন্তু প্রজ্ঞা কোনও বিশিষ্ট বস্তু নহে—তাহা বিশিষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের যৌক্তিক কারণ। বিশিষ্ট বস্তুর অবস্থান দেশ ও কালের মধ্যে, কিন্তু প্রজ্ঞা দেশ ও কালের অতীত। দ্বিতীয়তঃ প্রজ্ঞা সার্ব্বিক। দেশ ও কালে অবস্থিত বস্তুসকল হইতে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। চিন্তাতে আমরা যুক্তিকে বস্তু হইতে পৃথক করিতে পারি, কিন্তু বস্তু হইতে বিচ্যুত যুক্তি একটা নিরাধার গুণমাত্র, তাহার দেশ ও কালে অস্তিত্ব নাই। সমবাহু ক্ষেত্র বর্জ্জিত সমবাহুত্বের অস্তিত্ব নাই; সুন্দর বস্তু-বর্জ্জিত সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব নাই। বস্তু-বর্জ্জিত গুণ সার্ব্বিক। জগতে অধিষ্ঠিত প্রজ্ঞাও সার্ব্বিক। প্রজ্ঞাই জগতের প্রথম তত্ত্ব; তাহাই অসঙ্গ।

প্রজ্ঞার গতিশক্তি

তর্কের যে প্রক্রিয়া[1], তাহাকেই যুক্তি বলা যায়। (১) সকল জবাফুল সুন্দর, (২) কতকগুলি জবাফুল লাল; (৩) সুতরাং কতকগুলি লালবস্তু সুন্দর। যে প্রণালী-ক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি বাক্য হইতে তৃতীয় বাক্যটি উদ্‌ভূত হইল, তাহাকে যুক্তি অথবা তর্ক বলে। কিন্তু উপরি উক্ত তিনটি বাক্যে ব্যবহৃত সমস্ত শব্দই সার্ব্বিক। সুতরাং যুক্তিকে সার্ব্বিকের সমাবেশ বলা যায়। কিন্তু এই সমাবেশ নিশ্চল নহে। ইহা গতিশীল; এই সমাবেশের মধ্যে এক সার্ব্বিক হইতে আমরা অন্য সার্ব্বিকে উপনীত হই। এই

[1] Process

গতিই যুক্তির গতি। হেগেলকে বুঝিতে হইলে যুক্তির এই গতি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

সার্ব্বিক স্বয়ংসিদ্ধ যুক্তি

আপত্তি হইতে পারে, যে জগতের প্রথম যৌক্তিক কারণের আবিষ্কার যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে শক্তিমূলক প্রথম কারণের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থিত হয়, ইহার বিরুদ্ধেও তো সেই আপত্তি উত্থিত হইতে পারে। কিন্তু যে যুক্তি সমগ্র জগতের কারণ, তাহা কোনও বিশেষ যুক্তি নহে, তাহা সার্ব্বিক যুক্তি অথবা প্রজ্ঞা। জগতের কোনও বিশেষ ঘটনা আমরা একটা যুক্তিদ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারি। সেই যুক্তি-বলে প্রমাণ করিতে পারি, যে উক্ত ঘটনা যুক্তিযুক্ত। উক্ত যুক্তিরও স্বতন্ত্র যুক্তি, এবং শেষোক্ত যুক্তিরও যুক্তি আছে। কিন্তু সমগ্র জগতের উৎপত্তির যৌক্তিক কারণ এতাদৃশ বিশেষ যুক্তি নহে; তাহা সার্ব্বিক যুক্তি। সেই জন্য তাহার ব্যাখ্যার জন্য অন্য যুক্তির প্রয়োজন হয় না; তাহা স্বয়ং সিদ্ধ। এই জন্যই স্পিনোজা তাঁহার প্রথম কারণ Substanceকে নিজের কারণ বলিয়াছিলেন। স্পিনোজা অবশ্য প্রজ্ঞা অর্থে Substance-শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাহাকে নিজের কারণ—স্বয়ম্ভূ—বলিয়া তিনি কারণান্তরের পরিহার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রজ্ঞার বেলায় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুক্তির প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। প্রজ্ঞা নিজেই নিজের যুক্তি—স্ব-প্রকাশ। তাহাকে প্রকাশ করিতে অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না।

বিশুদ্ধ চিন্তা ও মিশ্র সার্ব্বিক

হেগেলের প্রথম তত্ত্ব কি, তাহা বুঝিতে হইলে বিশুদ্ধ চিন্তা ও মিশ্র সার্ব্বিক কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইবে। যে চিন্তার সহিত ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ নাই, তাহাই বিশুদ্ধ চিন্তা। বৃক্ষ, পর্ব্বত, পুষ্প প্রভৃতি বস্তুর প্রত্যয় চিন্তা বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ চিন্তা নহে। কেননা তাহাদের প্রত্যয়ের সহিত রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থের সংশ্রব আছে। (১) সকল মানুষ মরণশীল; (২) সক্রেটিস হন একজন মানুষ; (৩) সুতরাং সক্রেটিস হন মরণশীল। এই Syllogisonএর যুক্তির মধ্যে কতকগুলি প্রত্যয় ইন্দ্রিয়ার্থের সহিত সম্বদ্ধ। মানুষ, মরণশীল, সক্রেটিস, ইহাদের প্রত্যয় ইন্দ্রিয়ার্থের প্রত্যয়। কিন্তু (১) সকল ম হয় প; (২) কোন একটি ম হয় স। (৩) সুতরাং কোন একটি স হয় প। এই Syllogismএর সহিত ইন্দ্রিয়ার্থের সংশ্রব নাই। ইহাদের মধ্যে "সকল", "হয়" এবং "কোন একটি", এই শব্দ তিনটির প্রত্যয় সার্ব্বিক এবং ইন্দ্রিয়ার্থ-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ প্রত্যয়।

প্লেটো তাঁহার সামান্য-জগৎ-দ্বারা জড় জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার সামান্য জগতে সকলপ্রকার সার্ব্বিকই আছে। বিশুদ্ধ ও মিশ্র যাবতীয় সার্ব্বিকই সে জগতের অধিবাসী। সেখানে যেমন বৃক্ষ, পর্ব্বত গো, অশ্ব, মানুষ প্রভৃতির প্রত্যয় আছে, তেমনি ক্যান্টের ক্যাটেগরিগণও আছে। হেগেলের মতে জগতের প্রথম কারণের মধ্যে

মিশ্র সার্ব্বিক নাই। ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ-বর্জ্জিত সার্ব্বিকদিগের সংস্থানই তাঁহার মতে জগতের প্রথম তত্ত্ব বা আদি কারণ।

সত্তা ও বোধের অভেদ

যে সকল ক্যাটেগরি হইতে ন্যায়ের নিয়মে এই জগৎ উদ্‌ভূত হইয়াছে, তাহারা জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু এই পূর্ব্ববর্ত্তিতা কালিক নহে, নৈয়ায়িক। তাহারা না থাকিলে আমাদের কোনও জ্ঞানই সম্ভবপর হইত না, সুতরাং জগৎও থাকিত না; কেননা জগতের যে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, তাহাই আমাদের জগৎ। তদ্ব্যতিরিক্ত কোনও জগতের অস্তিত্ব নাই। সত্তা[1] ও বোধ[2] অভিন্ন। প্রত্যেক বস্তু যে কতকগুলি সামান্য অথবা সার্ব্বিক প্রত্যয়ের সমষ্টিমাত্র, প্লেটোর দর্শনের আলোচনার সময় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সামান্য প্রত্যয়ের অতিরিক্ত কোনও স্ব-গত বস্তুর অস্তিত্বকল্পনা যে অযৌক্তিক, তাহাও দেখানো হইয়াছে। সুতরাং এই জগৎ সার্ব্বিকদিগের সমষ্টি, এবং সার্ব্বিকগণ জ্ঞানের রূপবিশেষ। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা মনের সৃষ্ট নহে। তাহাদের মনের বাহিরে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অছে; কিন্তু সেই অস্তিত্ব দেশ ও কালে অস্তিত্ব নহে। সার্ব্বিকেরা যখন দেশ ও কালে প্রকাশিত হয়, তখনই জগতের আবির্ভাব হয়।

ক্যাণ্টের ও হেগেলের ক্যাটেগরি

"প্রকার"গণ হেগেলের অসঙ্গ, তাহারাই জগতের প্রথম তত্ত্ব, তাহাদিগের হইতেই এই জগতের উদ্‌ভব হইয়াছে। ইহাদের সমবায়ই প্রজ্ঞা। ক্যাণ্ট মাত্র দ্বাদশটি "প্রকারে"র নাম করিয়াছিলেন, কিন্তু হেগেল আরও অনেক "প্রকারে"র উল্লেখ করিয়াছেন। ক্যাণ্ট তাঁহার প্রকারদিগের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ প্রদর্শন করেন নাই। হেগেল দেখাইয়াছেন, যে প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে অন্যান্য প্রকার অন্তর্নিবিষ্ট। এই সকল প্রকার বা Caetgory পরস্পর মিলিত হইয়া একত্বে পরিণত হইয়াছে, তাহাদের একত্বই প্রজ্ঞা, এবং প্রজ্ঞাই জগতের মূল তত্ত্ব। ইহাই হেগেলের, Logicএ প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী গ্রন্থে কিরূপে এই মূলতত্ত্ব হইতে জগতের উদ্‌ভব হইয়াছে, হেগেল তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

হেগেল অদ্বৈতবাদী, কিন্তু প্লেটোকে অদ্বৈতবাদী বলা যায় না। প্লেটোর প্রত্যয়-জগৎ ও বাস্তব জগৎ পাশাপাশি অবস্থিত। প্রত্যয়-জগৎ হইতে বাস্তবজগৎ কি প্রকারে উদ্‌ভূত হয়, তাহা তিনি দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রত্যয়-জগতে অসংখ্য প্রত্যয় বর্ত্তমান; তাহারা উচ্চ-নীচ-ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ হইলেও, উর্দ্ধতন প্রত্যয়ের মধ্যে যে নিম্নতন প্রত্যয় সন্নিবিষ্ট, তাহা তিনি দেখান নাই। দেখানোও সম্ভবপর ছিল না। লাল, নীল, সবুজ, পীত প্রভৃতি বর্ণের সামান্য "বর্ণের" প্রত্যয়। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় বর্ণের সাধারণ ভাগই, "বর্ণ"—তাহাদের

---

[1] Being [2] Knowing

সামান্য। এই সামান্যের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং বর্ণ-সামান্য হইতে কিরূপে বিভিন্ন বর্ণ উদ্ভূত হয়, তাহা দেখানো সম্ভবপর ছিল না। হেগেলের সামান্যের ধারণা প্লেটোর সামান্যের ধারণা হইতে ভিন্ন। হেগেলের "গণে"[1] র এর মধ্যে "প্রজাতি[2]" এবং তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ গুণ[3] অনুপ্রবিষ্ট। প্লেটোর সামান্য বস্তুত্বহীন, হেগেলের সামান্য স্থূল।

প্রথম ক্যাটেগরি

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ক্যাণ্ট ক্যাটেগরিদিগের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু হেগেল তাহাদিগকে যুক্তির বন্ধনে বদ্ধ বলিয়াছেন। তিনি "সত্তাকে" প্রথম ক্যাটেগরি বা প্রকার রূপে নির্দ্দেশ করিয়া, তাহা হইতে ক্রমানুসারে অন্যান্য ক্যাটেগরি উদ্ভূত বলিয়াছেন। "সত্তা" যাবতীয় ক্যাটেগরির মধ্যে সার্ব্বিকতম। কোনও বস্তু হইতে তাহার সমস্ত গুণ পৃথক করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা সত্তামাত্র। জড়ীয় ও মানসিক যাবতীয় বস্তু সত্তাবান্, সুতরাং তাহারা সত্তা সামান্যের অন্তর্গত। 'সত্তা' যাবতীয় বস্তুর মধ্যে সাধারণ; বস্তুর পরিমাণ, গুণ, কারণ, বস্তুত্ব প্রভৃতি সকলের মূলে তাহার সত্তা। কোনও বস্তু আছে প্রথমে এই বোধ না হইলে, তাহার পরিমাণ, গুণ ও কারণের কথা উঠিতেই পারে না। হেগেল এই সত্তা ক্যাটেগরি হইতে কিরূপে অন্যান্য ক্যাটেগরির উদ্ভাবন করিয়াছেন, পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে হেগেলের আর একটি উক্তির অর্থ বোধ প্রয়োজন।

বিপরীত পদার্থের অভিন্নতা

হেগেল বলিয়াছেন, যে সকল বস্তু বিপরীত, তাহারা অভিন্ন। ইহার অর্থ সহজে বোধগম্য হয় না। "সত্তা" ও "বোধের" অভিন্নতা-সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলে এই উক্তির অর্থ স্পষ্ট হইতে পারে। কোনও বস্তু ও তৎসম্বন্ধীয় চিন্তা অভিন্ন—ইহার অর্থ বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে কোনও দুরতিক্রম্য বিচ্ছেদ নাই। কেননা, বিষয় বিষয়ীর মধ্যে বর্ত্তমান। বিষয় বিষয়ী হইতে স্বতন্ত্র—ইহার অর্থ এই, যে বিষয়ী আপনারই এক অংশ আপনা হইতে বাহির করিয়া আপনার সম্মুখে স্থাপিত করে। প্রস্তর খণ্ড যে আমার বাহিরে অবস্থিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা অনাত্মা। ইহাই বিষয়ী ও বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু প্রস্তরখণ্ড তো কতকগুলি "সামান্যের" সমাবেশের অতিরিক্ত কিছু নহে। আবার "সামান্য"সকল চিন্তামাত্র। সুতরাং প্রস্তরখণ্ড চিন্তার অন্তর্গত—চিন্তার একত্বের মধ্যে অবস্থিত। ইহা চিন্তার বাহিরে অবস্থিত নহে, এবং সেই অর্থে আমার বাহিরে অবস্থিত নহে। ইহাই জ্ঞান ও সত্তার অভেদ। এই জন্যই হেগেল বলিয়াছেন, "চিন্তা ও তাহার বিষয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, চিন্তা তাহা অতিক্রম করিয়া যায়";

---

[1] Genns [2] Species [3] Differentia

অর্থাৎ চিন্তা ও তাহার বিষয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা বিলুপ্ত হয়, উভয়ে এক হইয়া যায়। উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা চিন্তার মধ্যেই বর্ত্তমান। বিষয় যদি চিন্তার একত্ব হইতে মুক্ত হইয়া বাহিরে যাইতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে অজ্ঞেয় বস্তুতে পরিণত হইত, কিন্তু তাহা অসম্ভব—অজ্ঞেয় কিছুই নাই। গণ হইতে প্রজাতির উদ্ভাবন করিতে হইলে, গণ এবং প্রজাতির মধ্যে যে পার্থক্য, (প্রজাতির বিশেষ লক্ষণ) তাহা গণে যোগ করিতে হয়। বর্ণরূপ-সামান্যের সহিত নীল, লোহিত ও পীতবর্ণের বিশেষত্ব যোগ করিলে, নীল, লোহিত ও পীত প্রভৃতি বর্ণের উদ্ভব হয়। হেগেল বলেন, যে গণের মধ্যে যে বিশিষ্ট লক্ষণ নাই, ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমাদের বুদ্ধিতে ধারণা হয়, যে সত্তা এবং অসত্তার মতো দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ পরস্পরের বাহিরে অবস্থিত, তাহাদের একটির মধ্যে অন্যটির অস্তিত্ব নাই। প্রজ্ঞাতেও প্রতীত হয়, যে তাহারা পরস্পরের বাহিরে বর্ত্তমান। কিন্তু প্রজ্ঞাতে ইহাও প্রতীত হয়, যে পরস্পর বিপরীত পদার্থের এই বাহ্যত্বই একমাত্র সত্য নহে। তাহারা যেমন পরস্পরের বাহিরে বর্ত্তমান, তেমনি তাহারা অভিন্নও বটে। এই সত্য আবিষ্কার করিয়া হেগেল গণ হইতে প্রজাতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। গণের যাহা সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহাকে differentia গণ্য করিয়াই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। গণ হইতে প্রজাতির উদ্ভাবন করিতে হইলে গণের অবচ্ছেদ প্রয়োজন। হেগেল বলিলেন, যাবতীয় অবচ্ছেদ যেমন নেতিবাচক তেমনি যাবতীয় নেতিবচনও অবচ্ছেদ। গণের সম্পূর্ণ বিপরীত তাহার নেতিবচন। সুতরাং এই নেতিবচন যুক্ত হইলে গণ অবচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, এবং প্রজাতির উদ্ভব হয়। পরস্পর বিরোধী পদার্থের অভিন্নতা চিন্তার জগতে এক অতি দুঃসাহসিক কল্পনা। এই কল্পনাদ্বারা হেগেল অনেক সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু হেগেলের এই মত সম্পূর্ণ নূতন নহে। বৈদান্তিক, এলিয়াটিক, প্লোটিনাস্ এবং স্পিনোজা সকলেই জগতের বহুত্বকে একত্বে পরিণত করিয়াছেন। যাহা বহুরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন, ইহাই তাঁহাদের মত। বহু ও এক পরস্পরের বিপরীত। সুতরাং তাঁহারাও পরস্পর বিপরীত পদার্থের একত্ব স্বীকার করিয়াছেন। হেগেল এই মতকে একটি বিশিষ্ট নৈয়ায়িক মত রূপে প্রকাশিত করিয়াছেন মাত্র। সর্বেশ্বরবাদী সমস্ত দার্শনিক প্রস্থানে 'এক' হইতে "বহুর" আবির্ভাব স্বীকার করা হইয়াছে। এই 'এক' অসীম। অসীম আপনার মধ্য হইতে সসীমের সৃষ্টি করিয়া নিজে সসীমের সহিত এক হইয়া যায়, ইহাই এই সকল দর্শনের অন্তর্নিহিত মত। বিপরীত পদার্থের অভিন্নতাই ইহার গূঢ় অর্থ। হেগেল বিপরীত পদার্থের অভিন্নতা স্বীকার করিয়াও, তাহাদের ভেদ অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে তাহারা বিভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। বিভিন্নতা ও অভিন্নতা উভয়ই সত্য।

ত্রিভঙ্গী ন্যায় প্রণালী বা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি*

এই প্রণালী হেগেলের আবিষ্কৃত নহে। নব্য-দর্শনে ফিক্‌টে প্রথম এই প্রণালীর ব্যবহার করেন। ইহা ভাল রূপে না বুঝিলে, হেগেলের দর্শন বোধগম্য হয় না। সত্তা-

ক্যাটেগরি হইতে অন্যান্য ক্যাটেগরির আবিষ্কারে হেগেল এই প্রণালীর ব্যবহার করিয়াছেন। যাবতীয় প্রত্যয়ের মধ্যে সার্ব্বিকতম প্রত্যয় সত্তা। সত্তার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, কোনও গুণ নাই। ইহার সংখ্যা নাই, পরিমাণ নাই, কিছুই নাই। ইহা কেবল সত্তামাত্র। ইহার মধ্যে কোনও অবচ্ছেদ নাই। কিন্তু জাগতিক যাবতীয় বস্তু গুণদ্বারা অবচ্ছিন্ন। নির্গুণ অনবচ্ছিন্ন সার্ব্বিক সত্তা হইতে কিরূপে এই সগুণ অবচ্ছিন্ন বহুধা বিভক্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য হেগেল প্রথমে সত্তা ক্যাটেগরি হইতে অন্যান্য ক্যাটেগরির উদ্‌ভাবন করিয়াছেন। সত্তা-রূপ সর্ব্বোচ্চ গণ হইতে প্রথমে একটি প্রজাতির উদ্‌ভাবন, সেই প্রজাতি হইতে অন্য প্রজাতি, তাহা হইতে অন্য প্রজাতির উদ্‌ভাবন, এইরূপে ক্রমশঃ বিশিষ্ট হইতে বিশিষ্টতর প্রজাতির এবং অবশেষ বিশিষ্টতম বস্তুতে উপনীত হওয়া যায়। গণ এবং প্রজাতির মধ্যে যে পার্থক্য, গণে তাহা যোগ করিলেই প্রজাতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। জন্তু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য মানুষের প্রজ্ঞাবত্তা। জন্তুতে প্রজ্ঞাবত্তা যোগ করিলে মানুষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং 'সত্তা' হইতে কোনও নিম্নতর ক্যাটেগরির উদ্‌ভাবন করিতে হইলে সত্তার সহিত নূতন কিছু যোগ করিতে হইবে। যাহা যোগ করিতে হইবে, তাহাই হইবে নূতন ক্যাটেগরির বিশিষ্ট লক্ষণ।

সত্তার সম্পূর্ণ বিপরীত অ-সত্তা। সত্তা ও অসত্তা অবিনাভাব-সম্বন্ধে আবদ্ধ। কিন্তু সত্তা ও অসত্তা সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও, হেগেল প্রমাণ করিয়াছেন, যে উভয়ে অভিন্ন। কেন না সত্তা নির্গুণ; যাহা নির্গুণ, যাহার রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি কিছুই নাই, যাহার সংখ্যা নাই, পরিমাণ নাই, যাহার সহিত কোনও কিছুর সম্বন্ধ নাই, তাহার কল্পনা করাও অসম্ভব—তাহা শূন্যমাত্র,—তাহা অসত্তা (non-Being)। এইরূপে যাহা ছিল 'সত্তা', তাহা অসত্তার মধ্যে প্রবেশ করে। আবার অসত্তার দিক হইতে বিবেচনা করিলে, যাহা কিছুই নহে, তাহাই অসত্তা। এই অসত্তাও শূন্যমাত্র। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, বিশুদ্ধ নির্গুণ সত্তাও শূন্যমাত্র। সুতরাং অসত্তা এই রূপে সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে। সত্তা ও অসত্তার এইভাবে পরস্পরের মধ্যে "প্রবেশ" হইতে "ভবন" ক্যাটেগরির উদ্‌ভব হয়। 'ভবন' অর্থ অসত্তার সত্তার মধ্যে প্রবেশ এবং সত্তার অসত্তার মধ্যে প্রবেশ। অসত্তা হইতে সত্তার উদ্‌ভব এবং অসত্তার মধ্যে সত্তার বিলয়কে পারমিনিদিস "ভবন" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সত্তার উদ্‌ভব হইতেছে "উৎপত্তি, এবং বিলয় হইতেছে 'শেষ অথবা অন্তর্ধান।' ভবনের মধ্যে সত্তা ও অসত্তা উভয়ই বর্ত্তমান। সত্তার সহিত অসত্তা যুক্ত হইলে ভবনের উদ্‌ভব হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হেগেল সত্তার সম্পূর্ণ বিপরীত যাহা, যাহা সত্তার অভাববাচক, তাহাকেই differentia রূপে ব্যবহার করিয়া, তাহার নিম্নস্থ ক্যাটেগরি "ভবনের" উদ্‌ভাবন করিয়াছেন। এই উদ্‌ভাবন হেগেলের "সৃষ্টি" নহে, তাঁহার বুদ্ধির খেলা নহে; ইহা "আবিষ্কার", যাহা গূঢ় ছিল, তাহারই আবিষ্কার, তাহার উদ্‌ঘাটন। নেতিবচনের যে আশ্চর্য্যজনক শক্তির কথা হেগেল বলিয়াছেন, ইহা তাহাই—পরস্পর বিরোধী ক্যাটেগরির সমন্বয়-সাধনদ্বারা নূতন ক্যাটেগরির উদ্‌ভাবন। ইহাই ত্রিভঙ্গী নয় প্রণালী।

হেগেল সত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া বহু-সংখ্যক ক্যাটেগরির আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ ক্যাটেগরির নাম "অসঙ্গ প্রত্যয়"[1]। কিন্তু একদিকে সর্ব্বশেষ ক্যাটেগরি হইলেও, ইহা সকলের প্রথমও বটে। সত্তা হইতে 'ভবনের' আবির্ভাব হয়। সুতরাং 'ভবন' সত্তার মধ্যে ছিল; 'ভবন' ব্যতীত "সত্তা" হইতে পারে না। সুতরাং ভবন সত্তার প্রতিবন্ধ[2], ভবন সত্তার ভিত্তি, ইহা বলিতে হইবে। এইরূপে ভবনের পরবর্ত্তী সমন্বয় ভবনের ভিত্তি—অর্থাৎ ভবন ও সত্তা উভয়ের ভিত্তি। এই ভাবে অগ্রসর হইয়া সর্ব্বশেষ সমন্বয়—অসঙ্গ প্রত্যয়—যেমন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমন্বয়ের ভিত্তি, তেমনি তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য সকল সমন্বয়েরই ভিত্তি। সুতরাং যাহা ছিল সকলের শেষে, তাহা সকল ক্যাটেগরির ভিত্তি-রূপে সর্ব্ব-প্রথম বলিয়া বিবেচিত হয়। হেগেলের এই ধারণার সহিত আরিস্টটলের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। আরিস্টটলের রূপহীন উপাদানের কোনও অবচ্ছেদ নাই। হেগেলের বিশুদ্ধ সত্তার সহিত তাহা অভিন্ন। ক্রমে ক্রমে অবচ্ছেদ-সমন্বিত হইয়া আরিস্টটলের রূপহীন উপাদান উপাদান-হীন রূপে উত্তীর্ণ হয়। আরিস্টটলের উপাদানহীন রূপ হেগেলের অসঙ্গ প্রত্যয়। এই অসঙ্গ প্রত্যয় সম্পূর্ণ বস্তুত্ব-প্রাপ্ত[3], বহুধা অবচ্ছিন্ন এই বাস্তব জগৎ। আরিস্টটলের উপাদানহীন রূপের দিকে সমস্ত সত্তার গতি। ইহাতেই গতির শেষ; শেষ হইলেও ইহাদ্বারাই সমস্ত গতি নিয়ন্ত্রিত। এই অর্থে শেষ হইয়াও ইহা সর্ব্বপ্রথম। হেগেলের অসঙ্গ প্রত্যয়েই ক্যাটেরিদিগের অভিব্যক্তির শেষ পরিণতি। এই অর্থেই ইহা শেষ হইয়াও প্রথম।

হেগেলের ক্যাটেগরিদিগের হইতে অসঙ্গের উদ্‌ভব হইলেও, অসঙ্গ ও ক্যাটেগরিগণ অভিন্ন। ক্যাটেগরিগণ অসঙ্গের ধর্ম্ম নহে। ব্রাডলে হেগেলের অসঙ্গকে "An unearthly ballet of bloodless Categories (রক্তহীন ক্যাটেগরিদিগের অলৌকিক নৃত্য) বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্যাটেগরিগণ রক্তহীন নহে—প্রজ্ঞার কল্পনামাত্র নহে। তাহারা সত্য। সমস্ত সত্যের প্রসূতি প্রজ্ঞার রূপই ক্যাটেগরিগণ—তাহারাই অসঙ্গ। জগৎ সেই অসঙ্গের প্রকাশ।

হেগেলের দর্শনের বিভাগ

হেগেলের দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত: (I) লজিক (তর্ক), (II) প্রকৃতির দর্শন এবং (III) আত্মার দর্শন। এই তিনটি লইয়া একটি ত্রয়ী। পর প্রত্যয় স্বরূপে যাহা, তাহাই লজিকে আলোচিত হইয়াছে। পর প্রত্যয় "নয়"। পর প্রত্যয়ের বিপরীত প্রকৃতি। ইহাই "প্রতিনয়"। এই নয় ও প্রতিনয়ের সমন্বয় হইয়াছে আত্মার মধ্যে। হেগেলের এই প্রথম ত্রয়ীর নয়, প্রতিনয় ও সমন্বয়ের প্রত্যেকটি হইতে অন্য ত্রয়ীর উদ্‌ভব হইয়াছে, এবং

[1] Absolute Idea [2] Condition
[3] Concrete

এই সকল ত্রয়ীর নয়, প্রতিনয় ও সমন্বয় হইতেও আবার অন্যান্য ত্রয়ী উদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল ত্রয়ীই প্রথম ত্রয়ীর (প্রত্যয়, প্রকৃতি ও আত্মা) অন্তর্গত। লজিকে কেবল এই প্রথম ত্রয়ীর "নয়", পর প্রত্যয়ের আলোচনা আছে। লজিক তিন ভাগে বিভক্ত : (১) সত্তা, (২) সার এবং (৩) সম্প্রত্যয়[২]। সত্তা, সার ও সম্প্রত্যয় লইয়া একটি ত্রয়ী। ইহাদের প্রত্যেকটি আবার ক্ষুদ্রতর ত্রয়ী-সমূহে বিভক্ত। এইরূপে প্রথম ত্রয়ীর প্রতিনয় প্রকৃতি, এবং সমন্বয় আত্মা, ক্ষুদ্রতর ত্রয়ী-সমূহে বিভক্ত। তাহারা প্রকৃতির দর্শন, ও আত্মার দর্শনে আলোচিত হইয়াছে।

লজিকে বিশুদ্ধ সার্ব্বিক প্রত্যয় অথবা ক্যাটেগরিগণের বর্ণনা আছে। এই ক্যাটেগরিগণই জগতের প্রথম কারণ। হেগেলের দর্শনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে প্রকৃতি এবং আত্মার অর্থাৎ বাস্তব জগতের আলোচনা আছে। দেশ, কাল, অজৈব জড়বস্তু, উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রকৃতির অন্তর্গত। আত্মা অর্থে মানুষের আত্মা, তাহাও বাস্তব জগতের একটি অংশ।

পরপ্রত্যয় স্বরূপে যাহা, তাহাই ক্যাটেগরিগণদ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। পরপ্রত্যয় স্বীয় স্বরূপের বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইয়া যাহা হইয়াছে, তাহাই প্রকৃতি। পরপ্রত্যয় এই বৈপরীত্য হইতে স্বরূপে প্রত্যাগত হইয়া যাহা হইয়াছে, তাহাই আত্মা। পরপ্রত্যয় শব্দ দ্বিবিধ অর্থে হেগেল ব্যবহার করিয়াছেন। পরস্পর-সম্বন্ধ ক্যাটেগরিদিগের সমষ্টি অর্থে ইহা যেমন ব্যবহৃত হইয়াছে, তেমনি লজিকে বর্ণিত শেষ ক্যাটেগরি বুঝাইতেও ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। সর্ব্বশেষ ক্যাটেগরির নাম অসঙ্গ প্রত্যয়। কিন্তু ইহা যে মণ্ডলের অন্তর্গত, তাহাকেও পরপ্রত্যয় বলা হয়। শেষ ক্যাটেগরি অসঙ্গ প্রত্যয় পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় ক্যাটেগরিদিগের সমষ্টি, কেননা ত্রিভঙ্গী নয়-পদ্ধতির * নিয়মানুসারে শেষ ক্যাটেগরির মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় ক্যাটেগরিই বর্ত্তমান—সেই সকল ক্যাটেগরির একত্বই শেষ ক্যাটেগরি। সুতরাং বস্তুতঃ পর প্রত্যয়ের এই দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। পরপ্রত্যয় এবং অসঙ্গ প্রত্যয়ের মধ্যে ভেদ নাই।

লজিকের পর প্রত্যয়ের বিপরীত প্রকৃতি। সত্তা ও অসত্তার মধ্যে যে সম্বন্ধ পরপ্রত্যয় ও প্রকৃতির মধ্যের সম্বন্ধও তাহাই। কিন্তু সত্তা ও অসত্তা যেমন অভিন্নও বটে, তেমনি প্রকৃতি ও পরপ্রত্যয়ও অভিন্ন। এখানে বিরোধের মধ্যে অভিন্নতা বর্ত্তমান। আত্মাতে এই বিরোধের সমন্বয়। প্রকৃতি এবং পরপ্রত্যয়ের একত্বই আত্মা। আত্মাই দেশ ও কালে বর্ত্তমান প্রজ্ঞা।

(১) বিষয়ী আত্মা, (২) বিষয় আত্মা এবং (৩) অসঙ্গ আত্মা, আত্মার দর্শনের এই তিন ভাগ। বিষয়ী আত্মা বিভাগে নৃতত্ত্ব, প্রতিভাস-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে।

[১] Triad [২] Notion

* জৈন দর্শনে স্যাৎ-বাদের বর্ণনায় "সপ্তভঙ্গী নয়ে"র বর্ণনা আছে। নয়= Judgment "বিচার"। সেখানে একই বস্তু-সম্বন্ধে Judgmentএর সাত রূপের কথা আছে। (Vide Introduction to Indian Philosophy by Dr. S. C. Chatterjee and Dr. D. M. Dutta P. 84.)

বিষয়গত আত্মা বিভাগে আলোচিত হইয়াছে, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি। অসঙ্গ আত্মা বিভাগে কলা, দর্শন ও ধর্ম্মের দর্শন আলোচিত হইয়াছে।

পরপ্রত্যয়, প্রকৃতি এবং আত্মা এই ত্রয়ীর শেষ পদ আত্মাকে পরপ্রত্যয় ও প্রকৃতির ভিত্তি বলা যায়। সত্তার অব্যবহিত ভিত্তি ভবন, এবং শেষ ভিত্তি শেষ ক্যাটেগরি অসঙ্গ আত্মা। সেই রূপ স্বগত[১] পরপ্রত্যয়ের ভিত্তিও আত্মা। আবার আত্মার ভিত্তি অসঙ্গ আত্মা। সুতরাং এই অসঙ্গ আত্মা (যাহা সকল ত্রয়ীর শেষ প্রান্তে অবস্থিত) সকলের ভিত্তি। ইহা যে কেবল বিষয়ী আত্মা এবং বিষয় আত্মার ভিত্তি, তাহা নহে; ইহা প্রকৃতি এবং পরপ্রত্যয়েরও ভিত্তি। সুতরাং এই অসঙ্গ আত্মাই জগতের চরম ভিত্তি। অসঙ্গ (The Absolute) এই আত্মাই। অসঙ্গ ক্যাটেগরিদিগের সমষ্টি, আবার মানবাত্মার শেষরূপ অসঙ্গ আত্মাই অসঙ্গ। অসঙ্গ প্রত্যয় (যাহা পরে বর্ণিত হইবে) ও এই অসঙ্গ আত্মা অভিন্ন। বাস্তব জগতের কারণ বস্তু ও কারণ ক্যাটেগরি যেমন অভিন্ন, বাস্তব কারণ যেমন ক্যাটেগরি কারণের বাস্তব রূপ, তেমনি অসঙ্গ আত্মা অসঙ্গ প্রত্যয়ের বাস্তব রূপ; অসঙ্গ প্রত্যয় অসঙ্গ আত্মার প্রত্যয় রূপ। কারণ বস্তু ও কারণ ক্যাটেগরির মধ্যে যে ভেদ, দ্রব্য ও দ্রব্য ক্যাটেগরির মধ্যে যে ভেদ, অসঙ্গ আত্মা ও অসঙ্গ প্রত্যয়ের মধ্যেও সেই ভেদ। হেগেলের মতে চিন্তা ও সত্তা অভিন্ন, এবং দ্রব্য ও তাহার প্রত্যয় অভিন্ন। সুতরাং অসঙ্গ আত্মা ও অসঙ্গ প্রত্যয়ও অভিন্ন।

কিন্তু এই অসঙ্গ আত্মা ব্যক্তির আত্মা নহে, মানবাত্মা নহে। ইহা মানব জাতিও নহে। পূর্ণতম আত্মাই অসঙ্গ আত্মা। প্রত্যেক মানবের মধ্যেই অসঙ্গ আত্মা বর্ত্তমান, কেননা অসঙ্গ আত্মার আদর্শেই প্রত্যেক আত্মা গঠিত। মানবাত্মার মধ্যে স্বার্থপরতা, যুক্তিহীন খেয়াল ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান বলিয়া তাহা অপূর্ণ। কিন্তু অসঙ্গ আত্মা সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণাঙ্গ, প্রজ্ঞাবান, অনবদ্য, নিরস্ত-নিখিল-দোষ—তিনিই ঈশ্বর। মানবাত্মা ঈশ্বরের সজাতীয়, এবং প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বরত্বের শক্যতা আছে, কিন্তু তাহা ঈশ্বর নহে। খৃষ্টধর্ম্মে যে ঈশ্বরের কথা আছে, হেগেলের অসঙ্গ তাহা নহেন। তিনি পুরুষ বটেন, কিন্তু অসীম, সসীম ব্যক্তি নহেন।

(I)

তর্কবিজ্ঞান

লজিকে হেগেল বিশুদ্ধ সার্ব্বিক প্রত্যয়দিগের আলোচনা করিয়াছেন। আরিস্টটল, উলফ্ ও ক্যাণ্ট যে সকল ক্যাটেগরির বর্ণনা করিয়াছিলেন, হেগেল তাহাদিগের পরীক্ষা করিয়া যেগুলি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছেন, এবং কয়েকটি নূতন ক্যাটেগরির আবিষ্কার করিয়া সকল ক্যাটেগরির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

ক্যাটেগরিগণ এক দিকে যেমন সকল চিন্তার ভিত্তি, তেমনি যাবতীয় বস্তুরও ভিত্তি। তাহারা যেমন জ্ঞানের মৌলিক উপাদান, তেমনি বাহ্য পদার্থের অন্তঃস্থ মৌলিক তত্ত্বও বটে।

---

[১] The Idea in itself or Logical Idea

তাহারা আত্মিক ও প্রাকৃতিক জগতের মিলন-ক্ষেত্র। সত্য যবনিকাদ্বারা আচ্ছাদিত (হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং)। যবনিকামুক্ত সত্য—সত্য স্বরূপে যাহা, তাহাই—লজিকের আলোচ্য বিষয়। রূপক ভাষার ব্যবহার করিয়া হেগেল বলিয়াছেন, জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর যে সনাতন স্বরূপে অবস্থিত ছিলেন, লজিকে তাহারই বর্ণনা আছে। সুতরাং লজিকের ক্ষেত্র বস্তুত্ব-হীন ছায়ামাত্র। তাহাতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিছুই—নাই। কিন্তু স্থূলত্ববর্জ্জিতএই সকল ছায়াই বিশ্বের মূল তত্ত্ব। তাহারাই এই বিশ্বের কাঠামো। সেই কাঠামোর মধ্যে এই বিশ্ব গঠিত।

প্রথম ক্যাটেগরি সত্তা ও শেষ ক্যাটেগরি অসঙ্গ প্রত্যয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সকল ক্যাটেগরি এই শেষ ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত, যদিও তাহাদের হইতেই ইহার উদ্ভব। এই অসঙ্গ প্রত্যয়ই লজিকের আলোচ্য বিষয়। সেইজন্য ইহাকে লজিকের প্রত্যয় নাম প্রদত্ত হইয়াছে। শেষ ক্যাটেগরি অসঙ্গ প্রত্যয়কে যখন যাবতীয় ক্যাটেগরির সমষ্টিরূপে গণ্য করা হয়, তখন তাহাকে "লজিকের প্রত্যয়" বলা হয়।

লজিকের আলোচ্য বিষয় প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার দুই রূপ, আন্তর ও বাহ্য[1]। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, পরস্পর সংবদ্ধ ক্যাটেগরিগণই প্রজ্ঞা। এই সকল ক্যাটেগরিরও দুই রূপ—আন্তর ও বাহ্য। ক্যাণ্ট ক্যাটেগরিদিগকে প্রজ্ঞার আন্তর রূপ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু হেগেল তাহাদিগকে জ্ঞান ও বাস্তবতা উভয়ের ভিত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং হেগেলের লজিক জ্ঞান-বিজ্ঞান[2] এবং তত্ত্ববিজ্ঞান[3] উভয়ই।

হেগেল ক্যাটেগরিদিগকে তিন মণ্ডলে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) সত্তা[4] মণ্ডল (২) সার মণ্ডল[5] এবং (৩) সম্প্রত্যয়[6] মণ্ডল। এই তিন মণ্ডলে মিলিয়া একটি ত্রয়ী। সত্তা যেমন একটি ক্যাটেগরি নাম, সত্তা-অসত্তা-ভবন, এই ত্রয়ীর অন্তর্গত প্রথম ক্যাটেগরির নাম, তেমনি একটি মণ্ডলেরও নাম। এই মণ্ডলের অন্তর্ভূত ক্যাটেগরি দিগের মধ্যে সত্তা একটি মাত্র ক্যাটেগরি। সত্তা-মণ্ডলের মধ্যে গুণ, পরিমাণ, নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রভৃতি ক্যাটেগরি এবং তাহাদের অধীনস্থ ক্যাটেগরিসকল বর্ত্তমান। সত্তা মণ্ডলের অন্তর্গত ক্যাটেগরিগণ দৃশ্যতঃ অনপেক্ষ অর্থাৎ স্পষ্টতঃ তাহাদের ধারণার জন্য অন্য কোন ক্যাটেগরির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সার মণ্ডলের অন্তর্গত ক্যাটেগরিগণ সাপেক্ষ। ইহারা যুগলাত্মক। এক এক যুগলের একটির ধারণা করিতে অন্য একটি ক্যাটেগরির প্রয়োজন; যেমন কারণ ও কার্য্য। এই মণ্ডলকে সার মণ্ডল বলা হইয়াছে এই জন্য, যে এই মণ্ডলের অন্তর্ভূত ক্যাটেগরিদিগের একটি অন্য আর একটির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন কার্য্যের ভিত্তি কারণ, উপলক্ষণের ভিত্তি দ্রব্য। তৃতীয় মণ্ডলের নাম "সম্প্রত্যয়" অথবা Notion। এই মণ্ডলের অন্তর্গত ক্যাটেগরিগণ পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ। তাহাদের পরস্পরের বিভিন্নতা সুস্পষ্ট। কিন্তু এই বিভিন্নতা স্থায়ী নহে। বুদ্ধিতে আবির্ভূত হইয়াই এই

[1] Subjective and Objective [2] Epistemology
[3] Metaphysic [4] Being [5] Essence [6] Notion

বিভিন্নতা অন্তর্হিত হয়। ক্যাটেগরিগণ বিভিন্ন রূপে প্রথমে প্রতীত হইলেও, অচিরেই অভিন্ন রূপে প্রতীত হয়।

ভেদাভেদবাদ

ক্যাটেগরিগণ একদিকে যেমন অসঙ্গের বাচক, তেমনি বাস্তব জগতেরও বাচক। তাহারাই অসঙ্গ, আবার তাহারাই বাস্তব জগৎ। এই জগৎ অথবা তাহার অন্তর্গত কোনও বস্তু কি, তাহা বুঝিতে হইলে ইহাদের প্রয়োজন। কোনও বস্তু কি, বুঝিতে হইলে প্রথমেই তাহার যে অস্তিত্ব আছে, ইহা বুঝিতে হয়—তাহাকে "সত্তা" ক্যাটেগরির অন্তর্ভূত বলিয়া বুঝিতে হয়। তাহার পরে বুঝিতে হয়, যে তাহা একটি দ্রব্য; পরে বুঝিতে হয়, যে তাহা "কারণ", অর্থাৎ তাহা হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়। পরে বুঝিতে হয় তাহার "গুণ" ও "পরিমাণ" আছে, ইত্যাদি। কিন্তু সর্ব্বশেষ ক্যাটেগরিগুলিও যে প্রত্যেক বস্তুতে প্রয়োজ্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। তাহা প্রমাণ করা হেগেলের দর্শনের উদ্দেশ্য। আমাদের সেরূপ দৃষ্টিশক্তি থাকলে দেখিতে পাইতাম, যে এই স্থূল জগৎ অসঙ্গ প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কিছু নহে; এবং পরপ্রত্যয় ও আত্মা অভিন্ন।

প্রত্যয় বলিতে বুঝায় চিন্তা। "দ্রব্য" ক্যাটেগরি বলিতে দ্রব্যের প্রত্যয় বুঝায়। সকল ক্যাটেগরিই প্রত্যয় অথবা আমাদের মনের চিন্তা বা ধারণা। পরপ্রত্যয়ও চিন্তা। ক্যাটেগরিগণ যাহা, তাহার চিন্তা বা প্রত্যয়ই পরপ্রত্যয়। ক্যাটেগরিগণ যখন চিন্তা বা প্রত্যয়, তখন পরপ্রত্যয় চিন্তার প্রত্যয়—ক্যাটেগরি-রূপ প্রত্যয়গণের প্রত্যয়—চিন্তার চিন্তা।[১] অসঙ্গ প্রত্যয় ক্যাটেগরিও স্থূল জগতে প্রযোজ্য—ইহার অর্থ জড়জগৎ চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ নহে। কোনও বস্তুর অস্তিত্ব আছে, যদি বলা যায়, তাহা হইলে হেগেলের মত-অনুসারে তাহার অস্তিত্ব নাই, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। তাহার পরে তাহাকে "কারণ" "দ্রব্য" এবং ক্রমে ক্রমে অবশেষে অসঙ্গ প্রত্যয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে সকল ক্যাটেগরিই সেই বস্তুতে প্রযুক্ত হইল। যে কোনও বস্তুতেই "সত্তা" ক্যাটেগরি প্রযোজ্য, তাহাতেই অসঙ্গ প্রত্যয় ক্যাটেগরিও প্রযোজ্য, অর্থাৎ কোনও বিশিষ্ট বস্তুই হউক, অথবা সমগ্র জগৎই হউক, যাহারই অস্তিত্ব আছে, তাহা চিন্তা অথবা আত্মা। প্রাতিভাসিক জগৎ অসঙ্গ হইতে ভিন্ন কোনও বস্তু নহে, অসঙ্গের বাহিরে অবস্থিত নহে। কিন্তু এই অভেদের মধ্যে ভেদও আছে। অসঙ্গ ও জগতের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়েই আছে। এই ভেদাভেদ-বাদই হেগেলের মত।

ক্যাটেগরিদিগের মূল্য

সকল ক্যাটেগরিই সমগ্র জগৎ এবং তাহার অন্তর্গত বিশিষ্ট বস্তুতে প্রযোজ্য হইলেও, তাহাদিগের মূল্যের তারতম্য আছে। জগতের অথবা বিশিষ্ট বস্তুদিগের বর্ণনায় প্রত্যেক

[১] Thought of Thought

ক্যাটেগরি অপেক্ষা তাহার পরবর্ত্তী ক্যাটেগরি অধিকতর উপযোগী, এবং সর্ব্বশেষ ক্যাটেগরিদ্বারাই কেবল, জগতের পরিপূর্ণ বর্ণনা সম্ভবপর হয়। কোনও বস্তুতে "সত্তা" ক্যাটেগরির প্রয়োগ করিলে, তাহা আছে, এই মাত্র বলা হয়। ইহাদ্বারা সেই বস্তুর সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিচয় দেওয়া হয়। তাহার পরে যখন "ভবন" ক্যাটেগরির প্রয়োগ করা হয়, তাহার পরিবর্ত্তন হয় বলা হয়, তখন আর একটু বেশী পরিচয় দেওয়া হয়। যখন সেই বস্তুর গুণের এবং পরিমাণের উল্লেখ করা হয়, তখন আরও বেশী পরিচয় দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী প্রত্যেক ক্যাটেগরিদ্বারা বস্তুটিকে পূর্ব্ব হইতে অধিকতর অবচ্ছিন্ন করা হয়, এবং প্রত্যেক ক্যাটেগরির মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্যাটেগরি বর্ত্তমান থাকে বলিয়া ক্রমেই বস্তু-সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ হয়। পরিশেষে যখন তাহাকে সর্ব্বশেষ ক্যাটেগরি "অসঙ্গ প্রত্যয়" বলা হয়, তখনই তাহার পূর্ণ জ্ঞান-লাভ হয়। পারমিনিদিস্ অসঙ্গকে সত্তামাত্র বলিয়াছিলেন। ভুল হয় নাই। কিন্তু অসঙ্গের পূর্ণ বর্ণনা হয় নাই। স্পিনোজা অসঙ্গকে দ্রব্য বলিয়াছিলেন। ঠিকই বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও পূর্ণ বর্ণনা হয় নাই। অসঙ্গকে যখন অসঙ্গ প্রত্যয় বলা হয় , তখনই বর্ণনা সম্পূর্ণ হয়।

সত্তা মণ্ডলের ক্যাটেগরিগণ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত হয়। প্রাত্যহিক জীবনে যে সকল বস্তুর আমাদের প্রয়োজন, তাহাদের অস্তিত্ব, গুণ ও পরিমাণ জানিলেই আমাদের চলিয়া যায়। সার মণ্ডলের ক্যাটেগরিগুলি ব্যবহৃত হয় বিজ্ঞানে। গুণ ও পরিমাণের প্রয়োজন যে বিজ্ঞানের নাই, তাহা নহে। বস্তুর শক্তি ও তাহার প্রকাশ—কার্য্য-কারণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, দ্রব্য ও তাহার বিকার প্রভৃতি ক্যাটেগরিগুলি—জগতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্য বিশেষ আবশ্যক। ইহাদের দ্বারা জগতের পূর্ণতর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারা বুদ্ধির ক্যাটেগরি।

কিন্তু জগতের পূর্ণতম জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন সম্প্রত্যয় মণ্ডলের অন্তর্গত ক্যাটেগরিদিগের। সংঘাত,[1] প্রাণ, উদ্দেশ্য এবং অবশেষে পরম প্রত্যয় ক্যাটেগরির প্রয়োগেই পূর্ণতম জ্ঞান সম্ভবপর হয়। যাবতীয় বস্তুই যে চিন্তা, সমগ্র জগৎ যে একটি প্রাণবান আত্মিক সংঘাত, এবং ইহা বুদ্ধিদ্বারা চালিত, এবং এই বুদ্ধি যে উদ্দেশ্যের অভিমুখী এবং সর্ব্বশেষে ইহা যে আত্মা, ইহা যে পর প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ইহাই বিশ্ব-সম্বন্ধে শেষ কথা। এই জ্ঞানই দর্শন।

দর্শনের অভিব্যক্তি

হেগেল বলিয়াছেন, যে পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় দর্শন তাঁহার দর্শনের অন্তর্গত। তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল দর্শনের উদ্‌ভব হইয়াছিল, তাহাদের উদ্‌ভব আকস্মিক নহে। তাহাদের মধ্যে অভিব্যক্তির ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এলিয়াটিকগণ অসঙ্গকে সত্তামাত্র বলিয়াছিলেন। হেগেলের অসঙ্গ সত্তা, কিন্তু আরও কিছু। হেরাক্লিটাস "ভবনকেই" মূল তত্ত্ব বলিয়াছিলেন। "ভবন" হেগেলের দ্বিতীয় ক্যাটেগরি। পরমাণুবাদিগণ পরমাণুকেই সত্য বলিয়াছিলেন। হেগেলের "আপনার নিকট ব্যক্ত সত্তা"[2] (যাহার মধ্যে এক, বহু এবং আকর্ষণ বিকর্ষণ ক্যাটেগরি

---

[1] Organism [2] Being for itself

বর্ত্তমান) ক্যাটেগরিই সেই তত্ত্ব। স্পিনোজার "দ্রব্য" হেগেলের সার মণ্ডলের অন্তর্গত। ইহা-দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে পর প্রত্যয় আপনাকে বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে কালে প্রকাশিত করে। সুতরাং আপাত বিরোধ থাকিলেও, সকল দার্শনিক প্রস্থানই সত্য। দর্শনের ইতিহাসে যাহা সত্য, জগতের ইতিহাসেও তাহা সত্য। জগৎ অন্ধ শক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র নহে। প্রজ্ঞা-কর্ত্তৃক ইহার অভিব্যক্তি পরিচালিত। পর প্রত্যয়ের কালে প্রকাশই ইতিহাস। এই অভিব্যক্তি যাদৃচ্ছিক নহে। ইহা যুক্তি-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

(১)

সত্তাবাদ[1]

এই খণ্ডে হেগেল সত্তামণ্ডলের অন্তর্গত সকল ক্যাটেগরির উদ্ভবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সত্তার অন্তর্গত প্রধান তিন ক্যাটেগরি হইতেছে: (১) গুণ, (২) পরিমাণ (৩) সমানুপাত। ইহাদের প্রত্যেকটি হইতে আবার অন্যান্য ক্যাটেগরি-ত্রয়ীর উদ্ভব হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে হেগেলের এই উদ্ভাবন-প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইল।

গুণ

সত্তা ও অসত্তা সমান। নির্গুণ সত্তা শূন্যমাত্র। অসত্তাও শূন্য। সুতরাং উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই। উভয়ের সমন্বয় হয় "ভবনের" মধ্যে। ভবন অর্থ যাহা ছিল না, তাহার ঘটন—পরিবর্ত্তন। ভবন দ্বিবিধ—উৎপত্তি ও লয়। অসত্তার সত্তায় পরিণতি উৎপত্তি, সত্তার অসত্তায় পরিণতি লয়। দেশ ও কালে অস্তিত্ব এবং সত্তা এক নহে। দেশ ও কালে অস্তিত্বের সহিত অন্য বস্তুর সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সত্তা সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, তাহ শূন্যগর্ভ।

উৎপত্তি ও লয়ের সমন্বয় "বিশিষ্ট-অবস্থাপ্রাপ্ত সত্তা[2]"। সত্তা যখন অসত্তার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন হয় লয়। অসত্তা যখন সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন হয় উৎপত্তি; পরিবর্ত্তন। কিন্তু সত্তা ও অসত্তার মিলিত অবস্থা একটা বিশিষ্ট অবস্থা, সত্তার অবচ্ছিন্ন অবস্থা। ইহাই "গুণ"। কোনও বস্তুর গুণকে সত্তা হইতে পৃথক করা যায় না। করিলেই সে বস্তুর অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়। গুণকৃত অবচ্ছেদ বস্তুর আভ্যন্তরীণ অবচ্ছেদ। ইহাই বস্তুর বাস্তবতা—সীমাবদ্ধ অবস্থা। গুণ দ্বিবিধ—ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক। লৌহের বর্ণ, ভার, কাঠিন্য প্রভৃতি ভাবাত্মক গুণ। আবার এই সকল গুণের অস্তিত্বদ্বারা ইহাদের বিপরীত গুণের অভাবও সূচিত হয়। এই অর্থে উহারা অভাবাত্মক বটে। সুতরাং গুণ একদিকে যেমন বাস্তবতা, অন্যদিকে তেমনি ব্যাতিরেকও বটে। বাস্তবতা ও নিত্যত্ব এক নহে। ব্যবচ্ছিন্ন সত্তা—দেশে বিদ্যমানতা—যাহার আছে, তাহাই বাস্তব। বস্তুর গুণকে ভাবাত্মকরূপে তাহার স্বরূপ বলিয়া গণ্য করিলে পাওয়া যায় "স্ব-গত সত্তা"[3].

[1] Doctrine of Being [2] Determinate Being

এবং অভাবাত্মক গণ্য করিলে, অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ভাবে দেখিলে, পাওয়া যায় "অন্য সম্বন্ধী সত্তা[2]।" সত্তা, বিশিষ্ট সত্তা ও আপনার নিকট ব্যক্ত সত্তা—এই তিনটিই গুণের নিম্নস্থ ক্যাটেগরি।

বিশিষ্ট সত্তার অন্তর্গত তিন ক্যাটেগরির নাম : গুণ, সীমা ও সত্য অনন্ত। সীমার অধঃস্থ তিন ক্যাটেগরির নাম সান্ত, পরিবর্তন ও ভাক্ত অনন্ত। সান্ত বস্তু অন্য বস্তুদ্বারা—তাহার ব্যতিরেকদ্বারা—সীমাবদ্ধ। সেই ব্যতিরেক একটা বস্তু, তাহারও গুণ আছে। সেই গুণদ্বারা তাহা সীমাবদ্ধ। সুতরাং প্রথম (ভাবাত্মক) বস্তু দ্বিতীয় (অভাবাত্মক) বস্তুর ব্যতিরেক। যাহা ভাবাত্মক, এইভাবে তাহা অভাবাত্মক হয়, যাহা অভাবাত্মক, তাহা ভাবাত্মক হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন প্রত্যয়গত, বস্তুগত নহে। প্রত্যয় কিরূপে প্রত্যয়ান্তরে পরিণত হয়, ইহা তাহারই উদাহরণ। পরিবর্তন সসীমত্বের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এই জন্য সকল পদার্থের ধ্বংস হয়।

ভাক্ত অনন্ত ও সত্য অনন্ত

সসীমের অন্তহীন পারম্পর্য্য হইতে যে অনন্তের ধারণা হয়, তাহা প্রকৃত অনন্ত নহে, তাহা ভাক্ত অনন্ত, অভাবাত্মক অনন্ত। ১+২+৩+৪........এই শ্রেঢ়ী অন্তহীন হইলেও, প্রকৃত অসীম নহে। পরিবর্তনের পরে পরিবর্তন অনন্তকাল ধরিয়া চলিলেও, তাহা প্রকৃত অনন্ত নহে। এই শ্রেঢ়ীর প্রত্যেক পদটি সসীম। সসীমের সমষ্টি হইতে অনন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যাহা আপনাদ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন, অন্য-কর্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন নহে, তাহাই প্রকৃত অনন্ত। বুদ্ধিতে সসীম ও অসীম পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু অসীমের পার্শ্বে যদি সসীমের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহা হয় সসীম-কর্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন; সুতরাং সে অসীম হইতে পারে না। বুদ্ধির এই ভ্রান্তির সংশোধন হয় প্রজ্ঞা-কর্তৃক। সসীম অসীমের বহিঃস্থ বস্তু নহে। সসীম অসীমেরই অন্তর্গত। সসীম ও অসীম অভিন্ন। ঈশ্বর অনন্ত। তাঁহার পার্শ্বে সান্ত জগতের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভবপর? ইহার উত্তর প্লোটিনাস বলিয়াছিলেন, তাঁহার অসীম "একে"র সহিত সসীম জগতের সংস্পর্শ নাই। স্পিনোজা এই সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার প্রকৃত উত্তর সসীম ও অসীম অভিন্ন। চিন্তাই প্রকৃত অসীম। পর প্রত্যয়ই[3] অসীম। ইহা হইতে যে সসীম নির্গত হয়, তাহা ইহা হইতে অভিন্ন।

নিজের নিকটব্যক্ত সত্তা[4]

যাহা অন্যকর্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন, তাহা সসীম। কিন্তু যাহা স্বাবচ্ছিন্ন, অন্য-কর্তৃক অবচ্ছিন্ন নহে, তাহা অসীম। অসীমই নিজের নিকট ব্যক্ত

---

[1] Being in itself [2] Being for others
[3] The Idea [4] Being for itself

সত্তা। অহং এই সত্তার উত্তম দৃষ্টান্ত। একখণ্ড প্রস্তর এই সত্তা নহে। তাহার অস্তিত্ব আমার নিকট; কেবল চিন্তাতেই তাহার অস্তিত্ব। কিন্তু অহং তাহার নিজের অস্তিত্ব জানে—"আমি" আমার নিজের জ্ঞানের বিষয়। অহং নিজের নিকট ব্যক্ত সত্তা ও অনন্ত। সাধারণ জ্ঞানে অহং অনহং-দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন। কিন্তু দার্শনিকের জ্ঞানে অহং ও অনহং অভিন্ন। প্রকৃতি ও প্রত্যয় অভিন্ন।

নিজের নিকট ব্যক্ত সত্তার অন্তর্গত তিনটি ক্যাটেগরি: (১) এক, (২) বহু ও (৩) বিকর্ষণ ও আকর্ষণ। এই সত্তা স্বাবচ্ছিন্ন ও স্বয়ং প্রতিষ্ঠ। এই জন্য তাহা "এক" বা "একক"। ইহার সহিত "অন্যে"র সম্পর্ক নাই; যাহা কিছু সম্বন্ধ ইহার আছে, তাহা নিজের সঙ্গে। 'এক' হইতে 'বহু'র উদ্ভব। 'এক' কেবল নিজের সহিত সম্বদ্ধ, ইহার অর্থ "অন্য" ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইহার সহিত একীভূত হইয়াছে। যাহা "একের" মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার সহিত সম্বন্ধই নিজের সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু এই সম্বন্ধ সম্বন্ধী ও সম্বন্ধের মধ্যে সম্বন্ধ। যদিও উভয়ে মিলিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি চিন্তায় তাহাদিগকে পৃথক করা যায়। 'এক' আপনাকে 'আপন' হইতে পৃথক মনে করিয়া উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করে। এই পৃথকীকরণকে হেগেল "বিকর্ষণ" বলিয়াছেন। এই রূপে "বহু"র ক্যাটেগরি উদ্ভূত হয়। "বহু"র মধ্যে বহু "একে"র সমাবেশ। সেই সকল "এক" পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। তাহারা প্রত্যেকে অন্য সকলকে দূরে রাখে; ইহাই বিকর্ষণ। আবার প্রত্যেকেই এক একটি 'এক' বলিয়া তাহারা পরস্পরের সদৃশ। ইহাই তাহাদের আকর্ষণ।

পরিমাণ

পরিমাণ ক্যাটেগরির অন্তর্গত তিনটি ক্যাটেগরি: বিশুদ্ধ পরিমাণ,[১], নির্দিষ্ট পরিমাণ[২] এবং পরিমাণের গভীরতা[৩]। অনির্দিষ্ট পরিমাণই বিশুদ্ধ পরিমাণ। বিশুদ্ধ পরিমাণের মধ্যে আছে তিনটি ক্যাটেগরি: (১)। বিশুদ্ধ পরিমাণ, (২)। সন্তত এবং বিচ্ছিন্ন আকারের পরিমাণ[৪] এবং (৩) পরিমাণের ব্যবচ্ছেদ[৫]।

পরিমাণের সঙ্গে সম্বন্ধ বস্তুর আকারের, গুণের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। বস্তুর আকারের মধ্যে বহু পৃথক এককের অস্তিত্ববশতঃ ইহা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এই সকল একক সজাতীয় বলিয়া বস্তুর আকার সন্ততও বটে। সাতত্য ও বিচ্ছিন্নতা বস্তুতঃ অভিন্ন। বিচ্ছিন্নতার প্রত্যয় ব্যতীত সাতত্যের চিন্তা হয় না। সাতত্যের প্রত্যয় ব্যতীত বিচ্ছিন্নতার চিন্তা হয় না। পরিমাণের বাস্তবতা[৬] অথবা সীমাবদ্ধ পরিমাণই নির্দিষ্ট পরিমাণ। ইহার মধ্যে একত্ব ও বহুত্ব উভয়ই বর্তমান। ইহা বহু এককের সমষ্টি;

[1] Pure quantity [2] Quantum [3] Degree
[4] Continuous and Discrete [5] Limitation [6] Actuality

ইহাই সংখ্যা। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের, (বিস্তীর্ণ আকারের) বিপরীত গভীরতামূলক পরিমাণ। ইহার মধ্যে পরিমাণ ও গুণের মিলন সাধিত হয়; এই মিলনের নাম "পরিমাণগত অনুপাত"।[১]

সীমাবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পরিমাণের বাহ্য ব্যাপ্তি। পরিমাণের আন্তর ব্যাপ্তি অথবা গভীরতাই গভীরতামূলক পরিমাণ। পঞ্চাশ ফুট পরিমাণের বাহ্য ব্যাপ্তি (Quantum), কিন্তু তাপের ৫০ ডিগ্রী তাহার আন্তর ব্যাপ্তি বা Degree,

সমানুপাত

পরিমাণের উপর গুণের নির্ভরকে সমানুপাত[২] বলে। ২ : ১ এই অনুপাতে মিশ্রিত জলজান ও অম্লজানই জল। এই অনুপাতের পরিবর্ত্তন করিয়া ১ : ১ করিলে হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের উৎপত্তি হয়। গুণ এখানে পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

হেগেল বলেন, দেশের শাসনতন্ত্রের গুণ নির্ভর করে দেশের আয়তন এবং লোক-সংখ্যার উপর। ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশে প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রের শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর নহে। স্বরের গুণ নির্ভর করে স্পন্দনের উপর। গুণ পরিমাণের উপর নির্ভর করে বলিয়া হেগেল সমানুপাতকে "গুণ-যুক্ত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ"[৩] বলিয়াছেন।

অন্যান্য ক্যাটেগরির ন্যায় সমানুপাতও অসঙ্গের বাচক। ইহুদীদিগের স্তোত্রের অনেকগুলিতে বলা হইয়াছে, যে ঈশ্বর জল, স্থল, বিভিন্ন জন্তু ও উদ্ভিদ, সকলেরই সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। গ্রীক ধর্ম্মের Nemesisও এই ভাবের দ্যোতক। প্রত্যেক বস্তুরই—সম্পদ, সম্মান, শক্তি, আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি প্রত্যেকেরই—সীমা আছে। তাহা উল্লঙ্ঘিত হইলে ধ্বংস অনিবার্য্য।

পরিমাণের সহিত গুণের সংযোগই সমানুপাত। গুণ-বর্জ্জিত পরিমাণের গতিকে হেগেল "সমানুপাতহীন"[৪] বলিয়াছেন। কিন্তু পরিমাণের এই গুণ-বর্জ্জিত রূপ স্থায়ী নহে। ইহা আবার পরিমাণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সমানুপাতে পরিণত হয়। জলের তাপ ১৮০ ডিগ্রী অতিক্রম করিলে তরলতা অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তখন নূতন সমানুপাতের আবির্ভাব হয়, এবং বায়বীয়ত্বের উদ্ভব হয়। এই নূতন সমানুপাতও স্থায়ী হয় না। ফলে একটির পরে একটি সমানুপাতহীন ও সমানুপাতের আবির্ভাব হয়—একটি অন্তহীন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কিন্তু এই সমানুপাত ও সমানুপাতহীনতার ক্রমিক আবির্ভাব সমানুপাতের আপনার মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তনমাত্র। কেননা যাহা সমানুপাতহীন, তাহা সমানুপাতই। সমানুপাতের এই অন্তহীন শ্রেণীই "সমানুপাতের অসীম"[৫]।

[1] Quantitative Ratio [2] Measure [3] Qualitative Quantum
[4] Measureless [5] Infinite of Measure

(II)

সারবাদ

সত্তার শেষ ক্যাটেগরি "সমানুপাতের অসীমে" গুণ ও পরিমাণ মিলিয়া এক হইয়া যায়। সমানুপাতে প্রথমে গুণ ও পরিমাণের সংযোগ ঘনিষ্ঠ নহে। তাহাদের একত্ব আপেক্ষিক। "সমানুপাতহীনে" গুণ ও পরিমাণ পৃথক হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারা পৃথক হইয়া থাকিতে পারে না। সেই জন্য সমানুপাত আবার সমানুপাতে ফিরিয়া আসে, তখন গুণ আবার পরিমাণের সহিত সংযুক্ত হইয়া উভয়ে একত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন গুণ হয় পরিমাণ, এবং পরিমাণ হয় গুণ। এই পারস্পরিক পরিবর্ত্তনের অর্থ এই, যে গুণ ও পরিমাণ যেমন এক, তেমনি পৃথকও বটে, কেননা পার্থক্য যদি না থাকে, তাহা হইলে একটির অন্যটিতে পরিবর্ত্তনের কোনও অর্থই হয় না। ইহা হইতে প্রতীত হয়, যে বস্তুর সত্তার দুই স্তর, বাহ্য ও আন্তর। আন্তর স্তর অপরিবর্ত্তনীয় একত্ব; তাহার সম্বন্ধ নিজের সহিত, তাহার মধ্যে ভেদ নাই; সেখানে গুণ ও পরিমাণ অভিন্ন। কিন্তু বাহ্য স্তরের মধ্যে ভেদ আছে। সেখানে গুণ ও পরিমাণ পরিবর্ত্তনশীল। তাহারা অনবরত একটি অন্যটিতে পরিণত হইতেছে। বস্তুর আন্তর রূপ তাহার সার, বাহ্য রূপ সারেব আবরণ। সুতরাং জগতের বাহ্য রূপ তাহার প্রকৃত স্বরূপ নহে। উপরিভাগের পরিবর্ত্তন-রাজির নিম্নে আমরা তাহার অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপের (সারের) অনুসন্ধান করি। সারের যাবতীয় ক্যাটেগরিদ্বারা জগতের এই দ্বৈত ব্যক্ত হয়—একটি তাহার প্রতীয়মান রূপ, অন্যটি তাহার অব্যক্ত স্বরূপ। সত্তার জ্ঞান অব্যবহিত। তাহার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। সারের জ্ঞান ব্যবহিত, তাহার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। সত্তার ক্যাটেগরিগণ অব্যবহিত—ইহার অর্থ, ইহাদের কোনটিই অন্যের অপেক্ষা করে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ধারণা ভুল। প্রকৃতপক্ষে সত্তার ক্যাটেগরিগণও পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। যে শৃঙ্খলে তাহারা বদ্ধ, তাহার অনুসরণ করিয়া একটি হইতে অন্য আর একটিতে পৌছান যায়। কিন্তু এই সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর নহে—লুক্কায়িত। সারের ক্যাটেগরিগণ স্পষ্টতঃই পারস্পরিক সম্বন্ধে বদ্ধ। তাহারা যুগলাত্মক, প্রত্যেক যুগলের একটি অন্যটি হইতে অবিচ্ছেদ্য। তাহারা আপেক্ষিক। সত্তার ক্যাটেগরিগণের প্রভাবাধীন মনের নিকট বাহ্য জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু সারের ক্যাটেগরিতে পৌছিয়া মনঃ জগতের তলদেশে নিত্যের অনুসন্ধান করে। অন্তঃস্থ এই সার দৃষ্টিগোচর হয় না। গুণ ও পরিমাণ প্রত্যক্ষের বিষয়। বস্তুর বর্ণ চোখে পড়ে। কিন্তু কোনও বস্তু যে অন্য বস্তুর কারণ, তাহা বুঝিতে তুলনা ও চিন্তার প্রয়োজন হয়। এই জন্যই সারের ক্যাটেগরিগণ বুদ্ধিগ্রাহ্য। সারের ক্যাটেগরিগণ বিজ্ঞানের বিষয়। তাহাদের সাহায্যে বিজ্ঞান বাহ্য জগৎ বুঝিতে চেষ্টা করে। সেই জন্য জ্ঞানের আপেক্ষিকতাই বিজ্ঞানের তত্ত্ব। বিজ্ঞান অসঙ্গকে অজ্ঞেয় বলিয়া গণ্য করে। সারকে অতিক্রম করিতে না পারিলে অসঙ্গের জ্ঞান হয় না। সত্তা আপনার মধ্য হইতে বাহির হইয়া ভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়। সত্তা প্রতীয়মান, ও নির্দিষ্ট

স্থানে অবস্থিত। সারকে সেখানে পাওয়া যায় না, তাহা দৃষ্টির অতীত। যাহা সেখানে পাওয়া যায়, সার তাহার ব্যতিরেক। সত্তা ও সারের সমন্বয় সম্প্রত্যয়ের (Notion) মধ্যে।

সত্তার ক্যাটেগরিদিগের মতো সারের ক্যাটেগরিগণও অসঙ্গের বাচক। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে অবস্থিত—বৈচিত্র্য ও বহুত্বের তলদেশে অবস্থিত—একত্বই অসঙ্গ। হেগেল বলেন-হিন্দুগণ 'সার'কেই অসঙ্গ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, তাহার কারণ তাঁহারা পর-প্রত্যয়ে পৌঁছিতে সক্ষম হন নাই।*

অসঙ্গ জগতের প্রথম কারণ, প্রতিভাসের তলস্থ শক্তি, স্পিনোজার Substance, প্রাচ্য দর্শনের একমেবাদ্বিতীয়ম। এই সকল বর্ণনাই সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। সম্প্রত্যয়ের ক্যাটেগরিগণদ্বারাই কেবল অসঙ্গের সংপূর্ণ বর্ণনা হয়।

অন্তঃস্থ সার ও তাহার বাহ্য প্রকাশ বা প্রাতিভাসিক জগৎ—সার ও অ-সার—সত্তার এই দুই রূপ। কিন্তু এই বিভাগ প্রকৃত পক্ষে সত্য নহে। কেননা অসার যেমন সারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সারও তেমনি অ-সারের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং সারের জন্য অসারের প্রয়োজন। অসারের অস্তিত্ব যদি না থাকিত, তাহা হইলে সারের সারত্বই থাকিত না। অসারের বিনাশ হইলে সারেরও বিনাশ হয়। সার ও অসারের এই পারস্পরিক-নির্ভরকে হেগেল প্রতিফলন[1] বলিয়াছেন। আলোক দর্পণে পতিত হইয়া প্রতিফলিত হয়। তাহার প্রতিফলনের জন্য দর্পণ অথবা অন্য বস্তুর প্রয়োজন। সারের ধারণার জন্য তেমনি প্রতিভাসের ধারণার প্রয়োজন, এবং প্রতিভাসের ধারণার জন্য সারের ধারণার প্রয়োজন। এই সাদৃশ্যের জন্যই হেগেল সারকে প্রতিফলিত সত্তা বলিয়াছেন।

সার-মণ্ডলের অন্তর্গত তিনটি প্রধান ক্যাটেগরির নাম: (ক) "অস্তিত্বের ভিত্তিরূপ সার,"[2] (খ) প্রতিভাস এবং (গ) বাস্তবতা।

(ক) অস্তিত্বের ভিত্তি সার

অস্তিত্বের ভিত্তি সারের অন্তর্গত তিন ক্যাটেগরি: (১) বিশুদ্ধ তত্ত্বাবলী বা বুদ্ধির ক্যাটেগরিগণ[3] (২) অস্তিত্ব ও (৩) বস্তু। বুদ্ধির বিশুদ্ধ ক্যাটেগরি তিনটি: (১) ভেদ (২) অভেদ

* হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে হেগেলের যে ভাল জ্ঞান ছিলনা, ইহাদ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে সমগ্র জগৎ নানাবিধ সামান্যের সমষ্টি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল সামান্য এক মহাসামান্যের অন্তর্গত এবং সেই মহাসামান্য বিজ্ঞানরূপী ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হেগেলের অসঙ্গ (তাহার বর্ণনা যে রূপই হউক না কেন) এই বিজ্ঞানরূপী ব্রহ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও উচ্চতর পদার্থ নহে। ব্রহ্মকে উপনিষদে সৎ ও অসতের অতীতও বলা হইয়াছে। ("সদসৎ তৎপরং যৎ"—গীতা)। হেগেলের দর্শনে সৎ ও অসতের অতীত নির্বিকল্প কোনও কিছুর উল্লেখ নাই। হিন্দু দর্শন সারের উপর উঠিতে পারে নাই, এই কথা সত্য নহে।

[1] Reflection [2] Essence as Ground of Existence

[3] The pure Principles or Categories of Reflection

ও (৩) ভিত্তি। ইহাদিগকে বুদ্ধির ক্যাটেগরি বলা হইয়াছে এই জন্য, যে ইহারা বুদ্ধির প্রধান তত্ত্ব। সার ও অসার এক হিসাবে ভিন্ন হইলেও, তাহারা একই বস্তুর দুই পিঠ। যাহা অসার, তাহাই সার হইয়া দাঁড়ায়, ইহাই অভেদ। হেগেলের মতে অভেদের নিয়মও তাদাত্ম্যের নিয়ম একই নিয়ম, ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত। "ক হয় ক" এই নিয়মের ভাব-বাচক রূপ। "ক অ-ক "নহে,", ইহা অভাববাচক রূপ। অভেদ হইতে ভেদের উৎপত্তি হয়। আপনার সহিত সম্বন্ধই অভেদ। কিন্তু সম্বন্ধের জন্য দুইটী বস্তুর প্রয়োজন। যখন বলি "ক হয় ক", তখন দ্বিতীয় "ক"কে প্রথম "ক" হইতে ভিন্ন মনে করিয়া পরে তাহাদের অভেদ কল্পিত হয়। সুতরাং ভেদ অভেদের অন্তর্গত।

ভেদের মধ্যে তিন ক্যাটেগরি: (১) বৈচিত্র্য (২) সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এবং (৩) বৈপরীত্য (ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক)। বিভিন্ন বস্তু যখন পরস্পর হইতে ভিন্ন হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকে না, তখন বৈচিত্র্য[1] প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি পেনসিল ও একটি ছাগের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও বিরোধ নাই। কিন্তু আলোক ও অন্ধকার যেমন ভিন্ন, তেমনি পরস্পরের বিরোধীও বটে,—তাহারা ভাব ও অভাববাচক। বৈচিত্র্যের পার্থক্য বাহ্য, কিন্তু বৈপরীত্যের পার্থক্য আন্তর। দুই বস্তুর তুলনামূলক সম্বন্ধ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য। ইহাও বাহ্য।

অভেদ ও ভেদের সমন্বয়ই "ভিত্তি"[2]। অভাবের সহিত সম্বন্ধে ভাবকে ভাব বলা হয়, এবং ভাবের সহিত সম্বন্ধে অভাবকে অভাব বলা হয়। কিন্তু অভাবকে (যেমন অন্ধকার) ভাব বলিয়া গণ্য করিলে, "ভাব" (আলোক=অন্ধকারের অভাব) হইয়া দাঁড়ায় অভাব। অসত্যকে ভাব বলিলে সত্য হয় অভাব, আর সত্য ভাব হইলে অসত্য হয় অভাব। সুতরাং ভাব ও অভাব অভিন্ন। একটি অন্যের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতাই ভিত্তি।

"অস্তিত্বের ভিত্তি সারের" দ্বিতীয় ক্যাটেগরি "অস্তিত্ব"। যাহা অন্যের উপর নির্ভর করে, অন্য পদার্থ যাহার ভিত্তি, তাহাই অস্তিত্ব। এই নির্ভর অন্যোন্যসাপেক্ষ। ভাব যেমন অভাবের উপর নির্ভর করে, তেমনি ভিত্তি ও ভিত্তিবান্[3] পরস্পরের উপর নির্ভর করে। তাহারা অভিন্ন। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রত্যেক বস্তুই প্রকৃতপক্ষে তাহার নিজের উপরেই নির্ভর করে। লোকের আচরণ তাহার চরিত্রের উপর নির্ভর করে; তাহার চরিত্রও আচরণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং চরিত্র ও আচরণ অভিন্ন। সুতরাং ভিত্তি এবং ভিত্তিবান অভিন্ন। ভিত্তিবান অব্যবহিত ভাবে প্রতীত হয়। অব্যবহিত ভিত্তিবানই অস্তিত্ব; কিন্তু ভিত্তি ভিত্তিবানের সহিত অভিন্ন। সুতরাং ভিত্তিও আর একটি অস্তিত্ব। জগতের প্রত্যেক বস্তু জগতের অংশ, জগতের অন্যান্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ, এবং যে বহুবিধ সম্বন্ধের জাল এই বিশ্ব, তাহার অন্তর্গত। ইহা বুঝাইতেই হেগেল "অস্তিত্ব" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। সত্তা ও অস্তিত্ব এক নহে। ভিত্তিবান সত্তাই অস্তিত্ব। প্রত্যেক অস্তিত্ববান

---

[1] Variety [2] Ground [3] Grounded

বস্তুর ভিত্তি আছে, এই ভিত্তিরও ভিত্তি আছে; তাহারও ভিত্তি আছে। প্রত্যেক অস্তিত্ববান বস্তু অবচ্ছিন্ন। কিন্তু সত্তার কোনও অবচ্ছেদই নাই।

"অস্তিত্বব ভিত্তিরূপ সারের" তৃতীয় ক্যাটেগরির নাম বস্তু[1]। বস্তুর অন্তর্গত তিন ক্যাটেগরি: (১) বস্তু ও তাহার ধর্ম্ম[2] (২) বস্তু ও উপাদান-রাজি[3] এবং (৩) উপাদান ও রূপ[4]। নিজের সহিত নিজের সম্বন্ধকে হেগেল "আপনার মধ্যে প্রতিফলন" এবং অন্যের সহিত সম্বন্ধকে "অন্যের মধ্যে প্রতিফলন" বলিয়াছেন! আপনার মধ্যে প্রতিফলন এবং অন্যের মধ্যে প্রতিফলনের একত্বকে অস্তিত্ব বলিয়াছেন। প্রত্যেক সত্ত্বাবান বস্তুর মধ্যে এই দ্বিবিধ প্রতিফলন বর্ত্তমান। আপনার মধ্যে প্রতিফলনের অর্থ এই, যে প্রত্যেক অস্তিত্ববান বস্তু অন্য-নিরপেক্ষ রূপে প্রতীত হয়। অন্যের মধ্যে প্রতিফলনের অর্থ—অস্তিত্ববান বস্তু অন্যের উপর নির্ভরশীল রূপে গণ্য হয়। যখন কোনও সত্তাবান পদার্থকে এই দ্বিবিধরূপে গণ্য করা হয়, তখন তাহা বস্তু। বস্তুর অন্যের মধ্যে প্রতিফলনই তাহার ধর্ম্ম[5]। সম্বন্ধ-বিচ্যুতরূপে চিন্তা করিলে বস্তু স্বরূপে যাহা, তাহাতে পরিণত হয়। ইহাই হেগেলের আপনার মধ্যে প্রতিফলন। বস্তুর দ্বিতীয় রূপ—অন্যের মধ্যে প্রতিফলন—হইতে তাহার ধর্ম্মের উৎপত্তি। বস্তুর ধর্ম্ম ও তাহার গুণ এক নহে। কোনও বস্তুর গুণ তাহার সত্তা হইতে অভিন্ন। তাহা তাহার সত্তার অবচ্ছেদ। সেই অবচ্ছেদ না থাকিলে তাহা শূন্যগর্ভ সত্তায় পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু বস্তুর ধর্ম্ম তাহার সত্তার সহিত অভিন্ন নহে; ধর্ম্ম অন্যান্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইতে প্রাপ্ত। জলের সংস্পর্শে লৌহে মরিচা পড়ে। মরিচা-উৎপাদন জলের ধর্ম্ম। আবার ভঙ্গুরত্ব (মরিচা পড়া) প্রাপ্ত হওয়া লৌহের ধর্ম্ম। কিন্তু এইভাবে গুণ ও ধর্ম্মের বিভেদ সকল সময় নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না। রক্তিমা রক্তবর্ণ আলোকের গুণ। কিন্তু বস্তুর উপর আলোকের ক্রিয়াদ্বারা উৎপন্ন বলিয়া ইহাকে ধর্ম্মও বলা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী ক্যাটেগরি পরবর্ত্তী ক্যাটেগরীর অন্তর্ভূত বলিয়া ইহা সম্ভবপর হয়।

বস্তু ও উপাদান

নিজের মধ্যে প্রতিফলন "বস্তু", অন্যের মধ্যে প্রতিফলন "ধর্ম্ম"। কিন্তু নিজের মধ্যে প্রতিফলন হইতে অন্যের মধ্যে প্রতিফলন পৃথক করা যায় না। উহাদের একটির মধ্যে অন্যটি নিহিত। নিজের মধ্যে প্রতিফলনই "আপনার অভিন্নতা"—আপনার সহিত আপনার অভেদ-সম্বন্ধ। কিন্তু এই সম্বন্ধ বুঝিতে বস্তুর দুই রূপের কল্পনা করিতে হয়—"এই বস্তু ও ঐ বস্তু"। এই বস্তু=ঐ বস্তু। "ঐবস্তুর" মধ্যে প্রতিফলন (যাহা বস্তুর ধর্ম্ম) তখন বস্তুর মধ্যগত হইয়া যায়, আপনার মধ্যে প্রতিফলন হইয়া যায়,

[1] The thing [2] The thing and its Properties
[3] Thing and Matters [4] Matter and Form [5] Property

এবং আপনার মধ্যে প্রতিফলন অন্যের মধ্যে প্রতিফলন হইয়া পড়ে। বস্তু ও তাহার ধর্ম্ম স্থানবিনিময় করে। বস্তুর ধর্ম্মই তখন আপনার সহিত অভিন্ন এবং স্বাধীন বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার পূর্ব্বে বস্তুই ছিল স্বতন্ত্র ও সারভাগ। এখন তাহার ধর্ম্মই হইয়া দাঁড়ায় "সার"। পূর্ব্বে বস্তু হইতে স্বতন্ত্রভাবে তাহার ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল না, এখন ধর্ম্মই স্বতন্ত্র বস্তুতে পরিণত। তাহারা বস্তুর মধ্যগত না হইয়া এখন স্বতন্ত্র সত্তা এবং তাহাদের দ্বারাই বস্তু গঠিত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই রূপে ধর্ম্ম উপাদানে পরিণত হয়।

উপাদান ও রূপ

বস্তুর তৃতীয় ক্যাটেগরি উপাদান ও রূপ। প্লেটো ও আরিষ্টটল যে অর্থে matter শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন, হেগেলও এখানে সেই অর্থেই ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুর সীমাহীন অনির্দ্দিষ্ট রূপ ও বৈশিষ্ট্যহীন উপাদান, যাহার উপর রূপের প্রয়োগ হইতে বিশিষ্ট বস্তুর উদ্ভব হয়, তাহাই matter। বস্তু ও উপাদান এর কাটেগরিতে যে উপাদান উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা বহু ও পরস্পর হইতে ভিন্ন। কেননা বস্তুর বিভিন্ন ধর্ম্ম হইতেই তাহারা উদ্ভূত। এই বিভেদ সত্য নহে। অন্যের মধ্যে প্রতিফলনই "ধর্ম্ম"। ইহা যখন আপনার মধ্যে প্রতিফলনে রূপান্তরিত হয়, তখন "ধর্ম্ম" উপাদানে পরিণত হয়। প্রত্যেক উপাদানই আপনার মধ্যে প্রতিফলন, ইহাই আত্ম সম্বন্ধ—যাহার মধ্যে ভেদ ও অভেদ এক হইয়া যায়। বহু উপাদানের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও ভেদ নাই! উপাদান একমাত্র, তাহার মধ্যে ব্যাবর্ত্তক কিছুই নাই; তাহার অবচ্ছেদ নাই, কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। কিন্তু এই উপাদানদ্বারা গঠিত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। যত অবচ্ছেদ ও বৈশিষ্ট্য এই বস্তুর মধ্যে বর্ত্তমান। তাহারা উপাদানের বহির্ভূত! সুতরাং বস্তুই উপাদানের রূপ, কেননা রূপ হইতেই বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়। এইরূপে উপাদান ও রূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(খ) প্রতিভাস[1]

সারের দ্বিতীয় ক্যাটেগরির নাম প্রতিভাস। প্রথম ক্যাটেগরি "অস্তিত্বের ভিত্তি সার" হইতে ইহার উদ্ভব। "অস্তিত্বের ভিত্তিরূপ সার" হইতে "বস্তু" ক্যাটেগরি উদ্ভূত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে—উপাদান ও রূপ। কিন্তু রূপের মধ্যে সমস্ত উপাদান এবং উপাদানের মধ্যে সমস্ত রূপ বিদ্যমান। উপাদান শূন্যগর্ভ, ইহা বস্তুর আপনাতে প্রতিফলন। অন্য দিকে রূপ বস্তুর "অন্যের মধ্যে প্রতিফলন।" আবার আপনার মধ্যে প্রতিফলন ও অন্যের মধ্যে প্রতিফলন অভিন্ন। সুতরাং রূপ (অন্যের মধ্যে প্রতিফলন) এবং উপাদান (আপনার মধ্যে প্রতিফলন) অভিন্ন। সুতরাং রূপও যেমন সমস্ত বস্তুটি, উপাদানও তেমনি সমস্ত বস্তুটি।

[1] Appearance

কিন্তু ইহা স্ববিরোধী। সুতরাং ইহা প্রতিভাস মাত্র। কিন্তু আপনার মধ্যে প্রতিফলন এবং অন্যের মধ্যে প্রতিফলনের অ ভদ হইতে সারের সহিত প্রতিভাসের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। প্রতিভাস সারেরই প্রতিভাস। সারই প্রতিভাসিত হয়। সুতরাং সার ও প্রতিভাস অভিন্ন। ভারতীয় দর্শনে জগৎকে মায়া বলা হইয়াছে। জগতের অস্তিত্ব নাই, বলা হইয়াছে। হেগেল জগৎকে মায়া' বলেন নাই। জগৎ প্রতিভাস সত্য, কিন্তু এই প্রতিভাস সার অপেক্ষা কম সত্য নহে। প্রতিভাসিত হওয়াই সারের ধর্ম্ম—তাহার স্বভাব। ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্ম কেন প্রতিভাসিত হন, তাহার কোনও যুক্তি নাই।

প্রতিভাস ক্যাটেগরির অন্তর্গত প্রথম ক্যাটেগরি প্রাতিভাসিক জগৎ। প্রত্যেক প্রতিভাস অন্য প্রতিভাসের সহিত সম্বন্ধ। সম্বন্ধযুক্ত প্রতিভাস-পরম্পরাই জগৎ। দ্বিতীয় ক্যাটেগরি "আধেয় ও রূপ"। প্রত্যেক প্রতিভাসের মধ্যে রূপ এবং উপাদান আছে। কিন্তু উপাদান রূপের একটা অংশ, এবং রূপ উপাদানের একটি অংশ। উপাদান এবং রূপের মধ্যে পার্থক্য সত্বেও প্রকৃত পক্ষে উভয়কেই এক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কোনও কবিতার উপাদান হইতেছে তাহার ভাব, তাহার রূপ, তাহার ছন্দ এবং শব্দাবলী। কিন্তু কবিতার ভাব তাহার রূপ তাহার ছন্দও শব্দ হইতেই উদ্ভূত। আবার তাহার ছন্দ ও শব্দও ভাব হইতে উদ্ভূত। ইহাই আধেয় ও রূপের ক্যাটেগরি। তৃতীয় ক্যাটেগরির নাম "সম্বন্ধ ও পরস্পরিক সম্বন্ধ"। ইহার মধ্যে তিনটি ক্যাটেগরি বর্ত্তমান। (১) সমগ্র ও অংশ, (২) শক্তি ও তাহার প্রকাশ, এবং (৩) আন্তর ও বাহ্য। ইহাদের প্রত্যেকের দুইটি দিক থাকিলেও তাহারা সম্পূর্ণ সমান ও অভিন্ন। সমগ্র যে তাহার অংশসকলের সমষ্টির সমান তাহা স্পষ্ট। কিন্তু সমগ্র ও তাহার অংশ সকলের মধ্যে সম্বন্ধ যান্ত্রিক সম্বন্ধ, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নহে।

সারের "আপনার মধ্যে প্রতিফলন" (অভেদ) যখন তৎক্ষণাৎ বিকৃষ্ট হইয়া "অন্যের মধ্যে প্রতিফলনে" (ভেদ) পরিণত হয়, তখন "শক্তি ও তাহার প্রকাশ" ক্যাটেগরির উদ্ভব হয়। একত্ব এখানে বহু রূপে প্রকাশিত হয়, এবং এই বহু প্রকাশ আবার একত্বে প্রত্যাবর্ত্তন করে। অন্যের মধ্যে প্রতিফলন বস্তুর বাহ্য দিক, নিজের মধ্যে প্রতিফলন আন্তর দিক (সার)। "অন্যের মধ্যে প্রতিফলন" এবং "নিজের মধ্যে প্রতিফলন" অভিন্ন বলিয়া উদ্ভূত বহুত্ব আবার একত্বে পরিণত হয়। এবংবিধ একত্ব ও বহুত্বের সমন্বয়ই "শক্তি ও তাহার প্রকাশ"।

তৃতীয় ক্যাটেগরির নাম "আন্তর ও বাহ্য" শক্তি ও তাহার প্রকাশ অভিন্ন। বিদ্যুৎ-বিকাশ ও বি দ্যুৎ অভিন্ন। শক্তিকে আন্তর সত্তা বা সার বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রকাশকে প্রতিভাস, বা বাহ্য সত্তা গণ্য করা হয়। কিন্তু শক্তি ও প্রকাশ উভয়ের বাচ্য (আধেয়) অভিন্ন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ব্যচনিক মাত্র। এই সম্বন্ধ দেশিক সম্বন্ধ নহে। ইহা সার ও তাহার প্রকাশের সম্বন্ধ। লোকের কর্ম্ম তাহার বাহ্য রূপ; তাহার চরিত্র আন্তর রূপ। এই প্রসঙ্গে হেগেল বলিয়াছেন, লোকে যাহা করে, সে তাহাই। বাইবেলে আছে "ফলদ্বারাই তোমরা তাহাদিগকে জানিবে"। কেহ যাহা বস্তুতঃ সম্পন্ন করিয়াছে, তাহাদ্বারা তাহার বিচার না করিয়া, সে যাহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহাদ্বারা তাহার বিচার করিবে, যদি

কেহ বলে, তবে তাহার সে দাবি অগ্রাহ্য করিতে হইবে। আবার কেহ যদি ভাল কাজ করিয়া থাকে, তাহা হইলে অন্তরে তাহার উদ্দেশ্য ভাল ছিল না, বলিলে তাহাও অগ্রাহ্য, কেননা কেহই তাহার আন্তর প্রকৃতি সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারে না।

(গ) বাস্তবতা[1]

সারবাদে জগতের দুই মূর্ত্তি—আন্তর ও বাহ্য। আন্তর মূর্ত্তি জগতের সার, বাহ্য মূর্ত্তি প্রতিভাস। সার মণ্ডলের প্রত্যেক ক্যাটেগরির দ্বিবিধ সত্তা—আন্তর ও বাহ্য। "অস্তিত্বের ভিত্তি সার" বিভাগে আন্তর সত্তা, এবং প্রতিভাস বিভাগে বাহ্য সত্তা আলোচিত হইয়াছে। বাস্তবতা "অস্তিত্বের ভিত্তি সার" এবং প্রতিভাসের সমন্বয়—আন্তর ও বাহ্যের, সার ও প্রতিভাসের, সমন্বয়। বাস্তবের মধ্যে আন্তর ও বাহ্যের ভেদ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও এই পার্থক্য একেবারে বিদূরিত হয় নাই। বাস্তবেরও বাহ্য ও আন্তর, এই দুই দিক আছে। কিন্তু এই ভেদ বাস্তবের একত্বের মধ্যেই বর্ত্তমান। ইহা বাস্তবের আপনার সহিত অভেদের মধ্যে বর্ত্তমান। সেখানে আন্তরই বাহ্য, বাহ্যই আন্তর। সার আপনাকে পূর্ণভাবে প্রকাশিত করে। তাহার কোনও অংশই অপ্রকাশিত থাকে না। এই প্রকাশই সার, সারের মতই সারবান[2] এবং সত্য। হেগেল বাস্তব ও সৎ[3] শব্দ দুইটি প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

জগৎ যে সৎ পদার্থ, ইহা এক দেশদর্শী জ্ঞান। জড়বাদিগণ ও সাধারণ লোকে ইহাই মনে করে। আবার বাহ্য জগৎ যে মায়া, ইহার যে সত্যতা নাই, ইহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম (হিন্দুদর্শন) অথবা বিশুদ্ধ সত্তাই (এলিয়াটিক দর্শন) যে কেবল সৎ, এই মতও একদেশদর্শী। বাহ্য জগৎ প্রাতিভাসিক, ইহা সত্য, কিন্তু মিথ্যা নহে। সার যেমন অসদের অঙ্গ, বাহ্যজগৎও তদ্রূপ। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে জগতের সার ব্রহ্ম, অথবা সত্তা কেন আপনাকে প্রকাশিত করে, তাহা বোধগম্য হইত, না। প্রকাশিত করে, ইহার কারণ প্রকাশিত করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই; প্রকাশিত না হইলে ব্রহ্ম অথবা সত্তাই অসৎ হইয়া পড়িত। সুতরাং প্রকাশশীল সারই সৎ পদার্থ। এই জগৎ মায়া নয়; যবনিকা নয়; আন্তর সত্তার আবরক নয়; ইহা আন্তর সারের প্রকাশক। সুতরাং বাহ্য জগৎকে জানিলেই অন্তর্জগৎকে জানা হয়; কেননা ইহার বাহ্য রূপ ইহার আন্তর রূপেরই প্রকাশক। বাহ্যরূপই আন্তর রূপ।

কিন্তু বাহ্য ও আন্তর রূপের যে সমন্বয় "বাস্তব", সেই বাস্তব কি? হেগেল বলেন—যাহা যুক্তি-সঙ্গত, তাহাই বাস্তব। প্রত্যেক অস্তিত্ববান পদার্থই বাস্তব নহে। অমঙ্গল যুক্তিহীন, সুতরাং তাহা বাস্তব নহে। তাহাদ্বারা জগতের অভ্যন্তরীণ প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয় না, তাহা প্রতিভাস মাত্র, তাহা মায়া। বাহ্য ও আন্তরের ঐক্যের মধ্যে অবশ্যম্ভাবিতার ধারণা অন্তর্নিহিত। এই অবশ্যম্ভাবিতা অথবা অবশ্যকতা নৈয়ায়িক অথবা যুক্তিমূলক, বাহ্য

[1] Actuality [2] Essential [3] Reality

পদার্থের উপর নির্ভরশীল নহে। বাহ্য জগতে যাহা যুক্তিমূলক, তাহাই জগতের আন্তর সত্তার প্রকাশ; যাহা যুক্তি-সঙ্গত তাহাই বাস্তব, যাহা বাস্তব, তাহাই যুক্তি-সঙ্গত।

'বাস্তবতা ক্যাটেগরির মধ্যে তিনটি ক্যাটেগরি আছে; (১) দ্রব্য ও বিকার[১] (২) কার্য্য ও কারণ (৩) ব্যতিহার[২]।

যাহার স্বাধীন সত্তা আছে, তাহাই দ্রব্য। যাহার স্বাধীন সত্তা নাই, যাহার সত্তা দ্রব্যের (Substance) উপর নির্ভর করে, তাহা অনিত্য—তাহা বিকার। দ্রব্য নিজের কারণ বলিয়া আপনার সহিত সম্বন্ধ। সম্বন্ধ দ্বৈতবাচক! আপনার সহিত যেখানে আপনার সম্বন্ধ, সেখানে আপনাকে আপনা হইতে ভিন্ন কল্পনা করা হয়। এই ভিন্নতা হইতে বহুত্বের উদ্ভব হয়। সেইজন্য দ্রব্য বাহিরে বহু রূপে ব্যক্ত হয়। কিন্তু এই বাহ্য রূপ ও দ্রব্য অভিন্ন। সুতরাং বাহ্য বস্তু আবার নিজের মধ্যে বিলীন হয়।

স্পিনোজা জগৎকে দ্রব্য এবং অসঙ্গ বলিয়াছেন। অসঙ্গ যে দ্রব্য তাহা সত্য, কিন্তু সমগ্র সত্য নহে। হেগেলের পর প্রত্যয়ের অভিব্যক্তির ইতিহাসে স্পিনোজার "দ্রব্য" একটি নিয়ত ক্রম। কিন্তু অসঙ্গ এই দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত আরও কিছু; অসঙ্গ আত্মা।

কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ বাস্তবতার দ্বিতীয় ক্যাটেগরি। বিকার দ্রব্যের ব্যতিরেক, যাহা নিত্য নহে, তাহাই। কিন্তু বিকার দ্রব্যে বিলীন হয়। তখন দ্রব্য ব্যতিরেকের ব্যতিরেকে[৩] পরিণত হয়। হেগেলের ব্যতিরেকের শক্তি পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্রব্যের ব্যতিরেক একটা শক্তি। সক্রিয় দ্রব্য শক্তির প্রয়োগ করিয়া বিকার উৎপাদন করে। যে বিকার উৎপন্ন হয়, তাহাও একটি দ্রব্য। ইহা হইতে একটি সক্রিয় দ্রব্য অন্য দ্রব্যের উপর নিজ শক্তির প্রয়োগ করে, এবং এই দ্বিতীয় দ্রব্য নিজে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া সেই শক্তি গ্রহণ করে, এই ধারণা উৎপন্ন হয়। ইহাই কার্য্য কারণের ধারণা।

সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় দ্রব্যের বিভেদ হইতে কারণের উদ্ভব হয়। কারণ সক্রিয়, কার্য্য নিষ্ক্রিয়। কিন্তু কার্য্যের নিষ্ক্রিয়তা সত্য নহে। যাহা নিষ্ক্রিয়, তাহাই সক্রিয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দ্রব্য ব্যতিরেক এবং তাহার শক্তি এই ব্যতিরেকেরই শক্তি। কিন্তু কার্য্যও একটা দ্রব্য, সুতরাং তাহাও শক্তি। যাহা কারণ, তাহাই কার্য্য, আবার যাহা কার্য্য, তাহাই কারণ। সুতরাং উভয়ের পার্থক্য থাকে না। ইহাই ব্যতিহার—ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া।

উত্তাপে মোম গলে। উত্তাপ সক্রিয়, মোম নিষ্ক্রিয়। এখানে কারণ হইতে কার্য্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু গলা যদি মোমের স্বভাব না হইত, তাহা হইলে গলন কার্য্য হইতে পারিত না। সুতরাং মোমের স্বভাবও কারণের একটা অংশ। ইহা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার একটা দৃষ্টান্ত। আর একটি দৃষ্টান্ত মনুষ্যের অনুভূতি ও বাহ্য প্রলোভনের সম্বন্ধের মধ্যে

[১] Substance and Accident
[২] Reciprocity
[৩] Negation of Negation

পাওয়া যায়। বাহ্ প্রলোভন সক্রিয়—তাহারা মানুষের প্রলুব্ধ হইবার কারণ। কিন্তু অন্তরস্থ অনুভূতিও এই প্রলোভনের ফলে সক্রিয় হইয়া উঠে। এখানে উভয়ত্রই সক্রিয়তা। অনুভূতির উদ্ভব প্রলোভনের কার্য্য। কিন্তু প্রলোভনের ক্রিয়ার ফলে অনুভূতিও সক্রিয়তা প্রাপ্ত হয়।

ব্যতিহার ক্যাটেগরি ঠিক সম্প্রত্যয় মণ্ডলের পূর্ব্ববর্ত্তী? ইহা হইতেই সম্প্রত্যয় ক্যাটেগরির উদ্ভব। মানুষের সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে ব্যতিহারের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ পাওয়া যায়। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার এক সঙ্গে বিদ্যমানতার জন্য ইতিহাসে কোনও অবস্থা অবস্থান্তরের কারণ অথবা ফল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। কোনও জাতির শাসনতন্ত্র এবং প্রচলিত আইন তাহার জাতীয় চরিত্রের কারণ অথবা ফল, তাহা বলা সহজ নহে। এখানে কারণ ক্যাটেগরি ব্যাখ্যার জন্য পর্য্যাপ্ত নহে। ব্যতিহার ক্যাটেগরিই এখানে প্রযোজ্য। জাতীয় চরিত্র ও শাসন-তন্ত্র এবং আইনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সমগ্র বিশ্বেই এই ক্যাটেগরি প্রযোজ্য। জগতের প্রত্যেক অংশদ্বারা অন্যান্য অংশ প্রভাবিত।

স্টার্লিং বলেন, দর্শনের ইতিহাসে হেগেলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দর্শন এই ব্যতিহার ক্যাটেগরিতে উপনীত হইয়াছিল। দর্শনের বিকাশের বিভিন্ন ক্রমে পরপ্রত্যয়ের বিকাশ সুস্পষ্ট। পারমেনিদিস্ ও হেরাক্লিটাসের দর্শনে সত্তা, অসত্তা ও ভবন, এই তিন ক্যাটেগরি অভিব্যক্ত। প্রাক্ হেগেলীয় নব্য দর্শনে বুদ্ধির ক্যাটেগরি অর্থাৎ সারের ক্যাটেগরি অভিব্যক্ত,—দ্রব্য, কারণ এবং ব্যতিহার ক্যাটেগরি ইহার তত্ত্ব। স্পিনোজার মূল তত্ত্ব দ্রব্য, হিউমের মূলতত্ত্ব কারণ, ক্যাণ্টের ব্যতিহার। এই জগৎকে ক্যাণ্ট স্বগত বস্তু এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আকার (দেশ ও কাল) এবং বুদ্ধির ক্যাটেগরিদিগের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেই ক্যাণ্ট চরম সত্য মনে করিয়াছেন। কিন্তু হেগেল ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সম্প্রত্যয়ের ক্যাটেগরিদিগের মধ্যে পরম সত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৩)

নোশান[1]

নোশান শব্দের অর্থ সামান্যের প্রত্যয় বা সম্প্রত্যয়। হেগেল এই শব্দটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সারের শেষ ক্যাটেগরি "ব্যতিহার" হইতে নোশানের উদ্ভব। নোশান ক্যাটেগরি জটিল। ইহার সম্যক ধারণা করিতে হইলে চিন্তার এক নূতন স্তরে প্রবেশ করিতে হইবে।

দ্রব্য ও তাহার বিকার এবং ব্যতিহার ক্যাটেগরিতে আমরা দেখিতে পাইয়াছি, যে

[1] Notion

আপনার সহিত সম্বদ্ধ "দ্রব্য" হইতে তাহার বিপরীত ক্যাটেগরির উদ্ভব হয় ; এই বিপরীত ক্যাটেগরি, "কার্য্য", আবার "দ্রব্যে" পরিণত হইয়া পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের উপর ক্রিয়া করে। ব্যতিহারে দ্রব্য ও তাহার বিপরীত এক হইয়া যায়, এবং কারণ ও কার্য্যের ভেদ বিলুপ্ত হয় ; কারণই কার্য্য হয়, এবং কার্য্য কারণে পরিণত হয়। ইহা বুঝিতে হইলে কারণ ও কার্য্যকে বিশুদ্ধ "চিন্তা"-রূপে ধারণা করিতে হয়। সূর্য্য ও পৃথিবীর পরস্পারের উপর ক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও তাহারা এক হইয়া যায় না, ইহা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত অনেক অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপাদান মিশ্রিত থাকে। সেইগুলি কার্য্য ও কারণের ধারণা হইতে নিষ্কাশিত করিলে, বিশুদ্ধ কার্য্য ও কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্তা ও অসত্তা অভিন্ন বলিয়া যেমন কোনও বিশিষ্ট সত্তাবান্ বস্তু শূন্যে পরিণত হয় না, তেমনি কার্য্য ও কারণ অভিন্ন বলিয়া, সূর্য্য ও পৃথিবী এক হইয়া যায় না। বিশুদ্ধ কারণের মধ্যে কারণত্বের অতিরিক্ত কিছুই নাই। এতাদৃশ কারণ ও তাহার কার্য্যই অভিন্ন। ইহা হইতেই এমন এক সত্তা পাওয়া যায়, যাহা তাহার বিপরীতে পরিণত হইয়া, তাহার নিজের মধ্যেই প্রবেশ করে, এবং এই বিপরীত ভিন্ন কোনও বস্তুতে পরিণত না হইয়া বৈপরীত্যের মধ্যেও অভিন্ন থাকে। ইহাই নোশান। ব্যতিহারে 'ক' কর্ত্তৃক 'খ' প্রতিবদ্ধ, আবার 'খ' কর্ত্তৃকও 'ক' প্রতিবদ্ধ। সুতরাং 'খ'কে প্রতিবদ্ধ করিবার সময় 'ক' আপনাকেই প্রতিবদ্ধ করে। যখন 'ক' তাহার বিপরীতে পরিণত হয়, তখন তাহার বিপরীত 'ক'র মধ্যেই প্রবেশ করে। কিন্তু 'ক'র বিপরীত যখন 'ক' হইতে অভিন্ন, তখন বিপরীতের এই 'ক'র মধ্যে প্রবেশ আপনার মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন। এই সত্তা, যখন আপনা হইতে বহির্গত হইয়াও আপনার মধ্যেই অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহাকে আর তখন দ্রব্য বলা যায় না। তাহাই নোশান।

ক্যাণ্টের ক্যাটেগরিদিগের মধ্যে হেগেলের নোশানের অনুরূপ কোনও ক্যাটেগরি নাই। হেগেলের সত্তার ক্যাটেগরিগণ ক্যাণ্টের গুণ ও পরিমাণ ক্যাটেগরির অনুরূপ। তাঁহার "সারের" ক্যাটেগরিগণ ক্যাণ্টের সম্বন্ধ এবং বিধা ক্যাটেগরির অনুরূপ। কিন্তু নোশনের অনুরূপ কোনও ক্যাটেগরি ক্যাণ্টের ক্যাটেগরিদিগের মধ্যে নাই। নোশান হেগেলের নূতন আবিষ্কার।

সত্তার ক্যাটেগরিদিগের বিশেষত্ব এই, যে যদিও তাহারা বস্তুতঃ অন্যনিরপেক্ষ নহে, তথাপি অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া প্রতীত হয়। যদিও গুণের মধ্যে পরিমাণ, এবং পরিমাণের মধ্যে গুণ আছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে এই সম্বন্ধ গূঢ়, স্পষ্ট নহে। কিন্তু সার-মণ্ডলের ক্যাটেগরিগণ স্পষ্টতঃই সাপেক্ষ। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তাহার বিপরীত স্পষ্ট বর্ত্তমান। অভেদ ও ভেদ, কার্য্য ও কারণ প্রভৃতি ক্যাটেগরির মধ্যে প্রত্যেক ক্যাটেগরি তাহার বিপরীতের সম্মুখীন। ব্যতিহার ক্যাটেগরির মধ্যে এই বৈপরীত্যের সমাধান হইয়াছে, বিরোধের উদ্ভবমাত্রই তাহার অবসান হইয়াছে। দ্রব্য হইতে তাহার যে বিকারের উদ্ভব হয়, তাহা বস্তুতঃ ভিন্ন কোনও পদার্থ নহে, তাহা সেই দ্রব্যই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে বাস্তব পদার্থের মধ্যে যে বিরোধ, তাহা নিজের সহিত নিজের বিরোধ। নিজের মধ্যে এই বিরোধের প্রকৃত সমাধানই নোশান। "যে সত্তা তাহার বিপরীতের মধ্যে

আপনার সহিত অভিন্ন থাকে, তাহার প্রত্যয়ই নোশান।” সত্তা অব্যবহিত,[1] সার ব্যবহিত।[2] সত্তা ও সারের সমন্বয়ই নোশান। লজিকের প্রথম ত্রয়ীর ইহা তৃতীয় পাদ। বিপরীতের অভিন্নতা ইহার তত্ত্ব। বিপরীত দুইটি সত্তা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়াও সম্পূর্ণ অভিন্ন রূপে প্রতীত হয়। ইহাই প্রজ্ঞার তত্ত্ব।[3] সারের ক্যাটেগরিগণ প্রত্যেকেই তাহার বিরুদ্ধ ক্যাটেগরি-কর্তৃক অবচ্ছিন্ন। কিন্তু নোশান স্বাবচ্ছিন্ন। সারের ক্যাটেগরিগুণ অন্য-কর্তৃক আবচ্ছিন্ন বলিয়া নিয়ত। তথায় স্বাধীনতা নাই। নোশান স্বাবচ্ছিন্ন বলিয়া স্বাধীন। সেই জন্য অসীমও বটে।

নোশানের তিন প্রধান ক্যাটেগরি: (ক) বিষয়িগত নোশান,[4] (খ) বিষয়গত নোশান, এবং (গ) পর প্রত্যয়।[5]

(ক) বিষয়িগত নোশানের তিন ক্যাটেগরি:—(১) স্ব-গত নোশান[6] (২) বহির্গত নোশান অথবা বিচার,[7] এবং (৩) সিলজিসম[8] অথবা নোশানের আপনাতে প্রত্যাবর্তন। স্ব গত নোশানের মধ্যে আছে:—(১) সার্ব্বিক, (২) বিশেষ এবং (৩) এক[9] অথবা ব্যক্তি। বস্তুতঃ ইহারা স্বতন্ত্র ক্যাটেগরি নহে। ইহারা নোশানের উৎপাদক।[10] ইহাদের লইয়াই নোশানের অস্তিত্ব। ইহাদের প্রত্যেকেই অন্য দুইটি হইতে এবং নোশান হইতে অভিন্ন। কেননা নোশান আপনাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া বিভিন্নতার মধ্যেও আপনার সহিত অভিন্ন থাকে।

নোশানের আপনার সহিত প্রাথমিক অভেদই সার্ব্বিকত্ব। বিশেষ হইতেছে পরবর্ত্তী ভেদ। কিন্তু ইহাও সার্ব্বিকের সহিত অভিন্ন। কেননা বিশেষ যখন সার্ব্বিকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, তখন সার্ব্বিক ও বিশেষ—এই দুইটির মধ্যে সার্ব্বিক হয় একটি; সুতরাং তাহার সার্ব্বিকতা থাকে না। সার্ব্বিক তখন বিশেষ হইয়া যায়; অর্থাৎ সার্ব্বিক ও বিশেষের মধ্যে ভেদ দূরীভূত হয়, তাহারা অভেদে পরিণত হয়। কিন্তু সার্ব্বিক ও বিশেষের এই অভেদই "এক" বা "ব্যক্তি"। সার্ব্বিক ও বিশেষ যদি এইরূপে "একত্বের" উৎপাদক বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে (সার্ব্বিক ও বিশেষ অভিন্ন বলিয়া) তাহাদের প্রত্যেকেই একাকী একত্বের সমগ্র অংশ। সার্ব্বিক, বিশেষ ও এক সুতরাং পরস্পরের সহিত অভিন্ন। তাহাদের প্রত্যেকেই অবিভক্ত সমগ্র নোশান।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে নোশান শব্দের অর্থ সম্প্রত্যয়।[11] কিন্তু "নোশান" ও সম্প্রত্যয় এক নহে। মানুষ, গরু, বৃক্ষ প্রভৃতি প্রত্যেক সাধারণ নামই সম্প্রত্যয়। ইহাদিগকে সার্ব্বিক বলা হয়। কিন্তু এই সার্ব্বিক হেগেলের নোশান হইতে ভিন্ন। সাধারণ অর্থে সার্ব্বিক বস্তুত্বহীন। কিন্তু হেগেলের নোশান তাহা নহে। সাধারণ সার্ব্বিকের মধ্যে

[1] Immediate
[2] Mediate
[3] Principle of Reason
[4] Subjective Notion
[5] The Idea
[6] Notion in itself
[7] Judgment
[8] Syllogism
[9] Singular
[10] Factor
[11] Concept

বিশেষ ও "একের" অস্তিত্ব নাই বলিয়াই তাহা বস্তুত্বহীন। কিন্তু হেগেলের সার্ব্বিকের মধ্যে—নোশানের মধ্যে—বিশেষ ও এক উভয়ই আছে।

হেগেল যে সকল ক্যাটেগরি বিষয়িগত নোশানের অন্তর্ভূত বলিয়াছেন, তাহারা সকলেই চিন্তার রূপ। হেগেল "অহং"কে নোশান বলিয়াছেন। ক্যাণ্ট সংবিদকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন: এক ভাগ জ্ঞানের রূপ—দেশ, কাল ও ক্যাটেগরিগণ; অন্য ভাগ সংবেদন—জ্ঞানের উপাদান। দেশ, কাল ও ক্যাটেগরিগণই (মনের রূপ) অহং। সংবেদন অনহং। ক্যাণ্ট অহংকে বিশুদ্ধ চিন্তা বলিয়াছিলেন; হেগেলের নোশানও বিশুদ্ধ চিন্তা—যাবতীয় ক্যাটেগরিদিগের সমষ্টি। কিন্তু ক্যাণ্টের অহং বস্তুত্বহীন সার্ব্বিক। হেগেলের অহং (নোশান) বস্তুত্ব-সমন্বিত সার্ব্বিক।[1]

প্রচলিত লজিকে প্রথমতঃ "নামের" কার্য্য ব্যখ্যা করিয়া পরে, "বিচার" এবং তাহার পরে সিলজিয়মের ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু "বিচার"ও সিলজিসম্ কেন আছে, কিরূপে ইহাদের উদ্ভব হয়, তাঁহার যুক্তি-সম্মত ব্যাখ্যা নাই। হেগেল ইহাদের উদ্ভবের যুক্তি-সম্মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সত্তা-মণ্ডলে এবং সারমণ্ডলে তিনি যেমন প্রত্যেক ক্যাটেগরির উদ্ভবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তেমনি তিনি নোশান হইতে কিরূপে বিচার ও পরে সিলজিসম্ উদ্‌ভূত হয়, তাহার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন।

"একত্বে"র ক্যাটেগরি হইতে "বিচারের" উদ্‌ভব—এই উদ্‌ভব অবশ্যম্ভব। সার্ব্বিকের ব্যতিরেক বিশেষ; বিশেষ ও সার্ব্বিক পরস্পরের বিপরীত বলিয়া অভিন্ন। আবার নোশান যখন একত্বের মধ্যে আপনাতে ফিরিয়া আসে, তখন "এক" হয় বিশেষের ব্যতিরেক, অর্থাৎ ব্যতিরেকের ব্যতিরেক অথবা অসঙ্গ ব্যতিরেক।[2] ইহার পরে সার্ব্বিক ও ও বিশেষের ভেদ বিদূরিত হয়, এবং ইহা অব্যবহিতত্বে পরিণত হয়। এই অব্যবহিতত্ব একটি স্বতন্ত্র সত্তা, কেননা অব্যবহিতত্ব ও স্বাধীনতা অভিন্ন। সার্ব্বিক ও বিশেষ ইহার অন্তর্গত বলিয়া, "এক" একটি সমগ্র সত্তা—ইহা সমগ্র নোশান; বিশেষ ও সার্ব্বিকও প্রত্যেকেই সমগ্র নোশান—সার্ব্বিক, বিশেষ এবং একের সমগ্রতা। কেন না ইহারা একের সহিত অভিন্ন। এইরূপে নোশানের প্রাথমিক একত্ব ত্রিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে—সার্ব্বিক, বিশেষ ও এক। নোশানের এই বিভক্তিই "বিচার"। নোশান স্বীয় সক্রিয়তার ফলে "বিচারে" পরিণত হয়। নোশানের মধ্যে যাহা গূঢ় ছিল, এই বিভাগের ফলে তাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহাদ্বারা নোশানের একত্ব নষ্ট হয় না। এই ফলটি পক্ক—এই বিচারের মধ্যে "এই ফলটি" ব্যক্তি, "পক্ক" একটি সার্ব্বিক।" সুতরাং "এই ফলটি পক্ক" = ব্যক্তি হয় সার্ব্বিক। পার্থক্যের মধ্যে এইরূপে একত্বও বর্তমান। হেগেল চারি প্রকার বিচারের উল্লেখ করিয়াছেন: (১) গুণবাচক বিচার, (২) পরিচিন্তন মূলক বিচার,[3] (৩) নিয়তি মূলক বিচার,[4] এবং (৪) নোশান মূলক বিচার। এই চারি প্রকার বিচারের প্রত্যেকটিকে

[1] Concrete Universal
[2] Absolute Negativity
[3] Judgment of Reflection
[4] Judgment of Necessity

আবার তিনি ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন। এই সকল বিভাগ ও অনুবিভাগের বিস্তারিত বর্ণনার স্থান এখানে নাই।

প্রত্যেক সিলজিস্‌মের তিনটি অংশ: একটি সার্ব্বিক, দ্বিতীয়টি বিশেষ, তৃতীয়টি ব্যক্তি। (১) সকল মানুষ হয় মরণশীল; (২) সক্রেটিস্ হন মানুষ; সুতরাং (৩) সক্রেটিস্ মরণশীল। এই সিলজিস্‌মের তিনটি পদ—মানুষ, মরণশীল এবং সক্রেটিস্। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকপদ মরণশীল। এটি সার্ব্বিক। তাহার পরে ব্যাপক মানুষ—ইহা বিশেষ। উপরোক্ত সিলজিসম এর মধ্যে "মানুষ" পদটি মধ্যপদ। ইহাদ্বারাই মরণশীল এবং সক্রেটিসের মধ্যে সম্বন্ধ স্পষ্টীকৃত হয়। স্ব-গত নোশনের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব এবং সামান্যত্ব অবিভক্ত ছিল। বিচারের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মরণশীল পদার্থ বহু। মানুষ মরণশীল, পক্ষী মরণশীল, উদ্ভিদ মরণশীল। বিচারে মরণশীলের অন্তর্গত পদার্থসকল বাহির হইয়া পড়ে। সিলজিস্‌মের মধ্যে এই সকল পদার্থের মরণশীলের মধ্যে একত্ব ব্যক্ত হয়। এই জন্য নোশান এবং বিচারের সমন্বয়ই সিলজিয়ম্।

বিচারদ্বারা সামান্যের অন্তর্গত ভেদ উদ্‌ঘাটিত হয়। এই জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। সিলজিসমের মধ্যে যে বিরোধের সমন্বয় হয়, তাহা প্রজ্ঞার কার্য্য। কিন্তু সিলজিসম্ ও বিচার কেবল মাত্র চিন্তার রূপ নহে। প্রত্যেক বস্তুই সিলজিসম্ ও বিচার। সিলজিসম্ প্রজ্ঞার রূপ। বাস্তব প্রত্যেক বস্তুই প্রজ্ঞা-সম্মত বা যুক্তিযুক্ত। সুতরাং প্রত্যেক বাস্তব পদার্থই সিলজিসম্। অসঙ্গ অথবা ঈশ্বরও সিলজিসম্। ঈশ্বরকে বস্তুত্ববর্জ্জিত সার্ব্বিক বলিয়া গণ্য করিলে, ঈশ্বর ও নৈয়ায়িক প্রত্যয় (Logical Idea) অভিন্ন। কিন্তু ঈশ্বর কেবল বস্তুত্ব-বর্জ্জিত সার্ব্বিক নহেন। সার্ব্বিক আপনার মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়, এই বিশেষ প্রকৃতি। এই বিশেষ আত্মারূপে আবার এই সার্ব্বিকের মধ্য ফিরিয়া আসে।

Syllogismএর তিন রূপ: (১) গুণ বাচক সিলজিস্‌ম্ (২) পরিচিন্তন মূলক সিলজিস্‌ম্ এবং (৩) নিঃস্তি মূলক সিলজিস্‌ম্। হেগেল এই ত্রিবিধ সিলজিস্‌মকে নানাভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাদিগের বিস্তারিত ব্যাখ্যার এখানে স্থানাভাব।

বিষয়গত নোশান

ক্যাণ্ট জ্ঞানকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—বিষয়ী ও বিষয়, জ্ঞানের রূপ ও উপাদান। দেশ ও কাল এ বারোটি ক্যাটেগরিই রূপ, এবং সংবেদন উপাদান। বিবিধ রূপের সংযোগ-সূত্র, যাহাকে ক্যাণ্ট আত্মজ্ঞানের অতীন্দ্রিয় একত্ব[1] বলিয়াছিলেন, তাহাই বিষয়ী, তাঁহার বিশুদ্ধ অহং[2]। বিষয়ী আপনাকে বারো ক্যাটেগরিতে বিভক্ত করে—কিরূপে করে, তাহা ক্যাণ্ট বলেন নাই। এই ক্যাটেগরিগুলিই বিচার বৃত্তির[3] রূপ। হেগেলের নোশান ও ক্যাণ্টের বিশুদ্ধ অহং অভিন্ন। হেগেল তাঁহার নোশান কিরূপে আপনাকে বিচারে

[1] Transcendental Unity of Apperceptiou
[3] Faculty of Judgment [2] Pure Ego

সার্ব্বিক, বিশেষও ব্যাক্তি, এই তিন ভাগে বিভক্ত করে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বিষয়ী জ্ঞানের রূপ, এবং বিষয় জ্ঞানের উপাদান ক্যাণ্ট জ্ঞানের রূপ ও উপাদান দুই বিভিন্ন উৎস হইতে উদ্‌ভূত বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু হেগেল জ্ঞানের উপাদানকে তাহার রূপ হইতে উদ্‌ভূত বলিয়াছেন, এবং কিরূপে বিষয় বিষয়ী হইতে উদ্‌ভূত হয়, তাহা দেখাইয়াছেন। নোশানের মধ্যে যাহা যাহা বর্ত্তমান, তাহা স্বগত নোশানের মধ্যে অবিভক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান। নোশান হইতে যখন "বিচার" উদ্‌ভূত হয়, তখন তাহারা বিভিক্ত হইয়া পড়ে। সিলজিস্‌মের মধ্যে তাহাদের সম্বন্ধ এবং একত্বে প্রত্যাবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। ইহাই বিষয়। মনে রাখিতে হইবে এই "বিষয়" জ্ঞানের মধ্যেই অবস্থিত, বাহিরে নহে। ইহা বিষয়ীরই বিষয়, বিষয়ী-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত নহে। অন্যান্য ক্যাটেগরির মত এই বিষয় ক্যাটেগরিও যেমন বাহ্য জগতের বাচক, তেমনি অসঙ্গেরও বাচক। প্রত্যেক বস্তুই বিষয়, অর্থাৎ বিষয়ীর সহিত সম্বন্ধ যুক্ত। ইহার অর্থ চিন্তার সহিত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই। বিষয়ীর সহিত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত অজ্ঞেয় স্বগত বস্তু কিছুই নাই। দ্বিতীয়তঃ অসঙ্গও বিষয়—ঈশ্বর পরতম বিষয়। ঈশ্বর যেমন বিষয়, তেমনি তাহার বিষয়ীও বটেন, ইহা বিস্মৃত হইলে তাঁহাকে বিষয়ীর বিরোধী একটি অজ্ঞেয় শক্তি বলিয়া মনে করা হয়; তাঁহাকে বাহ্য শক্তি এবং বিষয়ীর সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং তাঁহাকে ভয় করা যায়, কিন্তু ভালোবাসা যায় না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞ লোক তাহাই মনে করে। কিন্তু যখন ঈশ্বরকে বিষয়ী বলিয়া গণ্য করা হয়, তখন তাঁহাকে আমাদের অন্তরতম আত্মা এবং আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ও প্রেমাস্পদ বলিয়া ধারণা করা হয়। খৃষ্টধর্ম্মে তিনি এই ভাবেই গৃহীত হন।

বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত: (১) যান্ত্রিকত্ব,[১] (২) ঘনিষ্ঠতা[২] এবং (৩) উদ্দেশ্যাভিমুখিতা।[৩] জগৎকে বিভিন্ন বস্তুর অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ-বর্জ্জিত সমষ্টিরূপে দেখাই যান্ত্রিকতা। প্রত্যেক বস্তু অন্যান্য বস্তুর বাহিরে অবস্থিত, তাহাদের কোনও অভ্যন্তরীণ যোগ-সূত্র নাই—এই ধারণাই যান্ত্রিকতা। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া ও প্রত্যেক বস্তুর গুণের সহিত অন্যান্য বস্তুর গুণের সম্বন্ধ লক্ষ্য করাই ঘনিষ্ঠতা। রাসায়নিক সংযোগ বস্তুর গুণের মধ্যে সম্বন্ধ হইতে উদ্‌ভূত হয়। উদ্‌ভিদ ও জন্তুর মধ্যে যৌন আকর্ষণ, ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির পারস্পরিক আকর্ষণ এই ঘনিষ্ঠতার দৃষ্টান্ত। বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যের সম্বন্ধই উদ্দেশ্যাভিমুখিতা। বিষয়ী আদর্শ; সেই আদর্শের বাস্তবে পরিণতিই উদ্দেশ্য। অভিব্যক্তির গতি এই উদ্দেশ্যের অভিমুখে—এই ধারণাই উদ্দেশ্যাভিমুখিতা। জৈব দেহের যাবতীয় অংশ সমগ্রের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার বাস্তবতা-সম্পাদনের জন্য সক্রিয়। সমগ্রের উদ্দেশ্য জীবন-রক্ষা। ইহা দেহের বহির্ভূত কোনও উদ্দেশ্য নহে। দেহের অস্তিত্ব তাহার নিজের জন্য। দেহের যাবতীয় অংশের অস্তিত্ব সমগ্র দেহের জন্য। কিন্তু দেহ ও তাহার অঙ্গ সকল অভিন্ন। সমগ্র দেহ উদ্দেশ্য। তাহার অঙ্গ সকল উপায়। দেহ ও অঙ্গদিগকে এক বলিয়া গণ্য

---

[১] Meehan.sm [২] Chemism [৩] Teleology

করিলে পাওয়া যায় উদ্দেশ্য; দেহকে বহুত্বের সমবায় মনে করিলে পাওয়া যায় উপায়। উদ্দেশ্য ও উপায় অভিন্ন। রাষ্ট্র ও নাগরিকদিগের মধ্যেও এই সম্বন্ধ বর্ত্তমান। রাষ্ট্র নাগরিকদিগের উদ্দেশ্য, আবার তাহা নাগরিকগণের সমবায় বলিয়া নাগরিকগণ হইতে অভিন্নও বটে। যখন উদ্দেশ্য ও তাহার সাধনের উপায় অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখনই উদ্দেশ্যাভিমুখিতার অর্থ সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়। প্রথমে উদ্দেশ্য ও উপায় ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। বিষয়ী উদ্দেশ্য, বিষয় উপায়। বিষয়ের সম্মুখে বিষয়ী, উপায়ের সম্মুখে উদ্দেশ্য, স্বতন্ত্র ভাবে প্রথমে বর্ত্তমান। বিষয় তখন তাহার আদর্শে উপনীত হইতে পারে নাই। উদ্দেশ্য তখনও বস্তুত্ব প্রাপ্ত হয় নাই; তখনও তাহা বিষয়ীরূপে বর্ত্তমান, তখন সেই উদ্দেশ্য বিষয়িগত। উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্মদ্বারা বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ বিদূরিত হয়। এতাদৃশ কর্ম্মই তখন উপায় বলিয়া গণ্য হয়। যখন বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ বিলুপ্ত হয়, তখন উদ্দেশ্যের বিষয়িত্ব আর থাকে না। তখন বিষয়ী বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়া বাস্তবতা প্রাপ্ত উদ্দেশ্যে[১] পরিণত হয়।

কিন্তু জাগতিক উদ্দেশ্যের বাস্তবে পরিণতি কালে সংঘটিত ঘটনা নহে। জগতের উদ্দেশ্য এখন পর্য্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয় নাই—এই ধারণা অধঃস্থ ক্যাটেগরির প্রয়োগ হইতে উদ্ভূত হয়। হেগেল বলিয়াছেন, "অসীম উদ্দেশ্য বাস্তবে পরিণত হয় নাই—ইহা ভ্রান্ত ধারণা। এই ভ্রান্তির নিরসন হইলে বুঝিতে পারা যায়, যে উহা বাস্তবে পরিণত ব্যাপার। পরম মঙ্গল জগতে চিরকালই বাস্তবতা প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা ভ্রান্তির মধ্যে বাস করিতেছি।"

কিন্তু এই ভ্রান্তি পরপ্রত্যয়-কর্ত্তৃকই সৃষ্ট এবং উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য ইহা অপরিহার্য্য। এই ভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া তাহার বিদূরণই পরপ্রত্যয়ের কার্য্য। এই ভ্রান্তি হইতেই সত্যের উদ্ভব হয়। বিদূরিত ভ্রান্তি সত্যের একটা শক্তিমূলক অংশ।[২] অন্যত্র হেগেল বলিয়াছেন "পরপ্রত্যয় এত শক্তিহীন নহে, যে তাহার কেবল অস্তিত্বের অধিকার অথবা বাধ্যতা আছে, কিন্তু বাস্তব অস্তিত্ব নাই।" জগতে অমঙ্গল, ভ্রান্তি ও অপূর্ণতার অস্তিত্ব ভ্রান্তি নহে। তাহাদের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু জগৎ অনবদ্য, পরম মঙ্গল সর্ব্বদাই বাস্তবে পরিণত ব্যাপার; ইহার সহিত অমঙ্গল ও অপূর্ণতার অস্তিত্বের অসামঞ্জস্য নাই। ইহাই হেগেলের মত।

পর প্রত্যয়

নোশানের মধ্যে তিনটি ক্যাটেগরি: বিষয়ী, বিষয় ও পর প্রত্যয়। ইহারা সকলেই অসঙ্গের বাচক। অসঙ্গ প্রথমে বিষয়ীরূপে প্রতীত হয়। তাহার পরে বিষয়রূপে প্রতীত হয়। এই উভয়ের সমন্বয় পর প্রত্যয়। বিষয়ী ও বিষয়ের একত্বই পর প্রত্যয়। উদ্দেশ্যাভিমুখিতা ক্যাটেগরি হইতে পর প্রত্যয়ের ক্যাটেগরির উদ্ভব। উদ্দেশ্যাভিমুখিতায় উদ্দেশ্য ও উপায়ের একত্ব সাধিত হয়। জীবদেহে অঙ্গসকল উপায়—সমগ্র দেহের জীবনের উপায়।

---

[১] Realised end

[২] Dynamic element

সর্ব্ব অঙ্গের সংহত একত্ব উদ্দেশ্য। দেহকে বহুত্বের সমবায়রূপে দেখিলে তাহা উপায়; বহু অঙ্গকে এক বলিয়া গণ্য করিলে তাহা উদ্দেশ্য। যখন উপায় ও উদ্দেশ্য বাস্তবতা-প্রাপ্ত উদ্দেশ্যের ক্যাটেগরিতে মিলিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন বিষয়ী ও বিষয়ের একত্ব সাধিত হয়। এই একত্বই পর প্রত্যয়।

যাবতীয় বস্তুই চিন্তা। চিন্তার দুই দিক: বিষয়ী ও বিষয়। জগৎ কেবল বিষয়ী ও কেবল বিষয় নহে, জগৎ বিষয়ী ও বিষয়ের একত্ব। এই একত্ব শূন্যগর্ভ নহে। ইহার মধ্যে সমস্ত পার্থক্য নির্মূল হইয়া যায় নাই। পার্থক্য একত্বের মধ্যে বর্ত্তমান—বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য এই একত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই একত্ব শেলিংএর "উদাসীন বিন্দু" নহে। যদি বলা যায় অসঙ্গ বিষয়ী নহে, বিষয়ও নহে, চিন্তাও নহে, সত্তাও নহে, অসীমও নহে, সসীমও নহে, তাহা হইলে সে বর্ণনা ঠিক হইবে না। এই একত্বের মধ্যে সসীম অসীমের অন্তর্গত, সত্তা চিন্তার অন্তর্ভুক্ত, বিষয় বিষয়ীর মধ্যে বর্ত্তমান। Substanceএর প্রত্যয় হইতে ইহা ভিন্ন। "চিন্তা ও তাহার মধ্যে যে ভেদ, চিন্তা তাহা অতিক্রম করিয়া যায়।" চিন্তার যাহা বিষয়, তাহাও চিন্তা, যদিও চিন্তার বিপরীত রূপেই বিষয় তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হয়। বিষয় ও বিষয়ী অভিন্ন। জ্ঞান ও সত্তা অভিন্ন

পর প্রত্যয়ের তিন ক্রম: (১) জীবন, (২) জ্ঞান ও[1] (৩) অসঙ্গ প্রত্যয়।[2] বহুত্বে আপনাকে বিভক্ত করাই যে একত্বের স্বভাব, এবং আপনাকে সংহত করিয়া একত্বে পরিণত করাই যে বহুত্বের স্বভাব, তাহারা অভিন্ন। এই অভিন্নতাই "জীবন" ক্যাটেগরি। যে একত্ব ও যে বহুত্ব এই ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত, তাহারা অবিনাভাবী। পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র ভাবে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। দেহের অঙ্গবিশেষ অন্যান্য অঙ্গের সহিত সংহত বলিয়াই তাহার অঙ্গত্ব। এই সংহতি বিনষ্ট হইলে তাহার অঙ্গত্ব থাকে না। হাত কাটিয়া ফেলিলে আর তাহাকে দেহের অঙ্গ বলা যায় না। এই দৃষ্টান্তদ্বারাও জীবন ক্যাটেগরির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না। কর্ত্তিত হস্ত অঙ্গ না হইলেও, তাহার অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু যে বহুত্বের ও একত্বের সংহতি জীবন, পরস্পর হইতে স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের অস্তিত্ব নাই।

জীবন হইতে প্রাণবান্ ব্যক্তি[3], প্রাণক্রিয়া[4] এবং জাতির[5] উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া হেগেল পর প্রত্যয়ের দ্বিতীয় ক্যাটেগরি "জ্ঞানের" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জ্ঞানে বাহ্য জগৎ বিষয়ীর সম্মুখে উপস্থিত হয়, বিষয়ীর মধ্যগত রূপে। প্রথমতঃ বিষয়ী নিষ্ক্রিয়ভাবে বাহ্যজগৎরূপ বিষয় গ্রহণ করে। ইহাই জ্ঞান। এখানে বিষয় সংবিদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন সংঘটন করে। জগতের স্বরূপ অবগত হওয়াই জ্ঞানের লক্ষ্য। আবার বিষয়ীকে সক্রিয় মনে করাও যাইতে পারে। বিষয়ী জগৎকে পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করে, ইহাও মনে করা যাইতে পারে। ইহা "ইচ্ছা ক্রিয়া"—জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র।

---

[1] Cognitien [2] Absolute Idea [3] Living individual
[4] Life Process [5] Kind

কর্ম্মদ্বারা বিষয়ী জগৎকে আপনার উদ্দেশ্যের অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে চায়। ইহাই ইচ্ছা।

জ্ঞানের লক্ষ্য সত্যের প্রত্যয়।[১] এই প্রত্যয়কে Theoretical Ideaও বলে। এই জ্ঞানে বাহ্য জগৎকে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা সসীম জ্ঞান। কেননা এই জ্ঞানই সমগ্র সত্য নহে। বাহ্য জগৎ ইহার বাহিরে অবস্থিত। বিষয়ী ও বিষয় ইহার মধ্যে পৃথক ভাবে বর্ত্তমান। তাহাদের অভিন্নতা এ জ্ঞানের মধ্যে নাই। ইহা বুদ্ধির জ্ঞান। চিন্তার অভিব্যক্তিতে এই জ্ঞান একটি অবশ্যক ক্রম। বাহ্য বস্তু এই জ্ঞানে সার্ব্বিকের মধ্যে গৃহীত হয়। এই সার্ব্বিকগুলি ক্যাণ্টের ক্যাটেগরি। এই ক্যাটেগরি-গুলি বাহ্যবস্তুদ্বারা পূর্ণ হয়। হেগেল এই জ্ঞানের মধ্যে আরোহ এবং অবরোহ প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ত্রিভঙ্গী নয় প্রণালীকেই তিনি দার্শনিক প্রণালী বলিয়াছেন।

বাহ্য জগৎ হইতে যাহা মনের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার মধ্যে অবশ্যকতা নাই। অবশ্যকতার ধারণা উৎপন্ন হয় মনের ক্রিয়া হইতে। সক্রিয় বিষয়ী যখন জগৎকে আপনার অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে চায়, তখন ইচ্ছার উদ্ভব হয়। তখন Theoretical Idea হইতে Practical Ideaতে আমরা উপনীত হই। জ্ঞানের উদ্দেশ্য সত্য, ইচ্ছার উদ্দেশ্য শিব বা মঙ্গল।

জ্ঞানের মত ইচ্ছাও সসীম। ইচ্ছার নিকট জগৎ একটা বিসদৃশ বস্তু, জগৎ ইচ্ছার অবচ্ছেদক। ইচ্ছা সসীম বলিয়াই শিবকে অনায়ত্ত এবং জগতে সাধনীয় বলিয়া গণ্য করে। যাহা আছে, তাহা বিষয়, যাহা হওয়া উচিত, তাহা বিষয়ী। ইচ্ছা এখন পর্য্যন্ত বিষয়ী ও বিষয়ের অভেদে উত্তীর্ণ হয় নাই। অসঙ্গ প্রত্যয়েই এই একত্ব অধিগত। যাহা আছে এবং যাহা হওয়া উচিত, তাহারা পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। ইচ্ছা শিবের দিকে অনবরত অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু কখনও তাহাকে সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যাহা আছে ও যাহা হওয়া উচিত, উভয়ে একও বটে, বিভিন্নও বটে; অর্থাৎ জগতের উদ্দেশ্য যেমন সাধিত হইয়া আছে, তেমনি সাধিত হইতেছে। দার্শনিক জগৎকে অসঙ্গ প্রত্যয় বলিয়া জানেন; তিনি উদ্দেশ্য এবং উপায়ের মধ্যে, বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে, এবং যাহা আছে এবং যাহা হওয়া উচিত, তাহার মধ্যে কোনও ভেদ দেখিতে পান না। স্বরূপতঃ জগৎ শিব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং শিব যেমন সাধিত হইয়াই আছে, তেমনি চিরকাল সাধিত হইতেছে। সসীম বুদ্ধিই বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে, "আছে" এবং "হওয়া উচিতের" মধ্যে, ভেদ দেখিতে পায়, এবং শিবকে দূর ভবিষ্যতে সাধ্য আদর্শ বলিয়া গণ্য করে।

অসঙ্গ প্রত্যয়

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ইচ্ছা সসীম। ইহা বাহ্য জগৎ-দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন। ইহার সম্মুখে সাধনীয় উদ্দেশ্যরূপে 'শিব' বর্ত্তমান। একদিকে ইচ্ছা এই শিবকে একমাত্র সত্য এবং

---

[1] Idea of the True

জগতের সাররূপে দেখে, এবং এই শিব হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান বিষয়কে তাহার ছায়া বলিয়া গণ্য করে। আবার এই শিব অনবাপ্ত বলিয়া, ভবিষ্যতে সাধ্য বলিয়া, এখনও জ্ঞানের বিষয় হয় নাই বলিয়া, তাহাকেও অসৎ বলিয়া মনে করে। শিবকে পাইবার জন্য অন্তহীন প্রচেষ্টার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট। শিবের দিকে ইচ্ছার দৃষ্টি আবদ্ধ। কিন্তু শিব বিষয়ীর মধ্যে বর্ত্তমান। ইচ্ছা বিষয়কে বিষয়ীর মধ্যগত শিবের অনুরূপ করিবার জন্য সচেষ্ট। সেই সচেষ্টতাই ইচ্ছার ক্রিয়া। বিষয়ী ও বিষয়ের একত্ব-সম্পাদন করিয়া স্বকীয় সসীমত্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্যই ইহার প্রচেষ্টা। এইভাবে ইচ্ছা ক্যাটেগরি ও জ্ঞান ক্যাটেগরি মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। বিষয়ীর মধ্যে বর্ত্তমান শিবের ধ্যানই সম্পূর্ণ সত্য নহে। ইচ্ছা চাহে শিবকে বিষয়ে পরিণত করিতে, বাহ্য জগতে তাহাকে প্রকাশিত করিতে। এই প্রকাশ সম্পূর্ণ হইলে—জগতে শিব বিষয়রূপে আবির্ভূত হইলে—বিষয়ী তাহাকে জ্ঞাতার দিক হইতে দেখিবে, তাহাকে বাস্তবরূপে দেখিবে। ইহাই জ্ঞান। এইরূপে ইচ্ছা ও জ্ঞানের একত্ব সাধিত হইবে। ইহাই অসঙ্গ প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের মধ্যে বিষয়ী ও বিষয় অভিন্ন। বাস্তবতা-প্রাপ্ত উদ্দেশ্যের মধ্যে যেমন উদ্দেশ্য ও উপায়ের ভেদ বিদূরিত হয়, তেমনি অসঙ্গ প্রত্যয়ের মধ্যে যাহা আছে ও যাহা হওয়া উচিত, তাহার একত্ব সাধিত হয়। বাস্তবতা-প্রাপ্ত শিব বিষয়ী ও বিষয়ের একত্ব।

অসঙ্গ প্রত্যয়ে উপনীত হইয়া দার্শনিক দেখিতে পান, যে বিষয় বিষয়ী হইতে স্বতন্ত্র ও বিরূপ কিছু নহে—উভয়ে অভিন্ন। গ্রহ-নক্ষত্র-সমন্বিত জীব-সমাকুল বহুধা বিভক্ত এই জগৎ বাহ্য উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া বিষয়ীর সম্মুখে উপস্থিত হয় না—তাহা ও বিষয়ী অভিন্ন। বাহ্য জগৎরূপে যাহা তাহার নিজের নিকটই আবির্ভূত হয়, সেই জগৎকে চিন্তা করিবার সময় মনঃ আপনাকেই চিন্তা করে। সুতরাং মনঃ চিন্তার চিন্তা; চিন্তা তাহার বিরূপ কোনও দ্বিতীয় পদার্থের চিন্তা করে না, আপনাকেই চিন্তা করে। অসঙ্গ প্রত্যয়কে স্ব-সংবিদও বলা হয়, তাহাকে পুরুষও বলা যায়। অসঙ্গ প্রত্যয়ই পরতম সত্য; ইহাই অসঙ্গ অথবা ঈশ্বরের এবং বিশ্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাচক। ইহাই জগতের সত্য রূপ। শক্তির আধার জড় রূপ জগতের পূর্ণতম রূপ নহে। জগৎ চিন্তারূপ এবং এই চিন্তা "চিন্তার চিন্তা"। ইহাই জগতের সত্যরূপ।

অসঙ্গ প্রত্যয় অসঙ্গ অসীম। ইহা স্বাবচ্ছিন্ন, সুতরাং অসীম। মানুষের মনঃকে সসীম বলা হয়—ইহা সত্য নহে। দার্শনিকের জ্ঞান—অন্তহীন চিন্তা—অসীমকে ধারণ করিতে সমর্থ। ইহা নিজেই অসীম—যে অসীমকে ধারণ করিতে ইহা সমর্থ, ইহা নিজেই সেই অসীম।

এই অসীম প্রত্যয়ের মধ্যে কি আছে? হেগেল বলেন, তাঁহার "লজিক"ই এই প্রত্যয়ের আধেয়, অর্থাৎ তিনি যে সকল ক্যাটেগরি তাঁহার "লজিকে" বর্ণনা করিয়াছেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ সেই সকল প্রত্যয়ই তাঁহার অসঙ্গ প্রত্যয়ের মধ্যে বর্ত্তমান—তাহারাই সম্মিলিত ভাবে অসঙ্গ প্রত্যয়। প্রত্যেক ক্যাটেগরি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল ক্যাটেগরির আধার।

অসঙ্গ প্রত্যয় সর্ব্বশেষ ক্যাটেগরি বলিয়া তাহার মধ্যে অন্যান্য সকল ক্যাটেগরিই বর্ত্তমান। অসঙ্গ প্রত্যয় বিষয়ী ও বিষয় উভয়ই। বিষয়ীরূপ অসঙ্গ প্রত্যয় লজিকের রূপ[1] অর্থবা পদ্ধতি, কেননা চিন্তার রূপই জ্ঞানের বিষয়ী দিক। ত্রিভঙ্গী নয় পদ্ধতিই হেগেলের লজিকের পদ্ধতি। সুতরাং বিষয়ী-রূপী অসঙ্গ প্রত্যয় ও ত্রিভঙ্গীনয় পদ্ধতি অভিন্ন। বিষয় রূপে অসঙ্গ প্রত্যয়ের আধেয় লজিকের ক্যাটেগরিগণ। *কিন্তু এই রূপ এবং এই আকার* বিভিন্ন নহে। সুতরাং ত্রিভঙ্গী নয় পদ্ধতি আধেয়ের উপর স্থাপিত একটা *বিসদৃশ 'রূপ'* (আকার) নহে, তাহা তাহার আধেয়ের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন।

(II)

প্রকৃতির দর্শন

নৈয়ায়িক প্রত্যয়, প্রকৃতি ও আত্মা, পর প্রত্যয়ের অন্তর্গত এই ত্রয়ীর মধ্যে প্রকৃতি "প্রতিনয়"। ইহা পর প্রত্যয়ের বিপরীত। পর প্রত্যয় প্রজ্ঞা; সুতরাং তাহার বিপরীত প্রকৃতি প্রজ্ঞাহীন। পরপ্রত্যয় সার্ব্বিক; কিন্তু প্রকৃতি বিশেষ। আত্মা সার্ব্বিক ও বিশেষের সমন্বয়—একত্ব-প্রাপ্ত এক বা ব্যক্তি।

পর প্রত্যয়ের মধ্যে বহু 'চিন্তা' সম্মিলিত; তেমনি প্রকৃতির মধ্যে বহু বস্তু সমাবিষ্ট। সর্ব্বাপেক্ষা শূন্যতম ক্যাটেগরি "সত্তা" হইতে ক্রমশঃ পূর্ণতর ক্যাটেগরি উদ্‌ভূত হইয়াছে। তেমনি প্রকৃতির দর্শনের আরম্ভ হইয়াছে শূন্যগর্ভ বস্তুত্ব-বর্জ্জিত আকারহীন "দেশ" হইতে। কোনও ভেদই ইহার মধ্যে নাই।

প্রকৃতির এক প্রান্তে "দেশ," অন্য প্রান্তে আত্মা। আত্মা ও প্রজ্ঞা অভিন্ন। প্রকৃতি আকারহীন শূন্য দেশ হইতে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়া অবশেষে আত্মাতে উপনীত হইয়া‌ছে। পর প্রত্যয় এইরূপে প্রকৃতিরূপে আপনা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া আত্মারূপে আপনাতে ফিরিয়া আসিয়াছে। পরপ্রত্যয় হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময়ে প্রকৃতির মধ্যে পর প্রত্যয়ের কোনও চিহ্নই ছিল না বলা যায়, তাহার মধ্যে প্রজ্ঞা সম্পূর্ণ চাপা পড়িয়াছিল। পরবর্ত্তী ক্রমগুলিতে প্রজ্ঞা ক্রমশঃ উদ্‌বুদ্ধ হইয়া অবশেষে জীবদেহে সংবিদে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন আত্মার উদ্বোধন আসন্ন।

"দেশ" চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। চিন্তা অন্তর্মুখী, অন্তরের দিকে বিস্তৃত। দেশের অংশ সকল পরস্পরের পার্শ্বে অবস্থিত, কিন্তু চিন্তার অংশসকল পরস্পরের বাহিরে অবস্থিত নহে। "চিন্তার অংশ"ই রূপক বর্ণনামাত্র। ক্যাটেগরিদিগকে যখন পরপ্রত্যয়ের অংশ রূপে বর্ণনা করা হয়, তখনও রূপক ভাষাই ব্যবহৃত হয়। অসত্তা সত্তার মধ্যেই অবস্থিত। সেই জন্য সত্তা হইতে তাহার উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়। পরবর্ত্তী যাবতীয় ক্যাটেগরি সত্তার মধ্যে বর্ত্তমান।

হেগেল কালিক অভিব্যক্তি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে প্রকৃতি নানা ক্রমের[2] শ্রেণী। এই ক্রমদিগের একটি হইতে তাহার পরবর্ত্তী ক্রমের উদ্ভব ন্যায়ের নিয়মে

---

[1] Form [2] Grades

[illegible]। তাহার উদ্ভব কোনও প্রাকৃতিক নিয়মের ফল নহে। জল হইতে উদ্ভিদ ও জীবের উৎপত্তি, এবং নিম্নতর জীব হইতে উচ্চতর জীবের উৎপত্তি হেগেল অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি যে অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নৈয়ায়িক অভিব্যক্তি। ইহার সহিত কালের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই অভিব্যক্তি যে কালেও সংঘটিত হইয়াছে, ডারুইন ও অন্যান্য অনেকে তাহা পরে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে কিছু আসে যায় না। হেগেল নৈয়ায়িক ক্রমে এই অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তিনি করিয়াছেন। কালের ক্রমে প্রকৃতির মধ্যে যে অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহাতে অভিব্যক্ত রূপদিগের মধ্যে উচ্চ নীচ সম্বন্ধের কোনও যুক্তি নাই। মানুষ যে পশু হইতে উচ্চতর জীব, তাহার মূল্য যে অধিকতর, তাহা বলিবার কোনও যুক্তি কালিক অভিব্যক্তির মধ্যে নাই। হেগেলের বর্ণিত অভিব্যক্তিতে সেই যুক্তি পাওয়া যায়। পরিবর্ত্তনকে বিকাশ বলা যায়, যদি তাহা কোনও উদ্দেশ্যের অভিমুখী হয়। উদ্দেশ্যাভিমুখিতা যদি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বিকাশ বলা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানে এই রূপ কোনও উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু হেগেলের মতে প্রজ্ঞার বাস্তবতা-প্রাপ্তিই অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে না হউক, বহুল পরিমাণে মানুষের মধ্যে সিদ্ধ হইয়াছে। প্রকৃতির যে রূপ যতটা এই উদ্দেশ্যের নিকটবর্ত্তী, ততটা তাহা উচ্চতর। হেগেলের দর্শনে অভিব্যক্তির প্রকৃত ভিত্তি পাওয়া যায়।

হেগেলের পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে, বর্ত্তমানে তাঁহার প্রকৃতির দর্শনের বিশেষ মূল্য নাই। সুতরাং তাহার বিবরণ অতি সংক্ষেপ প্রদত্ত হইল।

হেগেলের লজিকের বিষয় বিশুদ্ধ চিন্তা, বস্তু নহে। কিন্তু প্রকৃতির দর্শন ও আত্মার দর্শনের বিষয় স্থূল বস্তু। বস্তুহীন সত্তা, কারণ, দ্রব্য প্রভৃতি প্রকৃতির দর্শনের আলোচ্য বিষয় নহে। বাস্তব জড় বস্তু, উদ্ভিদ ও জন্তু তাহার আলোচ্য। আত্মার দর্শনেও জগতে বর্ত্তমান মানবমনঃ, মানবীয় প্রতিষ্ঠান, কলা, ধর্ম্ম ও দর্শন আলোচিত হইয়াছে। হেগেল ন্যায়ের যুক্তিদ্বারাই ইহাঁদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু লজিকে বর্ণিত ক্যাটেগরি হইতে বস্তুর উদ্ভাবন অসম্ভব ব্যাপার। চিন্তা হইতে চিন্তা ভিন্ন অন্য কিছুই উদ্ভূত হইতে পারে না। লজিকের এক ক্যাটেগরি হইতে অন্য ক্যাটেগরির উদ্ভব সম্ভবপর হইতে পারে, কেননা সকল ক্যাটেগরিই চিন্তামাত্র। কিন্তু লজিকের যুক্তিদ্বারা বস্তুর উদ্ভাবন অসম্ভব। অনেকে এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন।

এই আপত্তির উত্তরে বলা যায়, যে প্রকৃতির দর্শনেও হেগেল চিন্তার ক্ষেত্র অতিক্রম করেন নাই, চিন্তা হইতে বস্তুর উদ্ভাবন করেন নাই। প্রকৃতির দর্শন এবং আত্মার দর্শনে তিনি যাহার উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও চিন্তা। তিনি পর প্রত্যয় হইতে স্থূল প্রকৃতির উদ্ভাবন করেন নাই, প্রকৃতির চিন্তারূপের (প্রত্যয়ের) উদ্ভাবন করিয়াছেন। উদ্ভিদের চিন্তারূপ হইতে প্রাণীর চিন্তারূপের উদ্ভাবন করিয়াছেন। আত্মার দর্শনেও তিনি পরিবারের চিন্তারূপ হইতে অসামরিক সমাজের চিন্তারূপের এবং অসামরিক সমাজের চিন্তারূপ হইতে রাষ্ট্রের চিন্তারূপের উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, "পরিবারের" প্রত্যয়ের

মধ্যে "অসামরিক সমাজের" প্রত্যয় নিহিত আছে, যেমন "সত্তার" প্রত্যয়ের মধ্যে "অসত্তা"র প্রত্যয় নিহিত।

উপরি উক্ত ব্যাখ্যা সত্য হইলে বাস্তব জগতের ব্যাখ্যা হেগেলের মধ্যে নাই বলিতে হয়। প্রত্যয়-জগৎ হইতে বাস্তব জগতের উদ্ভব যখন অসম্ভব, তখন হেগেলের দর্শনে বাস্তব জগতের উৎপত্তি অব্যাখ্যাত রহিয়া গিয়াছে, বলিতে হয়। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে যাহাকে বাস্তব পদার্থ বলা হয়, তাহাও চিন্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। প্রত্যেক বস্তুই সার্ব্বিকের সমষ্টি মাত্র, এবং সার্ব্বিক ও চিন্তা অভিন্ন। এক খণ্ড কাগজের মধ্যে শ্বেতবর্ণ, বর্গাকার, মসৃণ, প্রভৃতি সার্ব্বিক ভিন্ন আর কিছুই নাই। সুতরাং যাবতীয় সার্ব্বিকের ব্যাখ্যা করিলেই জাগতিক যাবতীয় বস্তুর ব্যাখ্যা হয়।*

হেগেল প্রাকৃতিক জগৎকে পরপ্রত্যয়েরই বিষয়গত (বাহ্য) রূপ বলিয়াছেন, তাহাকে পর প্রত্যয় হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া গণ্য করেন নাই।

কিন্তু লজিক ও প্রকৃতির দর্শন উভয়েরই কারবার যদি কেবল "চিন্তার" সঙ্গেই হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? লজিকে অসঙ্গ প্রত্যয়কে সর্ব্বোচ্চ ক্যাটেগরি বলা হইয়াছে। প্রকৃতির দর্শনের সর্ব্বনিম্ন সম্প্রত্যয় (দেশ) কি এই অসঙ্গ প্রত্যয় হইতে উচ্চতর ক্যাটেগরি? প্রকৃতির দর্শন যদি লজিকের অনুবৃত্তি মাত্র হয়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এই আপত্তির উত্তর এই, যে প্রকৃতির দর্শন যে লজিকের অনুবৃত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। উভয়েই একই দর্শনের অন্তর্বর্ত্তী। কিন্তু প্রকৃতির দর্শন একটি স্বতন্ত্র বিভাগ। লজিকের মধ্যে "সারমণ্ডল" যেমন সত্তা মণ্ডল হইতে স্বতন্ত্র বিভাগ, সেই রূপ, সত্তা-মণ্ডলের অন্তর্গত ক্যাটেগরিগণও চিন্তা, সার মণ্ডলের ক্যাটেগরিগণও চিন্তা, কিন্তু দুই মণ্ডলে চিন্তার দুইরূপ প্রকাশিত। তেমনি প্রকৃতির দর্শনে চিন্তার এক নূতন রূপ প্রকাশিত। লজিকের ক্যাটেগরিগণ সকল বস্তুতেই প্রযোজ্য; কিন্তু প্রকৃতির দর্শনের সঙ্গে যে সকল সার্ব্বিকের সম্বন্ধ, তাহারা কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতেই প্রযোজ্য।

হেগেল প্রকৃতির মধ্যে তিনটি ক্রমের নির্দেশ করিয়াছেন:—(১) যান্ত্রিক বিজ্ঞান[1] (২) ভৌতিক বিজ্ঞান[2] এবং (৩) সংঘাত বিজ্ঞান[3]।

(১) যান্ত্রিকবিজ্ঞানে পরপ্রত্যয় আপনা হইতে বহির্গত হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত বাহ্য জগৎ রূপে আবির্ভূত হয়। এই জগৎ সম্পূর্ণ বাহ্য। দেশ, কাল ও জড় বস্তু লইয়া এই বাহ্য জগৎ। ইহার মধ্যে প্রত্যেক অংশ অন্যান্য অংশের বাহিরে অবস্থিত, এবং পরস্পরের প্রতি উদাসীন ও উদ্দেশ্যহীন রূপে প্রতীত হয়। তাহাদের মধ্যে একত্ব-বিধায়ক কিছু দৃষ্ট হয় না। কিন্তু দৃষ্ট না হইলেও একত্বের জন্য প্রচেষ্টা আছে। জগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে আকর্ষণ—মহাকর্ষণ—তাহার মধ্যে এই একত্বের জন্য প্রচেষ্টা পরিস্ফুট।

(২) ভৌতিক বিজ্ঞান। যান্ত্রিক বিজ্ঞানে জড় বস্তু সাধারণ ভাবে আলোচিত হয়।

---

* Vide Stace's Philosophy of Hegel PP. 297-300

[1] Mechanics [2] Physics [3] Organics

জগতের বিভিন্নতা তাহার আলোচ্য বিষয় নহে। জড় যে যে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত, তাহা যান্ত্রিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নহে। ভৌতিক বিজ্ঞানে জড়বস্তুর বিভিন্ন রূপ আলোচিত হয়। অ-জৈব প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ এবং বৈশিষ্ট্য-যুক্ত রূপ এবং প্রজাতির আলোচনা ইহার বিষয়।

(৩) সংঘাতবিজ্ঞানে আমরা অসংহত প্রকৃতি হইতে সংহত প্রকৃতিতে উপনীত হই। রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা এই অগ্রগতি সাধিত হয়। সংহত জড়ের ক্রম তিনটি:—(১) ভৌম সংঘাত[1] (২) উদ্ভিদ্ সংঘাত[2] এবং (৩) জান্তব সংঘাত[3]।

ধাতু-জগৎ ভৌম সংঘাতের অন্তর্গত। পৃথিবী জীবন্ত বস্তু নহে, কিন্তু ইহাকে প্রাণহীন জীবদেহের মত গণ্য করা যায়। উদ্ভিদ্-সংঘাতে বৃক্ষ জীবন্ত সংঘাত। ইহাতে জগতের বহুত্বকে শৃঙ্খলাবদ্ধ একত্বে পরিণত করিবার জন্য প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। কিন্তু উদ্ভিদের অংশসকলের একত্ব সুদৃঢ় নহে। তাহারা বহুল পরিমাণে পরস্পরের প্রতি উদাসীন। বৃক্ষের এক অংশদ্বারা অন্য অংশের কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

জৈব সংঘাতের মধ্যেই এই একত্ব পূর্ণরূপে দেখা যায়। জীব-জগতে পর প্রত্যয় সংবিদরূপে আপনার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং তাহা মানুষে "অহং"এ পরিণত হইয়াছে। জীব-জগৎই প্রকৃতির শেষরূপ, এবং ইহার মধ্য দিয়াই পর প্রত্যয় আত্মায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

(III)

আত্মার দর্শন

লজিকে হেগেল অসঙ্গ মনের বর্ণনা করিয়াছেন। জগতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ঈশ্বরের স্বরূপই এই অসঙ্গ মনঃ। এই মনঃ বস্তুত্বহীন। দেশ ও কালে ইহার প্রকাশ হয় নাই। প্রকৃতিতে এই বস্তুত্বহীন মনঃ তাহার বিপরীত রূপে (মনঃহীন) প্রকাশিত হইয়া চৈতন্যহীন স্থূল জড়ে পরিণত হইয়াছে। আত্মার দর্শনে হেগেল আত্মার স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তনের বর্ণনা করিয়াছেন।

পর প্রত্যয় ও প্রকৃতির সমন্বয় হইয়াছে আত্মার মধ্যে। নৈয়ায়িক প্রত্যয়, প্রকৃতি ও আত্মা, এই তিনটি পর প্রত্যয়ের অভিব্যক্তির প্রথম ত্রয়ী। মানুষ একদিকে প্রকৃতির অচ্ছেদ্য অংশ, প্রকৃতির নিয়মের অধীন, অন্যদিকে আত্মিক পদার্থ, প্রজ্ঞা ও সনাতন মনের জীবন্ত শরীরী রূপ। পর প্রত্যয় "গণ", প্রকৃতি "ব্যাবর্ত্তক গুণ"। পর প্রত্যয়ের সহিত প্রকৃতি যোগ করিলে প্রকৃতি-কর্ত্তৃক ব্যবচ্ছিন্ন পর প্রত্যয় বা প্রজ্ঞাই প্রজাতি মানবাত্মাতে[4] পরিণত হয়। যে বিশুদ্ধ পর প্রত্যয় আপনা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া প্রকৃতির মধ্যে বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, বিপরীতের সহিত দ্বন্দ্বের ফলে সমৃদ্ধ হইয়া তাহাই মানুষে ফিরিয়া

---

[1] Geological Organism [2] Vegetable Organism
[3] Animal Organism [4] Spirit of Man

আসিয়াছে। প্রজ্ঞাহীন প্রকৃতির মধ্যে পর প্রত্যয় অবরুদ্ধ ছিল। অবরোধ-মুক্ত পর প্রত্যয়ই স্বাধীন মানবাত্মা। পর প্রত্যয় যে যে ক্রমে প্রকৃতির মধ্যে নিবিড় অচেতনত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করে, প্রকৃতির দর্শনে হেগেল তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। অজৈব জড় বস্তু হইতে জীবদেহের অভিব্যক্তিতে পর প্রত্যয়ের স্বীয় স্বরূপে প্রত্যাবর্তনের আরম্ভ। আত্মার অভিব্যক্তিতে এই প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু এই প্রত্যাবর্তন দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য। একেবারেই আত্মা অসঙ্গ আত্মারূপে প্রকাশিত হয় না। অতি নিম্ন স্তরে এই বিকাশের আরম্ভ। ক্রমশঃ উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইয়া অসঙ্গ আত্মারূপে বিকাশিত হয়। আত্মার দর্শনে এই ক্রমবিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে।

আত্মার দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত: (১) বিষয়ী আত্মা, (২) বিষয় আত্মা এবং (৩) অসঙ্গ আত্মা। ব্যষ্টি মানবের মনঃ ও তাহার বিকাশ প্রথম ভাগে আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রতীতি, তৃষ্ণা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, কল্পনা; স্মৃতি প্রভৃতি ইহার অনুবিভাগ। সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতির মধ্যে অবলুপ্ত-কল্প প্রজ্ঞা আপনাতে কি প্রকারে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রদর্শনের জন্য মনের ক্রমবিকাশ প্রথম ভাগে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে আত্মার বিষয়ে[1] পরিণতি বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু এই বিষয় স্থূল জড় জগৎ নহে। পর প্রত্যয় আপনা হইতে বহির্গত হইয়া জড় প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছিল। মানবাত্মা যে বিষয়-জগৎ সৃষ্টি করে, তাহা এই জগৎ নহে, তাহা মানুষের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানাবলী—আইন, সুনীতি এবং রাষ্ট্র, এই সকল প্রতিষ্ঠান। প্রস্তরাদির মতই এই সকল প্রতিষ্ঠান বাহ্য পদার্থ। কিন্তু যে অহমের তাহারা বাহ্য, তাহার সহিত তাহারা অভিন্ন। তাহারা অহমের বাহ্য রূপ। কিন্তু সে অহং ব্যষ্টি অহং নহে প্রত্যেক অহমের মধ্যে যে সার্বিক অহং আছে, যে সার্বিক প্রজ্ঞা আছে, তাহা তাহারই বাহ্য প্রকাশ। ধর্মনীতি ও রাষ্ট্রনীতি এই ভাগের অন্তর্গত।

তৃতীয় ভাগে কলা, ধর্ম এবং দর্শনে মানবাত্মার অভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে। সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান, ধর্মের দর্শন এবং দর্শনের দর্শন এই ভাগের অন্তর্গত।

আত্মার এই অভিব্যক্তি কালিক অভিব্যক্তি নহে, নৈয়ায়িক অভিব্যক্তি। এক ক্রম হইতে অন্য ক্রম উদ্ভূত হইয়াছে ন্যায়ের ক্রমে।

(১)

বিষয়ী আত্মা

বিষয়ী আত্মার বর্ণনা হেগেল তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—(ক) নৃ-তত্ত্ব-বিজ্ঞান, (খ) প্রতিভাস-বিজ্ঞান এবং (গ) মনোবিজ্ঞান। প্রথমভাগের আলোচ্য বিষয় জীবাত্মা, দ্বিতীয় ভাগের সংবিদ, এবং তৃতীয় ভাগের মনঃ।

---

[1] Objective Spirit

(ক) নৃতত্ত্ববিজ্ঞান—জীবাত্মা

Soul শব্দ হেগেল যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাকে ঠিক জীবাত্মা বলা যায় না। মনের সর্ব্বনিম্ন যে অবস্থার ধারণা করা সম্ভবপর, ইহা সেই অবস্থা। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আবির্ভাব হয় নাই। ইহা অস্পষ্ট ক্ষীণ চৈতন্যাবস্থামাত্র, দেহ ও প্রকৃতির দাসত্বে বদ্ধ। ইতর জন্তুর অবস্থার সহিত ইহার পার্থক্য করা কঠিন। হেগেল এই জীবাত্মার তিনটি ক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) প্রাকৃতিক, (২) অনুভূতিমান, এবং (২) বাস্তব। প্রাকৃতিক জীবাত্মার[1] মধ্যে কোনও স্বগত ভেদ নাই; বাহিরেও অন্যান্য বস্তুর সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। সার-ক্যাটেগরি ইহাতে প্রযোজ্য নহে। কেবল 'সত্তা' ক্যাটেগরিই ইহতে প্রযোজ্য। লজিকের প্রথম ক্যাটেগরি 'সত্তা' যেমন শূন্য চিন্তামাত্র, এবং প্রকৃতির প্রথম ক্রম "দেশ" বাহ্য শূন্যতামাত্র, তেমনি আত্মার প্রথম অবস্থাও প্রায় শূন্যমাত্র। কিন্তু ইহাই প্রকৃতির সর্ব্বোচ্চক্রম—আত্মার সর্ব্বনিম্ন ক্রম। ইহার জীবন প্রকৃতির জীবনেরই অংশ। এবং ইহার ধর্ম্ম ইহার দেহের ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন। বাহ্য দ্রব্যের জ্ঞান ইহার নাই। দেহ হইতে ইহার পার্থক্যও ইহার অজ্ঞাত। বাহ্য জগৎ-কর্ত্তৃক ইহার মধ্যে যে পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয়, তাহাকে ইহা বাহ্যদ্রব্য-কর্ত্তৃক উৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে না। ইহার ধর্ম্মদিগকে হেগেল প্রাকৃতিক ধর্ম্ম[2] বলিয়াছেন, এবং এই ভাবে তাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন :—

(১) প্রাকৃতিক জীবাত্মা পৃথিবীর সাধারণ জীবনের অংশভাক্। জল বায়ুর ভেদ, ঋতুভেদ এবং দিনরাত্রির ভেদ ইহার অনুভব-গম্য। (২) পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অবস্থার পার্থক্যবশতঃ বিভিন্ন জাতির এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি হয়। (৩) বিভিন্ন জাতিতে বিভাগ হইতে ব্যক্তিগত পার্থক্য—মনের প্রকৃতি, চরিত্র, ও মানসিক শক্তির উদ্ভব হয়।

প্রাকৃতিক আত্মা জ্ঞানের সর্ব্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত। কিন্তু জ্ঞানের নিম্নতম স্তরেও সাদৃশ্য ও পার্থক্যবোধ আছে। মনের ক্রিয়া-বর্জ্জিত সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় সংবেদনের কল্পনাও করা যায় না। প্রাকৃতিক আত্মার মধ্যে ইহাও নাই। সুতরাং মানুষের মধ্যে যে ইহার অস্তিত্ব নাই, তাহা বলা যায়। এমিবার মধ্যেও ইহার অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ। প্রাকৃতিক আত্মা যে স্বতন্ত্র ভাবে আছে, তাহা হেগেল বলেন না। ইহা কল্পনামাত্র। তবুও প্রকৃতির সহিত মানবীয় প্রকৃতির সমবেদনা হইতে এই প্রকার একটা কিছুর অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। সভ্য মানুষেরও সময়ে সময়ে যে মানসিক সমতার বিচ্যুতি ঘটে, প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থার সহিত সহানুভূতির ফলে মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাতে এই প্রাকৃতিক আত্মার আভাস পাওয়া যায়। অসভ্যদিগের মধ্যে প্রকৃতির জীবনের সহিত এই সমবেদনা স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হয়।

প্রাকৃতিক আত্মার প্রাকৃতিক ধর্ম্মগুলি ত্রিবিধ পরিণামের অধীন :— (১) শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য, (২) যৌন পরিণাম এবং (৩) নিদ্রা ও জাগরণ। আদিতে প্রাকৃতিক

---

[1] Natural Soul [2] Physical Qualities

আত্মার মধ্যে স্ব-গত কোনও ভেদ না থাকিলেও, ক্রমে পরিবেশের ক্রিয়াজনিত ফলের পার্থক্য উপলব্ধ হয়। তখন ইহা নিদ্রিত অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়। আবার এই পার্থক্য-বোধ বিদূরিত হইয়া আদিম শূন্যতার যখন আবির্ভাব হয়, সেই অবস্থা নিদ্রা।

আত্মা ও তাহার মধ্যে প্রকৃতির প্রভাবোৎপন্ন ফলের ব্যাবৃত্তি হইতে সংবেদন উদ্‌ভূত হয়। তখন আত্মা হইতে তাহার আধেয় স্বতন্ত্র বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেও, তখনও সেই ফল আত্মার বহিঃস্থ রূপে পরিজ্ঞাত হয় না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি আত্মা হইতে ভিন্ন হইলেও, আত্মার মধ্যগত। যখন পার্থক্যের অনুভূতি জাগে, তখন "অনুভূতিমান" আত্মার উদ্‌ভব হয়।

অনুভূতিমান আত্মার তিন অবস্থা: (১) অব্যবহিত, (২) স্বানুভূতি ও (৩) অভ্যাস। প্রথম অবস্থায় আত্মার নিজের সক্রিয়তার জ্ঞান নাই। সংবেদন হইতে তাহার পার্থক্যের জ্ঞান থাকিলেও, অহমের স্পষ্ট জ্ঞান নাই। এই জ্ঞান বর্ত্তমান অন্য এক আত্মার মধ্যে। মাতৃগর্ভস্থ শিশুর যে অনুভূতি, তাহা তাহার মাতারই অনুভূতি; মাতার অনুভূতি রূপে সংক্রামিত হয়। Hypnosis (কৃত্রিমনিদ্রা) এ যাহাকে নিদ্রাভিভূত করা হয়, তাহার আত্মা প্রযোক্তার আত্মার সহিত এক হইয়া যায়, এবং তাহার মানসিক ভাব প্রাপ্ত হয়। স্বানুভূতিমান আত্মা তাহার সংবেদন ও অনুভূতি হইতে আপনাকে সুস্পষ্ট ভাবে পৃথক বলিয়া বোধ করে। পৃথক বোধ করিলেও ইহাদিগকে আপনারই সংবেদন ও অনুভূতি বলিয়া জানে। ইহার মধ্যে আত্মার অনুভূতি[1] বর্ত্তমান।

উপরে বর্ণিত ভিন্ন ভিন্ন সংবেদন ও অনুভূতির উপর আত্মার সার্ব্বিকতার প্রয়োগ হইতে—আত্মার উভয় ভাগের সংযোগ হইতে—যে একত্বের উদ্‌ভব হয়, তাহাই বাস্তব আত্মা; বাস্তব আত্মা তাহার সংবেদন ও অনুভূতি হইতে আপনাকে অভিন্ন মনে করে। অন্তর ও বাহিরের একত্বকে, সার ও তাহার প্রকাশের একত্বকে, হেগেল "বাস্তব" নাম দিয়াছেন। এই জন্যই বিষয়ী ও তাহার সংবেদন ও অনুভূতির একত্বকে "বাস্তব আত্মা" বলিয়াছেন।

জীবাত্মার পরবর্ত্তী বিকাশ ইহার পরে বিবৃত হইয়াছে।

(খ)

প্রতিভাস-বিজ্ঞান

সংবিদ

লাইবনিট্‌জের মনাদের মধ্যে জাগতিক যাবতীয় ঘটনাই বর্ত্তমান, কিন্তু মনাদ তাহাদিগকে আপনার বাহ্য বলিয়া মনে করে না। মনাদের নিকট বাহ্য জগতের অস্তিত্ব নাই। এ পর্য্যন্ত জীবাত্মার যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই মনাদের অবস্থা, তাহার অন্তরস্থ সংবেদন ও অনুভূতিকে বাহ্য কিছু বলিয়া তাহার জ্ঞান নাই। সংবিদে আত্মার

[1] Self feeling

বাহ্য বস্তুর জ্ঞান—বাহ্য বস্তুরূপে সংবেদনের জ্ঞান—বর্ত্তমান। বিষয়ী আত্মা বিষয়ী ও বিষয়, এই দুই অংশে বিভক্ত হয়, এবং বিষয় বিষয়ীর বাহিরে অবস্থিত বলিয়া গণ্য হয়। ইহাই সংবিদ। সংবিদের তিন ক্রম: (১) ঐন্দ্রিয়িক (আক্ষিক)* সংবিদ, (২) প্রত্যক্ষ প্রতীতি, ও (৩) বুদ্ধি।

অব্যবহিততা ঐন্দ্রিয়িক সংবিদের প্রধান লক্ষণ। সংবিদের বিষয় অব্যবহিত ভাবে সংবিদের সম্মুখে উপস্থিত, এবং বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে সম্বন্ধও অব্যবহিত, তাহাদের মধ্যে তৃতীয় কিছু নাই। এই সংবিদে বিষয়ী বিষয়ের অস্তিত্বই কেবল অবগত হয়, ইহাতে কেবল সত্তা ক্যাটেগরির প্রয়োগ করে। বিষয়ের মধ্যগত কোনও ভেদ অথবা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যগত সম্বন্ধ এই সংবিদ অবগত নহে। সুতরাং এতাদৃশ সংবিদের যাহা বিষয়, তাহা বিশুদ্ধ সংবেদনমাত্র, জ্ঞানের বিশুদ্ধ উপাদান মাত্র। এতাদৃশ সংবিদ স্বতন্ত্ররূপে মানুষে বর্ত্তমান নাই। ইহা কল্পনা মাত্র।

ঐন্দ্রিয়িক সংবিদের সহিত মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়া যুক্ত হইলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব হয়। এই জ্ঞান অব্যবহিত নহে। সংবেদনের সহিত সার্ব্বিকতা যুক্ত হইবার ফলে প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য সংবেদনদিগের সমন্বয়ন[1] এবং ব্যাবর্ত্তনের[2] প্রয়োজন। বস্তু যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আবির্ভূত হয়, তখন বিবিধ গুণের আধার রূপে প্রতীত হয়। এই সকল গুণই সার্ব্বিক। সার্ব্বিকের সংবেদনের উপর প্রয়োগ মনেরই কার্য্য।

হেগেল বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মধ্যে পার্থক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বুদ্ধি জগতের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বহুত্বকে প্রতিভাস বলিয়া এক ধারে রক্ষা করে, এবং সার্ব্বিককেই প্রকৃত সত্তাবান বলিয়া অন্য ধারে রক্ষা করে। "নিয়মের রাজ্য" সার্ব্বিকদিগের অতীন্দ্রিয় জগৎই বুদ্ধির নিকট সার বস্তু, ইন্দ্রিয়-জগৎ প্রতিভাসমাত্র। একমাত্র মহাকর্ষণের নিয়ম ইন্দ্রিয় জগতে বহু রূপে প্রকাশিত হয়; তড়িতের নিয়ম বহুবিধ বৈদ্যুতিক ব্যাপারে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধির নিকট মহাকর্ষণ ও তড়িত সৎ, তাহাদের বিভিন্ন প্রকাশ প্রতিভাস।

স্ব-সংবিদ

সংবিদে বিষয় বিষয়ী হইতে স্বতন্ত্ররূপে প্রতীত হইয়াছিল। স্ব-সংবিদে বিষয় বিষয় হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। বিষয় যে বিশুদ্ধ সার্ব্বিক ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সার্ব্বিক গণ চিন্তা মাত্র। সুতরাং বিষয়ও চিন্তা, এবং চিন্তাস্বরূপ বিষয়ী এবং চিন্তাস্বরূপ বিষয় অভিন্ন। সংবিদ যখন এই অভিন্নতা বুঝিতে পারে, তখন স্ব-সংবিদ পদ-বাচ্য হয়।

বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-জগতের বহুত্বকে প্রতিভাস এবং সার্ব্বিকের একত্বকে সৎ বলিয়া গণ্য

* অক্ষ=ইন্দ্রিয়। অক্ষজ=ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন।

[1] Assimilation [2] Differentiation

করিয়া দুইটি বিভিন্ন জগতের কল্পনা করে। কিন্তু এই ভেদ মিথ্যা। কেননা বিশিষ্ট আবের হইতে স্বতন্ত্রীকৃত "এক" অথবা সার্বিক শূন্যমাত্র, এবং একত্ব-বিচ্যুত ও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বহুও অন্ধ, এবং দুর্বোধ্য বিশৃঙ্খল সমবায় মাত্র। উভয়ের কেহই অন্য হইতে স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পারে না। সুতরাং বিষয়কে "একে"র মধ্যে অবস্থিত "বহু" অথবা বহুতে বিভক্ত এক বলিতে হয়। কিন্তু বিশেষে বিভক্ত সার্বিক—যে এক আপনাকে আপনা হইতে ভিন্নরূপে স্থাপিত করিয়াও সেই ভেদের মধ্যে অভিন্ন থাকিয়া যায়, তাহা—ও নোশান এক। নোশান (সম্প্রত্যয়) কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই বিষয়িগত। সুতরাং বিষয়ও বিষয়িগত। ইহার অর্থ এই, যে বিষয়ী বুঝিতে পারে, যে বিষয়ের মধ্যে যাহা সত্য, তাহা সে নিজে। বিষয়ের মধ্যে বিষয়ী তাহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। ইহাই স্ব-সংবিদ। কিন্তু বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে এই অভেদ ব্যষ্টি মনের সহিত বিষয়ের অভেদ নহে। স্ব-সংবিদে বিষয়ী যখন বিষয়ের সহিত তাহার অভেদ বুঝিতে পারে, তখন সার্বিক মনের সহিত বিষয়ের অভেদই দৃষ্ট হয়; বিষয়ের মধ্যে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা সার্বিক মনঃ।

স্ব-সংবিদের তিন ক্রমঃ—(১) তৃষ্ণা অথবা কামনা; (২) অভিজ্ঞাতা স্ব-সংবিদ[1] এবং (৩) সার্বিক স্ব-সংবিদ।

স্ব-সংবিদে বিষয়ী আপনাকে বিষয় হইতে অভিন্ন মনে করিলেও, বিষয় ভিন্নই থাকে। এই ভেদ দূরীকরণের জন্য স্ব-সংবিদের প্রচেষ্টাই তৃষ্ণা।[2] খাদ্য স্বতন্ত্র বস্তুরূপে বিষয়ীর সম্মুখেই থাকে। এই ভেদ দূরীকরণের চেষ্টাই ক্ষুধা। অন্যান্য কামনা-সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

স্ব-সংবিদ যখন অন্য স্ব-সংবিদের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তখন তাহার নাম অভিজ্ঞাতা স্ব-সংবিদ। হেগেল বলিয়াছেন, যে বিষয়ীর কামনার যাহা বিষয়, সেই প্রাকৃতিক বস্তুই সংবিদ-সম্পন্ন অন্য এক অহমে রূপান্তরিত হয়। কামনার বিষয়ের মধ্যে অন্য এক অহমের প্রত্যয় গূঢ়ভাবে থাকে। কি ভাবে এই রূপান্তর সাধিত হয়, হেগেল বিস্তারিত ভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

সার্বিক স্ব-সংবিদ

স্ব-সংবিদ আপনাকেই এক মাত্র স্বাধীন বলিয়া মনে করে, অন্য স্ব-সংবিদকে আপনা হইতে অভিন্ন গণ্য করিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্যের বিলোপ সাধন করে। দাসের সংবিদ স্ব-সংবিদ নহে। কেননা তাহার স্বাধীনতা নাই। আমা হইতে স্বতন্ত্র কেহ নাই, অন্য যাহা কিছু সকলই আমি, এই বোধই স্বাধীনতা, ইহাই স্ব-সংবিদ। দাসের এই বোধ নাই। তাহার বিষয় কেবল তাহার কামনার বস্তু, সেই বস্তুও সে প্রভুর ভোগের জন্যই প্রস্তুত করে—তাহার প্রভুর স্ব-সংবিদ্ তাহার স্বাধীনতার বিলোপ করিয়াই নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করে। সুতরাং তাহার প্রভুর স্বাধীনতা তাহার উপর নির্ভর করে। আবার দাস প্রভুর জন্য দ্রব্য

[1] Self Consciousness Recognitive [2] Apeptite or Desire

প্রস্তুত করিতে আপনাকেই সেই বস্তুর মধ্যে স্থাপিত করে। দাসের ইচ্ছা সেই বস্তুকে পরিবর্ত্তিত করে, এবং তাহার স্বাধীনতার বিলোপ করিয়া সে নিজে স্ব-সংবিদ লাভ করে। কেননা মনের মধ্যে বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যই প্রকৃত সংবিদ, এবং এই স্বাতন্ত্র্যের যখন বিলোপ হয় (বিষয়ী বিষয়কে আপনা হইতে অভিন্ন মনে করে) তখনই স্ব-সংবিদের বিকাশ হয়। দাস তাহার বিষয়ের মধ্যে আপনাকে প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার মধ্যে আপনাকেই দর্শন করে এবং স্ব-সংবিদ প্রাপ্ত হয়।

দাসের প্রভু যখন দেখিতে পায়, যে তাহার স্বাধীনতা দাসের উপর নির্ভর করে, তখন তাহাকে অন্য একটি স্ব সংবিদ বলিয়া স্বীকার করে। দাসও আপনাকে স্ব-সংবিদ বলিয়া জানিতে পারে। অহং তখন আপনাকেই বিশ্বে একমাত্র স্ব সংবিদ বলিয়া মনে না করিয়া অন্যান্য অহং দিগকেও স্ব-সংবিদ বলিয়া স্বীকার করে! যাবতীয় অহমের পরস্পরকে স্ব-সংবিদ বলিয়া স্বীকার করাই সার্ব্বিক স্ব-সংবিদ।

প্রজ্ঞা

সার্ব্বিক স্ব-সংবিদে উত্তীর্ণ হইয়া অহং অন্যান্য অহং এর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে। কিন্তু আমার স্ব-সংবিদের নিকট, অন্য অহং অন্য একটি স্ব-সংবিদ। সুতরাং তাহা (অন্য অহং) "আমিই", অন্য অহং আমার অহমের বিষয়। অন্য অহংকে যখন দেখি, তখন আমার অহংকেই দেখি। আমার বিষয় প্রথমতঃ অন্য একটি স্বতন্ত্র বস্তু। দ্বিতীয়তঃ ঐ বিষয় আমিই—অন্য কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নহে। বিষয়ী আপনার সহিত বিষয়ের পার্থক্য স্বীকার করিয়াও বলে, যে এ পার্থক্য পার্থক্যই নহে, এ পার্থক্য আমার নিজের মধ্যগত। বিষয় বিষয়ীর সম্মুখে অবস্থিত, কিন্তু বিষয়ী তাহাকে আপনার মধ্যেই রক্ষা করে। ইহাই প্রজ্ঞার দৃষ্টি। ভেদ স্বীকার করিয়াও, ভেদের মধ্যে একত্ব-দর্শনই প্রজ্ঞা। বিপরীত পদার্থের অভেদই প্রজ্ঞা-তত্ত্ব। বিষয় বিষয়ী হইতে ভিন্ন হইয়াও তাহার সহিত অভিন্ন।

সংবিদ, স্ব-সংবিদ এবং প্রজ্ঞা—এই ত্রয়ীর তৃতীয় পদ প্রজ্ঞা। সংবিদে বিষয় স্বতন্ত্র; স্ব-সংবিদে বিষয় বিষয়ী হইতে অভিন্ন। প্রজ্ঞা এই উভয় দৃষ্টির সমন্বয় সাধন করে। প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে বিষয় বিষয়ী হইতে স্বতন্ত্রও বটে, অভিন্ন ও বটে। ইহা ভেদের মধ্যে অভেদ

(গ)

মনোবিজ্ঞান

হেগেলের নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের জীবাত্মা অব্যক্ত বিষয়ী; তাহার মধ্যে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ নাই। তাহা স্বগত বিষয়ী। প্রতিভাস-বিজ্ঞানে সংবিদ বিষয়ী ও বিষয় রূপে দুই ভাগে বিভক্ত। মনোবিজ্ঞানের বিষয় যে মনঃ, তাহা বিষয় হইতে বিষয়ীর আপনাতে প্রত্যাবর্ত্তন। বিষয়ী যখন বিষয়কে আপনা হইতে অভিন্ন মনে করে, বিষয়ীর তৎকালিক

অবস্থাই মনোবিজ্ঞানের মনঃ[1]। হেগেল মনঃকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) জ্ঞান মূলক মনঃ[2], (২) কর্ম্মাভিমুখী মনঃ[3] এবং (৩) স্বাধীন মনঃ[4]।

জ্ঞানমূলক মনের তিনরূপ :—(১) অব্যবহিত জ্ঞান[5] (২) প্রতিরূপক জ্ঞান[6] ও (৩) চিন্তা[7] অব্যবহিত জ্ঞানে বিচার[8] অস্পষ্ট ভাবে বর্ত্তমান। কোনও বিষয়ের কারণ-জ্ঞান-বর্জিত অনুভূতিই অব্যবহিত জ্ঞান; কোনও তথ্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞানই এই জ্ঞান। কর্ত্তব্য জ্ঞান, ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রভৃতি এই জ্ঞানের অন্তর্গত। কোনও যুক্তি-দ্বারা এই জ্ঞান লাভ আমরা করি না। ইহা সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর জ্ঞান। ইহার মধ্যে মনোযোগ প্রথম আবির্ভূত হয়। অব্যবহিত জ্ঞান মনের আভ্যন্তরীণ অনুভূতি, কিন্তু বহির্মুখী—আভ্যন্তরীণ অনুভূতির দেশ ও কালে বাহ্য সত্তা-রূপে প্রকাশ।

অব্যবহিত জ্ঞান যখন তাহার বাহ্যতা হইতে মুক্ত হয়, এবং অন্তর্ম্মুখী হয়, তখনই তাহা প্রতিরূপক জ্ঞানে পরিণত হয়। প্রতিরূপক জ্ঞানের তিন ক্রমঃ :—(১) স্মরণ, (২) কল্পনা ও (৩) স্মৃতি। স্মরণে যাহা বাহ্য কাল ও দেশের মধ্যে ছিল, তাহা অভ্যন্তরীণ কাল ও দেশের অন্তর্গত হয়। তখন তাহা হয় প্রতিবিম্ব। ফুল বাহ্য দেশে অবস্থিত, কিন্তু তাহার মানবিক প্রতিবিম্ব, মনের মধ্যে যে দেশে অবস্থিত, তাহা অভ্যন্তরীণ ও কাল্পনিক। ইহাই স্মরণ। প্রতিবিম্ব ক্ষণস্থায়ী হইলেও ইহার পুনরাবির্ভাব হয়। ইহা অবচেতন মনে রক্ষিত হয়; যে কোনও সময়েই ইহার পুনরাবিভাব সম্ভবপর। অবচেতন মনঃ হইতে অনবরত এতাদৃশ প্রতিবিম্ব-ধারা প্রবাহিত হয়। ইহা মনেরই সৃষ্টি। এই সৃষ্টিই কল্পনা।

কোনও বস্তুর যে প্রতিবিম্ব মনে আবির্ভূত হয়, তাহা অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-বর্জিত। এই জন্য তাহা তাহার বৈশিষ্ট্য হইতে বিচ্যুত হইয়া সার্ব্বিকত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা একটি সাধারণ (সেই শ্রেণীভুক্ত সর্ব্ব-বস্তু-সাধারণ) প্রতিবিম্বে পরিণত হইয়া অবচেতন মনে রক্ষিত হয়। যখন কোনও নূতন সংবেদন উপস্থিত হয়, তখন তাহা তাহার উপযোগী সার্ব্বিক প্রতিবিম্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহাই স্মরণ এবং ইহা হইতেই পূর্ব্বোক্ত প্রতিবিম্ব ধারার উৎপত্তি হয়! এই সমস্ত প্রতিবিম্ব প্রতিরূপক এবং সার্ব্বিক। যখন কোনও সিংহের প্রতিবিম্ব আবির্ভূত হয়, তাহা যাবতীয় সিংহের চিহ্নরূপেই আবির্ভূত হয়। ইহা হইতেই ভাষার উদ্ভব হয়।

ভাষার প্রত্যেক শব্দ এক একটি ধ্বন্যাত্মক চিহ্ন। তাহা বাহ্য জগতে অবস্থিত। কিন্তু সংবিদে গৃহীত হইয়া তাহা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পরিণত হয়—একটি মূর্ত্তিতে পরিণত হয়। ইহা তখন যে সার্ব্বিকের প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহার সহিত মিলিয়া যায়, এবং পূর্ব্বে প্রতিবিম্বদ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইত, তাহাই সম্পাদন করে; তখন প্রতিবিম্ব

[1] Mind [2] Theoretical Mind [3] Practical Mind
[4] Free Mind [5] Intuition [6] Representation
[7] Thinking [8] Judgment

অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপে নামের দ্বারা যখন আমরা চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হই, তখন স্মৃতির পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। "সিংহ" এই নামটি পাইলে, তখন সিংহের মানসিক প্রতিরূপের প্রয়োজন হয় না। তখন শুধু এই নামের সাহায্যেই চিন্তা করা সম্ভবপর হয়।

নাম ব্যতীত চিন্তা হয় না। প্রতিরূপ হইতে চিন্তার উদ্ভব স্মৃতি দ্বারাই সাধিত হয়। যখন প্রতিরূপ বিলুপ্ত হয়, তখন যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই চিন্তা। নামের অর্থের বোধ যদি থাকে, তাহা হইলে তাহাই চিন্তার পক্ষে যথেষ্ট। প্রতিরূপের সাহায্য ব্যতীত নামের অর্থবোধই চিন্তা। কিন্তু চিন্তার সময় প্রতিরূপ যে আবির্ভূত হয় না, তাহা নহে। অনেক সময় চিন্তার সহিত বস্তুর প্রতিরূপ থাকে, কিন্তু সেই প্রতিরূপের আবির্ভাবই চিন্তা নহে। প্রতিরূপ চিন্তার সহযোগী হইতে পারে, কিন্তু তাহা চিন্তা নহে। চিন্তা নিজে প্রতিরূপ-হীন।

নাম যে সার্ব্বিকের বাচক, তাহার সহিত বিশেষ প্রতিরূপের মিলনই চিন্তা। এই মিলনে বিশেষের প্রতিরূপ অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তাহার বিশিস্টতা অথবা অব্যবহিতত্ব চিন্তাব মধ্যে থাকিয়া যায়। এই অব্যবহিতের সহিত সার্ব্বিকের একত্বই চিন্তা। অব্যবহিতত্ব আর সত্তা এক। যাহা নির্দ্দিস্ট স্থানে অবস্থিত বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই অব্যবহিত। তাহাই একটা বস্তু। সুতরাং সার্ব্বিক এবং সত্তার একত্বই চিন্তা, সত্তাই বিষয়। সুতরাং চিন্তার বিশেষত্ব এই, যে চিন্তা ও সত্তার মধ্যে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে ভেদ, তাহা লুপ্ত হয়। যাহার চিন্তা করা যায়, তাহা আছে বলিয়া চিন্তায় প্রতীত হয়, এবং যাহা আছে, তাহা চিন্তার বিষয় বলিয়াই তাহার অস্তিত্ব। সত্তা এবং চিন্তার একত্বই চিন্তা।

চিন্তার তিন রূপঃ (১) বুদ্ধি (২) বিচার এবং (৩) প্রজ্ঞা।

কর্ম্মাভিমুখী মনঃ

চিন্তা যখন তাহার আধেয়কে আপনা হইতে অভিন্ন, আপনাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া জানিতে পারে, তখন জগৎকে স্বতন্ত্র, স্বপ্রতিষ্ঠ, ও আপনার কর্ত্তৃত্ব-মুক্ত মনে করে না। বরং ইহাকে আপনার সৃস্ট, আপনাদ্বারা রূপায়িত বলিয়া গণ্য করে। বিষয়ী যখন তাহাকে রূপান্তরিত করে, তখন তাহাকে কর্ম্মাভিমুখী মনঃ অথবা ইচ্ছা বলে।

বিষয়ী ও তাহার আধেয়ের মধ্যে যখন সামঞ্জস্য থাকে, তখন সুখের অনুভূতি এবং যখন অসামঞ্জস্য, তখন দুঃখের অনুভূতি হয়। এই অনুভূতি হইতে স্বতঃই একটা ক্ষীণ কর্ম্মাভিমুখিতা উদ্ভূত হয়। এই কর্ম্মাভিমুখিতাই কর্ম্মাভিমুখী অনুভূতি।[1] কর্ম্মাভিমুখী অনুভূতি প্রবলতর হইয়া প্রবৃত্তিবেগে[2] পরিণত হয়। আবার বুদ্ধি যখন অন্যান্য প্রবৃত্তি বর্জ্জন করিয়া একমাত্র প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকে বলে বলবতী প্রবৃত্তি। ক্যাণ্ট বলিয়াছিলেন, নৈতিক জীবনে প্রবৃত্তিবেগের স্থান নাই। কর্ত্তব্যবোধেই কর্ত্তব্য

---

[1] Practical feeliug. [2] Impulse.

করিতে হইবে। কর্ত্তব্যের প্রতি অনুরাগ-বশতঃ যদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহার কোনও নৈতিক মূল্য নাই। হেগেলের মতে প্রবৃত্তিবেগ ও বলবতী প্রবৃত্তিই সমস্ত কর্ম্মের মূল। কোনও মহৎ কর্ম্মই বলবতী প্রবৃত্তি ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। ক্যাণ্ট মনঃকে বিভিন্ন বৃত্তিতে[1] বিভক্ত করিয়াছিলেন, বলিয়াই তাঁহার এই ভ্রম হইয়াছিল। প্রবৃত্তিবেগের মধ্যে কর্ম্মাভিমুখী প্রজ্ঞা বর্ত্তমান।

ইচ্ছা এক, কিন্তু প্রবৃত্তি বহু। ইচ্ছা প্রবৃত্তিদিগের উর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের মধ্যে একটি বাছিয়া লয়। ইহাই ইচ্ছার স্বরূপ। একটিমাত্র প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিতে ইচ্ছা তৃপ্ত হয় না; একটির পরে একটির চরিতার্থতার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু তৃপ্তি তাহার কখনও হয় না। সেইজন্য ইচ্ছা সার্ব্বিক তৃপ্তি অনুসন্ধান করে। এই সার্ব্বিক তৃপ্তিই পরিপূর্ণ সুখ।

স্বাধীন মনঃ

বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া ইচ্ছা সার্ব্বিক তৃপ্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। সার্ব্বিক উদ্দেশ্যের অনুসরণ হইতেই সার্ব্বিক তৃপ্তি সম্ভবপর। ইচ্ছা নিজেই সার্ব্বিক। সুতরাং ইচ্ছা আপনাকেই উদ্দেশ্য-রূপে গ্রহণ করে। ইচ্ছার জগতে প্রকাশেই তাহার স্বাধীনতা, তাহাই স্বাধীন মনঃ। ইচ্ছা নিজেই তাহার বিষয়—তাহার উদ্দেশ্য। ইহাই স্বাধীন ইচ্ছা। প্রবৃত্তির অনুসন্ধানে ইচ্ছা স্বাধীন নহে। কেননা সেখানে তাহার প্রবৃত্তি উদ্দেশ্য,—তাহা হইতে ভিন্ন। কিন্তু স্বাধীন মনের বিষয় তাহা হইতে অভিন্ন। স্বাধীন মনঃ সুতরাং স্বাবচ্ছিন্ন, স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত, ইহাই স্বাধীনতা।

(২)

বিষয় আত্মা

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিষয়ী আত্মার জীবাত্মা, সংবিদ এবং মনঃ রূপে অভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে, এবং মনের স্বাধীনতার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মনের এই স্বাধীনতা হইতে বিষয় আত্মার উদ্ভব!

বিষয়াত্মা ও প্রকৃতি এক পদার্থ নহে। সমগ্র জগৎই আত্মার ব্যক্ত রূপ—তাহা জ্ঞানের বিষয়! আত্মাই জগৎরূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত। প্রকৃতির আবির্ভাব পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। আত্মা যে সকল প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছে—আইন, কর্ম্মনীতি এবং সমাজ-নীতি প্রভৃতি, এই অধ্যায়ে তাহাই ব্যাখ্যাত হইবে।

স্বাধীন ইচ্ছা বিশেষ বিশেষ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হইতে তৃপ্তি-লাভে অসমর্থ হইয়া সার্ব্বিক তৃপ্তির অনুসন্ধান করে। এই অনুসন্ধান হইতেই আইন, কর্ম্মনীতি ও সমাজনীতির উদ্ভব!

আইন, কর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি ব্যক্তিগত নহে, সার্ব্বিক। যাহা সার্ব্বিক, তাহাই

[1] Faculties.

বিষয়গত। যাহা সকলের পক্ষে সত্য, তাহাই সার্ব্বিক, তাহাই বিষয়গত। আবার প্রত্যেক মনের দুইটি অংশ, একটি ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়টি সার্ব্বিক। যে অংশ সার্ব্বিক, তাহাই প্রজ্ঞা। তাহা সর্ব্বমানব-সাধারণ। স্বাধীন ইচ্ছা তাহারই অনুসন্ধান করিয়া, তাহারই অনুরূপ করিয়া, বাহ্য জগৎ গঠন করিতে চায়—স্বকীয় তৃপ্তির জন্য। ইহা হইতেই পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠানসকলের উৎপত্তি। স্বাধীন ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন মানুষে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, তাহা সার্ব্বিক—সর্ব্বমানব-সাধারণ। ব্যক্তির ইচ্ছা যখন সার্ব্বিকের কামনা করে, তখন আপনার ব্যক্তিত্ব অতিক্রম করিয়া যায়। আত্মার বিরত্ব ইচ্ছার ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। সার্ব্বিক ইচ্ছা আপনাকে জগতে বিস্তারিত করিয়া জগতের উপাদানের দ্বারা নানা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়া আত্মিক জগৎ রচনা করে। এই সকল প্রতিষ্ঠানই সার্ব্বিক। কর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে, তাহারা সার্ব্বিক প্রতিষ্ঠান।

হেগেল এই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্‌ভবকে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তাহাদের আবির্ভাব আকস্মিক নহে। তাহারা কারণ-সম্ভূত, কিন্তু সেই কারণ প্রাকৃতিক কারণ নহে, যুক্তির কারণ। সম্পত্তি, চুক্তি, আইন, পরিবার, রাষ্ট্র প্রভৃতির উদ্‌ভব যে কারণ হইতে, তাহা মানুষের খেয়াল অথবা কোনও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রচেষ্টা নহে। আত্মা জগতে আপনাকে যে রূপে অভিব্যক্ত করিয়াছে, এই সকল প্রতিষ্ঠান তাহারই এক একটি ক্রম। জগতের অভিব্যক্তিতে অসঙ্গ স্বসংবিদে উপনীত হইবার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল, এই সকল প্রতিষ্ঠান তাহার সোপান, অসঙ্গের ব্যক্ত রূপ, মানবের অভাব-পূরণের জন্য মানবসৃষ্ট উপায় নহে। তাহাদের উদভব ছিল অবশ্যম্ভাবী। বস্তুর স্বরূপ হইতেই তাহারা উদভূত। তাহারা বিশ্বের আভ্যন্তরীণ স্বরূপ প্রকাশিত করে। জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে, অপরাধ হইতে লোককে বিরত করিবার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং উপযোগ এবং ভাবী মঙ্গলের উপর কর্ম্মনীতি প্রতিষ্ঠিত, এই মত হেগেল নিতান্তই তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। স্বাধীন ইচ্ছা যে উপাদানের দ্বারা এই সকল প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছে, সে উপাদান মানুষ, মানুষের অনুভূতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি। তাহাদের উপর স্বাধীন ইচ্ছার ক্রিয়া হইতেই এই সকল প্রতিষ্ঠান উদ্‌ভূত।

উপযোগমূলক কর্ম্মনীতি ক্যাণ্টও বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনিও প্রজ্ঞার উপরই কর্ম্মনীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্যাণ্টের প্রজ্ঞার অর্থ "আপনার সহিত সামঞ্জস্য"। অভেদ নিয়ম এবং বিরোধের নিয়মই ক্যাণ্টের প্রজ্ঞা। তাহার আধেয় কিছুই নাই। "এমন ভাবে কর্ম্ম কর, যে তুমি ইচ্ছা করিতে পার, যে তোমার কর্ম্মনীতি সকলেই অনুসরণ করে, এবং তোমার এই ইচ্ছার সহিত তোমার কর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত না হয়।" ইহাই ক্যাণ্টের কর্ম্মনীতি। প্রতিজ্ঞা করিয়া ভঙ্গ করিও না, কেননা সকলেই যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা বলিয়াই তো কিছু থাকে না। সুতরাং ক্যাণ্টের মতে আপনার সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণ কর্ম্মই নৈতিক কর্ম্ম। কিন্তু কোনও লোক যদি অনবরত অন্যায় কর্ম্মই করিতে থাকে, তাহা হইলে স্ব-বিরোধ উৎপন্ন হইবে না, এবং তাহার কর্ম্ম ক্যাণ্টের নিয়মের

বিরোধী হইবে না। সুতরাং অভেদ এবং বিরোধের নিয়মের সহিত সংগতি হইতে নৈতিক নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হেগেলের প্রজ্ঞা সার্ব্বিক, কিন্তু শূন্যগর্ভ নহে। নোশানই এই সার্ব্বিক। এই নোশানের মধ্যে গণ, প্রজাতি, ব্যবর্ত্তক সকলই আছে। সুতরাং কর্ম্মনীতি সমাজ ও রাষ্ট্র ইহা হইতে উদ্‌ভূত হইতে পারে। প্রতিজ্ঞা করার রীতি যদি থাকে, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ স্ব-বিরোধী। ক্যাণ্টের কর্ম্মনীতি হইতে ইহা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিজ্ঞার রীতি থাকিবার প্রয়োজন কি, ইহার উত্তর পাওয়া যায় না; হেগেলের নোশান হইতে প্রতিজ্ঞার অস্তিত্ব যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই প্রতিজ্ঞার রীতিই চুক্তি। সম্পত্তি, বিবাহ, দণ্ডমূলক আইন, সকলের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য।

হেগেলের ইচ্ছার স্বাধীনতা ক্যাণ্টের স্বাধীনতার মতো উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম নহে, ইচ্ছার খেয়াল নহে; ইহা স্ব-নিয়ন্ত্রণ। যতক্ষণ "ইচ্ছা" যাহা ইচ্ছা করে, তাহা সার্ব্বিক, অর্থাৎ ইচ্ছার কার্য্য স্বত্বের নিয়ম এবং আইন-সঙ্গত হয়—ততক্ষণ ইচ্ছা স্বাধীন। কেননা স্বত্বের নিয়ম[1] সার্ব্বিক ইচ্ছা হইতে উদ্‌ভূত। ইচ্ছা যদি এই নিয়মের বিরোধী হইয়া স্বকীয় স্বার্থের অনুসরণ করে, তাহা হইলে স্বাধীন নহে। ইচ্ছা তখন প্রকৃতির দাস। কেননা সার্ব্বিকতাই মানুষর স্বরূপ, সংকীর্ণতা মানুষের প্রাকৃতিক অংশের অন্তর্গত। ত্রিভঙ্গী নয় পদ্ধতিতে বিষয়ী আত্মার বিকাশে অনুভূতি, তৃষ্ণা প্রভৃতি আত্মার ব্যক্তিগত রূপ তাহার জ্ঞান এবং ইচ্ছা-রূপে সার্ব্বিক প্রকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী। আত্মার অভিব্যক্তিতে যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা অপেক্ষা যাহা পরবর্ত্তী, তাহার সত্যতা অধিক।

হেগেলের বিষয় আত্মা তিনভাগে বিভক্ত: (ক) মানবীয় অধিকার[2] (খ) সু-নীতি[3] এবং (গ) সামাজিক কর্ম্মনীতি। (ক) মানবীয় অধিকার তিনভাগে বিভক্ত: (১) সম্পত্তি[4] (২) চুক্তি[5] এবং (৩) অন্যায়াচরণ।[6]

স্ব-সংবিদ-সম্পন্ন অহমের নিজের সহিত (অহং=অহং) অভেদ আত্মার মধ্যগত একত্ব। এই অভেদ জানে, ইহা যেমন আপনাকে জানে, তেমনি বাহ্য জগৎকে জানে। ইহা কেবল সংবিদ নহে, ইহা স্ব-সংবিদ। সেই জন্য ইহা একটি পুরুষ।[7] ইতর জন্তুর সংবিদ আছে, কিন্তু স্ব-সংবিদ নাই। সেই জন্য তাহারা পুরুষ নহে। প্রত্যেক পুরুষের অধিকার আছে। কেননা প্রত্যেক স্ব-সংবিদ অসীম, তাহা অন্য কোনও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় নহে। সুতরাং কোনও পুরুষই অন্য পুরুষকে নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। ইহা হইতে প্রত্যেকের অধিকার ও তাহার কর্ত্তব্যের উদ্ভব হয়। কেবলমাত্র সংবিদ হইতে অধিকারের উদ্ভব হয় না। কেননা সংবিদ তাহার বিষয়দ্বারা সীমাবদ্ধ, সেই জন্য সসীম, কিন্তু স্ব-সংবিদের বিষয় স্ব-সংবিদ্ নিজে। আপনা কর্ত্তৃক সীমাবদ্ধ হওয়াই অসীমত্ব। স্ব-সংবিদের অসীমত্বের উপর তাহার

[1] Law of Right
[2] Abstract Right
[3] Morals
[4] Property
[5] Contract
[6] Wrong
[7] Person

অধিকার প্রতিষ্ঠিত। সসীম বস্তুর কোনও অধিকার নাই। তাহারা পুরুষের ইচ্ছার অধীন। মানুষ পুরুষ বলিয়াই তাহার যে সকল অধিকার উদ্ভূত হয়, তাহাই মানবীয় অধিকার। নাগরিক রূপে তাহার যে অধিকার, তাহা মানবীয় অধিকার নহে। এই অধিকারের সহিত কর্তব্য জড়িত। "একটি পুরুষ হও, এবং অন্যকেও পুরুষ বলিয়া সম্মান কর" ইহাই অধিকারের সাধারণ নিয়ম।

সম্পত্তি—বস্তু সসীম, এবং পুরুষ অসীম বলিয়া বস্তুর উপর পুরুষের অধিকার আছে। পুরুষ বস্তুকে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। এই অধিকার ব্যক্তিগত অধিকার—সম্পত্তির অধিকার। হেগেল ব্যক্তিগত সম্পত্তি-বিলোপের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে সাম্যবাদও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী নহে—সম্পত্তির অন্যায় বিভাগের বিরোধী। জীবন-রক্ষার জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন, তাহাতে ব্যক্তিগত অধিকার সাম্যবাদেও স্বীকার করে। হেগেল প্রত্যেক পুরুষেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকার করেন, কিন্তু এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সকলের সমান হইতে হইবে, ইহা স্বীকার করেন না। কেননা একদিকে সকল মানুষ সমান হইলেও, মানুষে মানুষে বুদ্ধি, ক্ষমতা প্রভৃতির ভেদও আছে।

সম্পত্তির মধ্যে তিন প্রকারের অধিকার আছে :—(১) দখলের অধিকার, (২) ব্যবহারের অধিকার এবং (৩) সম্পত্তি-পরিত্যাগের অধিকার। ইচ্ছার প্রয়োগ হইতে যখন অধিকারের উদ্ভব, তখন ইচ্ছা যদি সম্পত্তির উপর তাহার প্রয়োগ হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে সম্পত্তির উপর অধিকারেরও বিলোপ হয়। ইহাই 'দখলী স্বত্বের' ভিত্তি। প্রত্যেকের জীবন তাহার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু এই সম্পত্তি-বর্জনের অধিকার কাহারও নাই। ইচ্ছার অভিব্যক্তি-রূপেই সম্পত্তি-বর্জনের অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু আত্মহত্যা ইচ্ছার ধ্বংস-সাধন—অভিব্যক্তি নহে।

চুক্তি :—সম্পত্তির হস্তান্তরই চুক্তি। সম্পত্তি কেবল স্থাবর নয়। পরিশ্রমও সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি বর্জন করিবার অধিকারও সকলের আছে। সম্পত্তিবান দুই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের নিকট সম্পত্তি-বর্জনের অধিকার আছে। ইহাই চুক্তি।

হেগেল বিবাহকে চুক্তিমাত্র বলিয়া গণ্য করেন নাই। রাষ্ট্রকেও চুক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

অন্যায়াচরণ :—সার্বিক ইচ্ছার বিষয়ত্ব-প্রাপ্তিই অধিকার। সকলের সাধারণ ইচ্ছা সার্বিক ইচ্ছা নহে। মাত্র একজনের ইচ্ছার মধ্যে সার্বিক ইচ্ছা মূর্তিগ্রহণ করিতে পারে। অন্য সকলের ইচ্ছা তাহার বিরোধী হইতে পারে। প্রজ্ঞানুসারী ইচ্ছাই[1] সার্বিক ইচ্ছা। তাহা হইতেই স্বত্বের উদ্ভব। কিন্তু ব্যক্তি যদিও তাহার অন্তরতম প্রদেশে সার্বিক, তথাপি তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, তৃষ্ণা, প্রবৃত্তিও আছে। যখন তাহার স্বেচ্ছাকৃত কার্য্য ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কৃত হয়, এবং এইরূপ কার্য্য প্রজ্ঞানুসারী সার্বিক ইচ্ছার বিরোধী হয়, তখনই তাহা অন্যায়াচরণ। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধারণ ইচ্ছার বিরোধী না হইতেও

[1] Rational Will

পারে। যখন কোনও ব্যক্তি মনে করে, সাধুতাই কার্য্যসিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়, এবং সেই জন্ত সাধুতা অবলম্বন করে, তখন তাহার কার্য্য সার্ব্বিক ইচ্ছার বিরোধী নহে, অন্যায়ও নহে।

"মানবীয় অধিকার" অধ্যায়ে হেগেল যে অন্যায়াচরণের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নৈতিক অন্যায়াচরণ নহে, আইনগত অন্যায়াচরণ। ঈদৃশ অন্যায়াচরণ ত্রিবিধ :—(১) অপূর্ব্বকল্পিত, (২) প্রতারণা এবং (৩) অপরাধ। অপূর্ব্বকল্পিত অন্যায়াচরণ হইতে দেওয়ানী বিচারের উদ্ভব হয়। যখন দুই জনের মধ্যে সম্পত্তি অথবা চুক্তি-সংক্রান্ত বিবাদ উদ্ভূত হয়, তখন প্রত্যেকেই মনে করে, তাহার দাবি আইনসঙ্গত ; কেহই আইনের দাবি অস্বীকার করে না। এক জনের দাবি ইহার মধ্যে ভিত্তিহীন। যখন কেহ বাহ্যতঃ আইনের দাবি স্বীকার করিয়াও জ্ঞাতসারে তাহার বিরোধী কার্য্য করে, তখন তাহার কর্ম্ম প্রতারণা-মূলক। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অন্যায়াচরণ 'অপরাধ' বলিয়া গণ্য। অপরাধী আইনের দাবি প্রকাশ্যে অস্বীকার করিয়া তাহার বিরোধী কর্ম্ম করে। হেগেল অপরাধের জন্ত শাস্তিকে ন্যায় বিচারের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়াছেন। শাস্তিদ্বারা লোককে অপরাধ হইতে বিরত করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু তাহাই শাস্তির উদ্দেশ্য নহে। অপরাধের জন্ত শাস্তি অধিকারের নিয়মের অন্তর্ভূত, মানুষের জীবন ও সম্পত্তি-রক্ষার জন্ত কল্পিত ব্যবস্থা নহে। হেগেল মৃত্যুদণ্ডেরও সমর্থন করিয়াছেন। ব্যক্তি অপেক্ষা রাষ্ট্রের মূল্য অধিক, এবং প্রয়োজন হইলে ব্যক্তির জীবন দাবি করিবার অধিকার রাষ্ট্রের আছে বলিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিবার তিনি পক্ষপাতী।

(খ) কর্ম্মনীতি

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে মানবীয় অধিকার আলোচিত হইয়াছে, তাহার সহিত কর্ম্মনীতির পার্থক্য এই, যে অধিকারের সহিত সম্বন্ধ বাহ্য জগতের, কর্ম্মনীতির সহিত সম্বন্ধ অন্তরস্থ সংবিদের—ধর্ম্মবিবেকের। সার্ব্বিক ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরোধ হইতে অন্যায়াচরণের উদ্ভব হয়। কিন্তু "ইচ্ছার" স্বরূপ সার্ব্বিকতা। সুতরাং ব্যক্তির ইচ্ছা যখন সার্ব্বিক ইচ্ছার বিরোধী হয়, তখন নিজের স্বরূপেরই বিরুদ্ধাচরণ করে ; ইচ্ছার যেরূপ হওয়া উচিত, তাহার সহিত ইচ্ছা বস্তুতঃ যেরূপ আছে, তাহার অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। এই "উচিত"ই কর্ম্মনীতির মধ্যে যে বাধ্যতা আছে, তাহার স্বরূপ। কর্ম্মনীতি বিষয়ীর সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। যখন ইহা বাহ্য প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত হয়, তখন ইহা সামাজিক নীতিতে[১] রূপান্তরিত হয়। ইচ্ছা এবং তাহার সার্ব্বিক স্বরূপের মধ্যে বিরোধের অবসানদ্বারা ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও তাহার স্বরূপের মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠাদ্বারাই কর্ম্মনীতির বিকাশ হয়। কর্ম্মনীতিতে ইচ্ছা স্ব-নিয়ন্ত্রিত, স্বীয় নিয়মদ্বারা পরিচালিত ; যাহা ব্যক্তির ধর্ম্মবিবেকদ্বারা অনুমোদিত, তাহাই তাহার পক্ষে নিয়ম। বিষয়ী তাহার বিবেকের বাহিরে অন্য কাহারও কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

[১] Social Ethics

হেগেল কর্ম্মনীতি-সম্বন্ধে কর্ম্মের অভিসন্ধি, অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্মের যে সমস্ত ভাবী ফল কর্ত্তার মনের সম্মুখে উপস্থিত থাকে, তাহাই অভিসন্ধি। কর্ম্মের ফল সুদূর প্রসারী। অব্যবহিত ফল হইতে অন্য ফলের উদ্ভব হয়, সেই ফল হইতে অন্য ফল, পরে তাহার ফল, এইরূপে কর্ম্মের ফল বিস্তার লাভ করে। সকল ফল কর্ত্তার মনে উপস্থিত থাকা সম্ভবপর নহে। যে সকল ফল উপস্থিত থাকে, অথবা থাকা উচিত, তাহাই অভিসন্ধি[1]। এই সকল ফলের মধ্যে যেগুলি কৃত কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা অভিপ্রায়[2]। যে বিশেষ ফলের জন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কর্ম্মের উদ্দেশ্য[3]. যদি কাহারও মস্তকে আমি বন্দুকের গুলি বিদ্ধ করি, তাহা হইলে তাহার ফলে লোকটির মৃত্যু হইবে, ইহা আমি জানি। সেই কর্ম্মের অন্যান্য অনেক ফলও আমি অবগত আছি. এই সকল ফল আমার কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইতে পারে জানিয়া, আমি তাহাদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই সেই কর্ম্ম করি। এই সকল ফল আমার অভিসন্ধি। কিন্তু ইহার যে যে ফল অবশ্যম্ভাবী—যেমন লোকটির মৃত্যু, কেবল তাহাই অভিপ্রায়। আবার শুধু হত্যা করিবার জন্যই আমি হত্যা করি না। তাহার একটা কারণ থাকে। হয়তো সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিবার জন্যই হত্যা করি। যে জন্য হত্যা, করি, তাহাই আমার উদ্দেশ্য। নানা কর্ম্মের নানা উদ্দেশ্য থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকিতে পারে। একটা উদ্দেশ্য অন্য উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় হইতে পারে, এবং সকলের মিলনে একটা উদ্দেশ্য গঠিত হইতে পারে। এই সাধারণ উদ্দেশ্যকে হেগেল well being বলিয়াছেন। well being শব্দের অর্থ মঙ্গলজনক অবস্থা বা মঙ্গল। কিন্তু হেগেলের well being ভাল ও মন্দ উভয়ই হইতে পারে। ইহাকে জীবনের লক্ষ্য বলা যাইতে পারে।

ইচ্ছার স্বরূপ সার্ব্বিক। কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে ইচ্ছা ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্যক্তির ইচ্ছা সক্রিয়। তাহার কর্ম্মের অভিসন্ধি, অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য আছে। ব্যক্তির ইচ্ছার অভিসন্ধি, অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্যের সহিত যখন সার্ব্বিক ইচ্ছার সামঞ্জস্য থাকে, অর্থাৎ ইচ্ছার স্বরূপের সহিত সামঞ্জস্য থাকে, তখনই সেই ইচ্ছাকে "সৎ" বলে। যখন ব্যক্তির ইচ্ছা সার্ব্বিক ইচ্ছার বিরোধী হয়, তখন তাহা অসৎ। তখন তাহা নিজের খেয়াল অনুসারে চলে। প্রজ্ঞা ও সার্ব্বিকের বিরুদ্ধাচরণ করে। তখন ব্যক্তির ইচ্ছা তাহার নিজের ইচ্ছা, তাহার উদ্দেশ্য তাহার নিজের উদ্দেশ্য। তাহার সার্ব্বিকতা তখন বিলুপ্ত হয়। ব্যক্তির ইচ্ছা যখন যুক্তি-সঙ্গত, তখনি তাহা সার্ব্বিক ইচ্ছা। সুতরাং যে ইচ্ছা যুক্তি-সঙ্গত ভাবে ইচ্ছা করে, যাহা জগতে যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাহাই "সৎ ইচ্ছা"। যুক্তি-সঙ্গত ইচ্ছাই সার্ব্বিক ইচ্ছা। যাহা সার্ব্বিক ও যুক্তি-সঙ্গত, তাহা ইচ্ছা করা এবং করাই সুনীতি। হেগেল "সামাজিক নীতি" অধ্যায়ে কোন্ কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। কোন্ কর্ম্ম সার্ব্বিক, প্রজ্ঞানুগত এবং সৎ, তাহা নির্ণয়ের জন্য বাহ্য কোনও নিয়মের প্রয়োজন নাই। আপনার

[1] Purpose [2] Intention [3] End

অন্তরে অনুসন্ধান করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। অন্তরের এই ক্ষমতাই ধর্ম্ম বিবেক।[১]

(গ)

সামাজিক কর্ম্মনীতি[২]

কর্ম্মনীতিতে আমরা যে "সৎ" অথবা মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সম্প্রত্যয় মাত্র, বস্তু হইতে নিকৃষ্ট গুণমাত্র। কোন কর্ম্ম "সৎ", তাহা নির্ণীত হয় নাই। ধর্ম্মবিবেকও সেইরূপ, তাহা শূন্যগর্ভ সার্ব্বিক মাত্র। কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তাহার জ্ঞান তাহার মধ্যে নাই। এইমাত্র জ্ঞান তাহার আছে, যে কাহারও যাহা কর্ত্তব্য, তাহার বিচারক সে নিজে। মঙ্গল ও ধর্ম্মবিবেক উভয়েই শূন্যগর্ভ সার্ব্বিক, সুতরাং অভিন্ন। অভিন্ন হইলেও ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ীর মধ্যগত, মঙ্গল বিষয়গত। কেননা মঙ্গল ইচ্ছার "বিষয়"; বিষয়ীকে যাহা করিতে হইবে, তাহাই মঙ্গল। পরিবার, অসামরিক সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এই অভিন্নতা বাস্তবরূপে প্রকাশিত হয়। ইহারাই সমাজনীতির আলোচ্য বিষয়। হেগেলের নৈতিক ব্যবস্থা ইহাদেরই সমবায়। এই সকল প্রতিষ্ঠান বিষয়ীর সৃষ্ট—বাহ্য জগতে বিষয়ী ও তাহার প্রজ্ঞার ব্যক্ত রূপ, বিষয়গত রূপ।

কর্ম্মনীতিতে সার্ব্বিক ইচ্ছার সহিত ব্যক্তির ইচ্ছার সামঞ্জস্য আদর্শ রূপে—বাধ্যতা রূপে—ছিল, কিন্তু বাস্তবতা প্রাপ্ত হয় নাই। পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ইহা বাস্তবতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সার্ব্বিক ইচ্ছার বাস্তবতা-প্রাপ্তি হইতেই এই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। সুতরাং এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ব্যক্তির প্রকৃত সত্তা বর্ত্তমান। কেননা প্রজ্ঞানুসারিতা এবং সার্ব্বিকতাই ব্যক্তির স্বরূপ। সুতরাং পরিবার ও রাষ্ট্র ব্যক্তি হইতে উন্নততর, অর্থাৎ সার্ব্বিক ইচ্ছার সহিত যখন ব্যক্তির ইচ্ছার সমতা হয় না, তখন পরিবার ও সমাজকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। রাষ্ট্রেই ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ বর্ত্তমান। রাষ্ট্রের বিরোধী ব্যক্তির যে রূপ, তাহা সত্য নহে। কিন্তু রাষ্ট্র প্রকৃত রাষ্ট্র হইলেই তবে এই কথা সত্য। রাষ্ট্র যদি ব্যক্তি-বিশেষের অথবা শ্রেণী বিশেষের স্বার্থের সাধক না হইয়া স্বাধীনতার পরিপোষক হয়, তবেই ইহা সত্য। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় রাষ্ট্র স্বকীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ব্যক্তির জীবন দাবি করিতে পারে। হেগেল রাষ্ট্রকে বিষয়ীর সার্ব্বিক রূপের ব্যক্ত অবস্থা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন; সুতরাং রাষ্ট্রই ব্যক্তির সত্যরূপ; রাষ্ট্রের স্বার্থই ব্যক্তির প্রকৃত স্বার্থ; সুতরাং রাষ্ট্রের স্বার্থে ত্যাগ-স্বীকার ও নিজের স্বার্থের অনুসরণ অভিন্ন। ব্যক্তির রাষ্ট্রীয়, সামাজিক অথবা পারিবারিক কর্ত্তব্যদ্বারা তাহার স্বাধীনতার খর্ব্বতা সাধিত হয় না। কোনও নিয়ম মানিয়া না চলা, অথবা সংযমের অভাবকে স্বাধীনতা বলে না; আপনাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়াই স্বাধীনতা। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মে ব্যক্তির সত্য স্বরূপই

[১] Conscienc   [২] Social Ethics

অভিব্যক্ত। সুতরাং সেই নিয়ম পালন করিয়া ব্যক্তি আপনাকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বিবাহকে স্বাধীনতা-হানি মনে করা ভুল। বিবাহের মধ্যে ব্যক্তি স্বীয় মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহাই তাহার "কর্ত্তব্যের" ভিত্তি। পারিবারিক সম্বন্ধ হইতেছে পিতামাতার সহিত তাহাদের সন্তানদিগের সম্বন্ধ। সুতরাং এই সম্বন্ধ হইতেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য আবিষ্কৃত হয়।

সমাজ-নীতির আরম্ভ পরিবার হইতে। ধর্ম্ম-বিবেকের সহিত মঙ্গলের একত্বকে হেগেল "নৈতিক দ্রব্য"[১] নাম দিয়াছেন। ইচ্ছার সহিত তাহার স্বরূপের ঐক্য অন্তরের ব্যাপার। পরিবারের মধ্যে এই ঐক্য বস্তুত্ব প্রাপ্ত হয়।

বিবাহ হইতেই পরিবারের উৎপত্তি হয়। দুই ব্যক্তির মধ্যে ঐক্যের অনুভূতিই প্রেম। বিবাহে দুই ব্যক্তি তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন করিয়া এক ব্যক্তিতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে সন্তান সহ সমগ্র পরিবারই এক ব্যক্তি। যে পর্য্যন্ত পুত্রকন্যাগণ বিবাহ করিয়া নূতন পরিবারের সৃষ্টি না করে, ততক্ষণ তাহারা "স্বাধীন" ব্যক্তি নহে। এই জন্যই ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে বিবাহ কর্ম্মনীতি-সঙ্গত নহে। কেননা দুই স্বাধীন ব্যক্তির মিলনই বিবাহ। বিবাহ একটা কর্ম্মনৈতিক বন্ধন। বিবাহ অন্য কোনও উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় নহে—ইহা নিজেই নিজের উদ্দেশ্য। স্বামী-স্ত্রীর সুখ অথবা সাংসারিক সুবিধা বিবাহের উদ্দেশ্য নহে। স্বামীস্ত্রীর নৈতিক মিলনই বিবাহ। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ইহার গৌণ ফল। বিবাহ সুখের হেতু হইতে পারে, কিন্তু মুখ্যতঃ ইহা মানুষের একটা কর্ত্তব্য, সুখ-দুঃখের সহিত সে কর্ত্তব্যের সম্বন্ধ নাই। সুতরাং যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদন করা যাইতে পারে, তথাপি যতদূর সম্ভব ইহাকে দুঃসাধ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। যাহারা বিবাহ করে, কেবল তাহাদের সুখের জন্যই যদি বিবাহ কল্পিত হইত, তাহা হইলে, তাহাদের ইচ্ছামত বিবাহ-বিচ্ছেদ করা চলিত। বিবাহ যদি কেবল চুক্তিমাত্র হইত, তাহা হইলেও ইহার বিচ্ছেদ চলিতে পারিত; কিন্তু তাহা নহে।

হেগেল পূর্ব্ব-রাগকে আধুনিক রোমান্টিকদিগের মত বিবাহের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। যে পূর্ব্বরাগের মূলে যুক্তি নাই, তাহা বিবাহে পরিণত করা উচিত নহে। বিবাহে কেবল পূর্ব্বরাগকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দান করিলে বিবাহকে তাহার উচ্চ স্থান হইতে অবনত করিয়া ব্যক্তিগত সুখের সাধনে পরিণত করা হয়। পিতামাতা-কর্তৃক নির্ব্বাচিত বর কন্যার মধ্যে বিবাহকেই হেগেল অধিকতর নীতি-সঙ্গত বলিয়া গণ্য করিতেন—যদি সেই নির্ব্বাচনের মূলে যুক্তি থাকে।

হেগেলের মতে পরিবারের সম্পত্তিতে পরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার থাকা উচিত। পিতামাতার প্রেম সন্তানে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হয়। পরিবারের সম্পত্তি হইতে সন্তানের শিক্ষার ব্যয়-নির্ব্বাহে সন্তানের অধিকার আছে। শিক্ষার অর্থ সন্তানের মধ্যে সার্ব্বিক মনের প্রতিষ্ঠা, তাহাদের মনের মধ্যে স্বাধীনতা ও সার্ব্বিকতার উদ্বোধন,

[১] Moral Substance

যাহা তাহাদের মধ্যে সুপ্ত ভাবে থাকে, তাহার উদ্বোধন। যখন এই সার্ব্বিকতা ও স্বাধীনতার উদ্বোধন সমাপ্ত হয়, তখন সন্তানেরা বিবাহ করিয়া নূতন পরিবারের প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার পায়। তখন পূর্ব্ব পরিবারের বিশ্লেষণ হয়।

অসামরিক সমাজ[১]

এক একটি পরিবার বিশ্লিষ্ট হইয়া এইরূপে বহু পরিবারে পরিণত হয়। এই সকল পরিবার মিলিয়াই অসামরিক সমাজ গঠিত হয়। স্বাধীন প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য সকলকে আপনার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় মনে করে। সুতরাং প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে। এই পরস্পরের উপর নির্ভরতাই অসামরিক সমাজের ভিত্তি।

পরিবারের স্বার্থই তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থ। কিন্তু সামাজিক জীবনে প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থের অনুসরণ করে। এইজন্য পারিবারিক জীবনের নৈতিক গুণ সামাজিক জীবনে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু ইহা সাময়িক। যাহা সামাজিক জীবনে অন্তর্ধান করে, রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহা পুনরাবির্ভূত হয়।

"অসামরিক সমাজের" ব্যক্তিগণ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইলেও, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বার্থ অনুসরণ করে। পরিবারের মধ্যগত সার্ব্বিকতা হইতে এই বিশেষের উদ্ভব হইলেও, রাষ্ট্রে এই বিরোধের সমন্বয় হইয়াছে। রাষ্ট্রের মধ্যে ভিন্ন অসামরিক সমাজের অস্তিত্ব নাই। রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্ববিধ মঙ্গল-সাধনের জন্য সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে, এই মত হেগেলের মতে অর্দ্ধ-সত্য মাত্র। এই মতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভেদ থাকিলেও অভেদও আছে। অসামরিক সমাজ ও রাষ্ট্র এক নহে। অসামরিক সমাজে যে বিরোধ আবির্ভূত হয়, রাষ্ট্রে তাহার সমন্বয় হয়, এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের স্বার্থের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

অসামরিক সমাজের ব্যক্তিদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইতে তাহাদের ঐক্য সাধিত হয়। খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতির প্রয়োজন প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে। এই সকল প্রয়োজন ব্যক্তিগত। কিন্তু তাহা পূরণ করিবার জন্য পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে হয়। কেহ শস্য উৎপাদন করে, কেহ বস্ত্র বয়ন করে, কেহ চিকিৎসা করে। এইরূপ শ্রমবিভাগদ্বারা সমাজের অভাব পূর্ণ হয়। প্রত্যেকেই স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পরিশ্রম করে। ফলে সকলের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ সার্ব্বিক স্বার্থে পরিণত হয়। ব্যক্তির পরিশ্রমদ্বারা যে ধন উৎপন্ন হয়, তাহা সমাজের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। সমাজের প্রয়োজন-সাধনের জন্য সমাজ তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে: (১) কৃষক, (২) শিল্পী ও বণিক এবং (৩) শাসক। শেষোক্ত শ্রেণীকে হেগেল সার্ব্বিক শ্রেণী নামে অভিহিত করিয়াছেন। সমাজের এবং রাষ্ট্রের মঙ্গল-সাধনই এই শ্রেণীর কাজ। হেগেল বংশগত শ্রেণীবিভাগ অনুমোদন করেন নাই। এই জন্য ভারতীয় জাতিভেদ-প্রথার

---

[১] Civil Society

সমর্থন করেন নাই। কে কোন শ্রেণীভুক্ত হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভার প্লেটো শাসকদিগের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। হেগেল তাহাও অনুমোদন করেন নাই। বংশ, বুদ্ধি, সামর্থ্য ও ব্যক্তির গুণাবলী সকলেরই গুরুত্ব থাকিলেও, ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও সামর্থ্যানুসারেই এই বিভাগ হওয়া উচিত, ইহাই হেগেলের মত।

ব্যক্তির সমবায়ই সমাজ। তাহাদের মধ্যে বাহ্য সম্বন্ধই "অধিকার" এবং কর্ত্তব্যের ভিত্তি। এই অধিকার ও কর্ত্তব্য "বিষয়ত্ব" প্রাপ্ত হয়, বাহ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, ব্যবহার শাস্ত্রে[১]। ইহা হইতেই—প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারের কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজন হইতে—"বিচারের[২]" এবং বিচারালয়ের উদ্ভব হইয়াছে। প্রচলিত প্রথা সার্ব্বিকতা প্রাপ্ত হইলে—সমাজের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে—ব্যবহারে পরিণত হয়।

সমাজের ব্যক্তিগণের অধিকার, সম্পত্তি ও চুক্তি, তাহাদের অনুষ্ঠিত অন্যায়াচরণ ও অপরাধ প্রভৃতিই ব্যবহারের বিষয়। কিন্তু এ সকলই ব্যক্তিগণের মধ্যে বাহ্যিক সম্বন্ধ হইতে উদ্ভূত। যাহা আন্তর, যাহা বিষয়ীর মধ্যগত, যাহা প্রত্যেক ইচ্ছার মধ্যে বিশেষত্ব-প্রাপ্ত, তাহা ব্যবহারের আয়ত্তের বহিরে; তাহা সুনীতির বিষয়। এই জন্যই পারিবারিক ব্যাপারে, স্বামীস্ত্রী, পিতাপুত্রের ব্যাপারে ব্যবহার হস্তক্ষেপ করে না। কেন না এক একটি পরিবার এক একটি ব্যক্তি, এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সম্বন্ধ বাহ্য সম্বন্ধ নহে।

হেগেল বলেন, যে সকল ব্যবহার প্রণীত হয়, তাহা সকলে বুঝিতে পারে, এমন ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, এবং যতদূর সম্ভব, বিস্তারিত ভাবে তাহার প্রচার করিতে হইবে। বিদেশী ভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করা উচিত নহে। অধিকার ব্যবহারে পরিণত ও লিপিবদ্ধ হইবার পরে ব্যক্তিগত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য বিচারপ্রার্থী না হইয়া স্বহস্তে শাস্তিদান করিলে নূতন অন্যায়ের সৃষ্টি হয়।

সমাজস্থ ব্যক্তিগণের অধিকার-সংরক্ষণের জন্য পুলিশের ব্যবস্থা উদ্ভূত হইয়াছে। সম-অধিকার-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অধিকার-সংরক্ষণের জন্য তাহাদের সমবায়ে "সংঘের[৩]" উৎপত্তি হইয়াছে। সংঘের সভ্যগণ ব্যক্তিগত স্বার্থের গণ্ডী ছাড়িয়া সংঘের স্বার্থসাধনে মনোযোগী হয়, এবং এই অর্থে সার্ব্বিকতা প্রাপ্ত হয়। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্মদ্বারা অন্য সকলের উপকার হয়, কিন্তু সে কর্ম্ম সজ্ঞানে সাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না। সংঘের অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সজ্ঞানে সংঘের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করে। কিন্তু স্বার্থপর ব্যক্তিও সংঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়া স্বার্থের গণ্ডী যে অতিক্রম করিতে পারে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

রাষ্ট্র

অসামরিক সমাজের বিভিন্ন ক্রমের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে ব্যক্তিগত এবং সার্ব্বিক স্বার্থের বিরোধ ক্রমেই সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রত্যেকের পরিশ্রমের

[১] Law [২] Administration of Justice [৩] Corporations

দ্বারা অন্যের প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। বিচারালয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থের সহিত সার্ব্বিক স্বার্থের সমন্বয় সাধিত হইতেছে। সংঘের মধ্যে সভ্যদিগের সকলের স্বার্থ ব্যক্তির স্বার্থের উপর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সার্ব্বিকতার দিকে এই গতি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে রাষ্ট্রের মধ্যে। রাষ্ট্রের মধ্যে সার্ব্বিক ও বিশিষ্টের পূর্ণ-মিলন সাধিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের সার্ব্বিক উদ্দেশ্য এবং তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির উদ্দেশ্য অভিন্ন। পরিবারের সার্ব্বিক তত্ত্ব এবং অসামরিক সমাজের বিশিষ্ট তত্ত্বের ভেদাভেদ-সমন্বিত একত্বই রাষ্ট্র। পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র, এই তিনটি লইয়া একটি ত্রয়ী। রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পদের সমন্বয় হইয়াছে। স্বগত পরপ্রত্যয়ের ত্রয়ীর মধ্যে সার্ব্বিক ও বিশিষ্টের সমন্বয় হইয়াছে ব্যক্তির মধ্যে। রাষ্ট্রের মধ্যেও সার্ব্বিক ও বিশিষ্টের সমন্বয় হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রও একটি ব্যক্তি। ইহা একটি পুরুষ, অঙ্গী; রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তিসকল ইহার অঙ্গ। রাষ্ট্রের জীবনী শক্তি সমগ্র অঙ্গের মধ্যে বর্ত্তমান। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে সকল আপতিক ও অস্থায়ী অংশ আছে, তাহা নিষ্কাশন করিলে যাহা তাহার মধ্যে সার্ব্বিক, তাহাই অবশিষ্ট থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির এই সার্ব্বিক অংশই রাষ্ট্রের মধ্যে বাস্তবতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রাষ্ট্র বাস্তবতা-প্রাপ্ত সার্ব্বিক। ব্যক্তি অব্যক্ত সার্ব্বিক। ব্যক্তির এই অব্যক্ত সার্ব্বিকতা রাষ্ট্রে ব্যক্ত হইয়া বাস্তব রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্র কোনও বিরোধী বস্তু নহে, ইহা ব্যক্তির উপর আপনাকে বল পূর্ব্বক স্থাপিত করে নাই। পরন্তু রাষ্ট্র ব্যক্তি হইতে অভিন্ন। রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বাস্তবতা লাভ করে। সুতরাং রাষ্ট্র স্বাধীনতার মূর্ত্ত প্রতীক। রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি তাহার আপনার মধ্যে যাহা সত্য, যাহা সার্ব্বিক, তাহাদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

হেগেলের সমালোচকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে প্রতিক্রিয়াশীল, স্বাধীনতার শত্রু, এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সমর্থক বলিয়াছেন। কিন্তু হেগেল বর্ত্তমান রাষ্ট্র সকলের দোষ ত্রুটী অস্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে সকল সমাজ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে, দোষ-ত্রুটী সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রের সারভাগ বর্ত্তমান। হেগেল রাষ্ট্রের সমর্থক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার কারণ তিনি রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার শত্রু বলিয়া গণ্য করেন নাই। তিনি রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনতার মূর্ত্তিই দেখিয়াছেন। যাহারা দম্ভ ও অভিমান ভরে আপনাদিগের যুক্তি ও মতকেই সার্ব্বিক সত্য বলিয়া গণ্য করে, এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া বহু যুগের যাহা সৃষ্টি, তাহার ধ্বংস-সাধনের চেষ্টা করে, তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন। যে সার্ব্বিক প্রজ্ঞা হইতে জগৎ উদ্‌ভূত হইয়াছে, বর্ত্তমান রাষ্ট্রগুলিও তাহা হইতেই উদ্‌ভূত। প্রজ্ঞা এই সকল প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া তাহার লক্ষ্যাভিমুখে চলিয়াছে; ইহারা সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়। কাহারও স্বেচ্ছাচার অথবা ব্যক্তিগত খেয়াল হইতে ইহারা উদ্‌ভূত হয় নাই। সার্ব্বিক মানবাত্মা হইতেই ইহারা উদ্‌ভূত। হেগেল এই কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু রাষ্ট্রের কোনও ত্রুটী নাই এবং তাহাদের সংশোধন করিতে হইবে না, একথা তিনি বলেন নাই।

রাষ্ট্র সার্ব্বিক, কিন্তু ইহার সার্ব্বিকতা বস্তুত্ববিহীন নহে, বাস্তব। সার্ব্বিকতার বিপরীত বিশিষ্টতা ইহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। সার্ব্বিক বলিয়া রাষ্ট্র প্রজ্ঞানুসারী। সুতরাং রাষ্ট্রই নৈতিক

প্রত্যয়ের[1] শেষ ও পরতম অভিব্যক্তি। বিষয়গত আত্মার ক্ষেত্রে পর প্রত্যয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে রাষ্ট্রে। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বিকাশ কর্ম্মনীতির ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। সে বিকাশ হইয়াছে অসঙ্গ আত্মার ক্ষেত্রে। ইচ্ছার সহিত তাহার প্রত্যয়ের অভেদই রাষ্ট্র। রাষ্ট্র নৈতিক বস্তুর[2] সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও 'স্ব-সংবিদ-সম্পন্ন রূপ। রাষ্ট্র সজ্ঞানে সার্ব্বিক উদ্দেশ্যের অনুসরণ করে; পরিবারের মধ্যে যাহা সহজাত প্রবৃত্তি-বশে কৃত হয়, রাষ্ট্রে তাহা সজ্ঞানে অনুষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্র তাহার অন্তর্ভূক্ত জনগণের মঙ্গলের উপায় নহে; কোনও উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়ই রাষ্ট্র নহে। রাষ্ট্র নিজেই নিজের উদ্দেশ্য, ব্যক্তি অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য।[3] এইজন্য রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বার্থত্যাগ দাবি করিতে পারে। কিন্তু এই দাবি কেবল যুক্তি-সঙ্গত সার্ব্বিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই চলিতে পারে। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার ইহাদ্বারা অস্বীকৃত হয় না।

রাষ্ট্রের তিন রূপ: (১) শাসনতন্ত্র; (ইহা দ্বারা রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনগণের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ এবং তাহাদিগের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়;) (২) আন্তর্জাতিক আইন; (ইহাদ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়;) (৩) সার্ব্বিক ইতিহাস।

রাষ্ট্রের দুই দিক—সার্ব্বিক ও বিশিষ্ট। রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনগণের স্বার্থ তাহার বিশিষ্ট দিক। ব্যক্তিগত স্বার্থ-বিযুক্ত দিক সার্ব্বিক। প্রকৃত রাষ্ট্রের মধ্যে উভয় দিকেরই পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজন—রাষ্ট্রের অধিকার এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা উভয়েরই পূর্ণ বিকাশের প্রয়োজন। পরস্পর বিরোধী এই দুই দিকের একত্বই রাষ্ট্র। প্লেটো তাঁহার Republicএ রাষ্ট্রের সার্ব্বিক দিকের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। আধুনিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। হেগেল রাষ্ট্রের উভয় দিকেরই তুল্যরূপ বিকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং হেগেল যে প্রাচীন মতের সমর্থক ছিলেন, একথা সত্য নহে।

রাষ্ট্রের দাবি এবং ব্যক্তির দাবির মধ্যে বস্তুতঃ ভেদ নাই। ব্যক্তির মধ্যে সার্ব্বিকতার বীজ নিহিত আছে, সার্ব্বিকতাই ব্যক্তির স্বরূপ। এই সার্ব্বিক স্বরূপ রাষ্ট্রের মধ্যে বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়। রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির স্বকীয় স্বার্থের উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম্মের ফল হইয়া দাঁড়ায় সার্ব্বিক, কেননা প্রত্যেকে পরের অভাব পূর্ণ করিয়াই নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করে; তার পরে সভ্য সমাজের অন্তর্গত জনগণ ক্রমশঃই রাষ্ট্রের সার্ব্বিক উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই উদ্দেশ্য-সাধনে আপনাদের শক্তি নিয়োগ করে। রাষ্ট্রও সযত্নে তাহার অন্তর্গত সংঘ ও পরিবারদিগকে রক্ষা করে, এবং জনগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকে। জনগণও রাষ্ট্রকে পরম বন্ধু বলিয়া গণ্য করে, এবং রাষ্ট্র তাহাদের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করে, তাহাদের ধন ও প্রাণ নিরাপদ করে এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহাদিগকে সাহায্য করে, এই বিশ্বাসে তাহার স্বার্থের সহিত আপনাদের স্বার্থ অভিন্ন বলিয়া গণ্য করে। এইরূপে রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং স্বদেশ হিতৈষণার উদ্ভব হয়।

[1] Ethical Idea [2] Ethical Substance [3] End

রাষ্ট্র অঙ্গী, তাহার অন্তর্গত সংঘ, পরিবার ও ব্যক্তিগণ তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। দেহের মধ্যে যে সকল ভেদ আছে, তাহাদের একত্ব হইতেই তাহাদের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন অঙ্গের জীবনী শক্তি সমগ্র দেহ হইতেই তাহারা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পৃথক হইলেও তাহারা দেহেরই অঙ্গ, দেহ হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

আইনের উৎস-রূপে রাষ্ট্র সার্ব্বিক; বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগে রাষ্ট্রের বিশিষ্ট রূপ পরিদৃষ্ট হয়, এবং ইহা হইতে রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার বিভাগের উৎপত্তি। রাজাই রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত রূপ। সার্ব্বিক, বিশেষ এবং ব্যক্তি নোশানের এই তিন রূপ ব্যবস্থাপকসভা, শাসন-বিভাগ এবং রাজার মধ্যে অভিব্যক্ত। ইহারা বিভিন্ন হইলেও এক রাষ্ট্রেরই মূর্ত্তি, রাষ্ট্রেরই অঙ্গ। সুতরাং তাহারা স্বতন্ত্র ভাবে যদি পরস্পরের বিরোধিতা করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ধ্বংস হয়। ইংরেজদিগের শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক বিভাগের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য। হেগেল এই প্রথার সমর্থন করিয়াছেন।

হেগেলের মতে নিয়মানুগ রাজতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ তন্ত্র। নিয়মানুগ রাজতন্ত্রের মধ্যেই নৈয়ায়িক প্রত্যয় পূর্ণ রূপে অভিব্যক্ত। রাজতন্ত্রই সম্পূর্ণ প্রজ্ঞানুযায়ী। শাসন-বিভাগের কর্ত্তব্য প্রত্যেক বিষয়ে অবহিত হইয়া সার্ব্বিক স্বার্থ রক্ষা করা।

ব্যবস্থাপক সভার গঠনে হেগেল রাষ্ট্রভুক্ত যাবতীয় নর-নারীর ভোটদানের অধিকারের সমর্থক ছিলেন না। রাষ্ট্রের জনগণের সকলের ইচ্ছার অথবা তাহাদের অধিকাংশের ইচ্ছার সমষ্টি রাষ্ট্র নহে। রাষ্ট্র রাষ্ট্রভুক্ত জনগণের সার্ব্বিক অর্থাৎ প্রজ্ঞানুযায়ী ইচ্ছার অভিব্যক্তি। অধিকাংশের ইচ্ছাই যে সার্ব্বিক ইচ্ছা, তাহার নিশ্চিতি নাই। সার্ব্বিক ইচ্ছাই ব্যক্তির সত্য স্বরূপ। তাহা পালন করাই প্রকৃত স্বাধীনতা। রাষ্ট্রীয় কার্য্যে রাষ্ট্রভুক্ত জনগণের অংশ-গ্রহণের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য হেগেল অন্যবিধ উপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমতঃ রাষ্ট্রের মধ্যে যে সকল বিভিন্ন সংঘ আছে, তাহাদের মধ্যে জনগণের বিভিন্ন স্বার্থ প্রতিফলিত। ব্যবস্থাপক সভায় এই সকল সংঘের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার থাকা উচিত। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণ মত-গঠনে সংবাদ-পত্রের সাহায্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। সাধারণ মত এই উপায়ে প্রকাশিত হইলে, শাসক সম্প্রদায় তাহা হইতে সাধারণের ইচ্ছা কি বুঝিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করিবেন, কিন্তু "সাধারণ মত" গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন না। সাধারণ লোকেই তাহাদের স্বার্থ কি, তাহা ভাল জানে, এই যুক্তির উত্তরে হেগেল বলেন, সাধারণ লোকে বাস্তবিক কি ইচ্ছা করে, তাহা তাহারা অবগত নহে। আমরা কি ইচ্ছা করি, তাহা জানা, বিশেষতঃ প্রজ্ঞারূপ সাধারণ ইচ্ছা কি ইচ্ছা করে, তাহা জানিতে হইলে যে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির প্রয়োজন, সাধারণের তাহা নাই। "সাধারণ মতকে অবজ্ঞা করিতে যিনি শিক্ষা করেন নাই, তাঁহাদ্বারা মহৎ কোনও কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।"

আন্তর্জাতিক আইন

প্রত্যেক রাষ্ট্রই এক একটি ব্যক্তি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্বীকৃত হইলে তাহা হইতে আন্তর্জাতিক আইন উদ্ভূত হয়। অন্য রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধে প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বাধীন। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনে প্রথমতঃ এই স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ এবং অসামরিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে পার্থক্য এই, যে নাগরিকদিগের উপবস্থ রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক তাহাদের অধিকার সংরক্ষিত হয়, কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপরে এমন কোনও শক্তি নাই, যাহাদ্বারা তাহাদের অধিকার রক্ষিত হইতে পারে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের কার্য্য তাহার স্বকীয় ইচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের অধিকার পরস্পরের মধ্যে চুক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চুক্তির বিষয় বস্তু আন্তর্জাতিক আইনের অধীন নহে। চুক্তি-পালনের প্রয়োজনীতা শুধু তাহাদ্বারা আদিষ্ট হইতে পাবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল চুক্তি অকার্য্যকর হইয়া পড়ে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপরে কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নাই বলিয়া শেষে যুদ্ধদ্বারাই রাষ্ট্রীয় বিরোধের নিষ্পত্তি হইতে পারে। হেগেলের মতে চিরস্থায়ী শান্তি অলীক স্বপ্ন মাত্র। কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান-সৃষ্টির সম্ভাবনাতেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না।

নিজের স্বাধীনতা রক্ষাই রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রের জীবন ও উদ্দেশ্য ব্যক্তির জীবন ও উদ্দেশ্য অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বলিয়া রাষ্ট্রের জন্য সম্পত্তি ও জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য।

যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়াও প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার শত্রু রাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করে। যুদ্ধ দুই রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রভুক্ত জনগণের মধ্যে, নহে। জনগণের সম্পত্তি ও জীবন যুদ্ধের আক্রমণের লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে।

জাগতিক ইতিহাস

অসামরিক সমাজে জনগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, রাষ্ট্র সকলের পরস্পরের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ। রাষ্ট্রভুক্ত ব্যক্তিগণ যেমন তাহাদের বিভিন্ন স্বার্থের অনুসরণ করে, প্রত্যেক রাষ্ট্রও তেমনি তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুসরণ করে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে সার্ব্বিক প্রত্যয়ের একটি বিশেষ রূপ প্রকাশিত। ইতিহাসে পর প্রত্যয়ের বিভিন্ন ক্রম কালে প্রকাশিত হয়। এক এক যুগে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতির মধ্যে পর-প্রত্যয়ের যে ক্রম অভিব্যক্ত হয়, তাহাই সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ক্রম। এই সকল পরম্পরাগত ক্রমই জাগতিক ইতিহাস। এই ইতিহাস যদৃচ্ছা-প্রসূত নহে, অন্ধ নিয়তিও ইহার কারণ নহে। পরপ্রত্যয় অথবা প্রজ্ঞাকর্ত্তৃকই এই ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত। প্রজ্ঞার ক্রমিক বিকাশই ইতিহাস। ইতিহাসে অভিব্যক্ত এই পর-প্রত্যয়ই জগতের আত্মা। পরপ্রত্যয়ের বাস্তব রূপই আত্মা। এইজন্যই ইহা জগদাত্মা। জগদাত্মাই জাতিদিগের বিচারক। জাতিদিগের বিচার করিবার

জন্য কোনও আন্তর্জাতিক বিচারালয় নাই। এরূপ কোনও বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াও সম্ভবপর নহে। জগতের ইতিহাসে প্রত্যেক জাতির পরিণাম হইতেই এই বিচারফল অবগত হওয়া যায়।

অসঙ্গ আত্মা[1]

বিষয়ী আত্মা অন্তর্মুখী,এবং অসঙ্গের এক দিক মাত্র। বিষয় আত্মা বহির্মুখী—অসঙ্গের অন্যদিক। চৈতন্য অথবা সংবিদই আত্মার স্বরূপ; কিন্তু বিষয় আত্মা সংবিদহীন। অনুভূতি-তৃষ্ণা-বুদ্ধি সমন্বিত জীবাত্মা সচেতন ও ব্যক্তিত্বাপন্ন, কিন্তু পরিবার-নৈতিক-নিয়ম-ও-রাষ্ট্র-রূপে আত্মা ব্যক্তিত্বহীন ও সংবিদহীন। রাষ্ট্র বাহ্য জগতে অবস্থিত, কিন্তু সংবিদ-যুক্ত ব্যক্তি নহে, বিষয়ী নহে। বিষয়ী আত্মা এবং বিষয় আত্মা পরস্পর কর্তৃক অবচ্ছিন্ন; উভয়ের প্রত্যেকেই সসীম। কিন্তু স্বরূপতঃ আত্মা অসীম। স্বকৃত ভেদ অতিক্রম করিয়া—বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ, অতিক্রম করিয়া—আত্মা অসীমত্ব এবং অসঙ্গত্ব লাভ করে, বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদের সমন্বয় করিয়া ভেদাভেদ-যুক্ত অসঙ্গ আত্মায় অভিব্যক্ত হয়। অসঙ্গ আত্মা একই সময়ে বিষয়ী ও বিষয় উভয়রূপী।

বিষয়ীরূপী অসঙ্গ আত্মা ব্যক্তিত্বাপন্ন মানবীয় সংবিদেরই এক রূপ। ইহা রাষ্ট্রের মত ব্যক্তিত্বহীন সত্তা নহে। এই সংবিদ মানুষের (ব্যষ্টি মানুষের) মনের মধ্যে বর্তমান কোনও বিষয়েরই বাস্তব সংবিদ। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে বিষয়ী বলা যাইত না। কিন্তু এই অসঙ্গ আত্মার জ্ঞানের এই বিষয়টি কি? অসঙ্গ আত্মার মধ্যে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ বিলুপ্ত। সুতরাং অসঙ্গ আত্মার এই জ্ঞান তাহার এই ভেদ-বর্জিত অবস্থার জ্ঞান, তাহার নিজেরই জ্ঞান; অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মা নিজেই তাহার জ্ঞানের বিষয়। আত্মার স্ব-সম্বন্ধী জ্ঞানই অসঙ্গ আত্মা। অসঙ্গ আপনাকেই চিন্তা করেন।

মনোবিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়ও আত্মা বা মনঃ। কিন্তু মনোবিজ্ঞান অসঙ্গ আত্মার এক রূপ নহে! কেননা মনোবিজ্ঞানের বিষয় সংবেদন, বুদ্ধি, অনুভূতি প্রভৃতি সকলই সসীম, এবং তাহাদের বিষয় তাহাদিগের হইতে ভিন্ন। যেমন সংবেদনের বিষয় বাহ্য জগৎ। কিন্তু অসঙ্গ আত্মার জ্ঞানের বিষয় অসঙ্গ আত্মা হইতে অভিন্ন। এই জন্য তাহা অসীম। অসঙ্গ আত্মার মধ্যে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। মনের বিষয়ের সহিত মনের ভেদজ্ঞান যখন তিরোহিত হয়, মনঃ যখন বুঝিতে পারে, যে যাহাই বিষয়রূপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়—সূর্য্যচন্দ্র-সমন্বিত প্রাকৃতিক জগৎ ও অন্তর্জগৎ—আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নহে, যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহা সে নিজেই, তখন মনঃ আপনাকে অসঙ্গ আত্মা বলিয়া বুঝিতে পারে। মানুষের মনের বাহিরে অসঙ্গ আত্মা অবস্থিত নহে। অসঙ্গ আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ। সে জ্ঞান মানুষের মনেই প্রকাশিত। মানুষের মনে অসঙ্গের যে জ্ঞান, তাহাই অসঙ্গ আত্মা। যে যে উপায়ে মানবমনঃ অসঙ্গের জ্ঞান

---

[1] Absolute Spirit

লাভ করিতে পারে, তাহারা সকলেই অসঙ্গ আত্মার রূপ। কলা, ধর্ম্ম, দর্শন, সকলের মধ্যেই অসঙ্গ আত্মা প্রকাশিত।

"আত্মা" এবং "অসঙ্গ" সমার্থক শব্দ। অসঙ্গ আত্মা একদিকে যেমন আত্মার আত্মজ্ঞান, অন্যদিকে তেমনি অসঙ্গেরও আত্মজ্ঞান! অসঙ্গ আত্মার মধ্যেই কেবল অসঙ্গ আপনাকে জানিতে পারে, আপনার স্বরূপ অবগত হয়।

স্বাধীনতাই মানব-মনের সার! রাষ্ট্রের মধ্যে এই স্বাধীনতা ব্যবহিত ভাবে অধিগত হয়, কেননা রাষ্ট্রকর্ত্তৃক শাসিত হওযা আপনাকর্ত্তৃক শাসিত হওয়ারই সমান। তবুও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ বাহ্য বস্তু—ব্যক্তির বিষয়িত্বের বিপরীত এবং ব্যক্তি হইতে ভিন্ন। সুতরাং রাষ্ট্রের মাধ্যমে, যে স্বাধীনতা, তাহা পূর্ণ স্বাধীনতা নহে। যাহার দৃষ্টির সম্মুখে যাবতীয় ভেদ লুপ্ত —চিরকালের জন্য বিলুপ্ত—যিনি আপনাকে সমস্ত বস্তুরূপে দর্শন করেন, যাহার বিপরীত কিছু নাই, সমগ্র সত্তা যিনি আপনার মধ্যগত রূপে দর্শন করেন, তিনিই সম্পূর্ণ স্বাধীন, তিনিই স্বরাট। স্বাধীনতা, স্বাবচ্ছিন্নতা এবং অসীমত্ব এই তিন শব্দ সমার্থক। সুতরাং অসঙ্গআত্মারূপী আত্মা সম্পূর্ণ অসীম। কলা, ধর্ম্ম এবং দর্শনে মানবীয় মনঃ এই অসীমত্ব প্রাপ্ত হয়।

অসঙ্গের জ্ঞান অসঙ্গ আত্মার মধ্যে বর্ত্তমান। ঈশ্বর ও অসঙ্গ এক। ঈশ্বরের জ্ঞান—ঈশ্বর ও সনাতনের জ্ঞানই—ধর্ম্ম। অসঙ্গের জ্ঞানের উপায় তিনটি:—(ক) কলা, (খ) ধর্ম্ম ও (গ) দর্শন। ইহারা অসঙ্গের সসীম অবস্থা হইতে মুক্তির তিন ক্রম। কলা ও ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সসীমত্বের সম্পূর্ণ তিরোধান হয় না, দর্শনেই আত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং অসীমত্ব প্রাপ্ত হয়।

কলা, ধর্ম্ম ও দর্শনের সার ভাগ অভিন্ন হইলেও, তাহারা রূপে বিভিন্ন। যাহা সনাতন, অসীম ও ঐশ্বরিক, তাহাই ইহাদের সার ভাগ, অর্থাৎ অসঙ্গই এই সারভাগ। অসঙ্গ পরম সত্যের জ্ঞানই ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য। কিন্তু যে রূপে এই পরম সত্য এই তিন ক্ষেত্রে সংবিদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা বিভিন্ন। দর্শনের মধ্যেই এই সত্যের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয়। দর্শনের পরে ধর্ম্মে, তাহার পরে কলায় এই সত্যের প্রকাশ। কলায় এই সত্যের প্রকাশ সর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ণ। কিন্তু যে সত্য এই তিনের মধ্যে বর্ত্তমান, তাহা একই, রূপেরই মাত্র প্রভেদ।

(ক) কলা[1]

সৌন্দর্য্য:—প্রত্যক্ষ জগতের যবনিকা ভেদ করিয়া অসঙ্গের যে দীপ্তি প্রকাশিত হয়, তাহাই সৌন্দর্য্য। অসঙ্গ অথবা পরপ্রত্যয়ের এই জ্ঞান অব্যবহিত। সৌন্দর্য্যের বিষয় প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু (যেমন রম্য হর্ম্ম্য, মূর্ত্তি, সঙ্গীত) অথবা প্রত্যক্ষ বস্তুর মানসিক মূর্ত্তি (যেমন কবিতা)। যখন এই সকল বস্তুর মধ্যে দীপ্তিমান পর প্রত্যয় দৃষ্টিগোচর

[1] Art

হয়, তখনই তাহারা সুন্দর বলিয়া গণ্য হয়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপে কলা এবং প্রকৃতির মধ্যে দৃষ্ট পর প্রত্যয়ই সৌন্দর্য্য। বিশুদ্ধ চিন্তা-রূপে পর প্রত্যয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। প্রত্যক্ষ জগতে প্রকাশিত পরপ্রত্যয়ই সৌন্দর্য্য। যখন কোনও বস্তু অথবা কতকগুলি বস্তুকে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে বদ্ধ বহুর সংহতি-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহার মধ্যে পরপ্রত্যয় প্রত্যক্ষ রূপে প্রকাশিত হয় বলিয়া তাহা সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়। সুন্দর বস্তু প্রধানতঃ একীভূত বহুর সংঘাত। প্রকৃতির মধ্যে পর প্রত্যয় সুন্দর রূপে প্রকাশিত। এই সৌন্দর্য্যের ইতর বিশেষ আছে। স্থূল জড়ের মধ্যে এই প্রকাশ ক্ষীণতম। কেননা বিভিন্ন জড় বস্তুর মধ্যে সংহতির অভাব। প্রকৃত সৌন্দর্য্য প্রথম দৃষ্ট হয় উদ্ভিদ-জগতে, তারপরে প্রাণীদেহে। প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের প্রত্যেক অংশ অন্যান্য অংশের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, এবং তাহাদের পার্থক্যের মধ্যে একত্ব পরিস্ফুট, কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্বাধীনতা এবং অসীমত্বের অভাব। পর প্রত্যয়ের পূর্ণ প্রকাশের জন্য যে স্বাবচ্ছিন্ন অসীমত্ব এবং স্বাধীনতার প্রয়োজন, প্রকৃতির মধ্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক দিক হইতে দেখিলে জীব ও উদ্ভিদ দেহ স্ব-নিয়ন্ত্রিত বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতির অন্তহীন কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ বলিয়া তাহাদেরও প্রকৃত স্বাধীনতা নাই। এই জন্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অসম্পূর্ণ। সুতরাং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপে অসঙ্গের সম্যক দর্শন পাইতে হইলে, মানুষকে প্রকৃতির উপরে উঠিয়া আপনাকেই সুন্দর বস্তু সৃষ্টি কবিতে হইবে। এই খানেই কলার প্রয়োজন। কলার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নিকৃষ্ট; প্রকৃতি যেমন আত্মা অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তেমনি প্রকৃতির সৃষ্টিও আত্মার সৃষ্টি অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

কলার প্রত্যেক সৃষ্টির দুইটি দিক। তাহারা পৃথক হইলেও পরস্পর সম্বদ্ধ। একটি অর্থের দিক, অন্যটি রূপের দিক। অর্থকে কলা-সৃষ্টির আধ্যাত্মিক আধেয়[1] বলে। ইহা এক। এই একত্ব সেই সৃষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রকাশিত। একত্ব-প্রাপ্ত বিভিন্ন অংশ সেই সৃষ্টির জড়ীয় দেহ অথবা রূপ[2]। স্থাপত্যে ইট পাথর দ্বারা কলার রূপ সৃষ্ট হয়; চিত্রে রূপ প্রকাশিত হয় বর্ণে, সঙ্গীতে হয় ধ্বনিতে, কবিতায় হয় মানসিক প্রতিরূপে[3]। পর-প্রত্যয় যখন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে বলে আদর্শ[4]। পর প্রত্যয় যখন জড়রূপে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়, তখনই আদর্শ প্রত্যক্ষ হয়।

হেগেল কলার কয়েকটি লক্ষণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ—কলা দাসের মত নিসর্গের অনুসরণ করে না। কোন ব্যক্তির প্রতিরূপ-অঙ্কনে তাহার আকৃতির আপতিক লক্ষণ—যেমন ক্ষতচিহ্ন, তিল প্রভৃতি—প্রদর্শিত হয় না। কেননা এই সকলের সহিত সেই ব্যক্তির স্বরূপের কোনও সম্বন্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ—নৈতিক উপদেশ কলার অঙ্গ নহে। অনন্তকে রূপান্বিত করাই কলার উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ—অতিশয় উন্নত সভ্যতার যুগ কলার অভিব্যক্তির উপযোগী নহে। মহাকাব্য এবং নাটকে বর্ণিত চরিত্র

[1] Spiritual Content
[2] Material Embodiment
[3] Mental images
[4] Ideal

সকল সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্ব-নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অতিশয় উন্নত সমাজে মানুষের আচরণ আইন ও প্রচলিত প্রথাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ট্রয়ের যুদ্ধে এচিলিস যখন আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন সেনাপতি আগামেম্‌ননের অনুমতির অপেক্ষা করেন নাই, সেনাপতিও তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনুরোধ ভিন্ন অন্য উপায় অবলম্বন করেন নাই। কলায় রাজন্যবর্গের প্রতি পক্ষপাতিতা লক্ষিত হয়, ইহার কারণ তাহারা স্বাধীন। কলায় যে সমস্ত প্রাচীন কালের বীরগণের কীর্ত্তি-কাহিনী বর্ণিত আছে, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি, এমন কি খাদ্য ও পানীয়ও স্বনির্ম্মিত। ইহা তাঁহাদের পর-নির্ভরতা-মুক্তির নিদর্শন। চতুর্থতঃ—কাব্যকলায় বর্ণিত চরিত্রগণ কখনও দুঃখ ও বিপদে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে না। পঞ্চমতঃ—মানব-চরিত্রের বর্ণনায় মানবের সার্ব্বিক ও প্রজ্ঞানুগত অংশই মুখ্যতঃ চিত্রিত হয়। মানবের প্রজ্ঞানুগত সার্ব্বিক চিত্তাবেগ কলার বিষয় বস্তু, তাহার ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নহে। সার্ব্বিক বলিয়াই ঐ সকল চিত্তাবেগ অসঙ্গের ব্যঞ্জক। ষষ্ঠতঃ—কেবল পাপ ও দুষ্প্রবৃত্তি কলার বিষয় হইতে পারে না। পাপ যুক্তিহীন ও অ-সার্ব্বিক; কলায় তাহার স্থান নাই। মিলটনের কাব্যের সয়তান অনেক মহৎ গুণের অধিকারী ও যুক্তি সঙ্গত প্রবৃত্তিদ্বারা পরিচালিত। তাহার চরিত্রের এই মহত্বই আমাদের মনোহরণ করে। সপ্তমতঃ—কাব্যে দুই সৎ প্রবৃত্তির মধ্যে সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন চরিত্রে তাহারা রূপায়িত।

হেগেল কলাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন:— (১) প্রতীকমূলক,[1] (২) সর্ব্বোত্তম[2] এবং (৩) রোমান্তিক। প্রত্যেক কলাসৃষ্টির দুইটি অংশ—তাহার আধ্যাত্মিক আধেয় ও তাহার জড়ীয় বাহন বা রূপ।[3] জড়ের মধ্যে অসঙ্গের দীপ্তিরূপ সৌন্দর্য্যই কলার আধ্যাত্মিক আধেয়। ইহাদ্বারা কলার বিভিন্ন অংশের একত্ব সাধিত হয়। আদর্শ কলার সৃষ্টিতে এই দুই ভাগের পরিপূর্ণ সাম্য বর্ত্তমান। প্রতীকমূলক কলার মধ্যে জড়ীয় রূপের প্রাধান্য, অধ্যাত্মিক ভাব যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। যে কলা-সৃষ্টিতে এই দুই অংশের পূর্ণ সমতা বর্ত্তমান, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রাচীন গ্রীক কলা এই শ্রেণীর। রোমান্তিক কলার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাধান্য। সকল যুগেই এই ত্রিবিধ কলার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা সত্য হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কলা প্রধানতঃ প্রতীকমূলক। তাহার পরের যুগের কলা দ্বিতীয় শ্রেণীর। রোমান্তিক কলা সকলের পরবর্ত্তী।

প্রতীকমূলক কলা

আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশের নিষ্ফল চেষ্টা হইতে প্রতীক-মূলক কলার উদ্ভব। ভাব-প্রকাশের উপযোগী বাহন না পাইয়া মানব-মনঃ প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ করে। প্রতীক দ্বারা তাহার অর্থের ইঙ্গিত প্রদত্ত হয় মাত্র, অর্থ প্রকাশিত হয় না। বলের প্রতীকরূপে

---

[1] Symbolic [2] Classical [3] Form

সিংহের মূর্তি, এবং ত্রিমূর্তি ঈশ্বরের প্রতীক-রূপে ত্রিভুজ ব্যবহৃত হয়। প্রতীকের সহিত প্রকাশিতব্য বস্তুর কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও, সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব। এইজন্য তাহার একাধিক অর্থ হইতে পারে। ত্রিভুজকে যেমন ঈশ্বরের প্রতীক বলা যায়, তেমনি নীলনদের ব-দ্বীপের বিশেষত্ব উর্ব্বরতার প্রতীক বলিয়াও গ্রহণ করা যায়। এই জন্য সকল প্রতীকমূলক কলাই রহস্যাচ্ছাদিত।

"সৎ"ও তাহার বাহ্য প্রকাশের মধ্যে পার্থক্যবোধ না থাকিলে, কলা-সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং যত দিন মানবমনে এই পার্থক্যবোধ না জন্মে, ততদিন কলাসৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। যে সকল জাতির মধ্যে এই পার্থক্য-বোধ জন্মে নাই, তাহাদের মধ্যে কলার উদ্ভব হয় নাই। প্রাচীন জেন্দ্ জাতি ঈশ্বর-জ্ঞানেই আলোকের উপাসনা করিত, আলোককে ঈশ্বরের প্রতীক বলিত না। সৎ ও প্রতিভাসের পার্থক্যের উপলব্ধি তাহাদের হয় নাই। তাহাদের মধ্যে কলার আবির্ভাবও হয় নাই। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে এই পার্থক্য-বোধ অস্পষ্টভাবে থাকিলেও, সকল সময়ে তাহারা সৎ ও প্রতিভাসের পার্থক্য উপলব্ধি করিত না। যখন এই পার্থক্য উপলব্ধি করিত, তখন সৎকে (ব্রহ্মকে) জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত, তাহাকে নির্গুণ নিরাকার শূন্যে পর্য্যবসিত করিত, বাক্য, মনঃ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া মনে করিত। আবার এই উপলব্ধি যখন হইত না, তখন প্রাকৃতিক বস্তুকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন গণ্য করিত, গাভী, সর্প ও বানরের পূজা করিত। ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিকের মধ্যে ভেদজ্ঞানের অভাবই হিন্দু-কলার অস্বাভাবিকতার কারণ। হিন্দু কল্পনার মধ্যে স্ব বিরোধের অস্পষ্ট অনুভূতি হইতেই হিন্দু কলার অস্বাভাবিক সৃষ্টি উদ্ভূত হইয়াছে। গাভী, সর্প ও বানরকে ঈশ্বরবোধে পূজা করিলেও, ঈশ্বরকে প্রকাশিত করিবার জন্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর অনুপযোগিতা তাহারা অনুভব করিত। এই বিরোধের সমন্বয়ের জন্যই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর অপরিমিত বিস্তৃতিদ্বারা অসীমকে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিত। হিন্দু দেবতাগণের মূর্ত্তি যে বহু হস্ত-পদ-ও মস্তক-বিশিষ্ট, ইহাই তাহার কারণ। কাল-সম্বন্ধেও হিন্দু কল্পনা এই জন্যই উদ্দাম হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অসংখ্য যুগ, কল্প ও পরিমাণের কল্পনাও এই কারণ হইতে উদ্ভূত। আধ্যাত্মিক ভাব ও তাহার বাহনের মধ্যে অসামঞ্জস্যই হিন্দুকলার বিশেষত্ব। আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশিত হইবার জন্য প্রচেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে, এবং বিপুল প্রচেষ্টার আলোড়নের ফলে সৃষ্ট মূর্ত্তি বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে।

মিশরের প্রতীক-কলা হিন্দু প্রতীক কলা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত। জগৎ-সম্বন্ধে মিশরীয়গণের ধারণা তাহাদের ফিনিক্সের কাহিনীতে এবং পিরামিড, মন্দির, ওবেলিস্ক এবং মেম্নন্ মূর্ত্তিসকলের মধ্যে প্রকাশিত। ওবেলিস্কগুলি সূর্য্য-কিরণের প্রতীক। সাত ও বারো সংখ্যাকে মিশরীয়গণ প্রতীক রূপে ব্যবহার করিত। সাত ছিল গ্রহের সংখ্যা, বারো চন্দ্রের পরিক্রমার সংখ্যা। এইজন্য মিশরীয় মন্দিরে সাতটি স্তম্ভ অথবা বারোটি সোপান। স্ফিংক্স্ বিশ্ব-রহস্যের প্রতীক। এই সকলের মধ্যে সৎ ও প্রতিভাসের পার্থক্যের স্পষ্ট উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সৎ ও প্রতিভাসের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যবোধ দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দু ও পারসিক অদ্বৈতবাদ-মূলক কলার মধ্যে। হিব্রু কবিগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, বিরাটের কলা। এই সকল হিন্দু, পারসিক ও হিব্রু কলায় অসঙ্গ বিশ্বের সার, অন্য সকল বস্তু তাহার উপলক্ষণ মাত্র। হিন্দু ও পারসিকগণ ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা, জগতে অনুস্যূত এবং জাগতিক ব্যাপারে প্রকাশিত বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। হিব্রুগণ ঈশ্বরকে একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করিত। তাহাদের মতে তাঁহার নিকট অন্য বস্তুর কোনও সত্তা নাই। হিব্রু ঈশ্বর বিরাট। যখন অসীমকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা উপযোগী ভাষা অথবা অন্য কোনও উপায় না পাইয়া ব্যর্থ হয়, তখন সেই চেষ্টাই বিরাট।

হেগেলের মতে উপকথা,[১] রূপক কলা, এবং রূপক বর্ণনায় প্রতীক কলার পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। উপকথার কোনও গল্পের মধ্যে কোনও নৈতিক উপদেশ অথবা সত্য থাকে। কিন্তু সেই গল্প ও উপদেশ অথবা সত্যের মধ্যে সম্বন্ধ একান্ত ভাবে বাহ্য। তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক কোনও সাদৃশ্য নাই। হেগেলের মতে এই গুলি প্রকৃত কলা নহে।

সর্ব্বোত্তম কলা

আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করিতে হইলে মূর্ত্ত আত্মাকেই প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু প্রতীক কলায় আত্মার সার্ব্বিক রূপই ব্যক্ত হয়। হিন্দু কলায় পরমার্থ "নিরাকার এক" রূপে ব্যক্ত। এই একের মধ্যে কেবল সত্তা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। এই শূন্যগর্ভ মহাসামান্যের মধ্যে বিশেষ ও ব্যক্তিত্বের স্থান নাই। সুতরাং প্রতীক-কলা বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ রূপের মধ্যে মহা সামান্যকে প্রকাশিত করিতে গিয়া ব্যর্থ হয়। হিন্দুদিগের রূপবর্জিত "একের" সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের কোনও সমন্বয়ই সম্ভবপর নহে। কলার আধ্যাত্মিক আধেয়ের মূর্ত্ত ব্যক্তিত্ব গ্রহণ ভিন্ন তাহার আদর্শ প্রকাশিত হইতে পারে না। প্রাচীন গ্রীকগণ পরমার্থকে শূন্যগর্ভ সার্ব্বিক বলিয়া মনে করিত না। গ্রীক দেবতাগণ ছিলেন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ। মানবাত্মা যখন পরমার্থকে পুরুষ বলিয়া মনে করে, তখন তাহাকে আপনা হইতে অভিন্ন বলিয়া গণ্য করে। এই জন্যই কলায় মানবীয় ভাবের এত প্রভাব। এই জন্য পরমার্থকে মানবীয় গুণান্বিত[২] বলিয়া কলায় ধারণা করা হয়। সর্ব্বোত্তম কলার মানবীয়তাই তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার আধ্যাত্মিক আধেয় ও রূপের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। আধেয়ের কোনও অংশই রূপের মধ্যে অপ্রকাশিত থাকে না। রোমান্টিক কলায় আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাধান্য। এই জন্য তাহা প্রায় ধর্ম্মে উন্নীত হইয়াছে। গ্রীক ভাস্কর্য্যে দেবতাদিগের মূর্ত্তি মানুষের মত হইলেও তাহাদের সার্ব্বিকতা, তাহাদের দেবত্ব, অতিরিক্ত পরিমাণে মানবীয় বৈশিষ্ট্য-মিশ্রিত নহে। তাহারা জগতে থাকিয়াও যেন জগৎ হইতে নির্লিপ্ত, এইভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা পরিপূর্ণ শান্তি ও চিরস্থায়ী আনন্দের ভাব এই সকল মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। সর্ব্বোত্তম

[১] Fable [২] Anthropomorphism

কলা বলিতে যদিও গ্রীক কলাই বোঝায়, তথাপি যে কলার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব ও রূপের পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, তাহাই এই শ্রেণীভুক্ত। গ্রীকদিগের মধ্যেও প্রতীক কলার ও রোমান্টিক কলার যে একান্ত অভাব ছিল, তাহা নহে। ঈশ্বরের যে ধারণা সর্বোত্তম কলায় প্রকাশিত, তাহা পূর্ণ নহে। ঈশ্বর অসীম। কিন্তু গ্রীক দেবতাগণ সসীম। ঈশ্বর স্বতন্ত্র। গ্রীক দেবতাগণ স্বাধীন নহে। তাহারা অদৃষ্টের অধীন। এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সর্বোত্তম কলার বিলোপ ঘটে।

রোমান্টিক কলা

রোমান্টিক কলার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাধান্য। সর্বোত্তম কলায় পরমার্থের শান্ত মূর্তি প্রকাশিত, কিন্তু রোমান্টিক কলায় দ্বন্দ্ব, গতি ও চাঞ্চল্য প্রকাশিত। আত্মাকে নিজের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, শুধু সার্বিকরূপে আপনাকে দেখিলে চলিবে না, মূর্ত রূপে, ব্যক্তিরূপে দেখিতে হইবে। স্বকীয় সার্বিকতার আনন্দময় শান্তির মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, আপনাকে বিভক্ত করিয়া, আপনার সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এবং সেই দ্বন্দ্বের ফলে যে শান্তি ও আনন্দ উদ্ভূত হইবে, তাহা নিশ্চলতার শান্তি ও আনন্দ নহে, তাহা দ্বন্দ্বের সমাধানের শান্তি ও আনন্দ। আত্মার মধ্যগত দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বের সমাধানই রোমান্টিক কলার আধ্যাত্মিক আধেয়। সর্বোত্তম কলা দুঃখ, যন্ত্রণা ও অমঙ্গলকে অসুন্দর বলিয়া তাহার প্রকাশের চেষ্টা করে নাই। কিন্তু রোমান্টিক কলার তাহারা প্রাণস্বরূপ। যাহা অসুন্দর, রোমান্টিক কলায় তাহাও চিত্রিত হইয়াছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব-পীড়িত আত্মাই রোমান্টিক কলার বিষয় বস্তু।

খৃষ্টের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান, এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যদিগের এবং সন্ত ও সহিদদিগের অভিজ্ঞতায় আত্মার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বে জয়লাভ বিশেষভাবে প্রকাশিত। রোমান্টিক কলার বিষয়-বস্তু এই সকল হইতে সাধারণতঃ গৃহীত। মধ্য যুগের চিত্রকলায় মুখ্যতঃ এই সকল বিষয়ই চিত্রিত হইয়াছে। বাহ্য জগৎ এই কলায় মূল্যহীন। পুরুষের ব্যক্তিত্ব এই কলার একটি প্রধান বিশেষত্ব। সিভালরির সাহিত্য ও কলায় এই ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে প্রতিফলিত। সিভালরির প্রধান লক্ষণ তিনটি—আত্মসম্মান, প্রেম এবং প্রভুভক্তি। আত্মার ব্যক্তিত্বের অসীমতাই এই তিন গুণের ভিত্তি। আমি আত্মা, আমার মূল্য সকলে স্বীকার করুক, ইহাই আত্ম-সম্মানের মূল কথা। রোমান্টিক প্রেমের ভিত্তিও তাহাই; তবে এখানে অন্য এক ব্যক্তির—প্রেমের পাত্রের—মূল্যই অসীম। প্রভু-ভক্তিতে প্রভুর দোষগুণের বিচার নাই। তিনি প্রভু। তাই তাঁহার মূল্য অসীম। ইহার মধ্যে নীতির কোনও প্রশ্ন নাই। আত্মা নিজেই নিজের উদ্দেশ্য, সুতরাং অসীম, এই ধারণাই আত্মসম্মান, প্রেম ও প্রভুভক্তির মূল। গ্রীক কলায় এই ধারণার কোনও প্রকাশ নাই। এচিলিসের রোষ তাঁহার ব্যক্তিত্বের অপমান হইতে উদ্রিক্ত হয় নাই। লুণ্ঠিত দ্রব্যে তাঁহার প্রাপ্য ভাগ তিনি প্রাপ্ত হন নাই বলিয়াই তাঁহার রোষ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল।

আধুনিক কলার বিশেষত্ব যে রোমান্তিক প্রেম, তাহার স্থানও গ্রীক কলায় ছিল না। দৈহিক প্রেমই তথায় স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের ভিত্তি বলিয়া গণ্য, আধ্যাত্মিক প্রেম নহে।

চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতা এই তিনটি কলাই প্রধানতঃ রোমান্তিক। গথিক স্থাপত্যও প্রধানতঃ রোমান্তিক। স্থাপত্য কলায় গতি প্রকাশিত হইতে পারে না। ভাস্কর্য্যেও গতির প্রসর বেশী নাই। চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতাই সেই জন্য রোমান্তিক কলার মুখ্য বাহন। দ্বিতীয়তঃ চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতার বাহন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কলার বাহন অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। কঠিন জড় বস্তুই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের বাহন। কিন্তু চিত্রের বাহন দেশের মাত্র দুইটি দিক, এবং ইহাতে প্রকাশিত হয় বস্তুর বাহ্য রূপ মাত্র, তাহার বস্তুত্ব নহে। সঙ্গীতের বাহন স্বর। কবিতার বাহন শব্দ ও মানসিক প্রতিরূপ।

রোমান্তিক কলায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপে পরমার্থের প্রকাশে অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া আত্মা কলাকে আপনার প্রকাশের অনুপযোগী বলিয়া গণ্য করে। তখন আপনার পূর্ণ প্রকাশের জন্য অন্য পন্থা অনুসন্ধান করে। এই পন্থাই ধর্ম্ম।

(খ) ধর্ম্ম

"সৎ" (পরমার্থ) ও অসঙ্গ আত্মা অভিন্ন। মানব-মনে পরমার্থের জ্ঞানই অসঙ্গ। পরমার্থ ও আত্মা অভিন্ন। এইজন্য আত্মারূপে তাঁহার জ্ঞানই তাহার সত্য জ্ঞান। কিন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপে আত্মাকে সম্পূর্ণ প্রকাশিত করিতে পারা যায় না। অথচ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-রূপে পরমার্থকে প্রকাশিত করাই কলার উদ্দেশ্য। এই বিরোধের ফলেই ধর্ম্মের উদ্ভব।

চিন্তারূপী সার্ব্বিকই আত্মার স্বরূপ। সুতরাং সার্ব্বিক চিন্তারূপে পরমার্থের দর্শনই তাহার সত্য দর্শন। পরমার্থের এই দর্শন, কেবল "দর্শনেই" সম্ভবপর। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপে পরমার্থের দর্শন হইতে মানুষ বিশুদ্ধ চিন্তা-রূপে তাহার দর্শনে অব্যবহিত ভাবে উঠিতে পারে না। উভয়ের মধ্যে আর একটি ক্রম আছে। সেই ক্রমে পরমার্থের যে রূপ দৃষ্ট হয়, তাহা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, সম্পূর্ণ প্রজ্ঞা-গ্রাহ্যও নহে। এই মধ্যবর্ত্তী ক্রমই ধর্ম্ম। চিন্তারূপ পরমার্থ কলায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপ গ্রহণ করে; দর্শনে তাহা চিন্তারূপে আবির্ভূত হয়। ধর্ম্মের আধেয় অসঙ্গ চিন্তা; কিন্তু তাহার রূপ অংশতঃ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, অংশতঃ প্রজ্ঞাগ্রাহ্য। হেগেল এই রূপকে Vorstellung অর্থাৎ প্রতিরূপক চিন্তা বলিয়াছেন। সাধারণ প্রতিরূপের মধ্যে সার্ব্বিকতা নাই; তাহা কোনও একটি বিশিষ্ট বস্তুর প্রতিরূপ মাত্র। কিন্তু Vorstellung যদিও মানসিক চিত্ররূপী, তথাপি তাহার মধ্যে সার্ব্বিকতা বর্ত্তমান। ইহা যদিও বিশুদ্ধ চিন্তা অর্থাৎ সার্ব্বিক, তথাপি সেই সার্ব্বিক প্রত্যক্ষ রূপের মধ্যে প্রকাশিত। সৃষ্টির সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা একটি Vorstellung। পর প্রত্যয় আপনা হইতে বহির্গত হইয়া জগতে পরিণত হয়। ইহাই দার্শনিক সত্য। পরপ্রত্যয়ের জগতে পরিণতি কোনও

---

[1] Chivalry

কালিক ঘটনা নহে। ইহা সনাতন ক্রিয়া। কিন্তু সাধারণে সৃষ্টিকে কালিক ঘটনা বলিয়াই বিশ্বাস করে। পরপ্রত্যয়কে তাহারা ঈশ্বর বলে, তিনি অতীতে কোন একদিনে জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং সার্ব্বিক চিন্তাকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপে গ্রহণ করে। এইজন্য ইহা Vorstellung। খৃষ্টধর্ম্মের ত্রিত্ববাদে ঈশ্বর পিতা ও পুত্র উভয়ই। পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সম্বন্ধ হইলেও, ইহা সত্যের নিকটবর্ত্তী। ঈশ্বরের মধ্যে সার্ব্বিকতা ও বিশিষ্টতা উভয়ই বর্ত্তমান। সার্ব্বিক ঈশ্বরই পিতা, তিনি আপনার মধ্য হইতেই বিশেষের উদ্‌ভাবন করেন। বিশেষই পুত্র! ঈশ্বরকে পুরুষ বলিয়া বিশ্বাসও একটি Vorstellung। পরমার্থ যে আত্মা, তিনি যে সর্ব্বোচ্চ ক্যাটেগরি অসঙ্গ প্রত্যয়, এই সত্যই এই বিশ্বাসে প্রতিফলিত! ঈশ্বরের অবতার অর্থাৎ মানবরূপ-ধারণও একটা Vorstellung। ইহা ঈশ্বরের সহিত মানুষের একত্বের ধারণা।

জনসাধারণের চিন্তা যতটা উচ্চে উঠিতে সমর্থ, তাহাই বিভিন্ন ধর্ম্মে প্রতিফলিত! বিশুদ্ধ নিরাধার চিন্তা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য। এই জন্য সত্য তাহার দার্শনিক রূপ পরিহার করিয়া ধর্ম্মের রূপে জন সাধারণের নিকট আবির্ভূত হয়। কোনও ধর্ম্মের আধেয় চিন্তা হইতে তাহার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপ বাহির করিয়া লইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা সত্য কিনা, তাহার উপরই তাহার সত্যতা নির্ভর করে! হেগেল খৃষ্টধর্ম্মকেই একমাত্র সম্পূর্ণ সত্য ধর্ম্ম বলিয়াছেন। কেননা এই ধর্ম্মের রূপক অংশ বর্জন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সহিত হেগেলের নিজের দর্শনের সম্পূর্ণ মিল আছে।

প্রতিরূপক চিন্তা-রূপে পরমার্থের অভিব্যক্তিই ধর্ম্ম। প্রত্যেক ধর্ম্মের তিন অংশ। (এই সকল অংশ নোশানের তিন অংশের অনুরূপ): (১) সার্ব্বিক অংশ, (ঈশ্বর অথবা সার্ব্বিক মনঃ এই অংশ), (২) বিশিষ্ট অংশ (সসীম মনঃ—বিভিন্ন মানুষে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত মনঃ। ঈশ্বর ও বিশিষ্ট মনঃ পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র! মানুষের মনঃ ঈশ্বরকে বিষয়রূপে অবগত হয়, এবং তাহা হইতে আপনার যে বিচ্ছেদ হইয়াছে, তাহাও অবগত হয়। এই বিচ্ছেদই পাপ ও দুঃখ) এবং (৩) ব্যক্তিত্ব। (ইহা হইতে ঈশ্বরের উপাসনা ও পূজার উদ্‌ভব হয়। বিশেষের সার্ব্বিকের মধ্যে প্রত্যাগমনই ব্যক্তিত্ব। এই প্রত্যাগমনে বিচ্ছেদের অবসান। উপাসনায় মানবমনঃ ঈশ্বর হইতে আপনার ভেদের বিলোপ করিতে চায়, তাহার সহিত এক হইতে চায়। ইহাই পূজা।) ঈশ্বর ও মানবের একত্বই সকল ধর্ম্মের সার। প্রত্যেক ধর্ম্মেই ঈশ্বর হইতে মানবের বিচ্যুতি কল্পনা করে, এবং তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলনের জন্য চেষ্টা করে। বিচ্ছিন্ন সসীম জীবের ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হওয়াই এই মিলন। ঈশ্বর ও মানবের এই একত্বই পরমাত্মার (অসঙ্গ আত্মার) আধেয়। আত্মা যখন তাহার বিষয়কে আপনা হইতে অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে, তখনই পরমাত্মায় পরিণত হয়। কলা, ধর্ম্ম এবং দর্শনে মানব-মনঃ আপনাকে সমগ্র সৎ[1] অর্থাৎ পরমার্থ বলিয়া বুঝিতে পারে। ইহাই ঈশ্বর ও মানবের ঐক্য।

---

[1] All reality

হেগেল আপনার দর্শনকে সর্বেশ্বরবাদ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সর্বেশ্বরবাদে প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বস্তুই ঈশ্বর, যাহা কিছুই প্রত্যক্ষ হয়, তাহা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন—তাহাদের বিশেষ বিশেষ রূপে, তাহারা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। কিন্তু হেগেলের মতে তাহার বিশিষ্টতাও সসীমত্ব সহ ব্যষ্টি মনঃ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন নহে। বিশিষ্টতা ও সসীমত্ব বর্জ্জন না করিয়া মানব-মনঃ ঈশ্বরের সহিত এক হইতে পারে না। আমি একটি বিশিষ্ট মনঃমাত্র। কিন্তু সার্ব্বিক মনঃ আমার মধ্যে বর্ত্তমান, তিনিই আমার অন্তরাত্মা, আমার অন্তরের সৎ বস্তু। সার্ব্বিক মনঃ ঈশ্বরকে মানবের হৃদয় অবস্থিত বলিলে তাহা সর্বেশ্বরবাদ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

হেগেল প্রচলিত ধর্ম্ম গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, (২) আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের ধর্ম্ম এবং (৩) পরম ধর্ম্ম অর্থাৎ খৃষ্ট ধর্ম্ম। যুক্তি-বলে মানুষ যে ধর্ম্মে উপনীত হয়, প্রত্যাদেশ-নিরপেক্ষ সেই ধর্ম্মকে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলে। কিন্তু হেগেল এই অর্থে "প্রাকৃতিক ধর্ম্ম" ব্যবহার করেন নাই। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরের আত্মারূপের সম্পূর্ণ ধারণা নাই, তাহাকে "সৎ বস্তু" অথবা শক্তিরূপে ধারণ করা হইয়াছে, তাহাকেই তিনি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এই সকল ধর্ম্মে মানবাত্মাকে প্রকৃতির শক্তির অধীন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। প্রাকৃতিক ধর্ম্মের তিনরূপ—(১) ম্যাজিক, (২) সৎ বস্তুমূলক ধর্ম্ম[1] এবং (৩) আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বাভিগামী ধর্ম্ম[2]। যেখানে সার্ব্বিক মনঃ ও ব্যক্তির মনের মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হয় নাই, সেখানে ধর্ম্মের উদ্ভব হয় নাই। যেখানে সার্ব্বিক ও বিশেষের পার্থক্যবোধ জন্মে নাই, সেখানে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ববোধও নাই। সেই জন্য প্রকৃতি হইতে মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধও নাই। অসংখ্য বিচ্ছিন্ন বস্তুর মধ্যে মানুষ আপনাকে একটি বস্তু বলিয়া মনে করিলেও, সে যে জড় বস্তু হইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী, এই রূপ একটা ক্ষীণ অনুভূতি, এবং সে যে ইচ্ছানুসারে মেঘ, ঝটিকা ও জলরাশিকে শাসন করিতে পারে, এই বিশ্বাস তাহার মনে উৎপন্ন হয়। ইহাই ম্যাজিক। কিন্তু ইহার মধ্যে আত্মা যে প্রকৃতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, এ ধারণা নাই। ইহার পরে যখন সার্ব্বিকের ধারণা উৎপন্ন হয়, তখন মানুষ প্রকৃতিকে আপনা হইতে স্বতন্ত্র গণ্য করে। এই পার্থক্য-বোধই যাবতীয় ধর্ম্মের ভিত্তি। কিন্তু এই সার্ব্বিকের মধ্যে প্রথমে বিশেষের কোনও স্থান নাই। ইহা বিশুদ্ধ সত্তা মাত্র। সমস্ত বিশেষ এই সার্ব্বিক সত্তার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তখন ব্যক্তির সংবিদ এবং বাহ্য জগতের যাবতীয় বিশিষ্ট বস্তুর কোনও পারমার্থিক সত্তার বোধ থাকে না। সেই সার্ব্বিক বস্তু নিত্য এবং সসীম বস্তু সকল তাহার উপলক্ষণ রূপে পরিগণিত হয়। এ বোধই সর্বেশ্বরবাদ। ইহার তিন ক্রম:—(১) চৈনিক ধর্ম্ম, (২) হিন্দুধর্ম্ম ও (৩) বৌদ্ধ ধর্ম্ম। এই সকল ধর্ম্মে ঈশ্বর অনন্তশক্তির আধার, কিন্তু সেই শক্তির কোনও উদ্দেশ্য নাই, তাহা জ্ঞানহীন অন্ধশক্তি

[1] Religion of Substance

[2] Religion in transition to the Religion of Spiritual Individuality

মাত্র। জ্ঞানময় ঈশ্বর মঙ্গলময় উদ্দেশ্যে জগৎ পরিচালনা করিতেছেন, এই ধারণা এই সকল ধর্ম্মে নাই। মানবাত্মার স্বাধীনতার ধারণাও নাই। এই সকল ধর্ম্মের ফল রাজতন্ত্র-শাসন প্রণালী। চীনের ধর্ম্মে ঈশ্বর ভেদহীন সার্ব্বিক, তিনি শূন্য সত্তামাত্র। আকাশই এই ধর্ম্মে সর্ব্বশক্তিমান। প্রকৃতির উপর আত্মার ক্ষমতার ধারণা যে এই ধর্ম্মে নাই, তাহা নহে। কিন্তু সে ধারণা অস্পষ্ট, এবং তাহা সার্ব্বিক আত্মার ধারণা নহে। সম্রাট সেই ক্ষমতার প্রতীক। সম্রাট সর্ব্বশক্তিমান আকাশের প্রতীক; তিনিই আকাশ, তিনিই ঈশ্বর! প্রকৃতি এবং মৃতাত্মাগণ তাঁহার জীবিত প্রজাবর্গের ন্যায় তাঁহার শাসনের অধীন।

হিন্দুধর্ম্মে সৎবস্তুর ধারণা স্পষ্টতর। ব্রহ্মই সৎ। তিনি নিগুর্ণ ও অনবচ্ছিন্ন, ভেদহীন. এক ও অদ্বিতীয় এবং নিরাকার। অন্য যাবতীয় বস্তু অনিত্য, ও আপতিক। তাহারা ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়। ব্রহ্ম যদিও পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে আত্মা (Spirit) বলা যায় না। তিনি ব্যক্তিত্বহীন। তিনি মূর্ত্ত নহেন, তাঁহার মধ্যে কিছুই নাই; হিন্দুদের কল্পিত জগতের মধ্যে কোনও শৃঙ্খলা নাই, এবং যদিও হিন্দুধর্ম্ম বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ, তথাপি তাহা অপেক্ষা উদ্‌ভটতর বহুদেববাদও আর নাই। কেহ কেহ হিন্দু ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোনও সাদৃশ্যই বস্তুতঃ নাই। বিশ্বের মূলীভূত প্রজ্ঞার (পর প্রত্যয়) অস্পষ্ট বিকশ ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহার বিকাশ হয় নাই। খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের সহিত হিন্দু ত্রিমূর্ত্তির সাদৃশ্য দেখাইতে হইলে, ব্রহ্মাকে সার্ব্বিক, বিষ্ণুকে বিশেষ, শিবকে ব্যক্তি, এবং ব্যক্তিরূপে শিবকে সার্ব্বিক ও বিশেষের একত্ব বলিতে হয়। কিন্তু শিবের কল্পনার মধ্যে সেরূপ কোনও ভাব নাই। তিনি "ভবন" ক্যাটেগরির প্রতীক। উৎপত্তি ও লয় "ভবনের" অন্তর্গত। শিবেরও দুই রূপ—স্রষ্টা এবং সংহার-কর্ত্তা. কিন্তু পরপ্রত্যয়ের তৃতীয় পদ "ব্যক্তিত্ব" যদিও পরিবর্ত্তন-সূচক তথাপি পরিবর্ত্তনমাত্র নহে। এই পরিবর্ত্তন বিশেষের সার্ব্বিকের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন। শিবের ধারণার মধ্যে তাহা নাই। বিশেষতঃ সৎ বস্তুর মধ্যে ত্রিমূর্ত্তির কোনও স্থান নাই। সৎ স্বীয় স্বরূপে ত্রিধা বিভক্ত নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সতের ত্রিবিধ প্রকাশমাত্র, সতের বাহিরে অবস্থিত, তাহার স্বরূপের মধ্যগত নহে। ত্রিমূর্ত্তির তিন দেবতা একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ, কিন্তু সেই তিন রূপের মধ্যে একত্ব নাই। হিন্দুদিগের উপাসনাও তাহাদের ঈশ্বর-ধারণার অনুরূপ। তাহাদের ঈশ্বর নিগুণ শূন্যমাত্র। ঈশ্বর ও মানুষের অভেদের ধারণাই উপাসনা। হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বরের সহিত এক হইতে হইলে, আপনার মধ্যে যাহা যাহা আছে, সমস্ত বর্জ্জন করিয়া শূন্যে পরিণত হইতে হয়। এই অবস্থা অনুভূতি-হীন, ইচ্ছাহীন, কর্ম্ম-হীন মনের নিষ্ক্রিয় শূন্য অবস্থা। কিন্তু ঈশ্বর আত্মা, এবং আত্মা শূন্য-গর্ভ নহে; সুতরাং মনঃ হইতে তাহার সমস্ত আধেয় নিঃশেষে বহির্গত করিয়া মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে। কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মনীতি, রাষ্ট্র এবং ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সার্ব্বিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রচেষ্টাদ্বারাই মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয়। পাপের বোধ অথবা প্রায়শ্চিত্তের ইচ্ছা

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে নাই। হিন্দুদের যে নীতিজ্ঞান নাই, তাহা নহে। কিন্তু কর্ম্মনীতি ও ন্যায়নিষ্ঠা তাহাদের উপাসনার অপরিহার্য্য অংশ নহে।

হেগেলের সময় ইয়োরোপে হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধে গভীর ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। হেগেলও হিন্দু দর্শন পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রম-সংকুল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাহার মতও নির্ভুল নহে।

আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বাভিগামী ধর্ম্মের মধ্যে হেগেল জরাথুস্ত্রের ধর্ম্ম, সিরীয় ধর্ম্ম ও মিশরীয় ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। জরাথুস্ত্রের ধর্ম্মের ঈশ্বর আহুর মাজদা অনবচ্ছিন্ন নহেন; তিনি মঙ্গলস্বরূপ, সুতরাং অমঙ্গলকর্ত্তৃক অবচ্ছিন্ন। তিনি শক্তি-স্বরূপও বটেন। এই জন্যই হেগেল জরথুস্ত্রের ধর্ম্মকে সৎ বস্তুমূলক বলিয়াছেন, কেননা সৎ বস্তুই শক্তি। আহুর মাজদার বিরুদ্ধ শক্তি আহ্রিমান তাহারই মত স্বাধীন। ইহা দ্বৈতবাদ। মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব আত্মার লক্ষণ। কিন্তু আত্মার দ্বন্দ্ব তাহার নিজের মধ্যে আবদ্ধ। আহুর মাজদার দ্বন্দ্ব বাহিরের শক্তির সহিত। জরাথুস্ত্রের ধর্ম্মে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন যে শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহার সহিত ঈশ্বরের মিলন সম্ভবপর নহে। সিরীয় ধর্ম্মে এই ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন তত্ত্ব ঈশ্বরের মধ্যেই অবস্থিত, এবং উভয়ের দ্বন্দ্বও ঈশ্বরের নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব। ইহাই আত্মার স্বরূপ! Pheonix একটা পক্ষী। প্রতি পাঁচ অথবা ছয়শত বৎসর অন্তর এই পক্ষী চিতানলে আপনাকে ভস্মীভূত করিয়া তৃতীয় দিনে আবার চিতাভস্ম হইতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উত্থিত হয়! Adonis ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া তৃতীয় দিনে আবার পুনরুজ্জীবিত হন। দেবতার মৃত্যুর মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত আছে! মৃত্যু আত্মার ব্যতিরেক। দেবতার মৃত্যুর অর্থ দেবতার মধ্যেই তাহার বিপরীত বর্ত্তমান, দেবতার মধ্যেই তাহার বিরোধী শক্তির সহিত সংঘর্ষ বর্ত্তমান।

মিশরীয় ধর্ম্মে এই তত্ত্ব অধিকতর বিকাশিত হইয়াছিল। ওসিরিস্ এই ধর্ম্মের প্রধান দেবতা। ওসিরিস্ যে ব্যক্তিদ্বারা নিহত হইয়াছিলেন, সেই টাইফন অমঙ্গলের প্রতীক। টাইফন-কর্ত্তৃক ওসিরিসের নিহত হওয়ার অর্থ এই বাহ্য শক্তির তাহার মধ্যে প্রবেশ। কিন্তু ওসিরিস্ পুনর্জ্জীবিত হইয়া কেবল জীব-জগতেরই অধিপতি হন নাই, মৃতের জগতের আধিপত্যও লাভ করিয়াছিলেন, এবং টাইফনকে পরাভূত করিয়া পাপের শাস্তি-বিধান করিয়াছিলেন। মৃত্যু আত্মার ব্যতিরেক, পুনর্জ্জীবন মৃত্যুর ব্যতিরেক। মৃত্যুকে হত্যা করা হয় পুনর্জ্জীবনদ্বারা। ইহাদ্বারা আত্মা ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বের নিরসন হয়। মিশরীয় ধর্ম্মে প্রতীকদ্বারা আত্মিক বিষয়ের প্রকাশের জন্য একটি প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের গুহ্য তত্ত্বের প্রকাশের জন্য প্রকাণ্ডকায় পিরামিদ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। আত্মাকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছাই ইহার মূল। মিশরীয় ধর্ম্ম প্রকৃতি এবং আত্মা উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

ইহুদী ধর্ম্ম, প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্ম এবং প্রাচীন রোমক ধর্ম্মকে হেগেল আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের

অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই সকল ধর্মে ঈশ্বর কেবল সৎ নহেন, তিনি বিষয়ী ও আত্মা, তিনি ব্যক্তিত্বাপন্ন পুরুষ।

ইহুদী ধর্মকে হেগেল বিরাটের ধর্ম বলিয়াছেন। এই ধর্মে ঈশ্বর পুরুষ, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, একমাত্র স্বাধীন সত্তা। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এই জগতের কোনও স্বাধীনতা নাই। জগৎ-সৃষ্টিতে জিহোবার কোনও বাহ্য উদ্দেশ্য নাই। গ্রীক ধর্মকে হেগেল সৌন্দর্য্যের ধর্ম বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-জগৎ, ঈশ্বর-বিহীন এবং তুচ্ছ নহে। প্রত্যক্ষ জগতেই ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশিত করেন। কলায় সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে তিনি প্রকাশিত। গ্রীক দেবতাগণ আত্মা—তাহারা পুরুষরূপে কল্পিত সামান্যমাত্র নহে। জিউস বায়ু-মণ্ডল, আপেলো সূর্য্য, এবং পসিডন সমুদ্র হইলেও, ইহারা বায়ু-মণ্ডল, সূর্য্য এবং সমুদ্র অপেক্ষা অনেক অধিক, কেবল ইহাদের পুরুষরূপে কল্পনামাত্র নহে। তাহারা মানবীয় গুণ-সমন্বিত। মানুষেরও স্বাধীন সত্তা আছে। প্রকৃতির দেবতা মানুষের সহিত বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। জগতে সবই ভাল, সুতরাং আমোদ প্রমোদে বাধা নাই। ক্রীড়া, উৎসব, গান, নাটক, কলা—এই সকলই ঈশ্বরের পূজা। দেবতারা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহারা রাষ্ট্রের ব্যবস্থা রক্ষা করেন।

কিন্তু এই আনন্দপূর্ণ ধর্মের পশ্চাৎ দিকে আছে, এক অজ্ঞেয় শক্তি—তাহার নাম নিয়তি। বহু দেবতার উদ্ভব হয় যে "এক" হইতে, নিয়তিই সেই এক। অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় হইলেও, দেবতা ও মানব সকলেই নিয়তির অধীন। নিয়তি অন্ধ ও যুক্তি-হীন।

রোমক ধর্মকে হেগেল উপযোগের ধর্ম[1] বলিয়াছেন। এই ধর্মের প্রধান দেবতা জুপিটার রোমক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ও রক্ষাকর্ত্তা। এই সার্ব্বিক দেবতার অধীনে বহুসংখ্যক দেবতা আছেন। তাহাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। এই সকল উদ্দেশ্যই সাম্রাজ্যের মঙ্গলের সূচক। রোমক দেবতাগণ স্বাধীন নহে, তাহারা মানুষের উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় মাত্র। তাহারা সুন্দর নহে, কিন্তু উপকারী। গ্রীকদেবতাগণ প্রফুল্ল ও আনন্দপূর্ণ, রোমক দেবতাগণ উদ্দেশ্য-সাধনে উৎসাহী ও চিন্তাযুক্ত।

হেগেলের মতে খৃষ্টধর্মের মধ্যেই অসঙ্গ সত্য বর্ত্তমান। খৃষ্টধর্মের গূঢ় অংশই হেগেলের দর্শন। উভয়ত্র এক সত্যই বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত: দর্শনে সেই সত্য বিশুদ্ধ চিন্তার আকারে প্রকাশিত। খৃষ্টধর্মে প্রকাশিত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপে, প্রতিরূপ-মূলক চিন্তার আকারে। খৃষ্টধর্মে পরম সত্য আছে বলিয়াই, এই ধর্ম প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম। ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ এই ধর্মে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত। ত্রিত্ববাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব, মানুষের পতন, অবতার, উদ্ধার, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ, এই সকল তত্ত্বের মধ্যেই খৃষ্টধর্মের সার নিহিত বলিয়া যাহারা ইহাদের তথাকথিত "যুক্তি-সম্মত" ব্যাখ্যা করিয়া ইহাদের অর্থ-বিকৃতি করেন, হেগেল তাহাদের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

খৃষ্টধর্মের সত্যতার প্রমাণ খৃষ্ট ও তাহার শিষ্যবর্গের অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে নাই।

---

[1] Religion of utility

আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রমাণ আত্মার মধ্যে——আত্মাই সেখানে একমাত্র সাক্ষী। সাধারণ লোকের মধ্যে অনুভূতি রূপেই এই প্রমাণ আবির্ভূত হইতে পারে। যাহা মহৎ ও সত্য, তাহার প্রতি আত্মার স্বতঃ স্ফূর্ত্ত আকর্ষণই এই প্রমাণ। সম্পূর্ণ মার্জিত মনে দর্শনই এই প্রমাণ। অন্য ধর্ম্ম হইতে খৃষ্ট ধর্ম্ম কিছু ধার করিয়াছে কিনা, তাহার আলোচনা এই প্রসঙ্গে অনর্থক। কোনও মত সত্য কিনা, তাহার আলোচনায় তাহার উৎপত্তি কোথায়, এই প্রশ্ন অবান্তর। দ্বিতীয়তঃ, একই পর প্রত্যয়ই সর্ব্বত্র আপনাকে প্রকাশিত করিতে সচেষ্ট। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মের মধ্যে তাহার প্রকাশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

ঈশ্বর বাস্তব আত্মা[1]—ইহাই খৃষ্টধর্ম্মের মূলকথা। বাস্তব আত্মার মধ্যে (১) সার্ব্বিক, (২) বিশেষ এবং (৩) ব্যক্তি এই তিনটি বর্ত্তমান। সার্ব্বিকের মধ্য হইতে বিশেষ বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং পরে বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে সার্ব্বিকের সহিত পুনর্মিলিত হয়। খৃষ্টধর্ম্মে এই সার্ব্বিকই স্বরূপস্থিত ঈশ্বর—সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি যেরূপ ছিলেন, সেই রূপে স্থিত ঈশ্বর। এই সার্ব্বিক ঈশ্বর হইতে জীবসমন্বিত জগৎরূপ বিশেষের উদ্ভব। ইহাই সৃষ্টি। শেষে খৃষ্টীয় সংঘে সার্ব্বিক ও বিশেষের সম্মিলন।

(গ) দর্শন

অসঙ্গ সত্যই অসঙ্গ ধর্ম্মের আধেয়—তাহার স্বরূপ। কিন্তু ধর্ম্মের ক্রটী, এই যে তাহাতে এই সত্য আগন্তুক রূপে ব্যক্ত হয়। জগতের সৃষ্টি, ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে ভেদের উদ্ভব এবং পরিণামে এই ভেদের অবসান, সকলই অবশ্যক ব্যাপার। কিন্তু ধর্ম্মে ঈশ্বরের স্বাধীন ইচ্ছা হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হয়—যেন জগতের সৃষ্টি না হইতেও পারিত। ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে ভেদ ও তাহার অবসান একটি কাহিনীর আকারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে জগৎসৃষ্টিও যেমন, এই ভেদ ও তাহার অবসানও তেমনি নিয়ত ও অবশ্যক। দর্শনেই সত্যের নিয়ত ও যুক্তি-অনুযায়ী রূপ প্রদর্শিত হয়। ধর্ম্মে সত্য রূপ সমন্বিত, দর্শনে রূপ-বর্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ চিন্তারূপে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু অসঙ্গ দর্শন প্রথমেই পূর্ণ রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় না। হেগেলীয় দর্শনের "নোশান"ই সত্যের পূর্ণরূপ। কিন্তু এই নোশানের ধারণা অল্পে অল্পে আবির্ভূত হয়। পূর্ণ দর্শনে পরপ্রত্যয়ই অসঙ্গ। বিশুদ্ধ সত্তার ক্যাটেগরিতে ইহার প্রথম প্রকাশ। প্রাচীনতম দর্শনে—এলিয়াটিক দর্শনে বিশুদ্ধ সত্তাই অসঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহার পরে সত্তার পরবর্ত্তী ক্যাটেগরি "ভবন" অসঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পূর্ণতর ক্যাটেগরি অসঙ্গ সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু সত্যের পূর্ণরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, পরপ্রত্যয় রূপে হেগেলের দর্শনে। ইহাই হেগেলের মত।

অসঙ্গ প্রত্যয়ই পর প্রত্যয়ের স্বরূপ। লজিকের শেষে আমরা যে অসঙ্গ প্রত্যয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা ছিল ক্যাটেগরিমাত্র, অন্তঃসার বিহীন, বস্তুত্ব-বর্জিত। কিন্তু এই

[1] Concrete

ক্যাটেগরিই বিশুদ্ধ চিন্তার ক্ষেত্র হইতে বাস্তবতার ক্ষেত্রে অসঙ্গ আত্মারূপে অভিব্যক্ত। দর্শনের মধ্যেই পরপ্রত্যয় অসঙ্গ আত্মারূপে প্রকাশিত, ইহাতেই তাহার উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ সিদ্ধি।

দর্শনই জগদ্ব্যাপারের উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই জগৎ-ব্যাপারের শেষ পরিণতি। পূর্ণতম জ্ঞানই পূর্ণ দার্শনিক জ্ঞান-সম্পন্ন আত্মা! সে জ্ঞান নিত্য ও সনাতন। তাহার পূর্ণতম প্রকাশই অসঙ্গ আত্মা।

অসঙ্গ আত্মাতেই হেগেলের দর্শন পরিসমাপ্ত। অসঙ্গ আত্মাই বিকাশের শেষ পরিণতি। কিন্তু এই পরমাত্মাই সকলের আদি, তিনি পুরাণ পুরুষ। সুতরাং দর্শনের যাহা শেষ, তাহাই আবার দর্শনের আদি। এই জন্যই হেগেল দর্শনকে বৃত্তাকার বলিয়াছেন।

হেগেলের দার্শনিক প্রস্থানের শেষেই পরমাত্মারূপী "দর্শন"কে আমরা প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই দর্শন কি, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, ইহার প্রারম্ভে—সত্তায়—ফিরিয়া যাইতে হয়! ইহাই দর্শনের বৃত্ত। এই বৃত্তের আরম্ভে লজিকের পর প্রত্যয় আলোচিত হইয়াছে। ইহার শেষেও আমরা পর প্রত্যয়ই (পরমাত্মারূপ) প্রাপ্ত হই দার্শনিকের মনে বাস্তব-সত্তা-বিশিষ্ট প্রত্যয় রূপে। ইহাতেই জগৎ ব্যাপারের সার্থকতা। "সনাতন প্রত্যয় আপনার স্বরূপের পূর্ণতা-সাধনে সদা সক্রিয় হইয়া পরমাত্মা-রূপে আপনাকে উৎপাদন ও সম্ভোগ করিতেছেন।"

সমালোচনা

হেগেলের দর্শনে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য তাঁহার জগতের উদ্ভব-সম্বন্ধীয় মত! জগৎ কেহ সৃষ্টি করে নাই; কোনও উপাদান হইতেও জগতের উদ্ভব হয় নাই। লজিক অর্থাৎ যুক্তি হইতে জগতের উদ্ভব হইয়াছে। লজিকের ক্যাটেগরি এবং যুক্তি-প্রণালী সমূহে হেগেল গতি ও শক্তির আরোপ করিয়াছেন। তাহা হইতেই যাবতীয় পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার মত। কিন্তু এই গতি ও শক্তি, ক্যাটেগরি ও যুক্তির ব্যবহার করে যে মানুষ, তাহাতেই বর্ত্তমান। জগৎ স্থূল, জাগতিক বস্তুসকল নানা গুণের আধার। ক্যাটেগরিগণ সূক্ষ্ম নিরালম্ব বস্তুত্বহীন সামান্য। তাহাদের দ্বারা জগতের সৃষ্টি কিরূপে হয়, তাহারা কিরূপে স্থূল জগতে পরিণত হয়, তাহার ব্যাখ্যা হেগেল করিতে পারেন নাই। কোন কোন সমালোচকের ইহাই মত।

জাগতিক প্রত্যেক বস্তুই যে সামান্যের সমবায়, সামান্য ব্যতীত যে কোনও বস্তুতেই অন্য কিছু নাই, স্ব-গত বস্তু যে কেবল অনাবশ্যক কল্পনা মাত্র, হেগেল তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রত্যয়গণ মানসিক ভাব; ক্যাটেগরিগণও সম্প্রত্যয়; উভয়েই মানসিক ভাব। উভয়ই সূক্ষ্ম। কিন্তু জগৎ যে সকল সম্প্রত্যয়ের সমবায়, তাহারা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধী। ক্যাটেগরিগণ ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত। উভয়ের মধ্যে এই বিপুল প্রভেদ বর্ত্তমান। জগতের প্রত্যেক বস্তুরই সত্তা, ও গুণ আছে। প্রত্যেক বস্তুই অন্য বস্তুর কারণ, এবং অন্য আর এক বস্তুর কার্য্য। এই জন্য সত্তা, গুণ, কার্য্য, কারণ প্রভৃতি ক্যাটেগরি। কিন্তু বৃক্ষ, লতা, জন্তু প্রভৃতি সামান্য-

গতের ব্যাপ্তি অত অধিক নহে। জগতের সকল বস্তু বৃক্ষ নহে কিংবা লতা বা জন্তু নহে, কতকগুলি লতা, কতকগুলি জন্তু। ক্যাটেগরিগুলি সর্ববস্তুতে প্রয়োজ্য বলিয়া তাহারা লজিকের অন্তর্গত। বৃক্ষ, লতা জন্তু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সামান্য লজিকের অন্তর্গত নহে। ক্যাটেগরি-রূপ বিশুদ্ধ সামান্যসমূহ (বা সার্ব্বিক) হইতে যুক্তির নিয়মে কিরূপে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধী সামান্য-সমূহের উদ্‌ভব হয়, হেগেল তাহা দেখাইতে সক্ষম হন নাই, ইহাই উপরিউক্ত সমালোচকদিগের মত। হেগেলের অসঙ্গ হইতেছে চিন্তা। জগতেও সামান্য-রূপ চিন্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, ইহা সত্য। কিন্তু ক্যাটেগরিরূপ চিন্তা হইতে লজিকের নিয়মানুসারে কিরূপে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধী সামান্যরূপ চিন্তার উদ্‌ভব হয়, হেগেল যে তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই, ইহা অস্বীকার করা সম্ভবপর নহে।

প্রত্যেক ধর্ম্মেই জগতের একজন জ্ঞানবান স্বষ্টিকর্ত্তা স্বীকৃত। তিনিই প্রজ্ঞানুযায়ী নিয়মে ভাবী এক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জগৎ পলিচালনা করেন। হেগেলের দর্শনে জগতের এইরূপ একটা উদ্দেশ্য স্বীকৃত। কিন্তু হেগেলের উদ্দেশ্য-বাদের সহিত ধর্ম্মের উদ্দেশ্যবাদের প্রভেদ প্রচুর। হেগেল সংবিদ-সম্পন্ন প্রজ্ঞাকে স্বষ্টির আদিতে স্থাপন করেন নাই। তাহা জগতের অভিব্যক্তির শেষে স্থাপিত। যে প্রজ্ঞাদ্বারা জগৎ শাসিত, তাহা জগতের বাহিরে কোনও পুরুষের প্রজ্ঞা নহে, তাহা জগতে অনুস্যূত। সৃষ্টির শেষে যে উদ্দেশ্য, অজ্ঞাত উপায়ে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অভিব্যক্তির উপর তাহার প্রভাব পতিত হয়, এবং এমনভাবে তাহাদ্বারা অভিব্যক্তির গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, যে তাহার ফলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সেই উদ্দেশ্য স্ব-সংবিদ। তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় কলা, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম এবং দর্শনে। যিনি জাগতিক ব্যাপার হইতে উদ্‌ভূত, তিনি জগতের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন না, তাহাকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করা যায় না, কোনও কোনও সমালোচক ইহাও বলিয়াছেন। কিন্তু হেগেল জগতের উদ্দেশ্যে যে পরবর্ত্তিতার আরোপ করিয়াছেন, তাহা কালিক পরবর্ত্তিতা নহে, তাহা লজিকের পরবর্ত্তিতা, সিলজিস্‌মের মধ্যে সিদ্ধান্ত তাহার অবয়ব দুইটির যেমন পরবর্ত্তী, সেই রূপ পরবর্ত্তিতা। হেগেলের যুক্তিতে যাহা পরে, তাহা আগেও বটে। তাঁহার পরমাত্মা যুক্তিতে যাবতীয় ক্রমের পরবর্ত্তী, কালের ক্রমে নহে। তিনি আদি, অন্ত ও মধ্য সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। ত্রিভুজের সমকোণত্ব যেমন যুক্তির ক্রমে সমবাহুত্বের পরে বর্ত্তমান, কিন্তু কালের ক্রমে পরবর্ত্তী নহে, পরমাত্মাও তেমনি কালিক স্বষ্টির পরবর্ত্তী নহেন। সমগ্র জগৎ তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান, তিনি জগতে অনুস্যূত, তিনি ও জগৎ অভিন্ন। তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতে কোনও যুক্তি-সঙ্গত বাধা নাই।

হেগেল জগৎকে দুইভাগে বিভক্ত করেন নাই, জড় ও চেতনের মধ্যে তিনি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর স্বষ্টি করেন নাই। বার্কলে জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন, জগৎকে তিনি মনেরই স্বষ্ট মনোময় পদার্থ বলিয়াছিলেন। হেগেল তাহা করেন নাই। তিনি দেকার্ত্তের মত জড় ও চৈতন্যকে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়া গণ্য করেন নাই। তিনি স্পিনোজার মত জড় ও চৈতন্যকে একই পদার্থের দুই রূপ বলিয়া গণ্য করিতেন—সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপ, এবং সূক্ষ্ম স্থূলে অভিব্যক্ত হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তবুও তিনি সূক্ষ্ম

হইতে স্থূলের অভিব্যক্তির নৈয়ায়িক ব্যাখ্যা দিতে পারিয়াছেন বলা যায় না; শূন্যগর্ভ সূক্ষ্ম সামান্য হইতে সারাংসার স্থূল বিশেষের উদ্ভব কিরূপে সম্ভবপর হয়, বিশুদ্ধ প্রত্যয় কিরূপে ন্যায়ের নিয়মে ইতিহাসে বাস্তবরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

হেগেলের মতানুসারে প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তন বলিয়া কিছু নাই। নূতন কিছুই হয় না। প্রজ্ঞা সনাতন, তাহা স্থাণু, অচল ও চিরন্তন, তাহার মধ্যে আজ যাহার অস্তিত্ব নাই, কল্য তাহা তাহার মধ্যে আবির্ভূত হওয়া অসম্ভব; প্রজ্ঞা চির বর্তমান, চিরপূর্ণ। প্রজ্ঞাই সমগ্র সত্তা। অপূর্ণতা তাহারই একদেশ মাত্র। ঐতিহাসিক ঘটনা দেশ ও কালে সমগ্রের বিকাশের অংশমাত্র। সুতরাং স্পিনোজা ও লাইবনিট্‌জের মতো হেগেলও জগতের সকলই ভালো বলিয়া গণ্য করেন, তাহার মতে সত্যদৃষ্টির নিকট এই জন্য এই জগৎ সমস্ত সম্ভাবিত জগতের মধ্যে সর্বোত্তম। সুতরাং দার্শনিক সমস্ত ব্যাপারই সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করেন। জগৎ গতিহীন এবং পূর্ণ। তাহার মধ্যে যে গতি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা ভ্রান্তি মাত্র, যদিও এই ভ্রান্তি বাস্তব, তথাপি তাহা ভ্রান্তি মাত্র। "পরমার্থ এক", ইহা পরস্পর সম্বদ্ধ বিভিন্ন অংশে একীভূত সমগ্রতা। ইহার মধ্যে যাবতীয় পার্থক্য ও ভেদ বর্তমান। বিষয়ী ও তাহার বিষয়ের ভেদও এই সকল পার্থক্যের অন্তর্গত। আমাদের মনঃ পরমার্থের পূর্ণরূপ দেখিতে অক্ষম, তাহার আংশিক রূপই দেখিতে পায়। অসঙ্গের আংশিক রূপ বলিয়াই এইরূপ তাহার সত্যরূপ নহে। জগৎ আমাদের মনের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সমবায়রূপে প্রতীত হয়। অসঙ্গের নিজের নিকটই বিশ্ব একমাত্র অবিভাজ্য একত্বরূপে প্রকাশিত হয়। দর্শনের সাহায্যে এইরূপের আভাস আমরা পাইতে পারি।*

অসঙ্গেই নিয়ন্ত্র আপেক্ষিক সত্যের পূর্ণ সত্যতা। সসীমের সত্যতাই অসীম। "যাহা অপূর্ণ, তাহা যাহা প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করে, তাহাই পূর্ণ।"†

কিন্তু ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মিথ্যা হইতেও যাহা অধিকতর অনিষ্টকর, সেই অর্দ্ধ সত্যেরও সমর্থন করা যায়। যে বিপজ্জনক ভ্রান্তি হইতে পীড়ার উৎপত্তি হয়, অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যে ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি হইতে ভীষণ অমঙ্গল উৎপন্ন হয়, যে ভ্রান্ত অর্থনীতি হইতে আর্থিক সর্বনাশ হয়—তাহাও ইহাদ্বারা সমর্থিত হয়। পরিপূর্ণ সমগ্রের মধ্যে সকল অংশই যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় (যাহা হেগেলের মত), তাহা হইলে উপরোক্ত মীমাংসা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

John Lewis হেগেলের দর্শনের বিরুদ্ধে তিনটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। প্রথমতঃ হেগেল জগৎকে পরম-প্রত্যয় রূপে গণ্য করিয়াছেন। প্রত্যয় মানসিক পদার্থ। পর প্রত্যয় ইতিহাসে আপনাকে বাস্তব রূপ দান করিয়াছে, বলার অর্থ চিন্তা জড়ের পূর্ববর্তী। কিন্তু এই মত আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধী। বিজ্ঞানের মতে জড়ই আদিম

---

* Joad—Great Philosophies of the World.

† Modern Idealism—Royce.

পদার্থ; বহুদিন জড় ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। তার পরে প্রাণ এবং প্রাণের পরে মনের আবির্ভাব হয়। এই আপত্তির কোনও গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। কেননা হেগেল যে পূর্ব্ববর্ত্তিতার কথা বলিয়াছেন, তাহা কালিক পূর্ব্ববর্ত্তিতা নহে, নৈয়ায়িক পূর্ব্ববর্ত্তিতা।

দ্বিতীয়তঃ—হেগেলের মতে পরিবর্ত্তন বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। ইহার ফলে জগতের বৈচিত্র্য বিনষ্ট হয়, এবং প্রকৃত পক্ষে জগতের বিকাশ ও নূতনত্বের আবির্ভাব বলিয়া কিছুই কল্পনা করা যায় না।

তৃতীয়তঃ—হেগেলের মতে সামগ্রিক একত্বের মধ্যে অমঙ্গল বলিয়া কিছু নাই, যাহা অমঙ্গল বলিয়া প্রতীত হয়, বস্তুতঃ তাহা মঙ্গল হইতে অভিন্ন। হেগেল ইহা প্রমাণ করেন নাই। উচ্চতর স্তর হইতে দেখিলে অমঙ্গলের কি সমর্থন পাওয়া যাইতে পারে, তাহা হেগেল বলেন নাই। যাহা যুক্তি-সঙ্গত, তাহাই কেবল সত্য; সুতরাং যাহা যুক্তি-সঙ্গত নহে, তাহার অস্তিত্ব নাই। মঙ্গল ও সত্যের অভাব-সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণাই হইতে পারিত না, যদি পূর্ণ মঙ্গল ও পূর্ণ সত্যের অস্তিত্ব না থাকিত। আমাদের মনঃ যখন পূর্ণতা-প্রয়াসী, তখন পূর্ণতা যে আছে, তাহা প্রমাণিত হয়। পূর্ণতার জন্য আমাদের যে প্রচেষ্টা, তাহা বিশ্বের মধ্যে প্রতীয়মান সামঞ্জস্যের অভাবের সহিত আমাদের মনের সামঞ্জস্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। পরমার্থের দিক হইতে যাবতীয় বস্তু যিনি দর্শন করিয়া অমঙ্গল-রূপ মায়া অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি মিষ্টিক। কিন্তু এই মত দৃষ্ট তথ্য হইতে অনুমান নহে। যে কোনও তথ্যের সহিত ইহার সামঞ্জস্য হইতে পারে। সুতরাং ইহাকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সত্য বলা যায় না। এই মতদ্বারা লোকে অমঙ্গলের প্রতিরোধ করিতে উৎসাহিত হয় না। অমঙ্গলকে শিরোধার্য্য করিয়া লয়। নিঃসহায় আশাহীন অলস ব্যক্তিদিগের ইহাই অবলম্বন। অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা ইহা দ্বারা আপনার অনাচারের সমর্থন করে।

অসঙ্গের মধ্যে তাহার সকল অংশের সামঞ্জস্য আছে; সুতরাং রাষ্ট্রের মধ্যেও তাহার বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্য বস্তুতঃ বর্ত্তমান, হেগেলের এই মতদ্বারা বহু অপূর্ণতা, অবিচার ও ত্রুটী-সমন্বিত রাষ্ট্রেরও বর্ত্তমান অবস্থা সমর্থিত হয়। হেগেল প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র-প্রত্যয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার মধ্যে সামাজিক সকল বিরোধের সমন্বয় হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এই মতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কোন যুক্তিতেই সমর্থনযোগ্য নহে। কিন্তু যাহা যুক্তিসঙ্গত, তাহাই কেবল যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, এরূপ রাষ্ট্র সত্য নহে, সুতরাং তাহার বশ্যতা স্বীকারেও কেহ বাধ্য নহে। এই ভাবে হেগেলের মত দ্বারাও বিপ্লবের সমর্থন করা যাইতে পারে।

তৃতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত